

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্ত
পূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা (১৯০০-২০২০)

গবেষক

স্নেহাশিস দাসকর্মকার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জয়দীপ ঘোষ

অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

Certified that the Thesis entitled

‘নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা (১৯০০-২০২০)’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Joydeep Ghosh, Department of Bengali, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the supervisor:

Dated:

Candidate:

Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা (১৯০০-২০২০)’ নিয়ে পিএইচ.ডি শুরু করেছিলাম ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে। এই গবেষণাপত্র যখন জমা দিতে যাচ্ছি তখন ২০২৪ সালের জুন মাস। প্রথমেই বলা দরকার পিএইচ.ডি-র দীর্ঘ যাত্রাপথ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারা বস্তুতপক্ষেই আনন্দের বিষয়। যদিও গবেষণাপত্রটি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের জন্য জমা দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। অবশ্যই এরপর বাকি থাকে থিসিসের ‘ফাইনাল ডিফেন্স’। পিএইচ.ডি আমাদের শুধুমাত্র ‘ডক্টরেট’ উপাধি লাভ করতেই সাহায্য করে না, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার এই দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর আমরা বুঝতে চেষ্টা করি গবেষণার স্বরূপ এবং তার সঙ্গে জড়িত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। গবেষণার জন্য একজন গবেষকের তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান এবং বিদ্যায়তনিক গভীর ভাবনা বা চর্চা গবেষককে পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি জীবনে তথা কর্মজীবনে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। এই দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে প্রত্যেক গবেষককে অনেক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয়ও দিতে হয়। মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা নিয়ে কাজ করার সূত্রে সাহায্য পেয়েছি একাধিক কৃতবিদ্য ও জ্ঞানী মানুষদের। যাঁদের নাম অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। তাঁদের উপযুক্ত পথ নির্দেশ ও সাহায্য ছাড়া এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

আমার দীর্ঘ গবেষণায় আগাগোড়া আমায় সাহায্য করে গেছেন আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. জয়দীপ ঘোষ মহাশয়। তাই এক্ষেত্রে তাঁর নাম আলাদা করে বলতেই হবে। মহাভারত নিয়ে আমার গবেষণার আগ্রহ দেখে প্রাথমিকভাবে স্যার নিজেই এটি নিয়ে এগোতে বলেছিলেন। এরপর গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত বই সংগ্রহের বিষয়ে স্যার নিজেই আগাগোড়া আমায় উৎসাহ দিয়ে গেছেন। গবেষণার বিভিন্ন স্তরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সন্ধানও তিনি আমায় দিয়েছেন। গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না এই বিপুল কাজটিকে কীভাবে শেষ করা যাবে, হতাশায় ভেঙে পড়ে গবেষণার বিষয় পরিবর্তনের কথাও মাথায় এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্যারের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ আমায় ভরসা দিয়েছে। তাই বাস্তবিক অর্থে স্যারের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অবশ্য গবেষণার কাজ কতটা ভালোভাবে করতে পেরেছি তা স্যারই বলতে পারবেন।

প্রত্যেক গবেষকের পিএইচ.ডি-র কাজকর্মগুলি যথাযথ নিয়মে এগোচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিভাগে একটি ‘Research Advisory Committee’ বা ‘RAC’ এর উপস্থিতি আছে। প্রত্যেক গবেষকের গবেষণার বিষয়ের ওপর নজর রেখে এই কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আমার ক্ষেত্রে এই কমিটিতে ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরেন্দ্র মণ্ডল এবং

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়। তাঁরাও নানাভাবে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। মাঝে মাঝে আমার কাজে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। অধ্যাপক বরেন্দ্র মণ্ডল মহাভারতের প্রতিগ্রহণ সংক্রান্ত নানান গুরুত্বপূর্ণ বই এবং পত্রপত্রিকা দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। এই দীর্ঘ গবেষণার পথে তাঁরা তাদের ভাবনা বা মতামত কখনোই আমার উপর চাপিয়ে দেন নি। গবেষণাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁরা আমায় দিয়েছেন। গবেষণার কাজকর্ম হয়তো এভাবেই শেষ করতে পারতাম। কিন্তু এরই মাঝে ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ থেকে বাংলা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ফলস্বরূপ ‘RAC’ এর সদস্য পরিবর্তন হয়। অধ্যাপক বড়ুয়ার জায়গায় আসেন ড. সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয়। আমার গবেষণার শেষ পর্যায়ে তিনি ‘Reception Theory’ বা প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম আমায় জানিয়েছিলেন। আমার গবেষণার একেবারে অন্তিম পর্যায়ে তিনি এলেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গবেষণার বিষয়টিকে দেখেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। তাই তাঁর প্রতিও আমি সমরূপে কৃতজ্ঞ।

এরপর অবশ্যই বাংলা বিভাগের অন্যান্য স্যার ও ম্যাডামদের কথা বলতেই হবে। যাঁদের কাছে স্নাতক স্তর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানাভাবে আমি ঋণী থেকেছি। তাঁরা উপযুক্ত সময়ে পাশে না থাকলে আজ এই পর্যন্ত আসতে পারা আমার অধরাই থেকে যেত। অধ্যাপক আব্দুল কাফি, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্হা, অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া এবং অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী আমার ‘রিসার্চ অ্যাডভাইসরি কমিটি’র সদস্য না হয়েও মূল্যবান মতামত দিয়ে আমায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাই তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্যার ও ম্যাডামরা ছাড়াও আরও অনেকেই আমার গবেষণাকে নানা সময় এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। মহাভারতের নানা বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে আলোচনাতেও তাঁরা আমাকে নানা সময় মুগ্ধ করেছেন। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও গভীর ভাবনা আমাকে নানা সময় প্রভাবিত করেছে। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয়ের নাম আমাকে বলতেই হবে। বিভিন্ন সময়ে মহাভারতের একাধিক জটিল বিষয়কে সহজ করে আমাকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফোনে কথোপকথনের পাশাপাশি ঢাকুরিয়াতে তাঁর বাড়িতেও এই বিষয়ে অনেক সাহায্য মিলেছে। বিশ্ব বিখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাগ্নে যোধপুর পার্ক নিবাসী সুদর্শন রায় নিজেও মহাভারতের একজন একনিষ্ঠ পাঠক। পেশাগতভাবে সুদর্শন রায় একজন অত্যন্ত সফল উচ্চস্তরীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ও ব্যবসায়ী মানুষ। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও মহাভারতের অনেক বিষয় তাঁকে গভীরভাবে ভাবায়। ২০২৩ সালে মহাভারতের একটি সরল বোধগম্য ইংরেজি অনুবাদও সুদর্শন করেছেন। ইংরেজির

পাশাপাশি বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজটিও সুদর্শন করে চলেছেন। তাঁর প্রতিও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সময়ে অসময়ে গবেষণাতে এবং গবেষণার বাইরেও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মহাভারত প্রীতি ও ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই সময়ের বিশিষ্ট মহাভারত গবেষক অধ্যাপক শামিম আহমেদ নানা সময় একাধিক তথ্য ও মতামত জানিয়ে আমায় গবেষণাতে অনেক সাহায্য করেছেন। এইসবের বাইরেও একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে বাংলা বিভাগের গবেষক বিশ্বজিত ঘোষালের সঙ্গে মহাভারতের অনেক বিষয় নিয়েই মতামতের আদান-প্রদান এবং তর্ক আমার হয়েছে। আমার গবেষণাতে হয়তো সরাসরি কাজে লাগবে না এমন বই বা পত্রিকার ছবিও অনেক সময় তিনি পাঠিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান গবেষক শ্রীমান অরুণ মাইতি দিনে রাতে একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে মহাভারতের অনেক বিষয় নিয়েই আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাবনা ও সুচিন্তিত মতামত আমায় গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বলা বাহুল্য, অরুণের আগ্রহের বিষয়- ‘মহাভারতের কূটনীতি এবং বর্তমান ভারতে তার প্রাসঙ্গিকতা’। এঁদের সবার ভাবনাই আমার গবেষণাতে সাহায্য করেছে।

গবেষণার সাহায্যের জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার এবং সেখানকার কর্মীদের ওপর। এই বিষয়ে প্রথমেই বলা দরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কথা। উভয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা গবেষণার কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার এবং আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে। মহাভারতের সমালোচনা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রাচীন বইপত্রের সন্ধান পেয়েছি কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সৌজন্যে (পূর্বতন সংস্কৃত কলেজ)।

এগুলি ছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় আমার বাবা শ্যামল দাসকর্মকার ও মা নমিতা দাসকর্মকারের কথা। যাঁরা এই দীর্ঘদিন নানাভাবে আমার পাশে না থাকলে এই গবেষণা শেষ করে উঠতে আমি পারতাম না। তাঁরা প্রতিনিয়ত আমার পাশে থেকেছেন এবং গবেষণার খুঁটিনাটি খবর মাঝেমধ্যেই নিয়েছেন। দীর্ঘ গবেষণার সময়ে মাঝেমধ্যেই ক্লান্তি ও অবসাদ আসাটাই হয়তো স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই তাঁরা আমাকে দ্রুত গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে তাগাদা দিয়ে গেছেন। তাই তাঁদের কাছেও আমার ঋণ কোনও অংশে কম নয়। আমার পুরো গবেষণার কাজে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় (Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India) এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের (UGC) ওপরে। কারণ তাঁদের নির্ধারিত যোগ্যতার মাপকাঠিতে

আমার গবেষণার বিষয়টি নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁদের সম্পূর্ণ অর্থায়নেই এই গবেষণাটি শেষ করা গেল। তাই তাদের প্রতিও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

উপরিউক্ত প্রত্যেকের সাহায্যেই আমার গবেষণাপত্রটি যথাসময়ে জমা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তাই এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি সমানভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের সবার উদ্দেশ্যেই আমার কৃতজ্ঞতা মাত্র এই কয়েকটি বাক্যে স্বীকার করলাম।

সূচি

	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	III- VI
গবেষণা পদ্ধতি	IX
ভূমিকা	X- XIX
প্রথম অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে মহাভারত প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা	২০-১২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে মহাভারত কথা	১২৪-২২০
তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা নাটকে মহাভারত অনুষঙ্গ বিচার ও বিশ্লেষণ	২২১-৩০১
চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা প্রবন্ধে বাঙালির মহাভারত চর্চা: রূপে ও রূপান্তরে	৩০২-৫০২
পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা শিশু এবং কিশোর সাহিত্যে মহাভারত কথার পুনর্নির্মাণ	৫০৩-৫৫৫
উপসংহার	৫৫৬-৫৫৭

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি	৫৫৮-৫৬৫
ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি	৫৬৫-৫৬৬
পত্র পত্রিকাপঞ্জি	৫৬৬
গবেষণা পদ্ধতি গ্রন্থ	৫৬৬
আর্কাইভ্যাল এবং বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি	৫৬৭-৫৬৮
সহায়ক গবেষণাপত্র	৫৬৮-৫৬৯

গবেষণা পদ্ধতি:

প্রদত্ত গবেষণাপত্রটি ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
যেগুলি সারিবদ্ধভাবে তালিকায় দেওয়া হল:

১। ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার এবং গ্রন্থপঞ্জি- মূলত এই চারটি বিভাগে আমাদের গবেষণাপত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২। তথ্যগত সাহায্যের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং শিশুদের উপযোগী মহাভারতীয় আখ্যানগুলি এই শ্রেণিতে পড়ে।

৩। সহায়ক উপাদান সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে আর্কাইভ্যাল ও বৈদ্যুতিন তথ্যও ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। গবেষণার সহায়তার জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। সমগ্র গবেষণাপত্রটি কালপুরুষ ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। সমস্ত বড়ো উদ্ধৃতিগুলি কালপুরুষ ১২ ফন্টে হয়েছে এবং ইনডেন্ট করা হয়েছে। ফলে কোটেশন চিহ্ন বর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে আয়তনে ছোট উদ্ধৃতিগুলি কালপুরুষ ১৪ ফন্টেই মুদ্রিত হয়েছে এবং সেগুলিকে পৃথকভাবে ইনডেন্ট করা হয় নি।

৬। প্রদত্ত গবেষণাপত্রে আকাদেমি বানান অভিধান বিধি অনুসৃত হয়েছে।

৭। গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA HANDBOOK-এর সপ্তম সংস্করণের মান্য পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার শিরোনাম- নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা
(১৯০০-২০২০)

স্নেহাশিস দাসকর্মকার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা আমাদের সমগ্র গবেষণার বিষয়টিতে ভাবতে চেষ্টা করেছি বিশ শতক থেকে একুশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাকে। বলাই বাহুল্য, মহাভারত একটি বহুমুখী ও বহুমাত্রিক অভিসন্দর্ভ। তাই মহাভারতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবনার প্রয়াস আমরা করতে চেয়েছি আমাদের গবেষণায়। আমরা জানি ভারত একটি বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির দেশ। এই বহুত্ববাদ ভারতের অন্যতম পরিচয়। ভাবনার এই জায়গা থেকে মহাভারতের পাঠ ও চর্চাও আমরা আমাদের গবেষণায় করতে চেয়েছি। কারণ সমকালীন পরিস্থিতিতে সারা ভারত জুড়েই কিছু উগ্র রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের মতো করে ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির নির্মাণ করছে। তাই মহাভারতও সেই সকল রাজনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পনার বাইরে থাকছে না। সেই কারণেই আমাদের গবেষণায় প্রতিটি অধ্যায়েই আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছি মহাভারতের এই বিশালতা ও ভিন্নতাকে। বস্তুতপক্ষে মহাভারতে হিংসা, ঘৃণা, মহাযুদ্ধ, অন্যায়ের মতো প্রেম, ভালোবাসা, নীতি ও ধর্মের জায়গাও সমানভাবে স্থান পেয়েছে। তাই কোনও ব্যক্তির পক্ষেই নির্দিষ্ট একটি ভাবনাকে কেন্দ্র করে বা নির্দিষ্ট একটি ছকে ফেলে মহাভারতকে পাঠ করা অসম্ভব। আমাদের গবেষণায় এগুলিকেই দেখার চেষ্টা হয়েছে। এর পাশে বর্তমান বিশ্বে ঘটে চলা একাধিক যুদ্ধ ও হানাহানি এবং মানুষের প্রতি মানুষের বিভেদ এতটাই বেড়ে চলেছে যে আজ আমরা প্রায় খাদের কিনারে এসে পৌঁছেছি। মূল মহাভারতে তো বটেই, এমনকী বিশ শতক থেকে একুশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিকেরা মহাভারতীয় বিভিন্ন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁদের নির্মিত নবনির্মাণেও প্রথমে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। তাই এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহাভারত আমাদের লড়াইয়ের অন্যতম শক্তি হতে পারে।

আমাদের গবেষণা পত্র প্রধান পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিতে সমকালীন যুগের চাহিদা মেনে যে সমস্ত সাহিত্যিকেরা মহাভারতীয় আখ্যান রচনা করেছেন, তাঁদের রচনাগুলিকে নিয়ে আমাদের আলোচনা এগিয়েছে। এর মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছি বর্তমান যুগের মানুষের

দ্বন্দ্ব ও সংকট উপস্থাপন করতে গিয়ে এবং ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মহাভারতীয় অনুষ্ণ কেমনভাবে উঠে এসেছে। গবেষণায় আমরা খুঁজতে চেষ্টা করেছি মহাভারতে ধর্ম ও নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। মূলত ধর্ম কী? অবস্থা ও পরিস্থিতির ভেদে ধর্মও কি পরিবর্তনশীল? ধর্মের সঙ্গে ভালোত্বের সংযোগ কতটা গভীর? মহাভারতের ন্যায় ও নীতির প্রসঙ্গগুলি সমকালীন যুগেও কতটা প্রাসঙ্গিক তাও বলার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণায়।

ছাড়াও আমাদের দীর্ঘ গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা অত্যন্ত চমকপ্রদ আমাদের কাছে। প্রথমত, মহাভারত শুধুমাত্র রূপকের আচ্ছাদনে আবৃত নয়। অলৌকিক ঘটনা ও অতিপ্রাকৃত বিষয় মহাভারতে থাকলেও তাতে আছে ইতিহাস পূর্বযুগের ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত। আদি মহাভারতের সময়কাল সিন্ধু সভ্যতার থেকেও প্রাচীন। মহাভারত ইতিহাস না হলেও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান মহাভারতের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কালে কালান্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিতে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের কাল সীমায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণের ধারা। তৃতীয়ত, মহাভারত চর্চায় নবজাগ্রত বাঙালির অন্বেষণ ও সৃষ্টিধারা। চতুর্থত, বিশ শতক ও একুশ শতকে মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকট বোঝাতে গিয়ে মহাভারতীয় অনুষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পঞ্চমত, ভারতীয় মহাভারত চর্চার ধারায় বাঙালির অবদান এবং ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালির মহাভারত চর্চার জায়গা।

ভূমিকা

সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক ভাবনার ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস, তা অগণন তত্ত্ব ও ধারায় সমৃদ্ধ। অসংখ্য তার রূপ, রীতি ও প্রকৃতি। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস যত দীর্ঘকালের সাহিত্যতত্ত্বের রূপান্তরণও ততদিনের। দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের এই ক্রমবিকাশের ধারা বহমান থেকেছে এবং একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তবে দেশে দেশে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত ও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। এছাড়াও আছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সম্পর্ক বিন্যাস, জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংকট, সম্পর্কের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ রূপ ও তার প্রকৃতি বিচার, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পূর্বজ ও পরিবর্তিত রূপান্তরণ, নবায়ন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু, যার ক্ষেত্র আলোচনা সমালোচনা বিচার পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব (Reception Theory)।

লেখক পাঠক এই দুই মৌল উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যেমন আদিমকাল থেকে ‘সাহিত্য রচনা’ নামক বিষয়টি সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কও প্রথমাবধিই ‘সাহিত্য নির্মাণ’ নামক রাসায়নিক যৌগ সৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় অনুঘটক রূপে থেকেছে। প্রকৃত অর্থে দেশ, কাল, সমাজ, ব্যক্তি বা পরিবার সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, এদের মধ্যকার যে কোনও পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই সাহিত্য প্রভাবিত হয়। আমরা জানি গতিশীলতার একটি অন্যতম লক্ষণ হল পরিবর্তন। তাই সাহিত্য ও সাহিত্য পাঠের, লেখক ও পাঠকের, স্রষ্টা ও ভোক্তার সম্পর্কের নানা বিন্যাস নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে করতেই, সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের তথাকথিত প্রচলিত প্রভাব পদ্ধতি থেকে নবায়িত ‘প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব’-র আগমন ঘটেছে। তত্ত্বগত দৃষ্টিতে ‘দাতা’ তত্ত্বের প্রাধান্যের স্থলে ‘গ্রহীতা’ তত্ত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাবনার এই জায়গা থেকে আমরা যাকে গ্রহণকারী সাহিত্য বলে ভাবছি, তাকে বিশ্লেষণের আলোকে ফেলে বিচার চলছে। ‘গ্রহীতা সাহিত্য’ কেন অন্য সাহিত্য থেকে গ্রহণ করছে? এই গ্রহণ সংক্রান্ত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনের শর্তগুলি কি কি হতে পারে? কোন মিল ‘গ্রহীতা সাহিত্য’কে ‘দাতা সাহিত্য’ থেকে গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিয়েছে? ‘গ্রহণ’ ক্রিয়ার ফলশ্রুতিই বা কত ধরনের? কি তার রূপ, কি তার বৈচিত্র্য? তারতম্যেরই বা কারণ কি? এই সমস্ত প্রশ্নকেই একত্রে ‘প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব’ আখ্যা দিয়ে, তার প্রেক্ষাপটে তুলনাত্মকভাবে দু’টি সাহিত্য ধারার পারস্পরিক সম্পর্ককে তুল্য-মূল্য বিচার করা সম্ভব, এবং দেখানো সম্ভব কোনও সম্পর্কই কার্যকারণ সূত্র ছাড়া স্বাভাবিকভাবে হয় না। তাই ‘দাতা’ বা ‘গ্রহীতা’ এই সম্পর্কগুলি আসলে

আপেক্ষিক, দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে তা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এভাবেই প্রভাবজাত আলোচনা সমালোচনাকে প্রতিস্থাপিত করে আধুনিক কালে ‘প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব’ এসেছে।

আমরা জানি যে, আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্য সমালোচনার অন্যান্য তত্ত্ব বা মতবাদ মূলত পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিশ্বেই এসেছে। ঠিক তেমনই প্রতিগ্রহণ তত্ত্বও এর বাইরে নয়। এই সাহিত্য তত্ত্বটি বিশ শতকে সাহিত্য সমালোচনার জগতে পা রাখে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির কনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি প্রথম আবির্ভূত হয়, ‘হ্যানস রবার্ট ইয়ার্ডস্’ এবং ‘উলফগ্যাঙ্গ ইজের’ নামের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি এই তত্ত্বের প্রবক্তা। স্বাভাবিকভাবে এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত করতে কমপক্ষে দুইটি পক্ষের প্রয়োজন হয়। তাই দুইটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা একে অপরের কাছাকাছি না হলে প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব কার্যকর হয় না। বিভিন্ন কার্যকারণ সম্পর্কসূত্রের বিচারে প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের দ্বৈত সাহিত্যধারার একটি দাতা বা emitter এবং অন্যটি গ্রহীতা বা Receiver নামে খ্যাত। প্রতিগ্রহণ তত্ত্বকে বুঝতে গেলে এই দুইটি বিষয়কে গভীরভাবে জানা দরকার। তা না হলে প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে:

The question of perspective is important in any study of transcultural contact and more... ..There are various possibilities in any study of reception... This law works in accordance with the cultural and literary system of the recipient, with the inherent traditions interacting with the needs of the moment. And the foreign element, before being assimilated or rejected as the case may be, undergoes a transformation, an interpretation if one may so put it, that is prompted by the ideologies and the general tendencies in operation in the system at any given moment. Reception studies here then do not merely lead to discoveries of diffuse, universal and timeless manifestation of welt-literature.

ইয়ার্ডস্ ও ইজের গ্রহণতাত্ত্বিক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে দু’টি ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছিলেন। উভয়েই প্রচলিত পাঠ পদ্ধতি প্রচলিত সাহিত্য সৃজন প্রক্রিয়া ও সাহিত্য স্রষ্টার সম্পর্কের গুরুত্বের থেকে পঠন প্রতিক্রিয়া, পাঠক ও পাঠক প্রতিক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের তাত্ত্বিক যে সকল ব্যক্তির, তাঁরা সাহিত্য পাঠ ও পাঠক এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটিকে প্রধানভাবে গ্রহণ করেন, সেটি হল, সাহিত্যকর্ম কখনও ব্যক্তিগতভাবে বা

কখনও সামগ্রিকভাবে, তার উপভোক্তার মাধ্যমেই গৃহীত এবং নির্মিত হয়। এর পূর্বের সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিতে লেখক বা রচয়িতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার পরিবর্তে সাহিত্যপাঠ নির্মাণে পাঠকের ভূমিকা স্বীকৃতি পেল প্রতিগ্রহণ তত্ত্বে। বিশ শতকের ছয়ের দশকে ইয়ার্ডস কনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যায়তনিক বক্তৃতা দেওয়ার সময়, প্রায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পূর্বের ‘ফ্রেডারিক শিলার’-এর সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত ভাবনাকে সামনে রেখে ‘What is and for what purpose does one study literary history’- তে, সাহিত্য ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্বয়নকে উদঘাটিত করতে চেয়ে সামাজিক চেতনার এক নতুন দিক দেখালেন। তিনি পাঠকের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের ক্রম পরিবর্তনকে তুলে ধরতে চাইলেন। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ইয়ার্ডসের তাত্ত্বিক প্রতিবেদনের সঙ্গে রাশিয়ান অবয়ববাদী বা structuralism ও রোমা জ্যাকবসনের বক্তব্যের অনেক মিল আছে। অবয়ববাদীরা সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিকতাকে পরিদৃষ্ট করতে চান। সাহিত্য স্রষ্টা যে সাহিত্য সৃজন করেন বা যে পাঠ নির্মাণ করেন, তাতে থাকে বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক উদ্দেশ্য। এই উপাদান ও উদ্দেশ্য থেকে তিনি একটি অবয়ব নির্মাণ করে থাকেন। এই অবয়বের শৃঙ্খলা এবং বর্ণনাগত শৃঙ্খলা উভয়ের একত্রিত রূপ থেকেই জন্ম নেয় যে নান্দনিক অনুভূতি, তা শুধু লেখকের দক্ষতার পরিচয়ক, তাই নয়, পাঠকের মনের অনুভূতিও তাকে নির্মাণ করে। প্রতিগ্রহণতত্ত্ব-র ক্ষেত্রে সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিক মতবাদ যেমন বিনির্মাণ/ Deconstructionism, পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ/ Reader-Response Theory, নারীবাদ/ Feminism ইত্যাদিও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এগুলির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় প্রত্যেক লেখক প্রথমে পাঠক এবং পরে লেখক। তাই লেখকের যে একটি পাঠকসত্তা আছে সেইটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিগ্রহণতত্ত্ব আরও অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাহিত্যচর্চার পরিসরে।

ইয়ার্ডস এর এই গ্রহণ কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের সমালোচনাকে আরও পূর্ণমাত্রা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করলেন কনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক তাত্ত্বিক উলফ্যাঙ্গ ইজের। বিশ শতকের ছয়ের দশকে ইউরোপে ঘটে গেছে নানা সামাজিক অঘটন, বিশ্বযুদ্ধের পরে সামাজিক তথা মানুষের মনে এসেছে আমূল পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সম্পর্কে জাগিয়ে তুলেছিল নানা প্রশ্ন, দেখা যাচ্ছিল নতুন পথ ও পথের দিশার জন্য ব্যাকুলতা, তখন সময়ের পরিবর্তন থেকে নতুন যে অভিজ্ঞতার প্রাপ্তি ঘটেছে তাকে অবলম্বন করে উপরিউক্ত দুইজন তাত্ত্বিক নির্মাণ করলেন মানুষের নতুন মনন অভিব্যক্তির রূপ। ইয়ার্ডস তাঁর তত্ত্বে (‘প্রতিগ্রহণের ইতিহাস’ এবং ‘প্রতিগ্রহণের নান্দনিকতা’) এই দুইটি ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এইভাবে যে, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সাহিত্য পাঠও পরিবর্তনশীল। এইটি লুকিয়ে থাকে সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। ইয়ার্ডস কোনও সাহিত্যপাঠকে ঘিরে পাঠকের সংবেদনশীলতার পূর্বের ও পরের রূপকে এবং

বিশ্লেষণী দক্ষতাকে ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ (the horizon of expectations) এই শব্দে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কিন্তু পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিকতার কারণে এই প্রত্যাশার দিগন্ত কখনও প্রসারিত কখনও সংকুচিত হতে পারে। এমনকী, সাহিত্যের প্রাকরণিক চরিত্রও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রত্যাশার দিগন্ত দ্বারা।

ইয়ার্ডস তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব ভাবনায় ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ এই শব্দবন্ধ প্রয়োগের মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনার একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেখাতে চাইলেন। তাঁর ভাবনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত চমৎকার। প্রথমত, প্রকরণের প্রচলিত আদর্শ এবং তার মধ্যে তত্ত্বরূপের বিশ্লেষণ ও তৎজাত গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য শিক্ষা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত সাহিত্যকর্মের মধ্যকার অন্তর্লীন সম্পর্ক সূত্রের বিন্যাসজাত বিশ্লেষণ এবং গ্রহণ। তৃতীয়ত, কল্পনার ও বাস্তবতার বিপ্রতীপকতার মধ্যে কাব্যিক ও ব্যবহারিক ভাষা পার্থক্যের সাহায্যে গ্রহণ। তবে এটা অবশ্যই বলতে হবে সাহিত্য পাঠের এই গ্রহণ নির্মিত হয় পাঠকের পঠন প্রতিক্রিয়া এবং সাহিত্য পাঠের সম্ভাব্যরূপের তুলনামূলকতার মধ্যে দিয়ে। ইয়ার্ডস যে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে প্রথমে প্রচলিত পাঠ, পরে প্রতিষ্ঠিত পাঠ এবং শেষে পরিবর্তিত পাঠ এর তুলনা উঠে এল। আমরা জানি যে, কোনও একটি সাহিত্য বর্তমানকালের পাঠকদের কাছে যে গুরুত্ব রাখে, পরবর্তী সময়ে কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার গুরুত্ব বা প্রভাব এক থাকে না। তাই কোনও একটি পাঠের যে রস বর্তমানে আমরা পাচ্ছি, ভবিষ্যতে অন্য মাত্রা পেয়ে তা আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তার মানে এই নয় যে, নির্দিষ্ট একটি কালের সাহিত্য পাঠ সমস্ত শ্রোতা বা পাঠকের কাছেই একই আবেদন নিয়ে হাজির হয়। এক্ষেত্রে আবেদন অবশ্যই পৃথক পৃথক হয়। একবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কোনও সময়োত্তীর্ণ তাৎপর্যকে লাভ করা সম্ভব নয় বলেই নির্দিষ্ট কোনও সময়ে নির্দিষ্ট কোনও সাহিত্য পাঠের চূড়ান্ত মূল্যায়ন তার শেষ কথা হতে পারে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যকে সেই সময়ের বিখ্যাত নাটককার ডি এল রায় যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তা তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত বিতর্কিত ছিল। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্য নাটকের মধ্যে যে বহুস্বর লুকিয়ে আছে, তা ডি এল রায় বুঝতে পারেন নি। মহাভারতের ক্ষেত্রেও আমরা এই পার্থক্যটি সহজে বুঝতে পারি। গীতার অর্থ প্রত্যেকটি সময়েই নতুনভাবে আমাদের সামনে হাজির হয়।

আবার সাহিত্য পাঠের মূল্যায়নে পাঠকদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কোনও সাহিত্য পাঠের যে পূর্বে প্রত্যাশার দিগন্ত তৈরি হয়, তা কিন্তু পরবর্তীকালে পাঠকদের পাঠ অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় বা হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতায় সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া সমকালীনতা আবার একবার পাঠের মধ্যে দিয়ে আলাদা হয়ে যায়। ফলে ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে প্রথম পর্যায়ের পাঠকরা পাঠের

মধ্যে যে বিষয়গুলিকে খেয়াল করতে পারেন নি বা আবিষ্কার করতে পারেন নি, পরবর্তী যুগের পাঠকেরা পরিবর্তিত সময়ের সাপেক্ষে সেগুলিকে খুঁজে পেলেন বা আবিষ্কার করলেন। এর মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি গ্রাহকের বা পাঠকের পঠন গুরুত্বের বিষয়টি। মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* তৎকালীন সময়ে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বিশ ও একুশ শতকে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। একই কথা *পথের পাঁচালী* সিনেমাটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সত্যজিৎ রায় প্রথম যখন এই সিনেমাটির বিষয়ে ভেবেছিলেন তখন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে উঠতে পারছিলেন না, নিজেদের জমানো অর্থ দিয়েই প্রাথমিকভাবে কিছুটা শুরু করেছিলেন, কিন্তু মাঝপথে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং লোকজনের উৎসাহও হারিয়ে যায়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থায়নে সিনেমাটির নির্মাণ শেষ হয়। তারপরের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। কলকাতা সহ চারিদিকে হৈ হৈ রব পড়ে গিয়েছিল। ইয়ার্ডস তাঁর প্রতিগ্রহণ তত্ত্বে এটাই দেখানোর চেষ্টা করলেন যে, ইতিহাস ও সাহিত্যতত্ত্ব ক্রমশ কালের নিয়মে এগিয়ে চলে। কোনও পাঠের বা সাহিত্যকৃতির সম্পূর্ণ অর্থ কখনোই আবিষ্কৃত হয় না। শুধু তাই নয়, সাহিত্যটির যারা পাঠক তাদের গ্রহণ ক্ষমতার বহুরূপতার দ্বারাই পাঠকের ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ক্রম রূপান্তরিত হয়ে চলে।

সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে ইয়ার্ডসের পাঠপদ্ধতির প্রয়োগের দিকটি হল অতীত পাঠের মধ্যে নতুন পাঠের সম্ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া। পুরাতন পাঠের নতুন দিক উপস্থাপন করা, বর্তমানের নতুন রূপে তার অনুবাদ করা, অথবা যে যে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা লুকিয়ে রয়েছে পাঠের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করা। তবে পাঠকের এই ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ নির্মাণের ক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন সমরেশ বসুর *বিবর* উপন্যাসটির কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে প্রথম প্রকাশের সময় পাঠকের প্রতিক্রিয়া যেমন ছিল, একুশ শতকে তা একেবারেই নেই। আমরা এখন *বিবর*-কে যৌনতায় ভরপুর একটি উপন্যাস হিসেবে দেখি না। এছাড়াও মনে করি না যে উপন্যাসটি অশ্লীল। একই কথা *কৃষ্ণকান্তের উইল* বা *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের ক্ষেত্রেও খাটে। এই উপন্যাসগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে পাঠকদের কাছে যে রূপে ধরা দিত, পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত সমাজে শরৎচন্দ্রের সময়কালে তার আবেদন এক ছিল না। পাঠকৃতির নিহিতার্থকে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ দিয়ে গ্রহণ করার ফলে পাঠ তাৎপর্যও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলে এবং এভাবেই এগিয়ে চলে তা। অতীত এবং বর্তমানের দ্বি-বাচনিকতায় এভাবেই ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে পাঠকের কাছে গৃহীত হয়।

প্রতিগ্রহণতত্ত্ব যেহেতু সাহিত্যরূপের অভ্যন্তরীণ সত্যকে প্রকাশিত করে, তেমনই সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি এবং অর্থনীতি— যাবতীয় মানবিক বিষয়ে লেখক পাঠক সমালোচকের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসেও উদ্ঘাটিত করে। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত এবং যা

কিছু যোগ করে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তার সমস্তটাই ধরা পড়ে প্রতিগ্রহণতত্ত্বে। এ কারণেই প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রতিগ্রহণতত্ত্ব উপলব্ধ হতে পারে, ঠিক তেমনই প্রথা বহির্ভূত সাহিত্যরূপের উপাদানও প্রতিগ্রহণতত্ত্বের প্রামাণ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারে। তাই নির্দিষ্ট কোনও সাহিত্য সংরূপ প্রতিগ্রহণতত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, তা ঠিক নয়। সমস্ত সাহিত্যই এর আলোকে বিচার করা যাবে। তা উপন্যাস হোক, কবিতা হোক, এমনকী নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র এবং আরও অন্যান্য কিছু। আমাদের সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্বে প্রতিগ্রহণতত্ত্বের প্রয়োগ খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত যুক্তির সত্যতা কোনও কালসীমায় সীমাবদ্ধ নয়। কারণ তা মানবিকী অনুভূতির সেই সত্যকে উদ্ভাসিত করে যা মানুষকে তার স্বরূপত্ব ও স্বকীয়তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এই অনুসন্ধানের ইচ্ছাই এই তত্ত্বের মূলকথা। তাই এই তত্ত্বে কোনও কর্তৃত্বের ভাব থাকা সম্ভব নয়। এরূপ বিভিন্ন প্রয়োজনে বর্তমান সাহিত্য বিশ্বে প্রতিগ্রহণতত্ত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পরবর্তী সময়ে ইয়ার্ডসের এই থিওরি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করেছেন উলফ্যাঙ্গ ইজের। তিনি মূলত ভেবেছেন ‘পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ’/ ‘রিডার রেসপন্স থিওরি’- এর উপর ভিত্তি করে। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিগ্রহণতত্ত্ব এবং পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পেলেও মূল ধর্মে এই দু’টি তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আসলে প্রতিগ্রহণতত্ত্বের পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের মাধ্যম হলেও, প্রতিপাদ্য মূলত সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যকৃতির অন্তর্বয়নকে উদঘাটন করার প্রয়াসে পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ মূলত পাঠক সমাজের শ্রেণিবিভাজন সহ বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সাহিত্যপাঠ কেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তাকে উপস্থাপিত করে। গ্রহণতত্ত্বের এই দুই প্রধান প্রবক্তার মূল পার্থক্যটি হল ইতিহাস কেন্দ্রিক। ইয়ার্ডস প্রতিগ্রহণতত্ত্বে ইতিহাসকে পাঠক ও সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, অন্যদিকে ইজের ইতিহাসের ছায়া থেকে সাহিত্যপাঠ ও পাঠককে বার করতে চান।

উলফ্যাঙ্গ ইজের-এর *Indeterminacy and the Reader Response in prose Fiction* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।। যদিও তাঁর তাত্ত্বিক প্রধান মতবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির নাম ছিল- *The Act of Reading: A theory of Aesthetic Response*। ইজের মত অনুসারে প্রতিটি সাহিত্যপাঠের ভেতরে কিছুটা ‘শূন্যায়তন’ প্রচ্ছন্ন থাকে। পাঠক তাকে আবিষ্কার করে এবং অর্থের দ্যোতনা দিয়ে পূর্ণ করে তোলে। কথিত বয়ানেই সাহিত্যপাঠ সম্পূর্ণ হয় না কখনও, অকথিত বয়ানকে উদ্ভাসিত করতে পারলেই তার সম্পূর্ণতা সম্ভব। সাহিত্যভাষ্য ও বিশ্লেষণ অকথিত বয়ানকে উদ্ঘাটিত করে। সাহিত্যপাঠের সেই শূন্যায়তন-কে ক্রমাগত পূর্ণ করে চলে। এই নির্মাণে পরিশীলিত পাঠক তার মনন ও জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাহিত্যকৃতির নিজস্ব অবস্থা ও পাঠকের স্বাধীন অবস্থান, এই দুইয়ের টানাপোড়েন জাত সাহিত্য পঠনের মাধ্যমে পাঠক ও সাহিত্যপাঠের মধ্যে যে দ্বিবাচনিক

সম্পর্ক তৈরি হয়, তার প্রধান কাজ হল পাঠকৃতির সম্ভাব্য সত্যকে মূর্তি প্রদান করা। কারণ সমস্ত সাহিত্যপাঠের গভীরেই লুকিয়ে থাকে ‘সম্ভাব্য পাঠ’। সম্ভাব্য অর্থাৎ শেষ কথা বলে কিছুই নেই। পাঠকের প্রতিক্রিয়া যেমন ভিন্ন কালে, ভিন্ন পরিসরে, ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করে, তেমনই পর্ব থেকে পর্বান্তরের সাহিত্যপাঠে নানা ধরনের তাৎপর্য উঠে আসে। এর মাধ্যমেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাঠক পৌঁছে যায় পাঠকৃতির বহুস্বরতায়।

এভাবেই পাঠকৃতির শূন্যায়তনকে পূর্ণ করতে করতে পাঠক ‘পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ’ এর মাধ্যমে পৌঁছে যায় প্রতিগ্রহণতত্ত্বের ‘প্রত্যাশার দিগন্তে’। প্রতিগ্রহণতত্ত্বের সঙ্গে ‘পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ’ এর মূল পার্থক্য এটাই যে ‘পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ’ যেখানে ব্যক্তিক, প্রতিগ্রহণতত্ত্ব সেখানে সামাজিক। আমরা জানি ‘পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ’-এ পাঠকদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। যেমন- প্রকৃত পাঠক বা actual reader, আদর্শ পাঠক বা ideal reader, প্রতীত পাঠক বা implied reader ইত্যাদি প্রকারের পাঠকসত্তার পাঠের উপলব্ধিই পাঠকৃতির অন্তর্ভুক্ত শূন্যায়তনকে পূর্ণ করে তোলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। পাঠক ভেদে একই পাঠকৃতির ভাষ্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায়। এই বক্তব্যই পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের মূল বিষয় বা প্রতিপাদ্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে-র পরিণতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক আলাদা আলাদা মত প্রকাশ করে।

‘নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা (১৯০০-২০২০)’- বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সূত্রে প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব বা Reception Theory নিয়ে কিছু প্রাথমিক পড়াশোনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মহাভারতের মতো অধিক জনপ্রিয় একটি মহাকাব্য সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করবে এমনটাই স্বাভাবিক বিষয়। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকেরা মহাভারত থেকে অনেক বিষয়েই প্রভাবিত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের লেখার মধ্যেও সমকালীনতার সঙ্গে মহাভারতীয় অনুষ্ঙ্গকে মিলিয়ে দেন। কেউ আবার মহাভারতের কোনও পৌরাণিক চরিত্রকে নতুন রূপে নির্মাণ করেছেন, যার ফলে মহাভারতীয় চরিত্রটি হয়ে উঠেছে বর্তমান সময়ের প্রতিনিধি। আমাদের আলোচনায় মহাভারতের গান্ধারী থেকে কুন্তী, দ্রৌপদী, মাদ্রী, হিড়িম্বা, ভীষ্ম, অশ্বথামা, শকুনি এবং দুর্যোধনের মতো চরিত্রেরা মহাভারতের অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে বিশ ও একুশ শতকের দ্বন্দ্ব এবং সংকটে পরিপূর্ণ মানুষের মতো হয়েছে। আমরা আমাদের গবেষণায় বিশ শতক এবং একুশ শতকের নির্বাচিত প্রতিনিধি স্থানীয় বেশ কিছু কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও শিশু সাহিত্যিকদের মহাভারতীয় রচনা থেকে আমাদের আলোচনাগুলি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্য বর্তমানের ভারতে নানা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু উগ্রবাদী রাজনৈতিক দল বা সংগঠন মহাভারতকে প্রতিনিয়ত নিজেদের মতো করে নির্মাণ

করতে চাইছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য বা বাঙালির মহাভারত চর্চা চিরকালই বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয়। ভারতীয় বাঙালি চিরকালই মহাভারতকে নিজেদের মতো করে পেতে চেয়েছে। ফলে গীতা যা মহাভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাকে বাঙালি যেমন ধর্ম জ্ঞানে পূজা করে, ঠিক তেমনই আবার শুধুমাত্র একটি টেক্সট বা পাঠ হিসাবেও পড়তে চায়। মহাভারত চর্চায় এই মুক্তচিন্তার আবহাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি মহাকাব্যকে নির্দিষ্ট একটি বৃত্তের মধ্যে ফেলে পড়তে পারাটা একেবারেই অসম্ভব আমাদের কাছে। আমাদের গবেষণার দীর্ঘ অংশে আমরা সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। মহাভারতের মধ্যে অনেক জায়গাতেই নীতি, ধর্ম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব ও সংকট দেখা গেছে। আবার মহাভারতের মধ্যেই এই সকল জটিল বিষয়ের উত্তর দেওয়া আছে। নীতি ও ধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, অমলেশ ভট্টাচার্য ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মহাভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে পেয়েছি। মহাভারত আমাদের দেখিয়ে দেয় ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে পার্থক্য আপাতভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কোনও একটি বিষয় একটি জায়গায় ধর্ম বা নৈতিকতার দিক থেকে ঠিক থাকলেও অন্যত্র তা অধর্মের রূপ পেতে পারে। ধর্ম ও অধর্মের বিষয়গুলি স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তনশীল। মহাভারতের এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমরা বাঙালির মহাভারত চর্চার পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এবং নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর আলোচনায় আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি ধর্ম বা ন্যায়ের সঙ্গে ভালোত্বের সংযোগ আছে। যে কাজ বা সাধনা মানুষের ভালো করে তাই ধর্ম। আবার উল্টোদিকে যে কাজ মানুষের ক্ষতি করে তা অধর্ম। বাঙালি প্রাবন্ধিকরা দেখিয়েছেন সত্য কথা বলা ধর্ম হলেও প্রকৃত সত্য যখন ব্যক্তি মানুষের লাভ না করে ক্ষতি করে, তখন তা অধর্ম। যে কারণে কৌশিক মুনির স্বর্গ লাভ হয় নি। কারণ সত্য কথা বলার জন্য একদল মানুষের দস্যুদের হাতে প্রাণ চলে যায়। মহাভারতের নীতি ও ধর্মের সংকট নিয়ে যে সমস্ত বাঙালি প্রাবন্ধিকেরা চর্চা করেছেন, তাঁদের এই অন্বেষণ আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। বাংলা শিশু সাহিত্যে বা ছোটদের মহাভারত মূলক বিভিন্ন লেখায় মহাভারতের অনুষ্ঙ্গ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা মহাভারতের মধ্যে থাকা অসংখ্য জটিল বিষয়গুলিকে আমাদের শিশু সাহিত্যিকরা কীভাবে শিশু মনের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন, আমাদের আলোচনায় তাও স্থান পেয়েছে। তাছাড়া মহাভারতের মধ্যে যুদ্ধ, মারামারি ও হিংসা শিশুমনে বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। শিশু সাহিত্যিকেরা সেই যুদ্ধ ও হিংসার ঘটনাকেও মজার ছলে ও অল্প বাক্য ব্যয় করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আমরা আমাদের গবেষণাকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি বাংলা উপন্যাসে মহাভারত প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে মূলত বিশ ও একুশ শতকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসে মহাভারতীয় অনুষ্ঙ্গ কীভাবে এসেছে তা বলার চেষ্টা করেছি। আমাদের আলোচনার

ক্ষেত্রে উঠে এসেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল কর, কালকূট এবং বাণী বসু। মূলত এঁদের মহাভারতীয় উপন্যাসগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। উপন্যাসগুলির ঘটনা ও চরিত্র আধুনিক যুগের হয়েও কীভাবে মহাভারতকে ধারণ করে আছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম বাংলা ছোটগল্পে মহাভারত কথা। এই অধ্যায়ে আমরা একাধিক ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পকে নির্বাচন করেছি। এই তালিকায় রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম যেমন আছেন, তেমনই আছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্নী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দীপক চন্দ্র, নবনীতা দেবসেন, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং সৌরভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের হাত ধরেই ছোটগল্পে মহাভারতের বিনির্মাণ ও নবনির্মাণ আমরা পেয়েছি। আবার সমকালের দ্বন্দ্ব ও সংকটকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে মহাভারতীয় অনুষ্ঙ্গকে নিপুণভাবে ব্যবহার করতেও দেখেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি বাংলা নাটকে মহাভারতীয় অনুষ্ঙ্গ কেমনভাবে এসেছে। অন্যান্য সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে নাটকের পার্থক্য আছে। কারণ নাটক মঞ্চে অভিনয় করা হয়। নাটকের পাশাপাশি যাত্রা ও পালাগান মহাভারতের গল্প ও আখ্যানকে কীভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে, তা আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। আমরা বিশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাভারত মূলক যে সকল নাটকগুলি লেখা হয়েছে তার একটি তালিকা এই অংশে যোগ করেছি। অত্যন্ত সমৃদ্ধ সেই নাটকের তালিকা। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বোধগম্য হয় যে, মহাভারত আজও কতটা জনপ্রিয় একটি মহাকাব্য দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে। তবে উনিশ শতকে পৌরাণিক নাটকের যে জনপ্রিয়তা ছিল তা বিশ শতকে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়, কারণ বিশ শতকে মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকট উপস্থাপন করতে গিয়ে মহাভারতের অনুষ্ঙ্গ নাটককারেরা উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে উনিশ শতকে দেবতার মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য প্রকাশের জন্যই নাটকগুলি লেখা হয়েছিল। এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় নাটককারদের পাশাপাশি অপ্রধান নাটককারদের নিয়েও আলোচনা করেছি। বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করেছি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ডি এল রায়, রবীন্দ্রনাথ, মন্মথ রায়, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ মিত্র ও শাঁওলি মিত্রের মহাভারতমূলক নাটকগুলিকে নিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায় আমরা আলোচনা করেছি বাংলা প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ গ্রন্থে বাঙালির মহাভারত চর্চার বিষয়ে। অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধের গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে রয়েছে। যেগুলি বাঙালির মহাভারত চর্চায় নতুন দিশা রেখেছে। বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারা যে একমুখী নয়, তা বাস্তবিক অর্থেই

বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরীয়, তা এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে বুঝতে পেরেছি। পাশাপাশি নীতি ও ধর্মের জটিল বিষয়গুলির দ্বন্দ্ব ও সংকট মহাভারত কীভাবে সমাধানের পথ দেখিয়েছে তা আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুখময় ভট্টাচার্য, প্রতিভা বসু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, অমলেশ ভট্টাচার্য, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এবং শামিম আহমেদ প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের মহাভারতমূলক রচনাগুলি। এছাড়াও একাধিক অপ্রধান প্রাবন্ধিকদের নিয়ে আলোচনা আমরা করেছি এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি মূলত শিশুদের মহাভারত নিয়ে যে সমস্ত সাহিত্যিক ভাবনা চিন্তা করেছেন, তাঁদের রচনাগুলি নিয়ে। মহাভারতের জটিল বিষয়গুলি শিশু মনে বোধগম্য হয় না। আবার এই জটিল বিষয়গুলি ছাড়াও মহাভারত অসম্পূর্ণ। যেমন ধরা যাক হিংসা, খুন, যুদ্ধ ছোটদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। আবার গীতার মতো দার্শনিক বইয়ের বক্তব্য শিশুরা বুঝতে পারবে না। ফলে শিশুদের মহাভারত পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকেরা দক্ষতার সঙ্গে সেই ফাঁকগুলি রাখেন নি। তাঁদের অসাধারণ উপস্থাপনার জন্যই মহাভারতের যুদ্ধ বা হিংসার ঘটনাগুলি বালক মনের উপযোগী হতে পেরেছে। এর সঙ্গে আছে ছবি ও কার্টুনতে মহাভারতের আখ্যান উপস্থাপন। এটিও অত্যন্ত চমৎকার বিষয়। একগুচ্ছ শিশু সাহিত্যিকেরা শিশুদের মনে মহাভারতের গল্প প্রবেশ করানোর জন্য কতই না ভাবনা রেখেছেন! দেখে অবাক হতে হয় আমাদেরও।

স্নেহাশিস দাসকর্মকার

আজুড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর

২৭/৬/২০২৪

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে মহাভারত প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা

মহাকাব্য আসলে সমস্ত দেশে ও সব কালেই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের ভারতীয় মহাকাব্যের প্রভাব আরও অনেকটাই বেশি বলে আমাদের মনে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশকে জানতে গেলে ও বুঝতে গেলে রামায়ণ ও মহাভারত অবশ্যই আমাদের পাঠ করতে হয়। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, নারীর প্রতি সামাজিক সম্মান, বর্ণপ্রথা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিবাহ, দর্শন চর্চা, রাজার সাম্রাজ্য পরিচালনার নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি জানতে গেলে প্রাথমিকভাবে আমাদের ফিরে যেতে হয় মহাকাব্যের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই রামায়ণের থেকে মহাভারতের মধ্যে জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও সংকট অপেক্ষাকৃত বেশি থাকার জন্য জীবনের মহত্তম সত্য বুঝতে তা আরও অধিক পরিমাণে আমাদের সাহায্য করে। নৈতিক সংকট, প্রকৃত কর্তব্য এবং ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ মহাভারত আমাদের নানাভাবে বুঝিয়েছে। অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যও আমাদের দুই মহাকাব্যের কাছে গভীরভাবে ঋণী। আমাদের আলোচনা যেহেতু মহাভারত কেন্দ্রিক, তাই বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ নিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা কথা বলব। মহাভারত থেকে ঋণ নিয়ে অনেক ঔপন্যাসিকই আমাদের উৎকৃষ্ট মানের উপন্যাস উপহার দিয়েছেন। তাঁদের আলোচনায় সহায়ক হয়েছে মহাভারতের চরিত্র, ঘটনা বা গল্প। তবে বিশ শতক থেকে একুশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত সাহিত্যিক মহাভারতের চরিত্র বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁরা সবাই সমকালীন যুগের চাহিদা মেনে মহাভারতের নবনির্মাণ বা বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁদের রচনাগুলির মাধ্যমে মহাভারতের চরিত্ররা আমাদের কাছে বর্তমানের রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। আমাদের গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ের সীমিত পরিসরে আমরা বিখ্যাত প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু ঔপন্যাসিকের উপন্যাস ধরে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি। আলোচনার সীমিত পরিসরে তাঁদের উপন্যাসগুলি ধরে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা। আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল কর, কালকূট, দীপক চন্দ্র এবং বাণী বসুর মহাভারতীয় অনেকগুলি উপন্যাস। বাঙালি সাহিত্যিকরা কম মহাভারতীয় উপন্যাস রচনা করেন নি এক্ষেত্রে। উপরের ঔপন্যাসিকরা ছাড়াও এক্ষেত্রে আছেন জাহ্নবী চক্রবর্তীর রচিত *পিতৃকন্যা*, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের *শেষ প্রহর*, *শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন*, *শ্রীমতী রাধার শেষ সংবাদ*। শাহ্‌যাদ ফিরদাউস মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছেন *ব্যাস*। *কুন্তীর বস্ত্রহরণ*, *দুর্যোধন*, *একলব্য* ও *মৎস্যগন্ধা* নামে উপন্যাসগুলি লিখেছেন হরিশংকর জলদাস। হর্ষ দত্ত লিখেছেন *বিকর্ণ*। দীপঙ্কর মিত্র লিখেছেন *অনাদৃত নায়ক ইন্দ্রজ অর্জুন*। তিলোত্তমা মজুমদার লিখেছেন *অর্জুন ও চারকন্যা*। মিহির সেনগুপ্ত লিখেছেন *বিদুর*, *যুদ্ধান্তে*। জয়ন্তী রায় লিখেছেন *দ্রৌপদী*, *সত্যবতী* এবং *হয় নারী*। সৌরভ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *প্রথম প্রবাহ*র মতো উপন্যাস।

এছাড়াও সুচেতনা সেন বেশ কয়েকটি মহাভারতীয় উপন্যাস লিখেছেন। এই তালিকা আরও বড়ো করা সম্ভব। ফলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, বাঙালির সাহিত্যচর্চায় মহাভারতের প্রতিগ্রহণ একটি বড়ো জায়গা দখল করে আছে। মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্যের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয়। যাই হোক, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় এইবার প্রবেশ করি।

১.২।। গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪)- পাঞ্চজন্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম। ১৯০৮ সালে গজেন্দ্রকুমারের জন্ম হয় কলকাতা শহরেই। বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছিল কাশীর একটি স্কুলে। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন তিনি। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে বন্ধুদের সঙ্গে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *কথাসাহিত্য* প্রকাশ শুরু করেন। তিনি লিখেছিলেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ও গল্প। ১৯৫৯ সালে তাঁর রচিত *কলকাতার কাছেই* উপন্যাসটি আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। বলা বাহুল্য, *কলকাতার কাছেই*, *কলকাতার উপকণ্ঠে* এবং *পৌষ ফাগুনের পালা*— এই ট্রিলজি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। *পৌষ ফাগুনের পালা* ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায়।

এখানে তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির বিষয়ে বেশি কথা বলতে আমরা আগ্রহী নই, আমাদের এখানের আলোচনায় *পাঞ্চজন্য* উপন্যাসটিকে নিয়ে কিছু কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। মহাভারতের কৃষ্ণকে নিয়ে রচিত এরকম জনপ্রিয় উপন্যাস খুব কমই আছে। তাঁর মহাভারতের কৃষ্ণকে নিয়ে রচিত গল্পগুলির বিষয়েও আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বিশ শতকের সময়কালে বাঙালির মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে বা পরিসরে এই উপন্যাসটির নাম উল্লেখ না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাভারতের এক সুবিশাল অংশ থেকে খুঁজে দেখতে চেয়েছেন কৃষ্ণ নামক চরিত্রটির স্বরূপকে। বাস্তবিক অর্থেই কৃষ্ণ মহাভারতের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণেই শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবরা জয়ী হতে পারে। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং মেধাবী পরিকল্পনাই অনেক অসম্ভব কাজকে বাস্তবে সফল হতে সাহায্য করেছে। সামগ্রিকভাবে পুরো উপন্যাসটির মাঝখানে কৃষ্ণকে রেখে গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর পাঠকদের দেখাতে চেয়েছেন যে, মহাভারতের কৃষ্ণ কীভাবে দ্রৌপদীর বিবাহ সভা থেকে শুরু করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোত্তর যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ফিরে পাওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় আগাগোড়া পাণ্ডবদের পাশে থেকে ও কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান করে ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রে এক ‘রাম রাজ্য’ বা ‘ধর্ম রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কালের বিবর্তনে প্রত্যেকটি

রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই এক জটিল সমস্যার আগমন ঘটে, প্রশাসনিক কাঠামোতে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, শক্তিশালী ও ধর্মপরায়ণ নেতৃত্বের অভাব দেখা যায় বা চারিদিকে অনাচার ও অবিচারের প্রাচুর্য অধিকতর দেখা গেলে প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যে থেকেই পরবর্তীতে উঠে আসে ধর্ম ও ন্যায়। তাই উপন্যাসটি পড়ার সময় মাঝে মাঝেই পাঠকের মনে হয় মহাভারতের কৃষ্ণ বোধ হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পূর্বেই এই ভয়ংকর ধ্বংসের ইঙ্গিত পেয়েছে, তাই ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রের ‘ধর্মরাজ্য’ প্রতিষ্ঠার জন্যই মহাভারতের কৃষ্ণ আগাগোড়া তার পরিকল্পনা অনুরূপভাবেই নির্মাণ করেছে। এই ইঙ্গিত উপন্যাসের মধ্যেই একাধিকবার ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। ভাবনার এই জায়গা থেকে কৃষ্ণকে দেখতে চাওয়ার প্রয়াসটি খুবই চমৎকার বিষয়। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণকে মহাভারতের মূল কেন্দ্রে রেখে উপন্যাসটি রচনা করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। বস্তুত সেই কারণেই আমরা উপন্যাসটির শুরুতে দ্রৌপদীর বিবাহ সভাকে দেখতে পাই। মহাভারতের এই জায়গাতেই পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের মুখোমুখি প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অথচ দ্রৌপদীর বিবাহের পূর্বে মহাভারতের একটি বড়ো কাহিনি আছে; কিন্তু কৃষ্ণের উপস্থিতি সেই সমস্ত আখ্যানে না থাকার কারণে তা ঔপন্যাসিক এড়িয়ে গেছেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের এই *পাঞ্চজন্য* উপন্যাসটি মনোযোগ সহকারে পড়লে পাঠক খুঁজে পেতে পারেন শ্রীকৃষ্ণের ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কিত গভীর ভাবনাকে। কেমন আদর্শ রাষ্ট্রের ভাবনা কৃষ্ণের ছিল? আসলে কৃষ্ণের জন্মের সময়ে এবং তার কিছু সময় পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান চরমসীমায় পৌঁছে গেলে ভারত রাষ্ট্রের মানুষ অত্যাচার অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। রাজশক্তি ও ক্ষত্রিয় তেজের লালসা, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতিতে মানুষের মন ও হৃদয় একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ ভারতকে তার এই পঙ্ক শয্যা থেকে এবং নিত্য আত্ম অবমাননা ও মালিন্য থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। মহাভারতের যাত্রাপথ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ধরা যায় তার এই রাজনৈতিক ভাবনাকে। যে কারণে সম্ভোগে মত্ত নির্বোধ বিকৃত রাজশক্তির হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সৎ মানুষের হাতে হস্তান্তর করতে চেয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের গড়ে তোলা সাম্রাজ্যকে শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তার বৃহৎ উদ্দেশ্যকেই সম্পূর্ণ করেছে। পুরো উপন্যাসটি গভীরভাবে পড়লে এই কথাটি মনে হওয়াই স্বাভাবিক বিষয়। পাণ্ডবদের দৈহিক শক্তিতে শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা পেলেও তার প্রকৃত ভাবনা ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার উদ্দেশ্য কৃষ্ণেরই ছিল। উপন্যাসের শুরুতে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ ভাবনার বিষয়টি। কৃষ্ণের পরিকল্পনাও উপস্থাপিত হয়েছে এখানে।

বাসুদেব সন্নেহে সত্যভামার কটি বেষ্টন করলেন, ‘বহু দিনে মানুষের এই ধারণা মজ্জাগত হয়ে গেছে যে রাজারা, ধনী ব্যক্তির যা ইচ্ছা তাই করতে পারে; এ বিধিনির্দিষ্ট বিধান, এর কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র গো-পালকদের ঘরে মানুষ হয়েছি, নিরীহ সাধারণ মানুষদের

সঙ্গে— বলদর্পী, স্বেচ্ছাচারী, অসংযমী কংসের ভয়ে জনসাধারণ— ওর প্রজারা সর্বদা কী শঙ্কাকণ্টকিত হয়ে থাকত— জীবনুত হয়ে দিন কাটাত— তা আমি নিজে দেখেছি, অনুভব করেছি। এর যে কোন প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন, ওদের দ্বারা এই যে অকারণ নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার করা সম্ভব— তা ওরা কখনও ভাবতেও পারে নি। এই ভাবে, নির্বাহ্য মার খাওয়াই তাদের ভাগ্যলিপি, এই ভেবেই মার খেত তারা।... আমি যে কংস বধ করেছি, সেটাকেও তারা অলৌকিক দেবলীলা ভেবেছে, আমাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ ক’রে নিশ্চিত হয়েছিল। তাদের যে কিছু করণীয় থাকতে পারে, তাদের দ্বারাও এমন কাজ হতে পারে— তা কখনও ভাবে নি, এখনও ভাবে না। না দেখা ভগবানের ওপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে চুপ ক’রে বসে আছে।”^১

এই বলে একটু থেমে আবারও বললেন বাসুদেব, ‘আমি সেইটেই দেখাতে চাই সকলকে। পাণ্ডবরা আজ যদি বেঁচে থাকে, বেঁচে আছে তা জানি— তারা এখন পথের ভিখারী— সহায়সম্বলহীন, গৃহহীন, ভিক্ষালঞ্জীবি। যদি তাদের দিয়েই এই মদগর্বিত, ঐশ্বর্যলোভী, ক্ষমতালোলুপ, চরিত্রহীন, পরশ্রীকাতর পাশব ক্ষাত্রশক্তিকে— যা অনাচারে অত্যাচারে দেশকে জর্জরিত করে তুলেছে, অগণিত দেশবাসীর রক্ত শোষণ ক’রে ক্ষীণতাদর হয়েছে, দেশের মাথার ওপর বসে আছে— তা ধ্বংস করাতে পারি— তাহলে এই লক্ষ লক্ষ মূঢ় মূক জনসাধারণ বুকে বল পাবে। প্রেরণা পাবে এগিয়ে যাওয়ার, মাথা তোলার।’^২

বাস্তবিক অর্থে কৃষ্ণ একজন মানুষই। কিন্তু তার রাজনীতি ও কূটনীতি এবং যথার্থ সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাকে সাধারণ মানুষের ওপরে স্থান দিয়েছে। মহাভারতের দু’একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত একজন মানুষই। দ্রৌপদীর বিবাহ সভায় পাণ্ডবদের চিনতে পেরে কৃষ্ণ তার বৃহৎ পরিকল্পনায় জোর পেয়েছে, অর্থাৎ অর্জুন ও ভীমদের মাধ্যমে আর্ষাবর্ত জুড়ে একটি ধর্ম রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছে। জতুগৃহের ঘটনায় তাদের মতো শক্তিশালী পুরুষেরা সহজে মৃত্যুবরণ করবে এমনটা কৃষ্ণও ভাবে নি। দ্রৌপদীকে অর্জুন বিবাহ সভায় লাভ করার পর অন্যান্য রাজারা অপমানিত বোধ করলে ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে তাদের ভীষণ যুদ্ধ লেগে যায়। এই যুদ্ধ হয়তো আরও কিছুটা এগোতে পারত, কিন্তু গজেন্দ্রকুমার মিত্র দেখিয়েছেন কীভাবে কৃষ্ণ তার কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা যুদ্ধরত রাজাদের যুদ্ধ থেকে নিরত করেছে। পরবর্তী সময়ে অর্জুনের রথের পথচিহ্ন লক্ষ্য করে পাণ্ডবদের কুটিরে তাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতে মহাযুদ্ধে যে তাদের অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যিক সেটিও তাদের মনে করানো হয়েছে। এভাবে কৃষ্ণের বৃহৎ পরিকল্পনার একটি ছবি প্রথম থেকেই গজেন্দ্রকুমার মিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চিত্রকল্প আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজভবন নির্মাণের সময়।

সমগ্র ভারতবর্ষের বুকে নিজেদের প্রভাব ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য যা যা করা প্রয়োজন তার সবটাই পাণ্ডবরা করতে পেরেছে কৃষ্ণের সৌজন্যে। খাণ্ডব অরণ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনের

সহায়তায় অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে যাতে শ্রেষ্ঠ ভবন নির্মাণের জন্য ময়দানবকে পাওয়া যায়। কারণ প্রথমে ময়দানবকে কোনও উপায়েই খুঁজে পাওয়া যায় নি, এমনকী কীলকের গুপ্ত সন্ধানের মাধ্যমেও না। মানুষের কৃত্রিম অগ্নিসংযোগ এর মতো ঘটনাটিকে দাবানল নাম দেওয়া হয়েছে, যাতে ক্ষত্রিয়দের এই অপরাধকে লঘু হিসাবে দেখানো যায়। অগ্নি থেকে ময়দানবকে বাঁচানোর পরিবর্তে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ভবন নির্মাণের প্রতিশ্রুতি বাসুদেব কৃষ্ণ আদায় করে নিয়েছে। আধুনিক যুগের অনেক জাতি রাষ্ট্র ভাবনার মাধ্যমে যে দেশগুলি গড়ে উঠেছে, সেখানেও দেশের কোন জায়গায় রাজধানী নির্মাণ হবে তা নিয়ে গভীর ভাবনা দেখা যায়। যেমন দেশের রাজধানী কখনোই সীমান্তবর্তী শত্রু দেশের সীমানার খুব কাছাকাছি হয় না। আবার দেশের রাজধানী এমন জায়গায়ও হয় না যেখানে বাইরের শত্রুরা দ্রুত আক্রমণ করতে পারবে। বর্তমান ভূ-রাজনীতির সাপেক্ষে বিষয়টিকে পড়লে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ১৯১১ সালে এ কারণেই কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়, আবার দেশভাগের ফলে জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী করাচি থেকে পরবর্তীতে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয় বাহ্যিক শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে।

উপন্যাসিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র খুব সুন্দরভাবে ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও মতামত কৃষ্ণের মুখ থেকে বলিয়েছেন এখানে। মহাভারতের পাঠকদের অবাক হতে হয় এই বিষয়ে কৃষ্ণের ভাবনার দূরদর্শিতা ও গভীরতা দেখে। ধৃতরাষ্ট্র সাম্রাজ্যের অর্ধেক অংশ পাণ্ডু পুত্রদের দিতে অস্বীকার করলে শেষ পর্যন্ত তাদের খাণ্ডবপ্রস্থ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের প্রাপ্যের অংশ না পাওয়ার ফলে ভীম অর্জুন যখন ক্রোধে নিজেদের আত্মদমন করতে পারছিল না, তখন কৃষ্ণ এসে তাদের শান্ত করে জানায় ওই পতিত জমিতেই রাজধানী স্থাপন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের যে অংশটি ভবিষ্যৎ ভারতভূমিকে ধর্ম রাষ্ট্রে পরিণত করবে এবং যেখানে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আরও ছত্রিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করবে, সেই ভূমির সম্পর্কে যথার্থ মতামত কৃষ্ণই দিয়েছে। এই বিষয়ে তার প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা অপারিসীম বলেই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মতো আমাদেরও মনে হয়। এই উপন্যাসে কৃষ্ণ বলেছে:

বুঝিয়ে দেন যে, এ ভালই হ'ল- প্রতিষ্ঠিত জনপদ বা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করতে গেলে পদে পদে অসুবিধা; তার চেয়ে পতিত জমিই ভাল- ইচ্ছামতো, নিজেদের পরিকল্পনামতো- সব চেয়ে বড় কথা প্রয়োজন ও সুবিধা-মতো নগরীর পত্তন গঠন করা যায়। কোথায় কোন গৃহ বা মণ্ডপ, কোথায় রত্নাগার, কোথায় শস্তাগার, কোথায় শস্য ভাণ্ডার নির্মিত হবে- সেটা নিজেদের সুবিধামতো নির্বাচন করার স্বাধীনতা-অনেক বেশী সুবিধাজনক।^৩

আরও বলেছিলেন বাসুদেব, 'রাজ্যের আয়তনের ওপর শক্তি-সামর্থ্য বা বিভূতি নির্ভর করে না। যে দেশ আত্মোন্নতির সুযোগ পায় সেই দেশেই অধিক সংখ্যক প্রজা এসে বসতি স্থাপন করে।

শিল্প বাণিজ্যের ওপরই রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। রাজা যদি তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আয়তনে বৃহত্তর রাজ্যগুলির থেকে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যই অগ্রগণ্য হয়ে উঠতে পারবে। দুর্যোধনরা ভুল করল, এ রাজ্য এমনিতেই এত জনবহুল-এখানে প্রজাদের উন্নতির আশা কম। বরং তোমরা রাজ্য পত্তন করলে দেখবে উদ্যমশীল পরিশ্রমী প্রজারা এদেশ ত্যাগ করে তোমাদের রাজ্যেই যাবে।^{১৪}

তবে এগুলি ছাড়াও রাজধানী স্থাপনের বিষয়ে বাসুদেব কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আরও অনেক সাহায্য করেছে। যেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে না উল্লেখ করলে তার পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ জানা সম্ভব নয়। খাণ্ডব অরণ্যের যে জায়গায় তারা রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল সেখানে যাতায়াতের পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। বস্তুত কোন রাস্তাই ছিল না। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে যাওয়াই একমাত্র উপায় ছিল। সেই গন্তব্য পথে ফলের গাছ এবং পানের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রাচুর্যও একেবারেই ছিল না। এ বিষয়ে পাণ্ডবরা যখন একেবারেই নিজেদের করণীয় সম্পর্কে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না, তখন বাসুদেব কৃষ্ণ কর্তব্য সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রদান করেছিল। বাসুদেবের মতে গাছ কেটে রাস্তা তৈরীর কথা বলা হয়েছিল, তারপর রাত্রিকালীন বিশ্রামের জন্য পাণ্ডবদের তৈরি হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতেও কৃষ্ণ ভোলে নি। সেই সঙ্গে গোরু, ঘোড়া এবং মহিষের জন্য সেবা ও আশ্রয়ের কথাও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়। রাজধানীর জন্য নির্মাণ কাজ কিছুটা এগিয়ে গেলে কোন মন্ত্রকের দায়িত্ব কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে সেনাবাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনী পর্যন্ত সমস্ত নিয়োগ বাসুদেব কৃষ্ণের পরামর্শ মতো যুধিষ্ঠির পালন করেছে। বর্তমান সমাজ জীবনেও আমরা দেখতে পাই বিশিষ্ট কোনও ভবনের উদ্বোধন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তিত্ববর্গ করে থাকে। এইটির পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট বার্তা দেওয়া হয়। মনে করা হয় এর ফলে ভবনটির পরিচিতির মাত্রা অধিকতর ওজনপ্রাপ্ত হয়। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও আমরা দেখতে পাই বিশিষ্ট কোনও সেতু, বৃহৎ প্রকল্প থেকে মন্দির পর্যন্ত অনেক কিছুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা করে থাকেন। এর ফলে গণতন্ত্রের বৃহৎ উৎসব ভোট রাজনীতিতে এবং সর্বোপরি জনমানসে এর একটি বিপুল প্রভাব পড়ে। বাসুদেব কৃষ্ণ মহাভারতের কালে অন্যতম প্রথম সারির একজন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবিকভাবেই তার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উপরিউক্ত বিষয়গুলি গভীরভাবে জানা থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে আমরা দেখেছি নতুন রাজধানীর ভিত্তিপত্তন যজ্ঞ করানো হয়েছিল পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র মহর্ষি ব্যাসদেবের দ্বারা। ব্যাসদেব স্বয়ং যে নবনির্মিত নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে যজ্ঞ করে তার সামাজিক গুরুত্ব ও প্রভাব এমনিতেই অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ঠিক সেই কারণেই ইন্দ্রপ্রস্থ প্রতিষ্ঠার কিছু বছরের মধ্যেই তা ধর্মগতভাবে মহান হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও

সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও সারা ভারতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য হয়ে উঠতে পেরেছিল।

তবে কেবলমাত্র ধনরত্ন ও সৈন্য সামন্ত দিয়েই একটি দেশ গড়ে ওঠে না। প্রয়োজন হয় দেশে বসবাসের জন্য মানুষদেরও, সেই রাষ্ট্র অধিক সমৃদ্ধশালী হয় যেখানে প্রজারা সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন যাপন করে থাকে। তাই ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনের পর প্রয়োজন হয়ে পড়ল বসতি স্থাপনের। বাসুদেব কৃষ্ণ এই বিষয়ে সাহায্য নিয়েছে কীলক নামে এক নিষাদ ব্যক্তির কাছে। কীলককে মথুরার উপকণ্ঠে বাসুদেব প্রেরণ করেছে। তাকে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে ওখানকার আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে যে বর্ণসংকর জাতি গড়ে উঠেছে, দস্যুবৃত্তিই যাদের প্রধান কাজ, তাদের নানাবিধ প্রলোভনে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে বাসুদেব। কীলককে দিয়ে বলানো হয়েছে যে, পাণ্ডবদের নানাবিধ দানে ইন্দ্রপ্রস্থের ব্রাহ্মণেরা রীতিমতো ঐশ্বর্যস্বীত হয়ে উঠেছে, এমনকী এই সকল ব্রাহ্মণদের গৃহ লুণ্ঠন করলেও রাজভাণ্ডার লুণ্ঠনের থেকে অধিক সম্পদ লাভ হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ চৌর্যবৃত্তি পালন করে অভাবে, এই কাজে সম্মানের কোনও আশা নেই, তার ওপর ধরা পড়লে অধিক প্রহার পেতে হয়। তাই চৌর্যবৃত্তি ছাড়াই যদি কেউ বা কারা অধিক সম্পদ লাভ করে তাহলে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসী হতে তাদের কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়। সেই কারণেই কীলককে দিয়ে মাংস বিক্রির অজুহাতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা মিশ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের বার্তা দিতে চাইল যে, নবনির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট ভালো। তাই তারা চাইলে অবশ্যই এখানে আসতে পারে। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ এখানে যথেষ্টই একজন দক্ষ কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বের মতো কাজ করেছে।

ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধের কথা আগাম বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ এই উপন্যাসে অর্জুনকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে। অর্জুন হল সেই অস্ত্র, যার সাহায্যে বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করবে। এমনকী সেটাও কোনওরকম অস্ত্র ধারণ ছাড়াই। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে এবং কূটনৈতিক চালের সাহায্যে। তাই পরবর্তীতে যে অর্জুনের ভূমিকা যুদ্ধে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাকে সমস্ত দিক থেকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা বাসুদেবের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। তাই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখা এই উপন্যাসে দেখতে পাই যুদ্ধ জয়ের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পন্থার কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাচ্ছে। এই কথাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক অর্থে যুদ্ধ শুধুমাত্র ‘কনভেনশনাল ওয়ার’ অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়। যুদ্ধের নানাবিধ আরও ধরন আছে। যুদ্ধে জয়লাভ করাটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই কোনওরকম বাহুবল ও অস্ত্রের প্রয়োগ ছাড়াই যদি জয়লাভ সম্ভব হয়, তাহলে তার থেকে ভালো আর কিছু হয় না। বাসুদেব এই কথাটি অর্জুনকে দীর্ঘ সময় ধরে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আমাদের দেশের বহু সংস্কৃতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বহু জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আধুনিক ভারতের মাঝে ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’-কে

খুঁজে পেতে চেয়েছি। বহুত্ববাদকে আধুনিক ভারত গর্বের সঙ্গে বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও বিশ্বের অনেক মানুষই এখনো বিস্মিত হয় এই বহু ভাষাভাষীর ও জাতি ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আধুনিক ভারত রাষ্ট্র কীভাবে একটি মানচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সঙ্গে থাকতে পারছে তা দেখে। আমাদের আসল শক্তি লুকিয়ে আছে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্ববাদের মধ্যেই। আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে এই সত্যের সারমর্মটি আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কিন্তু মহাভারতের যুগে যা বাস্তবিক অর্থেই সিন্ধু সভ্যতার থেকেও প্রাচীন, সেই সময়তেও কোনও এক শক্তিশালী বুদ্ধিমান কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই সত্যটি এড়িয়ে যেতে পারে নি। ভবিষ্যতে যে অর্জুন বিশ্বের সেরা যোদ্ধা হয়ে উঠবে, তার সখা তথা শিক্ষক হিসাবে বাসুদেব কৃষ্ণের এই উপদেশ স্বরূপ বাণী অবশ্যই আমাদের বিস্মিত করে। একবার দেখে নেওয়া যাক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর *পাণ্ডাজন্য* উপন্যাসে এই নিয়ে যা বলেছেন:

তাঁর কথায় একেবারে যে যুক্তি নেই, তা নয়। তিনি বলেছেন, পাণ্ডবরা এই দেবানুগৃহীত ভূমির সার্বভৌম শাসক হবেন— এই তিনি দেখতে চান। যে উচ্চাশা ওঁদেরও, অর্থাৎ পাণ্ডবদেরও থাকা উচিত। আর তা যদি থাকে তাহলে এ দেশ— দেশ বলতে দেশের মানুষকে ভালো করে জানা ও বোঝা প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। সুদৃঢ় বাহুবলে নির্ভর করলে— রাজাকে পরাজিত করা যায়— যথার্থ রাজ্য জয় হয় না। বিজিত রাজ্য পদানত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়— বিজয়ীর স্বভূমির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াই অভিপ্রেত। আর তা সম্ভব করতে হলে, বিজিতের সঙ্গে বিজয়ীর আত্মীয়তা স্থাপন করতে গেলে, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, রীতিনীতি, আচার-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে, জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।^৫

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ‘রাজ্য তার নিজ রূপ নিজেই পরিগ্রহণ করবে; শিশু বালক, বালক কিশোর হ’তে বিলম্ব ঘটবে না। রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনের প্রাত্যহিক কাজের জন্য রাজা যুধিষ্ঠির রইলেন, ভীমসেন রইলেন। তুমি এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো, এগিয়ে যাও। এ রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হতে থাক, তুমি ইত্যবসরে সমস্ত ভারতভূমি প্রদক্ষিণ করো। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে এদেশের মানুষের বিভিন্ন জাতি, তাদের চেহারা বিভিন্ন, ভাষা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন— রীতিনীতি আচার সবই— একেবারে অপরের সঙ্গে মেলে না— পৃথক, স্বতন্ত্র। সেগুলি জানার বোঝার— তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বা আয়ত্ত করার চেষ্টা করো। নইলে এ দেশকে সংহত ও শক্তিশালী করে তুলতে পারবে না। একটি ধর্মের সূত্রে আবদ্ধ এই বহুজাতির যথার্থ সমন্বয় ঘটানো খুব কঠিন নয়—যদি তাদের অন্তরগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকে। হে ভারতবর্ষ, তুমি তোমার পিতৃপুরুষের নামাঙ্কিত এই ভারতভূমি পরিক্রমা করো। তাতে তোমার তীর্থ পরিক্রমা— নররূপী নারায়ণকে পরিক্রমা করার কাজ হবে।’^৬

বাসুদেবের থেকে প্রাপ্ত এই জ্ঞান পরবর্তীতে ভারত ভ্রমণের সময় অর্জুন একাধিকবার উপলব্ধি করতে পেরেছে। জীবনে এগিয়ে চলার জন্য যে শিক্ষা ও জ্ঞান বাস্তবিক অর্থেই খুব

গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহাভারত ভালো করে পড়লে বা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের এই উপন্যাসটি পড়লেও বোঝা যায় অর্জুনকে অপ্রতিরোধ্য, নম্র ও জ্ঞানী ছাত্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কৃষ্ণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে অর্জুন উলূপীর দেশে হাজির হয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করেছে অতীতে বাসুদেবের বলা উপদেশগুলি। ঔপন্যাসিক মিত্র লিখেছেন:

এদের ধারণা কল্পনা থেকে শিক্ষা করারও অনেক কিছু আছে। দেশের কোনও লোক, সামান্যতম ইতরতম ব্যক্তিও অবজ্ঞেয় নয়— এ শিক্ষাও লাভ করেন তিনি। এ যেন ঈশ্বরের এক বিশ্বরূপ। তাঁর বিরাট শক্তি, বিপুল বিভূতি ও সীমাহীন মহিমারই বিচিত্র বিকাশ এরা।... এ দেশ প্রকৃত ভাবে শাসন করতে গেলে— বিশেষ এই বিভিন্ন বৃত্তির জীবনধারণার বহুবিচিত্র মনুষ্যত্বগুলির উপর সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র-নৃপতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আগে এদের জীবনধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এদের চিন্তাধারণার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন— এই মহামূল্যবান শিক্ষাও লাভ হয় তাঁর। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তাই বাসুদেবের উপদেশ মনে পড়ে, তাঁর দূরদৃষ্টির মূল্য উপলব্ধি করেন।^৭

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে পৃথিবী বিখ্যাত তীরন্দাজ করে তোলার পিছনে বাসুদেব এর ভূমিকার বিষয়ে আমরা এর পূর্বেই কথা বলেছি। কিন্তু, আদর্শ যোদ্ধা নির্মাণের পাশাপাশি কৃষ্ণ বাসুদেবের অন্য একটি ভূমিকার কথা আমাদের বলতেই হবে। যা হল যথার্থ হৃদয়বান মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। অর্জুনকে প্রতি মুহূর্তে মনে করানো হয়েছে তার জন্ম সাধারণ মানুষের মতো নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা পালনের জন্য হয় নি, শুধুমাত্র ঐশ্বর্য বিলাস এবং ইন্দ্রিয় সম্ভোগে মত্ত থাকাটাও তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বরং পরবর্তী জীবনে অনেক দৈব কর্তব্য এবং ধর্মযুদ্ধে শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে তাকে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই অর্জুন যাতে নিজেকে প্রস্তুত করে— বাসুদেব কৃষ্ণ একাধিক বার এই কথাটি অর্জুনকে স্মরণ করিয়েছে। একজন আদর্শ কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব যার রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনেক দূরবর্তী, সে এভাবেই সামনের দিনের জন্য নিজেকে ও অন্যকে প্রস্তুত করে। তাই কৃষ্ণের এই ভূমিকাটি যেমন খুবই আকর্ষণীয়, তেমনই সমকালীন বৈশ্বিক রাজনীতির জগতেও অত্যন্ত সফল কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও আগাম পরিস্থিতি অনুমান করে সেই অনুসারে এগিয়ে চলেন।

পাণ্ডবদের বাইরের শত্রুদের হাত থেকে ক্রমাগত রক্ষা করে এসেছে বাসুদেব কৃষ্ণ। শত্রুদের মনোভাব ক্রমাগত জানতে পারার জন্য কীলককে নিয়োগ করা হয়েছে ইতিমধ্যে, বাসুদেবের একান্ত অনুগত চর কীলক সংবাদ এনেছে যে দুর্যোধনের পরিকল্পনা নবনির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থকে আক্রমণ করার। যা শুনে দুর্যোধনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবের কথা ভেবে মনে মনে বাসুদেব হেসেছে। কারণ পূর্ণরূপে যুদ্ধ হলে পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য একাধিক রাজা ও রাজকুমারেরা এগিয়ে আসবে, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে সহজে দুর্যোধনের জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। বাসুদেবের এই কূটনৈতিক ভাবনার বিষয়টিও চমৎকার। তবে এই অংশে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ ভবন নির্মাণের বিষয়ে

বাসুদেব কৃষ্ণের ভূমিকার কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এখানে মহাভারতের বিশাল সমুদ্র থেকে যথার্থ ডুবুরির মতো সমুদ্রের তলদেশ থেকে রত্ন সংগ্রহ করে এনেছেন। শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ধর্মের সহাবস্থান একত্রে থাকলে সেই রাষ্ট্র উন্নতির শিখর স্পর্শ করে। পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী তা বোঝা যায় রাজভবনের কারুকার্য ও অলংকারের দিকে নজর রাখলে। কৃষ্ণ বাসুদেব বিষয়টি সম্পর্কে আগেই অবগত ছিল, তাই এই নিয়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সে এগিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ময়দানব ভবন নির্মাণের জন্য দক্ষ কারিগর ও শ্রমিকের যোগান দিলেও ভবন নির্মাণের জন্য যাবতীয় অলংকার এবং উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ বাসুদেবই সংগ্রহ করেছে। এই বিষয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র উল্লেখ করেছেন দানবরাজ বৃষপর্বীর পরিত্যক্ত একটি ভবনের কথা। দানব স্থপতি ময় নিজেই ইতিপূর্বে কৈলাসের উত্তরে সিন্ধু সরোবরের তীরে এই ভবন নির্মাণ করেছিল। বিশেষ যজ্ঞের জন্যই যা এককালে প্রস্তুত হয়েছিল, তার বহু তৈজস উপকরণ এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বাসুদেব সেই ভবনের বিষয়ে ময়কে জানালে ময় সেখান থেকে মূল্যবান স্ফটিক, শ্বেত প্রস্তর এবং রত্ন সমূহ আনবার ব্যবস্থা করে। এছাড়া সেই জনহীন পার্বত্য দেশে ইন্দ্র একসময় বহু বছর ধরে যজ্ঞ করেছিল, তাই সেখানেও বিস্তর মণিমুক্তা জমে ছিল। এগুলির সঙ্গে ময় নিয়ে এল আরও দু'টি জিনিস— বৃষপর্বীর দেবদত্ত নামে মহানাদী একটি শঙ্খ এবং বিশ্বে অতুলনীয় একটি গদা। এই গদা সে সময় দুর্যোধন ও ভীম ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে অক্ষম ছিল। এরপর দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে ময় ও তার সহকারীরা এমন একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করল যা পূর্বে কোথাও নির্মিত হয় নি এবং পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও পরবর্তীতে হবেও না। এভাবে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মতো এগিয়ে চলার ফলে সামান্য এক রাজকুমার থেকে যুধিষ্ঠির হয়ে উঠল সমগ্র আর্যাবর্তের শক্তিশালী ও ধার্মিক একজন খ্যাতিমান রাজা।

মহাভারতের প্রথম শ্রেণির গবেষকেরা প্রায় অনেকেই এক বাক্যে কৃষ্ণের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং কূটনৈতিক ক্ষমতার কথা স্বীকার করেন। বাসুদেব কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত মহাভারতে একজন মানুষই, মহাভারতের কয়েকটি ঘটনার কথা বাদ দিলে কৃষ্ণের মনুষ্য সত্তাটিই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর উপন্যাসে কৃষ্ণকে মানুষ হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। এমনকী মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়ার জন্য কৃষ্ণের মধ্যে বেশ কিছু পার্থিব গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। যেখানে আর পাঁচ জন মানুষের থেকে কৃষ্ণ আলাদা নয়। কিন্তু তা খুব অল্প সময়ের জন্যই। তারপরেই সে প্রায় সর্বদাই অবিচল থাকে নিজের লক্ষ্যে, যার প্রধান হল কূটনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মরাজ্যের স্থাপনা। যার জন্য কৃষ্ণ আজীবন লড়াই করে এসেছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর এই উপন্যাসে সেই বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। তবে বিশিষ্ট মহাভারত গবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী নিজেও কৃষ্ণের এই ভূমিকার কথা স্বীকার করেন তাঁর *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ* নামক বইতে। তিনি লিখেছেন:

কৃষ্ণ যখন জন্মেছিলেন, সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল ছিল না। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রায় পুরোটাই ছিল পূর্ব-মধ্য ভারতীয়দের দখলে, যার প্রধান পুরুষেরা ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধ, চেরিরাজ শিশুপাল এবং পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা পৌণ্ড্র বাসুদেব।...এইরকম একটা বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে রাজনীতির খেলাটা সম্পূর্ণ নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার সম্পূর্ণ কৃতিত্বটাই কৃষ্ণের। তিনি কাজ আরম্ভ করেন তাঁর অত্যাচারী মাতুলকে মেরে এবং কাজ শেষ করেন ভারতযুদ্ধে উত্তর ভারতের কর্তৃত্ব কায়ম করে। কাজটা সহজ ছিল না এবং যে অস্বাভাবিক দ্রুততায় তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছেন, তার জন্য ছলনা এবং কৌশলের আশ্রয় নেওয়া ছিল স্বাভাবিক।... ..^৮

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক দেবীদাস আচার্য তাঁর *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* নামক বইতে প্রথম প্রবন্ধেই দেখিয়েছেন কীভাবে বাসুদেব কৃষ্ণ সমগ্র আর্যাবর্তের রাজনীতিতে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠল। দেবীদাস আচার্য দেখিয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব পেয়ে পাণ্ডবরা গুছিয়ে বসার পর সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই বিষয়ে কৃষ্ণের মতামত জানতে চাইলে কৃষ্ণ জানায় যে যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ করার বিষয়ে যথার্থ ব্যক্তি, কিন্তু এই যজ্ঞের বিষয়ে পথের কাঁটা স্বয়ং জরাসন্ধ নিজে। তাই জরাসন্ধকে হত্যার মধ্যে দিয়েই এই কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। মূলত এই রাজাকে হত্যার মাধ্যমেই কৃষ্ণের ‘ধর্মরাক্ষ’ স্থাপনের যে বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল তা কিছুটা এগিয়ে যায়। দেবীদাস বইতে লিখেছেন:

কিন্তু কেবল তথ্য পরিবেশনই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নয়। বলতে গেলে এই তথ্যের হাত ধরেই মহাভারতের পটভূমিতে তিনি তাঁর বহু প্রতীক্ষিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলেন, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যুধিষ্ঠির কে বললেন— জরাসন্ধকে হত্যা করতে হবে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য জরাসন্ধের মৃত্যু যে খুব জরুরি ছিল, তেমন আশঙ্কার পক্ষে অকাট্য তথ্যের অবতারণা মহাভারতে নেই। তবে কৃষ্ণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এর বিকল্প ছিল না। জরাসন্ধকে এড়িয়ে রাজনীতির রাশ হাতে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।^৯

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও সম্পদ দেখে দুর্যোধন প্রবল ঈর্ষান্বিত হয়ে শকুনির সহায়তায় পাশা খেলার আয়োজন করে এবং যুধিষ্ঠির পরাজিত হয়। অতঃপর দীর্ঘ বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় কাটিয়ে ফেরার পর যখন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ফেরত চাওয়া হয়, তখন দুর্যোধনেরা তা দিতে অস্বীকার করে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। একটি দীর্ঘদিন ধরে মহাযুদ্ধের ফলে যে হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি চলে তা মানব সমাজের অগ্রগতিকে অনেকাংশে পশ্চাতে টেনে ধরে। এই সমস্ত বিষয় জেনেই মাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিল যুধিষ্ঠির। অন্যদিকে দ্রৌপদীর কঠোর বাক্য বাণে এবং তিরস্কারে পাণ্ডবরা সম্মিত ফিরে পায়। পাণ্ডব কন্যার হারানো সম্মান এবং চূড়ান্ত অপমানের বদলা এভাবে কি ফিরে পাওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নে যখন যুধিষ্ঠিরেরা নিজেদের কী করণীয় তা ভেবে পাচ্ছিল না,

তখন কৃষ্ণের কূটনৈতিক ভাবনা তাদের সামনের দিনে ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে। দ্রৌপদীর মানসিক যন্ত্রণা দূর করার জন্য গজেন্দ্রকুমার মিত্রে'র উপন্যাসে কৃষ্ণ বলেছে:

‘যশস্বিনী, তুমি নিশ্চিত থাকো- সন্ধি করতে নয়, সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতেই আমি সেখানে যাচ্ছি। আজ তুমি যেমন মুক্তবেণী হয়ে আকুল ভাবে ক্রন্দন করছ, অচিরকাল মধ্যে ভরতকুলকামিনীদের সেই ভাবেই রোদন ও হাহাকার করতে দেখবে। পূর্বেও বলেছি, আজও বলছি- তুমি যাদের প্রতি কুপিতা হয়েছ তাদের মৃত বলেই ধরে নিতে পারো। পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নেই- মানবিক বা দৈবিক- যা তাদের রক্ষা করতে পারে।’^{১০}

কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যতম বড়ো কূটনৈতিক সফলতা হল ভীষ্মকে মৃত্যুবরণ করতে সাহায্য করা। স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডব পক্ষের প্রতি পিতামহের স্নেহ ও ভালোবাসা থাকলেও কৌরব পক্ষের প্রতি ‘দায়িত্বের বন্ধনে’ আবদ্ধ ছিল ভীষ্ম। যাকে আমরা সমকালীন বিশ্বে ‘বেতনভুক্ত কর্মচারী’ হিসাবে আখ্যা দেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় অর্ধেক দিন ভীষ্ম নিজেই নিজ হস্তে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে যুদ্ধ করে এসেছে, তার ফলস্বরূপ পাণ্ডব শিবিরের প্রচুর সাধারণ সৈনিক মারা যায়। এরকম চলতে থাকলে অচিরেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয় একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। অন্যদিকে এই ধর্মযুদ্ধে বাসুদেব কৃষ্ণই যেহেতু প্রধান নিয়ন্তা, তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য পিতামহ ভীষ্মকে যুদ্ধে উৎসাহহীন করে অস্ত্র ত্যাগ করানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৃষ্ণের কাছে এটা রীতিমতো একটি ‘চ্যালেঞ্জ’ ছিল। ভীষ্মকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা পাণ্ডবদের বৃদ্ধি পায়। এরকম একটি বৃহৎ ধর্মযুদ্ধে জয় পেতে হলে ভীষ্মকে যুদ্ধ থেকে সরাতেই হতো, যে কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কৃষ্ণ বাসুদেব সম্পাদন করতে পেরেছে। যার ফলে যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরেরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত বাসুদেব কৃষ্ণের শব্দ চয়ন এবং উপযুক্ত জায়গায় যথার্থ শব্দের ব্যবহার যে কোনও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই অত্যন্ত আকর্ষণ করে। তাই কৃষ্ণের বাক্য বাণে ভীষ্মের যুদ্ধ বিমুখ হওয়ারই কথা ছিল। পিতামহ ভীষ্মের মতো প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধা যাকে স্বয়ং পরশুরামও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে নি, তাকে শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে যুদ্ধ বিমুখ করাটাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কূটনৈতিক জয় হিসেবে মনে করি। কারণ সম্মুখ সমরে যুদ্ধ কলায় ভীষ্মকে পরাজিত করা দেবতাদেরও সম্ভব ছিল না, তার সঙ্গে ভীষ্মের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল ইচ্ছামৃত্যুর বরদান, যা তাকে বাস্তবিক অর্থেই অপরাজেয় করে তুলেছিল। গজেন্দ্রকুমার মিত্রে'র উপন্যাসে দেখতে পাই পিতামহ ভীষ্মের শিবিরে এসে কৃষ্ণ তাকে বলেছে:

‘আপনাকে দণ্ড দেবার স্পর্ধা বা সাধ্য স্বর্গে মর্ত্যে কারও নেই। আপনি নিষ্পাপ শুদ্ধসত্ত্ব যোগেশ্বর- আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী এবং সে ব্রহ্মচর্য অটুট রেখেছেন, পরার্থেই আপনার জীবনধারণ, জীবন উৎসৃষ্ট। আমি সুদ্ধমাত্র আপনাকে স্মরণ করতে এসেছি যে, আপনি বহুকাল এ পৃথিবীতে এসেছেন, আপনি জন্মগ্রহণ করার বা জ্ঞান হওয়ার পর যে সমাজ ও সংস্কার

দেখেছেন, যে উচ্চমানের পবিত্র জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বলে আপনার ধারণা— তার বোধ করি আজ কোন চিহ্ন-ও কোথাও নেই। পূর্বে বিবেক ব্যতিরেকে কারও দ্বারা শাসিত হত না মানুষ, আর সে বিবেক, আত্মসম্মানজ্ঞান, সৌজন্যবোধ, ভদ্রজীবনের অলিখিত রীতি ও নীতি সকলই বিলুপ্তপ্রায়— সে সমস্ত বহুদূরস্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। পূর্বকালে সাধারণ প্রজারা সুবিচারের জন্য যে ধর্মাধিকরণে যেত, শাসকদের দ্বারস্থ হত— আজ সে ধর্মাধিকরণ পর্যন্ত কলুষিত, বিচারকরা অর্থলোলুপ, বিচার-বিক্রয়-উৎসুক। নৃপতিরা পর-ঐশ্বর্যলুপ্ত, ঈর্ষী, ভোগোন্মত্ত; অকারণেই উদ্ধত, অকারণেই অত্যাচারী। অপরের দুর্দশায় তাদের চিত্ত তৃপ্তি লাভ করে, দরিদ্র বলহীনদের অসহায় অবস্থার পৃষ্ঠপটে নিজেদের শক্তি বহুগুণবর্ধিত স্বরূপ কল্পনা করে এক বিকৃত আত্মপ্রসাদ ভোগ করে। মানবজাতির এই শোকাবহ অধঃপতন দেখেও কি আপনার মনে মৃত্যু-ইচ্ছা দেখা দেয় না? আরও কোন্ আশায়, কোন বাসনা চরিতার্থ করতে আপনি জীবিত থাকতে চান? আমি জানি পিতার ও গুরুর আশীর্বাদে, নিজের সাধনার ফলে আপনার ইচ্ছামৃত্যু— আপনি নিজে না শরাসন ত্যাগ করলে বা যুদ্ধে নিবৃত্ত না হলে কারও সাধ্য নেই আপনাকে নিপাতিত করে। সেই কারণেই আপনাকে স্মরণ করাতে এসেছি যে— এক্ষণে আপনার এ পাপনিমগ্ন পৃথিবী, এই জরাজীর্ণ দেহ থেকে বিদায় নেবার কাল সমুপস্থিত হয়েছে।”

কৃষ্ণের মুখ থেকে এরকম বক্তব্য শোনার পর ভীষ্ম সরাসরি তাকে জানিয়ে দেয় যে, এই ধর্মযুদ্ধে প্রকৃত মহান ধর্মেরই জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই কৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষে থাকছে, শেষ পর্যন্ত জয় তাদেরই হবে। কিন্তু ভীষ্ম জানায়, সাধারণ সেবক এর ধর্ম ছাড়াও বীরের ধর্ম পালনের প্রশ্ন আছে এক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে গুরু পরশুরাম এসে পাণ্ডব শিবিরে যোগদান করলেও তার অন্যথা হবে না। কিন্তু, নয় দিন যুদ্ধ করার পর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখে যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত না হলে তারপর আর যুদ্ধের কোনও প্রবৃত্তি ভীষ্মের নেই। এরপর আমরা দেখতে পাই যে নয় দিন যুদ্ধের পর প্রবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে পরাজিত করার জন্য তারই কাছ থেকে তার নিজের মৃত্যুর কারণ যুধিষ্ঠিরেরা জেনে নেয়। পরবর্তীতে যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডিনীকে অর্জুনের সামনে রেখে পেছন থেকে অর্জুনের তীব্র বলশালী তীরের সহায়তায় পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা হয়। এভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পাণ্ডব পক্ষ জয়ের জন্য আরও একটি ধাপ এগিয়ে যায়।

এখানেই শেষ নয়। ভীষ্মের পতনের দিন রাত্রিতে তার থেকেই যুদ্ধের অনেক গোপন সংবাদ কৃষ্ণ জেনে নেয়, এরই সঙ্গে ছিল ভীষ্মের একগুচ্ছ পরামর্শ যা পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়ে অনেকাংশে সাহায্য করেছে। সুতরাং, ভীষ্মকে শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই নয়, তার শরশয্যাকালীন অবস্থাতেও তার থেকে গোপন কথা কৃষ্ণ জেনে নিচ্ছে— এটাও একটি চূড়ান্ত কূটনৈতিক সফলতা। অন্যদিকে পিতামহ ভীষ্মের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণ সেটাও সম্পূর্ণভাবে ভীষ্মের থেকে দূর করাতে পেরেছিল। যারই ফলশ্রুতি যাবতীয় দ্বিধা ও

দ্বন্দ্ব মুক্ত হয়ে ভীষ্মের কথাগুলি বলে যাওয়া। এটিকেও আমরা কম কূটনৈতিক জয় হিসাবে দেখতে রাজি নই। গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

ভীষ্মপতন-রাত্রে কর্ণ চলে আসার অব্যবহিত পরেইই শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ একা ভীষ্ম সমীপে গিয়েছিলেন, কৌতূহলী রক্ষীদল প্রসাদাৎ সে কথোপকথনের কিছু অংশ অবগত হতেও অসুবিধা ঘটে নি। আসন্ন অবশিষ্ট যুদ্ধের ফলাফল সম্ভাবনাদি বিষয়েই আলোচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। কুরুপক্ষে কার কি পরিমাণ শক্তি, কে কে কোন সব মহাদিব্যাস্ত্র আয়ত্ত ও করায়ত্ত ক’রে অপেক্ষা করছেন এই যুদ্ধে নিজ নিজ চিহ্নিত শত্রুদের বিনাশ করার জন্য— এইসব তথ্যই তাঁর জিহ্বাস্য বা সংগ্রহণীয় ছিল।^{১২}

মহামানব ভীষ্ম অবশ্য এসব গূঢ় গোপনীয় তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশের পূর্বে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব প্রবল যুক্তিতে সে সঙ্কোচ— বীর ধর্মের স্বাভাবিক সংস্কার নিঃশেষে নির্মূল করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘হে মহাত্মা আপনি জাগতিক অর্থে এখন মৃত্যুই আপনার অসাধারণ যোগবলে ও চারিদিক শুদ্ধতায় আপনি প্রাণকে ইচ্ছাধীন করেছেন বলেই এই জরাজীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, রক্তশূন্য-প্রায় দেহখানাকে ত্যাগ করেন নি, সূর্য উত্তরায়ণ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। তথাপি সে দেহও ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে নেই, ইহজগতের খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করছেন না। উভয় পক্ষই সর্বসম্মতিক্রমে চতুর্দিকে বিশাল ভূমির ব্যবধান ও অতল পরিখার দ্বারা রণভূমি থেকে দূরে রেখেছে। এখন আপনি কোন পক্ষেরই নন, ইহসংসারের বন্ধন উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সাংসারিক শর্ত-বিবেচনাদির বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়েছেন। দুর্যোধনের নিকট যেটুকু ঋণ ছিল বলে আপনার বিশ্বাস সে ঋণ বহুগুণ কুসীদসহ শোধ করেছেন। এখন আপনার এসব তথ্য প্রকাশ করতে বাধা কি? বিশেষ আমি যখন রণচিকীর্ষু নই, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!’^{১৩}

ভীষ্ম পর্ব অতিক্রম করেও পরবর্তী জয়গুলি সহজভাবে আসে নি পাণ্ডবদের। দ্রোণাচার্যের বধ করতে হয়েছে বাসুদেব কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে, এখানেও বাসুদেবের কূটনৈতিক বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরদের সহায়ক হয়েছে। এরপর একে একে সংকট এসেছে জয়দ্রথ হত্যায় ও কর্ণ বধেও। জয়দ্রথ নিজ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে মহাদেবের ভীষণ তপস্যায় একসময় নিয়োজিত ছিল, মহাদেব তার কঠোর তপস্যায় খুশি হয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ছাড়া অন্যদের পরাজিত করার বর প্রদান করে। সেই বর প্রাপ্তির এতদিন পর মোক্ষম মুহূর্ত এসেছে। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে অভিমন্যুকে চক্রব্যূহের ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়ে বাইরের পথ জয়দ্রথ আটকে রাখে। ফলে অভিমন্যুকে সাহায্যের জন্য অন্য পাণ্ডবেরা চক্রব্যূহের ভেতর প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে কৌরব মহারথীরা সবাই একত্রে অভিমন্যুকে হত্যায় সফল হয়। অভিমন্যুর হত্যায় অর্জুন জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু সূর্যাস্তের মধ্যেই সমস্ত কৌরব সৈন্য ও মহারথীদের পরাজিত করে জয়দ্রথ বধ এতটা সহজ ছিল না। ফলে এখানেও বাসুদেব কৃষ্ণের কূটনৈতিক বুদ্ধি পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়ে সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে রাত্রিকালীন যুদ্ধের বিষয়ে ভীষ্মের পুত্র

ঘটোৎকচ যুদ্ধ কলায় ভীষণ পারদর্শী ছিল। অর্জুনকে হত্যার জন্য কর্ণ ব্রাহ্মণ রূপী ইন্দ্রের থেকে বিশেষ অস্ত্র লাভ করার ফলে বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনের বিষয়ে অধিক সচেতন ছিল। তাই কর্ণের কাছে এই অস্ত্র থাকাকালীন অর্জুনকে কর্ণের প্রতিপক্ষ হিসাবে বাসুদেব কখনোই হাজির করায় নি। ঘটোৎকচের প্রবল প্রতাপে যখন কৌরব পক্ষ একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, জয়ের বিন্দুমাত্র আশা কেউ আর দেখছে না, তখন বাধ্য হয়েই দুর্যোধনের ঐকান্তিক অনুরোধের সৌজন্যেই ইন্দ্র প্রদত্ত অস্ত্র কর্ণ ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়। এরই ফল হিসাবে ঘটোৎকচের মৃত্যু হয় এবং বাসুদেব কৃষ্ণের পরিকল্পনা সফল হয়েছে দেখে বাসুদেব আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। এভাবে শুধুমাত্র কূটনৈতিক বুদ্ধির দৌলতে নিজের সখাকে রক্ষা করতে পারা এবং প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্র ভেঁতা করে দেওয়া বাসুদেবের পক্ষেই কার্যত সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘টার্নিং’ পয়েন্ট। গজেন্দ্রকুমার মিত্র কৃষ্ণের এই কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন:

বালকের নির্বুদ্ধিতায় যেমন বয়স্ক অভিভাবকরা সপ্রশ্রয় অবহেলা প্রদর্শন করেন, সেইরূপ হাস্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ‘নির্বোধ, আমি তোমাদের বন্ধু ও হিতৈষী বলেই এত আনন্দ করছি। এই অব্যর্থ অস্ত্র কর্ণ তোমার জন্য রেখেছিলেন, এ অস্ত্র প্রয়োগ করলে পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য ছিল না তোমাকে রক্ষা করে। তবে এ অস্ত্র একাঘ্নী, একজনকে মাত্র বধ ক’রে নিজেও বিনষ্ট ও ভস্মীভূত হয়। সুতরাং এই অস্ত্র ব্যবহৃত হওয়ায় তোমার জয়ের পথই নিরঙ্কুশ হ’ল, অতঃপর আর কর্ণবধে কোন বাধা রইল না।’^{১৪}

তবে এগুলি ছাড়িয়েও ধর্মরাজ্য স্থাপনার কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করতে পারে না কৃষ্ণ বাসুদেব। যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন কৃষ্ণ নিজের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হিসাবে পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ, মাতুল শল্যের স্বর্গ লাভ হয়, সেই অতুল বোধ বুদ্ধির অধিকারী কৃষ্ণ আর্যাবর্তে কার্যত ইন্দ্রপ্রস্থের ধর্মের ধ্বজা টিকিয়ে রাখার জন্য পাপকর্মে লিপ্ত নিজের যাদব বংশকেও ধ্বংস করতে পিছিয়ে যায় নি। ব্যাসদেবের মহাভারতে যেখানে গান্ধারীর অভিশাপে সমগ্র যাদবদের বংশ নির্মূল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর উপন্যাসে অভিশাপের প্রসঙ্গটিকে গোঁণ করে দেখেছেন, বরং দেখাতে চেয়েছেন নানা প্রকার অধার্মিক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ার জন্য সমগ্র যাদব বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। যাদব ও তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা নারী ও সুরার লোভে দিনযাপন অতিবাহিত করতে লাগল। সুরাপানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও সবার সামনেই তারা তা পান করতে লাগল। পুরুষেরা অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় মেতে রইল এবং গুরুজন ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদের ক্রমাগত অশ্রদ্ধা করতে লাগল। বাসুদেব কৃষ্ণের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় নিরাপদ জীবন কাটাতে কাটাতে যাদব বংশের লোকেরা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে যায়। যার ফলে

বাসুদেব কৃষ্ণ যাদের জন্য জীবনভর সংঘর্ষ করে এসেছে, যাদের প্রতিষ্ঠার জন্য জরাসন্ধের মতো প্রবল প্রতাপশালী বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যাদের মঙ্গল কামনায় গোষ্ঠীর মধ্যকার কলহ ও বিরোধকে দক্ষ কূটনৈতিক চালের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হয়েছে, আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মরাজ্য অধর্মে ভরে যাওয়ার কারণে কৃষ্ণ ও বলরাম যুদ্ধযোগে নিজ বংশ নির্মূল করতে বাধ্য হল।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর এই উপন্যাসে চমৎকার একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন মহাভারতের পাঠকদের, অন্তত তাঁর এই উপন্যাসের পাঠকদের তো বটেই। ধর্মরাজ্য স্থাপনা একটি চূড়ান্ত স্তরের ভালো কাজ যা রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত উত্তম একটি দিক। আমরা ধর্মপ্রাণ মানুষেরা আদর্শ রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে ‘রাম রাজ্যের’ কথা অনেকেই বলে থাকি। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের বিরাট অংশের মানুষেরা আজও শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রসঙ্গে রামায়ণের রাম রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী নিজেও রাম রাজ্যের ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবের রক্ষ মাটিতে রাম রাজ্যের ভাবনা প্রয়োগে খুব একটা সফলতা আসে নি, বরং ব্যর্থতাই বেশি। উল্টোদিকে ধর্ম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে বাসুদেব কৃষ্ণ আজীবন লড়াই করে গেছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তারও ভাবনার পরিবর্তন ঘটে, বুঝতে পারে কৃষ্ণ তার ভাবনায় গলদ ছিল। বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন করা যায়, প্রয়োজনে রাজাকেও পদচ্যুত করা যায়, নিয়ম শৃঙ্খলায় কঠোরতা আনা যায়, ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে পুরো রাষ্ট্রকেই বেঁধে ফেলা সম্ভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের ভালো-মন্দের বিচার মানুষকেই করতে হবে। সমাজের ভালো-মন্দ, নীতি ও ন্যায়, নিয়মকানুন সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষদেরই বুঝে নিতে হবে। বাইরে থেকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মরাজ্যের স্থাপনা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ধর্মরাজ্যের স্থাপনা বাস্তবায়িত হবে শুধুমাত্র সমাজের নাগরিকদের চাওয়ার উপর ভিত্তি করে। যেহেতু সমাজের মধ্য থেকেই রাজা, মন্ত্রী ও শিক্ষাগুরু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির উঠে আসে। তাই রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থার অবনমন ঘটলে সমাজের সর্বস্তরে উপরিউক্ত (সুরা পান করা, শ্রদ্ধাবানদের অশ্রদ্ধা করা, অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় মেতে থাকা ইত্যাদি) বিষয়গুলি ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সমকালীন বৈশ্বিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এরকম দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের জাপান এবং যুদ্ধ-পরবর্তী জাপান দুটো দেশ সম্পূর্ণ আলাদা। পরমাণু বোমাতে দুটো শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর জাপানের নাগরিকেরা দেশ গঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেরা আত্মনিয়োগ করেছিল, যার ফল হিসাবে কয়েক দশকের মধ্যেই জাপান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশে পরিণত হয়। জাপানের মানুষেরা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে এবং তারা অত্যন্ত পরিশ্রমীও বটে। আজ ২০২৪ সালের হিসাবেও জাপান পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক

দেশ। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইয়েমেন, আফ্রিকার সুদান প্রভৃতি দেশ নিজেদের মধ্যে কলহ, দ্বন্দ্ব এবং একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দণ্ড কে বা কারা ভোগ করবে তা নিয়েই তারা লিপ্ত হয়ে রয়েছে। এরই ফলে জীবনধারণের সূচকে কিংবা অর্থনৈতিক অগ্রগতি কোনওটাতেই নিজেদের অবস্থান তাদের সামনে উঠে আসছে না। ফলে যদুবংশ ধ্বংসের বিষয়টিকে এভাবে দেখা যেতে পারে বলে আমাদের মনে হয়। লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র উপন্যাসের শেষে যদুবংশ ধ্বংসের প্রসঙ্গে বিষয়টিকে এমনভাবেই দেখেছেন। শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা ও সর্বদা ধর্মের পথে থাকা একটি নগর সভ্যতাকে ধীরে ধীরে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যায়। এভাবেই তাদের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি এবং আশেপাশের রাজ্যের ওপর আধিপত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তারপর ধীরে ধীরে ওই রাষ্ট্রটি ক্রমশ ‘রুলিং স্টেটে’ পরিণত হয়। রাজা কংসকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে পরবর্তী সময়ে জরাসন্ধ বধের মাধ্যমে কৃষ্ণের একটি রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক অভিসন্ধির কথা সমস্ত রাজারাই বুঝতে পেরেছিল। পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে সভার মাঝখানে সমস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষ ও রাজাদের মধ্যে যখন ভীষ্ম কৃষ্ণের নাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও প্রাজ্ঞ কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে উত্থাপন করলেন এবং তাকেই সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বাসুদেব কৃষ্ণের সমগ্র আর্যাবর্তের ওপর একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। যদিও কৃষ্ণ নিজে রাজা ছিল না, এমনকী তার মাথার ওপরেও দাদা বলরাম ছিল, তবুও কৃষ্ণের যথা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত এবং কূটনৈতিক ভূমিকা তাকে তৎকালীন ভারতবর্ষের সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলরাম ও কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই জায়গাতেই বাসুদেব কৃষ্ণের ণ্ডটির বিষয়টি ধরেছেন, বাহ্যিক শক্তির প্রভাব কখনোই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সর্বদা সাফল্যের চূড়ায় রাখতে পারে না। যে বৌদ্ধিক পরিকল্পনা ও কূটনৈতিক প্রভাবে বাসুদেব তৎকালীন ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ম রাষ্ট্র স্থাপনার স্বপ্ন দেখেছিল এবং যা বাস্তবেও রূপ দিতে পেরেছিল কৃষ্ণ, তাকেই যদুবংশীয় মানুষদের অধার্মিক কাজকর্মে বাসুদেব ও বলরামকে বাধ্য হতে হয় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসের শেষের এই ভাবনাটি আমাদের যথার্থ অর্থেই মুগ্ধ করেছে। সত্যিই তো রাষ্ট্রের উন্নতির প্রশ্নে বা সুনামের প্রশ্নে রাষ্ট্রের জনগণকেই সর্বপ্রথমে ভূমিকা পালন করতে হয়, যদি জনগণ তা না করতে পারে, তবে কৃষ্ণ বা বলরাম এর মতো শক্তিশালী ব্যক্তিত্বেরও শেষ পর্যন্ত কিছুই করার থাকে না। এই বিষয়টি অতীতের মতো সমকালীন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও সমানভাবে সত্য।

১.৩।। বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

বিমল কর বাংলা কথাসাহিত্যের দুনিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন লেখক। তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয় চারের দশকে, কিন্তু বিশ শতকের পাঁচ থেকে সাতের দশকের মধ্যে তিনি সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠা পান। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’ প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *পরাগ* পত্রিকায় সহ সম্পাদকের কাজ পান। সহ সম্পাদক হিসাবে তিনি *পশ্চিমবঙ্গ* ও *সত্যযুগ* পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প সংকলন *বরফ সাহেবের মেয়ে* প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই *দেশ* পত্রিকার বিভাগীয় প্রধান হিসাবে তিনি যোগ দেন। এই পদে তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ অবধি ছিলেন। এছাড়া তিনি *শিলাদিত্য* এবং *গল্পপত্র* পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিমল কর *অসময়* উপন্যাসের জন্য ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র পুরস্কার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। তিনি দু’বার আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি বহু ছোটগল্প এবং কিশোর উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ রচনাগ্রন্থ। এগুলির মধ্যে আছে উপন্যাস, রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ এবং গোয়েন্দা গল্প। উপন্যাসের মধ্যে আছে— *হৃদ*, *ত্রিপদী*, *দেওয়াল*, *অপরাক্ষ*, *খোয়াই*, *বালিকা বধু*, *গ্রহণ*, *পরবাস*, *পরিচয়*, *পূর্ণ অপূর্ণ*, *যদুবংশ*, *একদা কুয়াশায়*, *ভুবনেশ্বরী*, *কালের নায়ক*, *সংশয়*, *শমীক* এবং *শীত বসন্তের অতিথি* ইত্যাদি। গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে *কিকিরা সমগ্র* বাংলা পাঠক সমাজের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে তাঁর সাহিত্য গ্রন্থের সার্বিক পরিচয় দেওয়া এই সময়ে আমাদের কাজ নয়, আমরা তাঁর মহাভারত সম্পর্কিত উপন্যাসগুলি নিয়েই এখানে আলোচনা করতে চাইছি। এদের মধ্যে আছে— *যদুবংশ*, *শমীক*, *এই বেদনায়*, *বিষাদে*, *অসময়*।

বিমল করে’র লেখায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের নানান আন্দোলনগুলির ছবি পাওয়া যায়। বিদেশী শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত মাতৃভূমি এবং দেশের সাধারণ জনগণের অত্যাচারিত ও শোষণক্লিষ্ট রূপ তাঁর লেখায় আমরা পাই। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন উপমহাদেশের ইতিহাসে সবথেকে বড়ো বিপর্যয়। যার ফলে আমরা ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা তো পেলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পেলাম একদল মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণা ও বেদনা। পরবর্তী সময়ে দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার যদিও প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু সাধারণ জনগণের যন্ত্রণার অবসান হল না। ফলে সার্বিক নৈরাজ্য এবং অরাজকতায় আমাদের চারপাশ ছেয়ে যায়। যুবকরা চাকরির অন্বেষণে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায়, অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় অসং পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, হিংসা, দলাদলি এবং

রাজনৈতিক খুনের পরিমাণ ক্রমশবৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলত এই পরিস্থিতিতে যে কোনও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই বিমল কর সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উপস্থাপনের জন্য হাতে তুলে নিয়েছেন মহাভারতকে। এভাবেই বিমল কর আধুনিক জীবনের মধ্যে সঞ্চার করেন মহাভারতীয় অনুষ্ণ, তাতে দেন আবহমানতা। লেখক মহাভারতীয় অনুষ্ণ নিজস্ব ভাবনার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উপযুক্তভাবে সেগুলির প্রয়োগও করতে সক্ষম হয়েছেন। মিথ তিনি নিজেই গড়েছেন আবার নিজেই ভেঙ্গে চুরমার করেছেন। ফলে অনেক সময় পাঠক তাঁর মহাভারতীয় মিথের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পারে না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে বিমল কর তাঁর লেখা মহাভারতমূলক উপন্যাসগুলিতে মহাভারতকে যে নবরূপে ভাবতে পেরেছেন, তা বাঙালির মহাভারত চর্চার জগতে অন্যতম সম্পদ হয়ে থাকবে। বিশ শতক তো বটেই, এমনকী একুশ শতকে দাঁড়িয়েও তাঁর মহাভারতধর্মী উপন্যাসগুলি পাঠকের মুগ্ধতার অন্যতম নিদর্শন হয়ে থাকে।

বিমল করে'র *যদুবংশ* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা *উড়েখই* থেকে জানতে পারা যায় উপন্যাসটি রচনার কারণ সম্পর্কে। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্র তাঁর উপন্যাসে দেখাতে পারবেন কিনা, তাই নিয়ে বন্ধু মহলে বিমল করে'র বেশ তর্ক বিতর্ক হয়, ফলে বন্ধুদের সঙ্গে একপ্রকার বাজিই ধরেছিলেন তিনি। আসলে ওই যুগের সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলার কাজে লেখকের সাহায্য মিলেছিল জনৈক একটি বিদেশী উপন্যাসের থেকে। ছয়ান গোয়াটিসোলো রচনা করেছিলেন *দ্য ইয়ং অ্যাসাসিনস* নামের একটি স্প্যানিস উপন্যাস। এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুবকদের মধ্যে সার্বিক অবক্ষয়ের এবং নৈতিকতার অবনমনের ছবি। ফলে বিদেশের এই উপন্যাসটির কথা লেখকের মনে এসেছে সমকালীন বঙ্গদেশের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া যুবকটির প্রসঙ্গে, যে বাঁচার জন্য খুঁজে পাই নি কোনও আলোর দিশা। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিমল কর বলেছেন:

আমাদের দেশটা না স্পেন, না ইটালি। এখানে না হয়েছে গৃহযুদ্ধ না মুসোলিনির কালো কোর্তার দল দেখা গিয়েছিল। কোনো মিল সে অর্থে নেই। তবু যুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশেও ক্রমশ এক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছিল। অবক্ষয়, উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ। সেই অবক্ষয় যে বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাতে আর সন্দেহ কী।^{১৫}

আসলে বিমল কর ছয়ান গোয়াটিসোলোর উপন্যাসের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিল খুঁজে পেয়েছেন *যদুবংশ* উপন্যাসটির। আসলে ছয়ান গোয়াটিসোলোর উপন্যাসে পাওয়া যায় যুবকদের শৈশব ও কৈশোর জীবনের রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে গৃহযুদ্ধের ছবিও। ফলে এই সমস্ত যুবকেরা পরিবার-পরিজন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বেঁচে

থাকে। উপন্যাসটির এই অংশটির সঙ্গে বিমল কর মেলাতে চেয়েছেন মহাভারতের যাদব বংশ ধ্বংসের কাহিনিকে। যেখানে আমরা দেখতে পাই যুধিষ্ঠিরের ছত্রিশ বছর রাজ্য শাসন হয়ে গেলে যদুবংশীয়রা পরস্পর মারামারি ও হানাহানির ফলে নিজেদের বংশকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিমল করে'র *যদুবংশ* উপন্যাসে প্রবেশের পূর্বে মহাভারতের যদু বংশ ধ্বংসের কাহিনিটি বলা প্রয়োজন। একদিন বিশ্বামিত্র কণ্ঠ এবং মহর্ষি নারদ কৃষ্ণের দ্বারকা নগরীতে পৌঁছলে যাদবদের মধ্যে অনেকের মাথাতেই নানা প্রকার মন্দ ভাবনার উদয় হয়। সেই ভাবনার বশেই তারা শাসকে নারীর বেশে সজ্জিত করে মুনিদের কাছে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তারা মুনিদের জানায় এই নারী স্বয়ং যাদব বীর বক্র জ্যৈষ্ঠ। গর্ভধারণের পরে সে কী প্রসব করবে তাও মুনিদের কাছে তারা জানতে চায়। ফলত যাদবদের এই ব্যবহারের ফলে ঋষি ও মুনিরা অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করে এবং জানায় যে, যাদবদের ব্যবহার অত্যন্ত নিম্নগতিপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই কৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়া যাদব বংশের সবাই অকালে বিনষ্ট হবে। কৃষ্ণ এই অভিশাপের কথা জানার পর সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, মুনিদের অভিশাপ বৃথা যাবার নয়। যাদব বংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। নিজের চোখেই কৃষ্ণ ও বলরামকে এই ধ্বংস দেখতে হবে। কালের বিপর্যয় বুঝে কৃষ্ণ ত্রুণ হয় না। একের পর একজন তার চোখের সামনেই মারা যায়। কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। যে সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ, নিজের বাহু বলে এবং কূটনৈতিক দক্ষতায় ভারতবর্ষের একটি বিরাট অংশ নিজের অধীনে আনতে পেরেছিল, সেই কৃষ্ণ বাসুদেব জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে মুনিদের অভিশাপের ফলে ঘটে যাওয়া এই ধ্বংসের ছবি কিছুতেই স্তব্ধ করতে পারে না।

বিমল কর যাদব বংশের এই ধ্বংসাত্মক ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন সমকালীন অর্থাৎ ছয়ের দশকের বাংলাকে। এখানেই লেখক মিল খুঁজে পান ছয়ান গোয়াটিসোলোর উপন্যাসের সঙ্গে বাংলার যুবসমাজের। এক অন্ধকারে এবং পাক্কে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে ভবিষ্যতের আশার আলো কেউই দেখতে পায় না। উপন্যাসটিতে মূলত চারজনের কথা বলা হয়েছে, প্রত্যেকেই একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিমল কর এই চারজন চরিত্রের যাতায়াত ও কার্যকলাপের সূত্রে আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন ছয়ের দশকের সামাজিক অবক্ষয় ও অনাচারকে। উপন্যাসের প্রধান চার জন চরিত্র হল- সূর্য, বুললি, কৃপাময় এবং অভয়। পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে এই চারটি চরিত্র সমাজের একই সারিতে অবস্থান করে না, কৃপাময় এবং অভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা বাকিদের থেকে নিচে হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুত্বের মাঝে তা বিভেদ সৃষ্টি করে দাঁড়ায় না। কারণ এরা প্রত্যেকেই ছয়ের দশকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ধারক। লেখক এই সমস্ত যুবকদের সুন্দর একটি ছবি এঁকেছেন উপন্যাসের মধ্যে। আসলে ক্ষয়প্রাপ্ত এই সমাজ ওই সকল যুবকদের কোনও কর্মের সংস্থান করে

দিতে পারে নি। তাই এরা প্রতিনিয়ত আড্ডা মারে, চায়ের দোকানে সময় কাটায়, জীবনে সুন্দরী রমণী আসবে না বুঝতে পেরে পাড়ার মেয়েদের প্রতিনিয়ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে, রাস্তার দু'ধারে ল্যাম্প পোস্টের বাল্ব গুলতি দিয়ে ভেঙে ফেলে ইত্যাদি। আসলে বস্তুতপক্ষে হতাশার অন্ধকারে ডুবতে থাকা যুবকেরা নিজেদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ হয়তো এভাবেই করে থাকে।

ভেঙে যায় ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে পবিত্র সম্পর্কের রসায়নটি। ছাত্র শিক্ষক মশায়ের সম্পর্কে নানান অপমানজনক উক্তি করে। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্মানও তারা করে না। আসলে দীর্ঘদিন পারস্পরিক মেলামেশার কারণে মানুষের ভেতরের মুখোশগুলো খুলে গেছে। তাই কোনও জড়তা ছাড়াই নিজেদের শিক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করে এরা:

একদিন আমি মাইরি, তোদের বলেছি না, কলেজের সেই ইংলিশ প্রফেসর, কি যেন টি.বি.-
তড়িং ব্যানার্জীকেও দেখেছি। মাল খেয়ে লাটু হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রিক্সা ডাকছে।^{১৬}

রামেশ্বর জী,... তোমাদের বাংলা স্কুলের গোরা অ্যায়সা মাস্টারজী ...। আবার এরপরে বুললি
মন্তব্য করে— ‘রেণুস্যার আজকাল রোজ মাল খেতে আসে, মাইরি। রেণুস্যার শিব হয়ে গেছে
রে। ... বিধবা শালীটা পট করে মরে গিয়ে খেপে গেছে স্যার।’^{১৭}

এরপর বিমল কর পাঠকদের ধীরে ধীরে পরিচয় করান এই চারজন ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে। সেখানেও আমরা খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই যে এই সকল চরিত্রগুলির মানুষগুলিও তাদের পরিবারের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কের রসায়নে আবদ্ধ নয় একেবারেই। পরিবারের সন্তান তার পিতার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। আসলে সময়টাই অবক্ষয়ের যুগ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কর্মরত সূর্যের বাবা। বাল্যকাল থেকেই পিতার মধ্যে ভগ্নমী দেখে এসেছে সূর্য। সে কারণে বাবার প্রতি মনের মধ্যে অসীম ঘৃণা জমিয়ে রেখেছে সূর্য। ঠিক যেমন বাসুদেব কৃষ্ণের যাদব বংশের সন্তানদের মতো বিমল করে’র সূর্যও বলে ওঠে:

বাবার কত বয়স হল? ষাট-ফাট পার করে দিয়েছে নিশ্চয় কোন কালে। বুড়োর এখনও মজবুত
শরীর। তোয়াজ কম করে না; পাকা মাছ, বাড়িতে তৈরি ঘি, তিনপো দুধের ক্ষীর, এ সব তো
আছেই তার সঙ্গে হরতুকীর জল, বেলের পানা, কবরেজী মোদক ফোদকও আছে।^{১৮}

আবার আমরা ইলেকশনের বা নির্বাচনের পূর্বে তার বাবার সম্পর্কে চটুল একটি ছড়া সে শোনে, যদিও ছড়াটি শুনে বাবার সম্পর্কে তার কোনও খারাপ লাগা থাকে না, বরং এক গাল হেসে উঠে সে। ছড়াটি ছিল এরকম— ‘ওরে ও ধেড়ে কামাখ্যা, এবারে উলটে দেবো ছক্কা, জারিজুরি চলবে না আর হয়ে যাবি ফক্কা।’^{১৯} এর পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেও দেখতে পাই একই রকম সম্পর্কের রসায়ন। কারোর প্রতি কারো শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান একেবারেই নেই। পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের ভিত্তি ঘৃণা, লালসা

এবং অহংকারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের দিদি বিজয়া। সমাজে ভাই বোনের সম্পর্ক খুবই মিষ্টি মধুর হয়ে থাকে। উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাই প্রধান ভিত্তি হয়, কিন্তু সূর্য ও বিজয়ার মধ্যকার সম্পর্ক শুধু ভালো নয়, বরং ঘৃণায় পরিপূর্ণ। বিজয়ার প্রতি কিছু কথা বলতে গেলেই অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে সূর্য। সম্পত্তি বিভাজনের কুৎসিত লড়াইয়ে সূর্য বিজয়ার ওপর লাফিয়ে পড়েছে। বিষয়টা এমন যে বিজয়া যদি সম্পত্তি পায় তবে সূর্য তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলবে সে। সূর্য ভাবে একদিন সে দিদির মেয়েই ফেলবে। দিদি মারা গেলে তার কিছু যায় আসেও না। একেবারেই মহাযুদ্ধ ছাড়া দিদির হাতে সম্পত্তি সে তুলে দেবে না। বিমল করে'র সূর্য এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলেছে:

ধনচন্দর যে বাড়ি করছে, সেই বাড়ি তুমি তোমার নামে বানাতে চাও, বাবাকে মন্তর দিচ্ছ, ধনচন্দরকে দালাল লাগিয়েছ। তুমি কত বড় খলিফা মেয়েছেলে আমি জানি না?... বাবা তোমায় নতুন বাড়ি দিলে আমি বাবাকে ছেড়ে কথা কইব না। এ বাড়িতে বসে বসে তোমার ডিম পাড়া বের করছি।^{২০}

আসলে আমাদের সবার জীবনেই পরিবার অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও অভিমান পরিবারের মানুষদের সঙ্গেই আমরা ভাগ করে নিই। অন্যদিকে সূর্য পরিবারের প্রতি কোনও আকর্ষণ ও টান একেবারেই অনুভব করে না। দিনের শেষে প্রত্যেকটা পাখিও নিজের নীড়ে ফেরার জন্য আকুতি অনুভব করে। কিন্তু সূর্যের সেই অনুভবও নেই। এই বিশৃঙ্খল জীবনে সূর্যের যৌবনকে একমাত্র আশ্রয় দিতে পারত মালাদির ভালোবাসা। কিন্তু মালা এবং জয়ন্তীর মধুর সম্পর্ক সূর্যকে দূরে ঠেলে দেয়। এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সূর্যর নিজেকে ভাঁড় মনে হয়। যৌবনের আনন্দের কোনও সুরাহা খুঁজে পায় না সে। এরকম পরিস্থিতিতে সূর্যের শেষ আশ্রয় হয়ে ওঠে মদের দোকান এবং তারই মতো একদল হতাশ যুবকের সঙ্গ। এটাই হল সমকালীন ছয়ের দশকের সংকটপূর্ণ বঙ্গদেশের যুবকদের প্রতিচ্ছবি।

সূর্যদের অপর এক বন্ধুর নাম বুললি। তারা অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে সমাজে উপরের দিকেই রয়েছে। তাই সূর্যদের পরিবারের সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে যথেষ্টই মিল আছে। বুললি নিজে পুলিশ অফিসারের ছেলে। স্বাভাবিকভাবেই সূর্যর বাবা যেমন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়ে অসৎ উপায় অবলম্বন করে এগিয়ে চালাকেই প্রধান বলে মনে করে, ঠিক তেমনি বুললির বাবাও অসৎ পুলিশ হয়ে কালো টাকার উপার্জন করাকেই গুরুত্ব দেয়। বিষয়টি সমাজের সকল মানুষের মতো বুললির বন্ধুরাও জানে। সার্বিক এই অবক্ষয়ের পরিবেশে তারা বেড়ে উঠেছে, সততা ও ন্যায় নীতি যেমন বুললির বাবা মেনে চলে না, ঠিক তেমনি বুললিও ওই পথ দিয়ে জীবনে এগিয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। বুললির দাদা চাকরির স্থানে মৃদুলার সঙ্গে

অতিরিক্ত মেলামেশার ফলে বিবাহ পূর্ববর্তী সময়েই মৃদুলা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই বুললির বাবার কিছু করার থাকে না। কারণ বিষয়টা তার আয়ত্তের বাইরে ঘটেছে। কিন্তু বুললির মা বিষয়টাকে ভালোভাবে মানতে না চাইলেও ছেলে যেহেতু বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে অন্যত্র থাকে, তাই কোনও প্রকার পারিবারিক অশান্তি তাদের পরিবারে হয় নি। কিন্তু পারিবারিক বাড়ির দখলকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংকট ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। বুললির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে:

দাদা বিয়ে করার পর থেকেই বউদিকে নিয়ে একটা গোলমাল লেগে আছে। বিয়েটা বাবা মা— কারও পছন্দ হয় নি। এখনও তারা এটা পছন্দ করে না। বউদিকে মা সহ্য করতে পারে না। বাবাও যে পারে তা নয়, তবু বাবা পুরুষ মানুষ বলে মা'র মতন অনবরত চেষ্টামেচি করে না, যা বলার যা করার ধীরে সুস্থে বলে বা করে।^{২১}

প্রাথমিকভাবে বুললির সঙ্গে তার বউদির সম্পর্ক খারাপ ছিল না, কিন্তু দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক বিষয়টা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং মৃদুলার আগমনের কারণ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যকার সম্পর্কটিও আর পূর্বের মতো থাকে নি। বাড়ির মধ্যেই অসৎ পুলিশ বাবা যে সরকারি টাকার বাইরেও বেশি উপার্জনের আশায় ঘুষ খায়, অন্যদিকে নীতি-নৈতিকতা একপ্রকার বিসর্জন দেওয়া দাদা এবং মা ও বউদি— এদের কেউ বুললির মানসিক আশ্রয়ের জায়গা হয়ে ওঠে না। এইরকম পরিস্থিতিতে তার আশ্রয়ের জায়গা হয়ে ওঠে তারই মতো আরও তিনজন কর্মহীন যুবক। পরিবারে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই, কিন্তু সেই সুখ বা আরাম মানসিক আশ্রয়ের জায়গা হয়ে ওঠে না তার জীবনে।

এদের অপর বন্ধু কৃপাময়। কৃপাময় বনেদী বাড়ির বাসিন্দা। অবক্ষয়ের যুগের ক্ষত থেকে মুক্তি পায় নি কৃপাময়ের বাড়ির পরিবেশও। তাই একসময়ের বনেদী পরিবারের শক্তিশালী কাঠামো আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কৃপাময়ের বাবা যে পরিবারটিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল, তা আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃপাময়ের দাদু মারা যাওয়ার পর তার পিতা সংসারের হাল ধরেছিল। একে একে চাহিদা মেটানো হয়েছে বাড়ির সমস্ত সদস্যদের। কিন্তু এই সমস্ত কাজ করেও শেষ পর্যন্ত কৃপাময়ের বাবা যৌথ পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। বাড়ির মেজো ছেলে স্বার্থপর, কৃপণ এবং আত্মসুখী। অন্যদিকে সেজো ছেলে পেশায় ডাক্তার। তার মায়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাড়িতে এলেও মৃত্যুর পরে আর একেবারেই আসে না। বলা ভালো, বাড়ি ফেরার প্রয়োজন বোধ করে না সে। বাড়ির ছোট ছেলে পেশায় উকিল। তার বিয়ের পরই মারা যায় কৃপাময়ের বাবা। এক সময়ে অতি যত্নে গড়ে তোলা একটি পরিবার সময়ের পূর্বেই ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যেতে দেখে কৃপাময়ের বাবা। ঔপন্যাসিক বিমল করে'র উপন্যাসে এই পরিবারটির ভিতরের ছবি বা অন্তঃসারশূন্যতা বোঝানোর জন্য চমৎকার একটি বক্তব্য রয়েছে।

এ বাড়ির ভিত, দেওয়াল, কড়ি বরগা আর পুরনো যত আসবাবপত্র, আচার বিচার সমস্ত কিছু
মধ্যে বাইরে বাইরে একটি শোভা আছে, ভার আছে, পুরনো গন্ধ আছে; নয়তো আর কিছু
নেই।^{২২}

ধীরে ধীরে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে তাদের বনেদী যৌথ পরিবারের অন্ধকারাচ্ছন্ন
ছবি। যৌথ পরিবার কীভাবে কালের নিয়মে ভেঙে যায় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের
রসায়ন কীভাবে বিষময় হয়ে ওঠে তারই অন্যতম নিদর্শন এই আখ্যান। এখানে আমরা দেখতে
পাই কৃপাময়ের মায়ের প্রসঙ্গও। দেখতে পাই কালের নিয়মে পরিবারের সদস্যরা একে একে
গত হয়েছে। পরিবারের একগুচ্ছ লোক যথা ঠাকুরমা, কাকারা এবং পিসিরা কৃপাময়ের মাকে
পাগল বানিয়েছে। কৃপাময় এটি বুঝতেও পেরেছে। তার শেষ সম্বল তার মা। কৃপাময় বুঝতে
পেরেছে তার মায়ের মৃত্যুর পর তাকেও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা অন্যত্র ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাই
পরিবারে মাকে ছাড়া অন্য আর কাউকে সে চায় না। কৃপাময় বুঝতে পারে যে মায়ের মৃত্যুর পর
তাকেও এই পরিবার ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না, তাই তার মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের সমস্ত
কুকীর্তি প্রকাশ্যে আনার কথাও ভেবেছে সে। কৃপাময় চেয়েছে মায়ের মুখে আগুন দেওয়ার সময়
চিৎকার করে পরিবারের মানুষদের কেচ্ছা সবাইকে জানিয়ে দেবে সে। অভয় হল এদের অন্য
একজন বন্ধু। খুবই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সে। তার বাবা সামান্য একজন রেলের
কর্মচারী। অভয়ের মাথার উপরে দুইটি অবিবাহিত বোন রয়েছে, যাদের বিবাহের জন্য প্রতিনিয়ত
অভয় এবং তার বাবা চিন্তিত থাকে। সংসারের অর্থনৈতিক দিকের কথা ভেবে দ্রুত চাকরির
প্রতি নজর দেওয়ার চেষ্টা করে অভয়। কিন্তু সফলতা তো দূরের কথা, বরং ব্যর্থই হয় সে। এই
অবক্ষয়ের যুগ তাকে চাকরির নিশ্চয়তা থেকে দূরেই রাখে।

তবে এই অসুস্থ ও নষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও এমন একজনের কথা বিমল কর দেখিয়েছেন,
যার জন্য আজও এই পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকতে চাইবে। এই অবক্ষয়ের যুগের সম্পূর্ণ
বিপরীত একটি চরিত্র গণনাথ। সমাজের পাঁক সরিয়ে নিজের মতন রাস্তা করে এগিয়ে চলে এই
গণনাথ। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে গণনাথের যত ভালো গুণ যথা- মনুষ্যত্ববোধ, শুভ্রতা এবং সততা
বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয় এই জটিল সমাজে। কিন্তু তারপরেও গণনাথ হাল ছেড়ে ফিরে আসে
না। ফলে এই জটিল এবং হেরে যাওয়া সমাজের কাছে একমাত্র প্রদীপ হল গণনাথ, যে তার
ব্যক্তি চরিত্র দিয়ে সূর্যদের মতো হারানো পথিকদের পথ দেখাতে চায়, কিন্তু গণনাথ এখানেও
ব্যর্থ হয়। সূর্যরা কেউ গণনাথ হয়ে ওঠে না, কিন্তু গণনাথ তার প্রয়াস এই প্রসঙ্গে একেবারেই
কম করে না। তার সততার প্রমাণ বিমল কর একাধিকবার দিয়েছেন। নষ্ট হয়ে যাওয়া এই
সমাজ ব্যবস্থায় অসং পথে যেখানে অধিক উপার্জন সম্ভব, সেখানে সততার সঙ্গে সং পথে
থাকতেই অধিক ভালোবাসে সে। যার উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখেছি বাজারে ছোট একটি ঘর

নিয়ে ‘ইউনিভার্সাল এজেন্সি’ সে চালায়। কিন্তু লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তার ব্যবসায় একেবারেই লাভ থাকে না। কিন্তু লাভ নিয়ে গণনাথ আবার চিন্তিত নয়। একেবারেই নিজের কথা ও নিজের স্বার্থ নিয়ে গণনাথ চিন্তিত থাকে না, যে কারণে একটি চাকরি পাওয়ার পরেও আবার চাকরি ছেড়ে দিতে সক্ষম হয় সে। সমাজের কোনও বাধা বা নিয়মের তোয়াক্কা করে না সে। নয়নাদের প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে থেকেছে, সমাজের কটু কথা এক্ষেত্রে কোনও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নি তার কাছে।

গণনাথ চরিত্রটির সঙ্গে জুড়ে আছে সূর্যদের বাড়ির স্বর্ণ প্রদীপটি। নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজের কাছে ঐতিহ্যের কোনও গুরুত্ব থাকে না, ঐতিহ্যকে বড়ো করে দেখতে একেবারেই চায় না এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমাজের মানুষেরা। যাদের কাছে কোনও একটি বস্তুর অর্থনৈতিক মূল্যই প্রধান হিসেবে ধরা দেয়। বস্তুর অর্থনৈতিক প্রাধান্য থাকলে সমাজ তাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে পছন্দ করে, নচেৎ ফেলে দেয়। ফিরেও তাকাতে চায় না তার প্রতি। এরকম এক পরিস্থিতিতে সূর্যদের বাড়ির সোনার প্রদীপটি বিক্রির কথা উঠলে সূর্যরা প্রদীপটিকে দেখতে চেয়েছে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিচারে, কিন্তু ওই একই প্রদীপের মূল্য গণনাথের কাছে ‘অমূল্য’, তাই কোনও কিছু বিনিময়ে এটিকে সে বিক্রি করতে চায় না, কারণ এটির মধ্যে সে দেখতে পেয়েছে গৃহস্থ বাড়ির বংশগত ঐতিহ্যের বিষয়টিকে। এই প্রদীপটির নাম হল ‘জন্মসুখী প্রদীপ’। সূর্যদের বাড়ির প্রথা অনুসারে বাড়ির কেউ নতুন জন্মগ্রহণ করলে চৌকাঠের সামনে এটিকে জ্বালানো হয়। গৃহে নতুন সদস্যের আগমন হলে তার যাবতীয় মঙ্গল কামনার জন্যই এটিকে জ্বালানো হয়। কিন্তু সূর্যদের প্রজন্ম স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে, তাই প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে যে মহৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে তা বোধগম্য হয় না তার। সূর্যরা ভাবতে পারে না তাদের ভালোলাগা ও আশা আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে বলে। সেই কারণেই এই উপন্যাসে এই স্বর্ণ প্রদীপটিকে নিয়ে ঠাট্টা রয়েছে। গণনাথ এইরকম এক পরিস্থিতিতে বহু মূল্য এই প্রদীপটিকে বিক্রি করে দিতে পারে না। আবার সূর্যর হাতেও সেইটি নিশ্চিন্তে তুলে দিতে পারে না, কারণ সূর্য যদি প্রদীপটি বিক্রি করে দেয়, তবে হারিয়ে যাবে বংশ-পরম্পরাক্রমে ঐতিহ্যের ইতিহাসটি। ভাবনার এই জায়গা থেকে প্রদীপটিকে নিজের কাছে রেখে দেয় গণনাথ। পরিবর্তে অল্প কিছু টাকা ধীরে ধীরে সূর্যের হাতে তুলে দেয় সে। অনেক অপমান সত্ত্বেও প্রদীপকে বিক্রির পথে পা বাড়ায় না সে। মান সম্মানের বোধ তাকে পীড়িত করে। তাই সূর্যর পারিবারিক মঙ্গলের প্রতীক প্রদীপটা যখন যমুনা নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য বেঁচে দেয় তখন চোর হিসাবে ধরা খাওয়ার অপমানেই হোক অথবা এতদিনের সঞ্চিত মূল্যবোধ প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়াতেই হোক আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে হয় গণনাথকে। মৃত গণনাথকে দেখে সূর্যদের বলে উঠতে হয়:

গণাদা, মাইরি গণাদা, আমরা তোমায় মারিনি, মেরেছি? আমাদের জন্যে তুমি মরলে? কেন মরলে? মানে লেগেছিল? সম্মানে লেগেছিল? আমাদের কাছে চোটা বনে গিয়ে সহ্য করতে পারিনি! বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল? তুমি মাইরি, আজব মাল! কেন যে পিদ্দিমটা রেখেছিলে কে জানে! ওটা গেল তো কি হল তোমার, তা বলে আফিং খাবে...? গণাদা, গণাদা, এই শালা গণাদা...^{২৩}

গণনাথ কিন্তু বাস্তবিক অর্থেই আমাদের কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। গণনাথকে আমাদের আধুনিক যুগের কৃষ্ণ হিসাবেই ভাবতে ভালো লাগে। আসলে গান্ধারীর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাওয়া যাদব নগরী ও যদুবংশের সঙ্গে ছয়ের দশকের পশ্চিমবঙ্গ ও গণনাথের ভূমিকার মধ্যে মিল রয়ে যায় কোথাও। কৃষ্ণের জীবনের শেষ অংশের সঙ্গে গণনাথ অনেকটাই মিলে যায় আমাদের কাছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক বিমল কর তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণের সঙ্গে গণনাথের মিল থাকার বিষয়টি একেবারেই অস্বীকার করেছেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই উপন্যাসটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিমল কর জানিয়েছিলেন—

প্রশ্ন- কৃষ্ণের এই ট্রাজেডির চেহারাটা কি আপনি যদুবংশ উপন্যাসের গণনাথের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চাননি?

উত্তর- না, গণনাথ খুব রিয়েল চরিত্র। ওর মধ্যে কোন মিথ নেই। মানুষ তো এরকমই হয়। গণনাথ একজন ভালোমানুষ-গুড ম্যান।

প্রশ্ন- কিন্তু উপন্যাসের নাম তো যদুবংশ। তাতে তো পুরাণ প্রসঙ্গ এসেই যায়।

উত্তর- যদু বংশ ধ্বংস হয়েছিল নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেই তো, সেভাবেই তো এরা নিজেদের নষ্ট করেছে। সবদিক থেকে তারা অধঃপতিত হয়ে গিয়েছিল— সোসালি এবং পলিটিক্যালি। কৃষ্ণের পায়ে একটা তীর এসে বিঁধল ওটা গল্প, আসলে নিজেদের ভিতরেই তারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।^{২৪}

আসলে ছয়ের দশকের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। একদিকে দেশভাগের ফলে অর্থনৈতিক অবনমন হয়েছে, তার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও খুব একটা ভালো ছিল না। তাই এই সময়ে যুবসমাজ কোনও আলোর দিশা খুঁজে পায় নি। সেই কারণেই মহাভারতের যদুবংশ ধ্বংসের বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি যথা সূর্য, অভয়, বুললি এবং কৃপাময় যথেষ্ট পরিমাণেই হতাশ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়ে যায় একটি কোণ। যে কোণটি কিন্তু বাস্তবিক অর্থেই তাদের আশা ও ভরসার জায়গা। যেমন ধরা যাক বুললি ভালোবাসে আভাকে, তাকে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে ভালোবাসে সে। কৃপাময় ভালোবাসে তার ছোট কাকার স্ত্রীকে, যে কাকার স্ত্রীকে তার কাকা একেবারেই ভালোবাসে না। সেই কারণেই এই ছোট

কাকিমার কাছেই মানসিক আশ্রয়ের জায়গা খুঁজতে চায় সে। আবার অভয়ের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাই বন্ধুর বাবার সঙ্গে তার নিজের বাবার তুলনা টানলে অভয়ের পিতা অনেক অংশে অত্যন্ত সৎ মানুষ। তাই উপন্যাসের একটি অংশে আমরা তার মধ্যে গর্বের অনুভূতিও পেয়েছি। দিদির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাকলেও সূর্য তার পঙ্গু ভাগনাকে ভালোবাসে এবং তার প্রতি স্নেহ ও করুণার ছোঁয়াও আমরা দেখতে পাই। ফলে এটি সহজেই বোঝা যায় যে উপন্যাসের চরিত্রগুলি কালের প্রভাবে সাময়িকভাবে পথ হারালেও একেবারে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় নি। সেই কারণে গণনাথের মৃত্যুতে এরা সবাই অল্প হলেও কষ্ট পেয়েছে। মহাভারতের যদুবংশ ধ্বংসের আখ্যানকে মাথায় রেখে বিমল করে'র এই উপন্যাসটি যথার্থ অর্থেই মহাভারতের নবনির্মাণ হয়ে উঠেছে।

বিমল করে'র অন্যতম মহাভারতীয় বিখ্যাত উপন্যাস *এই বেদনায়, বিষাদে*। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাসটি। বিমল কর তাঁর অনেক লেখাতেই মহাভারতের অনুষঙ্গকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। ভাবনার এই জায়গা থেকেই কখনো তিনি মহাভারতীয় কাহিনিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, আবার কখনো বিনির্মাণও করেছেন। আসলে মহাভারতীয় চরিত্র হিসাবে কৃষ্ণ খুবই বহুস্তরীয় ও বহুমাত্রিক বলেই আমাদের মনে হয়। আসলে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার নিদর্শন রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেখানে কৃষ্ণের মধ্যে আদর্শ মানুষের গুণাবলী খুঁজে দেখতে চেয়েছেন, সেখানেই বুদ্ধদেব বসু কৃষ্ণকে দেবতা হিসাবে নয়, বরং মানুষ হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। আমরা পরের অধ্যায়গুলিতে আরও বিস্তারিত উপস্থাপন করেছি যে, মহাভারতের দুই তিনটি জায়গার প্রসঙ্গ বাদ দিলে সমগ্র মহাকাব্যে কৃষ্ণ একজন মানুষ হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। যে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ্যে মেনেও নিয়েছে, প্রবল পরাক্রমশালী জরাসন্ধকে কৃষ্ণ নিজে পরাজিত ও নিধন করতে সক্ষম হয় নি। সাহায্য নিতে হয়েছে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের শারীরিক বলের এবং অবশ্যই কৃষ্ণের নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত কূটনীতির। মহাভারতে এমন অনেক ঘটনাই আছে যা কৃষ্ণের দ্বারা করা সম্ভব হয় নি, আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সফলতা এসেছে শুধুমাত্র কৃষ্ণের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। ভাবনার সেই জায়গা থেকে কৃষ্ণকে আমরা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু'র জায়গা থেকেই বিচার করতে অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করি। মানব জীবনের অনেক না মেলা প্রশ্নের সমাধান এবং রহস্যের সমাধান অনুসন্ধানের জন্য বারবার ফিরে আসে কৃষ্ণের কথা। তাই বিমল করে'র *এই বেদনায়, বিষাদে* উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে ভারতীয় উপমহাদেশের জনপ্রিয় একটি ঐতিহাসিক তথা পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণ।

এই উপন্যাসে সুখী দাম্পত্যের আড়ালে দেখানো হয়েছে ভেতরের বেদনা ও বিষাদে পরিপূর্ণ একটি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে। একটি সুখী ও প্রেমময় দাম্পত্যের জীবন, যা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় অটুট ও পরিপূর্ণ, কিন্তু তার ভেতরে রয়ে যায় কোথাও অদৃশ্য ফাটল ও বেদনা। এভাবেই পরিচিত ছন্দের তাল বাজতে বাজতে কোথাও যেন কেটে যায়। ফলে পরিচিত ছন্দ হয়ে পড়ে ছন্দহীন। মহাভারতের অনুষ্ঙ্গকে মাথায় রেখেই বিমল কর তাঁর *এই বেদনায়, বিষাদে* উপন্যাসটি লিখেছেন।

আসলে *এই বেদনায়, বিষাদে* উপন্যাসটিতে জড়িয়ে আছে দু'টি মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ। এদের মধ্যে একজন নীরজা এবং অন্যজন হেমেন। নীরজার হেমেনের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে অন্যত্র বিয়ে হয়েছিল। যদিও সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয় নি। পরবর্তী সময়ে হেমেনের সঙ্গে নীরজার বিয়ে হলেও আজ তারা একই বাড়িতে অবস্থিত নির্জন দু'টি দ্বীপ। জীবনে চলার পথে এগোতে এগোতে কখন যেন ছন্দের তাল কেটে গেছে। তাই একই বাড়িতে অবস্থান করলেও দু'টি মানুষের মধ্যে স্বামী স্ত্রী হিসাবে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক একেবারেই নেই। তবে স্বামী হিসাবে হেমেন কখনো তার স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করে নি, কিন্তু স্ত্রীর অতীত সম্পর্ক তাকে স্বস্তি দেয় না। তাই কখনো মুখ ফুটে কিছু না বললেও পরিপূর্ণভাবে নীরজাকে মেনে নিতে সে পারে না। সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ও সংকট কাজ করে।

নীরজার পূর্বের জীবন সংকটে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক অত্যাচার ও অনাকাঙ্ক্ষিত কথা শুনতে হয়েছে তাকে, কিন্তু বর্তমানে স্বামী ও সন্তান সহযোগে ভালোই জীবন কাটছিল তার। সমস্ত কিছু যখন সাধারণ গতিতেই এগিয়ে চলছিল তখন সপরিবার আবহাওয়া বদল এর জন্য বাইরে যায় তারা। বাড়ি ফেরার সময়ে তারা যখন কাশী হয়ে ফেরে তখন পূর্বের ঘটনা নীরজার স্মৃতিতে উঠে আসে। প্রায় তিন দশক পর নীরজা মুখোমুখি হয়েছিল বরদাবাবুর সঙ্গে, যে সম্পর্কে ননদাই হয় তার। এরই ফলে নীরজার মনে উঠে আসে পূর্ব জীবনের শ্বশুরবাড়ির কথা। তার স্বামী ছিল তিন শরিকের বাড়ির ছোট মহলের ছোটবাবু। এই ছোটবাবু পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত ছিল মেজো মহলের পান ও আফিং খাওয়া বৌদির সঙ্গে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অতীতের সেই দাম্পত্য সম্পর্ক পরিপূর্ণতা পায় নি। অসহ্য যন্ত্রণায় ও বেদনায় নীরজা সেই স্বামী ও স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। এমনকী সে অতিক্রম করে যায় সামাজিক রীতিনীতি ও বাধ্যবাধকতার সবকিছুকেই। ননদাই বরদাবাবুর সঙ্গে গোপন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায় নীরজা। হয়তো এই গোপন সম্পর্কের মাধ্যমেই সে প্রাক্তন স্বামী ও সমাজের প্রতি তার যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল। যদিও বর্তমান স্বামী হেমেনের কাছে কিছুই গোপন রাখে নি সে, তার অতীতের সমস্ত ঘটনার কথাই বর্তমান স্বামী জানে। কিন্তু ননদাই বরদাবাবুর সঙ্গে সম্পর্কের দিকটি পরিপূর্ণভাবে নীরজা তার স্বামীকে জানায় নি। কিন্তু কাশীতে সেই ঘটনার আভাস পেয়েই হেমেন নিজেকে গুটিয়ে

নিয়েছিল বলে মনে হয়। যদিও এই ঘটনার বা প্রসঙ্গের সমর্থনে উপন্যাসে সরাসরি কিছু বলা নেই, কিন্তু উপন্যাসটি পড়া শেষ করলে পাঠকের এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ নিজের স্ত্রীর প্রতি হেমেনের গভীর অভিমান হয়ে থাকতেই পারে। তাই বাড়ির মধ্যে থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে পরিণত করেছিল সে।

আমরা আলোচনার শুরুতে কৃষ্ণের বিষয়ে কথা বলেছিলাম। বাঙালি চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের কৃষ্ণকে নিয়ে একাধিক বৌদ্ধিক নির্মাণ আমরা পড়েছি, মুগ্ধও হয়েছি। এইবার বিমল করে'র *এই বেদনায়, বিষাদে* উপন্যাসেও অন্য কৃষ্ণের একটি রূপ আমরা দেখতে পাই। এখানে নীরজার স্বামী হেমেনের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণকে অন্যভাবে দেখার দৃষ্টিকোণটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। তাদের উভয়ের অতীত সম্পর্কের গ্লানি তাদের মধ্যেই ছিল, তবুও সেইটি স্বীকার করেও তাকে অতিক্রম করতে চাওয়ার প্রয়াস আছে এখানে। কিন্তু ভাগ্যকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা হেমেনের ছিল না। তাই হয়তো কৃষ্ণের ট্রাজিক রূপটিকেই তার বেশি পছন্দ। তাই বাড়িতে একটি সন্ধ্যাকালীন আড্ডায় হেমেন কৃষ্ণ সম্পর্কে তার ধারণার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছে:

কৃষ্ণ যদি সর্বজ্ঞ হন তা হলে কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধটা থামাতে পারলেন না কেন? শান্তির চেষ্টা উনি করেছিলেন দু-পক্ষের মধ্যে, পারেননি। কেন পারলেন না? যিনি নিজেকে সর্বময়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের একমাত্র নিয়ামক মনে করেন, যিনি বলেন তিনি মহাকাল, তিনি লোকক্ষয়কারী, আবার তিনি জীবজগতের পালক— কেন তিনি শেষ পর্যন্ত কৌরব নিধনে মত্ত হয়ে উঠলেন? ধর্ম অধর্মের যুদ্ধ বলে! কিন্তু বিশ্বে যা কিছু সৎ অসৎ, ভালো-মন্দ, জন্ম মৃত্যু, হিংসা প্রেম সবই তো তাঁর মধ্যেই আছে। তিনিই বলেছেন। তবে?... আমার মনে হয় অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যতই কেন না তিনি তাঁর চেলাকে অভিভূত করুন কৃষ্ণ নিজেও ট্রাজিক হিরো। তিনি পারেননি। হয় তাঁর ক্ষমতা ছিল না নিয়তিকে আটকাবার, না হয় তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংস নিয়ে মাথা ঘামান না। আমি জানি না, তবে ঈশ্বরের যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে ধরে নিতে হবে, এই জগত জীব জন্ম মৃত্যু শোক দুঃখ আনন্দ— কোনও কিছু সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি নির্বিকার নিরাসক্ত, ধর্ম অধর্ম সবই সমান তাঁর কাছে।^{২৫}

আসলে কৃষ্ণকে আমরা বিশ্বের সমস্ত কিছুর ধারক ও বাহক হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত। যে কৃষ্ণ জীবজগতের রক্ষাকর্তা সেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। যুদ্ধে প্রাণ গেছে অসংখ্য মানুষ ও প্রাণীদের। ফলে সমসাময়িক আর্যাবর্তের বিপুল ক্ষতিকে ধারণ করে আছে এই যুদ্ধ। *এই বেদনায়, বিষাদে* উপন্যাসের কৃষ্ণ সম্পর্কে বিমল কর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন:

যদি এমনই হয় যে কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই তিনি জানেন, যিনি অর্জুনকে বলেন তুমি যাদের মারবে মনে করছো তাদের তো আমিই মেরে রেখেছি তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হও— সেই কৃষ্ণ ট্রাজিক। কেন না সব জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুই করতে পারেন না।

আমার কথা হল, কৃষ্ণ যদি ধর্মেরই প্রতীক হয়ে থাকেন তবে তিনি অধর্মেরও প্রতীক। ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভালোবাসা-কামুকতা এসবই তার মধ্যে ছিল। আমাদের শাস্ত্রে যে বলা হয় যা কিছু আছে এই পৃথিবীতে সবই তোমার মধ্যে ছিল। আলাদা করে কিছু তৈরি হয়নি এবং হবেও না। আমাদের জীবনে বোধহয় এটা স্থায়ী দ্বন্দ্ব। সৎ এবং অসৎ। এই যে ধর্মের তত্ত্বগুলো এগুলো আমি বোঝার চেষ্টা করি। সবসময় বুঝতে পারি একথা বলব না।^{২৬}

এর ফলে পাঠক মহাভারতীয় অন্যতম চরিত্র কৃষ্ণকে নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করে। সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পাঠক কৃষ্ণকে একাধিক দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করে। মহাভারতের কৃষ্ণ যেমন অনেক চেষ্টা করেও যাদব বংশকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে নি, ঠিক তেমনি হেমেনও চেষ্টা করে তা পারে না। তবে মহাভারতের কৃষ্ণের মতো এই উপন্যাসের হেমেনেরও সবকিছুই নেতিবাচক হয় না, তারও কিছু প্রাপ্তি থেকেই যায়। যেমন উপন্যাস শেষ হয় না দাম্পত্য সম্পর্কের বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। পারিবারিক সমস্যা, সংকট থেকে মুক্তির জন্য নীরজা বারবার আশ্রমে ছুটে গেছে। মায়ের পদ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে পারিবারিক কষ্ট ও বেদনা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু সেই স্ত্রী নীরজাই একসময় অসুস্থ স্বামীর পাশে বসে অনুভব করে যে, শুধু বিশ্বাসেই ভগবান হয় না। ভালোবাসা ছাড়া কে বা কারা তাকে বুঝতে পারে? সম্পর্কের মধ্যে অনেক সমস্যা, সংকট ও বেদনা থাকা সত্ত্বেও যদি পরস্পরের মধ্যে প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হয়, তবে অনেক ঝড় সামলেও ভালোভাবে বাঁচা সম্ভব।

বিমল করে'র *শমীক* একটি অন্যতম মহাভারতমূলক উপন্যাস। বিমল কর এই উপন্যাসে আধুনিকতার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় পুরাণের নতুন জন্ম দিয়েছেন। এরই সঙ্গে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং সেইটি থেকে জন্ম নেওয়া বিদ্রোহ। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন:

একটা কথা আমি বিশ্বাস করেছি। বিশ্বাস করেছি— পূর্বতন অনেক মতামত, চিন্তা, অভ্যাস, অন্যায়, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং আরও অনেক কিছুই ধারাবাহিক উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছি আমরা। এসবের নতুন করে বিচার হওয়া উচিত। দেখা উচিত, এর কতটা খাদ মেশানো আর কতটা আসল সোনা। সব কিছু অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহ্য তো একদিনে বা একা কেউ গড়ে দিয়ে যায়নি। কাজেই বোধবুদ্ধি বিচার সম্বল করে বর্জন করতে হবে যা বর্জনীয়, গ্রহণ করতে হবে যা গ্রহণযোগ্য।^{২৭}

যাই হোক, এসব ভাবনা মাথায় ছিল বলে পরবর্তী একসময়— *শমীক* বলে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম দেশ শারদীয় সংখ্যায়। ওটা আমার নিজের মনের কথা।^{২৮}

মহাভারতের আদিপর্বে শমীক মুনির কথা আমরা জানতে পারি। বিমল করে'র এই উপন্যাসে মহাভারতীয় অনুষ্ণ আলোচনার পূর্বে মহাভারতে শমীক মুনির কাহিনিটি আমরা একটু জেনে নেব। মহারাজ পরীক্ষিৎ একবার মৃগয়া করার জন্য গভীর অরণ্যে সঙ্গীদের নিয়ে প্রবেশ করে। কিছুদূর যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অরণ্যের পথ হারিয়ে ফেলে রাজা। ফলে যখন সঙ্গী সাথীদের একেবারেই দেখা পাচ্ছিল না রাজা, তখন পরীক্ষিৎ গভীর তৃষ্ণায় এবং একটু বিশ্রামের আশায় শমীক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে। কিন্তু মুনি নিজে ছিল গভীর ধ্যানে মগ্ন এবং ধ্যানের জন্যই মুনি মৌনব্রত ধারণ করেছিল। কিন্তু রাজা নিজে বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। তাই বারবার বিশ্রাম ও তৃষ্ণার বিষয়টি মুনিকে জানালেও শমীক নিরুত্তরই থাকে। রাজার সমস্যার সমাধান হয় না। ফলে ক্রোধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে রাজা পরীক্ষিৎ। এরই ফলে মুনির গলায় একটি মৃত সর্প জড়িয়ে দিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে যায় পরীক্ষিৎ। এই আচরণ সম্পর্কে মুনি ক্রুদ্ধ না হলেও তার সন্তান শৃঙ্গী অত্যন্ত ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দেয় যে, তার সম্মানীয় পিতার প্রতি যে এই কাজটি করেছে, তার আগামী সাত দিনের মধ্যে মহাবিষধর সর্প তক্ষকের দংশনে মৃত্যু হবে। কিন্তু মুনি তার পুত্রের দেওয়া এই অভিশাপে বিরক্ত হয় এবং পুত্রকে বলে এই অন্যায় কাজ করা তার উচিত হয় নি। কারণ রাজা এইরূপ আচরণ করেছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায়, ঋষির মৌনব্রত সম্পর্কে তার জানা ছিল না। অন্যদিকে এই রাজার রাজত্বেই মুনি সপরিবার বসবাস করে। তাই যিনি রক্ষক এবং আশ্রয়দাতা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে চায় নি শমীক। যদিও এর পরে পিতার নির্দেশে শৃঙ্গী রাজার নিকটে গিয়ে এই অভিশাপের বিষয়ে বিশদ ঘটনার বিবরণী দিয়ে এসেছিল এবং ভবিষ্যতে এর ফলাফল কী হতে পারে- তার সম্পর্কেও সচেতন করে এসেছিল শৃঙ্গী।

কিন্তু বিমল কর আধুনিক যুগের মানুষ তথা ঔপন্যাসিক। তাই তাঁর উপন্যাসে শমীক চরিত্রটি প্রশ্ন তোলে এই সমাজের দুর্নীতি, অপরাধ ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে। আর এই জিজ্ঞাসা থেকে বাদ যায় না তার নিজের পূর্বপুরুষেরাও। মহাভারতের শমীক মুনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছিল রাজাকে, রাজার কর্মের জন্য তাকে অভিশাপ দেয় নি। কিন্তু বিমল করে'র শমীক মহাভারতের চরিত্র থেকে একেবারে আলাদা। এই যুগের শমীকেরা প্রতিবাদ করে, দৃষ্ট কণ্ঠে সবাইকে জানিয়ে দেয় যে সমাজে তারা সবাই বসবাস করে সেইটি নষ্ট হয়ে গেছে। সামাজিক অবনমন ঘটেছে সমাজে। সে আরও জানান দেয় যে, দীর্ঘকাল ধরে নানান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতায় যে সমাজ আজ গড়ে উঠেছে ভাঙনের পথ ধরে তা অতি দ্রুতই ভেঙে যাবে। উপন্যাসটিতে একাধিক চরিত্র থাকলেও শমীক চরিত্রটি প্রধান হয়ে উঠেছে। যে পরিবারের কথা উপন্যাসে বলা হয়েছে সেইটি চারটি বংশ পরম্পরায় কলকাতায় বসবাস করে এসেছে। যদিও এর পূর্বে এই বংশের আদি বসবাসস্থল ছিল বর্ধমান। ভারত যে সময় স্বাধীনতা লাভ করে সেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসেই শমীকও জন্মগ্রহণ করেছিল। অন্যান্য অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের

মতো সেও চেয়েছিল সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে। অনেকদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক নিয়ম-কানুনের মুক্তির কথাও ভেবেছিল। জঞ্জাল এবং নোংরায় পরিপূর্ণ সমাজের মধ্যে প্রাণের সঞ্চারণ ঘটাতে চেয়েছিল সে। জন্মের সময় থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে তার বেড়ে ওঠা হয় নি। মাঝখানে অনেক বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। যেমন জন্মের সময় নাড়িটি তার গলায় অদ্ভুতভাবে পেঁচিয়ে গিয়েছিল, ফলে জন্মের সময় অন্যান্য স্বাভাবিক বাচ্চার মতো তার শরীরের রং ছিল না। তা সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে বেঁচে যায় সে। আবার জীবনে চলার পথেও তার ভাবনা অন্যান্যদের মতো ছিল না। বরাবর বাকিদের থেকে আলাদা কিছু করতে চেয়েছে সে। তারই ফল হিসাবে পরবর্তী সময়ে আত্মজিজ্ঞাসা, নিজের শিকড়ের প্রতি অন্বেষণ প্রভৃতি তাকে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করে তুলেছে। আসলে একটা ছন্দময় ও নিরাপদ জীবন শমীক বেছে নেয় নি। তাই পড়াশুনোর শেষে কাকুর সঙ্গে কোর্টে যায় না সে, বরং উদগ্রীব হয়ে ওঠে বহুদিনের প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙার জন্য। উপন্যাসের কাহিনি যত এগিয়েছে তত আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি শমীকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

শমীকের পূর্বপুরুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ, আশ্রয় এবং আহার নিশ্চিত করে গেছে। বিভিন্ন অসৎ উপায় অবলম্বন করে তার পূর্বপুরুষেরা অতিরিক্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছে, বর্তমান পরিবারে অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে জানলেও আদতে কেউই মুখ খোলে না। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া ধন সম্পত্তি ভোগের পেছনেই সবাই দৌড়াচ্ছে। কিন্তু শমীকের হাত ধরেই আমরা প্রথমে দেখতে পাই অনেক কম সময়ে কীভাবে একজন ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত সম্পত্তির মালিক হতে পারে! যদিও পরিবারে এই সম্পত্তি এসেছে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে নয়, বরং কখনও উচ্চ শ্রেণির মানুষদের তোষামোদ করে কিংবা কখনও ক্ষমতাবানদের অন্যায়াভাবে কিছু পাইয়ে দিয়ে। পরিবারের সবাই যখন এই অর্থ ও প্রাচুর্যে দম্ভ প্রকাশ করতে পিছিয়ে যায় না, তখন শমীক সচেতনভাবে এই সকল বিষয়গুলিকে ত্যাগ করে দূরে সরিয়ে দেয়। সমালোচনা করতে পারে তার ঠাকুরদার বাবা সম্পর্কে। শমীক পরিবারের সবাইয়ের সামনে জানায় যে, একটা লোক গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে জুটেছিল কিছু অল্প বস্ত্রের নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু তার ভাগ্যে জুটে গেল পেশকারী। ...সাড়ে চার টাকায় বাসাবাড়ি ভাড়া করে যে জীবন শুরু করেছিল সেই লোক পেশকারী করে এই কলকাতায় বাড়ি করে ফেলল— আরেকবার, লোকটাকে চোর না বলে বলা উচিত ডাকাত।^{২৯}

তবে যুক্তিপূর্ণ ভাবনা দিয়ে এই বিষয়টিকে ভাবা হয় না। পূর্বপুরুষের সম্পর্কে যখন পরিবারে কেউই প্রশ্ন তোলে না, অশ্রদ্ধা করে না, প্রচলিত রীতিতে যখন সবাই গা ভাসাতে ব্যস্ত তখন অলিখিত এই নিয়মের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ শমীক নিজে। পূর্বপুরুষ তথা বাবা ও ঠাকুরদারা যেভাবেই হোক সংসারের একটি ভিত্তি গড়ে দিয়েছে, পরবর্তী সময়ে কালের নিয়মে

সেই সংসারের মধ্যে এসেছে দেবপ্রসাদ ও চারুপ্রসাদরা। তবে তাদের মধ্যে পূর্বপুরুষের সম্পত্তির আধিক্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন দেখা যায় নি, অন্যদিকে শমীক কিন্তু সুখী মনে সম্পত্তির আধিক্য মেনে নিতে পারে না। খুঁজে দেখতে চেয়েছে তাদের এরূপ সম্পত্তি হওয়ার পেছনে আয়ের উৎস কী ছিল। সেই বিষয়টিকে খুঁজে দেখতে গিয়ে সে বুঝতে পারে ঠাকুরদার কুকীর্তির কথা। শুধু তাই নয়, উপন্যাসে উঠে এসেছে ঠাকুরদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও। উপন্যাসে আমরা জানতে পারি তার ঠাকুরদা রাত তিনটের সময় ঘোড়ার গাড়িতে করে বাইরে আমোদ সেরে বাড়ি ফিরত। অন্যদিকে তার ১৬-১৭ বছরের পত্নী স্বামীর অপেক্ষায় জেগে থাকত। শুধুমাত্র নিজের সুখ ও ইচ্ছার জন্য এমনটা করে গেছে ঈশ্বরদাস। উপন্যাসে এই নিয়ে বলা হয়েছে:

আমার মহামান্য ঠাকুরদা কাউন্সিলার বলরামবাবুকে নানারকম ভেট দিত, গাড়ি কিনে দিয়েছিল, তার বদলে বেনামী একটা ব্যবসা চালাত, কর্পোরেশনের ছকুমে যত ঘরবাড়ি ভাঙা হত তার দু-দশটা ঠাকুরদার কাছে আসত। শুধু সম্পত্তিই নয়, ঠাকুরদার চারিত্রিক ক্রটিও সে খুঁজে বের করে— ‘তোমার শ্বশুরমশাই তার প্রথম স্ত্রীকে তিলে তিলে মেরেছে।’^{৩০}

এভাবে পরিবারের মধ্যে ঢুকে থাকা স্বার্থপরতার ইতিহাস টেনে বের করে আনে শমীক। আমরা দেখতে পাই অর্থের আধিক্যের জন্য বিবাহ পর্যন্ত প্রভাবিত হয়। যথার্থ ভালবাসাকে মূল্য দেওয়া হয় না। অর্থের কাছে হেরে যায় মানুষের ভালোবাসা। আমরা দেখতে পাই চারুপ্রসাদের মেয়ে পূর্ববীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মৃগাক্ষের, কিন্তু তার চাকরি খুবই সাধারণ মানের হওয়ার জন্য উভয়ের মধ্যে বিবাহ শেষ পর্যন্ত হয় না। বিবাহ ভেঙে যায়। পূর্ববীর ভালোলাগা ও খারাপলাগার বিষয়টি একেবারেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে চারুপ্রসাদের মেয়ের বিয়ে হয় উচ্চপদে আসীন একজন অফিসারের সঙ্গে। মৃগাক্ষ রাজনীতি করে বলে তার সঙ্গে বিবাহে অনিচ্ছুক চারুপ্রসাদের পরিবার। কিন্তু শমীক ধরে ফেলে তাদের পরিবারের মধ্যে থাকা দ্বিচারিতার বিষয়টি। তাই উপন্যাসে এই বিষয়ে উঠে এসেছে:

মৃগাক্ষ পলিটিক্স করে বলে অপাত্র, আর তোমাদের মেজ জামাইয়ের বাবা যে ওই পলিটিক্স করেই নেতা হয়ে একসময়ে হাফমন্ত্রী হয়েছিল তাতে কোন দোষ হল না? আসলে পলিটিক্স করাটা কোনো ব্যাপার নয়, দেখতে হবে কোন দলের পলিটিক্স করছে? যদি দেখ যে পলিটিক্স করায় সুবিধে তা হলে হাত বাড়াও, যদি বোঝা ঝুঁকি আছে— তবে হাত সরিয়ে নাও।^{৩১}

উপন্যাসের একটি বড়ো অংশ জুড়ে শমীকের অন্বেষণ আমাদের মুগ্ধ করে। তার এই অন্বেষণ শেষ পর্যন্ত পরিবারের মধ্যে ঢুকে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে শমীক উন্মোচন করতে থাকে ঘরের মধ্যে থাকা দুর্নীতি, অপরাধ, লোভ এবং লালসার ইতিহাসকে। এভাবে একদিন পুরনো বইয়ের দোকানে শমীক খুঁজে পায় *দিস ইজ ফর মাইসেলফ* নামক বইটিকে। এই বইয়ের সুএই সে নিজেকে আত্ম জিজ্ঞাসার পথে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন এই বইটি তাকে

বেশ কিছু জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করায়। যেমন ধরা যাক— দেশপ্রেমের স্বরূপ কি? দেশকে ভালোবেসে মৃত্যুবরণ করলেই কি দেশপ্রেমী হওয়া যায়? যদি তাই হয়, তবে হিটলারের হাতে হওয়া অসংখ্য মানুষের মৃত্যু কি হিটলারকে শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমী আখ্যা দেবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সে চলে আসে নিজের পরিবারের মধ্যে। এভাবেই নিজের পরিবারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের অনাচার ও অবিচারের খেলাটাও সে ধরতে চায়। মহাভারতের শমীক মুনিকে আমরা দেখেছি ক্ষমা করতে, কিন্তু বিমল করে'র শমীক ক্ষমা করে না, বরং প্রতিবাদী হয়ে নিজের পরিবার ও সমাজের ত্রুটি সবার সামনে উপস্থাপন করে। এই শমীক বিশ্বাস করে যে, গতানুগতিক চলে আসা বিষয়কে যদি প্রশ্ন দেওয়া হয়, তবে তা ধীরে ধীরে সভ্যতাকে গ্রাস করে নেবে। আমাদের চারিদিকে থাকা ভালোত্বকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই সমস্যা, সংকট ও দ্বন্দ্ব যথার্থ ভুলটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো দরকার। বিমল করে'র শমীক সেটাই করতে চেয়েছে এবং করেছে। মানুষের সভ্যতাকে বাঁচাতে গেলে যা কিছু ক্ষতিকর তাকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে। আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মহাভারতের শমীকের থেকে বিমল করে'র শমীক আলাদা হয়ে যায়। সমগ্র মহাভারতে শমীক মুনি নিজে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নয়, কিন্তু এই উপন্যাসে তার চোখ দিয়েই আমরা নানান আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছি। তাই এই উপন্যাসে শমীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। বিমল কর এখানে মিথের পুনর্নির্মাণ করেছেন। এভাবেই শমীক চরিত্রটি সমকালের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান তুলে ধরে। যে অবস্থানের মধ্যে কোনও আপোষ নেই, বরং দ্বিচারিতায় পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটি শমীক আমাদের দেখিয়েছে।

বিমল করে'র *অসময়* উপন্যাসটিতেও এসেছে মহাভারতের অনুষ্ঙ্গ। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। এই উপন্যাসটিতে মহাভারতের কথা আসে অবিনের মৃত্যুচেতনা প্রসঙ্গে। সমগ্র উপন্যাসে এই অংশটি খুব কম জায়গা জুড়েই আছে। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অবিনকে বোঝার জন্য এই অংশটির গুরুত্ব খুবই বেশি। অবিন চরিত্রটির মাধ্যমে মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবনের পূর্ণতার দিকেই দৃষ্টি ফেরাতে চান লেখক বিমল কর। সেই কারণে শচিপতি যখন জিজ্ঞাসা করে তাকে যে, মৃত্যু সম্পর্কে অবিনের ভাবনা কী? তখন সে উত্তর দেয় জীবন সম্পর্কেই ভাবতে পারছি না, আবার মৃত্যু! আসলে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো মৃত্যুও মহাভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। মহাভারতের মৃত্যু নানারকমভাবে এসেছে। যদি ধরা যায় কর্ণের কথা, তাহলে আমরা দেখব যে কর্ণের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয় নি। তার এই অভিশপ্ত মৃত্যুতে পাঠকের মাঝে করুণ রসের আগমন ঘটে। সারা জীবন ধরে বীরত্বের সঙ্গে কাজ করে চলা কর্ণ জীবনের শেষে অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে। গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের নামগুলি ও মন্ত্র তার মনে আসছিল না, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের অভিশাপে রথের চাকা তার বসে যায়। এরকম অবস্থায় তাকে হত্যা করতে গেলে কর্ণ অর্জুনকে বাধা দেয়। এরূপ অবস্থায়

কর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালনের কথাও তাকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু অর্জুন সেই কথায় কান না দিয়ে কর্ণকে হত্যা করে। মহাভারতের পাঠকের কাছে এই মৃত্যু কর্ণকে হিরো বা নায়ক করে তোলে। পরাজিত হয়েও এই মৃত্যু মহাভারতে তাকে অন্যতম বীরের মর্যাদা দিয়েছে, করে তুলেছে প্রথম শ্রেণির যোদ্ধা। মহাভারতের যুদ্ধে হেরেও সে জয় করে নিয়েছে পাঠকের হৃদয়।

অন্যদিকে পাণ্ডুর প্রতি নজর দিলে আমরা দেখতে পাই তার মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবে হয় নি। অরণ্যে ভ্রমণকালে সে একটি হরিণকে শরবিদ্ধ করে মেরে ফেলে। এই হরিণ মৃত্যুকালে মৈথুন ক্রীড়ায় রত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুকালে সেই হরিণ নিজের স্বরূপে এসে পাণ্ডুকে জানায় যে তার নাম কিম্বিন্দম মুনি, পুত্রের কামনায় স্ত্রীর সঙ্গে হরিণ রূপ ধারণ করে সহবাস করছিল সে, পাণ্ডুর জন্যই তাকে যেহেতু মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তাই তাকে অভিশাপ পেতে হয় যে স্ত্রী সঙ্গমকালে একইভাবে তারও মৃত্যু হবে। যে কারণে পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তী ও মাদ্রী উভয় স্ত্রীই মিলনে বিরত ছিল। কিন্তু একদিন বসন্তকালে মাদ্রীকে দেখে পাণ্ডু কামনায় নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে উভয়ের মিলন ঘটে এবং পাণ্ডু স্বাভাবিক নিয়মেই মারা যায়।

আসলে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন জীবনটাই তার কাছে সত্য। এই ধারণাতেই অর্জুন বিশ্বাসী। পৃথিবীতে অন্ধকার আছে বলেই আলোকে আমরা ভালোবাসি, তাই অন্ধকারকে আমরা ভয় পাই। তেমনভাবেই মৃত্যুর বেড়াজাল আছে বলে আমরা জীবনকে চিনতে পারি। জীবনের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করি মৃত্যুর জন্যই। এই বিশাল পৃথিবীতে একদিন আমরা হারিয়ে যাব, আমাদের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না, এমনকী আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও আমাদের নিয়ে চিন্তিত হবে না, এই ভয়ংকর কথা ভাবলে আমাদের মধ্যে শিহরণ জেগে ওঠে, তখনই আমাদের মধ্যে বাঁচার তাগিদ বড়ো হয়ে দেখা দেয়। আমরা তখন গভীরভাবে বাঁচার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তাই এই জীবনের পাশাপাশি মৃত্যু নিয়েও অর্জুনের রয়ে যায় নিজস্ব কিছু ভাবনা। উপন্যাসের একটি অংশে তাই অর্জুন জানায় যে:

মহাভারতে নানারকম মৃত্যু আছে। যেমন ধরো পাণ্ডু একভাবে মরেছে, কর্ণ একভাবে, আবার মহাপ্রস্থানে যেতে গিয়ে এক একজন একেক ভাবে পড়ে যাচ্ছে।^{৩২}

প্রত্যেকটা মৃত্যুই মহাভারতে পাঠকের কাছে একাধিক বার্তা নিয়ে আসে। এর মধ্যে পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুই বোধহয় সবচেয়ে বীভৎস। যে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কৌরব বংশের হয়ে যুদ্ধ করছে, কিন্তু হৃদয়ে পড়ে আছে যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম তথা পাণ্ডবরা। যাকে হত্যার জন্য শিখণ্ডীর সহায়তা নিতে হয়েছে। ভীষ্ম অস্ত্র ধারণ করলে স্বর্গের দেবতারাও সফল হয় না। সেখানে শিখণ্ডীর সহায়তায় অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে জয়লাভের জন্য নিজের প্রিয় পিতামহকে বধ করতে হয়। এর থেকে যন্ত্রণাদায়ক আর কী হতে পারে! তবে শুধু শারীরিক যন্ত্রণাই যে ভীষ্ম ভোগ করেছে

তা নয়। নিজের প্রিয় বংশধরদের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে তীব্র মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করেছে ভীষ্ম। আসলে অবিনের কাছে এরকম মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। আসলেই অবিন মনে করে:

কুরু বংশের খ্যাতি যতই হোক, তার দাপট দেখি ভীষ্ম থেকে। সেই মানুষটা নিজে কিছু করল না, দু-হাত বাড়িয়ে শুধু বংশধরদের আগলে গেল, তাদের কীর্তিকলাপ দেখল, ভালো-মন্দ কথা বলল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। ভীষ্মের সাধ্য হল না কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করে। এমন একটা মানুষ— যার স্নেহ, প্রেম, ধর্মবোধ, ঔদার্য, ত্যাগ, ক্ষমতা সমস্তই ছিল বিশাল, যে নিজের হাতে চারপুরুষকে আগলে রেখেছিল সেই মানুষটিই শেষ পর্যন্ত দেখল, সব নষ্ট হয়ে গেল। লোভ, অন্যায, পাপ, শঠতা, বিদ্বেষ, রক্তপাত, হানাহানি— কোনটাই তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হল না। যে সব মহৎগুণের জন্যে ভীষ্ম প্রণয়— ঠিক সেগুলোকে ভাঙার জন্যই তার বংশধররা এসেছে।^{৩৩}

আসলে অবিনের মাধ্যমে ভীষ্ম চরিত্রটিকে নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলেন লেখক। শরশয্যার বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে ভেতরের অর্থে প্রবেশ করে অবিন। তার কথায়:

আমি যদি বলি শরশয্যাটা আর কিছু নয়, ওটা মোটা মনের মানুষকে বোঝানোর জন্যে মোটা করে দাগানো ব্যাপার। আসলে যদি ভীষ্মের মনের চেহারাটা দেখানো যেত দেখতে পেতাম, তার জীবনের সবদিকে তার স্বজনরা বাছা বাছা তীর বিঁধে গেছে। ... আমরা ভাবি শরশয্যাটা নেহাতই তীরের খোঁচা, কিন্তু তা নয়, যে মানুষটা মরবে তাকে নিয়ে মহাকবির অত মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না; মানুষটাকে কুরুক্ষেত্রের মাঠে ফেলে রেখে কবি তোমাদের দেখাতে চেয়েছেন, দেখো, ওই বিরাট মানুষটার তোমরা কী দশা করেছ।^{৩৪}

মহাভারতে ভীষ্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। তাই তার মৃত্যুর প্রসঙ্গ বারবার উপন্যাসে চলে আসে। কিন্তু বিমল কর এখানে ভীষ্মের মৃত্যুর বিষয়টিকে অন্য ব্যাখ্যা দেন, ভিন্নরূপে বিষয়টিকে ভাবতে চান। উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র অবিন এবং শচিপতি। কিন্তু তাদের পরস্পরের মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা পরস্পর বিপরীতধর্মী। শচিপতি মৃত্যুকেই অধিক প্রাধান্য দেয় জীবনের থেকে, যেখানে অবিন জীবনকেই বড়ো করে দেখতে চায়। যেখানে দেহের মৃত্যুই শুধু মৃত্যু হয়ে থেকে থাকে না তার কাছে, সারা জীবন ধরে কোন মানুষ যদি কিছু চেয়েও না পায়, সেটিও মৃত্যুরই নামান্তর হয়ে থাকে। কিন্তু অবিন এখানেই থেমে থাকে না, ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে জীবনের সুর শোনাতে চায় সে। মৃত্যুর মধ্যেও সে খুঁজতে চায় মহত্ত্ব। এভাবেই বিমল কর তাঁর লেখাতে সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতির পাশাপাশি মৃত্যুকেও নতুন করে দেখে নিতে চান।

বিমল করের এই সমস্ত মহাভারতীয় উপন্যাসগুলি থেকে আধুনিক সময়কে ধরতে চেয়েছেন মহাভারতের আলোকে এবং সেগুলি যথেষ্ট প্রাণবন্তই হয়েছে। মহাভারত থেকে ভাবনার

উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি তাঁর সাহিত্যে উপযুক্ত প্রয়োগ করেছেন, এর জন্য বিমল কর নিজে মহাভারতের কালে ফিরে যান না। তাঁর যাত্রা আধুনিক মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

১.৪।। সমরেশ বসু/কালকূট (১৯২৪-১৯৮৮)

সমরেশ বসু বিশ শতকের একজন অন্যতম বিখ্যাত বাংলা কথাসাহিত্যিক। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কালজয়ী গল্প ও উপন্যাস তিনি লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে খ্যাতিমান এই মানুষটির জন্ম ঢাকার রাজনগরে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর শৈশব কাটে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে আর কৈশোর কাটে কলকাতার উপকণ্ঠে নৈহাটিতে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। এক সময় মাথায় ফেরি করে ডিম বেচতেন। বিচিত্র বিষয় এবং আগ্রিকে নিত্য ও আমৃত্যু ক্রিয়াশীল লেখকের নাম সমরেশ বসু। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইছাপুরের গান ফাঙ্কুরিতে কাজ করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির এক জন সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। এ কারণে তাঁকে ১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে জেলও খাটতে হয়। তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস *উত্তরঙ্গ* রচনা করেন জেলখানায়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ‘কালকূট’ ছদ্মনামে লেখা *শাস্ত্র* উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। কালকূট মানে তীব্র বিষ। এটি তাঁর ছদ্মনাম। *অমৃত কুন্ডের সন্ধানে*, *কোথায় পাব তাকে* সহ অনেক উপন্যাস তিনি এই নামে লিখেছেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংখ্যা ২০০ এবং উপন্যাসের সংখ্যা ১০০। তাঁর জনপ্রিয় কিছু উপন্যাসের মধ্যে আছে— *উত্তরঙ্গ*, *গঙ্গা*, *বিবর*, *প্রজাপতি*, *দেখি নাই ফিরে*, *সওদাগর*, *কোথায় পাবো তাকে*, *নয়নপুরের মাটি*, *বাঘিনী*, *চলো মন রূপনগরে*, *পাতক*, *মুক্তবেণীর উজানে*, *মহাকালের রথের ঘোড়া*, *শাস্ত্র*, *বিটি রোডের ধারে*, *শ্রীমতি কাফে*, *অবশেষে*, *কামনা বাসনা*, *কে নেবে মোরে*, *গোগোল চিক্কুস নাগাল্যান্ড*, *ছায়া ঢাকা মন*, *জঙ্গল মহলের গোগোল*, *নিষ্ঠুর দরদী*, *পথিক*, *প্রাণ প্রতিমা*, *বাঘিনী*, *রক্তিম বসন্ত* ইত্যাদি। এরকম আরও উপন্যাস ও গল্প তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি। তবে এখন কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু’র অন্যান্য সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইছি না, আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ে তা অন্তর্গতও নয়। আমরা এখানে মূলত তাঁর কালকূট ছদ্মনামে লেখা চারটি মহাভারতীয় উপন্যাসের বিষয়ে কথা বলব।

তাঁর চারটি মহাভারতমূলক উপন্যাসের মধ্যে *শাস্ত্র* (১৯৭৮) নাম প্রথমেই আসবে। এছাড়াও *অন্তিম প্রণয়* (১৯৮৪), *পৃথা* (১৯৮৬) এবং *যুদ্ধের শেষ সেনাপতি* (১৯৮৭) খুবই উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে পড়ে। মহাভারতকার ব্যাসদেব যেখানে থেমে যায়, কালকূটের উপন্যাস শুরু হয় সেখান থেকেই। আধুনিকতার সমস্ত উপাদান মিশিয়ে মহাভারতের কাহিনিকে তিনি বিশ্লেষণ করেন। নিজের ব্যাখ্যা ও ভাবনা দিয়েই মনের মধ্যে থাকা প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন

কালকূট। তাঁর ভারতীয় পুরাণ ভাবনার মৌল প্রবণতা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে সমাজ বোধের নব মূল্যায়ন করা। অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক রাজীব চৌধুরী ‘কালকূট: শিল্পের অন্তরঙ্গ জীবন’ প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

কালকূট ছদ্মনামে লেখা হলেও উপন্যাসগুলি ‘কালকূট’ নামের ভিন্ন কোনো লেখক সত্তার আলাদা আলাদা উপন্যাস নয়। সেখানেই এই লেখাগুলির উত্তমপুরুষ কথক চরিত্রটির মধ্যে একটি চরিত্রকেই তৈরি হয়ে উঠতে দেখি। উপন্যাসগুলির কাহিনী (কাহিনি) যেমন প্রতিটিই পৃথক পৃথক হয়েছে, আবার সেগুলির মধ্যে নানাভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যোগসূত্র। কালকূট চরিত্রটিকে যে উপন্যাসগুলিতে প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে, সেই পুরাণ-ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গে চরিত্র কালকূটের যোগের ব্যাখ্যা পেয়ে যাই অন্য উপন্যাসে দেওয়া সূত্র থেকে।^{৩৫}

তবে এ কথা ঠিক যে, শাস্ত্র উপন্যাসটির ভাবনাসূত্র রয়ে যায় দশ বছর আগে প্রকাশিত নির্জন সৈকতের মধ্যে। অন্যদিকে পৃথা বা অস্তিম প্রণয় উপন্যাসের উৎস মূল খুঁজে পাওয়া যায় চলো মন রূপনগরের মধ্যে। আমরা জানি যে কালকূটের প্রথম পুরাণ নির্ভর উপন্যাস হল শাস্ত্র, যা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার দুই বছর পর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পায় এটি। ব্যাসদেবের মহাভারত যেখানে শেষ হয়ে যায় কালকূটের যাত্রা সেখান থেকেই শুরু হয়েছে এই উপন্যাসে। মৃত্যু নয়, মৃত্যু হলে তো জীবন শেষ, তাই মৃত্যুর পরিবর্তে কষ্ট করে বেঁচে থাকাতেই মানুষের মানুষ হয়ে ওঠা লুকিয়ে আছে। উপন্যাস জুড়ে কালকূট সম্ভবত আমাদের সেটাই বলতে চেয়েছেন। মহাভারতে শাস্ত্র নিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নয়, সেখানে কৃষ্ণ ও বলরাম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে আছে। কিন্তু এখানে কালকূট কৃষ্ণের পুত্র শাস্ত্রকেই প্রধান হিসাবে দেখতে চান। ভাবনার সেই জায়গা থেকে উপন্যাসটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণের অসূয়া তার নিজের পুত্রের জীবনে কীভাবে অভিশাপ নিয়ে এসেছে তারই ইতিহাস বলে এই উপন্যাসটি। শুধুমাত্র পৌরাণিক আখ্যান বলাটাই কালকূটের উদ্দেশ্য নয়। বরং শাস্ত্র নিজে এমন এক সত্তা হিসাবে ফুটে উঠে লেখকের কাছে, যে সময়ের প্রবাহেও অমলিন। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসটির ভূমিকায় কালকূট শাস্ত্রের বিষয়ে চমৎকার কিছু কথা বলেছেন। কালকূট এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন। শাস্ত্র আমার কাছে এক “সংগ্রামী” ব্যক্তি, “বিশ্বাস” এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছি, দেখতে চেয়েছি কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।^{৩৬}

শাস্ত্রকে এভাবেই দেখেছেন কালকূট। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে কালকূট শাস্ত্রকে সংগ্রামী হিসাবে ভাবতে চেয়েছেন, যে সহজে হাল ছেড়ে দেয় না, সহজে যাকে কারু বা পরাজিত করা

যায় না। শাস্ত্রের দশ বছর আগে প্রকাশিত *নির্জন সৈকতে* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই কোনারকে গিয়ে সূর্য মন্দির দর্শন করে শাস্ত্রের কাহিনি লেখকের মনে হয়। কালকূটের মনের ভাবনা *নির্জন সৈকতে* উপন্যাসে আমরা গভীরভাবে পেয়েছি। *নির্জন সৈকতে* এই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে:

সূর্য মন্দিরের সঙ্গে পুরাণের এই কাহিনী জড়িত। কিন্তু পুরাণকে বাস্তবে খুঁজে আমরা পাই নে। মানুষের বিশ্বাসকেই পাই। ইতিহাস তারই সাক্ষী দেয়। ইতিহাস বলে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষে প্রথম সূর্য উপাসনার শুরু। উত্তরাঞ্চল থেকে একদা ভারতের নানান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকের ধারণা বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান থেকেই সূর্য পূজার প্রচার কমে আসে। তবু জানি, এখনো বাংলাদেশে মাঘী সপ্তমীতে মেয়েরা সাতটি পাতা মাথায় নিয়ে অবগাহন স্নান করেন। সাতটি পাতা সাতটি অর্কের প্রতীক। সূর্যের সপ্তরশ্মির সপ্ত অর্ক।^{৩৭}

পুরাণ থাক, ইতিহাসও থাক, সূর্য পূজার মাধ্যমে তো আমরা পবিত্র হতেই চেয়েছি। আমরা কেউ শাস্ত্র নই, আমরা শ্রীকৃষ্ণের অভিশপ্ত সন্তান নই। কিন্তু ইহকালের যে ক্ষণিক জীবন নিয়ে আমাদের সংসার যাত্রা, সেখানে ব্যাধি আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী, মানুষ তার ক্ষণিক জীবন নিয়ে তাই সূর্যের পবিত্র কিরণকে প্রার্থনা করছে।^{৩৮}

সূর্য উপাসক শাস্ত্রের অনেক ঘটনার কথাই মহাভারতে আছে। কিন্তু, মহাভারতে কৃষ্ণ এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, যার কূটনীতি ও রাজনীতিতে দক্ষতা মহাভারতে তাকে মহামানব করে তুলেছিল। অন্যদিকে কৃষ্ণের পুত্র শাস্ত্র মহাভারতে কৃষ্ণের প্রতিভার পাশে অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। তাই মহাভারতে শাস্ত্র শেষ পর্যন্ত একজন নিতান্তই সাধারণ তুচ্ছ চরিত্র হয়ে থেকে গেছে। যদিও যদুবংশ ধ্বংসের কথা বলার প্রসঙ্গে মহাভারতে কৃষ্ণ পুত্র শাস্ত্রের কথা উঠে আসে, কিন্তু তা ছাড়াও শাস্ত্র চরিত্রের রয়ে গেছে অন্য একটি দিক। যা এই উপন্যাসে কালকূটের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি। শাস্ত্র মানে সংগ্রাম, কষ্ট, ধৈর্যের প্রতীক। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে কালকূট নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

শাস্ত্র-কাহিনী— বিশেষত তাঁর পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তি, বহুবিধ ঘটনা তত্ত্ব তথ্যের জালে আবৃত। আমি তার অনেক বিষয়ই বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছি। কেবল তাঁর প্রতি পিতার অভিশাপের কারণ এবং শাপমোচন বিষয়কেই আমি যথাসম্ভব সহজভাবে বলতে চেয়েছি। কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাস্ত্রকেও আমি প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী, ত্যাগী, বিশ্বাসী উজ্জ্বলতম ব্যক্তি রূপে দেখেছি।^{৩৯}

উপন্যাসটি শুরু হয় পথের টানে, পথকে আপন করে, পথের গান শুনে ও পিছন ফিরে না তাকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ার কথা দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রসঙ্গে চলে আসে কিছু দার্শনিকতার কথাও। জীবনের তিন ভাগ আছে দুঃখ এবং একভাগ সুখ। লেখক বলেন— “জীবনকে দেখার সেই দৃষ্টিভঙ্গি, নিদারুণ মনে হয়েছিল। তখনও সুখ বিষয়ে মনের মাত্রাঙ্তানে আকাঙ্ক্ষার

ভাগটা ছিল অনেক বড়। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল, জীবন হল দুঃখের দ্বারা বেষ্টিত। তাকে পাশ কাটিয়ে যাই, এমন কোনও পথ ছিল না। ব্রহ্মাণ্ডের অনিবার্যতার প্রমাণটা একটা প্রতীক। তিন ভাগ জলের ধারা প্রবাহিত স্থলের অভ্যন্তরে নানা নদ ও নদী। তার ওপরে, পল্ল বড় বন্ধুর হে, পল্ল বড় বন্ধুর। তিন ভাগ জল ছিল এক গভীর অর্থবহ সংবাদ। দুঃখ জীবনের সমগ্রতায় অনতিক্রমণীয়। সুখ থাকে দুঃখের কুণ্ডলীতে। তার নাম বলকিত দ্যুতি। সামান্য জীবনকালের কয়েকটি স্বপ্নময় মুহূর্ত মাত্র।^{৪০} এই সুখ এবং দুঃখের মধ্যে দিয়েই জীবন এগিয়ে চলে। কালকূটও পাঠকদের নিয়ে এগিয়ে চলেন। ঔপন্যাসিকের ভ্রমণের জায়গা দ্বারাবতী। কৃষ্ণকে সামনে রেখে উক্ত স্থানে যাবার আগে কৃষ্ণের আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। কালের আলোচনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি, কালের গহনজালে হারিয়ে যাবার আগে লেখক পাঠককে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছেছেন দ্বারকায়। যাদব বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপস্থিতিতেই যে মহাভারতকে অন্য মাত্রা দেয় তা মেনে নিয়েছেন কালকূট। অর্জুন ও ভীমসেনদের পরাক্রমের পেছনে বাসুদেব কৃষ্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাই হোক, কৃষ্ণের চরিত্রের ও বুদ্ধির বিশালতা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। বিশ শতকেও অনেক উপন্যাস কৃষ্ণকে নিয়েই লেখা হয়েছে। কিন্তু, কালকূট উপলব্ধি করেছিলেন যে শাস্ত্রও হয়ে উঠতে পারে আধুনিক উপন্যাসের একটি চরিত্র। আধুনিক চরিত্র হয়ে ওঠার জন্য যাবতীয় গুণাবলী তার মধ্যে রেখে গেছে স্বয়ং ব্যাসদেব। তাই কালকূটের লক্ষ্য দ্বারকা হলেও তাঁর এই রচনায় নায়ক কৃষ্ণের পরিবর্তে তার পুত্রই। কৃষ্ণ এখানে বরং পার্শ্ব চরিত্র। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের মধ্যে লিখেছেন— ‘পিতা পুত্রকে একসঙ্গেই দেখতে চাই। বেশি চাই অপরূপকান্তি ও বীর শাস্ত্রকেই। কৃষ্ণ ছাড়া নাম নেই, কিন্তু শাস্ত্র আমাকে আকর্ষণ করেছেন বেশি।’^{৪১} এভাবেই মহাভারতীয় একটি স্বল্প আলোচিত চরিত্রকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন কালকূট।

কালকূটের উপন্যাসের এমনই গুণাবলী আছে যে লেখকের সঙ্গে পাঠকও যেন দ্বারকা ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে এখানে। এরই সঙ্গে লেখক যেমন সংশ্লিষ্ট নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছেন, ঠিক তেমনই পাঠকেরও কৌতূহল জন্মানো স্বাভাবিক এক্ষেত্রে। আমরা সবাই জানি যে, মগধের রাজা জরাসন্ধের আক্রমণে মথুরা নগরী একাধিকবার বিপদের মুখে পড়েছিল। যদিও কৃষ্ণের কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রভাবে এবং রণনীতির সৌজন্যে শেষ পর্যন্ত মথুরা রক্ষা পায়। কিন্তু বারবার জরাসন্ধের আক্রমণের মুখে পড়ে মথুরাবাসী বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিম ভারতের দিকে সমুদ্রের উপকূলে কৃষ্ণ সহ যাদবরা চলে আসে। লেখক নিজেও এইটি অনুমান করেছেন। যদিও বর্তমানে কালকূটের এই ধারণার আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণ মেলে। বর্তমানে গুজরাটের উপকূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে সমুদ্রের তলায় প্রাচীন দ্বারকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়ে বলতে গিয়ে কালকূট বলেছেন— ‘কোথায় সে দ্বারকা? কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় রাজ্যের যে শহরকে এখন জুনাগড় বলা

হয়, সেখানেই কী? গির্নারের পর্বতমালাই কি রৈবতক? রৈবতক পাহাড়ের উপরে কুশস্থলী নামক যে সুদৃঢ় পুরী তৈরি করেছিলেন, সেই স্থান কি আজকের গুজরাটের দ্বারকা?^{৪২}

কালের সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা পিছনে গিয়ে কালকূটের মনে হয়েছে, হয়তো কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তৎকালীন দ্বারকা নগরীর সঙ্গে বর্তমান নগরীর বেশ কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন বর্তমানে বৃন্দাবনের ধারেই যমুনা এবং বৃন্দাবন মথুরার মধ্যে সময়ের পার্থক্য এক ঘন্টারও কম। কিন্তু কৃষ্ণ যখন কংস বধের জন্য বৃন্দাবন থেকে মথুরার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল তখন তা এক ঘন্টার অনেক বেশি সময় লেগেছিল। তাই এ কথা বোঝা যায় তৎকালীন নগরীর সঙ্গে বর্তমান নগরীর অবস্থানের অনেক পার্থক্যই আছে। উভয়ের ভৌগোলিক স্থান আলাদা বলেই মনে হয়। শাস্ত্র যখন দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে বলপূর্বক হরণ করে, তখন যে যুদ্ধ বাধে সেই যুদ্ধে শাস্ত্র পরাজিত হয় এবং তাকে কারারুদ্ধও হতে হয়। তখন সহসা নগরী ঘূর্ণায়মান হয়, এর ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় বলরাম হস্তিনাপুরকে প্রাকারে বিঁধিয়ে টানায় এমনটা হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের সচেতন পাঠক হিসাবে মনে হয় এর পেছনে ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় থাকতে পারে। তাই অতীতের দ্বারকা নগরীর সঙ্গে বর্তমানের ভৌগোলিক অবস্থান মিলিয়ে দেখাটা একটু সমস্যার বিষয়, কারণ এরই মধ্যে এগিয়ে গেছে হাজার হাজার বছর। ফলে প্রাকৃতিক বিবর্তন ঘটে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই সম্পর্কে কালকূট বলেছেন:

এই ভৌগোলিক পরিবর্তনটি আধুনিক হলেও, আমাকে একবার স্মরণ করতেই হলো। কেননা আমার যাত্রাটা একেবারেই অত্যাধুনিক কালে। কৃষ্ণ এবং যাদবগণের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরীর সঠিক স্থান নির্ণয়ে এই ঘটনাটি আমার যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করেছে।^{৪৩}

শেষ পর্যন্ত লেখক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কচ্ছপ্রদেশের দুই হাজার মাইল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো তার সঙ্গে প্রাচীন দ্বারকা নগরী সমুদ্র গর্ভে চলে যেতে পারে। কালকূট লিখতে বসেছেন ভ্রমণ উপন্যাস, ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থানের ইতিহাস, ভূগোল ও বর্তমান নিজে অবগত হওয়ার পাশাপাশি পাঠক সমাজকেও জানাতে চেয়েছেন।

এর পরের মুহূর্তেই আমরা দেখতে পেয়েছি মহর্ষি নারদের সঙ্গে লেখক ও পাঠক দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করে। নারদের ভ্রমণ স্থান ছিল প্রভাস তীর্থ। কিন্তু প্রভাস থেকে কৃষ্ণ ও বলরামদের দ্বারকা নগরী কাছে হওয়াতে নারদ সেখানেও যায়। স্বাভাবিকভাবেই নারদের মতো মহর্ষির আগমনের ফলে নগরী আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তির তথা যাদবদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাকে তাদের গৃহে নিয়ে যায় এবং আদর ও যত্নে ভরিয়ে তোলে। যাদবদের শ্রেষ্ঠ

পুরুষ কৃষ্ণ নিজেও মহর্ষি নারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আসে। নগরীর মানুষদের নারদের প্রতি ভক্তি ও আতিথেয়তা দেখে মহর্ষি অত্যন্ত খুশি হয়। যাবতীয় বিলাসে পরিপূর্ণ এই নগরী। আলাপন ও ক্রীড়া এবং নারীদের সঙ্গে অবসর কাটানো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে দ্বারকা নগরীর সুনাম আছে। কিন্তু সবাই নারদের আগমন বার্তা পেয়ে এলেও অপরূপ রূপবান কৃষ্ণ পুত্র শাম্ব মহর্ষির আগমনের কোনও সংবাদ পায় না। বরং তখন সে সুন্দরী নারীদের সঙ্গে সঙ্গ লাভে ব্যস্ত ছিল। উপন্যাসে কালকূট শাম্বকে অসাধারণ রূপবান পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

বিশেষতঃ কৃষ্ণপুত্রদের মধ্যে শাম্ব সর্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ। কাঞ্চনের অধিক উজ্জ্বল বর্ণে, তাঁর দেহে যেন, পারিপার্শ্বিক সকলেই প্রতিবিম্বিত হয়। ... তাঁর অতি আয়ত চোখে সর্বদা কামনার বহি অনল প্রজ্বলিত হয় না, কিন্তু মুগ্ধদৃষ্টিতে এমন একটি চিত্তজয়ী দুর্বীর আকর্ষণ আছে, রমণীমাত্রেই তাঁর দর্শনে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে ওঠে।^{৪৪}

কৃষ্ণ পুত্রের এই রূপ বর্ণনা অকারণে করেন না কালকূট। ভবিষ্যতে এই রূপ শাম্বের পথ কণ্টকিত করবে তাই হয়তো এই অসাধারণ রূপের কথা কালকূট বর্ণনা করেছেন। শাম্বের কাছ থেকে আদর, আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয় নারদ। ফলে দ্বারকা নগরীর সকলের প্রিয় শাম্বের শাস্তির বিষয়টি নারদ ভাবতে থাকে। কীভাবে কৃষ্ণের কাছে পুত্রকে হীন করে দেওয়া যায়, সেই চক্রান্ত মনে মনে ভাবতে শুরু করে নারদ। শেষ পর্যন্ত নারদ এই সিদ্ধান্তে আসে যে, পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে কুপিত করতে পারলেই নারদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। উপন্যাসে কৃষ্ণ দেবতা নয়, একেবারে একজন সাধারণ মানুষ। তাই অন্যান্য মানুষের মতো তারও রাগ, ঘৃণা, অভিমান ও আনন্দ থাকবে এটাই স্বাভাবিক বিষয়। তাই কৃষ্ণ এখানে সামান্য অসুয়াকেও জয় করতে পারে না। নারদ সেই বিষয়টি যেহেতু জানত, তাই কৃষ্ণকে জানায় যে তার বংশে একটি গ্লানিময় পাপের ছায়া রয়েছে। এই পাপের ছায়া বিষয়টি যে শাম্বকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তাও স্পষ্ট করে দেয় নারদ। শুধু তাই নয় যে ষোলহাজার রমণীকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে, তারাও শাম্বকে প্রার্থনা করে। প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণ এই অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায় নি। পুত্রের আচরণে সন্দেহের কিছু দেখতে পায় না কৃষ্ণ। কিন্তু নারদ শাম্বের প্রতি প্রতিশোধ না নিয়ে শান্তি পায় না। তাই এর কিছুদিন পর পুনরায় আবার দ্বারকায় নারদ ফিরে আসে এবং ষোল হাজার গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণ যেখানে জলক্রীড়ায় মগ্ন থাকে, সেখানে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে শাম্বকে উপস্থিত করে। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে কৃষ্ণ পুত্র শাম্ব অত্যন্ত অপরূপ রূপবান পুরুষ। তাই তার উপস্থিতিতে সমস্ত রমণীরা কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এই আচরণে কৃষ্ণ তার গোপিনীদের পাশাপাশি নিজ পুত্রকেও অভিশাপ প্রদান করে। অভিশাপ হল কিছুদিন পরেই শাম্বের এই শারীরিক সৌন্দর্য নিপাত যাবে এবং কুষ্ঠ রোগের কুশ্রীতা তাকে গ্রাস করবে।

কালকূটের লেখায় যে কৃষ্ণ পুত্র শাস্বকে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পেয়েছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অন্য এক শাস্বকে এরপর আমরা পাই। যে নিজে রমণী সম্ভোগে এবং বিলাসে মত্ত নয়। পিতার অভিশাপকে যে অদৃষ্টের লীলা বলে মেনে নেয়। শাস্ব চলে যেতে চায় নগরী ছেড়ে, এক মনস্তত্ত্ব কাজ করে এর পেছনে। যে এতদিন অপরূপ সৌন্দর্যে রমণীদের মাঝে ও সাধারণ লোকের প্রিয় ছিল, কিছুদিন পর তারই দেহে কুষ্ঠ রোগ নেমে এসে আমূল পরিবর্তন ঘটাবে, এই বিষয়টি সে বুঝতে পারে। ফলে এতদিনের সুখ ভোগ আর এখন সম্ভব নয়। কৃষ্ণের অভিশাপে তার দেহে যে পরিবর্তন আসে তার বর্ণনায় কালকূট জানিয়েছে:

তাঁর নাসিকা মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন। তাঁর জয়ুগল কেশহীন, সমস্ত মুখমণ্ডল মলিন কালিমালিণ্ড এবং তাম্রাভ, কোথাও রক্তাভ শুষ্ক ঘা এবং অতি পলিত। বিশাল চক্ষুদ্বয়ের কৃষ্ণ পুচ্ছ সকল পতিত হয়েছে, ফলে চোখ অতি রক্তাভ দগদগে দেখাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহের চর্ম ক্ষীত, বিবর্ণ, হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায়। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অতি করুণ অসহায়।^{৪৫}

বিভিন্ন জায়গায় একাকী ভ্রমণের পর অভিশাপ মুক্ত হওয়ার জন্য শাস্ব এরপর দ্বারকায় প্রবেশ করে। স্বাভাবিকভাবেই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য তাকে কেউ চিনতে পারে না। অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। নগরীতে গিয়ে পিতার সঙ্গে দেখা করার সময় মহর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত ছিল। শেষ পর্যন্ত শাস্বকে এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় নারদ বলে। কালকূট এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

আমি একদা একবার সূর্যলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি সূর্যদেবকে দেবতারা বেষ্টন করে আছেন। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং অঙ্গরাবৃন্দ তাঁর চারপাশে অবস্থান করছেন, পূজিত হচ্ছেন ত্রিসন্ধ্যা দ্বারা। সেখানে সূর্যকে ঘিরে রয়েছেন আদিত্যগণ, বসুগণ, মারুতগণ, অশ্বিনীগণ। তাঁর পার্শ্বেই রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তাঁর পত্নী রজনী ও নিম্বুভা। ...ইনি একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতা ও পিতৃগণেরও উর্ধ্বে। ইনিই সকল শক্তির উৎস। ইনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, ইনিই স্রষ্টা ও সময়ে ধ্বংসকারী। তোমার একমাত্র পূজ্য দেবতা এই সূর্য। ইনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিকে ধ্বংস করেন, সেইজন্য সকল দেবতাগণ তাঁকে মান্য করেন। তুমি সেই সূর্যলোকে যাও।^{৪৬}

শাস্বকে মহাভারতের পাঠকেরা সূর্যের উপাসক হিসাবে জানে। তার সূর্য উপাসনার বিষয়টিকে কালকূট অসাধারণভাবে যুক্ত করে কৃষ্ণের প্রদত্ত অভিশাপের সঙ্গে। এরপর অনেক কঠোর পরিশ্রম করে মাঠ, ঘাট ও জনপদ পেরিয়ে সে পৌঁছে যায় চন্দ্রভাগার তীরে, মিত্রবনে সূর্যক্ষেত্রে। এরপর আরও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সামনের লক্ষ্যে এগিয়ে যায় সে। হার না মানা মনোভাব, তীব্র লড়াইয়ের মানসিকতার সাহায্যে শাস্ব তার দুর্ভাগ্যের থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে থাকে। এভাবে উপন্যাসে কৃষ্ণ পুত্র শাস্ব নিজেই হয়ে ওঠে উত্তরণের এক প্রতীক। শাস্বকে এভাবে দেখতে পারাটা একান্তই কালকূটের নিজের দক্ষতা। নারদের নির্দেশ মতো মিত্রবনে

গিয়েও আশার আলো বিশেষ কিছু দেখতে পায় না শাস্ত্র। উল্টে এক বিচিত্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে যারা জীবনের প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ও ভরসা হারিয়েছে ইতিমধ্যে। দিনের বেলায় এই সমস্ত নরনারীরা ভিক্ষা করে এবং রাত হলে সেই ভিক্ষালব্ধ খায়। কোনও রকম সামাজিক বিধিনিষেধ কাজ করে না তাদের মধ্যে। তারা সবাই জানে যে কিছুদিন পর মৃত্যুর মুখে তারা পড়বে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যু থেকে মুক্তির উপায় তারা অনুসন্ধান করে না। এই জনগোষ্ঠীর লোকজনের মুখেই শাস্ত্র শুনে যে বনে এক মন্দির ও দেবতার বিগ্রহ আছে, সেখানে একজন মুনিও রয়েছে, যে এই সমস্ত লোকের মুক্তির উপায় হিসাবে একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে। যথা-ব্রহ্মচর্য পালন, উপোস করা এবং ভোরবেলা স্নানের পর সূর্যের প্রণাম করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল যে, এই অঞ্চলের লোকজন এই সমস্ত নিয়ম পালন করতে চায় না। পরিশ্রম, ত্যাগ স্বীকার এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা তাদের মধ্যে একেবারেই নেই। যা শাস্ত্রের মতো পুরুষকে অত্যন্ত হতাশ করে তোলে। মুনির প্রদত্ত উপদেশ তারা গ্রহণ করে নি, ফলে তাদের রোগ মুক্তিও ঘটে না। শাস্ত্রকে তারা নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু শাস্ত্র সেই প্রলোভনে পা দেয় না।

পরবর্তী সময়ে ঋষির দেখা পেলে ঋষির কথা অনুসারে অবিশ্বাসী রোগীদের উদ্ধার করতে চায় শাস্ত্র। একমাত্র সুস্থ হওয়ার মাধ্যমেই যে মুক্তি লাভ করা সম্ভব তা মানুষদের বোঝাতে থাকে সে। সমস্ত কিছু থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার থেকে যদি কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মাবলী মেনে কুষ্ঠ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক। ঋষি রোগ মুক্তির বিষয়ে শাস্ত্রকে জানায় যে:

যে দ্বাদশ নামে গ্রহরাজ অভিহিত হয়ে থাকেন, আমি সেই নাম সকল বলছি। আদিত্য, সবিত্র, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর, রবি। এই দ্বাদশ নাম এবং দ্বাদশরূপে তিনি দ্বাদশমাসে দ্বাদশতীর্থ ও নদনদীতে, অতিক্রিয়াশীল থাকেন। দ্বাদশমাসে, দ্বাদশদিন সেইসব নদনদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে, ব্যাধির আরোগ্য ঘটে।^{৪৭}

তবে কৃষ্ণের পুত্র শাস্ত্র যেহেতু সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থপর নয়, তাই কুষ্ঠ থেকে মুক্তির উপায় সে যে সকল মানুষদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদের সবাইকে জানায়। যদিও ঋষির মারফত তারা পূর্বেও এই বিষয়টি জানতে পেরেছিল, কিন্তু তা পালন করে নি। উপন্যাসে নীলাক্ষি নামে একটি চরিত্রের কথা কালকূট আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে রাত্রে শাস্ত্রের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় সেই রাত্রে সে প্রবলভাবে যৌন সন্তোগের ইচ্ছার কথা জানায়। নীলাক্ষি চরিত্রের মধ্যে এক বেদনা আমরা খুঁজে পাই। ব্যাধির পূর্বে সে ছিল সুন্দরী, কিন্তু এই ব্যাধি তার যাবতীয় রূপ ও যৌবন কেড়ে নিয়েছে। শাস্ত্র তার সঙ্গে যৌন মিলনে রাজি না হলে নীলাক্ষি তাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু পরের দিন আমরা অন্য নীলাক্ষির দেখা পাই, যে ঋষির কাছ থেকে শুনে আসা শাস্ত্রের কথা শুনে বিশ্বাসী হয়। নিজে উদ্ধার হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও একই পথে হাঁটার জন্য

প্ররোচিত করে সে। শেষ পর্যন্ত নীলাক্ষির জন্যই শাস্ত্রের কথা সবাই সত্য বলে মেনে নেয় এবং রোগ মুক্তির জন্য সত্তর জন মিলে একত্রে যাত্রা শুরু করে তারা। তাদের সবার উদ্দেশ্য চন্দ্রভাগার জলে স্নান করা। সবাই জানে তারা জীবনের গতি যে পথে এগিয়ে চলেছে তাতে মৃত্যু একপ্রকার প্রায় নিশ্চিত, তবুও জীবনের আশায় তারা এগিয়ে চলে। সবাই আশার আলো না দেখলেও চোদ্দজন আশার আলো দেখতে পায় এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে। অসুস্থ ও রোগযুক্ত দেহে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। তবে কৃষ্ণের পুত্র শাস্ত্রের যাত্রা এখানেই শেষ হয় না। সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমের জলে সে একটি ‘দারুমূর্তি’ খুঁজে পায়। যেই মূর্তির সঙ্গে মিত্রবনের গ্রহরাজের সাদৃশ্য আছে। তবে এই মূর্তির পূজার অধিকার কেবল শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের আছে, এই ব্রাহ্মণেরা কুষ্ঠরোগ সারাবার উপায় জানে এ কথা শোনার পর, শাস্ত্র শুক্লাসপ্তমী তিথিতে মূর্তিটিকে যথাস্থানে স্থাপন করার মাধ্যমে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে যাত্রার ফলে শেষে শাস্ত্র এসে পৌঁছায় শাকদ্বীপে। এখানের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে এরপর শাস্ত্রের পরিচয় ঘটে এবং তার আগমনের যথার্থ কারণ জানায়। এরপর তাদের সম্পূর্ণ সুখ ও আরামের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আঠারোটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে ভারতে নিয়ে আসে। এভাবে মিত্রবনের নতুন নামকরণ হয় শাস্ত্রপুর। ভবিষ্য পুরাণ অনুসারে চন্দ্রভাগা তীরে সূর্য মন্দির নির্মাণ করে শাকদ্বীপী সৌর ব্রাহ্মণদের সেখানে এনে শাস্ত্র মার্তোগোপাসনা করেছিল। কালকূট সেখান থেকেই এই উপন্যাস রচনার উপকরণ পেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু কালকূটের শাস্ত্রকে একান্তভাবেই তার চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য সহজে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়। পাশাপাশি তার লড়াকু মনোভাব এবং হার না মানা জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত সাফল্য ধরা দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

তবে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ পুত্র শাস্ত্রের এই মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনটাই আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই নারদ এসেছে শাস্ত্রের কাছে, তাকে দ্বারকা নগরীতে অতীতের মতো সুখ ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র তার নতুন জীবনেই অত্যন্ত খুশি। শুধু তাই নয়, মন খুলে নারদকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে অতীত জীবনে ফেরার কোনও ইচ্ছাই তার অবশিষ্ট নেই। কালকূটের উপন্যাসের শেষ এই অংশটি অতি চমৎকার। এখানেই উপন্যাসের শাস্ত্র পৃথক হয়ে গেছে মহাভারতের শাস্ত্রের থেকে। কালকূট লিখেছেন:

মহর্ষি নারদ এলেন মিত্রবনে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রপুর নগরী এখন ক্রমবর্ধমান। শাস্ত্র নারদকে অভ্যর্থনা করলেন, পূজা করে পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করলেন। মহর্ষি বললেন, ‘শাস্ত্র, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তুমি কি আর কখনও দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে চাও না? সেখানে রাজকীয় সুখভোগ করতে চাও না?’^{৪৮}

শাস্ত্র বললেন, ‘মহর্ষি, আমার আর ঐশ্বর্যপূর্ণ, দ্বারকায় রাজকীয় সুখভোগের কোনও বাসনা নেই। আমি এই মিত্রবনে, কালপ্রিয়ক্ষেত্র ও মৈত্রেয়বনে এক অপরূপ আনন্দে অতিবাহিত করছি। মগ ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে, ব্যাধিগ্রস্তরা চিকিৎসিত হচ্ছে এবং তিন স্থানের তিনকালের

আলোকে স্নান করছে। অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, আমি তা জেনেছি, অতএব এখন যা দেখছি, এর তুল্য আনন্দ আমার আর কিছু নেই।^{৪৯}

শাঙ্গ উপন্যাসটি একটি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ উপন্যাস। যেখানে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও মানস ভ্রমণে বের হয়, অবশ্য এদের সঙ্গে বেশ কিছু পৌরাণিক ও অপৌরাণিক চরিত্রেরা ভ্রমণের সঙ্গী হয়। তবে শুধুমাত্র পৌরাণিক পটভূমিতে ভ্রমণ উপন্যাস রচনা করা লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, মহাভারত ব্যবহারের অন্য এক তাৎপর্য দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ঝুমা রায়চৌধুরী মনে করেন:

কুষ্ঠরোগ কেবল মানুষের দেহে নয় মনে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আজ জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে নীতিভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে। সুখে, সম্ভোগে, পারস্পরিক সম্পর্কের সহবাসের মধ্যে কোথাও আর তাদের সাড় নেই। সেই অর্থে তারা বাস্তবহারা, ভূমিহীন ও পতিত। এই চরিত্রহীন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমষ্টিগত অভ্যুত্থানের কথাই কালকূট বলেছেন।^{৫০}

এভাবেই কালকূট তাঁর লেখায় মহাভারতের সঙ্গে সমকালীন ভাবনাকে মিলিয়েছেন। আধুনিক মনন ও দর্শন দিয়ে বিশ্লেষণ করলে উপন্যাসটিকে একেবারেই আধুনিক পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। মহাভারত থেকে কাহিনি উপাদান সংগ্রহ করেও কালকূট তাঁর ভাবনার জোরে শাস্ত্রকে মহাভারত থেকে পৃথক করে সমকালীন চাহিদা অনুসারে নির্মাণ করেছেন, ফলে এই কালকূট নির্মিত নতুন শাস্ত্র চরিত্রটি একেবারেই তাঁর নিজস্ব নির্মাণ। বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চা নিয়ে বা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করলে অবশ্যই এই উপন্যাসটিকে আলোচনার টেবিলে রাখতেই হবে।

মহাভারতের কুন্তী একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাকে নিয়ে অনেক সাহিত্যিকই তাঁদের ভাবনা তাঁদের লেখায় রেখেছেন। তাঁদের কারও চোখে কুন্তী অসামান্য সুন্দরী, আবার কারও চোখে সে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির যোগ্য নয়। তবে আর যাই হোক, কুন্তী চরিত্র হিসাবে যে নেহাত ক্ষুদ্র মাপের তাও কেউ বলতে সাহস করবে না। মহাভারতের এই চরিত্রটিকে নিয়ে কালকূটের আগ্রহও কিন্তু কম ছিল না। তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁরই লেখা দুইটি উপন্যাস থেকে। এগুলি হল— *অন্তিম প্রণয়* এবং *পৃথা*। এগুলি ছাড়াও ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত *চলো মন রূপসাগরের* মধ্যেও দেখতে পাই দামোদরের শাখা নদী কুন্তী কালকূটকে আকর্ষণ করেছিল। সেখানে কালকূটের মন্তব্য ছিল:

কেন তার নাম কুন্তী কে জানে? কুন্তী নামে তো একজনকেই জানি। সে আমাদের ইতিহাসের প্রাচীন রমণীশ্রেষ্ঠা, প্রাতঃস্মরণীয় কন্যা। প্রাণটি তার বড়ই বহতা ছিল। মনে চিররমণীর দেহের লীলা। খরস্রোতা নিঃসন্দেহে। তা না হলে আইবুড়ো কন্যেটি এক অপরূপ পুরুষকে ডেকে তার অঙ্কশায়িনী হতো না। সোজা কথা না। বিয়ের আগে মেয়ে এক-বিয়োনী হয়ে গেল। তারপরেও

অভিশপ্ত অক্ষম স্বামীর পত্নীটি পর-পুরুষদের ডেকে, তিনটি সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল। পুরাণ বলে রহস্যের আবরণে ঢাকা দিয়ে রেখে না।^{৫১}

মহাভারতের কাহিনির জটাজালে যা যা চাপা পড়ে গেছে, কালকূট ধুলোর আস্তরণ ঝেড়ে তাকে আমাদের সবার সামনে বের করে আনেন। শুধু যে নিয়ে আসেন তাই নয়, আধুনিক পাঠক ও মননের চাহিদা অনুসারে আমাদের সামনে তা তুলেও ধরেন। অত্যন্ত সচেতনভাবে কালকূট ধীরে ধীরে অলৌকিকতার ঘেরাটোপ থেকে কুন্তীকে বের করে এনেছেন। কষ্ট কল্পনা দিয়ে নয়, সহজ সত্য দিয়ে তিনি ধরতে চেয়েছেন কুন্তীকে, তথা পৃথার নারীত্বকে। যা আধুনিক ব্যক্তি মানুষের চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে প্রশংসার যোগ্য। ভাবনার এই জায়গা থেকে *অন্তিম প্রণয়* এবং *পৃথা* পড়া যেতে পারে। আমরা যদি *অন্তিম প্রণয়* উপন্যাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে পাণ্ডু ও মাদ্রীর মিলনের প্রসঙ্গেই এসেছে কুন্তীর প্রসঙ্গ। পাণ্ডুর জীবনের অন্তিম প্রণয়ই তার জীবনের শেষ পরিণতি হয়েছিল। পাণ্ডুর জীবনে অভিষাপ ছিল যে, পত্নীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমের সময়ে তার মৃত্যু হবে। এই অভিষাপের কথা পাণ্ডু নিজে সহ পত্নীরা অবশ্যই জানত। সেই জন্যই পাণ্ডু সংযত জীবন যাপন পালনে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু একদিন বসন্তের রঙিন কালে পাণ্ডুর সংযম হারিয়ে যায় এবং মাদ্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তার সঙ্গে মিলনে রত হয়। ফলে পাণ্ডু মারা যায়।

মহাভারতের এই ঘটনা কালকূটের লেখায় অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাণ্ডুর অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনায় কালকূট খুঁজতে চেয়েছেন কোনও এক ব্যাধির ঠিকানা। লেখকের মনে হয়েছে পাণ্ডুর শারীরিক মিলনের অক্ষমতাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য অভিষাপের ঘটনাটি মহাকাব্যের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকতে পারে। পাণ্ডুর কোনও হৃদরোগ বা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন জনিত এমন কোনও ব্যাধি হয়তো ছিল, যার কারণে নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে তার মিলন নিষিদ্ধই ছিল। বলা বাহুল্য, মহাভারতের অনেক গবেষকই এই প্রসঙ্গে কালকূটের মতের সঙ্গে নিজেদের মত মিলিয়েছেন। মহাভারতের প্রতি অনেক পাঠকেরই ভক্তিময়তা থাকা স্বাভাবিক বিষয়— এ কথা কালকূট জানতেন। তাই সেই ভক্তির স্তরকে সরিয়ে তিনি দেখতে চেয়েছেন আধুনিক যুক্তিবাদ। কিন্তু এ ঘটনা ব্যক্ত করা লেখকের উদ্দেশ্যে নয়। পাণ্ডুর হৃদয়ের অপরূপ প্রেম যা সংযমেও আবদ্ধ থাকে না। দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীর প্রতি তা বর্ষিত হয়, যা আমাদের একজন প্রেমিক পুরুষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে দরিদ্র মানুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক পুরুষের নারীর প্রতি ভালোবাসার যে অনুভূতি তা অপরিবর্তনীয়। প্রেমিক পাণ্ডু সেখানেই হয়ে ওঠে আধুনিক একটি চরিত্র। যার উদ্দেশ্যে লেখকের মন্তব্য— ‘পাণ্ডুর প্রণয় আমাদের চিরপ্রেমিক পুরুষের কথাই মনে করিয়ে দিল, দিচ্ছে, দেবেও।’^{৫২}

তবে শুধু পাণ্ডুকেই নয়, তার প্রথম স্ত্রী কুন্তীকেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিচার করে দেখতে চেয়েছেন কালকূট। কুন্তীর মানসিক উদারতা প্রকাশের জন্যই কালকূট ঘটনাক্রম এভাবে

সাজিয়েছেন। মাদ্রী কিন্তু পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী। তাই সেও জানত যে পাণ্ডুর যৌন মিলনকালে মৃত্যু অনিবার্য, তা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সহবাসকালেই স্বামীকে হারিয়েছে কুন্তী। তাই বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণার জন্যই মাদ্রীকে তিরস্কার করেছে কুন্তী। শুধুমাত্র স্বামীকে হারানোর যন্ত্রণাই কেবল নয়, চিরকালীন নারীর অধিকারবোধ থেকেও হাহাকার করে ওঠে কুন্তীর হৃদয়। প্রথম স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে মিলনের সুখ সে পায় নি, তাই মাদ্রীকে সে বলেছে- ‘মদ্র রাজনন্দিনী তুমিই ধন্যা, আমার চেয়েও শতগুণে সৌভাগ্যবতী। কারণ স্বামীর সেই আশ্চর্য প্রসন্ন সুন্দর মুখটি তুমিই দেখেছ।’^{৫৩} পাণ্ডুর প্রথম স্ত্রীর মধ্যে এই বেদনা ও হাহাকার তাকে চিরকালীন নারীর প্রতিনিধি করে তুলেছে। তাই এখানে কুন্তী চরিত্রটির সম্পর্কে কালকূটের পর্যবেক্ষণ- ‘অন্তিম প্রণয় কাহিনীর শেষে শুধু একটি কথাই বলব। কুন্তীর এই শেষ কথাটির জন্যই তাঁকে আমি ধন্যা মনে করছি। সত্য কথা এমন করে, বুকের পাঁজর ভেঙে কোন্ রমণী বলতে পারেন? তিনি সত্যিই প্রাণঃস্মরণীয়া।’^{৫৪} এভাবেই কালের সীমা অতিক্রম করে কুন্তী হয়ে ওঠে চিরকালীন, অন্তত কালকূটের লেখায় আমরা তাই পাই। যদিও এই উপন্যাসটি পৃথক উপন্যাসের পরে প্রকাশিত হয়, তবুও কালকূটের পরিকল্পনাগতভাবে এটি পূর্বের রচনা বলে মনে হয়। তবে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু পাণ্ডু ও মাদ্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ে হলেও এখানে উঠে এসেছে কৌরব বংশের পূর্ব ইতিহাসও। যেখানে স্থান পেয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়, যেগুলি ছাড়া মহাভারত বাস্তবিক অর্থেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উঠে এসেছে ঋষি পরাশর ও সত্যবতীর কাহিনি, শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ, গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর বিবাহের প্রসঙ্গ ও বিচ্ছেদ, এছাড়াও মহামতি ব্যাসদেব, পিতামহ ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের কথাও নানাভাবে কালকূটের লেখায় এসেছে। ফলে কালকূটের লেখায় নতুন এক মহাভারতের কথা উঠে আসে। আমরা উপন্যাসিকের হাত ধরে আবার একবার কৌরব বংশের আদি কথা জানতে পারি, তবে তা অবশ্যই কালকূটের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। তবে ব্যাসদেবের মহাভারত এবং কালকূটের বর্ণনা যা উপন্যাসে আমরা পাই সেগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়ে যায় মূলত কালকূটের বিশেষ পুরাণ ভাবনার জন্যই।

পৃথক উপন্যাসে কুন্তী একজন সাধারণ রমণী হিসাবেই কালকূটের লেখায় উপস্থিত হয়েছে। সেই কারণেই উপন্যাসের শুরুতে তিনি বলেছেন:

যাঁকে দর্শন করতে আমার এবারের যাত্রা, তাঁকে আপাততঃ আমি রমণী বলেই উল্লেখ করব। যে রমণীকে ঘিরে বহুকাল ধরে মানুষের নানা প্রশ্ন, নানা উজ্জি, নানা মন্তব্য, সে সবার মধ্যে আসল রমণীটি হারিয়ে গিয়েছেন। যাঁর বাস্তব সত্তার ওপর বহুতর কল্পিত আর অলৌকিক সব আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের পথ ধরে, সমস্ত কুহেলিকা আর কল্পিত অজ্ঞানতা থেকে তাঁকে আমি দেখব।^{৫৫}

এই উপন্যাসে কুন্তী তথা পৃথাকে যথার্থভাবে খোঁজার জন্যই লেখক তথা কালকূট অনেকগুলি পৌরাণিক যুগকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অন্বেষণ আমাদের মুগ্ধ করে। প্রথমে সংহিতা যুগ ও পৌরাণিক যুগ এবং মহাভারতের যুগ। এই যুগগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনই অলৌকিক ঘটনার আবরণ উন্মোচন করে সমকালীন আধুনিকতার বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ঘটনাটিকে দেখতে চাওয়া হয়েছে। পৌরাণিক যুগের নারীরা যে সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছে বা ভোগ করতে পারে নি সেইটি কালকূট বিশ্লেষণ করেছেন। তবে নারীর উপর এই সকল বিধিনিষেধ বা স্বাধীনতা সবটাই তৎকালীন সমাজের বিধান অনুসারে হয়েছে; এবং এটির পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ ছিল বলেই কালকূট মনে করেন। মাতৃতান্ত্রিক যুগে নারীর যৌন স্বাধীনতা ছিল সবথেকে বেশি। যে কোনও পুরুষের সঙ্গে নারী পছন্দ মতো মিলনে যেতে পারত। নারীর এরূপ আচরণ সেকালের সমাজ স্বাভাবিকভাবেই দেখত, এতে নারীকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। পরবর্তী সময়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। তখন নারীকে পুরুষ নিজের শক্তির বলে আবদ্ধ করে রাখল এবং নারীর নিজের স্বাধীনতা হরণ করল। কিন্তু এত কিছু পরেও নারীকে সম্পূর্ণরূপে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে পারে নি। নারী ঠিক খুঁজে নিয়েছে মুক্ত বাতাস, মুক্ত পৃথিবী এবং নিজের যৌন স্বাধীনতা সহ অন্যান্য সকল চাহিদার সমাধান সূত্র। তবে পুরুষের কঠোর দৃষ্টি থাকার জন্য সহজে একেবারেই প্রকাশ্যে নারী যৌন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি, তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে আড়ালের তথা গোপনীয়তার। এর নিদর্শন আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। সংহিতা যুগে নারীর দৈহিক বা শারীরিক শুদ্ধতার প্রশ্নে কোনও কারও মাথাব্যথা ছিল না, নারী এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবেই চলত। নারী ও পুরুষ সবাই নিজেদের শৌর্য, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করে জীবন কাটাত। এক্ষেত্রে উভয়ের লিঙ্গের বিভেদ কোনও কাজের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু এরপর থেকে বিষয়টির পরিবর্তন ক্রমশ ঘটতে থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর সক্রিয় উপস্থিতি না থাকা এবং সন্তান মানুষ করার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নারী গৃহের অভ্যন্তরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজব্যবস্থায় তার স্থান স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের পরে হয়ে যায়। ফলে নারী পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যার একাধিক দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে আছে।

এই বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে শ্বেতকেতু এবং দীর্ঘতমার কাহিনি। শ্বেতকেতুর পিতার সামনে থেকে যখন তার মাকে অন্য এক পুরুষ তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, তা দেখে শ্বেতকেতু বলে – ‘এখন থেকে যে রমণী ভর্তাকে অতিক্রম করে ব্যভিচারিণী হবে, তার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণ হত্যা সদৃশ পাপ হবে।’^{৫৬} অন্যদিকে দীর্ঘতমার আখ্যানও আমরা সবাই জানি। দীর্ঘতমা নিজে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। তাই এই অন্ধত্বই তার স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে তার স্ত্রী তাকে পরিপূর্ণভাবে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে চায় নি। তার স্ত্রীর বক্তব্য ছিল যে সম্পূর্ণরূপে ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকলে ভর্তার অধিকার জন্মায় না।

অন্যদিকে দীর্ঘতমা জন্মান্ব হওয়ার কারণে পত্নীর ভরণপোষণ করতে অক্ষম। এই ঘটনার পর দীর্ঘতমার বক্তব্য ছিল:

আমি আজ থেকে পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করলাম, স্ত্রী জাতিকে যাবজ্জীবন কেবলমাত্র স্বামীর অধীন হয়ে থাকতে হবে। স্বামী বেঁচে থাকলে বা মারা গেলেও স্ত্রী পুরুষান্তর ভজনা করলেও তিনি অবশ্যই পতিত হবেন। পতিহীনা নারীদের প্রচুর সমৃদ্ধি থাকলেও তা ভোগ করতে পারবে না।^{৫৭}

এরকম আচার-আচরণের মধ্যে দিয়েই সংহিতা যুগ শেষ হয়ে যায়। এরপর আসে পৌরাণিক যুগ, মহাভারত এই সময়ের ফসল। এই সময় নারীর শারীরিক শুদ্ধতার উপরে সামাজিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে মহাভারত এমন একটি সময়কে ধারণ করে আছে, যে সময়তে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ সংহিতা যুগের শেষে নারীর প্রতি যে সামাজিক একপেশে বদ্ধ মানসিকতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ছিল, তা মহাভারতের সময়কালে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। এই বদলে যাওয়া সময়কে নিরীক্ষণ করেই পৃথাকে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছেন কালকূট। তবে আগাগোড়াই কুন্তীকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন লেখক। যদু বংশের ব্যক্তি শূরের কন্যা হল পৃথা। কিন্তু শূরের নিকট আত্মীয় কুন্তীভোজের কোনও সন্তান ছিল না, তাই সন্তানহীন পিতার প্রতি দয়াবশত হয়ে নিজের কন্যা পৃথাকে কুন্তীভোজের হাতে তুলে দেয় শূর। সেই কারণেই বালিকা পৃথা মানুষ হয়েছে পালক পিতা কুন্তীভোজের কাছেই। কালকূট কুন্তীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন কুন্তী হল দীর্ঘনয়না, স্ত্রী সুলভ গুণবতী, গম্ভীর স্বভাবা এবং ধর্মশীলা। পৃথা যেহেতু শৈশবে বড়ো হয়েছে পালক পিতার কাছে তাই বাল্যকালের পিতা মাতার যথার্থ সুখ থেকে বঞ্চিত সে। পৃথাকে সন্তান হিসাবে কুন্তীভোজ গ্রহণ করার পর বিশাল প্রাসাদে কার্যত একাকী হয়ে পড়ে সে, ফলে একাকীত্ব তাকে গ্রাস করে। কারণ বৃহৎ প্রাসাদে বাল্যকালে পৃথার সঙ্গে খেলাধুলা করার জন্য সঙ্গী কেউ ছিল না। যদিও শৈশবের এই নিঃসঙ্গতা এবং একাকীত্ব কুন্তী চরিত্রে পরবর্তীকালে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। কালকূট এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন- ‘তিনি সখীদের সঙ্গে নানা রহস্যলাপ করলেও তাঁর চরিত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিনি সহজে নিজের রসসিক্ত মনকে সকলের সামনে খুলে ধরতেন না।’^{৫৮} নিজেকে এইভাবে সহজে সকলের সামনে মেলে ধরতে না চাওয়া বা গুপ্ত রাখার যে প্রয়াস কুন্তীর মধ্যে বাল্যকাল থেকেই ছিল, তার কারণেই পরবর্তীকালে এই চরিত্রটি সাহিত্যিকদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে।

তবে বাল্যকালের কিছুটা সময় অতিবাহিত করার পরই কুন্তীর জীবনে নেমে আসে একটি বড়ো ‘চ্যালেঞ্জ’। ঋষি দুর্বাসার মতো অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত ব্যক্তির সেবার মতো গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেছিল কুন্তীভোজ স্বয়ং। যাই হোক, সেই অতি কঠিন কাজ দায়িত্বের

মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ঋষি দুর্বাসার থেকে কুন্তী বর পেয়েছিল। ঋষির আশীর্বাদ স্বরূপ বরের প্রভাবে কুন্তীর মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা যে কোনও দেবতাই তার কাছে আসতে বাধ্য থাকবে। তবে ঋষি এই আশীর্বাদ দিয়ে চলে গেলে সেটির সত্যতা সম্পর্কে নিতান্তই কৌতূহলবশত হয়ে সূর্যদেবকে স্মরণ করে কুন্তী। ফলে সূর্যের আগমন হয় এবং কুন্তীর গর্ভে একটি সন্তান আসে, কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে ও লজ্জায় সংশ্লিষ্ট সন্তানকে প্রাসাদে মানুষ না করে একটি ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা মহাভারতই আমাদের জানিয়েছে। তবে আধুনিক মন এই ঘটনাটিকে সত্য বলে মেনে নেয় না। বরং বিশ্বাস করে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্যই মহাকাব্যে এরূপ অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কুন্তী চরিত্রটিতে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক কালকূট কিন্তু সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনের।

ঋষি দুর্বাসাকে নিজের যথাসাধ্য সেবার মাধ্যমে কুন্তী চেষ্টা করে গেছে সন্তুষ্ট করার জন্য। যদিও সন্তুষ্টির প্রমাণ আমরা ঋষির বরদান থেকেই পেয়েছি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে প্রশ্ন এসে যায় যে, দুর্বাসার মতো ঋষি পুরুষ দেখে কি কুন্তীর হৃদয়ে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি। ঋষি দুর্বাসার তেজ ও দীপ্তি সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় ছিল বলেই কি কর্ণের পিতা হিসাবে চলে আসে সূর্যের নাম আর অভ্যন্তরে রয়ে যায় দুর্বাসা নিজে। মহাকাব্যের এই ঘটনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভাবতে চেয়েছেন কালকূট। সংহিতা যুগ পেরিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের পুত্রকে বিসর্জন দিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল কুন্তী। ফলে কর্ণের জন্মের রহস্য যেমন একদিকে আবৃত থেকেছে, ঠিক তেমনই কুন্তীও পুত্রের যন্ত্রণায় দীর্ঘকাল মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছে। তবে এই ঘটনাটি কুন্তী চরিত্রের বিশিষ্টতা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে। পৌরাণিক যুগ হওয়া সত্ত্বেও কুন্তী কিন্তু পুরুষের সংসর্গ লাভ করার সাহস দেখাতে পেরেছিল। পরবর্তী সময়ে কুন্তীভোজ নিজ পালিতা কন্যার জন্য বিবাহ সভার আয়োজন করলে পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তারপরেও কুন্তী সুখী হতে পারে না, কারণ পাণ্ডু নিজে ছিল স্ত্রী সহবাসে অক্ষম। তাই কুন্তীর জীবনে এদিক থেকেও সমস্যার শেষ ছিল না। যদিও স্ত্রী সহবাসের অক্ষমতার বিষয়টিকে আড়ালে রাখার জন্য পাণ্ডুর জীবনে অভিশাপের আখ্যানকে মহাভারতে আনা হয়েছে। আধুনিক পাঠক মাত্রই বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়টিকে ভাবলেই এর উত্তর পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে পাণ্ডুর ইচ্ছা ছিল পিতৃঋণ পরিশোধের। কিন্তু নিজে সহবাসে অক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে কুমারী অবস্থায় কুন্তীর ঋষি দুর্বাসার থেকে পাওয়া আশীর্বাদ স্বরূপ বরের। কারণ সেই সময়ের বিশ্বাস অনুসারে জানা যায় যে, পুত্র ছাড়া কেউ পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারত না। অন্যদিকে সেই সময়ের সামাজিক বিধান অনুসারে ঔরসজাত পুত্র ছাড়াও আরও একাধিক পন্থা ছিল, যা থেকে সমাজ স্বীকৃত সন্তান পাওয়া সম্ভব হতো (এই নিয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি)।

কুমারী অবস্থায় কুন্তীর ঋষি দুর্বাসার থেকে বর পাওয়ার বিষয়টি পাণ্ডু জানতে পারলে ওই বরের মাধ্যমে নিজে পুত্র লাভ করার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে। ফলে পাণ্ডুর ইচ্ছাতেই কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়, যার পিতা স্বয়ং ধর্ম দেবতা। এখানেই প্রশ্ন তোলেন কালকূট। যুধিষ্ঠিরের পিতা স্বয়ং ধর্ম দেবতা যদি হয়, তাহলে এখানে ‘ধর্ম’ নামক ব্যক্তিটি কে? বিশ শতকের অনেক মহাভারত গবেষকের বা সাহিত্যিকের মতো কালকূট নিজেও মনে করেন এখানে ‘ধর্ম’ নামক ব্যক্তিটি হল বিদুর। এর কারণ হিসাবে তিনি দেখান যে, বিদুরের প্রতি কুন্তী যথেষ্টই দুর্বল ছিল এবং বিদুরের সাহায্যেই বস্তুতপক্ষে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠিরের পিতা হিসাবে বিদুরকে ভাবা আমাদের পক্ষে অনেকটাই কষ্টকর। যদিও ইরাবতী কার্ভে এবং প্রতিভা বসু’র মতো বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা এইরূপ ভেবেছেন। কিন্তু, ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে যুধিষ্ঠির ও বিদুর উভয়ের মধ্যেই চরিত্রগত দিক থেকে মিল আছে। মহাভারতের এক জায়গায় ব্যাসদেব তাই বিদুর ও ধর্মকে একীভূত করে দেখেছে। এই একীভূত করার বিষয়টিকে আমরা চরিত্রগত গুণাবলীর মিল হিসাবেই দেখতে চাই, পিতা এবং পুত্রের সম্পর্ক হিসাবে দেখতে চাই না। এই বিষয়ে আমরা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এবং প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী’র সঙ্গে সহমত। গবেষণার পরবর্তী অংশে এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যদিও এই পৃথা উপন্যাসে কালকূট বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সম্পর্কটি পিতা ও পুত্র হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন, তাঁর মতামত এক্ষেত্রে ইরাবতী কার্ভে ও প্রতিভা বসু’র সঙ্গে মিলে যায়। ভাবনার এই সূত্র ধরেই কালকূট ভীম ও অর্জুনের পিতা হিসাবে ঋষিপুরুষদেরই কল্পনা করেছেন। তাঁর যুক্তি হিসাবে তিনি বলেছেন যে, পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ঋষিদের তরফ থেকেই কুন্তী ও পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পাণ্ডুর মৃতদেহ নিয়ে হিমালয় থেকে স্বয়ং ঋষিরাই হস্তিনাপুরে এসেছিল।

পাণ্ডু তিনজন পুত্রের মুখ দেখতে পেলেও শান্তি পায় না। তাই আরও পুত্রের বিষয়ে কুন্তীকে জানালে কুন্তী আর পুত্রের জন্ম দিতে সম্মত হয় নি। কারণ হিসাবে শিক্ষিতা কুন্তী সেইসময়ের সামাজিক বিধান সম্পর্কে সচেতন ছিল। যেই বিধানে স্পষ্ট বলা ছিল যে, চারজন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে সেই নারী স্বৈরিণী হিসাবে পরিচিত হয়। যদিও কুন্তী জানত যে, অবিবাহিত অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার প্রথম সন্তান কর্ণের জন্ম হয়েছে। তাই আর সন্তান জন্ম দিতে কুন্তীর মন চায় না। কালকূট এখানে তাই কুন্তী চরিত্রের হৃদয়ের যন্ত্রণা তুলে ধরতে চেয়েছেন। লেখক বুঝতে চেয়েছেন কুন্তীর না বলা বেদনা ও যন্ত্রণাকে। কালকূটের কলমে উঠে এসেছে তাই:

কুন্তীর মনে একটা বড় কষ্টই ছিল। তিনি জানতেন প্রথম পুরুষের সংসর্গে তাঁর কুমারীত্ব অটুট থাকলেও চারজন পুরুষের সংসর্গ তিনি করেছিলেন। অন্তরে তিনি স্বৈরিণী ছিলেন,... ..^{৫৯}

মাদ্রীর সন্তানদের প্রতি কোনও অন্যায় কুন্তী করে নি, বরং আদর যত্নে তাদের সর্বদাই খেয়াল রেখে এসেছে। কখনও কখনও সেই যত্ন নিজের সন্তানদের থেকেও বেশি হয়েছে, নকুল ও সহদেবের প্রতি কুন্তী অতিরিক্ত সচেতন ছিল। তাই বনবাসে যাওয়ার সময় দ্রৌপদীকে মাদ্রী পুত্রদের প্রতি একটু বেশি নজর দেওয়ার নির্দেশ কুন্তী দ্রৌপদীকে দিয়েছিল। ভাইদের মধ্যে ঝগড়া ও মনের দ্বন্দ্ব হোক এমনটা কুন্তী কখনও চায় নি। কিন্তু ভাগ্য দেবীর নিষ্ঠুর পরিহাস কুন্তীকেও যথেষ্টই কষ্ট দিয়েছে। তার দুই পুত্র কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে বিরোধ তাকে দেখতে হয়েছে, এমনকী উভয়ের মধ্যে বিরোধ মহাযুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের অস্ত্রে বড়ো ভাই কর্ণের মৃত্যুও হয়েছে। মা হিসাবে কুন্তী তার সাক্ষী থেকেছে। কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের বিরোধ আটকানোর জন্য কর্ণের কাছেও কুন্তী গিয়েছে, কিন্তু তার মনের ইচ্ছামত ফল হয় নি। ফলে ভাইয়ের অস্ত্রে ভাই এর মৃত্যু একজন মা হয়ে তাকে দেখতে হয়েছে। সারা জীবন অন্তরে অন্তরে এই ব্যথা ও যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে। কর্ণের কাছেও ধিক্কার বাণী শুনতে হয়েছে কুন্তীকে, যা একজন মা হিসাবে তাকে যথেষ্টই বেদনা দিয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে কর্ণের আচরণকেও আমরা দোষ দিতে পারি না। কালকূটের কলমে উঠে এসেছে:

তুমি আজ তোমার পুত্রদের জীবন রক্ষার্থেই আমার কাছে এসেছো, কিন্তু আমি দুর্যোধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি কৌরব পক্ষে থেকে যুদ্ধ করব। তবে তোমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিজ্ঞা করছি। অর্জুন ভিন্ন তোমার আর চারিপুত্রকে সুযোগ পেলেও হত্যা করব না। কিন্তু অর্জুনকে রেহাই দেবো না। যদি অর্জুন নিহত হয়, তাহলেও তুমি পাঁচ পুত্রের জননী থাকবে? আমি নিহত হলেও পাঁচপুত্রেরই জননী থাকবে।^{৬০}

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ। কর্ণ সহ মারা গেছে পাণ্ডব পক্ষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তথা যোদ্ধারা। অশ্বখামার হাতে মারা গেছে দ্রৌপদীর সন্তানরা, মারা গেছে অভিমন্যুর মতো সাহসী যোদ্ধা এবং আরও অনেকেই। কুন্তীকে এই সমস্ত বিষয়গুলিও অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়েছে। শেষে একদিন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীদের সঙ্গে কুন্তীও অরণ্যে বানপ্রস্থে গমন করে। কুন্তী চরিত্রটি মহাভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বালিকা অবস্থায় প্রাসাদে তাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ তেমন ছিল না, পালিতা কন্যা হওয়ার জন্য প্রকৃত বাবা-মায়ের ভালোবাসাও সে পায় নি, অতঃপর দুর্বাসার মতো অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত একজন ঋষির পরিচর্যা করা, নিতান্তই কৌতূহলবশত হয়ে সূর্যকে ডাকার ফলে কর্ণের জন্ম হওয়া এবং সামাজিক বিধি ও নিষেধের ভয়ে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া এবং শেষে অর্জুনের হাতে কর্ণের মৃত্যু— এই সমস্ত ঘটনা কুন্তীর জীবনে দাগ রেখে গেছে। তাই কন্যা রূপে হোক বা রাজ পরিবারের বধূ হিসাবেই হোক বা রাজমাতা হিসাবেই হোক কুন্তীর জীবনে সুখ ও শান্তি ভোগের অনেক সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ভাগ্যের নিতান্তই পরিহাসে তাকে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে। নারী হিসাবে প্রচুর কষ্ট পেলেও কুন্তী কিন্তু কখনই ভেঙে পড়ে নি,

আর এখানেই সে প্রকৃতপক্ষে অনন্যা। দুঃখের আগুনে পুড়ে, পাপবোধের দহনে এবং সত্যের উপলব্ধিতে কুন্তী মহাভারতের অন্য সকল চরিত্রদের থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কালকূট যথার্থই বলেছেন:

আমি দেখছি, ইতিহাসের পাতায় কি ঐশ্বর্যময়ী রমণীচিত্র অঙ্কিত, সারা জীবনের দুঃখের মধ্যেও যিনি ভেঙে পড়েননি এবং যোগাসনে বসে দাবানলে প্রাণত্যাগ করেছেন। পৃথার জীবন যেন সমস্ত সুখদুঃখের উর্ধ্বে। যিনি প্রেম কি তা জেনেছেন, কিন্তু সারাজীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর পাপবোধ, বিশ্বের সকল মানবীকে নতুন চেতনা দিয়েছে। পৃথা! তুমি আমাদের সকলের প্রণাম নাও।^{৬১}

কালকূট এভাবেই সহানুভূতি ও কোমলতা দিয়ে কুন্তী চরিত্রটিকে দেখতে চেয়েছেন। আবার অন্যদিকে মহাভারতের অনেক গবেষক বা সাহিত্যিক কুন্তীকে অন্যরূপে দেখতে চান। এই সমস্ত ভাবনাগুলিই সবই আমাদের বিদ্যায়তনিক পাঠে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বস্তুতপক্ষে মহাভারত একটি বহুমুখী সন্দর্ভ। তাই বিভিন্ন দিক থেকে এটিকে পড়া যায়।

কালকূটের রচিত *যুদ্ধের শেষ সেনাপতি* উপন্যাসটিতেও ধরা পড়েছে তাঁর নতুন ভাবনা। উপন্যাসটির বিষয় হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ক্লান্ত দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বথামার সংগ্রাম। আমরা জানি যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একাধিক অন্যায় করা হয়েছিল উভয় পক্ষের তরফেই। ঠিক তেমনই পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুও অনীতির সাহায্যে হয়েছে, অস্ত্র পরিত্যাগ করে একপ্রকার ধ্যানেই বসেছিল দ্রোণাচার্য, কিন্তু তাকে হত্যা করতে এগিয়ে আসে দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। স্বাভাবিকভাবেই এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বথামা উদগ্রীব হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আগুন তার অন্তরে জ্বলছিল। তবে এই উপন্যাসে কাহিনির নতুনত্ব সেরকম কিছু নেই, মহাভারতের কাহিনির অনুরূপ ঘটনা এখানেও ঘটেছে। শুধুমাত্র কালকূটের অভিনব উপস্থাপনার জন্যই তা হয়ে ওঠে আমাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী। উপন্যাসে কালকূট বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে রেখেছেন। যেমন উপন্যাসের শুরুতেই তিনি আমাদের নিয়ে যান কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে হওয়া দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধের পেছনে থাকা আদি কারণটির কাছে। যেটাকে তুলে ধরার জন্য কালকূট আমাদের নিয়ে যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিনের রাত্রিবেলায়। কালকূট এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

আজ আমি আপনাদের নিয়ে চলেছি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিনের রাত্রে। যে রাত্রে ঘটেছিল এক ভয়াবহ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সেই হত্যাকাণ্ডের নায়ক দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বথামা। কিন্তু সেই রাত্রে যাবার আগে, মূলের কিছু ঘটনা জটিল জালের ভিতর থেকে বের করে আনতে পারলে, অনেক কিছুই পরিষ্কার হতে পারে।^{৬২}

এই কথার সূত্র ধরেই কালকূট নিয়ে আসেন আর্য ও অনার্য দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ। এখানে ভারতের বাইরে থেকে আসা আর্যরা সিদ্ধু সভ্যতার মূল ধারক অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে আর্যরা এসেছিল ইউরোপের উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে বলে মনে করা হয়। এই দেশে আসার পর তারা অনার্য নারীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যেহেতু তারা তাদের সঙ্গে নারী নিয়ে আসে নি। এভাবে একদিকে যুদ্ধ ও অন্যদিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হয়। কালকূট মনে করেন যে, আর্য ও অনার্যের মধ্যে এই সময়কালই রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আপাতভাবে এই মিলনের মধ্যেই রয়ে যায় একটু দ্বন্দ্ব ও সংকট। মহাভারত মহাকাব্যের জন্ম এখান থেকেই। বলা বাহুল্য, কালকূটের এই ভাবনার সঙ্গে আমরা সুকুমার সেন মহাশয়ের মহাভারত সম্পর্কিত ভাবনার অনেক মিল পাই। সুকুমার সেন বা অমলেশ ভট্টাচার্য'র মতো খ্যাতনামা প্রাবন্ধিকদের ভাবনাতেও এই আর্য বনাম অনার্য তত্ত্বের অনেক মিল খুঁজে পাই। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা গবেষণার পরের অংশে করেছি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ প্রধানত দুই ভাইয়ের সংঘর্ষ ও বিরোধ। এই দুই ভাই দুটো ভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহামতি ব্যাসদেব এবং অন্যজন গঙ্গা-শান্তনু পুত্র ভীষ্ম। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাসদেব অনার্য সন্তান এবং ভীষ্ম আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত, ফলে বিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক বিষয়। তবে পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অপর কারণ হয়ে দাঁড়ায় কুরু ও পাণ্ডবগণ দ্বন্দ্ব। যার একদিকে ছিল দ্রোণাচার্য এবং অন্যদিকে দ্রুপদ। এগুলি ছাড়াও এই উপন্যাসে কালকূটের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্বেষণ হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাস্তবিক অর্থেই অধর্ম যুদ্ধ। লেখকের মনে হয়েছে কোনও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এই যুদ্ধ হলেও যে সকল পন্থা অবলম্বন করে রথী বা মহারথীদের হত্যা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গর্হিত এবং অধর্মিকের মতো কাজ। প্রতিটি হত্যার পেছনেই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, যুদ্ধ ধর্মের নীতি মেনে বধ করা হয় নি যোদ্ধাদের। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে 'ধর্মযুদ্ধ' আখ্যা দেওয়ার ঘোরতর বিরোধ করেছেন কালকূট। এরপর অন্যায়ভাবে যে সকল যোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে সেই বিষয়ে কথা বলেছেন লেখক। দেখিয়েছেন দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং দুর্যোধন প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের হত্যার পেছনে কীভাবে পাণ্ডবদের সুপারিকল্পনা কাজ করেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ সময়ে যখন শল্য মারা গেছে, দুর্যোধন চরমভাবে পরাজিত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় সময় গুনছে, তখন অশ্বখামাকেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়। যুদ্ধের শেষ সেনাপতি হিসাবে। সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য এবং প্রতিশোধের জন্য সে তখন পুনরায় যুদ্ধের কথা ভাবে। সেনাপতি হিসাবে তার সঙ্গে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা সাথী হয়। সেই ভাঙা যুদ্ধের ময়দানে বীর অশ্বখামা নতুন এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এতদিন তারা যুদ্ধের নিয়ম মেনেই এবং ন্যায় পথে শত্রুকে পরাজিত করতে চেয়েছে, কিন্তু শত্রুরা অন্যায়ভাবে তাদের পরাজিত করেছে। এই বিষয়টি দ্রোণাচার্য পুত্র একেবারেই মেনে নিতে

পারে নি, তাই আর ন্যায়পথে যুদ্ধের লড়াই লড়বে না সে। বরং অন্যায়ভাবে হলেও শত্রুদের হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সে। এই বিষয়ে কালকূটের কলমে উঠে এসেছে:

ধৃষ্টদ্যুম্ন শুনে রাখ, তুমি বেঁচে থাকতে অশ্বখামা স্বর্গেও যাবে না। চিরকাল নরকবাস তার থেকে শ্রেয়। আমি পাণ্ডবদের-পাণ্ডবলিদের পুত্রদের কারোকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারব না। প্রতিশোধ চাই, ভয়ংকর প্রতিশোধ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। অন্যায় কূটযুদ্ধে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই।^{৬৩}

এরপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য অশ্বখামা অগ্রসর হতে থাকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে রাত্রিযাপনের সময় পর্যবেক্ষণ করে নিশাচর পাখির শত্রু নিধনের দৃশ্য। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে মনে মনে ভাবে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই রাত্রিতেই পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অন্যান্য দ্রৌপদীর সন্তানদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে সে। সমস্ত রাত ধরে সেই শিবিরের মধ্যে থাকা মানুষদের হত্যা করে সে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এও এক যুদ্ধ। তবে এই যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধের থেকে আলাদা, এই যুদ্ধ পিতৃহীন পুত্রের পিতার প্রতি ন্যায় বিচারের যুদ্ধ। তবে এরপর কালকূট অশ্বখামাকে এক অন্য চেতনায় রূপ দেন। হৃদয়ের উপলব্ধিতে হিংসার পথ ত্যাগ করে অহিংসার পথে যাত্রা করতে চায় সে। এত সমস্ত হত্যা, মৃত্যুর পরেও জীবনকেই বড়ো করে দেখতে চেয়েছে অশ্বখামা। ঘটনার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, সমস্ত উন্মাদনার শেষে সম্পূর্ণ অন্য এক দ্রোণাচার্যের পুত্রকে আবিষ্কার করে পাঠক। যার চোখ দিয়ে অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ে এবং মুখ থেকে উচ্চারিত হয়- ‘রক্তের পিপাসা শেষ হোক, জীবন ধন্য হোক। আমি আজীবন এই পৃথিবীর মাটিতে, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করতে চাই’।^{৬৪}

এই অশ্বখামা ব্যাসদেবের মহাভারতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। এই নবনির্মিত চরিত্র অবশ্যই কালকূটের নিজস্ব নির্মাণ। মহাভারতেও অশ্বখামা শান্তির বাহকই হয়, কিন্তু সেখানে মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপিত হয় না। সেখানে অশ্বখামা ব্যাসদেবকে বলে- ‘আমি আপনার কাছেই থাকব। তারপর অশ্বখামা পাণ্ডবগণকে মণি দিয়ে বনগমন করলেন’।^{৬৫} এখানেই উভয়ে অশ্বখামাকে আমরা পৃথক করতে পারি। কালকূটেরট এই নবনির্মাণ আমাদের মুগ্ধ করে।

আমরা বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিমল কর এবং কালকূটকে পেয়েছি। এছাড়াও অন্যান্য লেখকেরা তো আছেনই। কিন্তু এই দুই কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ তাঁদের উভয়ের লেখাতেই আলাদাভাবে এসেছে। বিমল কর তাঁর লেখায় আমাদের পরিচিত চেনা জানা মানুষদেরই তুলে আনেন, এই মানুষগুলির একদিন বা প্রতিদিনের যাপনের মধ্যেই ঔপন্যাসিক পরিচয় করিয়ে দেন আমাদের

এক গভীর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে। এর পাশাপাশি তাঁর লেখায় উঠে এসেছে গভীর দর্শনও। এই সমস্ত মানুষগুলির চেতনা জগত প্রকাশের ক্ষেত্রে, জটিল কোনও সম্পর্কের আভাস দিতে বা সমাজের কোনও বিশেষ সমস্যাকে উপস্থাপনের প্রশ্নে বিমল কর মহাভারতকে টেনে আনেন। কিন্তু তিনি মহাভারতের কালে ফিরে যান না। তিনি যাত্রা করেন আধুনিক মানুষের মন থেকে মনে। কিন্তু কালকূট সম্পূর্ণ এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। কালকূট এই ধরনের উপন্যাস রচনার প্রশ্নে ফিরে যান মহাভারতের কালে। পাঠককে সঙ্গে নিয়ে এই যাত্রায় তিনি তুলে আনেন মহাভারতেরই কিছু চরিত্রকে। সেই সকল চরিত্রের মধ্যে অলৌকিকতা বা অতিমানবীয় বিষয়কে ফেলে দিয়ে মানবতার খোঁজ করেন কালকূট। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধিক যুক্তিশীলতা বা আধুনিক মনন দিয়ে মহাভারতকে বারবার বুঝতে চান কালকূট। তার ফলে আমাদের কাছে বহুকালের পুরনো মহাভারতের চরিত্রগুলি হয়ে ওঠে স্পর্শযোগ্য রক্তমাংসের মানুষ।

১.৫।। দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩)

বিশ এবং একুশ শতকের বড়ো একটি সময়কাল জুড়ে বাঙালির মহাভারত চর্চার বিশ্বে কথা সাহিত্যিক দীপক চন্দ্র বিশেষ এক স্থান অধিকার করে আছেন। আমাদের আলোচিত এই অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি একগুচ্ছ ঔপন্যাসিকদের যাঁরা মহাভারতের কাহিনি বা চরিত্রকে অলৌকিকতার আবরণ থেকে সরিয়ে আধুনিক যুক্তিবাদের আলোকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁদের উপন্যাসগুলিকে সামনে রেখে আমরা আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছি। আলোচনার এই পরিসরে গজেন্দ্রকুমার মিত্র থেকে বিমল কর, কালকূট, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, তিলোত্তমা মজুমদার প্রমুখ লেখকেরা স্থান করে নিলেও এঁরা কেউই কিন্তু দীপক চন্দ্রের মতো মহাভারত কেন্দ্রিক প্রচুর উপন্যাস লেখেন নি। দীপক চন্দ্র এদিক থেকে অন্যান্য সকল ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক গুণ এগিয়ে আছেন। তাঁর মহাভারত কেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা এতটাই বেশি যে আমাদের এই সীমিত পরিসরে তার সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের অভিনবত্ব সম্পর্কে এখানে কথা বলব। মহাভারত সম্পর্কিত তাঁর উপন্যাসগুলি হল- *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম*, *ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ*, *শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়*, *বিষম শ্রীকৃষ্ণ*, *কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন*, *তোমারই নাম কর্ণ*, *পিতামহ ভীষ্ম*, *এবং অশ্বখামা*, *গান্ধারী*, *কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী*, *কৃষ্ণভগবান*, *আশ্রমকন্যা শকুন্তলা*, *মহাভারতের শকুনি*, *দ্রৌপদী চিরন্তনী*, *দ্বৈপায়নে দুর্যোধন*, *কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ*, *সম্রাজ্ঞী কুন্তী*, *শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম্* ইত্যাদি।

মহাভারত একটি বিচিত্রধর্মী মহাকাব্য। বহু বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনির স্থান মহাভারতে আছে। মহাভারত থেকে আমরা যেমন পেয়েছি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির চরিত্র, ঠিক তেমনই কিছু অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রও মহাভারতকে এত বড়ো মহাকাব্য করে তুলতে সাহায্য

করেছে। তাই এখানে প্রধান চরিত্রগুলির পাশাপাশি গৌণ চরিত্রগুলির ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। অনেক সময় আবার গৌণ চরিত্রগুলির জন্যই প্রধান চরিত্রগুলি মানুষের মনে গভীরভাবে স্থান পেয়েছে। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর *মহাভারতের লঘু গুরু* নামক বইতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখেছি ভীম ও অর্জুন এত খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছে বা বলা ভালো মানুষের মনে অধিক জায়গা পেয়েছে উল্টোদিকে নকুল ও সহদেবের জন্যই। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করেছি। এখন সেই দিকে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু, আমরা এটা বলতে চাই যে প্রধান চরিত্রগুলির ভিত্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে এমন কিছু চরিত্র যারা প্রথম সারিতে না এলেও মহাকাব্যের অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। মহাকাব্যের বিশাল গভীরতায় তাদের স্থান হয়তো খুব একটা বেশি নয়। এমনই অনেক চরিত্রকে নিয়ে দীপক চন্দ্র তাঁর একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। চরিত্রের মহারণ্য থেকে বেশ কিছু চরিত্রকে নির্বাচন করে মহাভারত এবং এর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির মনের মধ্যে থাকা গভীর গোপন রহস্যকে খুঁজতে চেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, মহাভারতের মধ্যে থাকা অলৌকিক ঘটনা বা এমন অনেক না বলা কথার বিষয়গুলিকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের উপযোগী করে ভেবেছেন দীপক চন্দ্র। একটি পরিবারের নামের নেপথ্যে গোটা ভারতের যে সাম্রাজ্য ও রাজনীতি এবং কূটনীতি কাজ করেছে, তার লক্ষণগুলি ধারণ করে আছে মহাভারতের চরিত্রেরা। মহাভারতের ভেতরে থাকা সেই সকল রহস্যের খোঁজ করতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর এই প্রয়াস চরিত্রগুলির একটি নতুন পাঠ আমাদের সামনে তুলে ধরে।

মহাভারতের বিশেষ কোনও চরিত্রের নবনির্মাণ আমরা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সংস্করণের পাশাপাশি উপন্যাসেও পেয়েছি। প্রমথনাথ বিশী থেকে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল কর, কালকূট, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপন্যাসিকদের লেখায় এই কাহিনিগত বা চরিত্রের নবনির্মাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু, এখানেই অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে দীপক চন্দ্র পৃথক হয়ে যান। তাঁর অন্যতম কাজ হল ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যদেরকে নিয়ে বিস্তৃত সাহিত্যচর্চার নতুন ধারা নির্মাণ করা। এই সাহিত্যচর্চার ধারায় যে সকল উপন্যাসগুলি আমাদের হাতে এসেছে, সেগুলি ‘পৌরাণিক উপন্যাস’ নামে খ্যাত। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে এক এক করে ধরে যে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় লেখক নবনির্মাণ করেছেন, তার ফলে পাঠক পুনরায় ভাবতে বাধ্য হয় ঘটনাগুলি বাস্তবেই এভাবে ঘটেছিল কিনা। আমরা আমাদের আলোচনায় এক্ষেত্রে গাফানারী ও মাদ্রীকে উপস্থাপন করে বিষয়টি দেখাতে চাইব। মহাভারতের নারীরা পুরুষদের থেকে কোনও অংশেই সেভাবে পিছিয়ে থাকে নি। অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ভূমিকা তারা গ্রহণ করেছে। এমনকী মহাভারতের অনেক নারীরা কূটনীতি, ধর্ম, নীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল সম্পর্কেও পুরুষের সমান জ্ঞানী ছিল। স্বয়ং দ্রৌপদী এক্ষেত্রে একাধিকবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণও হয়েছে। তবে নারীর প্রতি হওয়া অবিচার ও অত্যাচার দ্রৌপদীর মতো সোচ্চারভাবে অনেকই বলতে না পারলেও

মহাভারতের জটিল রাজনীতি অনেক প্রধান নারী চরিত্রকেই পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। ফলে তারা দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে রাজনীতির প্রাঙ্গণে। এই রাজনীতির প্রভাবেই কেউ সম্রাজ্ঞী থেকে গেছে, আবার কেউ রাজবধূ হওয়া সত্ত্বেও থেকে গেছে সামান্য এক নারী হিসাবে। এই রাজনীতিই সামান্য এক দাস রাজার কন্যাকে করে তোলে সমগ্র হস্তিনাপুরের সম্রাজ্ঞী তথা রাজমাতা সত্যবতী হিসাবে, আবার পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী ধর্মপত্নী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির বলি কাঠে নিজেকে বলি দিতে বাধ্য হয়। রাজনীতির এই চালে কেউ সম্রাজ্ঞী, আবার কেউ সামান্য বোড়ে মাত্র। এই সমস্ত চরিত্রেরই গুরুত্ব আছে আমাদের সাহিত্যে, এমনকী তারা না থাকলে মহাভারত এভাবে তৈরি হতো না। এই সকল নারী চরিত্রদের মধ্যে গান্ধারী অন্যতম। হয়তো গান্ধারীর মতো একজন ধর্মপরায়ণা নারী না থাকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাস্তবে হতো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সাহিত্যিক দীপক চন্দ্র গান্ধারীর চোখের বাঁধন খুলে নির্মাণ করেছেন নতুন এক গান্ধারীকে। তাঁর উপন্যাসের নাম *গান্ধারী*, *কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী*। উপন্যাস বাস্তবিক অর্থেই আধুনিক জীবনের মহাকাব্য। এই উপন্যাসের মধ্যেই দীপক চন্দ্রের চরিত্রেরা মনের গোপন কথা আমাদের সামনে খুলে বলে। দীপক চন্দ্র এই সকল উপন্যাসের আঙ্গিকেই এখানে মহাভারতের সেই নারী চরিত্রটির মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন। যার ফলে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে মহাকাব্যের ধূলিধূসরে চাপা পড়ে থাকা রক্ত মাংসের গান্ধারী। মহাভারতে ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নতুন দৃষ্টিকোণে উঠে এল দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে। এভাবেই গান্ধারী নামক চরিত্রটিকে নতুন করে ভাবনার অবকাশ রেখে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন দীপক চন্দ্র। তবে এই বিষয়ে দীপক চন্দ্র তাঁর *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম*-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, যেখান থেকে তাঁর পৌরাণিক উপন্যাসগুলিতে তাঁর যে ভাবনার প্রকাশ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন:

বলা বাহুল্য, ইতিহাস সৃষ্টি আমার নয়। সে চেষ্টাও করি নি। তবে মহাকাব্যের আখ্যানগুলিকে নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জন করেছি। অলৌকিক কাহিনী হয় বর্জিত হয়েছে, না হলে তার বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আধুনিক মানুষের চিন্তা, রুচি ও মেজাজের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছি। পুরাণের পৌরাণিকতাকে রেখে আজগুবি অসম্ভব ঘটনার ভার হালকা করেছি।^{৬৬}

মহাভারতে গান্ধারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। যদিও অধিকাংশ সময় রাজনীতির সামনে সে সরাসরি হাজির হতে চায় নি। মনের ভেতরে গভীর বৃহৎ সুগু ইচ্ছাও সেরকম কিছু ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্র রাজনীতির বলিকাঠে মাথা দিতে বাধ্য হয়েছে সে। প্রথমেই আমরা দেখতে পাই গান্ধারীর নামটিকে ভেবে দেখলে, একটি রাজ্যের রাজকন্যা সে এবং পরবর্তীতে হস্তিনাপুরের ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মপত্নী, তবুও সমগ্র মহাভারতে গান্ধারীর নিজের আসল নাম আমরা পাই না। একটি রাজ্যের নাম গান্ধার, যা বর্তমানের আফগানিস্তানের কান্দাহার নামে খ্যাত, সেখানকার রাজ্যের

নাম অনুসারে রাজকন্যার নাম গান্ধারী আমরা পেয়েছি। গান্ধারী চরিত্রটি মহাকবি ব্যাসদেবের নির্দিষ্ট কাহিনি পরিচালনার আধার। অথচ মহাভারতে কুরু রাজবংশের এই বধূটির নিজস্ব কোনও নামের উল্লেখ নেই। বরং রাজ্যের নামে, জাতির নামেই তার পরিচয়। গান্ধার থেকে গান্ধারী। পৃথকভাবে মনে রাখার বা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি ব্যাসদেব। তার চরিত্রটিকে ‘ধর্ম’ নামক আদর্শের মোড়কে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। দীপক চন্দ্র গান্ধারীকে নিয়ে অপরিচিত এক নারীর হৃদয়ের ব্যথা ও গোপন সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। আপাততভাবে ধর্মের মোড়কে যে অধর্মের যুদ্ধ আঠারো দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের ময়দানে হয়েছিল, দীপক চন্দ্র সেইটি তুলে ধরেছেন এই অভাগী চরিত্রটির মাধ্যমে।

লেখক দেখতে চেয়েছেন গান্ধারীর জীবন কীভাবে প্রথম যৌবনের কুমারী অবস্থা থেকেই রাজনীতির নোংরা খেলার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। মহাভারতে সৌজন্য ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিবাহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু, সাধারণভাবে অন্ধ একটি রাজা বা রাজকুমারকে বিবাহ করতে কেনই বা আগ্রহী হবে একজন রাজকন্যা? বিশেষ করে উভয়ের মধ্যে পূর্বে প্রেমের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত উভয়েই উভয়ের কাছে একপ্রকার অচেনাই বটে। রূপকথার গল্পে এরকম অনেক কাহিনি থাকলেও বাস্তবের মাটিতে এরকম ঘটনা একটু জটিল ব্যাপার। লেখক তাই বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টিকে ভাবতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন রাজকুমারী গান্ধারী সেইসময়ের ভারতে জোট রাজনীতিতে রাজনৈতিক ঘুঁটি ছাড়া আর কিছু ছিল না।^{৬৭} বাস্তবিক অর্থেই সে ছিল ব্যাসদেবের হাতের পুতুল। তার সমস্ত আচরণ কৃত্রিম ও মেপে দেওয়া। অন্ধের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া গান্ধারীর ইচ্ছাতে না থাকলেও গান্ধার রাজ্যের রাজনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানের জন্য সম্মতি প্রদানে বাধ্য হয় সে। কারণ অন্ধ হোক বা স্বাভাবিক হোক একজন রাজকুমারের বিবাহের সম্মতি নিয়ে স্বয়ং ভীষ্ম গান্ধারে রাজা সুবলের কাছে গিয়েছে, এই বিষয়টা রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজা সুবল জানত যে হস্তিনাপুরের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্য বা রাজ্য টিকে আছে এই প্রবল প্রতাপশালী ও পরাক্রমী মানুষটির জন্যই, এমনকী এর পূর্বেও বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিনজন রাজকন্যাকে ভীষ্ম অপহরণ করেছিল। সেখানে পরাক্রমশালী বহু রাজা ও যুবরাজ ভীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। তাছাড়া হস্তিনাপুরের সৈন্য সামন্তের আকার এবং প্রভাব তৎকালীন ভারতে অত্যন্ত বেশি ছিল, তাই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিবাহে রাজা সুবল সম্মতি না দিয়ে পারে নি। উল্টোদিকে গান্ধারের মতো ক্ষুদ্র ও কম শক্তিশালী একটি রাজ্যের রাজকন্যা হয়ে গান্ধারী তার পিতার রাজ্য ও সেই রাজ্যের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত তারই ফল হিসাবে এই বিবাহ। কিন্তু রাজা সুবলের পুত্র শকুনি বোনের এই বিবাহ হৃদয় থেকে মেনে নিতে পারে নি, ফলে শকুনি হস্তিনাপুরে চলে আসে এবং পরবর্তীতে নিজের ভাগ্নে দুর্যোধনের যুবরাজ হওয়ার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু

শকুনির এই সমস্ত কাজ সফলতা পায় নি, বাসুদেব কৃষ্ণের সাহায্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবরা যুদ্ধে জয়ী হয় এবং পাণ্ডবদের এই জয়কেই ধর্মের বিজয় হিসাবে সেই সময় এবং পরবর্তীকালেও দেখা হয়েছে। যদিও সাহিত্যিক দীপক চন্দ্র এই জয়কে কোনওভাবেই ধর্মের বিজয় হিসেবে দেখতে রাজি নয়।

গান্ধারী চরিত্রটির মধ্যে দুইটি সত্তা লেখক খুঁজে পেয়েছেন। একদিকে রাজকন্যা গান্ধারীর রানী হয়ে মা রূপে উত্তরণ, নিজের পরিবার এবং সন্তান সম্পর্কে যার সচেতনতার প্রকাশ কম। আবার অন্যদিকে সেই সচেতন রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটে কুরুক্ষেত্রের ভয়ানক যুদ্ধের মর্মান্তিক রক্তক্ষয়ী ফলাফল দেখার পর। এখানে গান্ধারীর সত্তাকে উপস্থাপন করেছেন দীপক চন্দ্র।

ধর্ম, সত্য, আদর্শের রঙিন ক্যাপসুলটি রোগ প্রতিষেধক বটিকার মতোই আমাদের কাছে লোভনীয়। কখনও ক্যাপসুলের আবরণ খুলে দেখি না তার ভেতর কী আছে? ‘স্ত্রী পর্বে’ কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে গান্ধারী প্রথম পুতুলের সাজ খুলে দাঁড়াল। রক্তমাংসের মানুষের হৃদস্পন্দনের ধুকপুক, ধুকপুক শব্দ প্রথম শুনলাম তার বুকে। মানবী গান্ধারীর সাথে দেখা হল কুরুক্ষেত্রে।^{৬৮}

দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে গান্ধারীর গলায় গানের মধ্যে দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই গান্ধারীর সরল মন তখনও রাজনীতির জটিল আবর্তে ঘেঁটে যায় নি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় শকুনির আগমনের মধ্যে দিয়ে, গান্ধারী শকুনির আচরণ খেয়াল করে বুঝতে পারে কিছু একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে চলেছে। প্রাচীনকালের কোনও ছোট বা দুর্বল রাজ্যের রাজকুমারীকে সর্বদাই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হতো এই বিষয়ে, এই সকল রাজকন্যাদের বিবাহ হতো কোনও শক্তিশালী রাজ্যের রাজা বা যুবরাজের সঙ্গে, কিন্তু রাজকুমারীর হৃদয়ের ইচ্ছা এখানে গৌণ বিষয় ছিল। তাদের নিজস্ব মতামতের কোনও গুরুত্ব ছিল না। এভাবেই গান্ধারীর জীবনের প্রথম পর্ব থেকে তার ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করলেন দীপক চন্দ্র। শকুনি বাল্যকাল থেকেই বোন গান্ধারীকে অত্যন্ত ভালোবাসত, তার স্নেহের বোনের জীবনের গতিপথ এভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে তা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারে নি সে। যদিও কূটনীতি ও রাজনীতিতে পারদর্শী শকুনি হস্তিনাপুরের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহল ছিল। অন্যদিকে গান্ধারীও রাষ্ট্র ক্ষমতার জটিল সমীকরণ এবং রাজনীতির আবর্তে নারী যে পণ্য তা বুঝতে পেরেছিল। সেই রাজনীতির আবর্তে নারীর যন্ত্রণা ও হাহাকারের বাস্তবিক অর্থে কোনও গুরুত্ব নেই। মহাভারতে গান্ধারীর মনে এক্ষেত্রে অনেক দ্বিধা ও সংকট কাজ করেছিল, কিন্তু দীপক চন্দ্রের গান্ধারী প্রথম থেকেই আত্মসচেতন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। জীবনের অপ্রকাশিত কথা অনুভব করার জন্য একটি সচেতন মন তার ছিল। সেই জন্যই সে বুঝতে পেরেছে গান্ধারীর ভূমিতে কিছু একটা নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে চলেছে। দীপক চন্দ্রের কলমে উপস্থাপিত হয়েছে

একজন রাজকন্যার মনের গভীর ভাবনা। নারীর ভাগ্যলিপি এবং অপমানের কথার পরিপ্রেক্ষিতে দীপকচন্দ্রের গান্ধারীর মুখে শোনা যায়:

আমি এমন কোনও মন্দ কপাল করে আসিনি যে তার জন্যে কোনও শঙ্কা থাকতে পারে। তবে রাজকন্যা বলেই দুর্ভাবনা। কারণ, রাজনীতির ঘোলা আবর্তে তোমরা ঘরের মেয়েকে টেনে আনতে কুণ্ঠা করো না। ... এ তো পুরান খেলা।^{৬৯}

তবে একজন সচেতন নারী হিসাবে গান্ধারী রাজনীতির প্যাঁচে নিজের ভাগ্য বিপর্যয় হতে পারে এমনটা হয়তো আন্দাজ করেছিল। কারণ গান্ধার রাজ্যের ক্ষমতা সম্পর্কে গান্ধারী পূর্ণ মাত্রায় ওয়াকিবহল ছিল। দীপক চন্দ্র উপন্যাসে দেখিয়েছেন গান্ধারীর ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছিল তৎকালীন ভারতবর্ষে জোট রাজনীতির প্রসার বৃদ্ধির জন্য। কারণ তৎকালীন ভারতবর্ষে দু'টি ক্ষমতামালী রাজনৈতিক অক্ষ ছিল। একটি হস্তিনাপুর এবং অন্যটি মগধ। জোট রাজনীতির প্রসার বৃদ্ধির নেতৃত্ব এই দু'টি রাজবংশ দিচ্ছিল। ফলে ছোট ছোট রাজ্যগুলির পক্ষে এই জোট রাজনীতির বিরোধিতা করা একেবারেই কল্পনার বাইরে ছিল। তাই রাজা সুবলের গান্ধারীর বিবাহে মতামত না থাকলেও কিছু করার ছিল না। অন্যদিকে এই সমস্ত বিষয় দেখে গান্ধারীর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও রাগ জন্মানোই হয়তো স্বাভাবিক বিষয় ছিল, কিন্তু গান্ধারীর তা স্বভাবে ছিল না। নারীর জীবনের ধর্ম সহনশীলতা, ধৈর্য এবং সকলকে সুখে শান্তিতে রাখা— এই পথেই একজন নারীর এগিয়ে চলা উচিত বলে গান্ধারীর মনে হয়েছে। হিংসা ও লোভ নয়, বরং ভালোবাসা দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করা সম্ভব— এমনটাই গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল। আর এই বিশ্বাস তাকে কুন্তী ও দ্রৌপদীর থেকে মহাভারতে আলাদা করেছে। মহাভারতে কুন্তী ও দ্রৌপদী বা অন্যান্য অনেক নারীই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর লড়াই করেছে, কিন্তু গান্ধারীর মধ্যে এমনটা একেবারেই দেখা যায় না। আসলে বাস্তবিক অর্থেই গান্ধারী জীবনের এই পর্বে নির্লিপ্তই থেকে এসেছে, কারণ ভবিতব্য সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল সে। এখান থেকেই লেখক মনে করেছেন রাজনীতির মধ্যে গান্ধারী বলিপ্রদত্ত, তার কিছুই করার ছিল না। তার নিজের কিছু বলবার স্বাধীনতা ছিল না। এই নির্লিপ্ততা এবং অসহায়তাকে মহাভারত ধর্মের মোড়কে খ্যাতি দিতে চেয়েছে। কিন্তু ধর্মের এই বন্ধন মাঝে মাঝে গান্ধারীকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, নির্লিপ্ততা তার চারিত্রিক গুণ হলেও দিনের শেষে সেও একজন নারী তথা মা, তাই গান্ধারীর স্বরূপ ধরা পড়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে। মহাভারতের এই প্রাণহীন ও নিলিপ্ত গান্ধারীকে প্রাণসর্বস্ব নারীতে পরিণত করেছেন লেখক। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব সুবল কন্যার জন্য এতটা সময় খরচ করে নি। সংসার জীবনে তার প্রবেশ ঘটেছে অপমানের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু নিজের গুণে সে অপমানকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে কুরু বংশের বধূ হয়ে উঠতে চেয়েছে। যে কুরুবংশের প্রধান পুরুষ ভীষ্ম গান্ধারীর জীবনে সুখ ও শান্তির জোয়ার বয়ে আসতে বাধা দিয়েছে, তাকেও ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখতে

চেয়েছে গান্ধারী। ভীষ্মকে তাই পরবর্তী সময়ে শ্রদ্ধা দিতেও কার্পণ্য করে নি সে। ভালো করে খেয়াল করলে আমরা দেখব যে ব্যাসদেব পুরো মহাকাব্য জুড়ে গান্ধারীর চোখে কাপড় পরিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এমন একটি নির্মম বিষয়কে স্বামীর প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীলা নারীর চরিত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এর ফলে গান্ধারীর প্রতি মর্মান্তিক ও অমানবিক অত্যাচার হয়েছে। তাই দীপক চন্দ্র মনে করেন যে এরকম গল্প বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বাভাবিকতার উপরেই অবস্থান করে। তাই লেখক তাঁর লেখায় গান্ধারী চরিত্রটিকে এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতিনাটকীয়তা বর্জন করে মানবিকতার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে গান্ধারীকে। গান্ধারীর চোখ তখনই আবদ্ধ হয়েছে যখন সে স্বামীর সংস্পর্শে এসেছে, লেখক দেখিয়েছেন পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা টিকিয়ে রাখার জন্যই গান্ধারীর এমন সিদ্ধান্ত। লেখকের উপন্যাসের গান্ধারী করুণার স্পর্শে বিবাহিত জীবনের প্রেম মলিন হতে দেয় নি। গান্ধারীর এই অন্ধত্ব যেমন সমাজের বিরুদ্ধে এক নারীর প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে, ঠিক তেমনই কিছু সময় আমরা দেখতে পাই এই অন্ধত্ব তার চরিত্রিক দ্বন্দ্ব বা সংকটের রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে। গান্ধারীর চরিত্রে ধর্মের আবরণ, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা ও সংকটে পড়ে যাওয়া, সময়মতো যথার্থ কথা বলতে না পারা মহাভারতে গান্ধারী চরিত্রটির অন্যতম দিক। অন্যদিকে দীপক চন্দ্রের লেখায় আমরা দেখতে পাই গান্ধারী তার চোখ দুটি ঢাকা রাখার পেছনে ভীষ্মকেই দায়ী করেছে, কারণ তার পরবর্তী জীবন রঙিন ও আনন্দময় হতে পারত, কিন্তু গঙ্গা পুত্র ভীষ্মর জন্যই তা অধরা থেকে গেছে। তাই তার এই দশার জন্যই ভীষ্ম একমাত্র দায়ী।^{৭০}

দীপক চন্দ্রের গান্ধারী রাজপরিবারের মধ্যে হওয়া যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও কলহের সাক্ষী থেকেছে, বেশিরভাগ সময় নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের রাজা হওয়ার উগ্র বাসনা তাকেও পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতে দেয় নি। ফলে না চাইলেও বা ইচ্ছা না থাকলেও গান্ধারী নেমে এসেছে রাজনীতির ময়দানে। গান্ধারী তার পর্যবেক্ষণে বুঝতে পারে যে সিংহাসন দখলের পেছনে যে লড়াইটি চলছে তা আসলে দুইটি ভিন্ন গোষ্ঠীর লড়াই, যে লড়াই শুরু হয়েছিল অনেক পূর্বে, এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী অনার্য এবং অন্যটি আর্য। বস্তুতপক্ষে লড়াইটি রাজা শান্তনু-গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম বনাম পরাশর-সত্যবতী-ব্যাসদেব গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য মানুষের সম্পর্ককে কীভাবে নোংরা করে দেয়, গান্ধারীর উপলব্ধিতে তা উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। দীপক চন্দ্রের গান্ধারী রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব, তাই পাণ্ডু যখন শতশৃঙ্গ পর্বতে যায় তখন গান্ধারী তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বলে বুঝতে পারে যে নেতিবাচক কিছু একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। গান্ধারীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে আভাস দিয়েছিল যে সিংহাসন নিয়ে এই দ্বন্দ্বের পরিণাম সুখকর হবে না। তাই কুন্তীর সন্তান প্রসবের ঘটনায় গান্ধারী ঈর্ষা করে, কারণ বড়ো পুত্র হিসাবে যুধিষ্ঠির যুবরাজের দাবিদার স্বাভাবিকভাবেই হবে, তার ফলে গান্ধারীর সন্তানেরা পরবর্তীকালে সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে।

দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে গান্ধারী ও কুন্তীর মধ্যে একটি চরিত্রগত পার্থক্য লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মহাভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি চরিত্রকে বোঝার জন্য যা খুবই প্রশংসার যোগ্য। বিষয়টি হল সন্তান জন্মকে কেন্দ্র করে দুইটি বধূর মানসিক টানাপোড়েন এবং চিন্তা ভাবনার অস্থিরতা। যৌন মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানে অক্ষম পাণ্ডু এ বিষয়টি জেনেও গান্ধারী যখন জানতে পারে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে কুন্তী পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তখন গান্ধারী নিজের অস্থিরতা ঢেকে রাখতে পারে নি। কারণ গান্ধারীর কোথাও মনে হয়েছে যে, কুন্তী তার পুত্রদের সিংহাসনের অধিকার সহজে ছেড়ে দেবে না বা ভুলেও যাবে না। এক্ষেত্রে কোনটি রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্যের বাইরে যেখানেই থাকুক না কেন। গান্ধারীর মধ্যে ন্যায়ের প্রতি, সততার প্রতি দুর্বলতা অনেক ক্ষেত্রেই তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। অন্যদিকে, কুন্তী কোনও কিছুকেই সহজে ছেড়ে দেয় নি। ভাগ্যে না থাকলেও, প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছে। তাই একধারে গান্ধারীর নিষ্ক্রিয়তা ও নির্লিপ্ততা, অন্যদিকে কুন্তীর সক্রিয়তা— দীপক চন্দ্র এভাবেই চরিত্র দুটিকে দেখতে চেয়েছেন।

এছাড়াও দীপক চন্দ্র পাণ্ডবদের জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। ইরাবতী কার্ভে ও প্রতিভা বসুর মতো দীপক চন্দ্র মনে করেন যে, পাণ্ডবরা আসলেই বিদুরের সন্তান। নিজের উপন্যাসেও এই ভাবনাটিকেই তিনি রেখেছেন। এমনকী উপন্যাসে গান্ধারীও বিদুরের আচরণে অনেক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছে, তাই সে বিষয়ে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে সচেতনও করেছে। কারণ রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব গান্ধারী বুঝতে পেরেছে বিদুর-কুন্তীর সন্তানেরা পরবর্তী সময়ে তার পুত্রদের সম্পদে অধিকার বসাবে। এভাবেই উপন্যাসের গান্ধারী ব্যাসদেবের গান্ধারীর থেকে অনেক বেশি পরিণত ও রাজনৈতিক বোধে পরিপূর্ণ। ধৃতরাষ্ট্রকে সচেতন করে নিজের মনের কথা বলতেও ভুলেনি সে, তার কথায়:

স্বামী, মেয়েমানুষ বলে অবহেলা কর না, শ্রদ্ধা কর। মনে রেখ, মেয়েদের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। আগে থেকে সে বিপদ টের পায়। আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে পারছি একটা ঝড় আসছে। শতশৃঙ্গ পর্বতের চূড়ায় তা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একদিন হস্তিনাপুরের ওপর আছড়ে পড়বে।^{৭১}

গান্ধারীর মনের সংশয় পরবর্তীতে মিলে গেল, দুর্যোধনের জন্ম কিছুকাল পরেই হল, কিন্তু অদ্ভুতভাবে জন্মের সময় থেকেই দুর্যোধন অপয়া, পাপাত্মা হিসাবে অভিহিত হয়ে গেল। প্রতিভা বসুর মতো এক্ষেত্রেও দীপক চন্দ্র মনে করেন যে, জন্মকাল থেকেই একজন শিশুর নামের সঙ্গে এরূপ বিশেষণ যুক্ত হয়ে যাওয়াটা চক্রান্তের নামান্তরই বটে। অথচ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কৃষ্ণের জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তাকে এরূপ অভিধায় ভূষিত হতে হয় নি। আসলে বস্তুতপক্ষে এই সবটাই একটা মিলিত চক্রের চক্রান্ত, যারা সবাই মিলে দুর্যোধনের যুবরাজ পদের অধিকারকে ছিনিয়ে

নিতে চায়। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই এই চক্রান্তের মূল কারিগর স্বয়ং ব্যাসদেব। কারণ পাণ্ডবদের কেউই কুরু বংশের যথার্থ উত্তরাধিকারী নয়, কারণ বিদুরের পিতা ব্যাসদেব এবং মা একজন শূদ্রাণী। মহাভারতের শেষে আমরা দেখতে পাই বিশুদ্ধ আর্য রক্তের আর কোনও উত্তরাধিকার থাকে না। শান্তনুর নিজের রক্তের প্রজন্মরা সবাই শেষ হয়ে যায়।

হিমালয়ের পর্বতে পাণ্ডু মৃত্যুবরণ করলে সন্তানসহ কুন্তী হস্তিনাপুরে ফিরে যায়। স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর রাজ পরিবারে স্বামী হারা পত্নী হিসাবে কুন্তী গান্ধারীর স্নেহ পেতে শুরু করে। তার পুত্ররাও কৌরবদের খেলার সাথী হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই এর ভেতরে অন্য গন্ধ পেতে শুরু করে গান্ধারী। স্বাভাবিকভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান হতে বললেও হস্তিনাপুরের সম্রাট তাতে দৃষ্টি ফেরায় না। মহাভারতের গান্ধারী এতটা সচেতন না হলেও দীপক চন্দ্রের গান্ধারী আগাগোড়াই রাজনৈতিক বোধ সম্পন্ন, রাজনৈতিক বিপদ আগাম অনুমান করতে সক্ষম সে। সেই দূরদৃষ্টি থাকার ফলেই সে যেমন ব্যাসদেব ও ভীষ্মকে চিনতে পারে, ঠিক তেমনই কুন্তী চরিত্রের মধ্যে থাকা জটিলতা ও অস্পষ্ট দিকগুলিও তার নজর এড়িয়ে যায় না। তাই কুন্তীর সন্তানেরা যে দেবতার সন্তান এ কথা প্রচারের পেছনে অন্য অভিসন্ধির গন্ধ বুঝতে পারে গান্ধারী। আমরা আগেই বলেছি যে অলৌকিকতার মোড়ক মুছে ফেলে যুক্তি দিয়ে দীপক চন্দ্র মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রকে বুঝতে চেয়েছেন, তাই ‘দেবতার সন্তান’ এই কথা প্রচারের মাধ্যমে কুন্তীর যৌন ব্যভিচারকে মহাভারত ঢাকতে চেয়েছে এমনটাও হতে পারে বলে দীপক চন্দ্র মনে করেন। অথচ সমস্ত কিছু আন্দাজ করা সত্ত্বেও গান্ধারী নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে তৎপর হয় না, বরং নির্লিপ্ত থাকে। তার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন প্রতি মুহূর্তেই কাজ করেছে। পিতার মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কাছে টেনে নিয়েছে গান্ধারী, নিজের ছেলেদের জায়গায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে পাণ্ডবদের। গান্ধারীর ভালোবাসার এই বৈপরীত্য সত্যিই অবাক করে তোলে। আসলে গান্ধারী উন্নত মানবিকতার দৃষ্টান্ত বরাবরের মতো রক্ষা করতে চেয়েছে, রাজনীতির জটিল প্যাঁচ এক্ষেত্রে বাঁধা হতে দেয় নি। গান্ধারীর এই আচরণের মধ্যে দিয়েই তাকে চিনতে চেয়েছেন লেখক দীপক চন্দ্র। ন্যায়পরায়ণ গান্ধারী ধর্মকেই সর্বাত্মক স্থান দিয়ে এসেছে বরাবর, যদিও সেই ধর্মই একসময় তার হাত-পা বেঁধে দেয়। সন্তানদের সম্পর্কে খারাপ কথা শোনার ফলে মা হিসাবে তার মনেও বিরাগ জন্মেছে। যদিও দীপক চন্দ্রের মত অনুসারে এটাও রাজনীতির একপ্রকার খেলা ছিল। আবার দুর্যোধনরা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত থেকেছে, কিন্তু এই বিষয়ে গান্ধারীকে প্রশ্ন করলে গান্ধারী আবার নিরন্তর থেকেছে। কিন্তু উল্টোদিকে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেক গান্ধারীর মনেও অশান্তির বীজ বপন করেছিল, মানসিকভাবে স্থির থাকতে পারে নি সে। পরবর্তী সময়ে পাণ্ডবদের যখন বারণাবতে পাঠানো হয় তখনও মানসিকভাবে গান্ধারী বেদনা পেয়েছে, কারণ তার মনে হয়েছিল অশুভ কিছু ঘটতে পারে। ফলে মহাভারতে গান্ধারী এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ যে নিজের সন্তানদের থেকে পাণ্ডবদের

অধিক মাতৃস্নেহ দিয়েছে, আবার সাধ্যমতো তাদের পাশেও থেকেছে, কিন্তু যখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখন নিজের সন্তান দুর্যোধনের বিষয়ে তার মন সমর্থন দিয়েছে। গান্ধারী চরিত্রের এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তাকে মহাভারতে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করেছে।

পরবর্তী সময়ে বারণাবতে যখন পাণ্ডবদের মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন একমাত্র গান্ধারীই ঘটনাটি মন থেকে বিশ্বাস করতে পারে নি, কারণ তার মনে হয়েছে যারা সিংহাসনের অধিকারের জন্য এতো লড়াই করে এসেছে, সহজে তারা হারবে না। এর পাশাপাশি গান্ধারীর চোখ চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও পরবর্তী সময়ে আরও বৃহৎ সংকটের গন্ধ পেয়েছে সে। এরপর দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহ হয় এবং সবাই বুঝতে পারে যে পাণ্ডবরা মারা যায় নি। এখানেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা গান্ধারীর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্রৌপদীর বিবাহ গান্ধারীকে অনেকটা অবাক করেছে। কারণ কুন্তী পাঁচজন পুত্রের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের ব্যভিচারের স্বপক্ষে একটা রাস্তা পরিষ্কার করে রাখল। গান্ধারী অনুধাবন করতে পেরেছিল যে দ্রৌপদীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের সবার সঙ্গে তাকে সংসার করতে হবে, যেহেতু কুন্তীর কথাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাই সাংসারিক জীবনে অশান্তি হওয়াটা নিতান্তই সাধারণ ঘটনা ছিল। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই দীপক চন্দ্রের গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানী নির্মাণের। কিন্তু গান্ধারীর কোনও কথাকেই ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধন সত্য বলে মেনে নেয় না। পাশাপাশি দ্রৌপদীর বিবাহ সভায় দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনির অপমানের বিষয়েও জ্ঞাত ছিল গান্ধারী। তাই তার ভাবনাতেই ছিল যে এই সমস্ত হিংসা ও অপরাধ পরবর্তীকালে শুভ কিছু বয়ে আনবে না, বরং যুদ্ধের রাস্তা আরও প্রকট করে তুলবে। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত গান্ধারীর ভাবনা মিলে যায়। পাশা খেলায় পাণ্ডবরা শকুনির কাছে পরাজয় বরণ করে এবং দীর্ঘ বারো বছর অজ্ঞাতবাসে তাদের যেতে হয়। এসব ঘটনা দেখেও গান্ধারীর নিজেদের ছেলেদের প্রতি একপ্রকার ঘৃণা জন্মে যায়। প্রকৃতপক্ষে গান্ধারী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং পাশা খেলার আয়োজন মন থেকে মেনে নিতে পারে নি।

তবে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র কিন্তু এখানে পাণ্ডবদের আপাত সৎ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিরীহতাকে একেবারেই এড়িয়ে যায় নি। বরং তিনি দেখিয়েছেন যে, গান্ধারীকে কীভাবে রাজনীতির হাতিয়ার করে তাকে দিয়েই তার সন্তানদের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী ন্যায়, স্নেহ ও ভালোবাসার মতো বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে এসেছে। তাই পাশা খেলার আয়োজন এবং তারপরে ঘটে যাওয়া যাবতীয় দুর্ঘটনা সমস্ত বিষয়টিকেই কিন্তু গান্ধারী লজ্জার চোখে দেখেছে, তার মাথা নত হয়ে গেছে নিজের সন্তানদের ও ভাইয়ের কার্যকলাপের জন্য। তাই কুন্তীর অভিযোগের জন্যই হোক বা প্ররোচনা, যে কারণেই হোক, সে দরবারে গিয়ে এর

প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করে। কিন্তু ভেবে দেখে নি এই সমস্ত ঘটনার মূলে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধিহীনতা কাজ করেছে, পাশা খেলার বাজি যুধিষ্ঠির নিজেই নিয়েছে, শাস্ত্রে পাশা খেলা অন্যায় এরূপ জেনেও দু'বার খেলতে চেয়েছে। ফলে রাজ দরবারে গান্ধারী নিজে এসে যাবতীয় ঘটনার প্রতিবাদ করার মধ্যে তার সংবেদনশীলতা এবং নারী মনের উদারতার ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উল্টোদিকে গান্ধারী নিজে রাজনীতির শিকার। কারণ দ্রৌপদীর বিবাহসভায় দ্রৌপদীর করা একাধিক অপমানের বদলা হিসাবে দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনিরা প্রস্তুত হয়েছে এখানে এবং পাশা খেলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে কারণেই। কৌরবদের অপরাধ এখানে অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু তারাও পূর্বের অপমানের বদলা নেওয়ার জন্যই এরূপ করতে চেয়েছে। মাঝখানে গান্ধারীর মতো নারী যে রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখে নি, তার এখানে অর্থাৎ প্রকাশ্য রাজসভায় চলে আসাটা আসলে বাস্তবিকই উচিত হয় নি। দীপক চন্দ্রের গান্ধারী পরবর্তী সময়ে নিজের এই ভুল বুঝতে পেরেছে। ফলে এখানেও গান্ধারী চরিত্রের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পূর্ণরূপেই প্রকাশিত। একজন নারী হিসাবে নারীর অপমানে ছুটে যাওয়া যেমন তার কর্তব্য এবং ধর্ম, ঠিক তেমনই রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সক্রিয়তা না থাকা সত্ত্বেও রাজদরবারে ছুটে গিয়ে কুন্তীর কথায় দ্রৌপদীকে রক্ষা করা এবং পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ ও সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করা আসলেই তার কূট রাজনীতির শিকার হওয়ার প্রমাণ। ব্যাসদেবের মহাভারতে গান্ধারীর মনে এরূপ জটিল ও বহুস্তরীয় ভাবনা আসে নি। এখানেই দীপক চন্দ্রের গান্ধারীর সঙ্গে মহাভারতের গান্ধারীর পার্থক্য।

আমরা দেখেছি দীপক চন্দ্র দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো ঘটনাটিকেও গান্ধারীর ভাবনা অনুসারে উপস্থাপন করেছেন। গান্ধারী এক্ষেত্রে তার অনেক না দেখা না ভাবা ঘটনাটিকে বুঝতেও পেরেছে। চিনতে পেরেছে বিদুর ও সঞ্জয়ের প্রকৃত রূপ। শকুনির কণ্ঠে গান্ধারী শুনতে পেল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পেছনের ঘটনা। দীপক চন্দ্রের কলমে উঠে এসেছে অসাধারণ একটি নব নির্মাণ।

সন্তানের বিরুদ্ধে মাকে দাঁড় করানোর এমন সুন্দর চক্রান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। সংসার রাজ্যের কোনও ব্যাপারে তুমি থাক না, পাশা খেলার ব্যাপারটাও তুমি জানো না, অথচ কুন্তী তোমার কাছে কেঁদে পড়ল। ...পাণ্ডব বিদ্রোহের বীজ বপন করতে তুমি হলে তাদের রাজনৈতিক প্রচারের একটি টোপ। অথচ তুমি জানতেও পারলে না, কীভাবে তাদের চক্রান্তে পা দিলে আর নিজের পুত্রদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলে। ... তুমিই পৃথিবীর প্রথম জননী যে কিছু না বুকেই শত্রুপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে নিজ পুত্রকে অভিযুক্ত করলো। এবং নিজেই মূল সাক্ষী হয়ে রইলো। নিজের কর্মের একজন বিচারকও বটে। ... কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সুযোধন কোনও অপরাধ করেনি। ন্যায়ত ধর্মত কোনও দোষ করলে বিদুর চুপ করে থাকত

না। পিতামহ ভীষ্মও দ্রৌপদীর ধর্ম ও ন্যায়ের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেনি। কেন পারেনি সে কথা একবারও না ভেবে সুযোধনকে অপরাধী করবে কেন? ^{৭২}

এছাড়াও গান্ধারী ভাবতে পেরেছে যে পাণ্ডবদের বনবাসের আসল উদ্দেশ্য হল ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বোঝা। অর্থাৎ পাশা খেলায় পাণ্ডবরা পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু বনবাস জীবনে নির্লিপ্ততা তাদের গ্রাস করবে না। বরং পরবর্তীতে রাজনীতির পাশা চালার ক্ষেত্রে উদগ্রীব হয়ে থাকবে তারা। দীপক চন্দ্রের গান্ধারীর এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবনা যথেষ্টই প্রশংসার যোগ্য। বাস্তবে হয়েছেও তাই। কৌরব ও পাণ্ডব বিরোধ শুধুমাত্র সাম্রাজ্য নিয়ে টানাটানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পরবর্তীতে কেমন হবে তার অন্তিম যুদ্ধ হিসাবে। যে আর্য বনাম অনার্যের বিরোধ এতদিন ভেতরে চলছিল, যে ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয় লড়াই মহাভারতে মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে তার সমস্ত হিসাব মিটানোর শেষ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই কারণেই ভারতব্যাপী অসংখ্য রাজাদের সামরিক জোট এই যুদ্ধে দেখা গিয়েছে। বলা বাহুল্য, দীপক চন্দ্রের মহাভারত মূলক যাবতীয় লেখালেখির মূলসূত্র হিসাবে এটাই দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রচুর রথী মহারথী মারা যায়। বাস্তবে যে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রতি পদে পদে নিয়ম ভঙ্গের বিষয়টি মহাভারতের পাঠকদের চোখে পড়ে। নিয়মের ভঙ্গ উভয় পক্ষই করেছিল, কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম থেকে দ্রোণাচার্য, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ সবাইকেই পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের কূটনৈতিক বুদ্ধি অনুসারে হত্যা করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, সেই হত্যার পিছনেও লুকিয়ে থাকে অধর্মের রণনীতি। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই দীপক চন্দ্র এই বৃহৎ যুদ্ধকে অধর্মের যুদ্ধ হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। লেখক দেখিয়েছেন কৌরবরা যাদের আমরা শঠ ও প্রবঞ্চক হিসাবে জেনে এসেছি, তারা যুদ্ধের শেষে কীভাবে মাথা উঁচু করে মৃত্যুবরণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে দুর্যোধনের কথা বলা যায়। গদাযুদ্ধে লড়াইয়ের পূর্বে গান্ধারীর কাছে আশীর্বাদ নিতে আসা দুর্যোধন গান্ধারীকে উপন্যাসে যা বলে তা সাধারণ পাঠককে বাকরুদ্ধ করে দেয়। পুত্রদের মৃত্যুর শোকে আচ্ছন্ন গান্ধারীকে দুর্যোধন বলে:

মা, চুপ করো। এই যুদ্ধের পরিণাম আমি জানি। কৌরব বংশের ধ্বংস হতে আর দেরি নেই। শেষ অঙ্ক শেষ হবে আমাকে দিয়ে। ... আমাকে দুর্বল করে দিও না। যদি তোমার কথা সত্য হয়— ‘যথা ধর্ম তথা জয়’ তাহলে এ যুদ্ধে আমি জিতব। আমি কোনও অধর্ম করিনি। চিরদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে জিতেছি, জেতার জন্যই তো বেঁচে আছি। ^{৭৩}

উপন্যাসের সমাপ্তিও অসাধারণ মনোরম হয়েছে। দীর্ঘ আঠারো দিন ধরে এই যুদ্ধ এগিয়ে চলা এবং ভীমের হাতে প্রায় সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের মৃত্যু গান্ধারীকে প্রায় চেতনাহীন বা বেহুঁশ করে তোলে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য গান্ধারী

এগিয়ে এলে কৃষ্ণের মা বা জননী ডাক গান্ধারীর হৃদয় শীতল করে তোলে। যুদ্ধের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য গান্ধারীর এই ডাকটির জীবনে দরকার ছিল। মানসিক শান্তিতে গান্ধারী একটু থিতু হয়। খুবই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও গান্ধারীর ক্ষমাশীল ও করুণাময় দৃষ্টিটি আমাদের সবার নজরে পড়ে।

দীপক চন্দ্রের গান্ধারীর বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের সবার আগে মনে হয় গান্ধারী এই উপন্যাসে মহাভারতের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছে। মহাভারত নির্ধারিত ধর্মের পথে উঠতে গিয়ে এই নারী নিজের অজান্তেই নিজের সন্তানদের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, নিজের পরিবারের প্রতিও কুন্তীর মতো মনোযোগ দিতে পারে নি। অন্যদিকে কুন্তী অধর্মের কাজ করেও ধর্মের নামে তা কঠোরভাবে চালিয়েছে। বলা বাহুল্য, নিজের পরিবার তথা সন্তানদের রক্ষার জন্য কুন্তী যা যা করা প্রয়োজনীয় বা আবশ্যকীয় বলে মনে করেছে তাই সচেতনভাবে করে গেছে। অন্যদিকে গান্ধারী ‘ধর্মের জয় হোক’ নামক মনগড়া শব্দের বলি হয়েছে। গান্ধারীর বিয়ে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ন্যায় ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে নিজের মাতৃ ধর্ম যথার্থ পালন করতে পারে নি, জীবিত অবস্থায় এই নারী শান্তি পায় নি এবং রাজনৈতিক ফাঁদ তার জীবন শেষ পর্যন্ত দুর্বিষহ করে তোলে।

উপন্যাসের শেষ অংশে দীপক চন্দ্রের নির্মিত গান্ধারীকে আমরা একটু অন্যরকম পাই। যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতিতে প্রায় বেহুঁশ গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে কেন অভিষাপ দিতে গিয়েছিল বা যুধিষ্ঠিরকে কেনই বা তিরস্কার করেছিল? দীপক চন্দ্রের উপন্যাস অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারি এখানে গান্ধারীর ভুল ভেঙে গিয়েছিল, যে সন্তানদের এতদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিল অবহেলা ভরে, সেখানে কুরুক্ষেত্র ময়দানই শেষ পর্যন্ত চিনিয়ে দিল আসল সত্য। এভাবেই দীপক চন্দ্রের হাতে পড়ে গান্ধারী চরিত্রটি পৌরাণিক আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। কুরুক্ষেত্রের শেষ দিনে তার হাহাকার শোনা যায় এবং এভাবেই এখানে চরিত্রটির উত্তরণ ঘটে। দীপক চন্দ্রের গান্ধারী চরিত্রটির এই নবনির্মাণ আমাদের নতুন করে মহাভারতের চেনা পাঠ পুনরায় একবার আরও পড়তে আগ্রহী করে তোলে। আমরাও নতুন যুগের নতুন সময়ের মতো করে চরিত্রটিকে পড়তে পারি।

মাদ্রীর কণ্ঠস্বর

ভারতের দুইটি মহাকাব্যের মধ্যে বিশেষত মহাভারত এত গভীরভাবে সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও কূটনীতির কথা বলেছে তা আজও সমানভাবে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। এই কথা ঠিক যে ভারতীয়দের মন এবং মানসিকতা জানতে গেলে আমাদের মহাকাব্য দুটির থেকে ভালো আর কিছু হয় না। আমাদের মহাকাব্যের কাহিনিগুলি প্রায় এক হাজার থেকে

সাতশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের বলে অনেকে মনে করেন। আবার অতুল সুরের মতো অনেক নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে, আদি মহাভারতের কাহিনির সময়কাল সিদ্ধু সভ্যতারও পূর্বের। আমাদের মহাকাব্যের উৎস ছড়িয়ে আছে গাথা, লোকগাথা, গীতগান কিংবা নায়ক ও তার বীরত্বের কোনও ঘটনার মধ্যে।^{৭৪} সেই দিক থেকে দেখলে এগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসের অংশ। আমাদের মূলত চারটি বেদ আছে। এর বাইরেও রামায়ণ ও মহাভারত পঞ্চম বেদ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। কারণ এগুলির মধ্যে পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যায়িকা ও ইতিবৃত্ত রয়েছে।^{৭৫} অর্থাৎ এখানে ঘটনা বা চরিত্র অনেক সময় কাল্পনিক হলেও যে প্লটের উপর নির্ভর করে তা রচিত হয়েছে, সেইটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তাই প্রাচীন ভারত বা তৎকালীন ভারতবর্ষকে বোঝার জন্য এই মহাকাব্যগুলি বিশেষ করে মহাভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। আমরা সুখময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের *মহাভারতের সমাজ* নামক বিখ্যাত বইটি দেখলেই বুঝতে পারি মহাভারতের সময়ের সমাজ, দর্শন, শিক্ষা, ধর্মীয় রীতি নীতি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, রাজার গুণ ও দোষ, রাজ্য পরিচালনার নিয়ম কানুন প্রভৃতি বিষয়ে কত বিস্তারিতভাবে তথ্য ও বিশ্লেষণ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে ইতিহাসের অনেক উপকরণ মহাভারতের মধ্যেই রয়েছে।

দীপক চন্দ্রের মাদ্রীকে নিয়ে লেখা একটি মহাভারতীয় উপন্যাস হল *মাদ্রীর কণ্ঠস্বর*। মহাভারতে গান্ধারীর মতো মাদ্রীও একটি চরিত্র। শুধু তাই নয়, মহারাজ শল্যের প্রিয় বোন এই কন্যাটি। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে মাদ্রী একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র চরিত্র। ব্যাসদেবের মহাভারত থেকে জানা যায় যে কৌরব বংশের নির্দিষ্ট বিবাহ রীতি না মেনে পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হয়েছিল। সেই কারণেই মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হয়। মহাভারতে মাদ্রীর মতো কম গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রকে দীপক চন্দ্র আধুনিক যুগের মতো করে নতুনভাবে ভেবেছেন, ফলে উঠে এসেছে মহাভারতে অনেক না বলা কথা এবং মহাভারতে স্থান না পাওয়া রাজনীতির ভেতরের কথা। দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন আর্য বনাম অনার্য বিরোধের মাঝে পড়ে মাদ্রী চরিত্রটি কীভাবে ভেতরে ভেতরে মৃত্যুবরণ করেছে। নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কুন্তী যা যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে সবটাই যত্ন সহকারে করে গেছে। অন্যদিকে মাদ্রী পরবর্তী সময়ে বুঝতে পেরেছে যে সে গভীর রাজনীতির শিকার। তাই উপন্যাসের শেষে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়, না হলে কুন্তী বা বিদুর চক্রান্ত করে তাকে অনায়াসেই হত্যা করত। এই সত্য কথা বুঝতে পারার জন্য মহাভারতে মাদ্রী নিজেই জোরপূর্বক মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়। দীপক চন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, মহাভারতের যুগে সতী দাহ প্রথা খুবই চালু প্রথা ছিল না, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির বা পুরোহিত কেউই এ বিষয়ে জোর করত না। কিন্তু মাদ্রী একপ্রকার জোর করেই সহমরণে যাওয়ার জন্য এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য অন্বেষণ করেছেন দীপক চন্দ্র। যদিও ব্যাসদেবের মহাভারত মাদ্রীর মৃত্যুকে সাধারণ সহমরণ হিসাবেই দেখতে চেয়েছে। মহাভারতকার এই নিয়ে বিস্তারিত কিছু ভাবে নি, ইঙ্গিতও দিয়ে রাখে নি। কিন্তু আধুনিক

যুগের ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র ব্যাসদেবের মতো করে বিষয়টিকে দেখতে চান না। তাই তার চোখে পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অন্য এক ভিন্ন চরিত্র। যার মানসিক কল্পনা শক্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বোধ ব্যাসদেবের মহাভারতের মাদ্রীর থেকে অনেক বেশি। তাই এই উপন্যাসে সেই বিষয়ে উঠে এসেছে অনেক অজানা কথা। এই উপন্যাস লেখা হয়েছে মূলত সেই বিষয়েই।

মহাভারতের নবনির্মাণ নিয়ে দীপক চন্দ্রই সবথেকে বেশি ভেবেছেন। মহাভারতের প্রাচীন যুগ থেকে তিনি তুলে এনেছেন প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনাকে। শুধু তাই নয়, সেগুলি করে তুলেছেন আধুনিক মননের উপযোগী করে। অবশ্য তিনি ফ্ল্যাশব্যাকে তুলে ধরেছেন পৌরাণিক সমাজ ও ঐতিহাসিক সেই মানবধর্মকে। মহাভারতের একটি সাধারণ ঘটনা ও চরিত্র যে কতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে, সেটি লেখকের উপস্থাপনায় আমরা অবাক হই। ফলে ব্যাসদেবের মহাভারতের ঘটনাকে সম্পূর্ণ পৃথক এক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় নতুন স্বাদ গ্রহণ করা আমাদের সম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচিত এই উপন্যাসও ভাবনার সেই জায়গা থেকে পড়া যায়। সাধারণভাবে সমগ্র উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী। ঔপন্যাসিক মাদ্রীকে দিয়েছেন নতুন যুগের নতুন মানসিকতা। তাই মাদ্রী ব্যাসদেবের মহাভারতের মতো নয় এখানে। নিজের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সচেতনভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছে সে। আসলে পুরাণের মনোধর্মের সঙ্গে সংঘাতের ফলেই দীপক চন্দ্রের লেখায় গড়ে উঠেছে নব-পুরাণ। এই বিষয়ে ক্ষেত্রে গুপ্ত মহাশয় বলেছেন:

দীপক চন্দ্র কিন্তু একালের ভাষায়, স্বাভাবিক জীবনের ছবি করেই সব কিছু ঐঁকেছেন। পৌরাণিক বলে প্রাচীনতার যতটা ছাপ থাকা দরকার তা আছে, কিন্তু পুরাণ-বিলাসিতা নেই।^{৭৬}

আবার আমরা *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে আমরা দেখতে পাই লেখক বলছেন:

অলৌকিক কাহিনী হয় বর্জিত হয়েছে, না হলে তার বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আধুনিক মানুষের চিন্তা, রুচি ও মেজাজের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছি। পুরাণের পৌরাণিকতাটুকু রেখে আজগুবি অসম্ভব ঘটনার ভার হালকা করেছি।^{৭৭}

মহাভারতে বৃহৎ চরিত্রের আড়ালে মাদ্রীর মতোও চরিত্রেরা আছে। ব্যাসদেব তার লেখায় মাদ্রীকে অল্পস্থান দিলেও দীপক চন্দ্র মাদ্রীকে তাঁর লেখায় যথাযথ স্থান দিয়েছেন। সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ রূপেই এখানে সে উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক তার গলায় এমন শব্দ বসিয়েছে যা পূর্বে শোনা যায় নি। সাধারণভাবে মহাভারতে মাদ্রী খুব ছোট চরিত্র হলেও দীপক চন্দ্র তাদের করে তুলেছেন সাহসী ও নির্ভীক। এরূপ উপন্যাস রচনার কারণ হিসাবে লেখকের মনে হয়েছে

যেসচেতনভাবে মাদ্রীর বিরুদ্ধে পক্ষপাত হয়েছে মহাভারতে। দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন মাদ্রী একপ্রকার রাজনীতির শিকার। কিন্তু অন্যের রাজনীতির গুটি হতে সে অস্বীকার করেছে। লেখকের মাদ্রী বিখ্যাত হয়ে থাকবে সুখের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা ছলনাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে, তার উপরে হওয়া অপমানের প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে এবং অসম্মান এবং চক্রান্তের পাত্রী হওয়ার জন্য। লেখকের মাদ্রীর নিজস্ব স্বাধীন কণ্ঠস্বর আছে। সে বাঁচতে চেয়েছে নিজের ইচ্ছায় এবং মৃত্যুবরণ করেছে নিজের ইচ্ছায়। চরিত্রটির এরূপ নবনির্মাণ তাকে মহাকাব্যের উপেক্ষিত চরিত্রদের ভিড় থেকে বের করে এনে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের নবনির্মিত চরিত্রগুলির একজন করে তুলেছে। এই সমস্ত বীর কন্যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জটিল রাজনৈতিক বিন্যাস প্রতিরোধ করে উদাহরণ স্থাপন করেছে। এই উপন্যাসে মাদ্রী তাই শাঁওলি মিত্রের *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকের দ্রৌপদীর মতো হয়েছে।

মাদ্রীর কণ্ঠস্বর উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনায় আসার পূর্বে ব্যাসদেবের মহাভারতে মাদ্রী চরিত্রটি কেমন ছিল তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। মাদ্রী নিজে মদ্রদেশের রাজকন্যা তথা রাজা শল্যের ভগিনী ছিল। মহাভারতের অনেক চরিত্রের মতো রাজ্যের নাম অনুসারে তার নাম মাদ্রী হয়েছে, এক্ষেত্রে ব্যাসদেব পৃথক নামকরণ করে নি। তবে তার প্রধান পরিচয় হল পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে। ভীষ্ম নিজের উদ্যোগে তাদের বিবাহের আয়োজন করে। পরবর্তী সময়ে কুন্তী ও পাণ্ডু সহ হিমালয়ের কোলে তারা যাত্রা করে। কুন্তীর থেকে ঋষি দুর্বাসার গুপ্ত মন্ত্র জেনে দুই পুত্রের সন্তান মাদ্রী লাভ করে। ব্যাসদেবের মহাভারত জানায় যে কিম্বদন্তি মুনির অভিশাপের কথা একদিন ভুলে গিয়ে পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গমে মেতে ওঠে। ফলে মুনির অভিশাপ সত্য হয় এবং পাণ্ডু মৃত্যুবরণ করে। মহাভারতে অনেক মৃত্যুর পেছনেই নিয়তির কথা আছে। কিন্তু ব্যাসদেব দেখিয়েছে যে এতকিছুর পরেও মাদ্রী সন্তুষ্ট হয় না। মিলনের অতৃপ্তি থাকার ফলে পাণ্ডুর সঙ্গে স্বর্গে যেতে চেয়েছে সে। তাই বেছে নিয়েছে নিজের ইচ্ছায় সহমরণ এবং সন্তান দু'টিকে কুন্তীর কাছেই রাখতে চেয়েছে। এর বেশি মহাভারতে মাদ্রীর স্থান হয় নি। পরবর্তী সময়ে কথা প্রসঙ্গে হয়তো মাদ্রী উঠে এসেছে। কিন্তু মহাভারতের খুব ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে মাদ্রীর উপস্থিতি রয়েছে।

দীপক চন্দ্রের লেখায় মাদ্রীকে উপস্থাপন করা হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে। এরই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে যাবতীয় ভাবনার সমীকরণ। মাদ্রীর জায়গা থেকে দেখলে একটি কথা মনে হয় যে, একটি চরিত্র কীভাবে চোখের সামনে থেকেও উপেক্ষিতা রয়ে গেলে! বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকা তো দূরের কথা, সম্ভোগলিপ্সার আরোপে আরোপিত করে তাকে গোঁণ করে দেওয়া হয়েছে। তার পাপের ফল যেন তাকেই ভোগ করতে হয়েছে। এই নীতির মধ্যেই তাকে মহাকবি ব্যাসদেব ফেলে দিয়েছে। ফলে মহাভারতের অন্যান্য নারীদের মধ্যেও তার জোরালো অবস্থান নেই। নকুল

এবং সহদেবকেও মৃত মায়ের জন্য মন খারাপ করতে দেখা যায় নি। ফলে মাদ্রী শুধুমাত্র একজন নকুল ও সহদেবের জন্মদাত্রী মা হয়েই থেকে গেছে। মহাভারতে মাদ্রীর অবস্থান পরবর্তী সময়ে কুন্তী গ্রাস করে নিয়েছে। মাদ্রীকে নিয়ে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন:

আমার দীর্ঘ লেখক জীবনে মাদ্রীর মধ্যে লুকানো এই রহস্যের দিকে ফিরে তাকানো হয়নি। কিন্তু মনের মধ্যে তার নিরন্তর যাওয়া আসা ছিল। ... হঠাৎই একদিন মাদ্রী আত্মপ্রকাশের দাবি করল। ভাবনার আলোয় উদ্ভাসিত হল তার জীবনের কত দিক। কোথায় তার দুঃখ, কোথায় তার ব্যথা, জীবনে কি পেল আর পেল না, কিংবা পেয়েও হারাতে হল কেন? ... অথচ, মহাভারতের গোটা আখ্যানে তার শিকড় ছড়িয়ে আছে। যে মাটি থেকে রস শোষণ করে গাছ বেঁচে থাকে সে গাছও খোঁজ রাখে না মাটির নিচে শিকড়কে কীভাবে লড়তে হচ্ছে। ব্যাসদেবের ফ্রেমেই ‘মাদ্রীর কণ্ঠস্বর’কে শোনানোর জন্য এই উপন্যাসের পরিকল্পনা।^{৭৮}

এরপর দীপক চন্দ্র শুরু করলেন তাঁর উপন্যাসে মাদ্রীকে সমকালীন যুগের চাহিদা মেনে অন্বেষণের। উপন্যাসের প্রথমেইই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন মহাভারতের কালে মদ্র দেশের বর্তমান স্থান বিষয়ে। বর্তমানের পাঞ্জাব-কাশ্মীরের মধ্যকার একটি অংশ মহাভারতের সময়ে মদ্র নামে পরিচিত ছিল। দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন প্রাচীনকালে মদ্র দেশের রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমাগত অস্তাচলে যেতে থাকলে রাজা কিছু সুব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তাতে খুব একটা সুরাহা হয় নি। এর মাঝখানে রাজার মৃত্যুর ফলে সাম্রাজ্যের ভার নিতে হয় যুবরাজ শল্যকে। রাজ্যের অবস্থা যখন এরকম সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম পাণ্ডুর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সেখানে আসে। দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর মদ্র দেশে আগমনের পেছনে ভীষ্মের নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য ছিল। ভীষ্ম জানত যে এই অঞ্চলের মেয়েরা অন্যান্য অঞ্চলের থেকে অধিক সুন্দরী হয়। জলবায়ুগত এবং অবস্থানগত কারণেই এমনটা হয়ে থাকে। তাই লোকমুখে ভীষ্ম শুনে থাকতে পারে যে মদ্র রাজকন্যা অত্যন্ত সুন্দরী, তাই রাজ্যের তৎকালীন রাজা শল্যের কাছে পাণ্ডুর বিবাহের বিষয়ে প্রস্তাব নিয়ে গেল। হস্তিনাপুরের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিবাহের মতো আত্মীয়তার বন্ধনে সবাই যুক্ত হতে চায়, মদ্র দেশ তাই এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি দেয়। তবে এই বিবাহের পেছনে থাকা রাজনীতি ও কূটনীতির একটি গভীর ছবি থাকাই যে বাস্তবসম্মত তা লেখক মনে করেন। তাই তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন এর পেছনে থাকা বিবাহের কারণটি। সেখান থেকে তিনি দেখতে পেয়েছেন কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর প্রথম বিবাহ ভীষ্ম একেবারেই মেনে নিতে পারে নি। ব্যাসদেবের বৈবাহিক কূটনীতি ধরে নিয়ে ভীষ্ম নিজের চাল ফেলেছে। কৌরব রাজবংশের রাজা ভীষ্ম না হলেও যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তার হাত ধরেই আমরা পেয়েছি। মূলত সেই দর্প এবং দম্ভে আঘাত হানাই ছিল ব্যাসদেবের প্রধান লক্ষ্য। তাই এই দ্বিতীয় বিয়ে ছিল ভীষ্মের উদ্যোগে পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিয়ে। আসলে বাস্তবিক দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে লড়াইটি ছিল পিতামহ ভীষ্ম ও ব্যাসদেবের মধ্যে। যাই হোক, পাণ্ডুর

দ্বিতীয় বিয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হল। মদ্র দেশ নতুন একটি রাজনৈতিক জোট পেল এই বিবাহের মাধ্যমে। ফলে সামরিক দিক থেকে তারা অনেকটা শক্তিশালী হল এমনটা বলাই যায়। উল্টোদিকে শক্তিশালী রাজনৈতিক জোট তো হল, কিন্তু আমাদের অজানাই রয়ে গেল এই বিবাহে মাদ্রীর মতামত কী ছিল সেই বিষয়ে! আসলে প্রাচীন ভারতে অনেক ছোট সাম্রাজ্যই কিন্তু নিজেদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বড়ো রাজ্যের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে জড়াতে বাধ্য থাকত। মাদ্রীর নিজের ক্ষেত্রেও এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না বলেই লেখক মনে করেন।

তবে এত কিছুর পরেও উপন্যাসে শোনা গেছে মাদ্রীর আত্মসম্মানের কথা, সে অনুভব করতে পেরেছে দ্বিতীয় এই বিয়ে মোটেও সুখকর হবে না। স্বাভাবিকভাবে কোনও স্ত্রী তার স্বামীর ওপর অন্য নারীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারে না। তাই এই বিয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে মাদ্রী তার আগামী দিনের ভবিষ্যতের জন্য যাবতীয় দোষ ভীষ্মকেই দেয়। বংশের প্রথা অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিবাহ রীতিতে বিয়ে দেওয়ার জন্য মাদ্রীকে অর্থের বিনিময়ে শল্যর থেকে আনা হয়। তবে দীপক চন্দ্র এই বিষয়টিকে বেচাকেনার সঙ্গে তুলনা করলেও আমরা জানি যে প্রাচীনকালে অনেক জায়গাতেই কন্যাপণ চালু ছিল, ফলে মাদ্রীর ক্ষেত্রেও এমনটা হতেই পারে। যাই হোক, উপন্যাসে পাণ্ডুর মাদ্রী বহু নারী সম্পর্কে অভ্যস্ত পুরুষ ভাবতেও দ্বিধা করে নি। লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে নিজের পরিবার ও পিতার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য একজন নারীকে জীবনের কতটা অংশ বিসর্জন দিতে হয়। ফলে এভাবেই উপন্যাসে মাদ্রী আধুনিক সময়ের একজন প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, মহাভারতীয় খোলস ছেড়ে সে অনায়াসেই বেরিয়ে আসে। লেখক দেখিয়েছেন মাদ্রী চরিত্রটি যদি না থাকত তাহলে ভীষ্মের সঙ্গে ব্যাসদেবের লড়াই বাঁধত না। আবার পাণ্ডুরও রাজ্য থেকে বেরিয়ে হিমালয় গমন করতে হতো না, ফলে তার মৃত্যুও ঘটত না। ফলে সিংহাসনের ভার যদি ধৃতরাষ্ট্রকে না অর্পণ করে পাণ্ডু গমন করত তবে ধৃতরাষ্ট্র আর সিংহাসনের দাবিও করতে পারত না। ফলে মাদ্রী চরিত্রটি মহাভারতে এসে অনেক হিসাব পাণ্টে দেয়। মাদ্রীকে নিয়ে এরকম ভাবনা আমরা অন্য লেখকদের লেখায় পাই না। পুরো উপন্যাস জুড়েই প্রকাশ পেয়েছে মাদ্রীর মনের ভেতরের কথা। বিবাহ পরবর্তী সময় থেকেই যেন তার লড়াই শুরু হয়েছে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে। লেখক দেখিয়েছেন কুন্তীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঈর্ষার ও হিংসার। মাদ্রীকে নাকী কখনও নিজের বোনের মতন দেখতে পারে নি কুন্তী, ফলে দুই সতীনের মধ্যকার সম্পর্কে পূর্ব থেকেই একধরনের ফাটলের অস্তিত্ব ছিল। যে ফাটল পরবর্তীকালে আরও গভীরতা লাভ করেছে। বিয়ের কিছুকাল পরে মাদ্রী বুঝতে পেরেছে তার স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম। ফলে বিবাহিত জীবন আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে তার। সেই কারণে যে ভীষ্ম তাদের বিবাহে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল তাকেই দায়ী করে মাদ্রী, যদিও গঙ্গা পুত্র এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র কিছু জানত না। তবে দীপক চন্দ্রের মাদ্রী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার অবস্থান রেখেছে। শারীরিকভাবে সুখ না পেলেও বিবাহ পরবর্তী জীবনে মাদ্রী আবিষ্কার করেছে স্বামী

হিসাবে পাণ্ডু উদার, বন্ধুপরায়ণ এবং সাহায্যকারী। নিজের দেহ মিলনে অক্ষম জেনে পাণ্ডু তার ভাবনা ও কল্পনার জানালাকে খুলে দিতে পেরেছিল। বাইরের খোলা বাতাস সেখানে প্রতিনিয়ত খেলা করত বলেই পাণ্ডুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে মাদ্রী। লেখকের মাদ্রী মিলনের আগ্রাসী খিদেকে সহ্য করেই নিষ্কাম ভালোবাসার জগতে নিজেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে।

মাদ্রীকে বোঝাতে গিয়ে কুন্তী চরিত্রটির বিষয়ে অনেক নতুন ভাবনার নির্মাণ করেছেন লেখক। লেখক দেখিয়েছেন এই বিষয়ে কুন্তীর ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল মাদ্রীর থেকে। নিজের শরীরের কামনা ও বাসনাকে মেটানোর জন্য কুন্তী যা যা প্রয়োজন অনুভব করেছে সবটাই করেছে, এমনকী রাজমাতা হওয়ার বাসনাকেও সে কখনোই ছেড়ে দেয় নি। এটা ঠিক যে, কুন্তী ভাগ্যের সহায়তা বালিকা অবস্থায় থাকার সময় থেকেই পায় নি। ফলে লড়াই তাকে সারা জীবন করতে হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ভাগ্যের ওপর কুন্তী সবটা ছেড়ে দেয় নি, বরং লড়াই জারি রেখেছিল। এর ফলেই দীর্ঘদিন সংগ্রামের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য এক নারীতে পরিণত হয়েছিল কুন্তী। কিন্তু প্রশ্ন জাগে তার মাথায় রাজমাতা হওয়ার ইচ্ছাটা প্রবেশ করাল কে? এখানেই লেখক দেখিয়েছেন ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা হলেও এক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিন্দাজনক। রাজমাতা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা কুন্তীর হৃদয়ে ব্যাসদেবই ঢুকিয়েছে। এর পেছনের কারণও দীপক চন্দ্র আমাদের দেখিয়েছেন। আমরা জানি যে আর্য বনাম অনার্য দ্বন্দ্বের পেছনে মূল শত্রুতা ছিল ভীষ্ম বনাম ব্যাসদেবের মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ের ঔরসজাত পিতা ব্যাস। কিন্তু সিংহাসনের অধিকার ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ার কারণে পাওয়া সমস্যা ছিল, তাই তার সন্তান রাজা হলে তবেই সিংহাসনের অধিকার আসবে। এই ভাবনা ব্যাসদেবকে শান্তি পেতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর উভয়েরই পিতা ঋষি ব্যাসদেব হলে তার এক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ কেন দেখা যাবে? কারণ হিসাবে দীপক চন্দ্র এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আমাদের সামনে রেখেছেন। যেখানে আমরা দেখতে পাই যে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ ভীষ্ম হস্তিনাপুরের কৌলিন্য ও মর্যাদা অনুসারে দিয়েছিল। তাই সেই জায়গাতে ব্যাসদেবের কূটনীতি ও রাজনীতি চলে নি। কিন্তু পাণ্ডুর বিবাহ কুন্তীর সঙ্গে যখন হয়েছিল তখন তা প্রধানত ব্যাসদেবের সৌজন্যেই। কুন্তী ছিল যাদবদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ। যা ভীষ্ম মন থেকে মানতে পারে নি। কারণ হিসেবে লেখক লিখেছেন তৎকালীন ভারত রাষ্ট্রের সার্বিক রাজনৈতিক চিত্র। সেই সময়ের হস্তিনাপুর ছিল আর্যাবর্তের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ। তার সঙ্গে সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী মগধের কোনও শত্রুতা ছিল না। কিন্তু যাদবদের সঙ্গে মগধের সম্পর্ক মসৃণ ছিল না, প্রায় উভয় রাজ্যের মধ্যেই ঝগড়া ও ঝামেলা লেগে থাকত। ফলে ভীষ্ম মনে করেছিল যে এই বিবাহের ফলে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সমীকরণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। অন্যদিকে শারীরিক দিক থেকে পাণ্ডু অক্ষম হওয়ার কারণে এতদিনের পরিকল্পনা ভেঙে দেওয়া যায় না, তাই ব্যাসদেব কুন্তীর বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ের দুর্বাসা ঋষির আশীর্বাদকে ঢাল করে তাকে দিয়ে

কার্যসিদ্ধি ঘটল। আবার অন্যদিকে কুন্তী জীবনযুদ্ধে যেভাবেই হোক মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে এসেছে। ফলে ব্যাসদেবের সেই অভিসন্ধি কুন্তীর হৃদয়ের গোপন বাসনাকে খোঁচা দিল মাত্র। তাই পাণ্ডুকে সামনে রেখে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্ভোগ ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে নতুন সন্তানদের জন্ম দিল কুন্তী। পাণ্ডুকে তাই নিজের দিকে টানবার উদ্দেশ্যে উপন্যাসে কুন্তীকে বলতে শোনা যায়:

এ পরিবারে এতো নতুন কিছু নয়। ... মনে রেখ, জীবনে জেতাটাই আসল কথা। জয়ের পরে কীভাবে জিতল সে কথা কেউ মনে রাখে না। যে জিতল যে জয়ী হলো তার কথাই মনে রাখে। লোকে তার জয়টাকেই দেখে।^{৭৯}

স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারা যায় যে নারী এই কথাগুলো হৃদয় থেকে বলতে পেরেছে সে অদম্য মানসিক শক্তির অধিকারী। রাজপরিবারের সবার নজর এবং নিরাপত্তা এড়িয়ে বিদুরের সঙ্গে কুন্তী যে সম্পর্ক স্থাপন করল, তা কারোর নজরেই পড়ল না। ব্যাসদেবের তিন ঔরস পুত্রের মধ্যে বিদুরই সবথেকে যোগ্য রাজা হতে পারত। কিন্তু সামাজিক বিধানের বলে শূদ্র গর্ভজাত সন্তান হওয়ার জন্য তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাজা হওয়া অসম্ভব। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই একদিকে কুন্তী এবং অন্যদিকে বিদুর, ভাবনাগত ও পরিকল্পনাগত দিক থেকে উভয়েরই অবস্থান এক হওয়ার জন্য কুরু রাজবংশে নিজেদের অধিকার ফলানোর জন্য এগিয়ে যায় তারা। মহাভারতের কাহিনি এভাবেই দীপক চন্দ্রের হাত ধরে নতুন রূপ পেয়েছে।

উপন্যাসের অন্য একটি দিকে দেখতে পাই মাদ্রী রাজপরিবারের মধ্যে থাকার জন্যই হোক বা তার গভীর দূরদৃষ্টির জন্যই হোক মাদ্রীর চোখের সামনে থেকে অনেক রহস্যের জট সরে যাচ্ছিল। ফলে প্রত্যেকটি প্রধান ব্যক্তির মুখ ও মুখোশ সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল। তাকে ভীষ্ম এই গৃহের বধূ করে আনার পেছনে যে কত বৃহৎ কূটনৈতিক চাল ছিল তা এখন সে বুঝতে পারে। এরপরেও সংসার ধর্ম মনোযোগ সহকারে করেছে মাদ্রী। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য ছেড়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রায় মনোযোগ দিতে থাকে পাণ্ডু। শুধু তাই নয়, হঠাৎ দুই স্ত্রী সহ পাণ্ডু চলেও গেল। মহাভারত এই নিয়ে খোলাখুলি আমাদের কিছু জানায় না। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর লেখায় বিষয়টিকে নিয়ে বলেছেন:

আসলে স্ত্রীদের কাছে আপন অক্ষমতা লুকিয়ে রাখার জন্য, অথবা ক্ষমতার ধ্বজাটুকু জিইয়ে রাখার জন্যই পাণ্ডুকে দিগ্বিজয়ে বেরতে হল— বিয়ের পর তিরিশ রাত্তিরের অক্ষম বিহার সেরেই— বিহৃত্য ত্রিদেশা নিশাঃ।^{৮০}

আসলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজ্যে ঘোরাঘুরির পর পাণ্ডু হস্তিনাপুরে ফিরে এসে সিংহাসন পুনরায় অধিকার করতে চাইলে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। কারণ পাণ্ডু বাইরে থাকা

অবস্থায় এতদিন রাজ্য ধৃতরাষ্ট্র চালাচ্ছিল, এমনিতেই বড়ো ভাই হওয়ার কারণে হস্তিনাপুরের সিংহাসন ধৃতরাষ্ট্রের পাবার কথা ছিল। যাই হোক, পাণ্ডুর রাজ্যের বাইরে যাওয়ার সময় সিংহাসন হস্তান্তর হয়। তাই পাণ্ডু ফেরার পর আর সিংহাসন ধৃতরাষ্ট্র দিয়ে দিতে চাইছিল না। একদিকে শারীরিক অক্ষমতা এবং অন্যদিকে সিংহাসন নিয়ে এরকম এক জটিলতার মধ্যে পড়ে পাণ্ডু হিমালয়ের কোলে অরণ্যে যাত্রা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। তবে মহাভারতে এরকম কথা থাকলেও লেখক দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে সম্পূর্ণ অন্য কথা পাই। সেখানে লেখক দেখিয়েছেন পাণ্ডুর এই হিমালয়ের কোলে অরণ্যে যাত্রার পেছনে কুন্তীর ভূমিকা ছিল। কারণ রাজনৈতিক সচেতন কুন্তী রাজ্যের বাইরে অবস্থান করে বুঝে নিতে চাইছিল রাজ্যের অর্থাৎ হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক উত্তাপ কতটা ছড়িয়েছে বা কোন পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ রাজনৈতিক তাপের মাত্রা ছাড়াই উল্টোদিকে নিজেদের যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। আবার পাণ্ডুকে কুন্তী এই বলে রাজি করাল যে, অরণ্যে সাধু ও মহাপুরুষেরা থাকে, তাই সেখানে গেলে তার শারীরিক অক্ষমতার বিষয়ে একটা সমাধান হতে পারে। কুন্তীর ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে পাণ্ডুও সেই মতো কাজ করতে সম্মত হল। ব্যাসদেবের মহাভারতে এরকম কথা বলা নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যের সিংহাসন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হিমালয়ের কোলে অরণ্যে পাণ্ডুর চলে যাওয়া লেখকের খুব একটা সহজ সরল মনে হয় নি। তাই তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন এর পেছনে থাকা না বলা কথাটি।

অন্যদিকে মাদ্রী সামগ্রিক এই ঘটনায় খুব একটা খুশি হয় নি। কিছু যে একটা নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে চলেছে তা মাদ্রী অনুভব করতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে মাদ্রী বুঝতে পেরেছে যে কুন্তীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বিদুরের। ফলে মাদ্রী বুঝতে পারে যে তাদের এই নির্বাসনের পেছনে বিদুর ও কুন্তীর মিলিত সিদ্ধান্ত আছে। শুধু তাই নয়, উভয়ের থাকতে পারে কোনও গুরুতর পরিকল্পনা। এখানে লেখক উপন্যাসের মোড়কে পুরাণের অন্ধকারে চাপা পড়া একটি ঘটনাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। এমনকী লেখকের নজর এড়িয়ে যায় নি মাদ্রীর মধ্যকার নিষিদ্ধ কাম, যা বিদুর ও কুন্তীকে মিলিত অবস্থায় দেখার ফলে মাদ্রী অনুভব করেছিল। মাদ্রী চারিদিকের সামগ্রিক ঘটনা বুঝতে পেরে পাণ্ডুকে বারবার সতর্ক করেছে। অবশ্য সতর্ক করা ছাড়া আর কী বা করার ছিল তার! মাদ্রীকে উপন্যাসে বলতে শোনা যায়:

আমার শত্রু তো আমার পাশেই ছায়ার মতো সবসময় ঘোরে। তার নিঃশ্বাস লাগে আমার গায়ে। আমি বেশ বুঝতে পারি, সে শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে। দেখো, একদিন তার হাতেই মরণ হবে আমার। ... তোমার হস্তিনাপুর ছেড়ে যাওয়া নিয়ে অলক্ষ্যে একটা বিরোধ বেঁধেছে। এরা সংখ্যায় এখন অনেক। এ পরিবারে বধু হয়ে আসা থেকে তাদের সঙ্গে এই ছায়া যুদ্ধ সমানে চলেছে। হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে তাই আমার ভয় হয়। ... তুমি না বললেও জানি কুন্তীই তোমায় হস্তিনাপুর ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কেন দিল তা জানার চেষ্টা করনি। এটাই তোমার দোষ।^{৮১}

শুধু তাই নয়, এরপরেও একটি প্রশ্ন করেছে মাদ্রী। গান্ধারীর মা হওয়ার খবর শুনে মন খারাপ করার কি আছে? এটা তো শুভ সংবাদ, যদি না এর পেছনে গুপ্ত কোনও স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। আসলে কুন্তীর রাজমাতা হওয়ার প্রবল বাসনা মনে আছে, গান্ধারীর মা হওয়ার খবর শুনে তা ধ্বংস হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। উপন্যাসে মাদ্রীকে আমরা সচেতন দর্শক হিসাবে দেখতে পাই। গান্ধারীর মা হওয়ার খবরে কুন্তী আর দেরি করে নি, পাণ্ডুর অনুমতি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করেছে। মাদ্রী সমস্ত কিছু বুঝে শুধুমাত্র যন্ত্রণায় পুড়েছে। শুধু মন খুলে ভেবেছে কোন জায়গায় সে এল! মাদ্রী যথার্থই পাণ্ডুকে ভালোবেসেছিল, স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গের মতো গুরুতর কিছু কাজ সে করে নি। অন্যদিকে ঋষি দুর্বাসার বরের আড়ালে কুন্তী ক্রমশ পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, বিষয়টি মাদ্রী ভালোভাবে নেয় নি। এরপর গান্ধারীর সন্তান জন্মের কথা পাণ্ডুদের কাছে আসে। তারপর কুন্তীর গর্ভ থেকে যুধিষ্ঠির সহ পরবর্তী দুই সন্তান ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করল। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সবাই বুঝে গেল যে সহজে যুধিষ্ঠিরের যুবরাজ এবং কুন্তীর রাজমাতা হওয়া আর সম্ভব নয়। যেহেতু গান্ধারীরও পুত্র জন্মেছে তাই বিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এদিকে বসন্তকালে একদিন পাণ্ডু নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে মাদ্রীর সঙ্গে মিলনে রত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব শর্ত মেনে পাণ্ডু মারা যায়। কিন্তু মাদ্রী জানায় যে বিবাহিত জীবনে সে সুখী ছিল না, তাই স্বামীর সঙ্গেই স্বর্গে যেতে চায় সে। মহাভারতের এই মাদ্রীর কথাকে আধুনিক সময়ে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করতে চেয়েছেন দীপক চন্দ্র। লেখকের মনে হয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। যা যথার্থ অর্থেই মাদ্রী চরিত্রটিকে নবনির্মাণ ঘটিয়েছে। প্রথমত, যে মাদ্রী পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহিত জীবনে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পেয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে খুশিও ছিল, সেই একই নারী কোন যুক্তিতে স্বামীর মৃত্যুর কারণ হতে গেল? দ্বিতীয়ত, মহাভারতের যুগে সতীদাহ প্রথা খুব একটা বেশি প্রচলিত ছিল না। কুরু রাজবংশের পূর্বের নারীরাও কেউ সহমরণে যায় নি। স্বাভাবিকভাবেই বিধবা নারীর জীবন কাটিয়েছে তারা। তবে মাদ্রীর সহমরণে যাওয়ার কি খুব দরকার ছিল? তৃতীয়ত, পাণ্ডু মূনির অভিষাপের বিষয়ে জানত। তাহলে কী এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার জন্য পাণ্ডু পর্যন্ত বিষয়টিকে অবহেলা করল? চতুর্থত, মাদ্রীর সহমরণে যাওয়ার পূর্বে নিজের সন্তানদের বিষয়ে একবারও কিছু মনে হয় নি? সবকিছু এত দ্রুতগতিতে হওয়ার কি খুব দরকার ছিল? এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাসে।

দীপক চন্দ্রের *মাদ্রীর কণ্ঠস্বর* উপন্যাসে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নকুল ও সহদেব আসলেই কুন্তীর সন্তান। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক নীতি অনুসারে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে তিনজনের বেশি সন্তান লাভ করা সম্ভব ছিল না। যদি তা হতো, তাহলে নারীর সামাজিক সম্মান আরও নিচে নেমে যেত। নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে তিনের অধিক সন্তান লাভ করলে সেই নারীকে চরিত্রহীনা নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু ব্যভিচারের ফলে নকুল ও সহদেবের জন্ম হলে সেই মাতৃ মাদ্রীর ওপরে চাপানোর জন্য কুন্তী তৎপর হয়ে

ওঠে। কিন্তু মাদ্রী অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন নারী, সমগ্র বিষয়টা জানার ফলে নকুল ও সহদেবকে মেনে নিতে রাজি হয় না মাদ্রী। ফলে এক জটিল রাজনৈতিক প্যাঁচে মাদ্রী ও পাণ্ডু পড়ে যায়। এই জটিল পথ থেকে মুক্তির অন্য কোনও উপায় তারা খুঁজে পায় নি। ফলে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় কিছুই ছিল না তাদের কাছে। ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার ফলে কুন্তী হয়তো আরও সন্তান জন্ম দিতে চেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মাঝখানে পাণ্ডুর মৃত্যু বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাণ্ডু হয়তো বুঝেছিল যে এই জটিল ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় মৃত্যু। তাই কোনও এক বসন্তকালে মাদ্রীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে পাণ্ডু সম্পূর্ণভাবে আত্মহারা হয়েছে, সামনে মৃত্যুর পথ জেনেও সম্ভোগ কামনাকে রুদ্ধ করে দেয় নি সে, মৃত্যুকে সচেতনভাবে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সে। অন্যদিকে বাকি থাকে মাদ্রী। তাই হাসি মুখে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় মাদ্রীর কাছে ছিল না, না হলে তাকেও পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতো। তাই তার মুখে শোনা যায়:

আমার সাধ্য ছিল না তাকে বাধা দেবার। এটাই ছিল ওর নিয়তি। আমি নিমিত্ত দিদি। আমার মরণটা তোমার হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তনের পথটাকে অনেক সহজ করে দেবে। বেঁচে মরে থাকার চেয়ে, মরে বেঁচে থাকা ভালো।^{৮২}

এভাবেই দীপক চন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে মাদ্রীর মৃত্যু কুন্তীর সামনের পথ মসৃণ করে দেয়। সে হস্তিনাপুরে ফেরে একেবারে চিন্তামুক্ত হয়ে। অন্যদিকে মাদ্রী ও পাণ্ডু সচেতনভাবে মৃত্যুবরণ করে যাবতীয় রাজনীতির জটিলতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিল। লেখকের উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই মহাভারতের এই নারীর জীবনে দর্শন ও আধুনিক জীবনধর্ম বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। বিবাহের সময়কাল থেকেই জটিল রাজনীতির শিকার হয়েছে সে। কিন্তু লেখক দেখাতে চেয়েছেন ব্যাসদেবের মহাভারতের এই নারী তাঁর উপন্যাসে পৃথকভাবে স্থান করে নিয়েছে। তাই বিশ শতকের মাদ্রীর নিজস্ব একটি বক্তব্য আমরা পাই। শুধু তাই নয়, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতেও তাকে আমরা দেখেছি। এই মাদ্রী আত্মসমর্পণ করে নি জটিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কাছে। তাই মহাভারতের মাদ্রীর থেকে এই উপন্যাসের মাদ্রীকে আমাদের অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। উপন্যাসের মাদ্রীর প্রতিরোধ আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। এভাবেই দীপক চন্দ্র সম্পূর্ণ মহাভারতীয় একটি চরিত্রকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন। একটি পৌরাণিক উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা আধুনিকতার আশ্বাদন থেকে বঞ্চিত হই নি। এখানেই দীপক চন্দ্র মহাশয়ের এই উপন্যাসের সার্থকতা।

অগ্নিগর্ভ খাণ্ডব (২০০৩) দীপক চন্দ্রের অন্যতম একটি মহাভারত মূলক উপন্যাস। তবে মহাভারতের এই ঘটনাকে অন্যভাবে দেখতে চেয়েছেন দীপক চন্দ্র। খাণ্ডববনের দাবানল হল বিদ্রোহীদের গণঅভ্যুত্থানের আখ্যান। চোখের জল এবং বুকুর আগুনে লেখা এই কাহিনি। অগ্নি

ও দাবানল এখানে বিদ্রোহের প্রতীক। অগ্নিকবলিত খাণ্ডবের গল্পটা বস্তুতপক্ষে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের গল্প হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ আদিবাসীদের ভেতরের লড়াই এবং বিরোধের ফলে এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ অরণ্যের ভেতরে যে পরিবেশ সৃষ্টি করল তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ছিল না। নবনির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের গায়ে পাছে বিদ্রোহের আগুন লাগে, সেই কারণেই কৃষ্ণ বিদ্রোহী অভ্যুত্থানকে শান্ত করার জন্যই খাণ্ডব বনে যায়। একেবারে বাড়ি ঘর ছাড়া পলায়মান ভীত মানুষকে জোর করে ঘরে ফেরত পাঠাল কৃষ্ণ। তবুও তার প্রয়াসকে কালিমা লিপ্ত করা হল, অর্জুন নিজেও তার ভাগী হল। লেখক এই বিষয়টিকে আধুনিক যুগের বিদ্রোহী গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন আমাদের কাশ্মীরের সন্ত্রাসমূলক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে। ফলে রূপক ভাঙতে খাণ্ডবের গল্পের ঐতিহাসিকতা কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে দীপক চন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন কাশ্মীর ও খাণ্ডবের ভিতরে একটি যোগসূত্র অবশ্যই আছে।^{৮০} কাশ্মীরের ভারতের অন্তর্ভুক্তির মতো খাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির পেছনে একটি মিল অবশ্যই আছে। ফলে একটি আগুন ক্রমাগত জ্বলে থেকেছে। তাই শেষ পর্যন্ত পরীক্ষিতের হত্যাকাণ্ড হয়ে ওঠে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুইসাইড স্কোয়ার্ডের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই শেষে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ হয়।

উর্বশী জননী (১৯৮৮) দীপক চন্দ্রের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। ভারতীয় পুরাণে তথা মহাভারতে উর্বশীকে নিয়ে একাধিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু লেখক তাঁর ভাবনায় যেমন পৌরাণিক অনুষ্ঙ্গকে বাদ দেন নি, তেমনই এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছেন সমকালীন বা বর্তমানের ভাবনাকেও। এ কালের নারী সম্পর্কিত কতগুলি জিজ্ঞাসা এবং ভাবনা পুরাণের উর্বশী চরিত্র ও ঘটনার মাপকাঠিতে যাচাই করে সেকাল ও একালের মধ্যে একটা সেতুবন্ধনের প্রয়াস করেছেন লেখক। নারী সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমস্ত কালেই এক মনে হয়েছে লেখকের। সেকাল এবং একালের কালগত দূরত্ব যতই থাকুক, সমস্যার পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা মূলত চরিত্রগত, গুণগত নয়। মেয়েদের পরিবর্তনটা বাইরে, ভেতরে নয়। এর কারণ মেয়েরা নিজেই। এই উপন্যাস সেরকমই একটি সমস্যাধর্মী উপন্যাস। পৌরাণিক আখ্যানে উর্বশীর কাহিনি আছে। কিন্তু সেই কাহিনিগুলি লেখকের অসংগতিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। কিন্তু তবু এগুলির ভেতরে ক্ষীণ একটি যোগসূত্র আছে। সেই যোগসূত্রটি এই উপন্যাসের হৃৎস্পন্দন। জীবনের সংঘাত ও সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। তাই এই চরিত্রটিকে নিয়ে নানান কিংবদন্তির পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে উর্বশীর মন এবং তার ব্যক্তিত্ব। মূলত এই সমস্ত বিষয়গুলি এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

উর্বশীকে বহুমাত্রিক চরিত্র বলেই আমরা জানি। কেউ তাকে ছলনাময়ী বলে, আবার কেউ তাকে মূর্তিময়ী প্রেমের নারী বলে। কেউ বলে জীবনের পরম অনুভূতি। প্রেম তার জীবন ও প্রেম

তার কলঙ্ক। সারা জীবন বিচিত্র খেলালে ছুটে বেড়িয়েছে এই নারী। জীবনে অনন্ত এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। এক জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে অন্য এক জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে এই নারী। এই এগিয়ে চলার মাধ্যমে যে জীবনকে সে পেয়েছে, তার মধ্যে কোনও অমরতার সন্ধান কি সে করেছে? পেয়েছে কি তার অমৃত জীবন, অনন্ত প্রেম? বিখ্যাত রাজা পুরুরবার সৌন্দর্য উর্বশীর নাচের তাল ভঙ্গ করেছিল, অন্যদিকে অর্জুন উর্বশীর প্রেম ও মিলন সম্বন্ধের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। অঙ্গরাদের জীবন এমনিতেই অন্যান্য নারীর থেকে আলাদা। প্রেম ও যৌনতা এবং সম্ভোগ ক্রিয়ার মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু এরপরেও উর্বশীর চরিত্রে জননীর ছোঁয়া অন্য মাত্রা পেয়েছে। এখানেই সে অন্যান্য স্বর্গের অঙ্গরাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এই বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি পরবর্তী অংশে।

লেখক উর্বশীর জীবনের সমগ্র ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে সর্বকালের অসহায়, নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের দেখতে পেয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনি আসলে জীবনেরই কাহিনি, তাই কোনও মহাকাব্যিক চরিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বর্তমানকালের জীবনকে ছুঁতে চেয়েছেন লেখক। উর্বশীর চরিত্রের মাপকাঠিতে লেখক বিচার করতে চেয়েছেন নারী মুক্তির আন্দোলন এবং তার স্বাধীনতাকে।^{৮৪}

কৃষ্ণ ভগবান (১৯৮৮) দীপক চন্দ্রের অন্যতম একটি বিখ্যাত উপন্যাস। দীপক চন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে এটি অন্যতম। দীর্ঘদিন মানুষের মনের মধ্যে ভগবানকে নিয়ে অনেক কৌতূহল জন্মে আছে। ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, তিনি নিরাকার। তবুও অনন্তকাল ধরে মানুষের মনের মধ্যে তার অবস্থান রয়ে গেছে। মানুষের চোখে ভগবান পরম করুণাময়। সমস্ত মানুষের বিপদেই তিনি একান্ত আশ্রয় হয়ে ওঠেন। সমস্ত স্তরের মানুষের পরম আস্থার জায়গা এই ভগবান। ভারতীয় দর্শনে এবং শাস্ত্রে ভগবানের যে ধারণা তা নিরাকার। কিন্তু মানুষরূপী ভগবান প্রত্যক্ষ করা যায় এবং লৌকিকও বটে।

কোনও কোনও মানুষ বিশেষ গুণের ও আদর্শের কারণে আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। যাবতীয় শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা তাকে পূজা করি। এভাবেই রক্তমাংসের মানুষ আমাদের কাছে ভগবান হয়ে ওঠে। ভাবনার এই জায়গা থেকে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও সারদা আমাদের কাছে ভগবান। এই উপন্যাসে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন ভগবান হয় না। ভগবানের গুণগুলি নিয়েই মানুষ ভগবান হয়। মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই মানুষরূপী ভগবান হয়ে উঠতে পেরেছে আমাদের কাছে। খেয়াল করলে দেখতে পাই মহাভারতের কৃষ্ণ এক বিরাট পুরুষ। নিজের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধিতে শত্রুদের সফলভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছে কৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, জরাসন্ধের মতো প্রবল প্রতাপশালী রাজাকেও বুদ্ধির জোরে হারাতে সক্ষম হয়েছে কৃষ্ণ। নিজের কূটনৈতিক চালেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে

ইন্দ্রপ্রস্থের একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ একদিনে মহাভারতে ভগবান হয় নি। তার জন্য বছ বছর তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং কালের নিয়মে ধীরে ধীরে তার ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয়েছে। মহাভারতে প্রথমে আমরা কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ হিসাবেই পাই। কিন্তু তার গুণাবলী সত্যিই তাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে। যেমন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও সিংহাসনের প্রতি তার লোভ ছিল না, নিজের জন্য কিছুই ভোগের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, অন্যের দুঃখে নিজে থেকেই সাহায্য এগিয়ে গেছে এবং সবশেষে সমস্ত স্তরের মানুষকেই সমানভাবে ভালোবেসে গেছে। কৃষ্ণের এই গুণগুলি তার বন্ধুদের তো বটেই, এমনকী তার পরম শত্রুদেরও অবাক করেছে। কৃষ্ণের এই অসাধারণ চরিত্রের গুণাবলী তাকে পূজা পেতে সাহায্য করেছে। এভাবেই দীপক চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণের ভগবান হয়ে ওঠা বাস্তবিক অর্থেই মানুষের সৃষ্টি।

মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে ভক্তির অর্থ্য নিবেদিত হল। তৃতীয় ও তার পরবর্তী স্তরে সেই ভক্তি ও পূজা এক পারমার্থিক দার্শনিক স্তরে পৌঁছে গেল। একমাত্র ভক্তিই কৃষ্ণকে পাওয়ার একমাত্র উপায় হয়ে উঠল। মহাভারতের কর্মমার্গের উপরে ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবেই কৃষ্ণের অলৌকিক লীলাগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেল। দীপক চন্দ্রের রচিত *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম* উপন্যাসে কৃষ্ণের অলৌকিক ঘটনাগুলি অলৌকিক হওয়ার কারণে লেখক উপন্যাসের মধ্যে স্থান দেন নি। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই ঘটনাগুলি লেখক স্থান দিয়েছেন। কারণ এই গল্পগুলির মধ্যেই কৃষ্ণের ভগবান রূপ লুকিয়ে আছে বলে লেখক মনে করেছেন। কৃষ্ণ নিজের চরিত্রগুণে বা ব্যক্তিত্বের সক্ষমতায় ধীরে ধীরে মানুষের সন্তান থেকে অলৌকিক শক্তিধর ভগবানে উত্তীর্ণ হয়েছে, তার জ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে এই গল্পগুলিতে। আধুনিক ধর্মপ্রাণ মানুষের শিক্ষা, চিন্তা ও মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুলির সঙ্গে কৃষ্ণের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কূটনৈতিক সক্ষমতা এবং করুণা ও মমতার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন লেখক এই উপন্যাসে।^{৮৫} বিখ্যাত পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ* বইতে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কৃষ্ণ বাস্তবিক অর্থেই একজন মানুষ। কৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। যিশু জন্মের অনেক আগেই ভারতীয় লোককথা ও স্থাপত্যে কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ছবি ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়। ঠিক তেমনই কোন বিশেষ চরিত্রগুণে এবং ব্যক্তিত্বের জোরে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে মানব সন্তান থেকে অলৌকিক লীলাময় ভগবানে উত্তীর্ণ হল তারই এক জনপ্রিয় আখ্যান এই উপন্যাস।

মহাভারত কেন্দ্রিক অনেক উপন্যাস আমরা দীপক চন্দ্রের থেকে পেয়েছি। মহাভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ও ঘটনার নবনির্মাণ আমরা তাঁর হাত থেকে পেয়েছি। আলোচনায় তাঁর আরও অনেকগুলি উপন্যাস এখানে বাকি থেকে গেল। বিশ শতক থেকে একুশ শতকের

বর্তমান কাল পর্যন্ত পৌরাণিক উপন্যাসের পৃথক একটি পরিচিতি জনমানসে দীপক চন্দ্র আমাদের দিয়ে গেছেন। এখানেই তিনি অন্যান্যদের থেকে আলাদা স্থান পেয়ে গেছেন পাঠকদের মধ্যে।

১.৬।। বাণী বসু (১৯৩৯-বর্তমান)

বাণী বসু এই সময়ের অন্যতম একজন বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখিকা। তিনি প্রচুর বাংলা উপন্যাস, গল্প, অনুবাদ গল্প এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। পেয়েছেন একাধিক সাহিত্য সম্মান ও পুরস্কার। হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা তিনি। মূলত আটের দশকের সময়কাল থেকেই সাহিত্য জগতে ভালোভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম গল্প *আনন্দমেলা* ও *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *জন্মভূমি* *মাতৃভূমি* প্রকাশিত হয় শারদীয়া *আনন্দলোকে* ১৯৮৭ তে। কিন্তু তার আগেই তাঁর অনেক অনুবাদ প্রকাশিত সমাদৃত হয়েছে। তাঁর উল্লেখ্য অনুবাদগুলি- *শ্রী অরবিন্দের সনেটগুচ্ছ* (শৃংখলিত), *সমারসেট মমের সেরা প্রেমের গল্প* (১৯৮০, ১৯৮৪, প্রকাশক: রূপা) ও *এইচ ডি লরেন্সের সেরা গল্প* (১৯৮৭, প্রকাশক: রূপা)। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন তারাশঙ্কর পুরস্কার (১৯৯১), আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৭), বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৯৯), ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (২০০৮) এবং সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০১০)। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলি হল- *মৈত্রেয় জাতক*, *অন্তর্ঘাত*, *কিনার থেকে কিনারে*, *উত্তরসাধক*, *পঞ্চম পুরুষ*, *বাইরে*, *দিদিমাসির জিন*, *মেয়েলি আড্ডার হালচাল*, *রাধানগর*, *অমৃতা*, *নূহর নৌকা*, *সুরূপা কুরূপা*, *কাক জ্যোৎস্না*, *অল লেডিস ড্রমণ*, *একুশে পা*, *ট্রেকার্স*, *অশ্বযোনি*, *ফেরো মন*, *অষ্টম গর্ভ*, *অষ্টম গর্ভ* (দ্বিতীয়), *খনামিহিরের টিপি*, *ক্ষত্ৰা*, *কালিন্দী*, *কৃষ্ণ*, *পাঞ্চগল কন্যা কৃষ্ণা*, *সুযোধন দুর্যোধন* এবং *কৃষ্ণ বাসুদেব*।

অষ্টম গর্ভ -

ভারতবর্ষে সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুরাণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। বহুকাল ধরে চলে আসছে মানব জীবনের মনের গভীর বাস্তব প্রতীতিই পুরাণের ঘটনা হয়ে থেকে যায়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানব, অসুর, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব এসব নিয়েই মূলত পুরাণ। পুরাণের সমস্ত কিছুই যেমন ধ্রুব সত্য নয়, তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে কাল্পনিক গল্পকথা, ঠিক তেমনিই আবার সমস্ত কিছু ফেলনাও নয়। রহস্যের আড়ালে পুরাণ আবার এমন অনেক কিছু বলে যা সমকালীন জগতেও সমানভাবে সত্য। তাই পুরাণের অনেক কথাই এখনও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আবেগ তড়িত মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কাজে পৌরাণিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসি। শুধু তাই নয়, অনেক সময় আমরা মিল খুঁজে পাই পৌরাণিক কোনও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে। আবার পৌরাণিক কাহিনি থেকে প্রাপ্ত শব্দ আমরা বর্তমানেও ব্যবহার করি। ফলে বর্তমানকালে ব্যবহার হলেও শব্দটির

পৌরাণিক অনুষ্ণ আমাদের মাথায় চলে আসে। এভাবে আমরা দুইটি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করি এবং অনেক মিল পাই উভয়ের মধ্যে। আমাদের আলোচিত অষ্টম গর্ভ উপন্যাসটিও এদিক থেকে গভীর অর্থ বহন করে। বিশ্লেষণের আধারে, পৌরাণিক যুগ অতিক্রান্তের দীর্ঘ সময় পেরিয়েও বাস্তব জীবনে সেটার প্রভাব মনুর সন্তানদের সমাজে আবদ্ধ করে রাখতে সাহায্য করে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে পুরাণের কাহিনি বা আখ্যানকে পাশে রেখে প্রচুর নাটক, কাব্য নাটক, কবিতা লেখা হয়েছে। তবে শুধু তাই নয়, বর্তমানেও এই ধারা সমানভাবে এগিয়ে চলেছে। তবে আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে উপন্যাস নামক সংরূপের ক্ষেত্রে। কারণ একটি বড়ো অংশের কথা সাহিত্যিকেরা মনে করতেন যে উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তব জীবন সম্পূর্ণ জড়িয়ে আছে। ভাবনার সেই জায়গা থেকে উপন্যাসে মিথ বা পুরাণ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের নবজন্ম পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। কিন্তু কাব্য বা নাটকের ক্ষেত্রে তা হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা কোথাও প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। বিশিষ্ট সমালোচক ও প্রাবন্ধিক ক্ষেত্র গুপ্ত এই বিষয়ে লিখেছিলেন যে উপন্যাসের বিভাজনের ক্ষেত্রে ‘পৌরাণিক’ নামে একটি শ্রেণি বিভাগ থাকবে, সেই কথা আগে ভাবা হয় নি। পুরাণের মাধ্যমে বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার একটা ঝুঁকি থেকেই যায় অথবা তা একেবারেই সম্ভব নয়— মূলত এই ভাবনার উপরেই লেখকেরা বিশ্বাস করে এসেছে। তাই অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের মতো উপন্যাসে কিন্তু পুরাণ নিয়ে খুব একটা প্রয়োগ দীর্ঘকাল হয় নি। তবে প্রয়োগ করার বিষয়ে সাহিত্যিকেরা পিছিয়ে ছিলেন না। যেমন জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী এক্ষেত্রে অন্যতম একজন মুখ, যিনি পুরাণ নিয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখালেখিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, মহাভারতীয় একটি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন এক্ষেত্রে *পিতৃস্মৃতি* নামে। তবে এক্ষেত্রে ভাষার জটিলতা ও বিভিন্ন কারণে এই রীতি প্রাথমিকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। পরবর্তী সময়ে দীপক চন্দ্র নিজে ভারতীয় পুরাণ ও মহাভারত নিয়ে পৃথক একটি উপন্যাস রচনার ঘরানা সৃষ্টি করলেন। মূলত আজ পর্যন্ত তাঁর মতো কোনও সাহিত্যিকই ভারতীয় পুরাণকে নিয়ে এত বিস্তারিত ও গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি, এক্ষেত্রে তিনি একটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই ধারার উপন্যাসকে পাঠকদের কাছেও বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা পেতে সাহায্য করেছেন। এভাবে পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে থাকা প্রচ্ছন্ন চরিত্রদের দীপক চন্দ্র সামনে আনলেন এবং পুরাণের বিনির্মাণ ও নবনির্মাণ করতে শুরু করলেন। আমরা আমাদের এই আলোচনায় দীপক চন্দ্রের বেশ কিছু উপন্যাসকে নিয়ে আলোচনা করেছি। কৃষ্ণকে নিয়ে একাধিক উপন্যাস আমরা তাঁর হাত থেকে পেয়েছি। যেমন *শ্রীকৃষ্ণ এলেন দারকায়*, *ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ*, *বিষ্ম শ্রীকৃষ্ণ*। যার মধ্যে *বিষ্ম শ্রীকৃষ্ণ* যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কৃষ্ণের মানসিক অবস্থার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। কৃষ্ণের নিজেকে ‘কালের পুতুল’ বলে মনে হয়। এগুলি ছাড়াও কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক উপন্যাস তিনি রচনা

করেছেন। যেমন *শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম*, *যদি রাধা না হতো*, *কৃষ্ণস্ত ভগবান*, *কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ* এবং *মন বৃন্দাবন*। *কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের যে ভাষণ তার পটভূমির আধারে রচিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকই কৃষ্ণকে নিয়ে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাছাড়া সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকে নিয়ে *শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন* নামে বিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছেন।

আমরা সবাই জানি যে মহাভারতে কৃষ্ণ একজন মানুষ হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে দু তিনটে ঘটনা ছাড়া কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা উপস্থাপিত হয় নি। তাই কৃষ্ণ মহাভারতে একজন রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সবার কাছে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী পুরুষ। মহাভারতে কৃষ্ণ কর্ম থেকে ভক্তিমার্গের দিকে অগ্রসর হয়েছে। *কৃষ্ণস্ত ভগবান* উপন্যাসের দিকে দেখলে আমরা পাব যে, সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে শিশুর মতোই জন্মগ্রহণ করে, তারপর ব্যক্তিত্বের জোরে ও চরিত্রের গুণাবলীতেই ভগবানে পরিণত হয়। কৃষ্ণ এখানে বাস্তব পৃথিবীর মানুষ। একইভাবে পুরাণের কৃষ্ণও একদিনে ঈশ্বরে পরিণত হয় নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতামত ও অভিরূচি পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানের কৃষ্ণ শুধুমাত্র ভগবান নয়, তিনি বাঙালির ঘরের ছেলে। পুরাণের চরিত্রেরা বাস্তব জগতে প্রকৃতিরূপে না থাকলেও রূপকের মাধ্যমে সব সময় ঘুরে বেড়ায়। আমাদের মতো মানুষের কথার মধ্যেই পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনা নানাভাবে প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে চারদিকে কতই না দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরা যাক একটি অতি পরিচিত শব্দবন্ধ ‘কলির কেষ্ঠ’, এটার অর্থ নারীর হৃদয় জয় করা বর্তমানের ছেলে ছোকরা বা যুবক। আবার অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য বোঝানোর জন্য বলা হয় ‘কুবেরের ভাণ্ডার’। অত্যন্ত সুন্দর রমণী বা নারীকে অভিহিত করা হয় ‘ডানা কাটা পরী’। আবার রূপবান যুবক বা পুরুষ আমাদের সমাজে অভিহিত হয় ‘ময়ূর ছাড়া কার্তিক’ নামে। আবার একটি পরিচিত শব্দবন্ধ হল ‘কানু বিনে গীত নাই’। অর্থাৎ ভারতীয় পুরাণে কৃষ্ণের একাধিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে কোনও একটি নাম গানের মধ্যে থাকবেই, তা না হলে গান রচিত হবে না। পুরাণের নানা অংশ জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে বাণী বসুর লেখায়। আমাদের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকটের মুহূর্তে সচেতনতার আনয়ন করা একজন লেখক এর কাজ বা দায়িত্ব। এতে অবশ্যই মিশে থাকে সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব জীবনবোধের আখ্যান। লেখিকা বাণী বসু পৌরাণিক চরিত্রদের আমাদের পৃথিবীর বাস্তবতার নিরিখে ও তিনটি শিশুর অবলোকনে সচেতন মননের আশ্রয় নিয়ে নির্মাণ করেছেন *অষ্টম গর্ভ*।

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই আমাদের মনে পড়ে যায় লোকবিশ্বাস, লোককথা এবং ধর্ম কেন্দ্রিক নানা বিষয়। আমরা জানি যে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ। মহাভারতের মধ্যে গীতায়

হোক, কিংবা বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদির মধ্যে কৃষ্ণের জীবনের অনেক কথা আমরা জানতে পারি। যেমন যাদবদের পরিবারে কৃষ্ণের জন্ম। তার পিতা বসুদেব এবং মাতা স্বয়ং দেবকী। আবার দেবকীর ভাই ছিল দানবরাজ কংস। দানব কংস আবার সাধারণ প্রজা থেকে জনগণকে ভীষণভাবে অত্যাচার করত। তাই ব্রহ্মা ও মহাদেবের অনুরোধে বিষ্ণু মাতা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে বসুদেবের সঙ্গে কংসের ভগিনীর বিবাহের পরে দৈব বাণী থেকে জানা যায় যে দেবকীর গর্ভের পুত্র সন্তানের মাধ্যমেই একদিন কংস মারা যাবে। এর ফলে বসুদেব ও দেবকীকে কংস কারারুদ্ধ করার আদেশ দেয় এবং পরবর্তীতে কারাগারের মধ্যে হওয়া সাত জন সন্তানকে হত্যা করে। এভাবে ধীরে ধীরে সাত জনের পালা শেষ হলে পালা আসে অষ্টম সন্তানের। আমরা জানি যে অষ্টম সন্তান বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ। বহু অসুরদের হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য কৃষ্ণের মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করা এই পৃথিবীতে। অন্যদিকে মহাভারতে কৃষ্ণ একজন ক্ষত্রিয়। গীতায় কৃষ্ণ বুঝিয়েছে ধর্মের সারমর্ম এবং দেখিয়েছে জীবন নির্বাহের সহজ পথ। মহাভারতে কৃষ্ণের কূটনীতি ও রাজনীতি আমাদের ধর্মের যথার্থ পথ দেখিয়ে দিয়েছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে, কৃষ্ণকে বন্ধু ও প্রেমিক এবং দুষ্টির দমনকারী হিসাবে পাওয়া যায়। মানব সমাজের কল্যাণে দ্বাপর যুগের কৃষ্ণকে বর্তমানের দেবতায় রূপ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গুণের আধার এবং সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি তথা দেবতাই কৃষ্ণ। বাণী বসু উপন্যাসের নামকরণ অষ্টম গর্ভ করেছেন কৃষ্ণকে ইঙ্গিত করেই। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যেই ভালো-মন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণ রূপকের ছলে বর্তমানের আঙিনায় উপস্থিত হয়েছে। মানব রূপে কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে চরিত্র শক্তির আধার। উপন্যাসের মধ্যে সেই কথাই বলার চেষ্টা হয়েছে।

বাণী বসু উপন্যাসটিকে দুইটি খণ্ডে বিভাজন করেছেন। উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছেও দুইটি খণ্ডে। উপন্যাসের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে পুরাতন চরিত্রেরা এবং অধ্যায়গুলির নামও পুরাণের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ‘অষ্টমের শতনাম’ যেখানে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শিশুদের নামকরণের কথা ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানান পৌরাণিক আখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই অষ্টম গর্ভ বলে যাদের মান্যতা দেওয়া হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে, দুর্গাপ্রসাদের পরিবারে আমরা দেখতে পাই তারাই বেড়ে উঠেছে। অর্থাৎ যেন ‘গোকুলে বাড়িছে সে’। অথবা ‘ছদ্মবেশী অসুর-অসুরিণী’, বাস্তব জগতের মানুষদের বাহ্যিক আবরণের প্রভাবে মনে বাসা বাঁধা ভয় এবং সেইটি জয় করার কথা এখানে উঠে এসেছে। এমনিতে যথার্থ নামকরণ পাঠকের মনে উপযুক্ত বিষয়কেই ইঙ্গিত করে। চরিত্রগত ভাব বৈশিষ্ট্য অনুসারে অধ্যায়ের নামকরণ এই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায়। উপন্যাসে একাধিক অধ্যায়ের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা- ‘শ্রীদাম-সুদাম-সুবল-সখা’, ‘নাচিকেত’, ‘বাসুদেব’, ‘নিও-যশোদা’, ‘কালিন্দীর দহে’, ‘হরিবংশ-৬’ অথবা ‘হরিবংশ-৭’। এগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এদের চরিত্র বোঝিত

নানান ঘটনা অধ্যায়গুলির ভেতরের অর্থ বহন করে রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা যদি ‘নাচিকেত’ অংশটির কথা বলি তাহলে সহজেই আমাদের মনে পড়ে যায় উপনিষদের নাচিকেতার আখ্যান। যে বালক নাচিকেতার কঠোর প্রশ্নে তার পিতা যথার্থ উত্তর না দিতে পেরে দেবতা যমের কাছে যাওয়ার কথা বলে, যমের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করার পর যমের দেখা পায় নাচিকেতা এবং অনেক তর্কবিতর্কের পরে নাচিকেতা মৃত্যু সম্পর্কিত অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর পায় মৃত্যুর দেবতার কাছ থেকে। যদিও মৃত্যুর পর কী থাকে বা ব্রহ্মবিদ্যার মাধ্যমে মৃত্যুকে জানার বিষয়টি সম্পর্কে একাধিক দ্বিধা ও সংকট নাচিকেতার মধ্যে কাজ করেছে। যমের উত্তরের মাধ্যমে নাচিকেতা খুশি হয় নি। যাই হোক এটি সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ। আমরা এই উপন্যাসেও দেখতে পাব মৃত্যুকে নিয়ে শিশুগুলির মনে একাধিক বোধের জন্ম হয়। আবার আমাদের উল্লেখ করা উপরের অধ্যায়ের নামগুলি খেয়াল করলে দেখা যাবে যে ওরকম অধ্যায়ের নাম আমাদের কৃষ্ণের জীবনের নানা ছবি বা ঘটনার কথা পাঠকের মানসলোকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। অন্যান্য অধ্যায়গুলির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি খেয়াল করা যায়।

উপন্যাসের শুরুতেই কৃষ্ণের কথোপকথন সুদর্শন চক্রকে নিয়ে শোনা যায়। যে চক্রের গুণে অসুর বিনাশ সম্ভব হতো। পৃথিবীর জন্ম থেকেই খারাপ মানুষ বা নেতিবাচক কূটনীতিবিদদের অবস্থান আমাদের সমাজেই রয়েছে। একজন কৃষ্ণের পক্ষে তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। মহাভারতের কৃষ্ণের পক্ষেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সামগ্রিক প্রয়াস সে করে গেছে। হয়তো প্রতিটি যুগেই কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ফিরে না আসার কথা উপন্যাসের শুরুতেই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সুদর্শন চক্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটি শত্রুর প্রাণ না কেড়ে ফিরে আসত না। হয়তো পৃথিবীর একশত অসুর ও রাক্ষসের মাঝে তার ধ্বংসলীলা নিউক্লিয়ার বোমার মতো খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। উপন্যাসে আমরা পাই:

তাঁহার শূন্য তর্জনির দিকে চাহিয়া দুশ্চিন্তিত হইয়া বলিলাম, ‘প্রভু আপনার চক্র কোথায়?’

— ‘দুষ্কৃতিদের বিনাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, যুগ ঘুরিতে চলিল, ফিরে নাই।’

— ‘সর্বনাশ! হইলটা কী? গেল কোথায়?’

— ‘টুকরাটুকরাটুকরাটুকরাটুকরাটুকরা হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া গিয়াছে শুনিতোছি। নিউট্রন বোমা হইতে চকোলেট বন্ড পর্যন্ত বিচিত্র রূপে।’

— ‘তাহা হইলে আর আপনি যাইয়া কী করিবেন?’ – হতাশ হইয়া বলিলাম। এই চক্রই তো শিশুপাল বধ করিয়াছিল। চক্রহস্তে ছুটিয়া আসিতেছেন দেখিলে তবেই তো লোকের কাপড়ে-চোপড়ে হইয়া যাইত!^{৮৬}

দেবতার ক্ষমতা বা শক্তি নিয়ে ভারতীয়দের বিশ্বাস চিরকালের। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ খুবই উল্লেখযোগ্য দেবতা। কারণ লোকবিশ্বাসের স্তরে কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে। কৃষ্ণকে নিয়ে মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা যথেষ্টই দেখা যায়। যে কোনও সংকটের মুহূর্তে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে মানব সমাজকে রক্ষা করবে এমনটাই ভক্তদের আশা। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে দুর্গাপ্রসাদ ও তার বাবা দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে পৃথিবীকে সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য তার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলের বউ দেবহুতির গর্ভে ‘কৃষ্ণ’ আবির্ভূত হবে তা বিশ্বাস করে। তাই দেবহুতি প্রতিদিন সকালে উঠে দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে গীতা পাঠ করত। এই সমস্ত বিষয়গুলি ভারতীয়দের মনে দেবতার ক্ষমতা বা বিশ্বাস সম্পর্কে সমীহ জাগাতে সাহায্য করে। দেবহুতি যখন প্রসব বেদনায় খুবই কষ্ট পাচ্ছে, তখন বাড়ির লোকের মনে উঠে আসে:

এক কানে প্রসূতির চিৎকার আর এক কানে ভাগবতের ‘সত্যম পরম ধীমহি’। বাবাও দেখছিলেন পৃথিবী আত্ননাদ করছে, সেই আত্ননাদ তাঁর কানে গেছে। চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধেয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে, আসন টলছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী তিনি আসছেন, নেমে আসছেন। কারাগারের লোহার দরজা ওই ঝনঝন শব্দে খুলে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাকে ঘর্মসিক্ত করে আমি সড়াক করে অবতীর্ণ হলুম।^{৮৭}

আবার উপন্যাসের পরিচয় অংশে বলা হয়েছে মানব জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। বাণী বসু অসাধারণ কথায় উল্লেখ করেছেন:

কৃষ্ণ এক অদ্ভুতকর্মা শিশুর নাম। আমাদের লোককথায়, পুরাণে, আমাদের চেতনায় মিশে আছে কৃষ্ণকথা। তার ওপরে আছে অবতার ভাবনা। প্রতিনিয়ত আমরা কৃষ্ণের অবতরণের প্রত্যাশায় থাকি। এই প্রত্যাশা যেমন করুণ তেমনই কৌতুকাবহ। কেননা জাতীয় চৈতন্যে ওতপ্রোত এই কৃষ্ণকথা যেন এক রূপক যা বাস্তব হয় উঠতে চায় ঘরে ঘরে শিশুদের জন্মে, তাদের বড় হয়ে ওঠায়, তাদের সম্পর্কে আমাদের আশায়। কোনও না কোনওভাবে তারাও অদ্ভুতকর্মা, যেন এক একটি ছায়াকৃষ্ণ। মহামানবের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন শুধু আমাদের বিশেষত্ব নয়, স্বপ্নও। অর্ধস্কুট এই আকাঙ্ক্ষার একান্ত মানবিক প্রেক্ষাপটে তিনটি শিশুর বেড়ে ওঠার কাহিনী ‘অষ্টম গর্ভ’। তাদের ঘিরে আবর্তিত হয় বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে কালান্তক সময়। শৈশবকে সাধারণত একটি সুন্দর উপসময় হিসেবেই দেখি আমরা। কিন্তু মানুষ, পৃথিবী, জীবন সম্পর্কে শিশুর বোধও তো বড়দের মতোই বাস্তব সত্য। শিশুদের দেখাকে পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ। যেহেতু তাদের বোধের জগৎ বড়দের জগতের সঙ্গে সমান্তরাল নয়, তাই দুই জগৎ পরস্পরের সঙ্গে কাটাকুটি খেলে এ উপন্যাসে। তৈরি করে এক জটিল ছক। বস্তু জগৎ সেখানে অনবরত পুরাণ হয়ে যাচ্ছে আর পুরাণ হয়ে উঠছে বাস্তব।^{৮৮}

পুরাণের কৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভের একমাত্র সন্তান হলেও উপন্যাসে কিন্তু দেবহুতির অষ্টমবারের গর্ভে জন্মায় তিনজন সন্তান। দুজন ছেলে ও একজন কন্যা সন্তান। প্রথম ছেলে মায়ের মতো ফর্সা হয়, দ্বিতীয় ছেলে কৃষ্ণ বর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণের মতোই শরীরের রঙ এবং মেয়েটির

সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘রোমশ কুৎসিত লোলচর্ম বাঁদর বাচ্চা’। তবে তিনজন সন্তানের জন্মের বিষয়টিতে তারা একেবারেই অবাক হয় না। বরং ভগবানের আগমন প্রমাণ করতে কালিকামোহনের থেকে বলিয়ে নেয়– ‘প্রথমটিই তোমার ঠিকঠাক অষ্টমগর্ভ শিবু, মনকে চোখ ঠেঁরে লাভ কী?’ আবার কন্যা সন্তানটি যে যোগমায়া ভিন্ন অন্য কেউ নয়, সেটিও ঠাকুরদার গভীর বিশ্বাস। শিবপ্রসাদ এবং দুর্গাপ্রসাদ পেশাগতভাবে চিকিৎসক। তাই যেখানে বিজ্ঞান ও যুক্তি তর্কের দ্বারা একটি বিষয়কে ভাবনার কথা উঠে আসে। সেখানে বিশ্বাস কীভাবে বড়ো স্থান দখল করে থাকে তা ভাবনার উপরে। যোগমায়ার জন্মের প্রসঙ্গে ঠাকুরদা এতটাই নিশ্চিত ছিল যে কালিকামোহনের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে উঠে এসেছে:

ঠাকুরদা বললেন, ‘যোগমায়া?’

— ‘তাই বল তো তাই। সুভদ্রা-বলদেব-জগন্নাথ বলো তো তাতেও আপত্তি করব না। অর্ডার কি আর সবসময়ে ঠিক থাকে? থাকে না! যুগটা তো পাল্টেছে হে!’

শুঁড়তোলা তালতলার চটিতে পা গলালেন কালিকামোহন। শিবপ্রসাদ বললেন, ‘তা বটে!’^{৮৯}

উপন্যাসের চরিত্রদের নামও দেব দেবীর নামে পূর্ণ হয়ে আছে। ঠাকুরদার নাম শিবপ্রসাদ, বাবা দুর্গাপ্রসাদ এবং মা দেবভূতি। স্থানীয় প্রপিতামহ হরিনারায়ণ ও ঠাকুমা মাতঙ্গ মোহিনী। বন্ধু কালিকামোহন, শিবপ্রসাদের ছেলে লক্ষ্মীপ্রসাদ ডাক নাম ইন্দ্র/ ইন্দ্রপ্রসাদ এছাড়াও অনাদিপ্রসাদ, নীলমণি ও চিত্তামণি এবং কানু মামা– এদের অনেক নামের সঙ্গেই কৃষ্ণের নামের মিল পাওয়া যায় এবং অনেকগুলি কৃষ্ণেরই নাম। শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই অষ্টম গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদের নামকরণ কী হবে, তা নিয়েও গভীর ভাবনা দেখা যায়। এদের নামও পুরাণ অনুসারে করার কথা ভাবা হয়। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে উঠে এসেছে:

— ‘আপনি কী ভেবেছেন বলুন তো!’

— ‘কী আবার ভাববো, কালী বলে গেছে ওদের বলরাম জগন্নাথের অংশে জন্ম।’ মা আধঘোমটা দিয়ে চা আনছিলেন, তখনও শরীর ভালো সারেনি। তিনি শীর্ণশ্রী। মৃদুকণ্ঠে বলেন, ‘এ সব কথা কি লোককে জানতে দেওয়া ভালো?’^{৯০}

দেবভূতির সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় জীবন সংকট দেখা দিলে এক সন্তান বুনবুনকে তরুণালার কাছে পাঠানো হয়। জন্মদাত্রীর শারীরিক অবনতির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ঘটনা কিছুটা কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে মিলে যায়। কৃষ্ণের জন্মের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই মহামায়ার ঘটনা, যেখানে কৃষ্ণের জন্মের ফলে কারাগারের বাইরে পাহারা রত সৈনিকেরা অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং কারাগার খুলে যায়। ফলে কৃষ্ণকে রেখে আসা হয় নন্দ-যশোদার

বাড়িতে এবং যশোদার সন্তান যোগমায়াকে কারাগারে আনা হয়। পুরাণের এই কাহিনি সমস্ত গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত গ্রন্থে কৃষ্ণ কথা উপস্থাপিত হয়েছে। অষ্টম গর্ভের সন্তান বুনবুনকেও বাস্তবের পটভূমিতে পালিত মায়ের স্তনের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই বুনবুনের কথা বলতে গিয়ে বাণী বসুর মনে হয়েছে- ‘আমি এখন মাতৃক্রোড়ে। মা নয়, তবু মা-ই। দেবকী নন্দন নই আর, এখন যশোদা দুলাল’।^{৯১} আবার উপন্যাসের ঘটনা একটু এগোতে না এগোতেই চমৎকার একটি দৃশ্যের দিকে আমাদের নজর পড়ে। তরুণালার কোলে শুয়ে দুধ খাওয়ানো মহাভারতের স্মরণীয় একটি দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বাণী বসু আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। অসাধারণ সেই দৃশ্য:

...যশোমতী তাঁর বক্ষ দু হাতে টিপে ধরছেন আর তেষ্ঠায় জল সো-জা আমি মুখ, আমাতে পড়ছে। চেষ্টা করতে হচ্ছে না। অর্জুন যেন শুয়ে আছেন শরশয়্যায়, পিতামহ তাঁর পিপাসা মেটাচ্ছেন। অর্জুন আর ভীষ্মর ভূমিকা উল্টে গেছে। ...^{৯২}

আমরা দেখেছি কৃষ্ণের জন্মের পর মামা কংস এক মুহূর্তেও শান্তিতে ঘুমোতে পারে নি। প্রতিমুহূর্তেই তাকে তাড়া করেছে পূর্বে ঘটে যাওয়া একটি দৈববাণী। যেখানে উল্লেখ ছিল দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তান তার মৃত্যুর কারণ হবে। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই পূর্বের সমস্ত সন্তানকে নির্বিচারে আছাড় মেরে কংসের হত্যা করতেও হাত কাঁপে নি। পরে যখন জানা যায় যে কৃষ্ণ অন্যত্র বেড়ে উঠছে, তখন একাধিক রাক্ষসী মামা কংস ভাগ্নে কৃষ্ণকে হত্যার জন্য পাঠাতে থাকে। যেমন পুতনা রাক্ষসী। এর উদ্দেশ্য ছিল স্তনে বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে খাওয়ানো। যার ফলে সহজেই কৃষ্ণের মৃত্যু হবে। কিন্তু বাস্তবে ফল উল্টো হয়েছিল, বরং রাক্ষসী নিজেই মারা যায়। এই উপন্যাসে শিশুর সরল মনের নির্বাক ভঙ্গির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আত্মীয়দের বিভিন্ন গন্ধকে বিষ মাখানো স্তনের পরিবর্তে বাণী বসু ব্যবহার করেছেন।

অন্য পৃথিবী থেকে অনেক গন্ধও আসে। যতক্ষণ তারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছে, আমি কিছু বলি না। কিন্তু তারা যখন হেঁটে হেঁটে ঘরে ঢুকে পড়ে আমি নাকমুখ কুঁচকে কেঁদে উঠি। ধোঁয়ার গন্ধে এক-একদিন গুঁর শাড়ি ভারী হয়ে থাকে। ... ধোঁয়া-পুতনার কাছ থেকে পালাচ্ছি। কোনও কোনওদিন ভীষণ মেছো মেছো গন্ধ থাকে হাতে। ... আঁশ-পুতনার হাত থেকে পালাচ্ছি। ...নাকমুখ রগড়াই, চিকরে উঠে ঠেলে দিই তেলের শিশি। তেল-পুতনার কাছ থেকে পালাচ্ছি।^{৯৩}

আবার এই গন্ধ যদি মায়ের নিজের শরীরের হয়, তখন প্রত্যেক শিশুর কাছেই তা অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ক্রমাগত কাঁদতে থাকা শিশু সেই গন্ধ পেয়ে কিছুটা শান্ত হয়। তার ভয় দূর হয়। সেই কথাও লেখিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লেখিকা লিখেছেন:

মুখে পানের গন্ধ, বুক দুধের গন্ধ, গালে গাল, বুক বুক যশোমতীর স্নেহের গন্ধ গলে গলে
পড়ছে। আস্তে আস্তে শান্ত হই। মুছে যায় সেই নীল, সেই সাদা, সেই বাঁশি, সেই গোষ্ঠ। ...

...
৯৪

বাঙালির ঘরের ছেলেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কখনও বুদ্ধিগত দিকটিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হয়, কখনও বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয় আবার আচরণগত দিক থেকেও ঘরের সন্তানদের বিভিন্ন দেবদেবীর নামের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাহিত্য সমাজ এবং জীবনের কথাই প্রকৃতপক্ষে বলে থাকে। আবার ভারতীয়রা তথা বাঙালিরা বাড়ির মেয়েদের লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তুলনা করে। এর একাধিক অর্থ আছে একদিকে লক্ষ্মী দেবী ধন-সম্পত্তির প্রতীক, আবার অন্যদিকে মেয়েদের ‘লক্ষ্মী হয়ে থাকা’ বলার মাধ্যমে বোঝানো হয় শান্ত হয়ে থাকার কথা। উপন্যাসে ছোটখাটো ফর্সা, সুন্দরী ও তুলোর মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও পিসিমা লক্ষ্মীর মুখরোচক খাবার বানানোর লক্ষ্মীমন্ত হাত ছিল। যা পরে তিন শিশুর একজন রপ্ত করে।

বাড়িতে ছোট শিশুদের স্কুল যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত বিভিন্ন পৌরাণিক লোকপ্রচলিত আখ্যান শোনানো হয়। সেইখানে তারা নিজেদের কল্পনার জগতের দেব-দেবী ও রাক্ষসদের দেখতে পায়। পুরাণ এবং মহাকাব্যের আখ্যানে এই উপন্যাসটি আগাগোড়া ভরে আছে। রামায়ণের সীতাকে হরণের ঘটনা আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই। দেখতে পাই শূর্ণখার প্রেম নিবেদনের বিষয়টিও। আসলে সেই সময়ের কলকাতায় ভিক্ষুকের চলাচল একটু বেশি বেড়ে গিয়েছিল। আসলে তেমজদের এই অভিজ্ঞতা আর রামায়ণের ভিক্ষা গ্রাহকদের কাল্পনিক বেশভূষার মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা যায় নি। বাচ্চাদের বড়োরা ছেলে ধরার আখ্যান শোনাত, ফলে তারা ভয়ে বাইরে যেত না এবং অপরিচিত লোকজন দেখলে ছেলে ধরা ভেবে ভয় পেত। ফলে উপন্যাসে আমরা দেখেছি একজন মহিলা ভিক্ষুক পাড়ায় ঢুকে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য ঠাকুমার তরফ থেকে ‘তারকা রাক্ষসী’ নাম দেওয়া হয় তাকে। রামায়ণে এই রাক্ষসী কিন্তু মুনি ও ঋষিদের অনেক সমস্যায় ফেলেছিল।

উপন্যাসটিতে কৃষ্ণ প্রধান পৌরাণিক চরিত্র হলেও বাস্তব কাহিনি মূলত দাঁড়িয়ে আছে ভূমিকম্প, দাঙ্গা ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠা তিনটি ছোট শিশুকে নিয়ে, তাদের মনের পরিবর্তনকে আশ্রয় করে। মাতৃভূমির প্রতি প্রেম সৃষ্টি হওয়ার আগে গহনার প্রতি আগ্রহ থেকে বুনবুনের সরল চেতনায় বিরূপ প্রতিফলন ঘটে। মায়ের গয়না তারা সমস্ত ভাই বোন মিলে পড়বে এই আশা ভেঙ্গে যায় তার। যখন সে জানতে পারে- ‘দেশের কাজে দেবু সব দিয়ে দিয়েছেন। তোদের বাবা তো দেশের কাজ করতো কিনা’।^{৯৫} দিদির মুখে এই কথা শোনার পর বুনবুনের রাগ হয় দেশের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই দেশভাগের ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা যখন চলতে থাকে তখন শিশুদের মনে উত্তেজনা তৈরি হয়, বাড়ির বড়োদের কাছে নানা

শব্দবন্ধ ক্রমাগত শুনতে থাকে শিশুরা। যেমন ধরা যাক ‘দুটি স্কুল মুসলমানদের হাতে’ বা ‘মসজিদে ১০ হাজার মুসলিম গুলি জমায়েত হয়েছে’, এগুলি থেকে তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং এই ভয় থেকেই শিশুরা ভাবতে শুরু করে মুসলমানেরা বুঝি রাক্ষস হবে বা রাক্ষসদের মতো ভয়ের কিছু একটা। হীরামতি রাক্ষসীর মতো মুসলমান রাক্ষসদেরও বধ করেছিল তিনটি শিশু- বাবা ও দাদার কথা শুনে এবং নতুন ধারণা লাভের মধ্যে দিয়ে।

বাবা দাদাভাইকে কখনও সোজাসুজি বাবা বলতেন না, আজ বললেন- ‘আপনি ভেবে দেখুন বাবা, এক মায়ের পেটের সন্তান ছিলুম আমরা এই কপুরুষ আগেই। পাণ্ডবও তো আসলে কৌরবই। কে আল্লাহ, কে ব্রহ্ম কেউই জানে না। সত্যস্বরূপে তিনি কি আল্লাই? তিনি ব্রহ্মই? তিনি কোনওটাই নন। আমাদের মনগড়া নামে তিনি ধরবেন কেন বাবা? আপনারা পণ্ডিতরা যাই বলুন। তবু সেইটুকু, মাত্র সেইটুকু নামের আর আচারের বিভেদের ছুতো ধরে যদি কতগুলো সুযোগ-সন্ধানী ক্ষমতালোভী আমাদের যখন তখন খেপিয়ে দিতে পারে, আমরা এমনি করে একে অপরকে খুন করব। আমাদের সত্যিই হাত পা আসছে না বাবা! সব মিথ্যে মনে হচ্ছে। যা এতদিন এত যুগ ধরে করা হল সবই বাজে ... বাজে।’^{৯৬}

উপরের কথাগুলি শুধুমাত্র দেশ ভাগ ও দাঙ্গার কথাই বলে না, দেশের অবস্থা বোঝার ক্ষমতাও শিশুদের প্রদান করে। শিশুদের পরিচয় হয় মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের সঙ্গে। তবে অবশ্যই তা বড়ো মানুষদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসের বুনবুনরা চেয়েছিল একটি শান্তিপূর্ণ দেশ, যেখানে সবাই একত্রে বসবাস করবে, একে অপরের দুঃখে ও সুখে পাশে থাকবে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে তা সম্ভব হয় নি। মহাভারতের সময়েও কৌরব পাণ্ডব একত্রে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা ও সম্পদের প্রতি লোভ তাদেরকে একসঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে নি। তার সঙ্গে জুড়েছিল নারীর প্রতি অপমান এবং সম্মান লুণ্ঠন। এই উপন্যাসেও দেশভাগ ও দাঙ্গায় সেরূপ ঘটনাই ঘটেছে। ফলে মহাভারত ও এই উপন্যাসের আখ্যান কোথাও অনেকাংশে এক হয়ে যায়।

— ওই তো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ওঁর নায়ক ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তী-বিদুর এঁদের সঙ্গে এবং যা চাইছিলেন সেই রাজত্ব, অতুল ঐশ্বর্য, ভাইয়েদের আনুগত্য, সহযোগিতা, প্রজাদের সন্তোষ একসঙ্গে পান নি?^{৯৭}

কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের পরেও আপনজনের সান্নিধ্য তথা নিবিড় বন্ধন এই সকল বীর মানুষদের জীবনে ফিরে আসে নি। বাস্তব পুরাণের মেলবন্ধন ক্রমশ জীবন তত্ত্বের আনয়ন ঘটিয়েছে।

—না, না, ভাই মন দিয়ে দেখো ভাবো, আমরা অনেকেই একটা জঙ্গলাকীর্ণ, রক্ষ- অনুর্বর খাণ্ডবপ্রস্থ পাই, তাকে ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করবার পরই রাজসূয় যজ্ঞে আমাদের পেয়ে বসে, আর তত্ত্ব দেখবার জন্যে আমরা দুর্যোধনদের খুঁজে খুঁজে বার করি।^{৯৮}

এর পরবর্তী সময়ে আবার আমরা মহাভারতীয় অনুষ্ণ খুঁজে পাই। স্বাধীনতা দিবসের দিন দুর্গাপ্রসাদ এর ছেলে হঠাৎ হারিয়ে যায়। তারপর অবশ্য আবার অন্যান্যদের সাহায্যে ফিরেও আসে। দুর্গাপ্রসাদ নিজে একজন ডাক্তার অর্থাৎ বিজ্ঞানের মানুষ। কিন্তু বিজ্ঞানের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সে একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষ। তাই সন্তান হারাবার ঘটনাকে দুর্গাপ্রসাদ বিশ্লেষণ করে মহাভারতের কৃষ্ণের আগমনকে সামনে রেখে। অসাধারণ এই তুলনা। মহাভারতে কৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে কোথাও মিল দেখা যায় দুর্গাপ্রসাদের সন্তানের ফিরে আসাকে। হতাশার মাঝে আবার খুঁজে পায় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নকে। বাণী বসুর এই নির্মাণ যথার্থই আমাদের চমকে দেয়। মহাভারতের নতুন এক নির্মাণ আমরা খুঁজে পাই এখানে। বাণী বসু লিখেছেন এই প্রসঙ্গে:

শুধু দুর্গাপ্রসাদ স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যাবেলা পুনপুনের হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে একটা বহু প্রচলিত কাহিনীর আদল দেখতে পেলেন। কংস সেবার পাঠায় ভূগাবর্তাসুরকে। ক্রীড়ারত যশোদাদুলালকে সে বাতাসের ঘূর্ণির রূপ ধরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সারা ব্রজ যখন শিশুর জন্যে হায় হায় করছে তখন দেখা যায় এক বিকট অসুরের মৃতদেহের বুকের ওপর শিশুটি তার গলা জড়িয়ে হাসছে।^{৯৯}

তবে উপন্যাসের এর পরের অংশে আবার আশাবাদ জেগে ওঠে। হতাশার মাঝে নতুন স্বপ্ন দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করে:

তবে কি এখনও আশা আছে? এই ছেঁড়াখোঁড়া হতশ্রী দেশ, চতুর্দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন! সুভাষ মৃত বলে ঘোষিত! তবু, তবু কি সব শেষ হয়ে যায়নি? আছে? আশা?^{১০০}

স্বাভাবিকভাবেই যে ভারতের জন্য এত আত্মত্যাগ, বলিদান ও যুদ্ধ করতে হয়েছে সমস্ত স্তরের ভারতবাসীকে, সেই স্বপ্নের ভারতভূমি ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা পেলেও পূর্বের অবস্থানে আর থাকতে পারে নি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে। দুর্গাপ্রসাদ দেখতে চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর দেখানো এক ভারতবর্ষ। তাই বিভাজিত এই দেশ তার কাছে হয়ে গেছে ‘হতভাগ্য’। দেশভাগের ফলে জন্ম নিয়েছে ভিটেমাটি ছাড়া মানুষ, দুর্ভিক্ষ, মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস ও দাঙ্গা- যা শিবপ্রসাদের ছেলে একেবারেই দেখতে চায় নি। তবুও সামনের দিনের ভালো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশায় থাকে মানুষগুলি। তাদের দেখতে হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে আশা একগুচ্ছ মানুষের যন্ত্রণাকাতর ছবি, বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ও শিয়ালদহ স্টেশনে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে সেই সমস্ত মানুষেরা। এই সকল মানুষেরা পরবর্তী সময়ে কলকাতার যেখানে জায়গা পায় সেখানেই থেকে যেতে বাধ্য হয়।

মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র বিশেষ গুণের অধিকারী। নিষ্ঠা ও শ্রম অর্জুনকে যেমন ভিন্নমাত্রা দিয়েছে, তেমনি মহাভারতের পাঠকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে কর্ণ। তাই মানুষের অভিমানের প্রতীক কর্ণ। ঠিক তেমনভাবেই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, গান্ধারী ও পিতামহ ভীষ্ম প্রত্যেকেই তাদের চরিত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণাবলী নিহিত রেখেছিল। এই উপন্যাসে আমরা যে ঠাকুরদাকে পাই, তিনি একধারে— ‘দুঁদে পুলিশ অফিসার কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবী’।^{১০১} তাই তার একইসঙ্গে কৃষ্ণ ও কর্ণ সাজার কথা। এই উপন্যাসে সারদাবাবু বলেছে:

— আমাগ প্রয়োজন এখন একটি কৃষ্ণ অবতারের—সারদাবাবু বললেন, সেই তিনি ইন্দ্র-ভজনা বন্ধ কইরলেন। বাস ইন্দ্র কুপিত হইয়া বৃষ্টি পাঠাইলেন, বৃষ্টিতে ব্রজ ভাইসা যায়। তখন তিনি গিরিগোবর্ধন এক আঙুলে তুইলা ছাতার মতন ধইরলেন ব্রজবাসীর মাথার উপর...^{১০২}

তিনটি শিশুর মাধ্যমে এই উপন্যাসটি ক্রমশ এগিয়েছে। শিশুরাই এই আখ্যানের প্রাণ। তাদের মানসিক সরলতা থেকে বাস্তববোধের শিখন, দেশ ও মানুষকে বুঝতে সাহায্য করেছে। বাস্তব জগতের বিষয়গুলিকে বোঝানোর জন্য ভারতীয় পৌরাণিক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং মহাকাব্য আমাদের সাহায্য করেছে। শিশুর মতো আচরণ করা মানুষগুলি নিজেদের জীবনের সার অনুসন্ধান না করে চমৎকার কোনও কিছু ঘটীর অপেক্ষায় থাকে। কৃষ্ণের একাধিক নামের ব্যবহার এই উপন্যাসে বারবার দেখা যায়। আবার এর মাধ্যমেই জীবনের রস অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখা যায়। তাই চিরন্তন সত্যকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে এই সকল মানুষেরাই নিজেরা দেব-দেবী ও রাক্ষসে পরিণত হয়েছে। আমাদের জীবনে চলার পথে যে নিরন্তর সত্য বিষয়টি আছে তা মহাভারতেও লক্ষ্য করা যায়। জীবনে চলতে গেলে একাধিক ধাক্কা আমাদের খেতেই হয়, তবুও এগিয়ে চলার নামই জীবন। সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সাফল্যকে পেতে হয়। নিজের ক্ষমতাকে জানা ও বোঝা এবং ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলাই জীবনের অন্যতম ধর্ম। মহাভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই কথাগুলি উপন্যাসের শেষে গভীরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অষ্টম গর্ভ এর অপেক্ষায় মানবজগৎ মনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু কোনও অষ্টম গর্ভই চেষ্টা বা প্রয়াস ছাড়া মুক্তির পথ বাতলে দিতে পারে না। মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় কঠোর পরিশ্রম, সংঘর্ষ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই যারা অন্ধকার ছাদে যাওয়ার জন্য ভীতুর মতো সাহায্য খুঁজেছিল, তারাই কাউকে না বলে উন্মুক্ত ছাদে একে অপরের সাহায্যে শান্তিতে ঘুমিয়ে যায়। এটি যেন চরিত্র শক্তিকে খুঁজে পাওয়ার স্বাধীনতা। শিশুদের প্রিয় পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে আসা পাকুমার পরশমণির খোঁজ পায় বুনবুন তার মনের গভীর সমুদ্রে। বাণী বসু এই প্রসঙ্গে চমৎকার লিখেছেন:

কারণ সে, সম্মিলিতভাবে তারা নিজেরাই তো সেই অবতারপুরুষ যাঁর জন্য সারদাবাবুদের, দুর্গাপ্রসাদদের আরও কত কোটি কোটি মানুষ, দুর্গত মানুষ, অন্যায় অবিচারে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের প্রার্থনা। এত কথা সে বোঝাবার মতো করে ভাবতেও তো পারছে না। খালি অস্পষ্টভাবে বুঝছে।^{১০৩}

বাহ্যিক কোনও শক্তি প্রয়োগ করে কারোর মনের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে রুদ্ধ করা যায় না। মানসিক সক্ষমতা এবং কোনও কিছু করার ইচ্ছা মানুষকে সাফল্যের পথে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায়। এই উপন্যাসে তিনটি শিশুর মধ্যেই সেই বিষয়টি আমরা পেয়েছি। যারা অলৌকিক বা অতিমানবীয় কোনও কিছুর আশায় বসে থাকে নি। বরং নিজেদের মনের জোরকে পাথেয় করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ফলে এর মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণকে লাভ করা গেছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যেই কৃষ্ণ লুকিয়ে আছে। শুধু নিজেদের পরিশ্রমের বলে তাকে খুঁজে পেতে হয়।

তবে বাণী বসু অষ্টম গর্ভ ছাড়াও মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি চরিত্রকে নিয়ে ছয়টি পৃথক বই লিখেছেন। বাঙালির মহাভারত চর্চার পরিসরে এই বইগুলির পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলিকে একটি সিরিজ হিসাবেও ধরা যায়। এদের মধ্যে সিরিজের প্রথম পর্ব *কালিন্দী* (২০১৬), তারপর যথাক্রমে *কৃষ্ণ*, *ক্ষত্র*, *ক্ষত্রবধূ*, *সুযোদন* *দুর্যোধন* এবং *পাণ্ডালকন্যা* *পাণ্ডালী*। এই প্রত্যেকটি রচনাই আকারে অত্যন্ত ছোট। *কালিন্দী* উপন্যাসটি যেমন লেখা হয়েছে রাজমাতা সত্যবতীকে কেন্দ্র করে। সামান্য একজন ধীবর রাজার কন্যা কালিন্দী, পরবর্তীতে ভারত রাজনীতির অন্যতম প্রধান রাজবংশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসবে যে, সেই ব্যক্তি কীভাবে একজন জেলের কন্যা থেকে রাজ সম্রাজ্ঞী ও রাজমাতা হয়ে উঠল এবং শান্তনুর অনুপস্থিতিতে কীভাবে বৃহৎ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল সত্যবতী- তারই কথা বলে এই উপন্যাস। যেহেতু ভীষ্ম নিজে অবিবাহিত থেকে আজীবন কুমার থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিল পিতার কাছে তাই মূলত তারই তত্ত্বাবধানে সত্যবতী সামান্য নারী থেকে দক্ষ রাজমাতা হয়ে উঠতে পেরেছে। যদিও সত্যবতীর নিজের ইচ্ছা ও প্রয়াসকে একেবারেই তুচ্ছ করা যায় না। বাণী বসুর উপন্যাসে উঠে এসেছে অশিক্ষিত ধীবর কন্যাকে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে যাবতীয় বিষয় শেখানো হয়েছে এবং সত্যবতীও প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে বাধ্য ছাত্রীর মতো বিষয়গুলি আয়ত্ত করেছে। বাণী বসু'র কলমে উঠে এসেছে:

অক্ষর আয়ত্ত করছে, শিক্ষা করছে রাজপুরীর সমস্ত নিয়মকানুন আচার-বিচার, সভ্যতা-ভব্যতা। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাগুরুও আছে। কেউ পুরুষ, কেউ নারী। কিন্তু দেবব্রতকে তত্ত্বাবধান করতেই হয়। রাজার আদেশ। তিনি এই বন্য কুসুমকেই ফুলদানে বসাচ্ছেন। নাগিনীর বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে বিষটুকু পাত্রবদ্ধ করতে চাইছেন রাজবাড়ির শত্রুদের জন্য। শত্রু কি শুধু বাইরে? রাজবাড়ীর সর্বত্র, সভায়, অন্তরমহলে, রন্ধনশালায় সর্বত্র শত্রু। রাজমহিষীকে তাদের চিনতে হবে। কূটবুদ্ধিতে তাদের বশ করতে হবে। প্রয়োজন হলে গরল প্রয়োগ।...^{১০৪}

ধীরে ধীরে সত্যবতী শিখতে পেরেছে রাজবাড়ির যাবতীয় আদবকায়দা। দাস দাসীদের প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় হুকুম দিয়েছে এবং নিজের চলাফেরার ভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। সত্যবতী বুঝতে পেরেছে সে অন্য পাঁচজন নারীর মতো নয়, তাকে সামলাতে হবে এই রাজপরিবার। ফলে

প্রসাধনে প্রসাধনে আরও চোখ ধাঁধানো সুন্দরী হয়ে উঠেছে সে। আচার্যরা সত্যবতীর বুদ্ধির তারিফ করেছে এবং বলেছে যে তাকে কোনও শাস্ত্রের জ্ঞানই অধিক সময় ধরে দিতে হয় না। দ্রুত আয়ত্ত করে নেওয়ার ক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে। শুধু তাই নয়, রান্নাঘরের অনেক বিষয়েই কড়া নজর রয়েছে সত্যবতীর। যেমন দই, মাংস, ছানা ও মশলাপাতি কত ও কী পরিমাণে আছে সেই সম্পর্কিত বিষয়। আবার হিসাবের গরমিল না দেখেও ধরে ফেলার ক্ষমতা জন্মেছে তার। ফলে রাজপরিবারে কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের প্রশ্নে সত্যবতী যথার্থ অর্থেই রাজমাতা হয়ে উঠতে পেরেছে পরবর্তীকালে। উপন্যাসে এই অংশগুলি আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এই চরিত্রের গুণাবলী তাকে যথার্থ অর্থেই রাজমাতা করে তুলতে পেরেছে। সত্যবতীর জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে রাজা শান্তনু তাকে বিবাহ করে। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি তার। স্বামী মারা যাওয়ার পর চিত্রা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য অল্প কিছু বছর থাকার পর গত হয়। ফলে একজন মা হিসাবে ভেঙে পড়াও স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু তারপরেই সিংহাসনের কথা ভেবে দ্রুত শক্ত হয়েছে সত্যবতী। মহাভারতের সত্যবতী এমন একজন নারী যে স্বামী ও পুত্রদের মৃত্যুর পরেও ভীষ্মের সহায়তায় সাম্রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময় সিংহাসনের পেছনে থেকেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। চরিত্রের বিশেষ এই ধরন তাকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে।

বাণী বসু এই সকল বিষয়গুলি ছাড়াও তাঁর কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন সত্যবতী ও ভীষ্মের মধ্যকার প্রেমের সম্পর্ক। যদিও উভয়ের বয়স মহাভারত অনুসারে প্রায় কাছাকাছিই। বাণী বসুর কল্পনায় তা পরিণত রূপ পেয়েছে কিছুটা। এছাড়াও উপন্যাসে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে কালিন্দীর মা ও বাবার মনের সুপ্ত বাসনা। তারা তাদের কন্যার মাধ্যমে বিশুদ্ধ আর্য বংশের মধ্যে ধীবরদের রক্ত ঢোকাতে চায়। ক্ষত্রিয় রাজবংশের দর্প চূর্ণ করতে ইচ্ছুক তারা।

এই সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস কৃষ্ণ (২০১৬)। তবে উপন্যাসের নাম শুনে মনে হতে পারে এই কৃষ্ণ বোধহয় মহাভারতের কৃষ্ণ বাসুদেব তথা পাণ্ডবদের সখা। কিন্তু তা নয়, এই কৃষ্ণ হল মহর্ষি ব্যাসদেব। ব্যাসদেবের জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা, পিতা পরাশরের সঙ্গে তার সম্পর্কের রসায়ন, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের থেকে ব্যাসদেবের শ্রেষ্ঠত্ব বাল্যকাল থেকেই প্রকাশিত—মূলত এসব নিয়েই এই উপন্যাসটি লিখেছেন বাণী বসু। এসব ছাড়াও মাতা সত্যবতীর ডাকে ধর্ম পালনে এড়িয়ে যায় নি ব্যাসদেব। হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের মধ্যে সন্তান জন্মদানে সাহায্য করেছে সে। ঋষি হয়েও একজন পূর্ণ গৃহস্থের মতো ধর্ম পালন করে গেছে ব্যাসদেব। মহাভারতে ব্যাসদেবের বাল্যকাল আমরা সেভাবে পাই না, অন্তত মহাভারতের মূল ঘটনার মধ্যে ব্যাসদেব কম এসেছে, কিন্তু বাণী বসুর এই উপন্যাসে বালক ব্যাসদেবের বেড়ে ওঠার ঘটনা

চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকী উঠে এসেছে ব্যাসদেবের সঙ্গে দশ বছরের ছোট একটি মেয়ের মিষ্টি ভালোবাসার সম্পর্কও। উপন্যাসের এক জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে:

এইভাবেই কাটে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের দিন-রাত। সারাটা দিন শতাধিক সংকলক ও লেখক নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত, সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিভাগ। কোনগুলি ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত হবে, কোনগুলি বা সাম, শুধু গীত হয়, কোনগুলি...। যজ্ঞের সময়ে কীভাবে কীসের পরে কী... করণীয়, সেইসব পদ্ধতিও তো লিপিবদ্ধ করতে হবে। কাজটা দৈহিক পরিশ্রমের দিক থেকেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সম্পাদনার কাজ লেখার আগেই সেরে ফেলতে হয়। অনেক ভ্রমণও করতে হয়, তীর্থে-তীর্থে, আশ্রমে-আশ্রমে, আবার যজ্ঞস্থলে, রাজসভায় যেখানে কোনও মহামান্য সূত তাঁর গল্পগুলি বলছেন।^{১০৫}

এই সিরিজের তৃতীয় উপন্যাসটি *ক্ষত্ৰা* (২০১৭)। যা মূলত বিদুরকে নিয়েই লিখিত। মহাভারতের এই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি অনেক কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে ধূতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে সাহায্য করেছে। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যথার্থ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদুরের গুরুত্বকে অস্বীকার করা একেবারেই যায় না। কিন্তু শুধুমাত্র একজন শূদ্রার গর্ভে জন্ম নেওয়ার জন্যই রাজা হতে পারে নি সে। মহাভারতের এই দিকটি সবাই কমবেশি ভেবেছেন। বাণী বসুও তাই বিদুরকে নিয়ে রচনা করলেন *ক্ষত্ৰা* উপন্যাস। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর ব্যাসদেবের ঔরসে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধূতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্ম নেয়। অন্যদিকে একজন দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম। বাল্যকাল থেকেই এই তিনজন সত্যবতী ও ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকে। উপন্যাসের প্রথম থেকেই দেখানো হয়েছে যে একজন রাজা হওয়ার জন্য সমস্ত গুণাবলীই বিদুরের বাল্যকাল থেকেই ছিল। ধৈর্যবান, স্থির, বুদ্ধিমান, যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াতে পারদর্শী ইত্যাদি বিষয়গুলি বিদুরের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই কীভাবে দেখা গেছে সেগুলি এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। এই উপন্যাসে এই তিন ভাইকে বোঝানোর জন্য লেখিকা তিনটি পৃথক নাম ব্যবহার করেছেন। যথা- ধূতরাষ্ট্র, ধূতসত্ত্ব এবং ধূতবীর্য। উপন্যাসে এই বিষয়ে উঠে এসেছে:

তার পাঠ্য তালিকায় নতুন নতুন বিষয় যোগ হতে থাকে। দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ, ভাষা, নানা রকমের ভাষা তার মধ্যে সাংকেতিক ভাষাও আছে, আছে অঙ্ক শাস্ত্র, তার ভালো লাগে এগুলো। নিজের অজান্তে সে ক্রমশ এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাই বলে তির-ধনুকের খেলায় তার অনাগ্রহ নেই। সে এ খেলায় সত্ত্বর সঙ্গে স্পর্ধা করতে পারে। সে যেগুলি পড়ে অন্য কুমাররাও সেগুলি পড়ে, কিন্তু তার মতো গভীরে যায় না। ভুল ভাবছেন, ভীষ্ম শাস্ত্র স্বরে বলেন, রাজ্য চালাতে হলে দৈহিক শক্তি আর অস্ত্রবিদ্যাই একমাত্র নয়, দর্শন, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা এসব কম লাগে না, এগুলিও শক্তি বৃদ্ধি করে।^{১০৬}

ক্রমে বীর্য সর্বশাস্ত্রে এত পারঙ্গম হয়ে উঠল যে শিক্ষকরা এক বাক্যে তাকে বিদুর, পণ্ডিত বলে ডাকতে লাগলেন। তার নাম হয়ে গেল বিদুর। তাকে অবিলম্বে নৈমিষারণ্যে উচ্চতর শিক্ষা নিতে পাঠান ভীষ্ম।^{১০৭}

এই সিরিজের চতুর্থ উপন্যাস ক্ষত্রবধূ (২০১৭)। হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের তিনজন নারীদের নিয়ে এই উপন্যাসের আখ্যান এগিয়েছে। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী। এই তিনজন রমণীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের আখ্যান এই উপন্যাস। সংসারের যাবতীয় ধর্মই তারা জানত, কিন্তু রাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন তারা ছিল না। এই তিনজন নারীর জীবনে রাজনীতি ঢুকে কীভাবে তাদের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিল সে বিষয়ে বাণী বসু এখানে ভেবেছেন। ঠিক একইভাবে বাণী বসু মহাভারতের দুর্যোধনকে নিয়ে সুযোধন-দুর্যোধন (২০১৮) এবং দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদীকে নিয়ে কৃষ্ণা (২০১৮) উপন্যাসগুলি লিখেছেন। একুশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে যে সমস্ত কথাসাহিত্যিক মহাভারতের পুনর্নির্মাণ নিয়ে ভেবেছেন, তাদের মধ্যে বাণী বসু অবশ্যই অন্যতম। তাঁর মহাভারত সিরিজের এই ছয়টি উপন্যাস পাঠকদের কাছে অতি পরিচিত এবং অষ্টম গর্ভ তো অবশ্যই খুবই জনপ্রিয়।

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

- ১। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, *পাঞ্চজন্য*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৪২৫ব, পৃষ্ঠা- ১৩
- ২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪
- ৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮
- ৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮, ৪৯
- ৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০
- ৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০, ৫১
- ৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭
- ৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'ভূমিকা', *মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৫ব, পৃষ্ঠা-২
- ৯। আচার্য, দেবীদাস, 'ঈশ্বরের রাজনীতি: পটভূমি মহাভারত', *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা-১, ২
- ১০। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, *পাঞ্চজন্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৬
- ১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৫, ৩০৬
- ১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪৩
- ১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪৩, ৩৪৪
- ১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৬২
- ১৫। কর, বিমল, *উড়োখই* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৩৫, ১৩৬
- ১৬। কর, বিমল, *একত্র: যদুবংশ ও দংশন*, কলকাতা: বিকাশগ্রন্থ ভবন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭
- ১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯
- ১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯
- ১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯
- ২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৬
- ২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫
- ২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮, ৬৯
- ২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫১

- ২৪। সুর, সুমনা দাস, *বিমল করের কথাসাহিত্য*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪১৫ব, পৃষ্ঠা- ৩৮০
- ২৫। কর, বিমল, *এই বেদনায়, বিষাদে*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৮৯
- ২৬। সুর, সুমনা দাস, *বিমল করের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮০
- ২৭। কর, বিমল, *উড়েখই* (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫
- ২৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫
- ২৯। কর, বিমল, *শমীক*, কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৩ব, পৃষ্ঠা- ১৩০
- ৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৪
- ৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৮
- ৩২। কর, বিমল, *অসময়*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, একাদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৩ব, পৃষ্ঠা- ৪৩
- ৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩
- ৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩
- ৩৫। চৌধুরী, রাজীব, 'কালকূট: শিল্পের অন্তরঙ্গ জীবন', সমরেশ বসু: মানুষের কথাকার, *এবং জলার্ক*, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১০৬
- ৩৬। কালকূট, 'ভূমিকা অংশ', *শাস্ত্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৫ব
- ৩৭। চৌধুরী, রাজীব, 'কালকূট: শিল্পের অন্তরঙ্গ জীবন', সমরেশ বসু: মানুষের কথাকার, *এবং জলার্ক*, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১০৭, ১০৮
- ৩৮। চৌধুরী, রাজীব, 'কালকূট: শিল্পের অন্তরঙ্গ জীবন', সমরেশ বসু: মানুষের কথাকার, *এবং জলার্ক*, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১০৭, ১০৮
- ৩৯। *শাস্ত্র* উপন্যাসের ভূমিকা অংশ থেকে আমরা লেখাটি নিয়েছি।
- ৪০। কালকূট, *শাস্ত্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২,৩
- ৪১। গুপ্ত, স্বাগতা, *বিমল কর ও কালকূটের উপন্যাসে মহাভারতের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বড়দিন ২০১২, পৃষ্ঠা- ৬২
- ৪২। কালকূট, *শাস্ত্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫
- ৪৩। কালকূট, *শাস্ত্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯
- ৪৪। কালকূট, *শাস্ত্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২, ৩৩
- ৪৫। কালকূট, *শাস্ত্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮

- ৪৬। কালকূট, শাস্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮
- ৪৭। কালকূট, শাস্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১
- ৪৮। কালকূট, শাস্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৫
- ৪৯। কালকূট, শাস্ত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৫
- ৫০। রায়চৌধুরী, ঝুমা, *কথাসাহিত্যে সমরেশ: সামগ্রিক মূল্যায়ন* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পূর্বাশা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩ব, পৃষ্ঠা- ১৭১, ১৭২
- ৫১। গুপ্ত, স্বাগতা, *বিমল কর ও কালকূটের উপন্যাসে মহাভারতের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১, ৭২
- ৫২। কালকূট, *কালকূট রচনা সমগ্র* (নবম খণ্ড), কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৬ব, পৃষ্ঠা- ২৩৭
- ৫৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৭
- ৫৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৭
- ৫৫। কালকূট, *পৃথ*, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৯৪ব, পৃষ্ঠা- ১১
- ৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২
- ৫৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩, ২৪
- ৫৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮
- ৫৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৮
- ৬০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৫, ১০৬
- ৬১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১০
- ৬২। কালকূট, *কালকূট রচনা সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯৩ব, পৃষ্ঠা- ৪১১, ৪১২
- ৬৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪৮
- ৬৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৩
- ৬৫। বসু, রাজশেখর(অনুবাদক), *কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত*, কলকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, একাদশ মুদ্রণ, ১৪১০ব, পৃষ্ঠা- ৫৪৪
- ৬৬। চন্দ্র, দীপক, 'দৃষ্টিকোণ', *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃষ্ঠা- ১০
- ৬৭। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিবাহ অনেক সময় কূটনৈতিক উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পড়ে যেত। শক্তিশালী ও বৃহৎ রাজপরিবার থেকে যদি ক্ষুদ্র রাজা ও রাজপরিবারে বিবাহের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ গেলে ক্ষুদ্র রাজপরিবারের পক্ষে প্রায় কিছুই করার থাকত না। সে ক্ষেত্রে রাজকন্যার সম্মতি

- বা অসম্মতির কোনও প্রশ্নই উঠত না। কারণ বিবাহ না হলে যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা থেকেই যেত। এক্ষেত্রেও এই বিবাহে গান্ধারীর সম্মতির বিষয়টি মহাভারতে খুব একটা পরিষ্কার নয়।
- ৬৮। চন্দ্র, দীপক, 'দৃষ্টিকোণ', গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৫
- ৬৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১
- ৭০। চন্দ্র, দীপক, মাদ্রীর কণ্ঠস্বর, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১৯
- ৭১। চন্দ্র, দীপক, গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৬
- ৭২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৪
- ৭৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৭
- ৭৪। Ghosh, N N, *Early History of India*, Allahabad: The indian press Ltd., First ed. 1939, p. 37
- ৭৫। Majumdar, R C, 'Ideas of History in Sanskrit Literature', *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London: OUP, 1961, P. 13-26
- ৭৬। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন দীপক চন্দ্র মহাশয়ের *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম* গ্রন্থের শুরুতে বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। প্রবন্ধটির নাম- প্রসঙ্গ: পৌরাণিক উপন্যাস ও তার মূল্যায়ন। চন্দ্র, দীপক, *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩
- ৭৭। চন্দ্র, দীপক, 'দৃষ্টিকোণ', *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃষ্ঠা- ১০
- ৭৮। চন্দ্র, দীপক, মাদ্রীর কণ্ঠস্বর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫
- ৭৯। চন্দ্র, দীপক, মাদ্রীর কণ্ঠস্বর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫
- ৮০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কুন্তী', *মহাভারতের অষ্টাদশী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৮০
- ৮১। চন্দ্র, দীপক, মাদ্রীর কণ্ঠস্বর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯
- ৮২। চন্দ্র, দীপক, মাদ্রীর কণ্ঠস্বর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৬
- ৮৩। চন্দ্র, দীপক, *অগ্নিগর্ভ খাণ্ডব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩ (ভূমিকা অংশ আমাদের প্রয়োজনে লেগেছে)
- ৮৪। চন্দ্র, দীপক, *উর্বশী জননী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৮ (ভূমিকা অংশটি আমাদের প্রয়োজনে লেগেছে)
- ৮৫। চন্দ্র, দীপক, *কৃষ্ণভগবান*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ (ভূমিকা অংশটি আমাদের প্রয়োজনে লেগেছে)

৮৬। বসু, বাণী, *অষ্টম গর্ভ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩

৮৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮

৮৮। *অষ্টম গর্ভ* উপন্যাসের ভূমিকা অংশ থেকে উপরের অংশটি নেওয়া হয়েছে।

৮৯। বসু, বাণী, *অষ্টম গর্ভ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯

৯০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০

৯১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫

৯২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫

৯৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪

৯৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮

৯৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫

৯৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫

৯৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬২

৯৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬২

৯৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৭

১০০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৭

১০১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৭

১০২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৩

১০৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৬

১০৪। বসু, বাণী, *কালিন্দী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৬১

১০৫। বসু, বাণী, *কৃষ্ণ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৫৭,৫৮

১০৬। বসু, বাণী, *ক্ষণ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৫৩,৫৫

১০৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা ছোটগল্পে মহাভারত কথা

সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো ছোটগল্পও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরূপ। ছোটগল্প অল্প পরিসরে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আজও। শুধু তাই নয়, মনের ভাব উপস্থাপনের পাশাপাশি সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংকট সমানভাবে উঠে এসেছে এতে। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো আধুনিক ছোটগল্পের বিকাশের ধারা অনেক পুরনো নয়। তবে জাতক, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, ঈশপ, দশকুমার চরিত, শুকসপ্ততি'র মতো প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে বর্তমান ছোটগল্পের অনেক উপকরণই ছিল। পরবর্তী সময়ে মূলত যাযাবর পর্যটক ও আরবের বণিকদের হাত ধরে ভারতে পৌঁছে যায় আরব ও পারস্যের রোমাঞ্চকর আখ্যানগুলি, এগুলি আমাদের দেশে এসে আমাদের প্রকৃতি এবং জলবায়ুর সঙ্গে অনেকাংশে মিশে গেছে। পরবর্তী সময়ে বাঙালি যখন ইউরোপের দিকে চোখ মেলে তাকায় তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গ্রিক ও রোমান গল্পের। তারপরে বাঙালি পরিচিত হল বোঙ্কাচো, চসার ও রাবল্যা'র সঙ্গে। একেবারে জীবনমুখী গদ্যে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে জীবনের ছবি আঁকলেন বোঙ্কাচো তাঁর *দেকামেরন* বইতে। দৈব, চাতুর্য, ব্যর্থ প্রেম ও সফল প্রেম, উপস্থিত বুদ্ধি, নির্বোধ স্বামীকে চতুরা স্ত্রীর ছলনা, নরনারীর পারস্পরিক শাঠ্য এবং অন্যান্য নানান রম্যকথা *দেকামেরন*-তে আছে।^১ চেকভ ও মোপাসাঁর গল্পও পরবর্তী সময়ে খুবই খ্যাতিলাভ করেছে।

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে হলেও তাঁর পূর্ববর্তী অনেক লেখকেরই রচনার মধ্যে ছোটগল্পের গুণ লুকিয়ে ছিল। এমনকী ছোটগল্প লেখার চেষ্টাও করেছেন অনেকে। এঁদের মধ্যে অবশ্যই স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার মধ্যেই মহাভারত নানাভাবে উঠে এসেছে, কিন্তু তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিতে মহাভারতকে সেভাবে আমরা দেখি না। বরং তাঁর রচিত কাব্য নাটক ও নৃত্য নাটক এবং প্রবন্ধ সাহিত্যে মহাভারতের ভাবসত্য, চরিত্র ও ঘটনা গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের আত্মা আছে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে। তাই ভাবনার এই জায়গা থেকে মহাভারতের অনেক চরিত্র ও ঘটনা সমকালীন যুগের চাহিদা মেনে বর্তমানে মতো করে নিজেদের মতো রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন একালের গল্পকাররা। পাশাপাশি এই যুগের সংকট ও দ্বন্দ্ব গভীরভাবে উপস্থাপনের জন্য মহাভারতকে হাতিয়ার করেছেন অনেক গল্পকারই। ফলে ছোটগল্প বাঙালির মহাভারত চর্চার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আমরা জানি যে মহাভারত অনেক প্রাচীন হওয়ার জন্য এর নানান জনপ্রিয় কাহিনি বা আখ্যান আমাদের লোক সমাজে বা সমাজ জীবনে এমনিতেই ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। মহাভারতের অনেক আখ্যানই টুকরো টুকরোভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই কারণে অনেক প্রাচীন নীতিকথা মূলক গল্প, জাতকের গল্প এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী বা

উপদেশের মধ্যে মহাভারতকে আমরা খুঁজে পাই। বর্তমানে আমাদের আলোচিত একাধিক ছোটগল্পকারদের গল্পগুলি আমাদের মহাভারত চর্চার জগতে অন্যতম স্থান করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মহাভারতমূলক ছোটগল্পের সম্পূর্ণ একটি তালিকা বানানো একপ্রকার অসম্ভব বিষয়ই বটে। মহাভারত কেন্দ্রিক প্রচুর গল্প আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তারই মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু গল্পকে আমরা নির্বাচন করেছি। আমাদের আলোচিত গল্পকারদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকারেরাই আছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০১), পূর্ণেন্দু পত্নী (১৯৩১-১৯৯৭), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯), দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯), বাণী বসু (১৯৩৯-বর্তমান), সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) এবং সৌরভ মুখোপাধ্যায় (১৯৭৩-বর্তমান) প্রমুখ গল্পকারেরা। এঁরা ছাড়াও বিক্ষিপ্ত পরিসরে আরও বেশ কিছু জনের কথাও আমরা তুলেছি। এই সকল গল্পকারদের হাত ধরে আমাদের পরিচিত মহাভারতের অন্য পাঠ আমরা পেয়েছি। আবার ব্যাসদেবের মহাভারতের নবনির্মাণ ও বিনির্মাণও সম্ভব হয়েছে এই সকল প্রথিতযশা গল্পকারদের হাত ধরেই। এভাবেই এঁদের হাত ধরে মহাভারতের চরিত্রাণ্ড হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে মানুষ। বর্তমান যুগের ও মানুষের সংকট ও দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে গল্পকারেরা মহাভারতের চরিত্রদের কাছে সাহায্য নিয়েছেন।^২ ওপরের গল্পকারদের গল্পগুলি ধরে ধরে আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

২.২।। রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

মহাভারতকে নিয়ে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের আগ্রহ কম ছিল না। মহাভারতকে কেন্দ্র করে তিনি অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন। আমাদের আলোচনার অংশটি মূলত এক্ষেত্রে ছোটগল্প কেন্দ্রিক। তবে রাজশেখর বসু'র মহাভারত চর্চা নিয়ে কথা বলতে গেলে অবশ্যই তাঁর বাংলায় রচিত মহাভারত অনুবাদের কথাটা বলতেই হবে। সরল বাংলা ভাষায় বোধগম্য হয় এরূপ মহাভারতের সারানুবাদ করেছেন তিনি। মহাভারতের মূল গল্পটি সমস্ত ধরনের পাঠকের মতো করে লিখতে পেরেছেন রাজশেখর বসু, নীতি এবং ধর্ম কথায় ভরপুর শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্বকে তিনি বাদ দিয়েছেন সযত্নে। মহাভারতকে নিয়ে পরশুরাম দশটি গল্পও লিখেছেন। যেগুলির মধ্যে পাঁচটি গল্প মহাভারতের কাহিনিসূত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে এবং অন্য পাঁচটি গল্পে

মহাভারতের চরিত্র বা প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে এসেছে। মহাভারতের পরিবেশ, চরিত্র ও আদর্শ সমস্ত কিছুই ওপরেই পরশুরাম অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু মহাভারতকে তিনি একটি পৌরাণিক বা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হিসাবে পড়তে চান নি, বরং মহাভারতের অনেক ঘটনা ও চরিত্রের সমান্তরালে বা বিপরীতে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার উপাদান রাজশেখর বসু খুঁজে পান। তাইতো মহাভারতের অনেক ঘটনা ও চরিত্রকে আধুনিকতার আলোকে ফেলে একটি ভিন্ন পাঠ নির্মাণ করেন তিনি। অনেক সময় সেই নতুন নির্মাণ আমাদের কাছে হাস্যরসের সৃষ্টি করে থাকে। পরশুরাম তাঁর গল্পে পুরাণ সমালোচনা করেন নি, বরং মহাভারতকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক সভ্যতা ও মানব জীবনের সংকট ও দ্বন্দ্বকে দেখতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বা গল্পে এরকম গল্পকার অনেক থাকলেও পরশুরাম একেবারেই তাঁদের থেকে অনেকাংশে আলাদা। বলা বাহুল্য, আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে তাঁর মহাভারত অত্যন্ত গভীর থেকে পড়া ছিল, কারণ মহাভারতের প্রগাঢ় অধ্যয়ন না থাকলে মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রদের নিয়ে এমন নব রূপে নির্মাণ কার্যত অসম্ভবই।

প্রথমে আমাদের অতি পরিচিত একটি মহাভারতীয় আখ্যান দিয়ে শুরু করা যাক। ‘যযাতির জরা’ নামে একটি গল্প পরশুরাম মহাভারতের আদি পর্ব থেকে গ্রহণ করেছেন। গল্পটি ১৮৭৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে প্রকাশ পায় ‘বসুধারা’-তে। গল্পে দেখানো হয়েছে কামনা, বাসনা ও যৌন মিলনের ইচ্ছা মানুষের মধ্যেই থাকে। প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে হলে মানুষের এই সকল জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি ত্যাগ করা আবশ্যিক। বস্তুতপক্ষে এই সকল প্রবৃত্তিগুলি অতিক্রম করেই সাধনার চরম পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। মহাভারতের যযাতির যৌবনের সুখ ও ভোগের ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই পুত্রকে জরা প্রদান করে নিজে ভোগ করেছে পুত্রের যৌবন, কিন্তু আবার যৌবনের সুখ ও বাসনা এবং কামনার চাহিদা পূরণের পর পুনরায় পুত্রকে যৌবন প্রদান করে নিজে জরা গ্রহণ করে সন্ন্যাস নিয়েছে সে। যযাতির তারপর আর যৌবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় নি। কিন্তু এই গল্পে দেখানো হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। যযাতির মধ্যে কামনা ও বাসনা থাকা সত্ত্বেও পুত্রকে নিজের যৌবন ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যযাতি সন্ন্যাসী হতে চেয়েছে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা গেছে সুন্দরী যুবতীর প্রতি মোহ বাসনা যযাতির একেবারেই উঠে যায় নি, বরং বিবাহের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে সে। এমনকী যযাতির পুত্র পুরু নিজে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরী নারীর প্রতি মোহ ও ভোগের বাসনা দূর করতে পারে নি। নারীর সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের চিরন্তন দুর্বলতা বোঝানোর জন্যই এই গল্পটি লেখা হয়েছে। একদল বৃদ্ধের যৌবনের লালসার ছবিও এই গল্পের বিষয়। যৌবন লাভের পর যযাতি পঞ্চাশটি বিবাহ করেছিল, পুত্র পুরুও সুন্দরী মনোহরাকে দেখে নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি। ফলে এতদিনের তপস্যার যাবতীয় ফল বিসর্জন দিয়ে সুন্দরী মনোহরাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছে। অথচ গল্পের শুরুতে

সম্পূর্ণ অন্য পুরুকে আমরা পেয়েছিলাম, যে তার এতদিনের তপস্যার ফল সহ বৃদ্ধ জীবনই কাটাতে চেয়েছে। পরশুরাম এই প্রসঙ্গে চমৎকার লিখেছেন:

অশোকতরুতলে কিছুক্ষণ আলাপের পর পুরু সকলের সমক্ষে এসে বললেন, পরমারাধ্য পিতৃদেব, ত্রিলোকপূজ্য দেবর্ষি, দেববৈদ্য অশ্বিনীদ্বয়, এবং সমবেত ভদ্রগণ, অবধান করুন। আজ সহসা আমার উপলব্ধি হয়েছে, পিতার আজ্ঞা পালন না করে আমি অপরাধী হয়েছি। এখন উনি আমাকে ক্ষমা করুন, ওঁর যৌবনের পরিবর্তে আমার জরা গ্রহণ করুন। এই রাজকুমারী মনোহরা আমাকেই পতিত্বে বরণ করবেন।^৭

শেষে যযাতি তাই বিরক্ত হয়ে পুরুকে বলেছে:

যযাতি মৃদুস্বরে আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ছি ছি ছি, এই যদি করবি তবে সেদিন অমন তেজ দেখিয়ে আমার কথায় ‘না’ বললি কেন? এত লোকের সামনে ধাষ্ট্যমো করবার কি দরকার ছিল?^৮

মহাভারতে যযাতি এবং পুরুর মধ্যে পারস্পরিক বয়স প্রদানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংকট দেখা যায় নি, কিন্তু পরশুরামের গল্পে পরশুরাম যযাতির যৌবন প্রদানের বিষয়ে বেশ কিছু সংকট তুলে ধরেছেন যা গল্প পাঠকদের কাছে যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করে। যযাতির যৌবন দানের বিষয়টি জানাজানি হতেই রাজার পত্নীরা বাধাদানের চেষ্টা করতে থাকে। তারা বলে এই ভরা যৌবনের বয়সে রাজা বৃদ্ধ পরিণত হলে পত্নীদের যৌবন তো বৃথা যাবে। সেক্ষেত্রে পত্নীরা সমস্যায় পড়বে। আবার অন্য কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে বয়স বিনিময় করলে বৃদ্ধ ব্যক্তি তরুণ হয়ে নতুন স্ত্রী বাড়িতে আনবে, ফলে পুরনো স্ত্রী একরাশ সমস্যায় পড়বে। বলা বাহুল্য, মহাভারতে যযাতির বয়স বিনিময়ের ক্ষেত্রে এরকম সমস্যার মুখোমুখি হতেই হয় নি। পরশুরাম হাস্যরসের উদ্রেক করে তাঁর পাঠকদের জন্য লিখেছেন:

রাজপত্নীদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠা সেই করঞ্জাক্ষী বললেন মহারাজ, এই যদি আপনার অভিপ্রায় ছিল তবে আমাদের পাণিগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনি বহু পত্নীর স্বামী, নিজের যৌবন ভোগ করার পর আবার পুত্রের যৌবন ভোগ করেছেন। আপনার যৌবনে অরুচি হতে পারে, কিন্তু আমাদের তো হয় নি। আমাদের অনাথা করে যদি জরা গ্রহণ করেন তবে আপনার মহাপাপ হবে।^৯

... ... ইনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কুরুরাজ যযাতি, শাস্ত্রে আছে— যৌবন ধন-সম্পত্তি প্রভুত্ব আর অবিবেকিতা, এর প্রত্যেকটি অনর্থকর, দুর্দৈবক্রমে আপনাতে চারিটিই একত্র হয়েছে। এক যৌবনেই রক্ষা নেই, আপনি দুই যৌবন ভোগ করেছেন, সুতরাং যৌবনাক্রান্ত খেড়ে-

রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কি প্রকার জীব তা ভালই জানেন। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আপনি বয়স বিনিময় করবেন সে নিশ্চয় যুবতী ভাৰ্যা ঘরে আনবে। তখন তার বৃদ্ধা পত্নীর কি দশা হবে ভেবে দেখেছেন কি?*

‘তৃতীয় দ্যুতসভা’ পরশুরামের রচিত মহাভারত কেন্দ্রিক একটি চমৎকার গল্প। মহাভারত কেন্দ্রিক এটি তাঁর প্রথম গল্প। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী পত্রিকায় এইটি প্রকাশিত হয়। মহাভারতের সভা পর্বে আমরা কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে দু’টি পাশা খেলার কথা জেনেছি। সেই সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা এবং শকুনির প্রবঞ্চনা মহাভারতের সকল পাঠক মাত্রই জানে। কিন্তু পরশুরাম এই গল্পে মহাভারতের তৃতীয় পাশা খেলার একটি প্রসঙ্গ এনেছেন, যেটা একান্তভাবেই পরশুরামের নিজস্ব নির্মাণ। পরশুরামের এই ভাবনার পেছনে অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই গল্পে আমরা উল্লেখ পাই- ‘বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতারণার যেসব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তার তুলনায় শকুনি-যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ছেলেখেলা মাত্র’। এই উক্তি মাধ্যমেই একটি বিষয় আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের প্রতারণাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই পরশুরাম এই কাল্পনিক মহাভারতের গল্প নির্মাণ করেছেন। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ছিল কপটতাই একমাত্র আশ্রয়, সেখানে যুদ্ধ কখনোই বন্ধ হয় না। এরকম যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে সমস্ত যুগেই চলতে থাকে। পরশুরামের এই গল্পে চরিত্ররা সবাই মহাভারতের, কিন্তু কাহিনিটি একেবারেই পরশুরামের নিজস্ব নির্মাণ। মনুসংহিতা থেকে যুধিষ্ঠিরের জ্ঞান উপস্থাপন করা, দ্রৌপদীর পতিনিন্দা, বিকর্ণের ভালোত্বের দিক যেমন- দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তার প্রতিবাদ, সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রশ্লেহ, কৃষ্ণের বড় ভাই বলরামের মাদকের প্রতি আসক্তি থেকে শুরু করে ভীমের গদা আশ্ফালন পর্যন্ত সমস্ত কিছুই পরশুরাম মহাভারত থেকে নিয়েছেন। এই সকল বিষয়গুলি মহাভারত থেকে নিয়ে পরশুরাম সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একপ্রকার ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ বা বিদ্রোপ করেছেন।

গল্পের শুরুতে আমরা পাই মহাভারত থেকে পরশুরামের উল্লেখ করা একাধিক তথ্য যথা- পাশা খেলার ছক ঘুঁটি কেমন ছিল এবং পাশা খেলার পদ্ধতি কী ছিল, সেগুলি শ্লোক সহকারে তিনি উল্লেখ করেছেন। অনুবাদের সময়ও এই শ্লোক উদ্ধারের প্রয়োজন অনুভব করেন নি তিনি। গল্পে পরশুরাম কাল্পনিক বিপরীত প্রতারণার গল্প নির্মাণ করলেন। এই আখ্যান মহাভারতে না থাকলেও মহাভারতে এটির সম্ভাবনার বীজ ছিল। পরশুরাম সম্ভবত এই ‘মিসিং লিঙ্ক’ বা হারিয়ে যাওয়া অংশটি খুঁজে পেতে চেয়েছেন। মহাভারতের বন পর্বে রাজা নলের কথা বলা হয়েছে। রাজা থেকে সর্বস্ব হারিয়ে কীভাবে নলের করুণ অবস্থার পরিণতি হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। বস্তুতপক্ষে মহাভারতের এই পর্বে যুধিষ্ঠির অনেক কিছুই শিখেছেন অরণ্যের মহামানব, ঋষি ও মুনিদের থেকে। এই জ্ঞান পরবর্তীকালে জীবন যুদ্ধে বা সাম্রাজ্য চালানোর কাজে নানাভাবে

যুধিষ্ঠিরের সহায়ক হয়েছে। ‘ভীমের অধৈর্য- মহর্ষি বৃহদশ্ব’ নামের অধ্যায়ে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেছে যে, অজ্ঞাতবাস সফলভাবে অতিক্রম করলেও তারপরে দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানাবে এবং যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় দক্ষতা না থাকার কারণে সে অবশ্যই পরাজিত হবে। পরশুরাম সম্ভবত এই ‘হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্রটিকেই’ গল্পে কাজে লাগিয়েছেন। সেই কারণে পূর্বোক্ত সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে ‘তৃতীয় দ্যুতসভা’ নামক গল্পে। শকুনি পাশা খেলায় ছল ও কপট পন্থার অবলম্বন করত, মহাভারতের জুড়েই এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের রচয়িতা সেই প্রতারণার কৌশল আমাদের সামনে উপস্থাপন করে নি। কী কারণের জন্য সেই কৌশল মহাভারতের পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হয় নি, সেই কাল্পনিক সমস্যার উত্তর দেবার জন্যই যেন পরশুরাম নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন।

এই গল্পে তাই শকুনির আত্মীয় মৎকুনির আবির্ভাব ঘটেছে। যে যুধিষ্ঠিরকে বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করেছে কীভাবে শকুনি পূর্বের খেলা পাশার যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। মৎকুনি আরও জানায় যে শকুনিকে এই বিদ্যা সেই শিখিয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল খেলায় জয়ী হওয়ার পর রাজত্ব মৎকুনি পাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেইটি না হওয়ার কারণে এবং উল্টে মৎকুনিকে দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী রাখার জন্যই এখন পাশা খেলার সেই বিদ্যা সে যুধিষ্ঠিরকে শেখাতে চায়। যাতে মৎকুনির শেখানো বিদ্যার ফলে শকুনি পরাজিত হয় এবং সেই কাজের ফলস্বরূপ পাণ্ডবরা আবার নিজেদের রাজত্ব ফিরে পায়। পরশুরাম এই প্রসঙ্গে তাঁর গল্পে লিখেছেন:

শকুনির পাশা থেকে একটি ঘুরঘুরে পোকা বার হ’য়ে নির্জীববৎ ধীরে ধীরে দাড়া নাড়তে লাগল। যুধিষ্ঠিরের পাশা থেকে একটি ছোট টিকটিকি বেরিয়ে তখন পোকাটিকে আক্রমণ করলে।^৭

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কার জয় হ’ল?’

বলরাম বললেন, ‘যুধিষ্ঠিরের। দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না। শুনেছি শকুনি অতি চতুর, কিন্তু এখন দেখছি যুধিষ্ঠির চতুরতর।’^৮

তবে এগুলি ছাড়াও এই গল্পের আরও অনেকগুলি দিক আছে। যেমন মৎকুনির তৈরি করে দেওয়া পাশা নিয়ে দুই পক্ষই একসময় লড়াই করেছে। মৎকুনি তাই বলে উঠেছে যে, এই তৃতীয় দ্যুতসভায় সে নিজেই উভয়পক্ষ, যুধিষ্ঠির ও শকুনি নিমিত্ত মাত্র। এই কথার মাধ্যমে আধুনিক পৃথিবীর অনেক বড়ো ভূ-রাজনৈতিক লড়াইকেই পড়তে পারা যাবে। যেখানে বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছোট দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ লাগানো হয় এবং যুদ্ধের ইন্ধন ও অস্ত্র বৃহৎ রাষ্ট্রটিই উভয়পক্ষকে প্রদান করে। এই যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যন্ত লাভবান বস্তুতপক্ষে বৃহৎ রাষ্ট্রটিই হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়ে ছোট

দেশগুলি যারা পূর্ণ শক্তি সহযোগে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। তাই এই গল্পে মৎকুনির এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বর্তমানের পরাশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে, যে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিভিন্ন অজুহাতের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন সময়েই যুদ্ধ লাগিয়েছে দুই বা অধিক দেশগুলির মধ্যে। তাই এই গল্পে পৌরাণিক অংশের ব্যবহারে আজকের পৃথিবীর যুদ্ধের নীতি ও দুর্নীতি বিষয়ক যে তর্ক, তাকে যেন ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে লেখা হলেও পৌরাণিক আবহের কারণে এটির ব্যঙ্গ সকলের কাছে সমান ভাবে ধরা দেয় নি। তাই অনেক সমালোচক মনে করেন পাশা খেলার মধ্যে দিয়ে আসলে যুধিষ্ঠির ও বলরামের চরিত্র ঐক্যেছেন পরশুরাম এই গল্পে। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সমালোচক মনে করেন যে, সাধুতা ও সরলতা এবং ন্যায়পরায়ণতা বিশ শতকের রাজনীতিতে নির্বোধের উপজীব্য।

আমরা ‘বালখিল্যগণের উৎপত্তি’ গল্পে বালখিল্য মুনিদের মহাভারতে পাই। রাজা দুশ্শন্ত যখন কণ্ঠের আশ্রমে আসে, তখন আসার পথে গাছের ডাল থেকে এদের মাথা নিচু করে ঝুলতে দেখেছিল। মহাভারতের আদি পর্বের মধ্যে আন্তিক পর্বাপ্যায়ে যেখানে কদ্র ও বিনতার আখ্যান রয়েছে, সেখানে এই বালখিল্য মুনিদের কথা পাওয়া যায়। অলম্ব তীর্থে একটি বটগাছের শাখায় বিষ্ণুর বাহন গরুড় বসলে সেই শাখা ভেঙ্গে যায়। তখন এই মুনিদের এইভাবে ঝুলে থাকতে দেখে গরুড় শাখাটি ধরে ফেলে, এরপর মুনিরা সেই শাখা ত্যাগ করে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে তপস্যা করতে যায়। যদিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন যে, বালখিল্যদের দ্বারা পরশুরাম সাম্যবাদী আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন। আবার অজিত দত্তের মতে, একদল তরুণদের কোনও প্রকার নীতি ও নিয়মকে তোয়াক্কা না করার মনোভাবকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

মহাভারতের আদি পর্বে ‘সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমা’-র একটি আখ্যান পাওয়া যায়। সেখানে দেখতে পেয়েছিলাম কীভাবে ঈশ্বর জগতের সবথেকে উত্তম বিষয়গুলি দিয়ে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছে। যাকে কেন্দ্র করে সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে বিরোধ ঘটে। মহাভারতের কাহিনিকে কাজে লাগিয়ে পরশুরামের গল্প ‘তিলোত্তমা’-য় সিদ্ধিনাথের প্রেম জ্বর সারাতে পরশুরাম তার সাহায্য নিয়েছেন।

পরশুরামের ‘অগস্ত্যদ্বার’ গল্পটি খুবই চমৎকার। ঋষি অগস্ত্যের কথা আমরা সবাই জানি। বিদ্য পর্বতের দক্ষিণে যাত্রা করার পূর্বে ঋষি পর্বতকে বলেছিল যে, তার আগমনের পূর্বে যেন পর্বত তার উচ্চতা না বৃদ্ধি করে। কিন্তু ঋষি এরপর আর ফেরে নি। ভারতীয় পুরাণের এই ঘটনা আমরা সবাই জানি, মহাভারতেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গল্পের পরের অংশটি পরশুরামের নিজের নির্মাণ। যেখানে উল্লেখ রয়েছে পর্বতের অভিশাপের ঘটনাটি এবং তারপরে দু’রাজার মধ্যে যাত্রা শুরু করাকে কেন্দ্র করে চরম বিরোধ এবং একে অন্যের রাজ্যকে অধিকার

করা ও শেষে একে অন্যের স্ত্রীকে পাঁচপালি বা বদল করে নেওয়া সমস্তটাই পরশুরাম চমৎকারভাবে উত্তম হাস্যরসের সাহায্যে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। পরশুরামের ‘গন্ধমাদন বৈঠক’ গল্পটিও ভারী চমৎকার। যেখানে উল্লেখ রয়েছে কলিযুগে ধর্মযুদ্ধের উপযুক্ত নিয়ম বেঁধে দেওয়া। মহাভারতে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে উল্লেখ রয়েছে এরূপ নিয়ম বন্ধনের বিষয়ে। পৃথিবীর সাত জন অমর ব্যক্তির মধ্যে চারজন মহাভারতের চরিত্র। এই সমস্ত চরিত্র ও তাদের ঘটানো ঘটনা থেকে পরশুরাম দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মযুদ্ধ বলে বস্তুত কিছুই হয় না। যুদ্ধ মানেই ক্ষতি এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সেখানে। তাই বস্তুতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ কথাটাই অসত্য, এটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনই বর্তমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পরশুরামের ‘কর্দম মেখলা’ গল্পটিও খুবই উত্তম। আসলে এখানেও মহাভারতের ঘটনাকে উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে বস্তুতপক্ষে পরশুরাম পিতৃতান্ত্রিক ব্যাভিচারকে কটাক্ষ করেছেন। আসলে মহাভারতে দেখতে পাই স্বর্গের অঙ্গরারা আসলেই মুক্ত, সন্তান পালন করা তাদের কাজ নয়। তাই অনেক অঙ্গরাকে আমরা পেয়েছি যারা সন্তান জন্মের পর পুনরায় স্বর্গে ফিরে গেছে, একবার ফিরেও তাকায়নি সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানের দিকে। আমরা মেনকা অঙ্গরাকে পেয়েছি যে বিশ্বাবসুর ঔরসে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েই পালিয়েছে, আবার ঋষি বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা শকুন্তলা পৃথিবীতে আসার পর মালিনী নদীর তীরে তাকে পরিত্যাগ করা হয়। পরে মহর্ষি কণ্ঠ শকুন্তলাকে বড়ো করে তোলে। মহাভারতে এই ঘটনাগুলি ভালোভাবেই উল্লেখ আছে। কিন্তু এই গল্পে পরশুরাম এনেছেন ঋষি বিশ্বামিত্রকে দেওয়া মেনকার অভিশাপের কথা। আসলে পুরুষের ছেলেখেলায় ভার বহন করতে হয় মেয়েদের, পুরুষ সেখানে মুক্তই থাকে। এর ফলে সামাজিকভাবে বর্তমান সমাজে মেয়েরা লাঞ্চিত হয়। একদল পুরুষদের ব্যাভিচারকে এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে দেখানোর জন্যই পরশুরাম মহাভারতের এই সকল প্রসঙ্গ এনেছেন।

পরশুরামের ‘পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চগলী’ নামক গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে বা ১৯৫৩ সালে। এই গল্পটির কিছুটা অংশ মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে, আবার গল্পের অনেকটা অংশ মহাভারতে হয়তো থাকা সম্ভব ছিল এবং গল্পের বড়ো একটি অংশ অবশ্যই পরশুরামের নিজের নির্মাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনে দাম্পত্য কলহ কমবেশি থাকেই, মহাভারতের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা গেছে। দ্রুপদ কন্যা যাজ্ঞসেনীকে বিবাহ পরবর্তী জীবনে এমনকী বনবাসে থাকাকালীন সময়েও পাণ্ডবদের সঙ্গে অনেক কলহ করতে দেখা গেছে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বন পর্বে তীব্র বাদানুবাদ হতেও আমরা দেখেছি, যেখানে দ্রৌপদী প্রতিমুহূর্তেই পাণ্ডবদেরকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছে। কিন্তু ধর্মরাজ দ্রৌপদীর সঙ্গে যুক্তিতে জয়লাভ করতে না পারার কারণে তাকে যুধিষ্ঠির নাস্তিক বলে আখ্যায়িতও করেছে। ফলে

প্রত্যেকটি বিবাহিত মানুষের জীবনের মতো পাণ্ডবদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীরও কলহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলে আমাদের মনে হয়।

আসলে পাঁচ জন শক্তিশালী স্বামী থাকা সত্ত্বেও কৌরবদের সভায় দ্রৌপদীর প্রতি একরাশ অপমান, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার নেমে এসেছিল। যার ফল হিসাবে অনেক সময়তেই দ্রৌপদীর হাহাকার স্বামীদের প্রতি গঞ্জনার রূপ নিয়েছে। এই দাম্পত্য কলহের গল্প মহাভারতে দেখা যায় ওই বনবাসে থাকার সময়তেই, এমনকী দাম্পত্য সমস্যার সমাধানে কৃষ্ণও সেখানে এসেছিল এবং দ্রৌপদীর যত্ননা ও হাহাকার প্রশমনের প্রয়াসও করেছিল। এগুলি মহামতি ব্যাসদেবের মহাভারতে আমরা পাই। কিন্তু পরশুরামের নির্মাণ শুরু হয়েছে এর পরের অংশ থেকে। যেখানে আমরা দেখি দ্রৌপদী তার স্বামীদের সঙ্গে এক মাস ধরে কথা বলছে না এবং সেই সমস্যা সমাধানে কৃষ্ণও তাকে বুঝিয়ে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারে নি। তার ফলে কৃষ্ণ সাহায্য নিয়েছে ঋষি জ্বলজ্জটের। ফলে গল্পের এই অংশটি পাঠকেরা খুবই উপভোগের সঙ্গে পাঠ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঋষি জ্বলজ্জটের দাম্পত্য সম্পর্ক সমাধানের জন্য করা নানারকম ক্রিয়াকর্ম। ঋষি জ্বলজ্জটের স্ত্রী মারা যাওয়াতে সে যুধিষ্ঠিরদের কাছে তার ধর্মপত্নী হিসাবে দ্রৌপদীকে কামনা করে। কিন্তু দ্রৌপদীকে কোনওরকমেই ঋষির কাছে সমর্পণের আগ্রহ পাণ্ডবদের ছিল না, তাই যুধিষ্ঠিরেরা বাধ্য হয়েই ঋষির কাছে আজীবন গোলাম হয়ে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীর কারণেই তার প্রিয় স্বামীরা আজীবন ঋষির গোলাম বা দাস হতে যাচ্ছে এটি দ্রৌপদী হৃদয় থেকে সহজে মেনে নিতে পারে নি, তাই জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে। পরে দ্রৌপদীর জ্ঞান ফিরলে কৃষ্ণ সমস্তটা খুলে বললে দ্রৌপদী নিজের ভুল বা ত্রুটি বুঝতে পারে। তারপরে স্বামীদের কাছে গিয়ে আর এরূপ কলহ না করার প্রতিশ্রুতিও দেয়। এভাবে অবশেষে মিটে যায় দাম্পত্যের চরম সমস্যা সৃষ্টিকারী কলহ। এই গল্পে দ্রৌপদী আমাদের কাছে পৌরাণিক নারীর দূরত্বকে অতিক্রম করে গিয়ে অনেকটাই চিরন্তনী নারী হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষে দেখতে পাই পাণ্ডবদের দাম্পত্য কলহ অবসানের পেছনে কৃষ্ণের যে ভূমিকা আছে তা অর্জুন বুঝতে পেরেছে, তাই অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছে:

কৃষ্ণকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে অর্জুন বললেন, মাধব, জ্বলজ্জট ঋষিটিকে পেলে কোথায়? তাঁর অভিনয় উত্তম হয়েছে, কিন্তু হাস্যদমনের জন্য তিনি বিকট মুখভঙ্গী করছিলেন। ভাগ্যক্রমে ধর্মরাজ, পাণ্ডগলী ও আর সকলে তা লক্ষ্য করেন নি।^৯

পরশুরামের মহাভারত মূলক অন্যতম জটিল গল্প ‘অদল বদল’, যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে শরৎ সংখ্যা যষ্টি-মধুতে। এই গল্পে পরশুরাম কালিদাসের মেঘদূত ও মহাভারত এবং ভারতীয় পুরাণের এমন জটিল মিশ্রণ ঘটিয়েছেন যা এই গল্পটিকে একটু দুর্বোধ্য করেও তুলেছে

বটে। আবার এই সকল রচনাগুলির সঙ্গে যোগ হয়েছে পরশুরামের নিজস্ব কল্পনার নির্মাণ। কালিদাসের মেঘদূত এর নামহীন যক্ষ এবং মহাভারতের ‘অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস’ অধ্যায়ের যক্ষকে একই ব্যক্তি ধরে নিয়ে পরশুরাম এই গল্পটি লিখেছেন। কালিদাসের যক্ষ শেষ পর্যন্ত ফিরেছিল কিনা তা কালিদাস তাঁর কাব্যে লেখে নি, কিন্তু এই গল্পে পরশুরাম তাঁর প্রিয়া মিলন ঘটিয়েছেন। মহাভারতের যক্ষকে শিখণ্ডিনী বা অম্বা পৌরুষত্ব ফেরত দিতে চাইলেও তা যক্ষের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কারণ ক্রুদ্ধ কুবের অভিষাপ দিয়েছিল শিখণ্ডীর মৃত্যু পর্যন্ত যক্ষ নারী হয়েই থাকবে। তাই শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর যক্ষ তার পুরুষ ফিরে পেয়েছিল কিনা মহাভারতে তা আমরা পাই না। অন্যদিকে পরশুরামের গল্পে কুবের কিন্তু নির্দয় নয়। গল্পে কুবের শিখণ্ডীকে একপ্রকার বাধ্যই করেছে তাদের পারস্পরিক পূর্বের লিঙ্গকে পরিবর্তন করে নিতে। গল্পের পরের অংশে আমরা পরশুরামের অসাধারণ নিজস্ব গল্প নির্মাণের ছাপ দেখি। যেখানে মহাভারত ও কালিদাসকে অতিক্রম করে গিয়ে নিজের ভাবনার উপরেই পরশুরাম জোর দিয়েছেন। মহাভারতে কৃষ্ণকে আমরা পেয়েছি। কিন্তু মহামতি ব্যাসদেব রাধার কথা বলে নি মহাভারতে। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর রাধা ও আয়ান ঘোষের কী হয়েছিল তা পুরাণেও পাওয়া যায় না। এই দুটি আখ্যানের চমৎকারভাবে মিলন ঘটিয়েছেন পরশুরাম। তাই আমরা দেখতে পাই গল্পে নারদের পরামর্শে শিখণ্ডিনী আয়ান ঘোষকে বিবাহের প্রস্তাব দিল এবং এক মাসের জন্য তার লিঙ্গ শিখণ্ডিনী ধার হিসাবে গ্রহণ করল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অশ্বখামার অস্ত্রে শিখণ্ডী মারা যায়, সেই কারণে আয়ানের পুরুষত্বও ধ্বংস হয়। অতঃপর আয়ান ঘোষ আয়ানী নামে কৃষ্ণ কীর্তন করতে লাগল। পরশুরামের গল্পে অধিকাংশ মহাভারতের চরিত্ররা কিন্তু তাদের মূলগত স্বভাব পাল্টায় না, পরশুরাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই এই কাজটি করেন না। কিন্তু এই ব্যতিক্রম আমরা শিখণ্ডীর ক্ষেত্রে দেখেছি। আসলে কাশীরাজের কন্যাদের বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য অপহরণ করলেও ভীষ্ম পরে রাজা শাল্বের প্রতি অম্বার ভালোবাসার কথা জেনে তাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে শাল্ব অম্বাকে গ্রহণ করতে না চাইলে অম্বা আক্রোশের বশে ভীষ্মকেই বধের সংকল্প করে। যদিও মহাভারতের অনুবাদের ভূমিকায় রাজশেখর জানিয়েছেন যে এই আক্রোশের যথার্থ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভীষ্মের প্রতি কি অম্বার কোনও গোপন প্রচ্ছন্ন অনুরাগ জন্মেছিল?

ভীষ্মকে না পেলেও আয়ান ঘোষের প্রতি শিখণ্ডী অনুরক্ত হয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে এবং অন্যদিকে স্ত্রী রাধার দুঃখে তার স্বামী আয়ানই বা একলা জীবন কাটাতে যাবে কেন? এরকম বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়াতে বাধ্য হই পরশুরামের গল্পে। গল্পটি হাস্যরসে ভরপুর। বাঙালির মহাভারত চর্চায় পরশুরামের এই গল্পটি অন্যতম হয়ে থাকবে।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় পরশুরামের ‘ভীমগীতা’ গল্পটি। এই গল্পটিও আমাদের মহাভারত চর্চার পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারতে এই গল্পের কোনও কাহিনি নেই। কিন্তু পরশুরাম ক্রোধের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভীমের কাল্পনিক কথোপকথন এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আসলে মহামতি ব্যাসদেব ভীমকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি, পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে অর্জুনই সব থেকে বেশি প্রশংসা পেয়েছে সর্বত্র। মহাভারতের কৃষ্ণও তার কূটনীতি ও রাজনীতি দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেছে, ফলে কৃষ্ণেরও প্রভূত গুরুত্বের কথা আজও আমরা স্মরণ করি। কিন্তু ভীমের ক্ষেত্রে এরকম কোনও সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ ইমেজ বা চিত্রকল্প মহাভারতে গড়ে ওঠে নি অথবা সচেতনভাবে সেইটি নির্মাণ করা হয় নি। মহাভারতের শেষে স্বর্গে যাওয়ার মুহূর্তে ভীম পড়ে গেলে যুধিষ্ঠির জানিয়েছিল তার এই ভাইটি ‘অত্যন্ত ভোজন’ করতে ভালোবাসত, এমনকী অন্যান্য পাণ্ডবদের পর্যাপ্ত আহার হতো না ভীমের জন্যই নাকী। ভীম নিজে চরম ক্রোধী ছিল এবং অন্যের শারীরিক শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে না জেনেই নিজের বলের গর্ব করতে ছাড়ত না, সেই কারণেই স্বর্গে আরোহণ কালে ভীমের পতন হয়েছিল বলে ব্যাসদেবের মহাভারত আমাদের জানিয়েছে। কিন্তু অলংকার শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কথা যদি দূরে সরিয়ে রাখি, তাহলে আমাদের বলতে কোনও আপত্তি নেই ভীম মহাভারতের খুবই আকর্ষণীয় একজন চরিত্র।

ভীমের ক্রোধ নিয়ে অনেক সময় সমস্যা হয়েছে, কিন্তু কোন ব্যক্তির মধ্যে অল্পমাত্রায় ক্রোধ না থাকলে সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না। তাই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ক্রোধের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। রাজশেখর বসুও ভীমের ক্রোধকে তাই গুরুত্ব সহকারে দেখতে চেয়েছেন। এই গল্পটি লেখার অনেক পূর্বে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রাজশেখর বসু ‘রস ও রুচি’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, গীতাকার কাম ও ক্রোধকে একই দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছে। রাজশেখর বসু মনে করেন— ছ’টা রিপুর মধ্যে কাম ভারতীয় কাব্য সাহিত্যে বড়ো আসন দখল করে আছে, কিন্তু ক্রোধ থেকেও আমাদের সাহিত্য অনেক কিছুই পেতে পারত। রাজশেখর বসুর এই মত থেকে আমরা বুঝতে পারি মহাভারতের ভীমকে তাঁর পছন্দই ছিল। কিন্তু মহাভারতের সারানুবাদ করার সময় তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের গুরুত্ব দেওয়ার খুব একটা সুযোগ ছিল না। তাই ‘ভীমগীতা’ গল্পে ভীমকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে গল্পটি তিনি উপস্থাপন করেছেন। পরশুরামের ভীম গীতাকে এখানে ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ বলে চিহ্নিত করেছে। অনেকের মতে গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত একটি অংশ। কিন্তু এ কথা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে, গীতা ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। যাকে একাধিক অভিমুখ থেকে পড়া যেতে পারে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুবিধ সমস্যার সমাধানও গীতা থেকেই আমরা পেতে পারি। এই গীতায় যে পুরুষশ্রেষ্ঠ মানুষের কথা বলা হয়েছে ভীম তা নয়, আবার ভীম কাপুরুষ ও অমানুষও নয়, সকল বিষয়েই সে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

রাজশেখর বসুর অনুবাদে প্রথম দিনের যুদ্ধ সন্ধ্যায় ভীম ও কৃষ্ণের মধ্যে গল্পের মধ্যে থাকা এই কথোপকথন নেই। ভীষ্মপর্বের প্রথম দিন যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছে যে, যুধিষ্ঠির দেখেছে অর্জুন যুদ্ধে উদাসীন, একমাত্র ভীম ক্ষত্রিয় ধর্মকে স্মরণে রেখে পূর্ণশক্তি সহযোগে যুদ্ধ করেছে। এভাবে বিষয়টিকে ভেবে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে মহাভারতের ঘটনার সঙ্গে এই গল্পের খুব একটা বিরোধ নেই। গীতার ভূমিকায় রাজশেখর বসু বলেছেন- ‘গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ণ সহিতেও নিষেধ আছে। ... গীতাধর্ম শৌর্যবীর্যাদি পুরুষোচিত গুণের এবং সমাজ রক্ষার্থ নিষ্ঠুরতাও পরিপন্থী নয়।’^{১০} পরশুরামের লিখিত ‘শোনা কথা’ গল্পের মাস্টারের মুখে মহাভারত কাহিনির একালের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়- ‘শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাভারতে অন্যত্র আড়াল থেকে বোমা মারতে বলেছেন,...দ্রোণবধের জন্য মিথ্যা বলা এবং দুর্যোধনের কোমরের নীচে গদাঘাত বোমারই সামিল।’^{১১} আসলে রাজশেখর বসু নিজে সহিষ্ণু ও অহিংসা মতে বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি আবার ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে বোমার মশলা সরবরাহ করে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। ফলে তাঁর মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহাভারতকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। তাই গল্পে ভীমের মুখ দিয়ে তিনি আসলে তাঁর মতকেও প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। গল্পে পরশুরাম কৃষ্ণের সঙ্গে ভীমের এক কাল্পনিক কথোপকথন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, অনেক তর্কবিতর্কের পরে গল্পের শেষ অংশে কৃষ্ণও সহমত হয়েছে ভীমের সঙ্গে। কৃষ্ণ বলেছে:

কৃষ্ণ- বৃকোদর, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে। আপনি যা বললেন তাও তত্ত্বকথা। কিন্তু কোনও বিধানই সর্বত্র খাটে না। অত্যাচারিত হলে যে রাগ করে না, প্রতিকারও করে না, সে অক্রোধী কিন্তু কাপুরুষ, অমানুষ, জীবনধারণের অযোগ্য। যে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপ করে ফেলে, সে হঠকারী দুষ্কর্মা, কিন্তু তার পৌরুষ আছে। যে ক্রোধের বশে ধর্মাধর্মের জ্ঞান হারায় না এবং অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।^{১২}

পরশুরাম ক্রোধের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ভীমের মুখে অসাধারণ কিছু উক্তি বসিয়েছেন, যেগুলি এই গল্পে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। ভীম বলেছে:

ভীম- কোনও বিষয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশী খেলে মেদবৃদ্ধি হয়, উদর স্ফীত হয়, যুদ্ধের শক্তি কমে যায়। কিন্তু উপযুক্ত আহার না হলে জীবনরক্ষাও হয় না। অত্যধিক ক্রোধও ভাল নয়, তাতে হাত-পা কাঁপে, লক্ষ্যভ্রংশ হয়, যুদ্ধে নিপুণতার হানি হয়। কিন্তু ক্রোধ বর্জন করলে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ- অনেক যোগী তপস্বী আছেন যাঁদের ক্রোধ মোটেই নেই।

ভীম- তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। তাঁদের স্বজন নেই, আত্মরক্ষারও দরকার হয় না। সকলেই জানে তাঁরা শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলতে পারেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ঘাঁটায় না, তাঁরাও নির্বিবাদে অক্রোধী অহিংস হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা তপস্বী নই, তাই দুর্যোধন শত্রুতা করতে সাহস করে। অন্যায়ের প্রতিকার এবং দুষ্টির দমনের জন্যই বিধাতা ক্রোধ সৃষ্টি করেছেন। একাদশ রুদ্র আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, দেহীর অপমান হলে তাঁরা রক্তে রৌদ্ররস সঞ্চর করেন, তার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, কোনও রকম রকম বিচারের দরকার হয় না। বুঝতে পারলে?^{১৩}

... ...

কৃষ্ণ- কিন্তু জ্ঞানীদের উপদেশ- অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে।

ভীম- গোবিন্দ, তুমি নিতান্তই হাসালে। কংসকে মেরেছিলে কেন? জরাসন্ধকে মারবার জন্য আমাকে আর অর্জুনকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন? রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলে কেন? তোমার অক্রোধ কোথায় ছিল? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। বিপক্ষ যদি সজ্জন হয়, তার শত্রুতা যদি ভ্রান্ত ধারণার জন্য হয়, তবেই অক্রোধ আর অহিংসা চলতে পারে। ভদ্র বিপক্ষ যদি দেখে যে অপর পক্ষ প্রতিহিংসার চেষ্টা করছে না, শুধু ধীরভাবে প্রতিবাদ করছে, তবে তার ক্রোধ শান্ত হয়ে আসে, সে ন্যায় অন্যায় বিচারের সময় পায়, নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়। হয়তো মার্জনা চাইতে সে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু অপরপক্ষ যদি উদারতা দেখায় তবে সহজেই শত্রুতার অবসান হয়।^{১৪}

রাজশেখর বসু মহাভারতকে নিয়ে যতগুলি গল্প লিখেছিলেন তার সবকটিই ভাবনার দিক থেকে, হাস্যরসের দিক থেকে এবং নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে অসামান্য হয়েছে। মহাভারতীয় ঘটনা বা আখ্যানকে কেন্দ্র করে যে এরূপ গল্প নির্মাণ সম্ভব বা রচিত হতে পারে তা বোধহয় পরশুরামের পক্ষেই সম্ভব।

২.৩।। প্রেমেন্দ্র মিত্র- মহাভারত এবং ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) বাংলা সাহিত্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত গল্প, উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞানমূলক রচনা, কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখেছেন। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে *ফেরারী ফৌজ*, *সাগর থেকে ফেরা*, *ফ্যান*, *কখনো মেঘ* ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সমগ্রের মধ্যে আছে- *পঞ্চসর* (১৯২৯), *বেনামী বন্দর* (১৯৩০), *পুতুল ও প্রতিমা* (১৯৩২), *মৃত্তিকা* (১৯৩২), *অফুরন্ত* (১৯৩৫) ইত্যাদি। তাঁর প্রথম উপন্যাস ছিল *পাঁক* (১৯২৬)। তারপর বেরোয় ধীরে ধীরে *মিছিল*, *আগামীকাল*, *প্রতিশোধ*, *কুয়াশা*, *পথ ভুলে*, *সূর্য কাঁদলে সোনা*, *বিসর্পিল* ইত্যাদি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্ট জনপ্রিয়তম চরিত্র ঘনাদা। গল্পবাগীশ সর্বজ্ঞানী মেসবাড়ির ঘনশ্যাম

দাস আজও সব বয়সের পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয়। তার এই অমর চরিত্র ৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দা ‘ঘনাদা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদাকে নিয়ে মোট আটটি গল্প লিখেছেন। প্রত্যেকটি গল্পতেই তিনি অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের নজির রেখেছেন।

বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় ঘনাদার এই আটটি গল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাভারত কত গুরুত্বের সঙ্গে গভীরভাবে পড়েছিলেন। কারণ তা না হলে এত সুন্দরভাবে ও নিখুঁত পদ্ধতিতে মহাভারতের গল্পগুলি উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা সময় মহাভারত চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন। সেটিকে তিনি ঘনাদার মহাভারত চর্চা হিসাবে ‘ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্’ গল্পে উল্লেখ করেছেন। গল্প থেকে জানতে পারি মেস বাড়ির কোনও একজন সদস্যের অপরাধে ঘনাদা তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে গল্প শোনানো বন্ধ রেখেছে। সেই প্রসঙ্গে ‘ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্’ গল্পের ‘আমি’ চরিত্র— সেও মেসের সদস্যদের একজন, সে বলছে:

অপরাধ আমাদের কী ছিল? না, কথায় কথায় আমাদের মাথায় মহাভারতের গাঁটা আমরা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ঘনাদাকে তখন পুরাণের প্রেতে পেয়েছে। দিন-রাত শুধু মহাভারতই দেখছেন সব কিছুতে সর্বত্র— যা কিছু বলো, যা কিছু করো, মহাভারত এনে ফেলবেনই সেই সুবাদে।

‘দিনকয়েক মন্দ লাগেনি। তার সঙ্গে দু-চারবার সঙ্গতও করেছি।’

‘কিন্তু তারপর আর কতদিন ভাল লাগে। আমরা ক্রমে ক্রমে একটু বাঁকা সুর ধরছিলাম। মহাভারতের কথা তুললেই যেন জরুরি দরকারে কেটে পড়ছিলাম টঙের ঘর থেকে।’^{১৫}

এটা থেকেই বোঝা যায় যে, মহাভারতের বেশ কিছু সাধারণভাবে অজানা ঘটনা এইবার ঘনাদার মুখ থেকে পাঠকেরা হয়তো শুনতে পাবে। বলাই বাহুল্য, সাধারণ মহাভারত পাঠকের যা অজানা ঘটনা, ঘনাদার কাছে তাই সত্য ঘটনা। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পগুলি বলার সময় কখনো মহাভারতের ঘটনার ক্রম মেনে চলে নি। তাই গল্পের ঘটনার ক্রম এবং প্রকাশের সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দপতন হয়েছে। এই গল্পগুলির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমরা পূর্বেই আটটি গল্পের কথা বলেছি যা মহাভারত সম্পর্কিত, এগুলি হল— ‘কীচক বধে ঘনাদা’, ‘ভারত-যুদ্ধে পিপড়ে’, ‘কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা’, ‘খাণ্ডবদাহে ঘনাদা’, ‘শান্তিপর্বে ঘনাদা’, ‘ঘনাদার শল্য সমাচার’, ‘আঠারো নয়, উনিশ’ এবং ‘জয়দ্রথ বধে ঘনাদা’।

১৯৭৫ সালে ‘কিশোর ভারতী’-তে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘কীচক বধে ঘনাদা’ গল্পটি। এই গল্পের মূল কথা হল, মহাভারতে ভীম ও বিরাট রাজ্যের সেনাপতি মহাবলশালী কীচকের যে যুদ্ধের ঘটনা আছে, সেইটি আমাদের কাশীরাম দাস সম্পূর্ণ উপস্থাপন করে নি। ফলে প্রকৃত যুদ্ধের চিত্রটি যথাযথভাবে ফুটে ওঠে নি। তাই এই গল্পের মধ্যে দিয়ে ভীম ও কীচকের মধ্যে হওয়া যুদ্ধের অপ্রকাশিত ঘটনা প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদার মুখ দিয়ে মহাভারতের পাঠকদের জানিয়েছেন। আসলে মেসের ছাদে ঘোরাঘুরি করতে থাকার সময় ঘনাদা যুদ্ধের কথা ভাবছিল, সেই ঘনাদাকে একটু উত্তেজিত করার জন্য মেসের অন্যতম সদস্য গৌর বিরাট পর্ব থেকে ভীম এবং কীচকের যুদ্ধের বিবরণ কিছুটা শুনিতে দেয়। যুদ্ধের বিবরণ ছিল এরকম:

মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণের ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন।।
তথাপি বিক্রমে ভীম হইতে নহে উন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে জড়াগড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি।।
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জর অঙ্গ পদাঘাতে নখে।।^{১৬}

যুদ্ধের এরকম ঘটনা শুনে ঘনাদা অসম্মত হয়। সে জানায় যে এরকম ঘটনা আসলেই ঘটে নি। মূল মহাভারতে আসল বর্ণনার সবটুকু পাওয়া যায় নি, সেই কারণেই ওরকম মিথ্যে কথা লেখা হয়েছে। ঘনাদা বলে আসল বিষয়টি ছিল- ‘সত্যিকার একটি নিযুদ্ধের বিবরণ’। এই কথার আশ্চর্য অর্থ করেছে ঘনাদা, তার মতে ‘নিযুদ্ধ’ মানে শাস্ত্রীয় মল্লযুদ্ধ। এই কথার অর্থ হল কোনও অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ বা লড়াই। এরপরই ঘনাদার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে সেই যুদ্ধের বিবরণ, যা অতি চমৎকার আমাদের শুনতে লাগে।

শাস্ত্রমতে আসল নিযুদ্ধটা কী রকম হয়েছিল, শুনি? গৌরের গলায় বেশ ছুঁচোলো সন্দেহ।
শুনবে? শোনো তা হলে। ঘনাদা চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে ফ্ল্যাশব্যাক-এ দেখার ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলেন, শাস্ত্রমতে নমস্কার আর হাত নেওয়ার পর কীচক করল কাস্ফোটন আর ভীমসেন স্কন্ধতাড়ন। এবার দুজনে কক্ষাবদ্ধ হয়েছে। ওই কীচক ভীমসেনকে পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ করেছে। ভীমসেন টলছে, টলছে, চোখে যেন সর্ষেফুল দেখছে, পড়ে যাচ্ছে কাটা কলাগাছের মতো। ওই পড়ছে, পড়ছে, পড়ল- না, না, পড়েনি। পড়তে পড়তে ভীমসেন সামলে বাহুকণ্টক লাগিয়েছে। গেল গেল, কীচক বুঝি জরাসন্ধ হয়ে গেল, চিড় খাচ্ছে, খাচ্ছে- না, ভীমসেনের

কৃত-এর পর কৃতমোচন করেছে কীচক, সুসংকট দিয়ে সন্নিপাত করে অবধূত করেছে ভীমসেনকে—^{১৭}

প্রেমেন্দ্র মিত্রে'র এরকম লাইন বা বাক্য গঠন এবং উপস্থাপনা পদ্ধতি শিশু ও কিশোরদের তো বটেই, এমনকী পরিণত বয়সের মানুষদেরও সমানভাবে আকর্ষণ করে। পুরো গল্পটি জুড়ে ঘনাদা বিচিত্র সব শব্দের প্রয়োগ করেছে, সেই সমস্ত শব্দের জটিলতার মধ্যে পড়ে মেসের সদস্যদের মাথা একপ্রকার ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। সমগ্র গল্পতে এরকম অনেক জটিল শব্দই ঘনাদা ব্যবহার করেছে। অনেকগুলি শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ যা বোঝে, ঘনাদা একেবারে তার উল্টো অর্থ বুঝিয়েছে। ফলে বিষয়গুলি পাঠকের কাছে কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। পাঠক মজাতে ডুবে থাকে। আমরা এই প্রসঙ্গে দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করছি।

ওঃ! ঘনাদা অনুকম্পায় কোমল হলেন, মাথায় কিছু ঢুকছে না বুঝি! আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসব হল সেকালের আখড়াই বুলি! বিরাটপুরীর জিমূত পালোয়ানের আখড়া ছিল সবচেয়ে নামকরা। নিযুদ্ধের বুলি সেখান থেকেই বেশির ভাগ আমদানি। কক্ষাফোটন আর স্কন্ধতাড়ন হল লড়াইয়ের আগে মল্লদের হাত-পা নেড়ে যাকে বলে গা-গরম করা—কক্ষাবন্ধ হল লড়াইয়ের প্রথম জাপটাজাপটি মানে আলিঙ্গন। পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ হল দুহাতে আঙুল শক্ত করে শত্রুর মাথায় চাঁটি! এক পা চেপে ধরে আরেক পা টেনে ছেঁড়ার নাম বাহুকণ্টক। শত্রুকে মারের প্যাঁচ হল কৃত, আর সে প্যাঁচ ছাড়ানো মানে কৃতমোচন হল প্রতিকৃত শক্ত ঘুষি-পাকানো হল সুসংকট, আর তার কাজ হল সন্নিপাত। অবধূতহল শত্রুকে ধরে দূরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া।^{১৮}

মহাভারতে ভীম এবং কীচকের মধ্যে হওয়া অসাধারণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধের বর্ণনা নাকী অনেকটাই মূল মহাভারত থেকে বাদ চলে গেছে। এই বাদ চলে যাবার জন্য দায়ী দুই জন ব্যক্তি। যারা হল নকুল এবং সহদেব। এই বাদ যাওয়ার বিষয়টি বোঝানোর জন্য ঘনাদা বলেছে:

কিছুই ছিল না। ঘনাদা যেন মুখোনা তেতো করে বললেন, ওই দুটো বোকা ফালতু ভাইয়ের দোষেই এই হিতে বিপরীত।

বোকা ফালতু ভাইদুটো মানে নকুল-সহদেব বুঝলাম। কিন্তু তাদের বুদ্ধির দোষটা কী, আর তাতে হিতে বিপরীতটা কীরকম?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ঘনাদাকে।

কীরকম তা বলতেও মেজাজ খিচড়ে যায়! ঘনাদা যেন আমাদের কাছেই সাড়ে তিনহাজার বছরের জমানো গা-জ্বালাটা প্রকাশ করলেন, দুই হাঁদা ভাইয়ের মাথায় হঠাৎ বাই চাপল, আদি পর্ব থেকে জতুগৃহদাহ অধ্যায়টা একটু ছাঁটাই করতে হবে। মানে কুন্তী মায়ের নামে কোনও নিন্দে যেন কখনও না উঠতে পারে।^{১৯}

আসলে বারণাবতের জতুগৃহের ঘটনাটি আমরা সবাই জানি। ব্রাহ্মণভোজনের সময় এক নিষাদ মা সহ পাঁচ জন পুত্র সেদিন পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিল। তাদের সবাই যখন ভোজনের পর

ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন পাণ্ডবরা সমস্ত বিপদের কথা জেনেও তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে নি। উপরন্তু সেই সময় পাণ্ডবদের বেঁচে থাকার জন্য নির্দোষ ও নিরপরাধ মানুষদের জীবন বলি দিতে হয়েছিল। আমাদের মনে হয় সমগ্র মহাভারতের মধ্যে এইটি অন্যতম গুরুতর একটি অপরাধ, যা সত্যিই ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু ঘনাদা জানায় যে মহাভারতের এই অংশটি বাদ দেওয়ার জন্য নকুল ও সহদেব ‘বল্মী-বিশারদ’ খেতাবধারী এক ফেরিওয়ালার সাহায্য নেয়। সেই ফেরিওয়ালা তার পোষা উইকে নাকী নির্দেশ দিয়েছিল পুথিপত্র ও দলিল মক্কেলের পছন্দ মতো সম্পাদনার জন্য। বেশ মজার ছলে অন্যরকম এক মহাভারত নির্মাণ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

ফেরিওয়ালার সঙ্গে আলাপ করে দুই ভাইয়ের আহ্বাদ আর ধরে না। মোক্ষম যা একটি প্যাঁচ এবার পাওয়া গেছে, তার কাছে দারুক-মূষিক কোম্পানির কসরত কোথায় লাগে!

ফেরিওয়ালার কাঁধে ঝোলানো বিজ্ঞাপনে তার খেতাব লেখা আছে, বল্মী-বিশারদ। গালভরা নামটার আসল মানে হল উই পোকার ওস্তাদ। ফেরিওয়ালা উই পোকা পোষে। সেই পোষা উই দিয়ে পুঁথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ সব সে যেমনটি চাই তেমনই সংশোধন করে দিতে পারে।

মহাফেজখানা নয়, সামান্য ক-টা ছত্র। আনন্দে গদগদ হয়ে নকুল-সহদেব বারণাবতের জতুগৃহদাহের কোন জায়গাটা লোপাট করতে হবে বুঝিয়ে মোটা বায়না দেয় বল্মী-বিশারদকে। তাইতেই সর্বনাশ হয়।

পোষা উই-বাহিনী কাজ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু একচুল দিক ভুলের দরুন বারণাবতের জতুগৃহের বদলে বিরাট পর্বের ভীম কীচক যুদ্ধটাই দেয় চিরকালের মতো কেটে লোপাট করে।^{২০}

এরকমই একটি গল্প ‘জয়দ্রথ বধে ঘনাদা’ ঘনাদা এবং মেস বাড়ির সদস্যদের নিয়ে টানটান উত্তেজনাময় একটি গল্প। ঘনাদার এই গল্পটিতে কাশীরাম-ঘনশ্যামের পাশাপাশি নির্ভেজাল বিজ্ঞানেরও দেখা আমরা পাই। গল্পের শুরুতে যে তর্কটিকে কেন্দ্র করে গল্পটি এগিয়েছে সেইটি হল- মহাভারতের যুদ্ধের সময় নির্ণয়কে কেন্দ্র করে। মেসের অন্যান্য সদস্যরা যেখানে জানিয়েছে যে, মহাভারতের ওই যুদ্ধের সময় মহাকাব্যে লেখা নেই, সেখানে ঘনাদার মন্তব্য ছিল- ‘পড়তে জানলেই পাওয়া যায়’।

এরপর ঘনাদা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে টেনে এনেছে জয়দ্রথ বধের প্রসঙ্গ। ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের কাছ থেকে বর লাভ করেছিল, তার কঠোর তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রদান করে যে, একমাত্র অর্জুন ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডবদের সহজেই সে পরাজিত করতে পারবে। মূল মহাভারতের পাশাপাশি কাশীরাম দাসের মহাভারতেও এটির উল্লেখ আছে। ঘনাদার এই গল্পেও এই প্রসঙ্গে শ্লোক উল্লেখ আছে। মহাদেবের বরকে পাথেয় করে জয়দ্রথ একদিনের জন্য প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা হয়ে যায়, এরই ফলস্বরূপ অর্জুন পুত্র অভিমন্যু নিহত হয়। স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অর্জুনের জয়দ্রথ বধের প্রবল প্রতিজ্ঞা ছিল।

জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর ।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্বজন ।
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর ।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥^{২১}

কিন্তু ঘনাদার মতে এরপরই ঘটে আসল ঘটনা। কোনও মহাভারতে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। ঘনাদার মতে অর্জুনের জন্য ব্যাসদেব একটু অদল-বদল করে লিখেছে। প্রকৃতপক্ষে যা লেখার কথা ছিল তা লেখে নি মহামতি ব্যাসদেব।

মানে, ওখানে যা থাকবার কথা তা হল, বলে ঘনাদা প্রায় সুর করেই আমাদের শোনালেন,

এত তীর পুত্রশোকে মুছাহত প্রায় ।
অর্জুনের মুখে না আর বাক্য বাহিরায় ॥
তখন চিৎকারী উঠি দেবকীনন্দন ।
বলেন শুনহ সবে প্রতিজ্ঞা বচন ॥
কালি যদি জয়দ্রথ বিনাশ না হয় ।
সূর্যাস্তেই প্রাণ পার্থ ত্যজিবে নিশ্চয় ॥
দিনান্তেও জয়দ্রথ না মরিলে কালই ।
আত্মঘাতী হবে পার্থ নিজ চিতা জ্বালি ॥^{২২}

এইখানে ঘনাদা আমাদের একেবারে নতুন কথা শোনালো, এই কথা আজ পর্যন্ত মহাভারতের কোনও পাঠক পড়ে নি। ঘনাদার বক্তব্য ছিল এরকম যে, অর্জুনের জয়দ্রথ বধের চরম প্রতিজ্ঞার বিষয়টি শ্রীকৃষ্ণই জোরপূর্বক অর্জুনের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য বেঁধে দিয়ে অর্জুনকে যথেষ্টই চাপে ফেলা হয়েছিল। জয়দ্রথকে বধের বিষয়ে যথেষ্টই শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছিল অর্জুনকে। সারাদিন ধরে শুধু প্রবল প্রতাপে যুদ্ধই করে গেছে সে, যুদ্ধ শেষে যখন রণক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে অর্জুন, নিজের প্রতিজ্ঞা আপাতত রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কৌরব শিবিরের লোকেরা যখন প্রবল আনন্দে অর্জুনের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্য দেখতে প্রবল আগ্রহী, তখন সূর্যকে আড়াল করে রাখা সুদর্শন চক্র সরে যায়। ফলস্বরূপ দিনের আলো দেখা যাওয়ার কারণে অর্জুন নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এবং জয়দ্রথ মারা যায়। ঘনাদার মতে এই ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে যুদ্ধের আসল দিনক্ষণ। আসলে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবল বুদ্ধিমান মানুষ, যে নিজের বুদ্ধিবলে জয়দ্রথ হত্যার সময়কালের সঙ্গে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়কে মিলিয়েছে। তাই সুদর্শন চক্র সহযোগে সূর্যকে ঢেকে দেওয়াটা ছিল প্রতীকী বিষয়। সূর্যগ্রহণের বিষয়ে একেবারে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত ছিল, তাই অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা রক্ষার

বিষয়ে ইচ্ছে করেই ঠেলে দেয়। ঘনাদার মতে বিকেলে সূর্য ঢেকে যাওয়ার এটিই ছিল প্রকৃত কারণ। অন্যদিকে সূর্যগ্রহণ কারোর ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল নয়, সেইটি হয় প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে। এরপর আবার আংশিক সূর্যগ্রহণ নয়, তা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। তাই সেইটি আমাদের পৃথিবীতে একেবারেই বিরল ঘটনা। ভাবনার এই জায়গা থেকেই কোনও খ্যাতিমান বিজ্ঞানী যদি পুরনো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ইতিহাস খুঁজে দেখেন, তাহলে সহজেই সেখান থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় জানা সম্ভব বলে ঘনাদা মনে করে।

এখনও সে কথা জিজ্ঞাসা করছ? আমাদের সম্বন্ধে তাঁর হতাশাটা ভাল করেই গলার স্বরে বুঝতে দিয়ে বললেন, আরে, সূর্যগ্রহণ কারওর খামখেয়ালে হয় না। তা হয় একেবারে নির্ভুল অঙ্কের হিসেবে। এই কদিন আগে আমাদের এখানে সূর্যের পূর্ণগ্রাস হয়ে গেছে। সত্যিকার জ্যোতির্বিদ কাউকে ধরে, এই গ্রহণ থেকে পিছনে হিসাব চালিয়ে সেই গ্রহণের তারিখ, জয়দ্রথ-বধ মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পল-বিপল পর্যন্ত নির্ভুল বলে দেবে।^{২০}

ঘনাদা ও মহাভারতকে নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি অতি সংক্ষিপ্ত গল্প হল- ‘আঠারো নয়, উনিশ’। আসলে মহাভারতের যুদ্ধের দিনসংখ্যা নিয়ে ঘনাদার গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পে। গল্পকার এখানে ঘনাদার মুখ দিয়ে বলেছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল উনিশ দিন ধরে। আসলে যুদ্ধ শুরুর পূর্বের দিনটিকেও ধরা উচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। কৌরব এবং পাণ্ডবদের যে বিপুল সৈন্য সমাবেশ হয়েছিল কুরুক্ষেত্র ময়দানে, তার যথাযথ জায়গা নির্ধারণকে কেন্দ্র করেই বিবাদ হয়েছিল। কোন পক্ষের সৈন্য কোন দিকে দাঁড়াবে- তাই হয়েছিল বিবাদ ও বিপদের মূল বিষয়। সুতরাং সেই উল্লেখযোগ্য দিনটিকেও যুদ্ধের একটি দিন হিসাবে আমাদের ধরা উচিত। এই বিশেষ দিনটিতে মহামতি ব্যাসদেবের পক্ষ থেকে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে নি, তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠারো দিনের বলে লেখা হয়েছে। তবে এই বিশেষ গল্পটির গুণমান অন্যান্য গল্পগুলির থেকে অনেকটাই কম।

১৯৭৫ সালে আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয় ঘনাদার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প ‘ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে’। আসলে মহাভারতের ঘটনা যে কোনও পাঠক মাত্রই সচেতনভাবে জানে। শিশু ও কিশোরেরা টেলিভিশনের মাধ্যমেই হোক, অথবা ছোটদের মহাভারতমূলক কোনও বই পড়েই হোক- প্রকৃত ঘটনা আমাদের কাছে অজ্ঞাত একেবারেই নয়। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে কৃষ্ণকে নিয়ে কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে একপ্রকার সংকট দেখা যায়, এই কথা আমরা সবাই জানি। কৃষ্ণের মতো প্রবল বুদ্ধিমান ও কূটনীতিবিদ যে পক্ষে থাকবে তার যুদ্ধ জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই উভয়পক্ষই কৃষ্ণকে নিজের দলে টানার জন্য দুর্বোধ্য ও অর্জুন তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু সে সময় কৃষ্ণ ঘুমন্ত অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। অতঃপর কোনও উপায় না দেখে দুর্বোধ্য কৃষ্ণের মাথার দিকে এবং অর্জুন কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসার জন্য মনস্তির করে। অন্যদিকে কৃষ্ণের পরিকল্পনা

ছিল যে, ঘুম ভাঙার পর যাকেই প্রথম সে দেখবে তার পক্ষেই সে যোগ দেবে। কাশীরাম দাসের মহাভারত বা ব্যাসদেবের মহাভারত সমস্ত জায়গা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, ঘুম ভাঙার পর কৃষ্ণ অর্জুনকেই প্রথম দেখে এবং সে কারণেই পাণ্ডব পক্ষে কৃষ্ণ যোগদান করে। দুর্যোধনকেও একেবারে আশাহত করে কৃষ্ণ পাঠায় নি। প্রবল পরাক্রমশালী একদল সৈন্যকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণের তরফ থেকে দুর্যোধনকে দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঘনাদার থেকে শোনা যায় সম্পূর্ণ অন্য কথা।

ঘনাদার মতামত অনুসারে দুর্যোধন নাকী বসেছিল কৃষ্ণের পায়ে কাছের কাছেই। অন্যদিকে অর্জুন বসেছিল কৃষ্ণের মাথার কাছে। কিন্তু ঘুমের ঘোরে কৃষ্ণ শুয়েছিল উল্টোদিকে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে যেমনটা হয় আরকি, স্বপ্নের মধ্যে উত্তেজनावশত বা নেহাতই কোনও কারণ ছাড়াই শোয়ার দিক পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন ঘুম ভাঙার পর দেখা যায় যা ছিল এবং যা হয়েছে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থা। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও এমনটা হওয়ার কারণেই ঘুম ভাঙার পর সে অর্জুনকেই প্রথম দেখে এবং স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডব শিবিরে যোগদান করে। ঘনাদার মতামত অনুসারে কৃষ্ণের ঘুম ছিল আসলেই কপট নিদ্রা। কৃষ্ণের ভাবনায় ছিল দুর্যোধন তার মাথার কাছে বসবে। কিন্তু সেইটি না হওয়ার ফলে সমস্যা হয়েছিল, এই বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদার বয়ানে লিখেছেন অসাধারণ মজাদার কাহিনি, আমাদের চিরাচরিত মহাভারত পাঠের বিপরীতে গিয়ে তিনি লিখলেন:

ঘুমের মধ্যে উলটে শুয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ? এবার আর আমাদের অবাক হবার ভান করতে হল না।

হ্যাঁ, উলটে শুয়েছিলেন। ব্যাখ্যা করলেন ঘনাদা, দুর্যোধন বোকা যেমন নয়, তেমনই গড়িমসি আলসেমিও তার ধাতে নেই। অর্জুন রথে ঘোড়া জুতে রওনা হতে না হতেই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে এসে হাজির। বাসুদেব ঘুমোচ্ছেন শুনে সে শোবার ঘরেই গেল অপেক্ষা করতে। ঘরে ঢুকেই সে কিন্তু একটু ফাঁপরে পড়ল। ঘুমন্ত বাসুদেবের মাথার দিকে যেমন পায়ে দিকেও তেমনই একটি করে আসন পাতা। এখন কোথায় তার বসা উচিত। ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত সে পায়ে দিকেই বসল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পড়লেন মুশকিলে। তাঁর তো কপট নিদ্রা। যা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তার উলটোটা করেছে জেনে, আর কোনও উপায় না পেয়ে নিজেও তিনি ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্নে উঠে পড়ার ভান করে উলটে শুলেন।

দুর্যোধন আহাম্মক নয়, কিন্তু অহংকারী। শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমের মধ্যে উলটে শুতে দেখে তার দেমাকে একটু সুড়সুড়িই লাগল। ভাবল, বাসুদেবের ঘুমের মধ্যেও তার মতো রাজাগজাকে পায়ে দিকে

রাখতে বাধছে। এই দম্ভেই হল তার মরণ। নইলে মাথা থেকে আবার পায়ে গিয়ে বসতে পারত না!²⁸

এখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে যে, মহাভারত থেকে এই ঘটনা সরিয়েছে কে? ঘনাদার মতে, এটি লুকোনোর প্রয়োজন হয় নি, কারণ এই ঘটনা মহাভারতে লেখাই হয় নি। না লেখার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে পিপড়েদের বা তাদেরই আদি কোনও প্রজাতিকে। মহামতি ব্যাসদেব যখন কৃষ্ণের এই কপট নিদ্রার বিষয়ে লেখার জন্য গণেশকে বলছিল, তখন ওই পিপড়েই নাকী গণেশের গুঁড়ের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। যারই ফলে ঘটে যায় এই অঘটন, প্রবল হাঁচির তোড়ে লেখাও থমকে যায় কিছুক্ষণ এবং পুঁথির পাতাও উড়ে যায়, ফলে আবার যখন লেখা শুরু হয় ততক্ষণে নাকী কৃষ্ণের কারসাজি সমাপ্ত হয়ে গেছে।

‘কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা’ এই সিরিজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গল্প। ১৯৭৭ সালে দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীতে এই গল্পটি বেরিয়েছিল। এই গল্পটি শিশু ও কিশোরদের কাছে বেশ মজাদার। পাশাপাশি মজার ছলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের বলেছেন। যেগুলিও সমানভাবে আমাদের সমাজে রয়েছে, অসততা এবং চৌর্যবৃত্তি আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে একটি প্রধান বড়ো সমস্যা। অবশ্য বিষয়টি থেকে প্রথম বিশ্বের দেশগুলিও একেবারেই মুক্ত নয়। বাস্তবের সংখ্যা এবং খাতায়-কলমে সংখ্যার মধ্যে তফাৎ দেখিয়ে মালিকের থেকে বা রাষ্ট্রের থেকে অর্থ বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়াও পৃথিবীর বাইরের অন্য কোনও গ্রহের ঘটনা নয়। আমরাই অনেক সময় নিজেদের সুবিধার্থে বা লাভের জন্য এরকম অন্যায় কাজ করে থাকি। ঘনাদা গল্পের ছলে হয়তো কৌরবদের কথা বলেছে, কিন্তু বাস্তবে তা আমাদের মনুষ্য সমাজেরই ঘটনা বলে আমাদের মনে হয়।

গল্পের বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবে ঘনাদার আড্ডায় প্রচুর লোকের সমাবেশ ঘটেছে। বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় চারিপাশ একেবারে জমে উঠেছে। এরকমই পরিস্থিতিতে পাণ্ডব এবং কৌরবদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যার প্রশ্নে তর্ক জমে উঠেছে। মহাভারত থেকে আমরা জানতে পারি পাণ্ডবদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাত অশ্বোহিনী এবং কৌরবদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা এগারো অশ্বোহিনী। কিন্তু ঘনাদার হিসাব অনুসারে এই সংখ্যাটা ভুল ছিল। তার মতে সংখ্যাটা এগারোর বদলে আট হবে। এই আট অশ্বোহিনী সৈন্য সামন্তের থাকার বিষয়টিও ভারী চমৎকার। কোথায় তাদের রাখা হয় নি! ঘনাদা এই প্রসঙ্গে জানিয়েছে সৈন্যদের থাকার জন্য হস্তিনাপুর পর্যাপ্ত ছিল না, তাই তাদের রোহিতকারণ্য, কালকূট, গঙ্গাকুল, বারণ, কুরু জাঙ্গাল এর মতো জায়গাগুলিতে তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তিন অশ্বোহিনী সৈন্য বেশি দেখানোর পেছনে শকুনি পুত্র উলূক দায়ী ছিল বলে ঘনাদা মনে করে। কারণ এত সৈন্য বেশি দেখানোর ফলে

তাদের পেছনে থাকা খাওয়া ও আপ্যায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ উল্লুক হাতিয়ে নিতে পেরেছিল। পৌরাণিক হিসাব অনুসারে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সামন্তের অর্থ সেখানে পদাতিক সৈন্যের পাশাপাশি হাতি ঘোড়া ও রথও থাকবে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশোর কাছাকাছি। তাহলে তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য সামন্তের অর্থ এর তিনগুণ, তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় উল্লুক কী পরিমাণ অর্থ নিজে সরিয়ে ফেলেছিল।

ভেজাল বা নকল জিনিস বাজারে ছড়িয়ে গেলে খুবই সমস্যা হয়, এমনকী যথার্থ উদ্দেশ্যও পূরণ হয় না। ফলে লক্ষ্য সিদ্ধিও ঘটে না। ঘনাদার মুখ দিয়ে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রই একেবারে মজার ছলেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কঙ্কালসার শরীরটিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ঘনাদার কথা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, ভগদত্তকে অসম্মান করেছিল শকুনি পুত্র। তার ওপরে ভগদত্তের চরম শক্তিশালী অস্ত্র বৈষ্ণবাস্ত্রের মশলায় ভেজাল মেশানো হয়েছিল, তারই ফলে সেই অস্ত্র বজ্র হয়ে পড়ার পরিবর্তে মালায় রূপ নেয়। উল্লুক আসলে বাজার থেকে পচা বা খারাপ মশলা এনে দিয়েছিল, যে মশলা থেকে ওই অস্ত্র বানানো হয়েছিল। যার জন্য শেষে বীর ভগদত্ত পরাজিত হয়। ঘনাদা এখানে বলেছে:

ঘনাদা নিজের জিজ্ঞাসার জবাব নিজেই দিলেন, ‘এ ভেষ্টা বৈষ্ণবাস্ত্রের মূলেও দুর্বোধনের সেই ভুল-উল্লুক। তাঁর হাতিদের ন্যায্য খোরাক না দিতে পেরে ভগদত্তের কিছুদিন থেকেই মেজাজটা খুব খারাপ। যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে দেশে ফেরার জন্য তাই তিনি অস্থির। সেই মতলবেই ক-দিন থেকে রোজ তিনি উল্লুককে ক-টা জিনিস আনিয়ে দেবার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। তিনি নিজে হস্তিনার বাজারে জিনিসগুলোর সরেস নমুনা পাননি বলেই অন্য কোনও শহর থেকে সেগুলো আনিয়ে দেবার জন্য উল্লুককে এই ফরমাশ। উল্লুক কিন্তু যেন গা-ই দেয় না তাঁর কথায়। দু-চারটে নমুনা যা এনে তাঁকে দেখিয়েছে ভগদত্ত তা দেখেই হস্তিনার বাজারেরই রদ্দি মাল বলে চিনে বাতিল করলেন। হস্তিনার বাজারে রদ্দি ছাড়া কোনও মাল কেন নেই এই বিষয়েই কোনও সন্দেহ শুধু তাঁর মাথায় আসেনি। সত্যের খাতিরে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে বাজারের সরেস মাল উধাওর ব্যাপারে উল্লুকের কোনও হাত ছিল না। অন্য শহরে গিয়ে সওদা করে আনার দায়টুকু শুধু সে নেয়নি, আর গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত হস্তিনার বাজার থেকে সে রদ্দি মাল এনে দিয়েছে, নিরুপায় হয়ে ভগদত্তকে কাজ সারতে হয়েছে তাই দিয়েই।

সেই জন্যেই বজ্র হয়ে যার নামবার কথা অব্যর্থ সে বৈষ্ণবাস্ত্রের ওই দশা। হাউইট্জার হয়ে ছোট্ট বদলে আকাশে হাউই-এর তারাবাজি।^{২৫}

তবে হস্তিনাপুরে বৈষ্ণবাস্ত্রের জন্য ভালো মানের মশলা না পাওয়ার কারণ হিসাবে ঘনাদা শ্রীকৃষ্ণের কূটনীতিকে দায়ী করেছে, কারণ এমনটা হবে পূর্বেই অনুমান করে বাজার থেকে সমস্ত উৎকৃষ্ট মাল মশলা সরিয়েছে সে। একেবারে পাকা রাজনীতিবিদ ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বের মতো

কাজ এটি আমরা বলতে পারি। বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টিকে পড়া যায়। আজ রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে, কবে এটি শেষ হবে আমরা কেউই জানি না। এদিকে এই যুদ্ধকে হাতিয়ার করে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় তৈল সংস্থাগুলি ভারতকে প্রচুর তেল বিক্রি করছে, কম দামে ভারতও তা কিনতে চাইছে। ইউরোপে রাশিয়ার ক্রুড ওয়েল বিক্রি বন্ধ, কিন্তু বাস্তবে ভারতের মাধ্যমেই সেই তেল ঘুরপথে ইউরোপে বিক্রি হচ্ছে। পৃথিবীর অতীতে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে দুটি বিপরীত পক্ষের মধ্যে সবগুলিকেই উপরের দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া যায়। পৌরাণিক ‘উলুক’ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতেও হারিয়ে যায় নি, এমনকী ভবিষ্যতের কোনও যুদ্ধেও উলুকেরা সমানভাবে সক্রিয় থাকবে।

এই গল্পের অন্য একটি অংশ সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে আমি পড়তে চেয়েছি। বরাবরই কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন এবং সাংস্কৃতিকভাবে এগিয়ে থাকা মানুষেরা প্রান্তিক মানুষদের খাটো ও নিচু দৃষ্টিতে দেখে থাকে, সবাই যে এরকমটা করে তা নয়, কিন্তু অনেক সময় তা আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। গ্রামবাংলা থেকে কলকাতাতে পড়তে আসা বা দিল্লিতে পড়ার সুযোগ পাওয়া ছেলেটি অনেক সময়তেই হয়ে প্রতিপন্ন হয় তারই সহপাঠীদের থেকে। কখনো সেইটি উচ্চারণের ত্রুটির কারণেই হোক বা অন্য কোনও কারণে। উচ্চারণের ত্রুটি বা ভুল বলাটা ঠিক নয়, আসলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের ভাষাতেই কথা বলে, ফলে আমাদের ধারাবাহিক কথাবার্তাতে কিছু অপরিচিত শব্দের টোন বা নতুন শব্দের আগমন হয়, সেইটি তথাকথিত ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা অনেক মানুষেরাই গ্রহণ করতে চায় না। এখানে শকুনির ছেলে উলুক, দুর্যোধনের মামাতো ভাই বলে কথা, সমস্ত কৌরব পক্ষের সৈন্যদের দেখাশোনার ভার তার ওপর দেওয়া হয়েছে, সর্বোপরি হস্তিনাপুরের সঙ্গে সে জড়িত, ফলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাবানদের নিকটাত্মীয় সে। হস্তিনাপুর সেই সময়ের ভারতীয় রাজনীতির প্রধান ক্ষমতার বিন্দু ছিল। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব ভারতের জল ও জঙ্গলের মানুষদের কথাবার্তার ধরন নিয়ে হাসি ঠাট্টা তামাশা শকুনির ছেলে উলুক করেছে। তারই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হল:

কী সব মাল যে এই যুদ্ধের টানে আমদানি হচ্ছে হস্তিনাপুরে! আজ এক চিজ এসেছিলেন আমাদের কৌরবপক্ষকে কৃতার্থ করতে! জিভের এখনও আড়ই ভাঙেনি। সমস্তকে বলে হমস্ত। চোর বলতে বলে চুর, আর সঙ্গে যাদের এনেছে প্রায় অর্ধেক হস্তিনানগরই চাই তাদের থাকার জন্য।... .. উলুক ব্যঙ্গের সুরে বলেছে, ‘ও পূর্বিয়াদের দৌড় আমার খুব জানা আছে! নিজেদের বনজঙ্গলে সবাই ওরা খুব বাহাদুর। এখানে লড়াইয়ের দুটো হাঁক শুনলেই দাঁত ছিরকুটিয়ে ভির্মি যাবে।’^{২৬}

‘শান্তিপর্বে ঘনাদা’ ঘনাদার মহাভারতমূলক গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। গল্পটি ১৯৭৪ সালে শারদীয়া কিশোর ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পের অন্যতম দিক হল- আসলে

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে সারা দেশটি অনাচার, অবিচার ও অর্থের প্রলোভন প্রভৃতিতে একেবারে ভরে গিয়েছিল। সামান্য একটি কাজ উদ্ধার করতে হলে কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত সুবিধা বা অর্থ না দিলে কাজ হতো না। এমনকী যে গণেশের হাত ধরে মহাভারত আমরা পেয়েছি, তার বাহন ইঁদুরও এখন অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা এবং অর্থ লুটে নিয়ে বরাহের আকার ধারণ করেছে। সেই ইঁদুরকে এখন চেনাই ভার। এটা তো আমাদের সমাজেরই একটি চিত্র, লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র একে ঘনাদার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন মাত্র। দেশে যখন অরাজকতা ও অবিচার চলে তখন প্রতীকী চরিত্র ইঁদুরের মতোই অন্য কেউ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়।

মহাভারতের শান্তি পর্বে চার্বাক গুরুত্বপূর্ণ একজন চরিত্র। নাস্তিকতার চর্চায় চার্বাক অন্যতম এক নাম, তবে চার্বাককে ব্যক্তি মানুষ না ধরে একটি প্রতিষ্ঠান ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। মূল মহাভারতে আমরা দেখেছি চার্বাক দ্বারা পুণ্যের কথা বলতে গিয়ে গরীব ব্রাহ্মণের দ্বারা অতিথি সেবার কাজটিকে অধিকতর পুণ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও দেখানো হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের এই বৃহৎ যজ্ঞের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় অবশ্যই সেই হতদরিদ্র ব্রাহ্মণের থেকে কম। কিন্তু ঘনাদার মাধ্যমে এই গল্পে আমরা পেয়েছি আরও একটি বৃহৎ সত্যের পরিচয়। যেখানে দেখতে পাই রাজার চারিদিকে যারা সর্বদাই ভিড় করে থাকে, তারা পরিস্থিতির সুযোগ নেয়, আদতে রাজাকে সর্বদা তোয়াজ ও প্রশংসায় ভরিয়ে রেখে রাজারই সর্বনাশ করে। যুধিষ্ঠিরের ওই যজ্ঞসভায় যে সব ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল, তাদের অধিকাংশই যে রাজার শত্রু সেইটি চার্বাক বুঝিয়ে দিয়েছে। এটিই হল গল্পের মূল বিষয়। এবার গল্পের প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলি। ভেতরের গভীর সত্যটিকে ঘনাদা মজার ছলে উপস্থাপন করেছে, তা পাঠকের কাছে অত্যন্ত রসের ও সরস উপভোগের বিষয়। ঘনাদার মতে শান্তি পর্বের ওই অংশের যেটি থাকার কথা ছিল, তা কোথাও নেই। বিষয়টি হল সিংহাসনে ওঠার আগে চার্বাক মুনি দু'টো প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরকে করেছিল। চার্বাকের জিজ্ঞাসা ছিল- যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের মাপ কত এবং তার শত্রু কারা? স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের মাপ সম্পর্কে যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছিল, কিন্তু শত্রুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে জানায় যে তার কোনও শত্রু নেই। সমস্ত শত্রু যুদ্ধে বিনাশ হয়ে গেছে। উত্তর শুনে চার্বাক জানায় যে দুইটা উত্তরই ভুল। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের মাপ ততটাই যতটা তার নিজের দেহের মাপ এবং তার শত্রুরা তারই চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। একবার গভীরভাবে ভাবলে আমাদের মনে হয় যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদার মাধ্যমে তো আসলে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার কথাই গল্পের ছলে বলেছে। এই কথাটি বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হোক অথবা রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই হোক, সর্বত্রই সত্য। পৌরাণিক রাজাই হোক অথবা একুশ শতকের কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীই হোক; তাদের চারপাশের ব্যক্তি মানুষেরাই তাদের শত্রু। পরিস্থিতি পরিবর্তন হলেই সম্পূর্ণ অন্য চেহারা বদলে যায় এতদিনের পরিচিত মানুষেরা। সেই কারণেই মহাভারতে বারবার

বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে রাজার অন্যতম কর্তব্য হল যে, তিনি তার শত্রুদের সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবহিত থাকবেন। এই জটিল কথাটির সহজ অর্থ ঘনাদা গল্পতে মজার ছলে জানিয়েছে।

ভিড় করা সব বামুন পণ্ডিত সভাসদদের দেখিয়ে চার্বাক বলেছিলেন, ‘এই সব জলৌকাবৃত্তি, মানে জোঁকমার্কী স্তাবকের দল। যদি বা একটু বুঝেবুঝে রাজত্ব চালাতে পারতে, এরা তোমাদের ঘাড়ে চেপে থেকে নির্জলা তোষামোদে সব সুবুদ্ধির গোড়াতেই ঘুণ ধরিয়ে ছাড়বে। কৌরবরা তোমাদের রাজত্ব নিতে চেয়েছিল, আর এরা তোমাদের মনুষ্যত্বই দেবে ঘুচিয়ে।’^{২৭}

‘খাণ্ডবদাহে ঘনাদা’ ১৯৭৬ সালে দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীতে প্রথম বেরিয়েছিল। এখানেও ঘনাদার বক্তব্য হল খাণ্ডব বন জ্বালানোর সময় এমন কিছু হয়েছিল যা মূল মহাভারতে নেই, কিন্তু থাকার কথা ছিল। আসলে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হওয়ার ফলে স্বর্গের অশ্বিনীকুমারদের শরণাপন্ন হয়, তাদের পরামর্শ অনুসারে খাণ্ডব অরণ্য ভোজন করলেই তার এই রোগ সেরে যাবে। মহাভারতে এই কথা জানা যায়, কিন্তু ঘনাদার কথা অনুসারে আমরা জানতে পারি অন্য কথা। অর্জুন আর ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ নাকী ষড় করে। অগ্নিদেব অরণ্য পোড়ানোর কাজ শুরু করলেই, তখন স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র আগুন নেভানোর জন্য বৃষ্টিপাত ঘটাবে। সেই বৃষ্টিকে ঠেকানোর অছিলায় অর্জুন তীর মেরে পবনদেবকে আটকে দেবে, এর ফলে অগ্নিদেবের আগুন আর ছড়াবে না। ফলস্বরূপ অরণ্যের কোনও শুকনো জায়গা খুঁজে নতুন করে আগুন লাগানোর জন্য অগ্নিকে সারাক্ষণ ছোট্টাছুটি করতে হবে। তাতে পশুদের বলসানো মাংস না পাওয়া গেলেও দৌড়ের জন্যই অগ্নির পেটের অসুখ সেরে যাবে। এমনকী কার্যক্ষেত্রেও নাকী তাই হয়েছিল। অর্থাৎ, ঘনাদার নিজের বলা মহাভারত অনুসারে। কৃষ্ণ নাকী বলেছিল যে এই ঘটনা সম্পর্কে মহাভারতে ছোট একটি টীকা থাকবে। কিন্তু, মূল মহাভারতে এরকম কিছুর অস্তিত্ব বাস্তবিকই নেই। এটি না থাকার কারণ সম্পর্কে ঘনাদার কাছে একপ্রকার তথ্য পাওয়া গেছে।

না, দারুণ মূষিক কোম্পানি কি বল্লী বিশারদের কাজ এটা নয়। দোষ তালপাতা জোগান যে দিয়েছিল সেই ব্যাপারীর। গণেশ ঠাকুরকে যেসব তালপাতার জোগান দেওয়া হয়েছিল তার কিছু ছিল রীতিমতো পুরনো, ঘুন-ধরা, মুচমুচে। পুঁথির রাশ নাড়াচাড়ার সময় তার খাস্তা হয়ে যাওয়া একটা টুকরো কখন কোথায় খসে পড়েছে কেউ টেরই পায়নি। টীকাটুকু ওখানেই ছিল।^{২৮}

‘ঘনাদার শল্য সমাচার’ গল্প আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মামা ও ভাগ্নের মধ্যে সম্পর্কটি প্রকৃতপক্ষেই কতটা আবেগের এবং ভালোবাসার। সেই আবেগকে কাজে লাগিয়েই শল্যকে বধ করা হয়েছিল। শল্য ছিল অসাধারণ যোদ্ধা এবং ক্ষিপ্রহস্ত। কিন্তু যুদ্ধতে কূটনীতি জয় ও পরাজয়ে বড়ো ভূমিকা রাখে। সেই বীর শল্যকে হত্যা করার জন্যই নকুল এবং সহদেবকে

সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির চক্রব্যূহ রচনা করে। তাই তার বধের আগে ঘনাদা মেসের সদস্যদের শুনিয়েছে:

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে,
দুর্জয় দেখি যে শল্য আজিকার রণে
হারিলে কি গতি হবে, পাব মহারাজ
এইমত ভাবি তবে কহে ধর্মরাজ!
চক্রব্যূহ করি মোরে দোঁহে বল রাখো।
সহদেব ও নকুল মম বামে থাকো।^{২৯}

আসলে নকুল এবং সহদেব দুপাশে ছিল, বামদিকে নয়। শল্য যখন বাম হাত দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রুখে দিচ্ছে, তখনই আবার অন্যদিকে অপর হাত দিয়ে পাণ্ডব সৈন্য সামন্ত ছারখার করছে। সেই সময় মামা শল্যকে নিরস্ত্র করতে এবং যুদ্ধ থেকে আপাতত মনের সংযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য ছলনা করে ‘মামা! মামা গো!’ বলে আতর্জনাদ করে ওঠে। এটির ফলে স্বাভাবিকভাবেই মামার দুর্বলতা ভাঙ্গোদের প্রতি দেখা যাবে। মামার মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ তাদের শরীরে খুব গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। পাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা সফল হয়, অর্থাৎ ঘনাদার মহাভারত অনুসারে। ভাঙ্গোদের কী হল এইটি দেখতে গিয়ে যথেষ্টই আনমনা হয়ে পড়েছিল শল্য এবং এই অবসরেই যুধিষ্ঠিরের তীর গিয়ে শল্যের বুকে বিঁধে যায়। শল্য বধের এই বিবরণ নাকী পণ্ডিতদের হাতে এখনো পৌঁছায় নি। মামা ও ভাঙ্গোর মধ্যে যে আঁতের সম্পর্ক থাকে, তা সমকালীন যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে ঘনাদা তার গল্পে বলেছে:

শল্য যুধিষ্ঠির নিয়ে সব পাণ্ডবেরই মামা, কিন্তু হাজার হলেও নকুল সহদেব হল তাঁর নিজের মায়ের পেটের বোন মাদ্রীর ছেলে, তাই টানটা যদি তাদের ওপর একটু বেশি হয়, সেটা অন্যায় নয়। নকুল সহদেবের আতর্জনে তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেছেন শল্য আর সেই ফাঁকে যুধিষ্ঠিরের তীর গিয়ে বিঁধেছে তাঁর বুকে। যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারও সঙ্গে যুদ্ধ হলে নকুল সহদেবের ওই নকল আতর্জনাদকে শল্য কখনও সত্যি বলে ভেবে অন্যমনস্ক হতেন না। শল্যকে এই ভুল করাবার জন্যই যুধিষ্ঠিরকে এ যুদ্ধে নামাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অত পীড়াপীড়ি। নকুল সহদেবের আতর্জনাদও অবশ্য তাঁরই শেখানো, আর সেটা যুধিষ্ঠিরের অজান্তে।^{৩০}

প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাভারতকে নিয়ে এই আটটি গল্পকেই লিখেছিলেন। এর মধ্যে প্রায় সবকটি গল্পই অসাধারণ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ এবং সমস্ত বয়সের পাঠকদের জন্য রসে ভরপুর। ফলে বাঙালি গল্পগুলি কম উপভোগ করে না। মহাভারতকে প্রচলিত পাঠের বিপরীতে অন্য এক রূপ

দিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পগুলির মাধ্যমে। রসের আনন্দের পাশাপাশি গল্পগুলিকে সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়েও পাঠকেরা পড়তে পারে।

২.৪।। সুবোধ ঘোষ- ভারত প্রেমকথা

সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০) জন্ম হাজারিবাগে। আদি নিবাস বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে মূলত হাজারিবাগ অঞ্চলেই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ গল্প তিনি লিখেছিলেন। তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাস পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে। তাঁর রচিত *ভারত প্রেমকথা* নিয়েই এখন আমরা কথা বলব, আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় এটি। বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চায় যে সমস্ত গল্পকারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ একেবারে প্রথম সারিতে থাকবেন। ভারত প্রেমকথা-র মধ্যে কুড়িটি গল্প স্থান পেয়েছে, যেগুলির প্রত্যেকটিই কিন্তু মহাভারতের কোনও এক আখ্যানের নায়ক ও নায়িকাদের নিয়েই তিনি লিখেছেন। তবে বলা বাহুল্য, মহাভারতের আখ্যানগুলিকে নতুন যুগ ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়েছেন তিনি। ফলে তার চরিত্ররা এবং গল্পের বিষয়বস্তুও অনেক বেশি মানবিক ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। কুড়িটি গল্প ছিল- পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা, সুমুখ ও গুণকেশী, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, অতিরথ ও পিঙ্গলা, মন্দপাল ও লপিতা, উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী, সংবরণ ও তপতী, ভাস্কর ও পৃথা, অগ্নি ও স্বাহা, বসুরাজ ও গিরিকা, গালব ও মাধবী, রুরু ও প্রমদ্বরা, অনল ও ভাস্বতী, ভৃগু ও পুলোমা, চ্যবন ও সুকন্যা, জরৎকারু ও অস্তিকা, জনক ও সুলভা, দেবশর্মা ও রুচি, অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, ইন্দ্র ও শ্রবাবতী। মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই প্রেম কাহিনিগুলি। সেই প্রেম মানবিক হয়েও স্বর্গীয়, বেদনাক্ত হয়েও আনন্দময়, বিচ্ছেদে মলিন হয়েও মিলনে মধুর। বিচিত্র, সুন্দর এবং স্বমহিম সেই আখ্যানগুলিকে আধুনিক আঙ্গিকে, অসাধারণ ভাষায় এবং অনন্য বিশ্লেষণে নতুন করে সাজিয়েছেন গল্পকার ঘোষ। আমরা এখন এই কুড়িটি গল্পকে নিয়েই আলোচনা করব।

সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা* আসলে আধুনিক হয়েও তার মধ্যে কিন্তু যথেষ্টই ক্লাসিক্যাল রসও বিদ্যমান আছে। আসলে প্রাচীন সাহিত্যে অসংখ্য গুণ থাকলেও তাতে এমন কিছু অভাব থাকে যাতে আধুনিক মনন সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি পায় না। আধুনিক মন বাস্তবিক রূপেই সাহিত্যে আধুনিক রস সন্ধান করতে চায়। এই সন্ধানের সূত্র ধরেই প্রত্যেক যুগ নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে। এই সবই সত্য। কিন্তু আবার প্রাচীন সাহিত্যের অংশে এমন কিছু সর্বজনীনতা আছে যার ফলে প্রত্যেক যুগ তার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়। দু'ভাবে এটি ঘটতে পারে। পুরাতনের নতুন ভাষ্য রচনা করে মানুষের মন তৃপ্তি পেতে পারে। আবার ক্লাসিক সাহিত্য আধুনিক ভাষায় পানীয় জোগাতেও পারে। তাই নতুন ভাষ্য রচনা না করে, নতুন যুগের উপযোগী করে রচনা করা।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পতিতা’ কবিতা, কবিগুরুর সৃষ্টি *চিত্রাঙ্গদা* কাব্য নাট্যের কথাও এক্ষেত্রে বলা যায়।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী *ভারত প্রেমকথা*-র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন:

বলা বাহুল্য, শিল্পদৃষ্টির বলে সুবোধবাবু বুঝিয়াছেন যে, প্রাচীনের অনুকরণ করিলে চলিবে না, প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিতে হইবে। মনে রাখা উচিত যে, ঐতিহ্যবিরহিত হইলেই সার্থকসৃষ্টি হয় না। সার্থক শিল্পসৃষ্টির মূলে দু’টি স্বতোবিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক, ট্রাডিশন ও ফ্রিডম, সংস্কার ও স্বাধীনতা। ভারত প্রেমকথার গল্পগুলিতে স্বাধীনতা ও সংস্কারের অতি অপূর্ব মিলন হইয়াছে, আর সেই জন্যই এই প্রেমকথাগুলি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।^{৩১}

আবার গল্পকার *ভারত প্রেমকথা* বইটির মুখবন্ধ অংশে নিজের গল্পগুলির সম্পর্কে চমৎকার কথা বলেছেন:

আদিযুগ আর নবতম যুগ, রূপের দিক দিয়ে এই দুয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এই ভিন্নতা নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ নয়। নবতমের মধ্যে হোক, আর পুরাতনের মধ্যে হোক, শিল্পীর মন সেই এক চিরন্তনেরই রূপের পরিচয় অন্বেষণ ক’রে থাকে। শিল্পীর সাধনা হল নতুন ক’রে পাওয়ার সাধনা। শুধু পথ চাওয়াতেই আর চলাতেই শিল্পীর আনন্দ হয়, নতুন ক’রে পাওয়ার আনন্দও শিল্পীর আনন্দ। আদিযুগের রূপকে এই জগতে আর একবার পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু আদিযুগের রূপকে নতুন ক’রে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিল্পী ছাড়তে পারেন না। কারণ, সেই পুরাতনের রূপের সঙ্গে একটি অখণ্ড আত্মীয়তার ডোরে বাঁধা রয়েছে নবতম যুগের মানুষেরও জীবনের রূপ।^{৩২}

মহাভারতের মূলকাহিনী ছাড়া আরও এমন এমন শত শত উপাখ্যানে এই গ্রন্থ আকীর্ণ যার মূল্য সহস্র বৎসরের প্রাচীনতার প্রকোপেও মিথ্যা হয়ে যায়নি। কারণ, ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি। নর-নারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন বাৎসল্য ও সখ্য— শ্রদ্ধা ভক্তি ক্ষমা ও আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে-সব সংস্কারের উপর সামাজিক কল্যাণ সৌষ্ঠব মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা এইসব উপাখ্যানের নায়ক নায়িকার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-সব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর যে-কোনও মানুষ তাঁর নিজের জীবনেরও সমস্যার অথবা আগ্রহের রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণে শতক যুগের কবিদল মহাভারত থেকে তাঁদের রচনার আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন।^{৩৩}

বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর কবিতাগুলি প্রেমের পরাকাষ্ঠা হিসাবে ধরা হয়। যেখানে নারীর প্রেমের ঐকান্তিক আকুতি বারবার প্রকাশিত হয়েছে। তবে ‘ভারত প্রেমকথা’-র গল্পগুলিতে

পুরুষের প্রেমের অনুভূতিও বেশ প্রকট রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এরকম একটি কাহিনি ‘বসুরাজ ও গিরিকা’। মহাভারতে স্থান পাওয়া উপরিচর বসু’র অপর নাম বসুরাজ। তার রাজধানীর কাছে শুভিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামক একটি পাহাড় চরম কামে পড়ে ওই নদীর পথ আটকে দিলে উপরিচর বসু নিজের পা দ্বারা কোলাহল পাহাড়কে বিদীর্ণ করে, এর ফলে গর্ভবতী নদী যাওয়ার পথ পায়। পরে এই কোলাহল পাহাড়ের ঔরসেই নদীটির গর্ভে দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান এবং অন্যটি কন্যা সন্তান। নদীটি রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ সন্তান দু’টিকে রাজাকে প্রদান করে। রাজা যথার্থ যত্নের সঙ্গে সন্তান দু’টিকে মানুষও করে। পরবর্তী সময়ে পুত্র সন্তানকে নিজের সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করে এবং গিরিকাকে নিজের স্ত্রী করে উপরিচর বসু। তবে মহাভারতের এই কাহিনি সুবোধ ঘোষ মহাশয়ের গল্পে হাজির হয়েছে অনেকটা আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে দিয়ে। মহাভারতের মতো সহজ সরল রেখায় আখ্যান এখানে এগিয়ে যায়নি। মহাভারতের ধার্মিক রাজা বসুরাজ এখানে রাজা হওয়া সত্ত্বেও একজন উত্তম প্রেমিক মানুষ। শুভিমতী গল্পে একজন যুবতী নারী, যে কোলাহলের লালসার নানাভাবে শিকার হয়েছে। ধার্মিক রাজা বসুরাজ নিজে কোলাহলে’র হাত থেকে শুভিমতীকে বাঁচালেও নিজের রাজ্যে তাকে বসবাসের অনুমতি দেয়নি। কিন্তু শুভিমতী তার গর্ভের সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে চায়। সন্তানকে বড়ো করতে চায় পৃথিবীর মাটি জল হাওয়ার মধ্যেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী এই নারী হার মেনে যায় বসুরাজের কাছে। অনেক প্রতিবাদ ও অনুনয়ের পরেও রাজা গর্ভের অনাগত সন্তানকে না মেনে নিলে শুভিমতী অন্যত্র চলে যায়। শেষ পর্যন্ত অনেকদিন পরে রাজা এক রূপবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়, প্রাথমিক কথাবার্তার পর কন্যার পরিচয় রাজার কাছে প্রকট হয়। রাজা জানতে পারে গিরিকা নামক এই কন্যার মা হল সেই শুভিমতী। এরপর গিরিকার প্রেমে মোহিত হয়ে সমস্ত রাজকার্য ও রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্ব রাজা ভুলে যায়। অবশেষে রাজা এই গিরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত ন্যায়-অন্যায়কে দূরে সরিয়ে রেখে তার প্রতি প্রেম ও প্রণয়কেই সত্য বলে মেনে নেয়। এভাবেই গল্পকার সুবোধ ঘোষের হাত ধরে রাজার কঠিন কঠোর প্রতিমূর্তি শেষে এসে ভেঙে গেছে। একদিকে ধর্মিতার প্রতি কঠোর নীতিবোধ এবং অন্যদিকে প্রেমের কাছে নিজের হৃদয়কে সমর্পণ-রাজার চরিত্রের এই দ্বন্দ্বপূর্ণ বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে পিতৃতন্ত্রের উপর সুবোধ ঘোষ কটাক্ষ করেছেন। মহাভারতের নদীকে গল্পে রক্তমাংসের নারীতে রূপ দিয়েছেন গল্পকার।

‘অতিরথ ও পিঙ্গলা’র গল্পে প্রেম যেন তপস্যায় পরিণত হয়েছে। সমস্ত ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে বাঞ্ছিত পুরুষকে পেতে চায় এক নারী। বহুগামিনী বারবনিতা এবং প্রেমময়ী নারীর মাঝে ফাঁকটি গল্পকার এই আখ্যানে পূর্ণ করে দিয়েছেন। পিঙ্গলা নামে এক অতি পরিচিত বারবনিতা বা গণিকার কথা আমরা পুরাণে পাই। ঋষভ মুনির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের ফলে পরজন্মে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মেয়ে কীর্তিমালিনী হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ভদ্রায়ুর সঙ্গে বিবাহ হয়।

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এই চরিত্রের এক অনবদ্য কল্পিত কাহিনি গল্পকার সুবোধ ঘোষ রচনা করেন।

রাজাদের রাজমহলে প্রতিনিয়তই নাচ ও গানের আসর বসে থাকে। এরকমই কোনও একদিন সন্ধ্যায় পিঙ্গলা রাজমহলে রাজার মনোরঞ্জননের জন্য এসেছিল। রাজধানীর শ্রেষ্ঠ রূপসী ও বারাজনা পিঙ্গলাকে দেখে রাজা অতিরথের মানসিক ও শারীরিক কোনও পরিবর্তনই দেখা যায় না। পৃথিবীর কোনও তৃষ্ণাই যেন তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনকী সুন্দরী নারীর প্রতি মোহ না থাকার কারণে স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ পেলেও অতিরথ যায় না। কিন্তু এদিকে পিঙ্গলা রাজাকে তার প্রণয় রসে ডুবিয়ে রাখতে এবং প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ করাতেও চায়। শেষ পর্যন্ত নাচ গানের শেষে রাজা পিঙ্গলাকে পুরস্কৃত করতে চাইলে পিঙ্গলা প্রার্থনা করে— ‘আমার সঙ্কেত কুঞ্জে একদিন আসবেন, এই পুরস্কার চাই, আর কিছু চাই না নৃপতি অতিরথ’। সামান্য এক গণিকার এই উজ্জিক্ত স্পর্ধা হিসাবেই রাজা ধরেছে। ফলস্বরূপ পিঙ্গলার দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষার কোনও মূল্য রাজা দেয়নি। প্রেমিকা পিঙ্গলার হৃদয় এরপর ধীরে ধীরে তপস্বিনীতে পরিণত হয়ে যায়। কিছু মাস পর রাজা জানতে পারে সেই বারবনিতা পিঙ্গলা রয়েছে সপ্তপর্ণ অরণ্যে। শেষ পর্যন্ত পিঙ্গলার অপেক্ষা সার্থক হয়, দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাজা অতিরথ হাজির হয় পিঙ্গলার সম্মুখে। সুদীর্ঘ সময় পর অতিরথের হৃদয়ে জেগেছে প্রেমের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা। তাই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর সে এসেছে পিঙ্গলার কাছে শেষ সংগীত শোনার জন্য। পৃথিবীর কোনও তৃষ্ণাই যাকে স্পর্শ করতে পারে না সেই অতিরথ এসেছে পিঙ্গলাকে তার প্রেমের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিতে। এরপরে পিঙ্গলার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় এক অনবদ্য সুমদ্রিত সংগীত। এভাবেই গণিকা পিঙ্গলার নিষ্ঠাপূর্ণ প্রেম রাজা অতিরথকে বিপথে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সমাজে বারবনিতার মর্যাদা পাওয়া একজন নারী কীভাবে নিজের প্রেম ও তপস্যায় কাম্য পুরুষকে পেয়েছে তারই একটি আখ্যান গল্পকার সুবোধ ঘোষের এই গল্পে পাই।

‘সুমুখ ও গুণকেশী’র আখ্যান সুবোধ ঘোষের এক অসাধারণ সৃষ্টি। এখানে দেখতে পাই যে নারী তার হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত মানুষকে লাভ করার জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। তবে নর-নারীর বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্কের প্রেম এই গল্পের মূল বিষয় নয়, বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে নর-নারীর সম্পর্কে প্রণয় মহিমার অন্বেষণই আখ্যানটির প্রধান বিষয়। গুণকেশীর পিতা কন্যার জন্য পাত্র হিসাবে গরুড়ের শত্রু সুমুখকে নির্বাচন করলে বড়ো সমস্যা দেখা দেয়। বিয়ের পর জানা যায় ঠিক এক মাস পর সুমুখকে গরুড় মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত নারদের সাহায্যে ইন্দ্রের কাছে গেলে ইন্দ্র সুমুখকে বর প্রদান করে এবং তাদের দাম্পত্য জীবনকে রক্ষাও করেন। এই কাহিনি থেকে রসদ সংগ্রহ করে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কটিকে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। নাগ বংশের পুরুষ হল সুমুখ। স্বাভাবিকভাবেই নাগদের সঙ্গে গরুড়ের বিরোধ সবারই

জানা। এদিকে সুমুখের অমর হওয়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল। সেদিক থেকেই সে ভেবেছে দেবরাজ ইন্ড্রের বন্ধু মাতলি নিশ্চয়ই তাকে অমৃত লাভে সাহায্য করবে। বলা বাহুল্য, গুণকেশীর সঙ্গে তার বিবাহে সম্মত হওয়ার পেছনেও এই অমৃত লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুমুখকে প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল গুণকেশী। মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে গুণকেশী। যথার্থ প্রেমিকার মতো তার প্রেমিককে জানিয়েছে যে, জীবনের আয়ু কম বা বেশি যাই হোক, সুমুখই তার জীবনের প্রেমিক পুরুষ। মৃত্যু যদি আসে তাহলেও সেই মুহূর্তটিকে মধুর করে দিতে চায় প্রেমিকা গুণকেশী। কিন্তু তার এই সমস্ত কথা সুমুখকে কিছু মাত্র প্রভাবিত করে নি। গুণকেশী জানিয়েছে যে, ব্যক্তি সুমুখকে সে ভালোবেসেছে, সুমুখের অমরতাকে নয়।

এদিকে সুমুখের হৃদয়ে মৃত্যু এসে হাজির হয়। গুণকেশী তার প্রেমপূর্ণ হৃদয় দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী প্রেমিকের শেষ যাত্রাকে মধুর করে দিতে চাইছে। ভারতীয় পুরাণের ‘অমৃত’ সম্পর্কিত ধারণাটি গল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। সুমুখ বুঝতে পেরেছে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তকে মধুর করে দিতে পারে, এমন বস্তুর নামই আসলে অমৃত। গল্পে নায়কের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা যেন মানুষের মহৎ কোনও বিশাল আশার প্রতীক। গল্পের শেষে সুমুখের উপলব্ধি হয় যে নশ্বর মানবজীবনে একমাত্র প্রেম ও ভালোবাসাই দিতে পারে অমরত্বের আশ্বাদ।

‘দেবশর্মা ও রুচি’ ভারত প্রেমকথা’র অন্যতম একটি গল্প। নারীর বিবাহ পরবর্তী প্রেমই মূলত এই গল্পে উঠে এসেছে। মহাভারতের কাহিনিকে আশ্রয় করেই সুবোধ ঘোষ নর-নারীর প্রেম-অপ্রেমের ছবি এঁকেছেন তাঁর গল্পে। পুরাণের গল্প ছিল অনেকটা এরকম। ঋষি দেবশর্মার স্ত্রী ছিল রুচি, যে বাস্তবিকই অসাধারণ সুন্দরী। ফলস্বরূপ অন্যান্য অনেকেই চরম আকর্ষণ অনুভব করত রুচির উপরে। এরপর একদিন ঋষি অন্যত্র গেলে শিষ্য বিপুলকে তার স্ত্রীর দেখাশোনার জন্য রেখে যায়। কিন্তু দেবরাজ ইন্ড্র এই সুযোগে আশ্রমে এসে রুচির সঙ্গে একটি রাত কাটাবার প্রস্তাব দেয়। রুচি প্রস্তাবে রাজি হলেও, শিষ্য বিপুলের সতর্কতায় শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে না। ভারতীয় পুরাণে দেখতে পাই রুচির রূপে সমস্ত পুরুষ যেখানে মোহিত হয়ে যায়, ঠিক সেখানেই আধুনিক লেখকের দৃষ্টিতে উঠে আসে দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার কারণ। তাই গল্পে দেখতে পাই রুচি স্বামী দেবশর্মাকে ভালোবাসে না, দেবশর্মাও সেইটি বুঝতে পারে। রুচি প্রেমকে রূপ ও যৌবনের উৎসব হিসাবে মনে করে। যৌনতায় পরিতৃপ্তি ছাড়া পুরুষের থেকে অন্য কিছু চায় না সে। অথচ, একজন পুরুষের রূপ ও যৌবনের যে সমস্ত গুণাবলীগুলি নারীকে পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি দিতে পারে, তাতে দেবশর্মার অভাব রয়েছে। কিন্তু দেবশর্মা আবার রুচিকে প্রেমের বন্ধনে নিজের কাছে রাখতে ইচ্ছুক। তাই পরপুরুষের প্রতি রুচির আকর্ষণ আছে জেনেও ঋষি দেবশর্মা তাকে ছেড়ে দেয়নি। ঋষি অন্যত্র যজ্ঞ করতে যাওয়ার সময় ইন্ড্র আশ্রমে এলে ঋষির শিষ্য বিপুল পথ রোধ করে দাঁড়ায়। রুচির অভিশাপে বিপুল দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর

গুরুর আদেশ স্মরণ করে নিজের দেহে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এনে রুচিকে মুগ্ধ করে সে। কামনায় পড়ে রুচিও বিপুলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। গুরুর আদেশ পালনে বিপুলের এই ছলনা রুচি জানতেও পারে না। কামের ফাঁদে পড়ে নারী শুধুমাত্র দৈহিক সুখেই আবদ্ধ থাকতে চায়। এদিকে বিপুলের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র অপমানিত হয়ে চলে গেলে রুচির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিপুল। একজন পুরুষের মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট রুচির হৃদয় কামনা করে বিপুলের থেকে দিব্যগন্ধ চম্পক পাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে যজ্ঞ থেকে ঋষি দেবশর্মা ফিরে আসে। রুচি নিজের বাসনা গোপন রেখে স্বামীর থেকেই চম্পক প্রার্থনা করে। কিন্তু ঋষি দেবশর্মা রুচি ও বিপুলের মনের বাসনা বুঝতে পারে। তাই বিপুলকেই চম্পক আনার জন্য আদেশ করে। গুরুর আদেশে দিব্যগন্ধ চম্পক রুচির হাতে তুলে দেওয়ার সময় সে প্রকাশ করে নিজের ছলনার কথা। এরপর কঠিন সত্যের মুখে পড়ে রুচির যাবতীয় মোহ ক্রমশ দূর হতে থাকে। রুচি বুঝতে পারে তার প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীই তার প্রতি সহৃদয়। আখ্যানের শেষে এসে রুচি বুঝতে পারে দেহজ সম্পর্ক এবং পরপুরুষের প্রতি মোহ প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। দেহাতীত প্রেমই পারে দাম্পত্য জীবনকে আরও মোহময় করে তুলতে।

মহাভারতে পুরুষের প্রেম মুগ্ধতায় পরিণত হয়েছে এমন একটি আখ্যান হল ‘চ্যবন ও সুকন্যা’র গল্প। যদিও ‘পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা’র আখ্যানটিও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেমের মুগ্ধতার কথাও বলে। গল্পকার সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা* বইটির গল্পগুলির মধ্যে ‘পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা’ গল্পটি অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের। বিষয়টিকে পরবর্তী স্থানে যথাযথভাবে আমরা আলোচনা করব। এখন চ্যবন ও সুকন্যা’র প্রসঙ্গে আমরা ফিরে আসি। যদিও পৌরাণিক কাহিনিটির সঙ্গে গল্পকার সুবোধ ঘোষের আখ্যানের অনেকটাই পার্থক্য আছে। প্রথমে পৌরাণিক কাহিনিটি আমরা একটু বলি। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন দীর্ঘ সময় ধরে তপস্যায় রত থাকার ফলে তার দেহে বল্লীক, পিপীলিকা এবং লতায় আবৃত হয়ে যায়। পরবর্তী কালে সেই বনে রাজা শর্যাতি সপরিবার ভ্রমণে এলে চ্যবন সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়। তাকে তপস্বী অল্প আওয়াজে বা ক্ষীণ স্বরে ডাকও দেয়। এরই ফলে সুকন্যা কৌতূহলের বশে বল্লীক স্তূপের উপরে ভেসে ওঠা চোখ দু’টিকে কাঁটায় বিদ্ধ করে। প্রবল যন্ত্রণায় চ্যবন রাজার রাজ্যের অনিষ্টসাধনের অভিশাপ দেয়। পরে রাজা শর্যাতি তার অপরাধ ক্ষমা করার কথা জানালে চ্যবন রাজার কন্যা সুকন্যাকে লাভ করার ইচ্ছা জানায়। রাজাও বাধ্য হয়েই সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে দান করে। পরবর্তী সময়ে সুন্দরী সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে অশ্বিনী কুমারেরা তাকে পেতে চাইলে, সুকন্যা জানায় সে বিবাহিত এবং স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। অশ্বিনীকুমারেরা চিকিৎসার দ্বারা চ্যবনের রূপ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। কিন্তু সুকন্যার সামনে একটি শর্ত রাখে তারা। জরামুক্ত হওয়ার পর সুকন্যার সামনে তারা তিনজনেই এসে দাঁড়াবে। তার মধ্যে থেকে একজনকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে সুকন্যা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চ্যবনকেই চিনতে পারে সুকন্যা এবং তাকেই স্বামী হিসেবে বরণ করে। পৌরাণিক এই ঘটনাটিকেই

আধুনিকতার ছোঁয়ায় রূপ দিয়েছেন গল্পকার ঘোষ। মহাভারতীয় আখ্যান এখানে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে।

মহাভারতীয় কাহিনিতে হৃদয়ের কোনও স্থান আমরা পাই না। পরিবর্তে কেবলই শর্ত আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু গল্পকার ঘোষের গল্পে প্রথম থেকেই চ্যবন একজন যথার্থ প্রেমিক। রাজকন্যা সুকন্যা'র রূপে তিনি মুগ্ধ। কিন্তু সুকন্যা রোগে আক্রান্ত তপস্বী চ্যবনকে ঘৃণা করে। উল্টোদিকে তপস্বী তার দেহ মন প্রাণ দিয়ে সুকন্যাকে ভালবাসতে চায়। সুকন্যা তার রূপের অহংকারে চ্যবনকে ঘৃণা করে চলে গেলে চ্যবনের চোখে সেই মুহূর্তেই যেন কাঁটা বিঁধে যায়। গল্পকার ঘোষের গল্পে তপস্বীর চোখে কন্টক বিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেমে প্রত্যাখ্যান এবং স্বীকৃতি না পাওয়াই এখানে কন্টক বিদ্ধ হওয়ার সমতুল্য হিসাবে ধরা হয়েছে। এদিকে চ্যবনের অভিশাপ শর্যাতির দর্প চূর্ণ করেছে। পিতার সম্মান রাখার জন্য কন্যাও চ্যবনকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু সুকন্যার বৈবাহিক সম্পর্কে সুখ ও তৃপ্তি ছিল না। শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যই স্বামী চ্যবনের সেবা করে সে গিয়েছে। কিন্তু একদিন প্রেমের ঝুলি নিয়ে অশ্বিনী কুমার রেবন্তের আগমন ঘটে। সে জানায় সুকন্যার বিপুল যৌবনভার বুকে ধারণ করবার তৃষ্ণা নিয়ে সে এসেছে। তৃপ্তিহীন দাম্পত্য সম্পর্কে এই কথা সুকন্যার মনের গভীরে জোয়ার আনলেও পরবর্তীতে চ্যবনের প্রতিই সে গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। রেবন্তের মুখে চ্যবনের প্রতি ঘৃণ্য বাক্য শুনে সুকন্যার হৃদয় কেঁপে ওঠে। রেবন্তকে প্রত্যাখ্যান করলেও তার মুখের মধুর বাক্য দিয়ে সুকন্যাকে সে মোহিত করে রাখে। রেবন্ত জানায় যে রোগ ও জরা অপহরণের জ্ঞান তার আছে। শুধুমাত্র একটি শর্তে চ্যবনের রোগ মুক্তির উপায় রেবন্ত সুকন্যার সামনে রাখে। রেবন্ত জানায় যে যৌবনকান্তি ফিরে আসার পর যার মুখের দিকে তাকিয়ে সুকন্যার প্রাণ মুগ্ধ হবে, তারই গলায় বরমাল্য অর্পণ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সুকন্যা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চ্যবনকেই বেছে নেয় সুকন্যা। তার চোখে বেদনাতুর দীপ্তি দেখে সুকন্যার সমস্ত ক্রোধ ও অহংকার দূরে সরে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠত্বই প্রধান বিষয়। তাই এই গল্পে নারী ও পুরুষের প্রেম একেবারেই দেহাতীত। প্রাথমিক অবস্থায় দেহজ কামনা বাসনার প্রতি মোহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত দৈহিক জৈবতাকে অতিক্রম করে দেহাতীত প্রেমই শ্রেষ্ঠ হিসাবে উঠে এসেছে। তাই চ্যবনের দৈহিক সৌন্দর্য নয়, তার হৃদয়ের উৎসারিত প্রেমকেই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছে সুকন্যা।

ভারতীয় সাহিত্যে এভাবেই দেহাতীত প্রেমকে বারবার শ্রেষ্ঠ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য; ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথ থেকে সুবোধ ঘোষের ভারত প্রেমকথা-র গল্পগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। গল্পকার লিখেছেন:

ক্রোধজ্বালা নয়, অবহেলা নয়, অহংকার নয়, দুঃসহ ব্যথায় বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে সুন্দরতনু ঋষিযুবা চ্যবনের চক্ষু। যেন এক হতাশ ও অসহায়ের দৃষ্টি। এতদিন পরে তাঁরই শান্তিনিঃসারী দুই গুরু চক্ষুর কঠোর শাসনে নিগৃহীতা নারীর উপর তাঁর সকল অধিকার একটি পুষ্পমাল্যের প্রতিহিংসার জ্বালায় ভস্মসাৎ হয়ে যাবে, সেই শান্তি নীরবে সহ্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন চ্যবন। কিন্তু সুকন্যা যেন এক অকল্প্য দৃশ্য দেখছে; বিস্ময়াভিভূত অন্তরের উল্লাস সংযত করে ব্যথিত নয়নে চ্যবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একই তরুর দুই পুষ্পের মত দুই সমানসুন্দর রূপ; কিন্তু একজনের নয়নে হর্ষ, আর একজনের নয়নে বেদনা। রেবন্তের সুস্মিত নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়ন মুগ্ধ হয় সুকন্যার, কিন্তু চ্যবনের ব্যথিত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় সুকন্যার হৃদয়।^{৩৪}

মহাভারতে কথিত সূর্যভক্ত এক রাজা সংবরণ চরিত্রকে পরিবর্তিত করে তার মধ্যে পুরুষের আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার ঘোষ। নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যাবতীয় কর্তব্য ও আদর্শকে বিসর্জন দিতেও দ্বিতীয়বার ভাবে না সংবরণ। পৌরাণিক আখ্যান থেকে জানা যায় রূপ ও গুণে সমৃদ্ধ রাজা সংবরণ, একবার মৃগয়াতে গিয়ে সূর্যকন্যা তপতীর রূপে মুগ্ধ হয় রাজা সংবরণ। সূর্য নিজেও কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজছিল। ইতিমধ্যে সংবরণের মধ্যে সমস্ত গুণের সমাহার থাকার জন্য তাকেই নিজের প্রিয় কন্যাকে দান করে। উপযুক্ত সুন্দরী রমণী লাভ করে সংবরণ রাজকার্য অমাত্যের ওপর অর্পণ করে পাহাড়ে দীর্ঘ বারো বছর সময় কাটায়। এর ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনায় নানা অসুবিধার ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। রাজ্যে খরা নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত ঋষি বশিষ্ঠ নিজে গিয়ে সংবরণকে ফিরিয়ে আনলে রাজ্যে বৃষ্টি নেমে আসে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সুদীর্ঘ বারো বছর যজ্ঞ করে সে। ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে রাষ্ট্রকল্যাণের এক দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে এই আখ্যানে। তবে পৌরাণিক এই আখ্যান সুবোধ ঘোষের গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে নতুনভাবে, চরিত্রগুলি এখানে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের গল্পে সংবরণ একজন যথার্থ প্রেমিক। প্রথম দর্শনে চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে একটি আদর্শ যা ‘সমদর্শিতার নীতি’ নামে পরিচিত। এই নীতির প্রধান গুরু সূর্যদেব। তারই শিষ্য সংবরণ। কন্যা তপতীও পিতার এই আদর্শকেই জীবনে বড়ো হিসাবে স্থান দিয়েছে। কিন্তু সংবরণের মধ্যে শিক্ষার এক ত্রুটি দেখতে পায় সূর্যদেব। সংবরণের তারুণ্য যেন বৈরাগ্যের নয়, তাকে সংসারী হতে হবে। অথচ সংবরণ বিশ্বাস করে যে বিবাহ তাকে তার সমদর্শিতা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তাই সংসারের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে চায় না সে। সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় সংবরণ। অতঃপর একদিন তপোবনে সূর্যকন্যা তপতীর রূপে মুগ্ধ হয় সংবরণ। যাবতীয় কামনা বাসনায় পতিত হয়ে তপতীকে পেতে সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তার পূর্বের সমস্ত নীতি ও আদর্শ ভুলে যায় সে। ঋষি বশিষ্ঠের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ে হয় এবং সূর্যদেবও প্রীত হয়। কিন্তু বিবাহের অল্প দিন পরেই ঋষি জানতে পারে সংবরণ তপতীকে

নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব এখন অমাত্যের উপর রয়েছে। সমদর্শী নীতিতে বিশ্বাসী রাজা সংবরণ শুধুমাত্র নারী প্রেমের কাছেই সমস্ত আদর্শকে বিলিয়ে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তপতীর সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ায় রত থাকছে সে। প্রবৃত্তির হাতে যেন খেলনায় পরিণত হয়েছে সে, ঋষিদের উপস্থিতিকে একসময় উপেক্ষাও করে সে। সংবরণের এই ক্রটি বুঝতে পেরেছে তপতী। সংবরণকে যেভাবে পেতে চেয়েছে তপতী, তা হয় নি। সংবরণের প্রেম শুধুমাত্র নারীর দেহকেন্দ্রিক হয়েই থেকে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংবরণের সমস্ত ভ্রান্তি ভেঙে যায়। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয় সে। গল্পকার ঘোষ প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে এক দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতির মুখোমুখি করিয়েছেন আমাদের। উভয়ের উপস্থিতি হওয়া উচিত পাশাপাশি এবং সমগুরুত্ব। জীবনে এই দুটির সম্পর্ক পারস্পরিক বিরোধের নয়। অনেকেই গল্পকার ঘোষের এই গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজা ও রাণী নাটকের তপতী সুমিত্রাকে মনে করিয়ে দেয়। ওই নাটকেও প্রেম ও কর্তব্যের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংকট দেখা যায়। সুবোধ ঘোষের গল্পে শেষ মুহূর্তে সংবরণ ও তপতীর মধ্যে অসাধারণ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। গল্পকারের কলমে ফুটে উঠেছে সেই মুহূর্ত। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন:

এক অভিশপ্ত বিস্মৃতির দীর্ঘ অবরোধ ভেদ ক'রে বহুদিন আগে শোনা এই ধ্বনি যেন নূতন ক'রে শুনতে পেয়েছেন সংবরণ- জগতের জন্য। সংসারের মানব ও মানবীর জীবন মিলিত হয় সমাজকল্যাণের নূতন মন্ত্ররূপে, সংকল্পরূপে, ব্রতরূপে, যজ্ঞরূপে! তারই নাম বিবাহ। শুধু নিজের জন্য নয়, নিভৃতের জন্যও নয়, জগতের জন্য।

বাষ্পায়িত হয় সংবরণের দুই চক্ষু। অবহেলিত রাজ্য সমাজ ও সংসারের দুঃখ যেন ঐ সূর্যরশ্মির সঙ্গে এসে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে। এই দৃশ্য দেখতে করুণ হলেও তপতী যেন এক পাষাণীর মূর্তির মত অবিচল ও অবিকার দু'টি চক্ষুর শান্ত কঠোর দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে।^{৩৫}

ভারত প্রেমকথা'র 'ইন্দ্র ও শ্রবাবতী' গল্পে নারীর প্রেম শেষ পর্যন্ত তপস্যায় পরিণত হয়েছে। আমরা জানি মহর্ষি ভরদ্বাজের স্বর্গের অঙ্গরা ঘৃতাচীকে দেখার পর বীর্যপাত হলে সেইটি পত্রপুটে ধারণ করা হয়। এর ফলে যে কন্যার জন্ম হয় তারই নাম শ্রবাবতী। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ভালোবাসা তার গভীর ছিল। দীর্ঘদিন তপস্যা করা হয়েছে ইন্দ্রকে লাভ করার জন্য। অবশেষে একশো বছর তপস্যার পর দেবরাজ ইন্দ্র ঋষি বশিষ্ঠ সেজে আসে। ঋষিকে যাবতীয় সেবা ও যত্নে ভরিয়ে দেয় শ্রবাবতী। কিন্তু, তার পক্ষে ঋষি পত্নী হওয়া অসম্ভব বলেও জানায় সে। কারণ একমাত্র ইন্দ্রকেই মনে-প্রাণে সে ভালোবাসে। তখন বশিষ্ঠরূপী ইন্দ্র পাঁচটি কুল শ্রবাবতীকে রান্না করতে বলে এবং দ্রুতই তার মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে চলে যায়। এরপর ইন্দ্র তীর্থে এসে জপ করতে থাকে যাতে রান্নার ব্যাঘাত ঘটে। অন্যদিকে শ্রবাবতী সারাদিন রান্নার পরেও রান্না যথার্থভাবে না হওয়াতে চিন্তিত হয়ে পড়ে, গৃহে সমস্ত কাঠও শেষ হয়ে যায়। তারপর শ্রবাবতী নিজের পা উনুনে দিয়ে রান্নার চেষ্টা করতে থাকে। তার এই প্রয়াস দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত

খুশি মনে তার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে চলে যায় এবং জানায় স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রর সঙ্গে তার মিলন হবে। মহাভারতে শল্য পর্বে এই আখ্যানটি পাওয়া যায়। মহাভারতীয় এই আখ্যানের অনেকটাই আধুনিকীকরণ করেছেন গল্পকার সুবোধ ঘোষ।

গল্পকার ঘোষের গল্পে শ্রবাবতীর নিষ্ঠাপূর্ণ প্রেম যেন নারীর অহংকারে পরিণত হয়েছে। এই গল্পে শ্রবাবতী আশ্রম কুটীরের নিষ্ঠাবতী কন্যা, হঠাৎ তার তপস্যার মাঝে এক স্বপ্নময় আবেশ সঞ্চারিত হয়, তার ইচ্ছা করে তপস্বিনীর বেশকে মিথ্যা করে দিয়ে ইন্দ্রের দর্শনে চলে যেতে। যেহেতু তার কামনার পুরুষ একমাত্র ইন্দ্রই। তবে সুবোধ ঘোষের গল্পে এরপর কাহিনির সমগ্র অংশটাই মহাভারতের সঙ্গে একই মিল আছে। শুধুমাত্র গল্পের শেষ অংশে সুবোধ ঘোষ তাঁর নিজের মতো করে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পুরাণে যেখানে বলার ছিল শ্রবাবতী মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবে, সেখানে সুবোধ ঘোষের গল্পে উভয়ের সম্পর্ক মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। এখানে ইন্দ্রের থেকে বর লাভ করার পর শ্রবাবতীর প্রেম আহত হয়। তার হৃদয়ের প্রেমিক সত্তা বলে ওঠে ইন্দ্রকে স্বর্গের মধ্যে সে পেতে চায় না। এই ধূলিকণা যুক্ত পৃথিবীর মধ্যেই ইন্দ্রকে পেতে আগ্রহী সে। কারণ স্বর্গের মধ্যে না পাওয়ার যন্ত্রণা ও অপ্রাপ্তির বেদনা নেই। মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে শ্রবাবতী রাজি নয় সে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ কবিতাতেও এই পৃথিবীরই জয়গান গাওয়া হয়েছে। সেখানে কবি বলেছেন:

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা- অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।
হে অঙ্গুরী,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান- লইনু বিদায়।
তুমি করে কর না প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্রুথছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে।^{৩৬}

সত্যিই তো স্বর্গ মানুষের কল্পনায় এবং ধর্মীয় শাস্ত্রে সুখ ও আরামের শ্রেষ্ঠ জায়গা। তার সমতুল্য স্থান আর কোথাও নেই। কিন্তু একথাও ঠিক যে, অনন্ত সুখ প্রকারান্তরে দুঃখেরই নামান্তর। আলোর গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি অন্ধকার থাকার জন্যই। কিন্তু স্বর্গে দুঃখ না থাকার কারণে সুখের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর জমিতেই জীবনের মাঝে ইন্দ্রকে পাবার আর্তি এবং তপস্যা শ্রবাবতীকে অসামান্য প্রেমিকায় পরিণত করেছে। স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের চাইতে মৃত্যুই তার কাছে অধিকতর শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। দয়িতের সঙ্গে মিলনের আশায় শেষ অভিসারে সে যাত্রা করেছে। মৃত্যুই একমাত্র সেই পথের সোপান, তাই মৃত্যুকেও শ্রবাবতী বরণ করেছে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র তার অসীম কৌতূহল নিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী নারীর অহংকারের মূর্তিটি দেখতে এসেছে পৃথিবীতে। এতকাল পর স্বর্গের অধিপতিরও পৃথিবীর বেদনার স্বাদ আস্বাদের অভিপ্রায় জেগেছে। শ্রবাবতীকে এতকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্র আর করুণা করে নি। সরাসরি পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেছে যে, শ্রবাবতীকে ইন্দ্র ভালোবাসে। শ্রবাবতীর প্রেম সার্থকতা লাভ করেছে সুবোধ ঘোষের গল্পে। মহাভারতে মানুষের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ধর্ম অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। তুলনায় মানবিক সম্পর্কগুলিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটির কারণও আছে যথার্থ। মহাকবি ব্যাসের মহাকাব্যের বিস্তৃতি অনেক বড়ো, তাই তার লক্ষ্যও পৃথক। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুশাসন নির্মাণ করা এবং নীতি ও ধর্মের যথার্থ প্রসার ঘটানো সেই সময়ের সমাজে অধিক প্রয়োজন ছিল। তাই মৃত্যু পথযাত্রী পিতামহ ভীষ্মের মুখে প্রচুর ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতির কথা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু উল্টোদিকে আধুনিক গল্পকার সুবোধ ঘোষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহাকবি ব্যাসের থেকে আলাদা। তিনি মহাভারতীয় চরিত্রদের আড়ালে আসলে সমকালীন আধুনিক নরনারীর প্রেমের ছবিই অঙ্কন করতে চেয়েছেন। আধুনিক মানুষদের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকটকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন গল্পকার ঘোষ। গল্পের শেষ অংশটি চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। তিনি লিখেছেন:

ধীরে ধীরে নীলাশোকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন বাসব। স্বর্গের মন এতদিনে বেদনার স্বাদ পেয়েছে। স্বর্গের গর্বিত কামনা আজ নত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে তার স্তোত্রের পাত্রীকে দেখতে পেয়েছে। বনবীথিকাচারী সেই পথিক তার জীবনের বাঙ্খিতাকে আর একবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।... ..

বাসব বলেন- একটি কথা বলতে এসেছি, শ্রবাবতী।

শ্রবাবতী- কী?

বাসব- আমি ভালবাসি।

বনস্থলীর সমীর হঠাৎ হর্ষে অশান্ত হয়, চঞ্চল হয় পুষ্পিত নীলাশোক। ভূতললীনা চন্দ্রলেখাও যেন চঞ্চলিত এক উৎসবের আনন্দে লীন হয়ে যাবার জন্য বাসবের আলিঙ্গনে আত্মদান করে।

বাসব বলেন- চল, প্রিয়া শ্রবাবতী।

শ্রবাবতী-কোথায়?

বাসব- স্বর্গলোকে চল।

শ্রবাবতী-আমি তো স্বর্গ চাইনি বাসব।

বাসব- কিন্তু স্বর্গ যে তোমাকে চায়।^{৩৭}

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে গল্পকার ঘোষ ‘উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী’র গল্পের অংশটি নিয়েছেন। এক পুরুষের প্রেম লাভে নারীর নিষ্ঠা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে এই গল্পে। মহাভারতে ঋষি অঙ্গিরার পুত্র হল উতথ্য। মহাভারতে মমতা ও সোমের মেয়ে ভদ্রা, যে উতথ্যের স্ত্রী। এই স্ত্রী ভদ্রার ওপর দেবতা বরুণের লোভ ছিল। পরে সময় সুযোগ মতো বরুণ ভদ্রাকে নিয়েও যায়। পরে ঋষি নারদের থেকে উতথ্য প্রকৃত ঘটনাটি জানতে পারলে নারদকে দিয়ে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ বার্তাটি দেবতা বরুণকে পাঠানো হয়। কিন্তু, বরুণ নির্দেশ অমান্য করলে উতথ্য সমুদ্রের সমস্ত জল শোষণ করে ফেলে। তখন বরুণ ভীত হয়ে ভদ্রাকে ফিরিয়ে দেয়। মহাভারতের এই ঘটনাটিকে সুবোধ ঘোষ তাঁর ভাবনায় নতুন রূপ দিয়েছেন।

মহাভারতের ভদ্রা সুবোধ ঘোষের গল্পে চান্দ্রেয়ী নামে পরিচিত। যে পিতামহ অত্রির আশ্রমে বাস করে। পিতামহ অত্রি জানে চান্দ্রেয়ীর মনের গভীর বাসনা। তাই ঋষি নিজের হাতে চান্দ্রেয়ীকে উতথ্যের হাতে সম্প্রদানের কথা জানায়। চান্দ্রেয়ীর তপস্যার কথা জানতে পেরে উতথ্যও তাকে গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি একাধিকবার চান্দ্রেয়ীর কাছে প্রেমমুগ্ধ উপহার পাঠায়। যেহেতু চান্দ্রেয়ী মনে প্রাণে উতথ্যের প্রতি অনুরক্ত তাই অজ্ঞাত পরিচয় প্রেমিকের পাঠানো উপহার সে ছুঁড়ে ফেলে। এদিকে চান্দ্রেয়ী ও উতথ্যের বিবাহ একদিন হয়ে যায়। কিন্তু উতথ্য জানায় যে ঋষি অত্রির সম্মান রক্ষার্থেই এবং চান্দ্রেয়ীর তপস্যার জন্যই তাকে সে গ্রহণ করেছে। বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করার কোনও ইচ্ছা তার নেই। এই কথাটিকে জানিয়েই চান্দ্রেয়ীর থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়েছে উতথ্য। অন্যদিকে চান্দ্রেয়ী অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়ে পড়ে উতথ্যের প্রেম প্রত্যাখ্যানের সংবাদ পেয়ে। যেন তার এতদিনের তপস্যার কোনও মূল্যই তার প্রেমিক দেয় নি, এই অসহ্য প্রত্যাখ্যান জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চান্দ্রেয়ী যমুনার জলে স্নান করে। স্নানের শেষে চান্দ্রেয়ী দেখতে পায় এক অপরিচিত মূর্তি একনজরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চান্দ্রেয়ী ইতিমধ্যেই ঋষি উতথ্যের স্ত্রীতে

পরিণত হয়েছে, এমনটা জানার পরেও অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টির কোনও পরিবর্তন হয় না। চান্দ্রেয়ী জানতে পারে এই অপরিচিত ব্যক্তির নাম বরুণ, যে দীর্ঘ সময় ধরে তাকে প্রেমের উপহার পাঠিয়ে এসেছে। দেবতা বরুণ আরও জানায় যে চান্দ্রেয়ীকে তার অত্যন্ত ভালো লাগে। বরুণের এরকম কথা শুনে চান্দ্রেয়ী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, জ্ঞান ফেরার পর চান্দ্রেয়ী দেখতে পায় তার মূর্তিত দেহ দেবতা বরুণ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে। উত্থের প্রতি ভীষণরকম অনুরক্ত চান্দ্রেয়ী দেবতা বরুণের হাত থেকে মুক্তি চায় শেষ পর্যন্ত। গল্পে উত্থ তার স্ত্রীর অপহরণ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সরস্বতী নদীকে ঋষি আদেশ দেয় গতিপথ পরিবর্তনের। ফলস্বরূপ জলের অভাবে ও মৃত্যু যন্ত্রণায় দেবতা বরুণ শেষ পর্যন্ত চান্দ্রেয়ীকে মুক্তি দেয়। যে ঋষি একদিন তার স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, দাম্পত্য সম্পর্ক যাপনের যার কোনও ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিলই না, সেই উত্থও আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরে চান্দ্রেয়ীর কাছে নিজের প্রেম উপস্থাপন করেছে। চান্দ্রেয়ীর অভাবে আজ হৃদয় শূন্য উত্থের।

‘অগ্নি ও স্বাহা’ গল্পটির উপাদান মহাভারতের বন পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। নারীর প্রার্থিত পুরুষকে নারী সহজে না পেলে কপট ও ছলের নানা আশ্রয় নিতেও পিছপা হয় না সে। শুধু তাই নয়, এমনকী প্রার্থিত পুরুষকে পেতে গেলে নারী নিজের চরিত্রকেও সমাজের চোখে কলঙ্কিত করতে পিছিয়ে যায় না। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের নায়িকারা সমাজের কলঙ্কে মাথায় নিয়েই প্রেমের সুখ খুঁজে নিয়েছে। সুবোধ ঘোষের ‘অগ্নি ও স্বাহা’ গল্পেও অনুরূপ বিষয়টি আমরা খুঁজে পেয়েছি। রাজকন্যা স্বাহার কাছে নারীর ধর্ম ‘এক পুরুষে প্রীতি’। অন্যদিকে অগ্নির কাছে এই ধর্মের অর্থ প্রেমকে ছোট প্রাচীরের মধ্যে ঘিরে রাখা। স্বাহা সহজেই বুঝতে পারে যে অগ্নির হৃদয়ে বেদনা নেই, তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অন্যদের মতো নয়। সপ্তর্ষি ভবনের যজ্ঞের নিমন্ত্রণ অগ্নির কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। প্রেমিকা স্বাহার হৃদয় চিন্তিত হয়ে ওঠার জন্য অগ্নিকে সপ্তর্ষি ভবনের নিমন্ত্রণে যেতে সে বাধা দেয়। সপ্ত ঋষির সমাদর ও অভ্যর্থনায় দিনযাপন করে আকস্মিকভাবে অগ্নি আবিষ্কার করে যে তার মন সপ্তর্ষি ভবন ছেড়ে যেতে চাইছে না। তার মনকেও প্রশ্ন করে কোনও কারণ অগ্নি খুঁজে পায় না। বড়ো অশান্ত হয়ে যায় তার মন ও হৃদয়। অপলক দৃষ্টিতে পান করতে থাকে সপ্ততর্ষীর রূপের অমৃত। সপ্তঋষিপত্নীর রূপ যৌবনে অগ্নি মুগ্ধ হয়ে যায়। যেই অগ্নি এক সময় বলেছিল যে, জীবনে কোনও নারীকে তার ভালোবাসার প্রয়োজন নেই, এও সত্য যে নারীকে প্রেমিকা রূপে নয়, শুধুই দাহিকারূপে লাভ করাই অগ্নির কামনা, যে দাহিকা অগ্নিকে শুধু ভস্মীভূত করবে। এই কলুষতা থেকে অগ্নিকে উদ্ধার করতে চায় স্বাহার হৃদয়। অথচ তার প্রেমের সেই শক্তি নেই বুঝে নিজেকেই সে ধিক্কার দেয়। অগ্নিকে পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রগাঢ়ভাবে তাকে ধাক্কা দেয়। তাই অগ্নির পরদারকামনার অশুচিতা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য স্বাহা অভিসার যাত্রা শুরু করে। চৈত্ররথ কাননের পথে সপ্ততর্ষীর প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন অগ্নির

কাছে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছে স্বাহা। সে জানে কাজটিকে অন্যায়ভাবেই সমাজ দেখে। নীতিগতভাবে কাজটি সমর্থনযোগ্যও একেবারেই নয়। তবুও ছদ্মবেশের মধ্যে দিয়েই প্রেমিকা স্বাহার তনু গোপনে অগ্নির সান্নিধ্য লাভ করে। শেষ পর্যন্ত অরুন্ধতীর রূপে অভিসারে যাত্রার সময় স্বাহা ভীষণরকম নিজ অপরাধ সম্পর্কে আত্মগ্লানিতে ভোগে। স্বাহা নিজেই বুঝতে পারে যে, অগ্নিকে অশুচিতা থেকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেরই দেহ ও মন অপবিত্র করে ফেলেছে সে। একজন প্রকৃত প্রেমিকার ধর্ম এমনটা নয়, এ শুধুই মোহ। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের সমস্ত ভুল বুঝতে পেরে স্বাহা অগ্নির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। শুধু ক্ষমা চেয়েই থেমে থাকেনি সে, একই সঙ্গে প্রার্থনা করে তার ভবিষ্যতের সন্তানকে যেন সকল অখ্যাতি থেকে রক্ষা করা যায়। অগ্নির প্রেমে পাগল হয়ে সমস্ত কলঙ্ক নিজে বরণ করেছে স্বাহা, কুমারী হয়েও অগ্নির সন্তানের মা হয়েছে সে। তাই শেষ পর্যন্ত স্বাহার নিখাদ প্রেমকে স্বীকৃতি দিতেই হয়েছে। এতদিন তার প্রেমে অগ্নি সাড়া দেয়নি, তাই এবার অগ্নি অনন্তকাল ধরে আহ্বান করে চলেছে— স্বাহা! স্বাহা! গল্পকার সুবোধ ঘোষের কলমে উঠে এসেছে অসামান্য গল্পের এই শেষ অংশটি। শেষ অংশটি সত্যিই বড়ো মনোরম।

সত্যিই এক অনন্ত প্রতীক্ষার তপস্যা শুধু করেছেন অগ্নি। কপালে কস্তুরীতিলক, স্নিগ্ধদ্যুতিরূপিণী এক নারী এই পথে ফিরে এসে দেখা দেবে কবে? স্বাহা! স্বাহা! আগ্নেয়জননী স্বাহা! পিতৃহৃদয়ের শূন্যতা, শুদ্ধপৌরুষ পতিহৃদয়ের শূন্যতা দূর করবার জন্য এক বাঙ্কিতার উদ্দেশ্যে সাগ্রহ আহ্বানমন্ত্র চৈত্ররথ কাননের সমীপে নিরন্তর মন্ত্রিত হয়। স্বাহা! স্বাহা! আমার আশ্রমগেহিণী রূপে এস। আমার গার্হপত্যের একমাত্র শিখা রূপে এস। এস প্রিয়া স্বাহা।

সেই একপ্রেমিকা নারীর কামনার পুণ্য স্পর্শকেই অনন্তকাল আহ্বান করবেন অগ্নি— স্বাহা! স্বাহা!^{৩৮}

ভারত প্রেমকথা গল্পগ্রন্থের রুরু ও প্রমদ্বরা গল্পটি মহাভারতের আদি পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের দু'জন চরিত্রই স্বর্গের অঙ্গরাদের সন্তান। অঙ্গরা ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুর জন্ম এবং অন্যদিকে বিশ্বাবসু ঋষির ঔরসে অঙ্গরা মেনকার গর্ভজাত কন্যা সন্তান হল প্রমদ্বরা। মহাভারতীয় ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি রুরু একবার শিকারের উদ্দেশ্যে যখন বেরিয়েছিল তখন এই অপরূপ রূপসী কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই মুগ্ধতা পরবর্তী সময়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। প্রমদ্বরাকে বিয়ে করতে চেয়ে অভিভাবকদের কাছে রুরুর প্রস্তাব গৃহীত হলে উভয়েই আনন্দে দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু, এরকমই এক সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সময় ঘুমন্ত এক সাপকে মাড়ানোর ফলে সাপের কামড়ে প্রমদ্বরার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর ফলে রুরু একেবারে ভেঙে পড়ে। অতঃপর দেবদূত এসে জানায় যে, তার প্রেমিকার জীবনের আয়ু পূর্ণ হয়েছে। তাই তার পক্ষে বেশিদিন বাঁচা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রুরুর নিজের কঠোর তপস্যার

উপর ভরসা ছিল, তাই সে তপস্যার অর্জিত পুণ্যফলে তার প্রেমিকা প্রমদ্বরাকে অর্ধেক আয়ু দান করে। এরই ফলস্বরূপ প্রমদরাও তার হত জীবন ফিরে পায়।

মহাভারতের এই আখ্যানকে কাজে লাগিয়েই সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পটি লিখেছেন। কাহিনির প্রয়োজনে তিনি গল্পের অনেক অংশই পরিবর্তন করেছেন। প্রেম সম্পর্কিত যে দার্শনিক ভাবনাটির ওপর কেন্দ্র করে গল্পটির মূল বিষয় আবর্তিত হয়েছে, তা হল প্রেমের ক্ষণিকতা নাকী দীর্ঘস্থায়ী প্রণয় নর-নারীর সম্পর্কে পূর্ণরূপ দেয়? রাজা রুরুর বিপরীত ভাবনার মানুষ এখানে তারই প্রেমিকা। প্রমদরা প্রেমের ক্ষণিকতায় বিশ্বাস করে না। উল্টোদিকে রুরু মুহূর্তের ভালোবাসা ও প্রেমকে অধিক গুরুত্ব দেয়। গল্পের প্রথম দিকে আমরা দেখি স্থূলকেশের আশ্রমে রুরু এসেছে, ফিরে যাওয়ার সময় প্রাচীরের অন্তরালে চমৎকার রূপের আভা আবিষ্কার করে। সেই সুন্দরী নারী হল প্রমদরা। স্বাভাবিকভাবেই সুন্দরী নারীর রূপের আভাতে রুরু একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, কামের বাসনায় নিজে যথেষ্টই কাতর হয়ে পড়েছে। উল্টোদিকে প্রেমিকা প্রমদরাও রুরুর প্রতি যথেষ্টই মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু ক্ষণিক প্রণয়ের আনন্দে নিজেকে সমর্পণ করতে প্রমদরা একেবারেই অনিচ্ছুক। রাজা রুরুর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধায় প্রেমিকা প্রমদরা জানায় যে রুরুই তার স্বপ্নের একমাত্র পুরুষ, তার জন্যই সে প্রতীক্ষারত। তার অন্তরের একমাত্র বিগ্রহও রুরুই। ‘প্রেম ক্ষণস্থায়ী’- এই ভাবনায় বিশ্বাসী রুরু প্রমদ্বরাকে বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু প্রমদরার গভীর ইচ্ছা রুরুর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে। গল্পকার সুবোধ ঘোষ লিখেছেন:

রুরু- তুমি অন্য কোন প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষিতা নারী, তাই প্রমতিতনয়ের আহ্বান এত সহজে তুচ্ছ করতে পারছ।

আর্তনাদ করে ওঠে প্রমদরা- অকারণে নিষ্ঠুর হবেন না, প্রমতিতনয়। আপনি আমার জীবনের একমাত্র বাঞ্ছিত পুরুষ। আপনি আছেন আমার স্বপ্নে, আপনি আছেন আমার প্রতীক্ষায়, আপনি আমার অন্তরমন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ।^{৩৯}

আবার কিছু অংশের পর প্রমদরা’র মুখে শুনেছি ভারতীয় নারীর প্রেমের সেই অসামান্য উক্তি।

প্রমদরা- যে জীবনে সর্বক্ষণ শুনতে পাব তোমার প্রাণের আহ্বান। তোমার শান্তিতে তুমি খুঁজবে আমার সেবা, তোমার সংকল্পে তুমি খুঁজবে আমার সাহায্য, তোমার শান্তিতে তুমি খুঁজবে আমার সান্নিধ্য।^{৪০}

বিবাহের প্রস্তাবে রুরু এখানে চমকেও ওঠে। প্রমদ্বরাকে রুরু তার সংকল্পের কথাও জানায়, এও বলে যে তাদের বিবাহ হলেও দীর্ঘ মিলন অসম্ভব। আসলে স্বর্গের অঙ্গরা কন্যা প্রমদরা নিজে জানে পুরুষের মুহূর্তের ভালোবাসা পেয়েও নারীর হৃদয় শূন্য থাকতেই পারে। বলা বাহুল্য,

গল্পকার ঘোষ এখানে অঙ্গরাদের থেকে তাদেরই গর্ভজাত সন্তানদের একেবারে পৃথক বৈশিষ্ট্যের ও চরিত্রের অধিকারী করে তুলেছেন। প্রমদ্বার চরিত্রের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের ও নারীর চিরকালীন অনেক আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গের অঙ্গরাদের আমরা দেখেছি একেবারেই হৃদয়হীন, নির্মম রূপে। মহাভারত জুড়ে একাধিক অঙ্গরা পৃথিবীর রাজা ও ঋষিদের সঙ্গে মিলনে আবদ্ধ হওয়ার পর সন্তান জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানদের প্রতি মায়ায় ও দায়িত্বে নিজেদের আটকে রাখে নি। উদ্দেশ্য সাধনের পরের মুহূর্তেই ফিরে গেছে স্বর্গে। কিন্তু প্রমদ্বরা নিজে অঙ্গরা কন্যা হওয়া সত্ত্বেও এমনটা হয় না। পৃথিবীবাসী অধিকাংশ মানুষের মতোই তাই সে অঙ্গরাদের জীবন চায় না। সে চায় পুরুষের বুকভরা গভীর প্রণয়, প্রেমের স্থায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে সন্তানের জননী হতে। রুরু নিজের গৃহে ফেরার পর নারী হৃদয়ের এই গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার ভালোবাসার মানুষটিকে সাপে দংশন করে। ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে রুরু যে মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তখন মহর্ষি স্থূলকেশ রুরুকে জানায় তার জীবনের পুণ্যের কিছু অংশ যদি প্রমদ্বরাকে দেওয়া যায়, তবে প্রেমিকা প্রমদ্বরাকে ফিরে পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত প্রমদ্বরা তার জীবন ফিরে পায়। রুরুও বুঝতে পারে প্রেমের গভীরতম সত্যটি।

‘জরৎকারু ও অস্তিকা’ গল্পটি মহাভারতের আদি পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। পুরুষ যেমন শুধুমাত্র পুত্র পাওয়ার জন্যই স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে, ঠিক তেমনই নারীও তার সংকল্পে স্থির থেকে প্রেমহৃদয়হীন স্বামীকে তার সন্তানের পিতা হিসাবে মেনে নিয়েছে। মহাভারতে জরৎকারু তার পিতৃবংশকে প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের বংশ রক্ষার বিষয়ে। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিশে ছিল একটি শর্ত। যেখানে বলা ছিল তারই নামের অধিকারী কোনও নারীকে যদি ওই নারীর পরিজনেরা স্বেচ্ছায় দান করে তবেই জরৎকারু বিয়ে করবে। কিন্তু এই বিয়ের সঙ্গে সংসার ধর্মের কোনও সংযোগ থাকবে না। পরবর্তী সময়ে জরৎকারুর ভিক্ষার ডাক শুনতে পেয়ে বাসুকি তারই ভগ্নি অস্তিকা’কে প্রদান করে। যদিও ভগ্নি অস্তিকা’র অন্য এক নাম ছিল জরৎকারু। উভয়ের নাম একই জেনে জরৎকারু অবশেষে বিবাহে সম্মত হয়। তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে জরৎকারু মুনি একদিন স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল। অন্যদিকে মুনির আগাম সতর্কতা ছিল যে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে একেবারেই ডাকা যাবে না। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীকে অস্তিকা ডেকে দেয়। এরই ফলস্বরূপ মুনি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে উদ্যোগী হয়। এই সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকার জন্য তারই গর্ভে মুনি হাত রেখে তিনবার ‘অস্তি’ নাম জপ করে, যার ফলে আগত সন্তানের নাম হয় আস্তিক। অন্য এক মতে স্ত্রী গর্ভবতী ছিল না। বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্ত্রী কশ্যপ ঋষি এবং মহাদেবের নাম স্মরণ করলে তারা উভয়েই হাজির হয়ে পুত্রসন্তান উৎপাদন না করে

স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বারণ করে। অতঃপর জরৎকারু তখন স্ত্রীর নাভিদেশে স্পর্শ করে এবং গর্ভে এক বলশালী পুত্রের সঞ্চার হয়।

মহাভারতের এই কাহিনি সুবোধ ঘোষের গল্পে নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে নায়িকা ‘অস্তিকা’ একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের হাত থেকে নাগেদের রক্ষার জন্যই জরৎকারু’র সঙ্গে অস্তিকা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদিও এই কঠিন ব্রতে কোনও প্রেমের চিহ্ন বা দাম্পত্য প্রণয় থাকে নি। উভয়ের বিবাহ বন্ধনই ছিল শুধুমাত্র কর্তব্য নির্বাহের একটি পন্থা। কিন্তু গল্পে সুবোধ ঘোষ অস্তিকাকে উপস্থাপন করেছেন একজন প্রতীক্ষারত প্রেমিকা হিসাবে। যে দীর্ঘদিন ধরে আশাই করেছে একদিন ঋষির মধ্যে কামনার সঞ্চার ঘটবে এবং তাদের প্রেম সুরভিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বিবাহিত সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয় নি এতটুকুও, কেবলমাত্র কঠোর বাহুবন্ধনে প্রতিনিয়ত অস্তিকা আবদ্ধই থেকেছে। এভাবেই পূর্ণ যৌবনা এক নারীর কামনা বাসনা প্রতিনিয়তই অবদমিত হয়েছে। যা একটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও বটে। কোনও এক সন্ধ্যায় অস্তিকা যখন স্বামীর সন্ধ্যা বন্দনার চিন্তায় মগ্ন সেদিন জরৎকারু হঠাৎ এসে তার হাত ধরে শয্যায় উপবেশন করল। অস্তিকা জরৎকারুকে মনে করালো যে সন্ধ্যা বন্দনার সময় এখন। কিন্তু জরৎকারু’র স্বাধীন ইচ্ছায় যেহেতু বাধা পড়ল, তাই পূর্বের কথা মতো সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ল। ব্যক্তিত্বময়ী নারী অস্তিকা তাকে মনে করিয়ে দিল পূর্বের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে। জরৎকারু এবং অস্তিকা উভয়েই একটি প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আবদ্ধ ছিল। জরৎকারু যেমন তার পূর্বজদের মুক্তি ও স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য পুত্র সন্তানের প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঠিক তেমনই অস্তিকাও নাগদের রক্ষার জন্য জরৎকারু মূনির সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিল।

নিতান্ত প্রেমহীন জীবন কাটিয়েছে অস্তিকা। শুধুমাত্র শর্তরক্ষার জন্যই পুত্রের জন্ম দিয়ে জরৎকারু মূনি চলে গেল। পরে বাসুকিকে জানানো হয় যে উভয়ের বংশ রক্ষার জন্যই অস্তিকা গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে। ফলে সমস্যার সমাধান হল একদিকে বটে। কিন্তু অন্যদিকে অস্তিকা পুরো জীবন জুড়ে এক শূন্যতার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকল। তাই এই শূন্যতাও তার জীবনে এক বড়ো সত্য ঘটনা। পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে নয়, স্বামীর কাছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হৃদয়হীন পুরুষের সন্তান গর্ভে নিয়ে মাতৃত্বের গৌরবে গৌরবান্বিতা অস্তিকার জয় হয়েছে। প্রেমহীন ও হৃদয়হীন স্বামীর পত্নী রূপে নয়, নিজের সন্তানের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাবার মধ্যেই অস্তিকার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। গল্পকার ঘোষের গল্পে উঠে এসেছে:

বোধ হয়, তার নিজেরই জীবনের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল অস্তিকা। দেখতে পায়, স্বামিহীনহীন এক সংসারের নিকেতনে আজীবন শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবন। আর, নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আধারে ঐ যে মসিময় অবলেপ, ঐ তো তার অপমানিত নারীত্বের শ্মশানধূমলেখা! শুধু অপমান, শুধু ব্যর্থতা ও অপৌরব।^{৪১}

মহাভারতে ‘ভাস্কর ও পৃথা’ গল্পটি বন পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। মহাভারতে পৃথা’র ঘটনা আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ পাণ্ডবদের মা কুন্তী’র কথা আমরা বলছি। কুন্তী’র প্রেম কাহিনি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। যদিও পাণ্ডবদের মা হিসাবেই তার ভূমিকা মহাভারতে আমরা বেশি পেয়েছি। কিন্তু তার বাল্যকাল থেকেই বা বলা ভালো জন্মের কিছু সময় পর থেকেই নানান কারণে তার বেড়ে ওঠা স্বাভাবিকভাবে হয় নি। মানুষ হয়েছে পৃথা পালক পিতার কাছে, তারপর কিশোরী বয়সে যখন তার সমবয়সীরা বন্ধুদের সঙ্গে নানা ধরনের খেলায় জীবন অতিবাহিত করে, তখন পৃথার ভাগ্যে জুটেছে ঋষি দুর্বাসার দেখাশোনা ও আপ্যায়নের মতো কঠিন ভার। এরপর দীর্ঘ সময় ঋষির যাবতীয় আবদার তাকে মেটাতে হয়েছে। কারণ কর্তব্যে গাফিলতি ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে, যার প্রভাব হয়তো তার পালিত পিতার রাজ্যের ওপরেও পড়তে পারে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঋষি দুর্বাসার আশীর্বাদ সহ পরীক্ষায় পাশ করে পৃথা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই আশীর্বাদই পরবর্তী সময়ে তার জীবনে কষ্টের কারণ হয়ে ধরা দেয়। পৃথা বা কুন্তী সম্পর্কে তাই প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী যথাযথ মন্তব্য করেছেন। কুন্তী সম্পর্কে এরকম গভীর নিরীক্ষণ বা বিদ্যায়তনিক ভাবনা আমরা কোনও মহাভারত গবেষকের সহজে দেখি না। তাঁর *মহাভারতের অষ্টাদশী* বইয়ের ‘কুন্তী’ নামক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন:

অভিমান হচ্ছে— যার পিতা সেই শৈশব অবস্থায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করে একটি শিশু কন্যাকে অন্যের কাছে দত্তক দিয়েছেন, তার আর জীবনের মূল্য কী— কিং জীবিতফলং মম। অথবা কুন্তী তাঁর পিতার ওপর অভিমানে তাঁর জীবনের ঘটনার শৃঙ্খল অন্যভাবে সাজাতে চান— অর্থাৎ যদি তাঁর পিতা কুন্তীভোজকে দত্তক না দিতেন, তা হলে স্বয়ম্বরসভায় পাণ্ডু আসতেন না, যদি পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হত, তা হলে... ইত্যাদি ইত্যাদি।^{৪২}

কুন্তীকে নিয়ে বিস্তারিতভাবে আমরা আমাদের গবেষণার প্রবন্ধ অংশে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তার জীবনের সঙ্গে জড়িত দ্বন্দ্ব ও সংকটগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেছি আমরা। কিন্তু এখন সুবোধ ঘোষের ‘ভাস্কর ও পৃথা’ গল্পে আমরা ফিরে আসি। মহাভারতের আদি পর্বের মধ্যেই পৃথার পরিচয় আমরা পাই। যদুশ্রেষ্ঠ শূরের মেয়ে পৃথা পালিত হয়েছে সন্তানহীন রাজা কুন্তীভোজের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই ঋষি দুর্বাসার আশীর্বাদ এবং তারপরের ঘটনা আমরা সবাই জানি। নিতান্তই কৌতূহলের বশে কুমারী কুন্তী সূর্য নাম জপ করে ফেলে এবং সূর্য তার সঙ্গে

মিলিত হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। অতঃপর বাহ্যিক ভয় ও সামাজিক গঞ্জনা এবং লজ্জার ভয়ে কুন্তী তার ধাত্রীর সহযোগিতায় তাদের সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেয়। মহাভারতের এই কাহিনি প্রায় একই থেকেছে গল্পকার ঘোষের গল্পে। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি পরিচয় দিয়েছেন তাঁর আধুনিক মানবিক মনের। তাই দুর্বাসার বরদানের বিষয়ে রোমান্টিকতার সুর শোনা যায়। ঋষি জানায় এখানে কুন্তীর মন যাকে চাইবে, তাকেই সে আহ্বান করতে পারে। পরের দিন ভোরবেলায় পূর্ব দিগন্তে তাকিয়ে পৃথার মনে হয়েছে নতুন উদিত সূর্যের ন্যায় এক দিব্যকায় পুরুষ তারই দিকে যেন চেয়ে আছে। কুন্তীর এই দর্শনের মধ্যে কামনা ছিল না, মুগ্ধতা ছিল। কিন্তু ভাস্কর পৃথার রূপে এতটাই লোভাতুর হয়ে পড়েছে যে মিলিত না হয়ে ফিরে যেতে চায় না। কুন্তীর একাধিক কাতর অনুনয় সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। উভয়ের মিলনে পৃথা ও ভাস্কর উভয়ই তৃপ্ত হয়েছে।

মিলনের ফলে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সন্তানকে পৃথিবীর কোলে ছেড়ে দিতে চায় কুন্তী। তাই যখন ছেলেকে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে, তখন মমতাময় মূর্তি শুধুই কল্পনার চোখে উপলব্ধি করে কোনও এক দূরালোকে একটি পুত্র সন্তান বড়ো হয়েছে, বধূ এনেছে, তাদের বরণ করে নিচ্ছে এক প্রসন্ন জননী, কিন্তু সেই মূর্তি কুন্তীর নয়। সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় আবারও সেই অসাধারণ মুহূর্ত ফিরে এসেছে। ভাস্করের প্রতি নিদারুণ অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে পৃথা। মহাভারত যেখানে আমাদের দেখিয়েছে যে পুত্রকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে সামাজিক লজ্জায়। কারণ সামাজিক অনুশাসন এখানে প্রধান বিষয়। কিন্তু সুবোধ ঘোষের গল্পে দেখতে পাই আমরা সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয়। এখানে পুত্র বিসর্জনের সময়ও তার চোখে ছড়িয়ে আছে অভিমানী প্রেমিকার করুণ আর্তি। এই প্রেমিকা নারী মিলিত হতে চায় তার প্রেমিকের সঙ্গে। সমাজ ও সংসার তার কাছে তখন মিথ্যে হয়ে যায়। সন্তান বিসর্জনের মুহূর্তটিকে এমনই মানবিক ও হৃদয়বিদারক করে তুলেছেন সুবোধ ঘোষ, যার ফলে তার সৃষ্ট পৃথা চরিত্রটি মহাভারতের থেকে অনেক বেশি আধুনিকও হয়েছে।

পৃথা- নূপুরের শব্দ। এই পৃথিবীর কোন মানুষের ঘরের আঙিনায় ক্রীড়াচঞ্চল এক শিশুর ছুটাছুটি, তার পায়ের ছোট ছোট নূপুরের ঝংকারে সে আঙিনার বাতাস মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে তো আমার ঘরের আঙিনা নয়।... ..

পৃথা- দেখছি, এই পৃথিবীর কোন গৃহে, প্রাসাদে কিংবা কুটীরে, এক নারীর কোলে পরিচয়হীন এক শিশুর কোমল কণ্ঠের কলস্বরে মাতৃসম্বোধন ধ্বনিত হয়ে চলেছে। সে মাতা কিন্তু আমি নই।... ..

পৃথা- উৎসবের শঙ্খ বাজছে, ধাত্রিয়িকা। এখান থেকে বহু দূরে, বহু বৎসর পরে, এই রাত্রি যেন ভোর হয়ে গিয়েছে। সুন্দরতনু এক যুবক বরবশে চন্দ্রমুখী বধূ সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলকলসে

সজ্জিত এক ভবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। ধান্যদূর্বা হাতে নিয়ে এক মাতা এসে বরবধূকে আশীর্বাদ করছে। পুত্র নত হয়ে মাতার পদধূলি নিয়ে শিরে ধারণ করছে। সুন্দর হাস্যে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে মাতার আনন। সে মাতাও কিন্তু আমি নই।^{৪০}

গল্পকার সুবোধ ঘোষের ‘জনক ও সুলভা’ গল্পটির মূল শান্তি পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। মহাভারতে এই দু’জন ব্যক্তির কথোপকথনে নাস্তিকতার দীর্ঘ মূল্যবান চর্চা পাওয়া যায়। গবেষকদের বিদ্যায়তনিক চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই অংশ। মহাভারতে সুলভাকে আমরা পাই একজন ব্রহ্মচারিণী হিসাবে। প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় চতুরাশ্রম প্রথা অন্যতম ছিল। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষই এই প্রথাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলত। স্বাভাবিকভাবে সুলভাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে যথার্থ স্বামী বা জীবন সঙ্গিনী না পাওয়ার কারণে মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায় সে। জনক বংশে রাজা ধর্মধ্বজ সন্ন্যাসধর্ম, দণ্ডনীতি, মোক্ষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিল। সুলভা মিথিলাতে এসে যোগ বলে অসাধারণ সৌন্দর্য রূপ ধারণ করে রাজসভায় উপস্থিত হয়। উল্টোদিকে রাজাও সুলভার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাজা সুলভার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তির সাহায্য নিয়ে তাকে পরাজিত করার কথা ভাবে। কিন্তু সুলভা যোগশাস্ত্রে দক্ষ হওয়ার কারণে যোগবলে রাজার বুদ্ধিকে ও ভাবনার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলে। সুলভাও নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে মোক্ষধর্মের বর্ণনা করেছে এরপর। কিন্তু রাজা জনক জানায় যে, রাজার দেহে প্রবেশ করার কারণে সুলভা গভীর অপরাধ করেছে। সুলভাও রাজাকে মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ প্রমাণিত করে।

গল্পকার ঘোষের গল্প থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই তা হল— সুলভা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছে কারণ স্বয়ম্বর সভাতে তার যোগ্য সমতুল্য জীবনসঙ্গী পাওয়া যায় নি বলে। যারা এসেছে তারা সবাই পরীক্ষায় নিজেদের প্রমাণ করতে অক্ষম হয়েছে। কিন্তু সকলে অযোগ্য হলেও সুলভা বুঝতে পেরেছে রাজা জনক অযোগ্য নয়। সুলভার রূপের কথা জেনেও জনক স্বয়ম্বর সভায় আসে নি। এই বিষয়টিতে অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সুলভা সারা জীবন কুমারী থাকার পরিবর্তে জীবন ত্যাগ করার সংকল্প নিলে তার পিতা ব্রহ্মব্রত পালনের কথা বলে। দীর্ঘ বছর ধরে তপস্যা করলেও জীবনের এক পর্যায়ে এসে তার আত্ম উপলব্ধি হয়। তারপর একদিন সে দেখতে পায় যেই গোপন আকাজক্ষাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে সুলভা সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেছে, তারই একটি ছবি যেন সলিলের দর্পণে ফুটে উঠেছে। কিংশুক মঞ্জরীর গুচ্ছ যেন সেই প্রেমেরই লাল রঙের ইঙ্গিত বহন করে। সাংখ্য, যোগ এবং নিস্কাম যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিল রাজা জনক। জনকের সৌন্দর্য বোঝার এবং দেখার জন্য সুলভা এরপর একদিন হাজির হয় রাজসভায়। সুলভার রূপ দেখে জনকের ভ্রান্তি জন্মায়। সে বুঝতে পারে না যে এই রূপ সন্ন্যাসিনীর নাকী

বিরহিনী প্রেমিকার! কথাবার্তার সূত্রে সুলভা জানতে চায় তার দৈনিক সৌন্দর্যের প্রতি জনকের কোনও কামনা বা বাসনা জন্মেছে কিনা? জনক নিজেও স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারে সুলভা সন্ন্যাসিনী নয়। বলা বাহুল্য, জনকের মধ্যে সুলভার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে সংশয় জাগে। পরবর্তীতে আরও কথোপকথন এগোলে জনক বুঝতে পারে সুলভার আকাজক্ষার স্বরূপকে। আসলে স্বয়ংবর সভায় বা বিবাহের সভায় জনকের না যাওয়ার প্রধান কারণ হল নারীর সৌন্দর্য ও রূপ সে প্রত্যক্ষ করে নি। তার কারণ অবশ্যই সুলভাকে অবহেলা করে এড়িয়ে যাওয়া নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনকের মধ্যেও নারীর প্রতি কামনা ও বাসনা জেগে উঠেছে। একান্ত নিজের মতো করে জনক পেতে চেয়েছে তার প্রিয়া সুলভাকে। আসলে উভয়েই নিজেদের গভীরে প্রাকৃতিক মোহ ও বাসনাকে মিথ্যে ঢেকে রাখার একপ্রকার প্রয়াস করে গেছে, আবার পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে দু'জনেই সেই মোহ থেকে বেরিয়ে গেছে বা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। চিরাচরিত সম্পর্কের উত্তরণ ঘটেছে তাদের যৌথ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি ত্যাগী হতে গেলে প্রথমেই আমাদের বাসনার স্বরূপটিকে চিনতে পারা দরকার। সেই স্বরূপকে চিনতে না পারলে বাস্তবিক ত্যাগী হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাহ্যিক ত্যাগের নাটক করা হয় মাত্র।

এইভাবেই সুলভার সান্নিধ্যে এসে রাজা জনকের জীবনের এক বড়ো ভুল ত্রুটিমুক্ত হয়ে যায়। কারণ সুলভা নিজের আকাজক্ষাকে চিনতে চায়, কিন্তু তার মধ্যে আবার ডুবতে চায় না। এই গল্পে দুইজন নায়ক ও নায়িকা তাদের প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে নিবৃত্তিমার্গে পৌঁছেছে। সুবোধ ঘোষের 'জনক ও সুলভা' গল্পটির শেষ অংশ চমৎকার। গল্পকারের লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে:

হ্যাঁ, এতক্ষণে জ্ঞানী জনকের ভুল ভেঙেছে। এতক্ষণে নিজেরই দুই চক্ষুর চকিতাহত দৃষ্টি দিয়ে আজ নিজেকে দেখতে পেয়েছেন জনক, শুধু মোক্ষব্রতের এক ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে মিথ্যা সন্তোষের জীবন যাপন করেছেন জনক। আত্মজ্ঞানের অহংকারকেই এতদিন আত্মজ্ঞান বলে যে মোহ পোষণ করেছিলেন জনক, সেই মোহ চূর্ণ করে দিল সুলভা, নৃপতি জনকের কল্যাণকারিণী বান্ধবী সুলভা।

চন্দ্রাস্তবিধুর দিগ্বলয়ের দিকে বিষাদালস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন জনক। কিন্তু সুলভা তার সুন্দর অধর যেন স্নিগ্ধ এক সাস্তুনা সুস্মিত করে বলে- এই বিষাদ বর্জন করুন জনক। ভুল ভেঙে গেল আপনার, ভুল ভেঙে গিয়েছে আমার। দু'জনের জীবনের পরম অন্বেষণের পথে শুষ্ক ধূলির আড়ালে একটি মায়াভীরু বাসনার কাঁটা লুকিয়ে ছিল, সেই কাঁটা আজ ভেঙে গেল, নৃপতি জনক।^{৪৪}

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে 'অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা' গল্পটির আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছেন গল্পকার সুবোধ ঘোষ। এই গল্পটি ভারত প্রেমকথা'র অন্যান্য গল্পগুলির থেকে একটু

আলাদা। ঋষি অষ্টাবক্র এখানে তার ভালোবাসার মানুষ সুপ্রভাকে পাবার জন্য নিজের আসক্তি ও সংযম এর কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মহর্ষি বদান্যের কন্যা সন্তান ছিল সুপ্রভা। অষ্টাবক্র এবং সুপ্রভা উভয়ে মিলিত হতে চাইলে, তাদের আকর্ষণে বদান্য আসক্তি খুঁজে পায়। পরে অষ্টাবক্র সুপ্রভাকে বিয়ে করতে চাইলে বদান্য প্রথমে তাকে কন্যা সম্প্রদান একেবারেই করতে চায় নি। যদিও পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে অষ্টাবক্রের সংযমী মনের প্রমাণ পায় সে। এগুলির মধ্যে দিয়েও বদান্যের সংশয় একেবারে নির্মূল হয়ে উঠে নি, তাই উদীচীর সহায়তায় বদান্য অষ্টাবক্রের আসক্তি ও সংযমকে আরও একবার পরীক্ষা করে নেয়। উদীচীর অপরূপ সৌন্দর্য এবং কঠিন আলিঙ্গন শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পেরেছে অষ্টাবক্র। সমস্ত প্রলোভন ও উদীচীর প্রবল যৌনসঙ্গমের আবেদন শঙ্কার সঙ্গে খারিজ করেছে অষ্টাবক্র। ফলে বদান্যের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায়। তবুও শেষবারের মতো উভয়ের মিলনে বাধা দিয়েছে বদান্য। আশীর্বাদের ছলে অভিশাপ দিয়েছে সে। গল্পে উঠে এসেছে:

বদান্য- কল্পনা করতে পার, কি আশীর্বাদ আমি দান করতে চাই?

অষ্টাবক্র- পারি না মহর্ষি।

বদান্য- আমি এই আশীর্বাদ দিতে চাই, তোমাদের দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তির শেষ লেশও লুপ্ত হয়ে যাক। বল, প্রস্তুত আছ, গ্রহণ করবে এই আশীর্বাদ?^{৪৫}

স্বাভাবিকভাবেই এমন রূঢ় অভিশাপ শোনার পরে উভয়েই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা সহজেই বুঝতে পারে যে এটি আশীর্বাদের মোড়কে বস্তুতপক্ষে অভিশাপই বটে। কিন্তু জ্ঞানী অষ্টাবক্র বদান্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় তারই একটি প্রতিশ্রুতির কথা। সেইটি হল যে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুভ লগ্নে একবার সে আশীর্বাদ করবে অষ্টাবক্রকে। শেষ পর্যন্ত অতীতের সেই প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করানোর মাধ্যমে অষ্টাবক্র প্রার্থনা করে সেই দুর্লভ বর। অষ্টাবক্রের প্রার্থিত বরটি ছিল এরকম যে, আশীর্বাদের ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাদের মৃত্যু হয়। সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসক্তিকেও সুন্দর করে তুলেছেন অষ্টাবক্র। শেষ পর্যন্ত তারা উভয়েই আসক্তির গৌরব ঘোষণা করে দাঁড়িয়েছে বদান্যের কাছে। সুপ্রভার পিতা বদান্য শেষ পর্যন্ত নিজের ভাবনার ভুল বুঝতে সক্ষম হয়েছে। বদান্য বলেছে যে, আসক্তিই প্রেমিক প্রেমিকার জীবনের প্রকৃত বন্ধনের অন্যতম গ্রন্থি। আসলে আসক্তি ছাড়া নর-নারীর সম্পর্ক সম্পূর্ণতা পায় না। সম্পর্কে জৈবিকতা থাকবেই, তার সঙ্গে প্রেমের পরিপূর্ণ সংমিশ্রণেই জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। আসলে লেখক যেন কোথাও বোঝাতে চেয়েছেন সংযম ও ত্যাগ জীবনে চলার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও শুধুমাত্র তা দিয়ে সমগ্রতাকে লাভ করা অসম্ভব। তাই তার সঙ্গে আসক্তিকেও আমাদের প্রয়োজন।

গল্পের শেষ অংশে ফুটে উঠেছে মহর্ষি বদান্য এবং অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার অসামান্য কথোপকথন। যে কথোপকথন আমাদের প্রেমের গভীর সত্যটিকে অনুধাবনে সাহায্য করে।

মহর্ষি বদান্য বলেন— নির্মম পরীক্ষার প্রাণ আনন্দে গলে গিয়েছে অষ্টাবক্র, এই অশ্রু আনন্দেরই অশ্রু। স্বীকার করি সুপ্রভা, তোমাদের সুন্দর আসক্তিই সত্য। স্বীকার করি অষ্টাবক্র, আসক্তিই এই মর্ত্যের মানব ও মানবীর মিলিত জীবনের মালিকা, প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি।

স্নেহে আগ্রহে সুপ্রভা ও অষ্টাবক্র দুই পাণি সমন্বিত করে মন্ত্র পাঠ করেন মহর্ষি বদান্য। তার পরেই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন।— কুঙ্কম ও কেতকীর জীবন চিরসুখী হোক।^{৪৬}

তবে ভারত প্রেমকথা'র সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে তিন-চারটি গল্পকে একেবারেই প্রথম সারিতে রাখতে হয়। এগুলির বিষয়ে আমরা আগে কথা বলি নি। আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে এগুলির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় এই গল্পগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। এগুলির মধ্যে 'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা'র কথা পৃথকভাবে অবশ্যই বলতে হবে। দেহজ প্রেম ও কামনা থেকে দেহাতীত প্রেমে যাত্রার পথটি অসামান্য সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন গল্পকার এই গল্পে। বস্তুত ওই গল্পটিকে অন্যান্য অনেক সমালোচকের মতো আমাদেরও ভারত প্রেমকথা'র শ্রেষ্ঠ গল্প বলে মনে হয়। ওই গল্পটি ছাড়াও 'অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা', 'গালব ও মাধবী' এবং 'ভৃগু ও পুলোমা'র কথা না বললে অন্যায় হবে।

'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা'র গল্প মহাভারতের বন পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। হঠাৎ গল্পটির চরিত্রেরা এবং গল্পবস্তু বনপর্ব থেকেই সুবোধ ঘোষ সংগ্রহ করেছেন। পাণ্ডবেরা বনবাসে থাকাকালীন মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে এই গল্প শুনেছিল। আসলে প্রেমের শক্তি ও ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এমনকী প্রতারকের জীবনকেও অনেকটাই বা পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তন আনতে সক্ষম প্রেম। আসলে পুরুষের গভীর প্রেম নারীর জীবনকে অনেক দিক থেকেই ভীষণভাবে বদলে দেয়। একইভাবে কথাটি আবার উল্টো দিক থেকেও সত্যি। এই গল্পে পুরুষের গভীর সমর্পণ এবং একনিষ্ঠ প্রেমের কথাই মহাভারত এবং গল্পকার ঘোষ দেখাতে চেয়েছেন। আমাদের মহাভারতীয় আখ্যানটি ছিল ঠিক এরকম। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজে রাজাদের মৃগয়াতে যাওয়াটা খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। তাই এমনই একটি ঘটনাতে যাওয়ার সময় রাজা পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে দেখে একেবারে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। যাকে সাধারণ মানুষ সহজ ভাষায় বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম। রাজা প্রণয় নিবেদন করে এবং সুশোভনাও তা গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু প্রেমিকা একটি শর্তই যোগ করে এর সঙ্গে, যেখানে বলা হয় তাকে যদি জল দেখানো হয়, তবে সে সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রেমে অস্থির রাজা পরীক্ষিৎ এই শর্ত মেনে নিয়ে তাকে নিয়ে এসে রাজধানীর একটি গোপন কক্ষে রাখা হয়। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রাণীর পরিচারিকার থেকে

সত্যটি জানতে পেরে একটি চক্রান্ত করে। রাজ্যের রাজা ও রাণীর জন্য একটি চমৎকার রমণীয় উদ্যান তৈরি করে দেয় এবং সেখানে একটি পুকুরও খনন করে রাখা হয়। তারপরে একদিন রাজা ও রাণী উভয়েই বিহারের উদ্দেশ্যে সেই উদ্যানে যায় এবং পূর্বের শর্ত ভুলে গিয়ে সেই পুকুরের জলেও রানীকে নামতে বলে। অতঃপর সেই জল থেকে রানী না উঠলে রাজার বিশ্বাস হয় পুকুরের মণ্ডকেরা বোধ হয় রানীকে খেয়ে নিয়েছে। সেই রাগের বশবর্তী হয়েই রাজা পরীক্ষিৎ সমস্ত মণ্ডক কুল ধ্বংসের পথে নামে। শেষ পর্যন্ত মণ্ডকদের রাজা এসে স্বয়ং পরীক্ষিতকে জানায় যে, তারই মেয়ে সুশোভনা। তার কাছে এরকম বিষয়টি একপ্রকার খেলার মতোই। সুশোভনা এর পূর্বেও এরকম ঘটনা অনেকগুলি করেছে। সমস্ত ঘটনাটি শোনার পর পরীক্ষিৎ তার স্ত্রীকে ফিরে পেতে চাইলে মণ্ডকরাজ সুশোভনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। মহাভারতীয় এই আখ্যান বর্তমান সময়ের মতো করে নিজের মতন সাজিয়েছেন গল্পকার ঘোষ।

গল্পকার ঘোষ প্রথম থেকেই সুশোভনার একটি চরিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন গল্পে। দেখানো হয়েছে হৃদয়হীনা, প্রকৃত নারীর ধর্ম বিরোধী একজন রমণী হিসাবে। যে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে পুরুষের মন বিজয়ের জন্য অভিসারে যায়। কিন্তু কিছু সময় প্রেমিকের সঙ্গে একত্রবাসে কাটাবার পরেই আবার প্রেমের বন্ধন থেকে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় গুটিয়ে নেয়, ফিরে আসে নিজের পূর্বস্থানে। অন্যদিকে প্রেমিকের মন এই ক্ষণস্থায়ী প্রণয়ে তৃপ্তি পায় না। তাই তীব্র আশাহত ও বেদনায় প্রেমিকের মন একেবারেই ভেঙে পড়ে। গল্পে সুশোভনার সহচরী সুবিনীতা তাকে এরূপ কাজের জন্য ধিক্কার দেয়। যদিও সুশোভনা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে কারও প্রিয়া বা স্ত্রী হওয়ার জন্য তার মন স্থির নয়, সেটি তার কাম্যও নয়। বরং তা তার কাছে মৃত্যুর সমতুল্য। ঠিক এই কারণেই তার পিতা স্বয়ম্বরসভা বা বিবাহসভার আয়োজন করলেও তা সফলতা পায় নি।

এরকম একাধিক অভিসার যাত্রার শেষে রাজা পরীক্ষিতের পালা আসে। মৃগয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে পরীক্ষিৎ। অনেকটা যাত্রার পর একটা সময় পরীক্ষিৎ সুশোভনার দেখা পায়। বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে রাজা, যেন তার সৌন্দর্যের ভ্রম সহজে কাটতেই চায় না। গল্পকার এই দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

বিশ্বাস করতে পারছি না বিশ্বোষ্ঠী। সপ্তকীমেখলা ঐ কৃশকটিতট, মুক্তাবলীশোভিত ঐ সুধাধবল
কণ্ঠদেশ, কুঙ্কুমাক্তিত ঐ কোমল বক্ষঃপট; তোমার কবরীর ঐ চন্দ্রোপল আর ঐ সপ্তস্বর
বিপক্ষী, এ কি পরিচয়হীনতার পরিচয়?

—আমার পরিচয় আমি। এছাড়া আর কোন পরিচয় জানি না।

নীরবে অপলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ।^{৪৭}

গল্পের একটু পরের অংশেই আবার পাই:

ক্ষণিকের জন্য নিরন্তর হয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ। দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। তারপরেই প্রেমবিধুর কণ্ঠস্বরে আহ্বান করেন—মণিময় ভবনে নয়, আমার মনোভব ভবনে এস সুতনুকা। প্রণয়দানে ধন্য কর আমার জীবন।^{৪৮}

প্রেমের প্রথম পর্বের যাবতীয় রোমাঞ্চ আপাতত কাটলে রাজা সুশোভনাকে রাজধানীতে নিয়ে আসে। রাণীর বা প্রেয়সীর শর্ত মেনেই তাকে রাজভবনে রাখা হয়। কিন্তু কালক্রমে সুশোভনার চক্রান্তে বা পরিকল্পনায় রাজা জড়িয়ে পড়ে। অপরিচিতা নারীকে অল্পদিনের মধ্যেই নিজের হৃদয়ের গভীরে রাজা স্থান করে দেয়। পরে একদিন ছলনাময়ী নারী রাজাকে প্রতারণার ছলে সরোবরে নিয়ে যায়, নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে সুশোভনা রাজাকে প্রতারণা করে। এরই মধ্যে রাজার যাবতীয় পূর্ব স্মৃতি ফিরে এলে নিজের ত্রুটি বুঝতে পারে, সে নিজেই ভুলবশত স্ত্রীকে সরোবরের জল দেখিয়ে দিয়েছে। ফলস্বরূপ সরোবরে সুশোভনা হারিয়ে গেলে রাজা হারিয়ে যাওয়া নিজের প্রেয়সীকে খুঁজে পাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। পরীক্ষিৎ মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায় সমস্ত অভিশাপকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য, যে অভিশাপ তাদের উভয়কে বন্ধন থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে কোনও অভিশাপই ছিল না, সমস্তটাই সুশোভনার মিথ্যা বুলির একপ্রকার নির্মাণ ছিল। রাজার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এক ছলনার আশ্রয় নেয় সুশোভনা, সরোবর তটের চারিদিক শূন্য করে সরে যায় সে। তার মনে হয় সরোবরের জলেই হয়তো প্রিয়ার সমাধি ঘটেছে, কিন্তু রাজার সন্দেহ আরও গভীর হয় যখন সে দেখতে পায় কতগুলি প্রেতের ছায়া এসে সুশ্বেতা কলহংসীর মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়। এরকম অবস্থায় চরের মূর্তিটি যে একটি মণ্ডকের তা বুঝতে পেরে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ মণ্ডককূলের সঙ্গে পরীক্ষিৎ একপ্রকার ভীষণ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের ফলে মণ্ডক সমাজ প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়ে। অন্যদিকে পরীক্ষিতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সুশোভনা সাফল্যের হাসি হাসতে থাকে। কারণ ভালোবাসার এই খেলার মধ্যেই তার মানসিক ও শারীরিক আনন্দ আছে। সুশোভনা তার সখীর কাছে যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ রাজমহলের মধ্যেই পেয়েছিল, পরীক্ষিতের ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র মণ্ডক সমাজকে ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা সুশোভনাকে অবশ্যই ভীত করেছিল। ইতিমধ্যে সুশোভনার পিতার মারফত পূর্বের যাবতীয় ঘটনা এবং রাজকন্যা সুশোভনার চরিত্র সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই পরীক্ষিৎ জানতে পেরেছে। সুশোভনার ধারণা ছিল যে তার পূর্ব জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা ও চরিত্রহীনা নারী প্রকৃতির রূপ জানতে পেরে পরীক্ষিৎ হয়তো ফিরে যাবে। কিন্তু গল্পে এমনটা হয় না। সমস্ত ঘটনাটি জানার পরেও পরীক্ষিৎ পূর্বের মতোই প্রেয়সীর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে। সুশোভনাকেই গ্রহণ করতে চাই নিজের স্ত্রী হিসাবে। গল্পে শেষবারের মতো সুশোভনা সখীর হাতে সজ্জিতা হতে চেয়েছে, এইবারে তার বাসনা জন্মেছে

বধূর সাজে সজ্জিত হবার। সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেমিক পরীক্ষিতের বিরহী আত্মার কথা ভেবে সুশোভনার হৃদয়ে সুগু নারী হৃদয়টি জেগে উঠেছে। পুরুষের প্রেমের মহিমায় নারী এখানে শেষপর্যন্ত নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। নারীর সমস্ত ছলনা এবং নিষ্ঠুরতা পুরুষের প্রেমের কাছে মাথা নত করেছে এই গল্পে। এরই সঙ্গে গল্পকারের ভাষা ব্যবহার এবং উপস্থাপন পদ্ধতি পাঠকদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

সুবিনীতা বলে- পরীক্ষিতের কাছ থেকে বার্তা এসেছে।

-কি?

-তিনি তোমার আশায় রয়েছেন।

- এ কি সম্ভব?

- এ সত্য।

- তিনি কি শোনেননি, আমি যে এক শুচিতাহীনা মসিলেখা মাত্র?

- সব শুনেছেন।

... ..

সুবিনীতার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সুশোভনা।— আজ আমার জীবনে শেষ

অভিসারের লগ্ন এসে গিয়েছে সুবিনীতা। সাজিয়ে দাও কিংকরী, আর সুযোগ পাবে না।^{৪৯}

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব থেকে ‘গালব ও মাধবী’র আখ্যানটি নেওয়া হয়েছে। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে এই গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অযথা কথা কাটাকাটির বা তর্কের কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে তার যথার্থ দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। গালব এবং মাধবীর সম্পর্কের মূলেও রয়েছে নিষ্ঠাবতী নারীর প্রেম। যদিও মহাভারতের কাহিনি গল্পের প্রয়োজনেই অনেকটা আধুনিক করে নিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। মহাভারতের কাহিনিটি ছিল এরকম- গুরু বিশ্বামিত্র’র থেকে যাবতীয় শাস্ত্রীয় ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তারই শিষ্য গালব গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে বিশ্বামিত্র এই বিষয়ে উৎসাহ দেখায় নি বা নিজে থেকে গুরুদক্ষিণার বিষয়ে কোনও বস্তু চায়ও নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, গালবের নিজের থেকে গুরুদক্ষিণা প্রদানের বিষয়ে বারবার অনুরোধ জানানো হলে ঋষি বিশ্বামিত্র একপ্রকার দুর্লভ দাবি করে বসে। তার কাম্য বস্তুটি ছিল চন্দ্রের মতো সাদা এবং একটি কান শ্যামবর্ণ এরূপ আটশোটি ঘোড়া। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ঘোড়া সহজে মেলার কথা নয়, কিন্তু গুরুদক্ষিণা যখন চাওয়া হয়েছে তখন তা দেওয়াটাই রীতি। প্রাথমিকভাবে বড়ো বিপদের আশঙ্কায় গালব বিম্বুকে স্মরণে আনে, তখন গরুড় এসে তাকে অত্যন্ত দানশীল রাজা যযাতির কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু যযাতির কাছেও এরকম ঘোড়া না থাকার কারণে তারই কন্যা মাধবীকে দান করে। যযাতির বক্তব্য ছিল সুন্দরী মাধবীর শুদ্ধ হিসাবে ঘোড়াগুলি রাজারা দেবে। তাই এর ফলে মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে গালব একাধিক রাজার কাছে যায় এবং পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাজার কাছে উপস্থাপন করা

হয়। রাজা হর্যশ্ব, কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে গালব গেলে তারা প্রত্যেকেই দুশো ঘোড়া দিয়ে মাধবীর গর্ভে পুত্র সন্তান উৎপাদন করল। শেষে ঋষি বিশ্বামিত্র মাধবীকে গ্রহণ করে। গালবের গুরুদক্ষিণা শেষে দেওয়া গেলেও আখ্যানের অভিমুখ অন্যদিকে যাত্রা করে। কাহিনিতে মাধবীকে বিক্রিত পণ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে। এত মহৎ কাজ করার জন্যই এতগুলি পুত্র সন্তান উৎপাদন করা সত্ত্বেও মাধবীকে মহাভারত কুমারী হিসাবেই দেখেছে, তাই তার বিবাহ সভার আয়োজনও করা হয়েছিল। কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান করে অরণ্যচারিণী হয়ে যায়। একপ্রকার সন্ন্যাসিনীর মতোই জীবন যাপন করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে নিজ কন্যার এই পুণ্যবলেই এবং গালবের তপস্যার অষ্টম ভাগ নিয়ে যযাতি স্বর্গে যায়। এরকম ঘটনার ফলে যযাতির স্বর্গ লাভ হলেও মহাভারতের পাঠক বা দর্শক বিষয়টিকে সহজে মেনে নিতে পারে না। আমাদের মনের মধ্যে একপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সংকট ভালোভাবেই কাজ করে।

মহাভারতের এই আখ্যানকেই নতুন করে রূপ দিয়েছেন গল্পকার ঘোষ। মহাভারতের যযাতি সুবোধ ঘোষের গল্পে অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাভারতের অর্থবান ও দানশীল রাজা যযাতি গল্পে পৌরাণিক রাজা যযাতির মতো না হলেও নিজের সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর। তার জন্য যেকোনও বিষয়কেই দান করতে সে প্রস্তুত। কিন্তু গল্পে দেখানো হয়েছে যযাতি এখানে দানের প্রশ্নে লোকনীতির প্রকৃত তত্ত্বই জানে না। বলা বাহুল্য, কাকে দান করা হচ্ছে এবং কী দ্রব্য দান করা হচ্ছে এরকম অসংখ্য বিষয়গুলি দানশীলতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। গল্পে গালব এই বিষয়গুলি রাজাকে বোঝাতে চেয়েছে। পুণ্য শুধু করলেই হয় না, যে পথে পুণ্য অর্জন করা হচ্ছে সেইটিও পুণ্যময় হওয়া দরকার। মানুষ কর্মব্রতের এই সহজ নীতি অস্বীকার করলে, মানুষের অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সুবোধ ঘোষের গল্পে রাজা যযাতি এসবের কোনও গুরুত্ব দেয় নি। রাজর্ষিদের মতো সেও স্বর্গে থাকতে চাওয়ার জন্য গালবের প্রার্থিত দানটি সম্বন্ধে বিশদে বিবেচনা করে নি, না ভেবেই নিজ কন্যা মাধবীকে দান করে দেয়। সুবোধ ঘোষের গল্পে মাধবী এই দান সম্পর্কে রাজাকে প্রশ্ন করেছে। কার কাছে এবং কেন তাকে দান করা হল? মহাভারতের মাধবী এই প্রশ্ন করে নি। সেখানে বিনা প্রশ্নেই সে পিতার আদেশ পালন করেছে।

সুবোধ ঘোষের গল্পে অভিসারিকা মাধবীর পদধ্বনি আমরা পাই। নিজের যথাযথ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মাধবী এখানে গালবের প্রতি মানসিকভাবে দুর্বল, বারবার নিজের রূপের ঐশ্বর্য দিয়ে প্রেমিককে কাছে পেতে চেয়েছে। কিন্তু মাধবীর কোনও ডাকেও গালব সাড়া দেয় নি, যুবতী নারীর কামনা ও বাসনা প্রতিমুহূর্তেই যেন গালবের থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। গল্পকার ঘোষের নির্মিত আধুনিক নারীর কণ্ঠে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে, মাধবী জানিয়েছে সে বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। আসলে মাধবীরা আশা ছিল যে, গুরুদক্ষিণা শোধ হওয়ার পর তার আস্থানে নিশ্চয়ই গালব সাড়া দেবে। গুরুদক্ষিণার পর্ব শেষ হওয়ার পর যে বিবাহ সভার আয়োজন যযাতি করেছিল

সেখানে মালা হাতে মাধবী গালবের অপেক্ষাতেই থেকেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাধবীর কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক পুরুষ না আসার ফলে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে অরণ্যে দিনযাপনের উদ্দেশ্যে সে পাড়ি দেয়। অরণ্য তাকে মোহ থেকে মুক্তি দিয়েছে। গল্পের শেষে দেখতে পাই একসময় মাধবী তার পুণ্যের অংশ পিতাকে দান করে মুক্তি দেয়। অন্যদিকে তপস্বী গালবও তার যাবতীয় জ্ঞান ও পুণ্য যযাতিকে দান করে। গল্পের শেষে দেখতে পাই অন্য এক গালবের ছবি, যে গালব এতদিন মাধবীর ডাকে কোনও সাড়াই দেয় নি, সেই এখন নিজের সকল অহংকার ও জ্ঞান তুচ্ছ করে মাধবীকে পেতে চায়। গল্পের শেষে গালবকে আমরা দেখি যে, মাধবীর হাতের ছিন্ন বরমাল্যের সূত্রের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। আসলে মহাভারতের কাহিনি বা চরিত্রকে অপরিবর্তিত রেখেও গল্পকার খুঁজতে চেয়েছেন আধুনিক মানুষের জীবন সংকটকেই। প্রেমিকা মাধবী গালবের কর্তব্যে সহায়তার জন্য নিজের নারীত্বকে একপ্রকার বিসর্জনই দিয়েছে, তবুও প্রেমিক গালবের প্রতি তার বিশ্বাস অটুট ছিল। গালব নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকেছে এবং যথার্থ গুরুদক্ষিণা প্রদানের মাধ্যমে যশ ও খ্যাতির জন্য লালায়িতও ছিল যথেষ্ট। প্রথম দিকে নিজের কর্মের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলেও পরবর্তীতে গালব তার প্রেমিক সন্তাটি নিয়ে হাজির হয়েছে মাধবীর স্মৃতির কাছে। মহাভারতের কাহিনিতে গালব ও মাধবী নিজেদের পুণ্যের অংশটুকু যযাতিকে দান করেই ক্ষান্ত থেকেছে। কিন্তু সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রতীকী ব্যঙ্গনায় এই দু'টি চরিত্রের দানের মাধ্যমে তারা নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই বাস্তবিকে সহজে পাওয়া যায়। সুবোধ ঘোষের কলমে গালবের প্রতি মাধবীর যন্ত্রনা ও হাহাকার অত্যন্ত তীব্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের অনেক জায়গাতেই পাঠকের মনে হয় মাধবীর কথাগুলি যেন একনিষ্ঠ প্রেমিকার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে। এরই মধ্যে থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করব।

মাধবী- তোমার শুভার্থিনী ও কল্যাণকামিকা, তোমার চরণের স্পর্শের জন্য প্রণামনমিতা এই মাধবীর জন্য একটুও মমতা আর একটুও লোভ হয় না গালব?... ..

পুরুষস্পর্শে আহত বীণাতন্ত্রী মত বেজে ওঠে মাধবীর কণ্ঠস্বর- দুঃসাহসী ঋষি, সন্ধ্যাকাশের ঐ সুন্দর শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বল দেখি, কোন প্রয়োজন নেই?

গালব- প্রয়োজন নেই।^{৫০}

অটুহাসিনী প্রগলভা মাধবী হঠাৎ বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, উদগত অশ্রুধারা নিরোধের জন্য দু'হাতে চক্ষু আবরিত করে। পরমুহূর্তে দুর্বলা লতিকার মত ঋষি গালবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।- একবার লুন্ধ হও ঋষি, মুগ্ধ হও নিমেষের মত। পিতা যযাতির দান এই কুমারীর অনুরাগ প্রতিদানে সম্মানিত কর, ঋষি সুকুমার! এখনও সময় আছে, কথা

দাও তুমি, তাহলে এই মুহূর্তে এই রাজ্যশ্রীর রত্নাভরণ দিবোদাসের সম্মুখে অবহেলাভরে নিষ্ক্ষেপ করে চলে আসি।^{৫১}

কোথায় তুমি গালব? আজ তুমি মুক্ত, আমিও মুক্ত। এস তোমার কুবলয়সদৃশ নীলনয়নের দু্যুতি নিয়ে; তোমারই জন্য সমর্পিত তনুমনপ্রাণ, তোমারই জন্য পণ্যায়িতা হয়ে অনেক বেদনা সহ্য করেছে যার যৌবন, সেই যাত্যাতিকন্যা মাধবীর স্বাধীন হৃদয়ের বরমাল্য কণ্ঠে গ্রহণ করে তাকে তোমার জীবনসহচরী করে নিয়ে চলে যাও। তুমি তো এখন ঋণমুক্ত, শান্ত সম্মানিত ও সুখী, তবে এখন এই বৈভবহীন প্রাসাদ থেকে পুষ্পাস্থিতা ব্রততীর মত মূল্যহীনাকে উদ্ধার করে নিয়ে তোমার প্রেমের স্পর্শে অমূল্য করে তুলতে বাধা কই তোমার?^{৫২}

মহাভারতে মাধবীর ঘটনাটি নিয়ে বিদ্যায়তনিক স্তরে একাধিক আলোচনা হয়েছে। গল্পকার ঘোষ ও আধুনিক দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে দিয়ে গালব ও মাধবীর একটি নতুন আখ্যান নির্মাণ করেছেন। তাঁর চরিত্রেরা সমকালীন যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বলা বাহুল্য, বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনারও একাধিক অভিমুখ আছে। নারীবাদী পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখও এখানে আছে। অনেক যশস্বী সাহিত্যিক থেকে সাহিত্য সমালোচকরাও এটি নিয়ে নিজেদের উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধিক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। আখ্যানের শেষে যখন দেখতে পাই গালবের উদ্দেশ্য পূরণের পর মাধবীও দায়মুক্ত হয়ে চলে গেল, এটার বিষয়ে বিশিষ্ট ভারততাত্ত্বিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র মতামতটিকেই আমরা গ্রহণ করেছি। কারণ এই আখ্যানের এই অংশটি আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের প্রদর্শন এবং শুধুমাত্র পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই 'ভোগ্য বস্তু' হিসাবে নারীকে ভোগ করা এবং উদ্দেশ্য পূরণের পর তার কোনও মতামত না জেনেই তাকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে একপ্রকার অন্যায় তো থাকেই। সেক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করাও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মাধবীর এই কাহিনির অন্য একটি পাঠও আছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র সেই মতটিকেই আমাদের অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তাঁর *মহাভারতের অষ্টাদশী* নামক বইতে মাধবী সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্বেষণ আছে। সেখান থেকেই দু'একটি বলার চেষ্টা করব। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখিয়েছেন মাধবী বাহ্যিক চাপিয়ে দেওয়া কোনও শর্তে বা পিতৃতন্ত্রের জোরপূর্বক নির্দেশে বাধ্য হয়ে গালবের গুরুদক্ষিণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাজাদের সঙ্গে যৌন মিলন করে নি। বাহ্যিক জোর নয়, বরং মাধবীর নিজের ইচ্ছা এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে যৌনতা বা একাধিক যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে আমাদের মহাভারত আজকের সমাজ ব্যবস্থার থেকে অনেক বেশি উদার। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখিয়েছেন মহাকাব্যিক রমণীরা যৌনতাকে একেবারেই মধ্যযুগীয় স্পর্শকাতরতায় গ্রহণ করে নি।

যাতি যে মুহূর্তে তাঁকে গালবের হাতে দিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি জানেন যে, তিনি কোনও রাজা-মহারাজার কণ্ঠলগ্না হতে যাচ্ছেন এবং নিজের শরীর সম্বন্ধেও তিনি এতটাই সচেতন যে,

তিনি জানেন- তাঁকে দেখলেই অতিবড় রাজারও ভোগস্পৃহা জন্মাবে। কিন্তু ভোগেচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতেও তাঁর খুব একটা ছুঁমার্গ নেই। বরং একটা নয়- গালবকে তিনি যখন প্রত্যেক প্রসবান্তে কন্যাভাবে খবর শোনাচ্ছেন, সেই মুহূর্তেই মাধবী বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি খুব 'ডিটাচড' ভাবেই অন্যান্য রাজাদের যৌন আচরণে সাড়া দিতে পারেন, তাঁর দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই।^{৫৩}

মাধবীর শেষ পর্যন্ত তপোবনে চলে যাওয়াটা অনেক সমালোচক অথবা একনিষ্ঠ মহাভারতের পাঠকই মনে করে বহুপুরুষোভুক্তা নারীর বিকল্পহীন আশ্রয় হিসাবে। কিন্তু প্রাবন্ধিক ভাদুড়ীর মতো আমাদেরও মনে হয় এরকম সরলীকরণ হয়তো সত্য নয়। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এক্ষেত্রে এতটাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা একেবারেই অসম্ভব আমাদের পক্ষে।

দেখুন মাধবী যে তপোবনকেই বর হিসেবে বেছে নিলেন, অথবা তপোবনে তপস্যার ইচ্ছেটাই যে তার মধ্যে বেশি প্রকট হয়ে উঠল— এই ঘটনাটাকে যে আমরা তাঁর দিক থেকে খুব বড় একটা প্রতিবাদ বা পিতার প্রতি তাঁর অভিমান-প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করব, সেটাও খুব মহাভারত-বোধের পরিচয় হবে না। আমি জানি, এখানে অনেক লেখক-লেখিকাই আধুনিক যুগের লেখ্যধারার করুণায় মাধবীর তপোবন আশ্রয়ের ইচ্ছেটাকে এক অসহায় বহুপুরুষোভুক্তা নারীর বিকল্পহীন আশ্রয় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন; তাঁদের জানাই মহাভারতের নারীরা রামায়ণের নারীর মতো এত অসহায়বৃত্তি নন। তাঁদের অনেকের মনের মধ্যেই অনেক দূরন্তপনা আছে। বিশেষত যে-রমণী স্বেচ্ছায় চার-চারজন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন বিনা কোনও মানসিক তাড়নায় এবং বিনা কোনও মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর তপোবন আশ্রয়ের ঘটনাকে মহাভারতোচিত-ভাবেই একটা বৈরাগ্যের উদাহরণ হিসেবে, এমনকী খুব উদার এক বৈরাগ্য-বিলাস হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

মহাভারতে এই বৈরাগ্যটা অনেক ক্ষেত্রেই একটা 'ট্রেইট' হিসেবে কাজ করে। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক মাধবীর ব্যাপারে 'অ্যাবান্ডান্' কথাটা খুব করুণাঘনভাবে ব্যবহার করেছেন। আমরা বলব- ওই 'অ্যাবান্ডান্'-টাই খুব গভীরভাবে মহাভারতের 'ট্রেইট', ওটাই মহাভারতের শেষ রস। একটা ভয়ংকরী সর্বগ্রাসী আসক্তি থেকে হঠাৎই একটা নিরাসক্তিতে চলে যাওয়া, আসক্ত হয়েও অনাসক্ত থাকা— এই অসম্ভব 'অ্যাবান্ডান্' মহাভারতের মুনি-ঋষি থেকে আরম্ভ করে অনেক মনুষ্যচরিত্রের মধ্যেও কাজ করে এবং তা নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে। পরাশর সত্যবতীকে উপভোগ করে মহাভারতের কবির পরম অভ্যুদয় ঘটিয়ে চলে গেলেন ছেলেকে নিয়েই। তারপরেই অনাসক্তি। তিনি আর ফিরে আসেননি। আবার সত্যবতীর দিক থেকেও কোনও অনুশোচনা নেই, কোনও ভাবনাই নেই। এটাও একটা 'অ্যাবান্ডান্'। একই কথা কুন্তীর সূর্যসম্ভোগের ক্ষেত্রেও খাটে, খাটে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও।... ..^{৫৪}

মহাভারতের ‘ভৃগু ও পুলোমা’র আখ্যান আমরা আদি পর্বে পাই। গল্পকার ঘোষ তাঁর গল্পের চরিত্র ও মূল ভাবনা সেখান থেকেই নিয়েছেন। আসলে দাম্পত্য সম্পর্কে সন্তান আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহিত জীবনে একাধিক সমস্যা, পরিবারের জটিলতা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকট সমাধানে সন্তানই অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রেম যদি আংশিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েও যায় অথবা জীবন যদি প্রেমহীন হয়েও থাকে, সেক্ষেত্রেও দুইটি মানুষের মাঝে হৃদয়ের সেতুবন্ধন করে রাখে সন্তানই। এই বিষয়টি অতীতেও যেমন সত্য ছিল, বর্তমানেও তাই। খুব একটা অস্বীকারের উপায় নেই। এই কথার অর্থ অস্বস্তিকর বা পেঁচিয়ে যাওয়া দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য শুধুমাত্র সন্তানকেই যে পৃথিবীতে এনে করতে হবে, তা হয়তো নয়। যদি তাই হতো তাহলে পৃথিবীর কোনও দাম্পত্য সম্পর্কই হয়তো সহজে ভেঙে যেত না। তাই সন্তানই সম্পর্ক স্থায়িত্বের একমাত্র উত্তর বা সমাধান নয়, কিন্তু অনেকগুলি সমাধানের মধ্যে এটিও একটি হতেই পারে। গল্পকার সুবোধ ঘোষের গল্পটিকে এই ভাবনার মধ্য দিয়ে পড়া যেতে পারে। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে তাকেই আরও একবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুবোধ ঘোষ। গল্পকার ঘোষের গল্পে প্রবেশের আগে মহাভারতের প্রকৃত ঘটনাটি একবার দেখা যাক। আদিপর্বের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ভৃগুর স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী এবং ধর্মপরায়ণ ছিল। ভৃগু একদিন স্ত্রীকে অগ্নির পাহারায় রেখে স্নান করতে যায়। সেই সময়ে দৈত্য পুলোমা ভৃগুর গৃহে এসে হাজির হয়। সেই কারণে ভৃগুর স্ত্রীও অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখে না। এই দৈত্য পুলোমা বহুদিন ধরেই ভৃগুর পত্নী পুলোমাকে পছন্দ করত। একসময় উভয়ের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনাও ছিল, কিন্তু সেই বিয়ে ভৃগুর সঙ্গে হয়। বাড়িতে পাহারারত অগ্নিকে দৈত্য পুলোমা জিঞ্জেস করে পুলোমা প্রকৃতপক্ষে কার স্ত্রী? এরপর বিভিন্ন কথোপকথন ও যুক্তিতে পরাজিত হয়ে অগ্নি স্বীকার করে যে পুলোমা প্রকৃতপক্ষে দৈত্য পুলোমারই। এই কথার পরেই ভৃগুর পত্নী পুলোমাকে হরণ করা হয়, পথে তার সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানের নাম চ্যবন। এরপর শিশু চ্যবনের দর্শনে ভস্ম হয়ে যায় দৈত্য।

মহাভারতের এই কাহিনি সুবোধ ঘোষ নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছেন। মহাভারতের কাহিনির মধ্যে এখানে সংযুক্ত হয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংকট। মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে পুলোমার, ভৃগু শুধুমাত্র পুত্র সন্তান লাভের জন্যই বিবাহ করেছে। তাই পুলোমা এখানে মহর্ষি ভৃগুর ধর্মপত্নী। কিন্তু পত্নী পুলোমার এর বাইরেও আরও কিছু প্রাপ্তির আশা দাম্পত্য জীবনে ছিল, সেইটি হল স্বামীর ভালোবাসা ও প্রেম। তাই তাদের মধ্যে প্রেমজ সম্পর্ক দৃঢ় ও গভীর না হওয়ার কারণে দাম্পত্য জীবনে একপ্রকার গুঞ্জন পুলোমা অনুভব করেছে। কিন্তু তারই মধ্যে আবার তাদের সন্তান পুলোমা গর্ভেও ধারণ করেছে। কিন্তু একদিন ভৃগু স্ত্রী পুলোমার জীবনে হাজির হয় এক সত্য, যা তার জীবনে এতকাল অপূর্ণ ছিল। সত্যের ডালি নিয়ে হাজির হয় প্রথম যৌবনের

প্রণয়াস্পদ দৈত্য পুলোমা। তাই অতিরিক্ত দ্বিধা না রেখেই দৈত্যের সঙ্গে পালিয়ে যায় ভৃগুর পত্নী। কারণ দৈত্যের ডাকে ছিল আন্তরিক আহ্বান, যার কারণেই যাবতীয় সমাজ সংস্কার ও বাঁধা অতিক্রম করে ভৃগুর স্ত্রী চলে যেতে পেরেছে। এমনকী গৃহ গুরু হতাশনও জীবনের এই সত্যকে স্বীকার করেছে। ক্ষণকালের এই অনুভূতি অবশ্য কঠোর বাস্তবের কাছে এসে প্রবল আঘাত পেয়েছে, পুলোমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভৃগুর সন্তানকে সে গর্ভে ধারণ করেছে, আবার অন্যদিকে দৈত্য পুলোমার সঙ্গে সে চলেও যেতে চায়— বাস্তবে এই দু'টি বিষয় একসঙ্গে ঘটা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ভার্গবকে পৌলমেয় করে দেওয়ার অধিকার তার নেই। তার সন্তানের কাছে পিতৃপরিচয় চিরকাল অজানা থাকবে এটা ভেবে কষ্টও পেয়েছে পুলোমা। আর্য হয়ে অনার্য পুলোমাকে সে বরণ করতে পারে না। তাই সন্তান জন্মের সময় দৈত্য পুলোমা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে সে। এই বিরহ বেদনায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে দৈত্য পুলোমা। ভৃগু স্ত্রী পুলোমা সন্তান জন্মের পর স্বামীর গৃহে ফিরে এসেছে, তার কোলে তখন সন্তান আছে। ঋষি তাকে গ্রহণ করতে রাজি হয় নি, যার জন্য শুধুমাত্র সন্তানের জননী হয়েই আশ্রমের এক প্রান্তে থাকতে চেয়েছে সে। প্রসঙ্গত এও জানায় সে, হতাশনের সম্মতি নিয়েই তাকে দৈত্য হরণ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত এই হতাশনের মুখ দিয়েই প্রেমের গভীর সত্যটি গল্পকার সুবোধ ঘোষ তাঁর পাঠকদের জানান। মহাভারতে অগ্নি অভিশপ্ত হয়ে চলে যায়, কিন্তু এখানে হতাশন জানায় প্রকৃত কথাটি। প্রেম তত্ত্বের প্রকৃত সত্যটি এই— দৈত্য অনার্য পুলোমা নিজের হৃদয়ের সমস্তটা দিয়েই তার প্রেমিকাকে চেয়েছিল, ফলে স্ত্রী পুলোমা সেই প্রেমের টানেই চলে যায়। অন্যদিকে শুধুমাত্র পুত্র সন্তান লাভের জন্যই ধর্মপত্নী হিসাবে পুলোমাকে গ্রহণ করেছিল ঋষি ভৃগু। শেষ পর্যন্ত প্রেমিক অনার্য পুলোমাকে চোখের জলেই শ্রদ্ধা জানিয়েছে স্ত্রী পুলোমা। শেষ পর্যন্ত সন্তান সহ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নেয় ঋষি ভৃগু। এখানে বড়ো হয়েই দেখা দিয়েছে যে স্ত্রী পুলোমা তার সন্তানকে স্বামীর পরিচয় থেকে বঞ্চিত রাখতে চায় নি, তাই শুধুমাত্র সন্তানের বন্ধনই তাদের সম্পর্ককে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে।

হতাশন বলেন—জীবনের প্রথম প্রণয়, জীবনব্যাপী এক প্রেমিকতার তৃষ্ণা পুলোমাকে অপহরণ করেছিল ঋষি। সে ইতিহাস আমি জানি, আমি তার সাক্ষী, তাকে নিতান্ত মিথ্যা মনে করতে পারি না। আমি আপনাদের মত শিক্ষাগুরু নই, আপনাদের তত্ত্ব দিয়ে সত্য-মিথ্যার বিচারও আমি করি না। আমার কাছে ঘটনাই একমাত্র সত্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন হতাশন। তারপর রুঢ়ভাবে একেবারে স্পষ্ট করেই বলেন— আপনি পুত্রার্থে পুলোমাকে চেয়েছেন, আর সেই অনার্য প্রেমিক পুলোমার জন্যই পুলোমাকে চেয়েছে। এই দুই চাওয়ার দ্বন্দ্ব তিনটি জীবনের জয়পরাজয়ের পরীক্ষা হয়ে গেল। সংসারে তারও সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি।^{৫৫}

‘অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা’র কাহিনি মহাভারতের বন পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। বংশ রক্ষার তাগিদে পুরুষ ভুলে যায় হৃদয়ের অস্তিত্বকে। কিন্তু নারী চায় পুরুষের প্রেম তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারায় আছে সম্পর্কের বাঁধন। লোপামুদ্রা এবং অগস্ত্যের গল্পে আসলে ব্রতচারীর হৃদয়ের আড়াল থেকে উদঘাটিত হয় প্রেম। এখানেও গল্পকার ঘোষ মহাভারতের কাহিনি থেকে অনেকটাই পৃথকভাবে নিজের গল্পকে নির্মাণ করেছেন। মহাভারতীয় এই আখ্যান বন পর্বে আমরা পাই। কাহিনিটি সেখানে এরকম ছিল তা আমরা বলার চেষ্টা করছি। মুনি একদিন দেখতে পায় একটি গর্তের মধ্যে পূর্বজ পিতৃপুরুষেরা ঝুলে আছে, প্রশ্ন করে নিজের পরিচয় মুনি জানালে তখন জানা যায় তাদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে বলেই তাদের এই অবস্থা। তখন ঋষি তাদের যথাযথ আশ্বাস দেয় এবং এটাও বলে যে তারা যাতে নিশ্চিন্তে স্বর্গে যেতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই অগস্ত্য করবে। পরে অনেকটা অশ্বেষণের পরেও নিজের জন্য উপযুক্ত স্ত্রী অগস্ত্য পায় না। অন্যদিকে সন্তান না থাকার কারণে বিদর্ভরাজেরও একটি সন্তান প্রয়োজন ছিল, ঋষির কাছে এটি প্রার্থনা করলে তখন অগস্ত্য জগতের প্রত্যেকটি সত্তার থেকে উত্তম অঙ্গ সংগ্রহ করে একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা সৃষ্টি করে। তারপর ঋষি সেই শিশু কন্যাকে বিদর্ভরাজাকে দান করে। স্বাভাবিকভাবেই এই অসাধারণ সুন্দরী কন্যার পরিচর্যার জন্য রাজা প্রচুর দাস দাসী রেখে দেয়। বিবাহের সময় এলে অপরূপ সুন্দরী এই নারীকে কেউই অগস্ত্যের ভয়ে বিবাহ করতে রাজি হয় না। স্বাভাবিকভাবেই যথাসময়ে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে না পারার কারণে রাজা চিন্তাশীল হয়ে পড়ে এবং কী করণীয় তা ভেবে কোনও দিশা পায় না। তারপর একদিন ঋষি অগস্ত্য নিজে এসে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাজা সম্মত হয় না, তখন ঋষির ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য লোপামুদ্রা নিজেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। বিবাহের পরও ঋষি নিজের খেয়ালেই চলে। দিনরাত তপস্যা এবং ঈশ্বরের উপাসনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এ সময় লোপামুদ্রাও নিজের কর্তব্যে কোনও গাফিলতি করে নি। পরবর্তী সময়ে সন্তান জন্মের জন্য একদিন লোপামুদ্রাকে অগস্ত্য আহ্বান করে। লোপামুদ্রা তখন স্বামীর থেকে প্রেম প্রার্থনা করে এবং পিতৃগৃহের যাবতীয় অলঙ্কার ও শয্যা পেতে চায়। লোপামুদ্রা তার স্বামীকেও মালায় ও ভূষণে সজ্জিত হয়ে আসতে বলে। ঋষি তার তপস্যাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ধন আনতে যায়। ফিরে এসে লোপামুদ্রার কাছে জানতে চায় যে, লোপামুদ্রা সহস্র সন্তান নাকী সহস্রের সমান একশত বা একটি পুত্র পছন্দ করে। ঋষির কথার পরিপ্রেক্ষিতেই লোপামুদ্রা জানায় সে একটি যোগ্য সন্তানই চায়।

মহাভারতের এই গল্প সুবোধ ঘোষের গল্পে অন্য মাত্রা নিয়ে এসেছে। সুবোধ ঘোষের রচনায় লোপামুদ্রা প্রথম থেকেই নানান অলঙ্কার ও বহুমূল্য গহনাতে রাজকন্যার মতো সজ্জিত হয়ে আছে। সে এই সাজ ভীষণভাবে পছন্দ ও উপভোগ করে। দাসী ও সখীদের সঙ্গে তার অবিরত

ক্ৰীড়ায় রত থাকা এবং বহুমূল্য গহনায় আবৃত থাকার কথা বলতে গিয়ে গল্পকার প্রথমেই উল্লেখ করেছেন অসাধারণ সব চিত্রকল্প বা ইমেজারি।

কিংকরী বিস্মিত হয়ে বলে— এইবার নৃত্য ক্ষান্ত কর রাজকুমারী।

লোপামুদ্রা বলে— না, বাধা দিও না কিংকরী। দাও; এই মুহূর্তে আমার দুই পায়ে পরিয়ে দাও কলহংসকণ্ঠের চেয়েও নিঃস্বনমধুর দু’টি স্বর্ণবিনির্মিত হংসক। এখনি ক্ষান্ত হতে দেব না এই উৎসব।

কৌতুকিনী কিংকরী বলে— এমন ক’রে সকল রত্নাভরণ শিঞ্জিত ক’রে আর মন্দিরদাসী নর্তকীর মত ছন্দোময়ী হয়ে মনের কোন্ স্বপ্নের দেবতাকে বন্দনা করছ রত্নাধিকা লোপামুদ্রা?^{৫৬}

এমনই আনন্দময় পরিবেশে আকস্মিকভাবে নেমে আসে উৎসব ক্ষান্ত করার বার্তা, লোপামুদ্রার ধাত্রিয়িকা ছুটে এসে জানায় রাজার প্রাসাদে ঋষি অগস্ত্য এসেছে। তাই লোপামুদ্রাকে গোপন করতে হবে তার সৌন্দর্যময়ী রূপ। ঋষি বিবাহের বার্তা নিয়ে এলে, লোপামুদ্রার অবিশ্বাস হয় নিঃস্ব রিক্ত অগস্ত্যের মনে কোনও রত্নের জন্য লোভ থাকতে পারে বলে। লোপামুদ্রা বুঝতে পারে ঋষির হৃদয়ে ও চোখে কোনও স্বপ্ন নেই, আছে শুধু সংকল্প। ঋষির সামনে সরাসরি না দাঁড়ালেও লোপামুদ্রা অনুভব করতে পারে, জীবনে এই প্রথম কোনও প্রিয়কে দর্শন করেছে সে। স্বাভাবিকভাবেই এরকম খাপছাড়া ঋষির হাতে নিজের প্রিয় কন্যাকে সম্প্রদান করতে বিদর্ভরাজ রাজি থাকে না, কিন্তু তবুও পূর্বশর্ত অনুসারে সেইটি করতেই হতো রাজাকে। এদিকে লোপামুদ্রা রাজভবনের সকলকে তথা পিতা-মাতাকে চমকে দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, একমাত্র ঋষি অগস্ত্যকেই সে বিবাহ করবে।

স্বাভাবিকভাবেই বিবাহের পরও জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন অগস্ত্যের জীবনে আসে নি। যাবতীয় শাস্ত্রীয় কাজকর্ম এবং পূজাতেই জীবন কেটেছে তার। লোপামুদ্রাও যে গৃহের প্রতিদিনের কাজকর্ম নিষ্ঠা সহকারে করে নি, তাও নয়। কিন্তু দিনের পর দিন এভাবে চলার ফলে তার মনের ভেতর এক অভিমান এবং প্রতিবাদের জন্ম হয়েছে। তাই ঋষি যেদিন তাকে বাৎসল্যে পুষ্পিত দেখতে চায় সেই দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত হানে লোপামুদ্রা।

লোপা— আপনার ইচ্ছা সত্য হোক।

ব্যথিতভাবে তাকিয়ে ঋষি অগস্ত্য বলেন— এ কেমন আচরণ লোপা? আমার হৃদয়ের এই মধুর অশান্ততার আবেদন শুনে কি এতই শান্তস্বরে উত্তর দিতে হয়? কোন বিস্ময় আর কোন আনন্দ কি আমার এই আহ্বানে নেই?

লোপা- আমি আপনার আদেশের দাসী। আপনার ইচ্ছার কাছে সর্বক্ষণ সমর্পিতা হয়ে আছি। আপনি ব্যথিত হবেন না ঋষি; আদেশের দাসী কখনও বক্ষে বিস্ময় ও নয়নে আনন্দ নিয়ে আপনার কাছে প্রগল্ভা হতে পারে না, সে দুঃসাহস তার নেই।

অগস্ত্য- ভুল করো না লোপা। পুষ্পিত হবার আগ্রহে ব্রততী যেমন বিহ্বল হয়ে সমীরণের উল্লাস আপন বক্ষে গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও তোমার ওই শান্ত অধরপুট স্মিতহাস্যে বিহ্বল করে তোমার স্বামীকে আজ গ্রহণ কর।

লোপামুদ্রা- পারি না ঋষি।^{৫৭}

আমরা সহজেই বুঝতে পারি এই কথা মহাভারতের নারী লোপামুদ্রার নয়। এই উক্তি আধুনিক যুগের নারী মনের জটিল মনস্তত্ত্বের। আসলে স্বামীর মনের সুপ্ত প্রেম জাগানোর জন্য লোপামুদ্রা যাবতীয় রত্নে সজ্জিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই ঋষি, কষ্ট পায় এবং জানায় যে, অগস্ত্যের তপস্যার বল ও সঞ্চিৎত পুণ্য ক্ষয় করেও লোপামুদ্রার জন্য রত্ন সংগ্রহ করে আনছে। মহাভারতের কাহিনিতে আমরা ঋষির পুণ্য ক্ষয়ের প্রসঙ্গ পাই না। কিন্তু গল্পকার ঘোষের গল্পে কাহিনি অপরিবর্তিত রেখেও চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানবিক সত্তাটিকে উন্মোচন করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। নায়িকা লোপামুদ্রার যৌবন শুধু একটি বক্সলে বলয়িত হয়ে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে ওঠে ঋষি। নিজের ভুল বুঝতে পারে ঋষি, লোপামুদ্রা তাহলে এতদিন রত্নের কামনা করে নি, মনের গভীরে কামনা করে গেছে একান্তে প্রেমিক অগস্ত্যের সঙ্গে মিলনের। আসলে কঠিন কঠোর হৃদয়ের অন্তরালে যে প্রেম সত্য ও সুপ্ত ছিল তারই সন্ধানের প্রতিজ্ঞা লোপামুদ্রা নিয়েছিল। গল্পকার ঘোষের গল্পের শেষ অংশটি অসাধারণ ছিল, গল্পকারের অসামান্য বাক্য নির্মাণে আমরা দেখেছি লোপামুদ্রার একান্ত গভীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশিত হতে।

বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাকিয়ে থাকেন অগস্ত্য। লোপা বলে- আমার ওষ্ঠপুটের স্মিতহাস্য দেখবার জন্য যে ঋষির হৃদয় আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আমি তাঁরই প্রেমিকা। এতদিন সেই প্রেমিকের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ পেয়েছি তাঁর হৃদয়, এবং তাঁর সেই হৃদয়ই হলো ঋষিবধূ লোপার জীবনের একমাত্র অলংকার।

অগস্ত্য ডাকেন- প্রিয়া লোপা!

দেখতে পায় লোপা, এক প্রেমিকের বিশালতৃষ্ণা ও সুস্মিত দুটি চক্ষু তাকে আহ্বান করছে।^{৫৮}

মহাভারতের অমর প্রেমগুলিকে নিয়ে সুবোধ ঘোষ যে গল্পগুলি রচনা করেছেন তা এককথায় অত্যন্ত সুস্বাদু এবং উপভোগ্য। গল্পের চরিত্রেরা মহাভারতের হলেও তাদের যাতায়াত

আধুনিক মানুষের মন থেকে হৃদয়ে। ফলে সমকালীন সময়ের দ্বন্দ্ব ও সংকট মহাভারতীয় ঘটনা ও চরিত্রদের মোড়কে আবৃত করে যেভাবে সুবোধ ঘোষ উপস্থাপন করেছেন তা শুধু বর্তমানকালেই নয়, আগামী দিনেও পাঠকদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় থাকবে।

২.৫।। দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩)

দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩) হলেন বিশ শতকের বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় অন্যতম একজন কথা সাহিত্যিক। তিনি ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের উপর ভর করে প্রচুর উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। অনেক বাঙালি সাহিত্যিক ও ছোটগল্পকারই মহাভারতকে কেন্দ্র করে একাধিক গল্প লিখেছেন, যেগুলি থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় আখ্যানগুলি নিয়ে আমরা কথাও বলেছি, কিন্তু দীপক চন্দ্র এক্ষেত্রে অন্যান্যদের একেবারে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর পুরাণ নির্ভর অন্যান্য রচনাগুলিকে সরিয়ে রাখলেও শুধু মহাভারতকে কেন্দ্র করেই তিনি প্রচুর গল্প লিখেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এক্ষেত্রে ঈর্ষনীয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেকদিন পূর্বেই পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে, যার চার ভাগের তিন অংশই ভারতীয় পুরাণ সংক্রান্ত। তাঁর শিক্ষক জগদীশ ভট্টাচার্য দীপক চন্দ্রের সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে কথা সাহিত্যের ভাষায় দীপক চন্দ্র স্পর্শ করেছে ভারতীয় মহাকাব্যের আত্মাকে।^{৫৯}

বিশ শতকের আটের দশকে ভারতীয় পুরাণ সংক্রান্ত আখ্যানের এক নতুন জন্ম দিলেন দীপক চন্দ্র। অবশ্য তার আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই মহাকাব্য ও পুরাণ সংক্রান্ত এইরূপ রচনাগুলির জনপ্রিয়তা ছিলই। এই পথের অনুসারী ছিলেন রাজশেখর বসু, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সমরেশ বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পুরাণের কাহিনিকে নিয়ে কথকতা রচনা করেছেন। পৌরাণিক কথাসাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই লেখকেরা পুরাণ বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক জীবনের প্রতিরূপকেই দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানে গল্পকার দীপক চন্দ্র তাঁর দৃষ্টিকোণ কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছেন। তাঁর ‘অমৃতকুম্ভ’ গল্প সংকলনের মুখবন্ধ অংশে তিনি বলেছেন:

পৌরাণিক জীবনকথাকে আমি যখন গল্পরূপ দিই তখন সে তার সময়ের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে এ কালকে রাস্তা করে দেয়। কারণ জীবনধর্মের কোনো সেকাল-সেকাল নেই। সে সম্পর্কের মধ্যে অধিকারের কোনো দেওয়াল নেই। মানুষের সঙ্গে কালের সম্পর্কটা পুরোপুরি মুক্ত। তবু কালগত ব্যবধানের বন্ধনটা থেকে যায়। ঐ বন্ধনের গিঁট খুলে আমি প্রমাণ করে দেখাই যে, জীবনের এই ঘটনা ও সমস্যার বাধাগুলো এখনও প্রচণ্ডভাবে রয়ে গেছে আমাদের জীবনে। চেহারাটা তার পুরনো হয়ে গেছে কিংবা বদলে গেছে মনে করাটাই একটা ভীষণ ভ্রম।

যে কাল পিছনে ছিল, সে কাল যখন সম্মুখে আসে তখন পুরনো নতুন হয়। এই নতুনও কালের সৃষ্টি। কাল শুধু পুরনো করে না। নতুনও করে।^{৬০}

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন ‘শাস্ত্রতভাবে আধুনিক’, ঠিক তেমনই ভাষায় দীপক চন্দ্র লিখেছেন মানুষের সব প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, স্বভাব এবং ব্যক্তিত্বের সংকট অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সেই উপলব্ধির মধ্যে থাকাটাই হল আধুনিকতা। তিনি তাঁর লেখালেখিতে সেই অমর জীবনেরই খোঁজ করেছেন। *পুণ্যের আলো* সংকলনের ভূমিকায় এই প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন- ‘পুরাণ ইতিহাস, পুরাণ কথাগুলি অত্যন্ত বাস্তব এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাই এত মন রাঙাতে পারে। পুরাণকে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসেও ভুলি নি। ভুলব না কোনোদিন। ভুলে যাওয়া মানে নিজের পিতৃমাতৃপরিচয় ভুলে যাওয়া। এর অর্থ নিজের আইডেন্টিটি হারল। ভারতীয়ত্বের আইডেন্টিটি হল ভারতীয় পুরাণ। এই সরল সত্য কথা মনে রেখে পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে আধুনিকীকরণ করেছি। প্রগতিশীল মানুষের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমার রচনাগুলি অন্তরঙ্গে আধুনিক, বহিরঙ্গে পুরনো। বাস্তবতার সঙ্গে পৌরাণিক পাত্র পাত্রীর জীবন ও মননের কোনো অমিল নেই। সমন্বয়সূত্রে গড়ে উঠেছে এক নতুন জীবনবোধ।’^{৬১} এই কথা অনুসারে জীবনবোধের ছবি আমরা পাই তাঁর ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ গল্পের মন্দপাল-জরিতার বিবাহিত জীবনে, ‘অর্ধনারীশ্বর’ গল্পে ইলা ও বুধের জীবনে, ‘অহল্যা-গৌতম সংবাদ’ গল্পেও তা পাই। এছাড়াও ‘দহন’, ‘রোদনভরা বসন্ত’, ‘কামপাখি’, ‘প্রসন্ন বিদায়’, ‘প্রণয় কন্টক’, ‘প্রতিশ্রুতি’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘প্রবাহ’ এবং ‘শঙ্কা’ নামক গল্পগুলিও এক্ষেত্রে অন্যতম।

এইবার আলোচনার এই অংশে আমরা তাঁর কিছু গল্পকে নিয়ে দু’একটি কথা বলব। যেগুলির মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, গল্পকার দীপক চন্দ্রের গল্পগুলি বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে কথা বলা যাক ‘অবহেলা’, ‘প্রবাহ’ এবং ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’ নামক তিনটি গল্পকে দিয়ে। মহাভারতের অনেক পুরুষই অন্য নারীদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে তাদের স্ত্রীরা স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত থেকে গেছে। এই যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে ওপরের তিনটি গল্পে। ‘অবহেলা’ গল্পের নায়ক জয়দ্রথের দুর্বলতা ছিল দ্রৌপদীর প্রতি। কাম্যকবনে পাণ্ডবদের হাতে জয়দ্রথের চরম শাস্তি হয়। সেই যন্ত্রণা এবং পরাজয়ের গ্লানি তাকে পরবর্তী সময়ে মানসিকভাবে অস্থির করে তুলেছিল। তাই জয়দ্রথের প্রতি হওয়া লাঞ্ছনার শোধ নিল সে দুর্যোধনের বোন দুঃশলাকে পীড়ন করে। পুরো গল্প জুড়ে গল্পকার দীপক চন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন দুঃশলার প্রতি হওয়া অন্যায় ও অত্যাচারের ছবি। দুর্যোধনের কন্যাকে শুনতে হয়েছে যে জয়দ্রথের মতামতকে উপেক্ষা করেই তার উপরে দুঃশলাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভীম ও অর্জুনের হাতে মৃত্যু না হয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে দুঃশলার জন্যই। এখানে বলা বাহুল্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দের পরাজয় বা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন সামাজিকভাবে ব্যক্তির

সম্মানকে নিম্নগামী করে তুলত। এক্ষেত্রে জয়দ্রথকে একসঙ্গে অপমান এবং স্ত্রীর কারণে করুণা করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে এই পরাজয় জয়দ্রথ একেবারেই মেনে নিতে পারে নি। ফলে পত্নীর প্রতি পূর্বের প্রেম ও ভালোবাসা এখন অবহেলা ও বঞ্চনায় রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃশলা তার স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য যুধিষ্ঠির এই কূটনৈতিক চালটা চলেছে। পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে সম্পর্ক কোনও সময়ই খুব একটা ভালো ছিল না। যুধিষ্ঠির দুঃশলার নিজের ভ্রাতা নয়, এমনকী তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎও খুব একটা বেশি হয় নি। কিন্তু তার এইসব যুক্তি জয়দ্রথের প্রতি খুব একটা কাজে আসে নি। জয়দ্রথ মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত এবং স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত ছিল যে সে শুনিতে দিয়েছে অপমানজনক একগুচ্ছ বাক্য। যেগুলি একজন প্রেমিকা বা নারীর মন ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। গল্পকারের কলমে উঠে এসেছে:

তাকে শোনানোর জন্যই জয়দ্রথ বলল, অনেকদিন হয়ে গেল, আর কেন? তুমি পুরনো হয়ে গেছ, পচে গেছ। আমার কাছে তোমার প্রত্যাশার কিছু নেই। তোমার নামটাও সহ্য হয় না। দুঃশলা নামটার সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর জ্বালা, যন্ত্রণা, অসম্মান জড়ানো আছে। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে তাদের দয়া, করুণা, অনুগ্রহ দেখানোর কোনো প্রশ্ন থাকত না। এই অপমান সহ্য করার চেয়ে মরণ অনেক ভালো।^{৬২}

জয়দ্রথ বিরক্ত হয়ে গলা থেকে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, শুকনো আদর ভালো লাগে না। গায়ে গা ঘষে পুরুষ মানুষকে উত্তপ্ত করা যায়, কিন্তু মন রাঙানো যায় না। আবার মনটাই মরে গেছে। তুমি কেন, কোন মেয়েই বোধ হয় পারবে না আবার মনের মরুদ্যান ফুল ফোটাতে। মেয়ে জাতটার ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে।^{৬৩}

‘প্রবাহ’ গল্পে বিদুরের পত্নী পরাশবীও কিন্তু কুন্তীর কারণে স্বামীর মনোযোগ, ভালোবাসা এবং আদর থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে। এই বঞ্চনার ক্ষত অনেক গভীর। মহাভারতে এমনিতেই বিদুরের পত্নীকে আমরা সেভাবে দেখতে পাই না। কাহিনির আড়ালেই থেকে গেছে বরাবর সে। গল্পকারের কলমে তাই উঠে এসেছে অসংখ্য চরিত্রের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া একটি বধূর অন্তরের ব্যথা ও বেদনার ছবি। পরাশবী তার স্বামীকে জানিয়েছে যে শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে আসার পর কুন্তীর সমস্ত ভালো-মন্দের প্রতি খেয়াল রেখেছে বিদুর। এমনকী বিদুরের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান নাকী কুন্তীই থেকেছে বরাবর। ফলে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছে বিদুর। গল্পকার গল্পের প্রথমে শুরু করেছেন এই বলে যে স্বামীর দর্শন পাওয়া, আদর পাওয়া কিংবা শারীরিক মিলন হওয়ার আশায় সপত্নীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কোনও ব্যাপার ছিল না পরাশবীর। বিদুরের অন্য ভাইদের স্ত্রীর মতো স্বামীকে অন্য কারোর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয় নি তাকে। কিন্তু তার কপাল পোড়া, স্বামীর প্রেম ও আদর পাওয়া বোধহয় তার ভাগ্যে

ছিল না। পরাশরী অভিযোগ করেছে যে বিদুরের নীরব ঔদাসীন্যই তার দুর্ভাগ্যের কারণ। পত্নীর অভিযোগ খণ্ডনের কম প্রয়াস বিদুর করে নি। পুরো গল্প জুড়েই আমরা তাই দেখতে পাই বিদুর তার স্ত্রীকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে তার অভিযোগের অসত্যতা এবং অসারতা সম্পর্কে।

নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বিদুর ধীরে ধীরে বলল, সব নারীই পুরুষকে অবিশ্বাস করে। পুরুষকে বড় বেশি নিজের করে রাখতে চায় বলেই সন্দেহের তীক্ষ্ণ তীর তার দিকে নিবদ্ধ করে রাখে। নারী পুরুষের সম্পর্কটা তাদের চোখে শুধু একটা জৈবিক ব্যাপার। নারী-পুরুষের বন্ধুত্বকেও যুগপৎ অবিশ্বাস এবং সন্দেহ করে। এমনকী, আত্মীয় সম্পর্ককে প্রবৃত্তিপূর্বকতার উর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না। সব নারী পুরুষের ভাবনায়, চেতনায়, আচরণে, অভিব্যক্তিতে এই বোধটা এত বেশি থাকে যে, কোনো ভাবেই তাদের বোঝানো যায় না একটা অপাপবিদ্ধ সুস্থ সুন্দর মানবিক সম্পর্ক হৃদয়ের নিভূতে প্রীতির দীপ্তি ছড়ায়।^{৬৪}

তারপরে আবার বিদুর স্ত্রীকে জোর গলায় সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য জানিয়েছে:

বলল, এজন্যই বলেছিলাম, মনের পাপে পাপী নয় কে? হীন সন্দেহ করে তুমিও পাপাচরণ করলে। কুস্তীকে এত বেশি ঈর্ষা করো বলেই ভালোবাসায় তোমার কষ্ট। ঈর্ষায় তোমার দৃষ্টি অন্ধ বলে টের পাওনা কী হারাচ্ছ? পতিপ্রেমের নামে লুকোনো কুস্তী-বিদ্বেষ তোমার আমার মাঝখানে এসে শুধু অশান্তি সৃষ্টি করেছে।^{৬৫}

স্বামীনিষ্ঠ কর্তব্যসচেতন পত্নীর প্রতি বহির্মুখী স্বামীর অনাদর-অবহেলা মহাভারতের যুগ থেকে আজও অব্যাহত রয়েছে। গল্পকার এই বিষয়টি ঠিক ধরতে পেরেছেন। ঠিক জয়দ্রথ বা বিদুর চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও দ্রৌপদীকে ভাগের অংশ হিসাবে পাওয়ার তীব্র বাসনা যুধিষ্ঠিরকেও একই অপরাধের ভাগী করেছে। যুধিষ্ঠিরের এই ঔদাসীন্য বিরূপতার দুঃখে জর্জরিত হয়েছে তার নিজের স্ত্রী দেবিকা। সে কারণে গল্পকারের ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’ গল্পে আলো পড়েছে এই দেবিকা চরিত্রের উপরে। যার ফলে ম্লান হয়ে গেছে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

গল্পকার চন্দ্রের ‘রোদনভরা বসন্ত’ গল্পে এসেছে গালব ও মাধবীর কথা। মহাভারতের এই দু’টি চরিত্রকে নিয়ে অনেক সাহিত্যিকই নিজেদের রচনা লিখেছেন। এই জায়গা থেকে দীপক চন্দ্র নিজেও খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। তবে গল্পকার চন্দ্রের গল্পে মাধবীর করুণ পরিণতি আমাদের দেখতে হয় নি। এখানে গালব কীভাবে বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইল এবং তার জন্য প্রেমিকা মাধবীকেও নিম্নগামী করতে উদ্যত হয়েছিল, তার বিচিত্র বিবরণ এই গল্পে ধরা আছে। গুরুদক্ষিণা দিতে না পারার কারণে গালব এই গল্পে ভীষণ ভেঙে পড়েছে, বারবার হেরে যাওয়ার কথা ভেবেছে, যেকোনও উপায় অবলম্বন করেই গুরুদক্ষিণা প্রদানে সম্মত ছিল সে।

কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্বের নায়িকা মাধবী কঠোরভাবে গালবকে শেষ পর্যন্ত জানিয়েছে যে, গালবের প্রতিজ্ঞা তাকেই সমাপ্ত করতে হবে, প্রেমিকা হিসাবে মাধবী শুধুমাত্র গালবের জন্যই সমর্পিত, কিন্তু অন্য কোনও পুরুষের কাছে গিয়ে গালবের গুরুদক্ষিণা দানের বিষয়ে তাকে সাহায্য করতে পারবে না মাধবী। একজন আধুনিক নারী হিসাবে মাধবী খুবই কষ্ট পেয়েছে তার পিতার সিদ্ধান্তের জন্য। কিন্তু স্পষ্টভাবে মাধবী এখানে জানিয়েছে যে, গালবের লক্ষ্য অর্জনে তার দেহ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে না। মহাভারতের গল্পের থেকে এখানেই দীপক চন্দ্রের গল্প আলাদা হয়ে গেছে। যেখানে শিষ্যের প্রতিজ্ঞা পূরণে একজন নারীকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে হয় নি। গল্পকার মাধবীর প্রতিবাদকে খুবই সম্মানের সঙ্গে মর্যাদা দিয়েছেন। এই গল্পে গুরুদক্ষিণা প্রদানের সংকটটি কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্বের কারণে কেটে গেছে। যে গুরুদক্ষিণা প্রদানের জন্য নারীকে তার নিজের সম্মান ও সম্মান বিসর্জন দিতে হয়, সেইটি নীতির দিক থেকে ত্যাগ করা বা এড়িয়ে যাওয়াই অধিকতর শ্রেয় বলে গল্পে ঋষি বিশ্বামিত্র জানিয়েছে। মহাভারতের কাহিনির মধ্যে তো বটেই, এমনকী সুবোধ ঘোষ মহাশয়ের গল্পেও এই সমাধান আমরা দেখতে পাই নি। গল্পকারের কলমে উঠে এসেছে সেই অসাধারণ লাইনগুলি যা পড়লে আধুনিক পাঠকের পরিশীলিত মন খুশিতে ভরে ওঠে:

বিশ্বামিত্রের অধরে অনির্বচনীয় হাসির মাধুরী ভোরের শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ল। বললেন, পুত্র কঠিন পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে তোমার গুরুপ্রীতি। গুরুদক্ষিণার চেয়ে তোমার কাছে বড় কিছু নেই। কিন্তু বৎস, গুরুদক্ষিণা দিতে গিয়ে আর কারো কাছে বিরাট ঋণ রয়ে গেল কি না একবারও যাচাই করে দেখলে না! তোমার দৃষ্টি অন্ধ ভিতরে ও বাহিরে, তাই ভালো-মন্দ দেখতে পাচ্ছ না। এক নীতিহীন বিবেকবর্জিত মনুষ্যত্ব তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মাধবীও তোমাকে ঘৃণা করবে। তোমার জন্য সে নিজের সম্মান বিসর্জন দেবে কেন? তুমি তার কে? মাধবীকে তার প্রাপ্য সম্মান দাওনি তুমি। অথচ সে তোমাকে বিশ্বাস করে গৃহ ছেড়েছিল। আর তুমি নিষ্ঠুরের মত তাকে নরকে টেনে নামাচ্ছিলে। ছিঃ!^{৬৬}

মহাভারতে কুন্তী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। সন্তানদের পিতা মারা যাওয়ার পর যথার্থভাবে ধর্মের জ্ঞান সহযোগে পাণ্ডবদের মানুষ করে তোলার পেছনে কুন্তীর ভূমিকা অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলির পাশাপাশি কুন্তী চরিত্রে জড়িয়ে আছে আরও কিছু অতিরিক্ত সংকট, যেগুলি গভীরভাবে না ভেবে দেখলে তাকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে না। মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীর নিকটে থেকে দীর্ঘদিন সেবা ও যত্ন নিয়েছে। অবশেষে তার সেবায় সন্তুষ্টি লাভ করে তাকে বরদানও করে গেছে। এরই ফলস্বরূপ অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে কুন্তীর সূর্যদেবকে মন্ত্রের দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো এবং তারপর কর্ণের জন্ম ও শেষে সামাজিক সম্মানের ভয়ে নিজের সন্তানকে জলে বিসর্জন দেওয়া—মহাভারতে কুন্তীর জীবনে এই ঘটনাগুলি মহাভারতের পাঠক মাত্রই জানে। এই ঘটনাগুলি নিয়ে কম গল্প বা উপন্যাসও লেখা হয় নি। ভাবনার এই পরিসর থেকেই দীপক চন্দ্রও

রচনা করেছেন ‘শঙ্কা’ নামের একটি গল্প। তবে এই গল্পে মূল মহাভারতের আখ্যান সরাসরি অনুসরণ করা হয় নি। গল্পকার কর্ণের জন্মের পিছনে ঋষি দুর্বাসার আশীর্বাদ এবং সূর্যদেবের আগমনকে সত্য বলে মনে করেন নি। পরিবর্তে বিষয়টিকে অনেকাংশে বাস্তবযোগ্য করে তুলেছেন। গল্পে তিনি ঋষি দুর্বাসার সঙ্গে কুন্তীর অপরিণত বয়সের প্রেমকে দেখিয়েছেন, এবং সেই ভালোবাসার মুগ্ধতায় উভয়ে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে, যারই ফলস্বরূপ কর্ণ পৃথিবীতে আগমন। ঋষি দুর্বাসা এই গল্পে নিজেই কুন্তীর চারিত্রিক গুণাবলী ও শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছে। শুধু তাতেই থেমে থাকেন নি গল্পকার এখানে, কুন্তীর কোলে মাথা রেখে ক্রোধী ও বদরাগী ঋষি দুর্বাসাকে গড়ে তুলেছেন একজন আদর্শ প্রেমিক পুরুষ হিসাবে। দীপক চন্দ্রের নির্মিত দুর্বাসা ঋষির প্রতিরূপের সঙ্গে আমরা পুরাণের দুর্বাসাকে মেলাতে পারি না। গল্পকারের গল্পে দুর্বাসা কুন্তীর নিকটে এসে নিজের দুর্বলতা ঢেকে না রেখে সরাসরি প্রেম দাবি করেছে। গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে:

দুর্বাসাও হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন পৃথার মুখে। অপরাহ্নের মরা সূর্যের সোনা রঙের আলো ছড়িয়ে আছে উদ্যানে। বাতাসে হাম্বাহানার গন্ধ। পাখিরা গাছের শাখার কলরব করছে। দুর্বাসার ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। নিজের মনে পৃথাকে গুনিয়েই বলল: জান পৃথা, তোমার সংস্পর্শে এসে মনে হল আমার বয়স অনেক কমে গেছে। একদিন ব্রহ্মচর্য্যার তাপে যে যৌবনকে পুড়িয়ে মেরেছিলাম, সে আমার বুকের মধ্যেই আছে, ভীষণভাবে আছে। সেই তরুণ দুর্বাসা আমার কাছে তোমার প্রেম দাবি করছে। তুমি কি প্রত্যাখ্যান করবে তাকে? বিশ্বাস কর আমাকে এক নতুন জীবন দিয়েছ তুমি। তোমার সান্নিধ্য আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, মানুষের শরীর বুড়ো হলেই মানুষ বুড়ো হয় না। মনটা যার বুড়ো হয়ে যায় যুবক হলেও সে বৃদ্ধ হয়ে যায়। আমার মধ্যে এক তরতাজা যুবক অনুক্ষণ তোমাকে চাইছে। তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে ভাল লাগছে। বিশ্বাস কর তোমার কাছে আমার কোনো লজ্জা সংকোচ নেই। নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছি না। তোমার একটু কৃপা করুণা পেলেই আমি ধন্য হয়ে যাব।^{৬৭}

প্রথম দর্শনেই দুর্বাসা সম্পর্কে পৃথার যত ভয় ছিল নিমেষে দূর হয়ে গেল। তাঁর সাধকোচিত দুই চোখের নিবিড় চাহনির মধ্যে কী যে লুকোনো ছিল ঈশ্বরই জানেন। তবু, এক দুর্লভ অপার্থিব দৃষ্টির মুগ্ধতা তার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। এক অজানিত ভালোলাগার সুখে মনটা ভরে উঠল। দুচোখে অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে লোভীর মত তার রূপ, যৌবন অপ্সের মাধুরী দেখতে লাগল দুর্বাসা। চোখে একটু লজ্জা কিংবা সংকোচ ছিল না। কিশোরী হলেও পৃথা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছিল দুর্বাসার প্রাণ মন তার দেহ বহুলীর সুখা গন্ধের আশ্রাণে ব্যাকুল। বড় বিস্ময় লাগল। বয়সে কত কনিষ্ঠ। কন্যাতুল্য। তবু কামনা মন্দির আঁখি তারায় দেহের যত তাপ জমেছিল আগুনের উৎক্ষিপ্ত ফুলকির মত রোমকূপের রঞ্জে রঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল পৃথার। নিজের অজান্তেই বিজয়িনীর গর্বিত হাসি তার অধরে স্ফুরিত হল।^{৬৮}

মহাভারতে হিড়িম্বা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের প্রথম স্ত্রী তথা কুন্তীর প্রথম পুত্রবধূ। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে খুবই স্বল্প জায়গা জুড়ে তাকে আমরা পাই। সমগ্র মহাভারতে অন্যান্য পাণ্ডব স্ত্রীদের মাঝেমাঝে উল্লেখ পেলেও হিড়িম্বা থেকে গেছে একেবারে উপেক্ষিতই। কুন্তী ও ভীমের কাছে তার প্রার্থনা ছিল তাদের একটি সন্তান পৃথিবীতে এলেই ভীমকে হিড়িম্বা ছেড়ে দেবে। ব্যাসদেবের মহাভারতে হয়েছিলও তাই। ঘটোৎকচের জন্ম হওয়া এবং তারপরেই পুত্রকে আশীর্বাদ সহযোগে কুন্তী সহ ভীমের সেই স্থান ত্যাগের উল্লেখ মহাভারতে আমরা পাই। মহাভারতের একাধিক আখ্যানের মধ্যে চরম আসক্তি সহকারে যৌন জীবন উপভোগের শেষে আসক্তিহীনভাবে বা নিরাসক্ত বিচ্ছেদ খুবই পরিচিত একটি বিষয়। এই নিয়ে গবেষণাপত্রের একাধিক জায়গায় আমরা আলোচনা করেছি। পরাশর ও সত্যবতীর মিলনের মতো ঘটনা মহাভারতে অনেক আছে। হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের দাম্পত্য সম্পর্কে এই যুক্তিতেই পড়া যেতে পারে। ভীমের শারীরিক আকৃতি ও পেশীবহুল শরীরের প্রতি হিড়িম্বার কামনা জন্মেছিল। সেই কারণের জন্যই মিলনের জন্য এতটা আকৃতি তার। কিন্তু হিড়িম্বার সন্তান পৃথিবীতে আসার পর সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানিয়েছে ভীমকে। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এই প্রসঙ্গে তাঁর *মহাভারতের অষ্টাদশী* নামক বইতে লিখেছেন:

পুত্রলাভের পরেই হিড়িম্বা স্মরণ করলেন— যুধিষ্ঠির কুন্তীর কাছে তিনি কথা দিয়েছেন, সে কথা তাঁকে রাখতে হবে, ভীমকে এবার আপন মায়াজাল থেকে মুক্ত করে দিতে হবে সম্পূর্ণভাবে। কেননা, ভীমের সঙ্গে সহবাসের দিন তাঁর শেষ হয়ে গেছে— সংবাসসময়ো জীর্ণ ইত্যভাষ্য ততস্তু তান্— শেষ বিদায়ের জন্য হিড়িম্বা আবেগে স্কুরিতধরা হলেন না। বরঞ্চ অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ছেলে ঘটোৎকচের হাত ধরে উপস্থিত হলেন জননী কুন্তীর সামনে।^{৬৯}

পাণ্ডবদের প্রথম গৃহবধূ হিসাবে হিড়িম্বার কাহিনি এখানেই মহাভারতে শেষ হয়ে গেছে। মহাভারতকার ব্যাসদেব এরপর হিড়িম্বার কথা আর স্মরণ করে নি। বরং তার প্রসঙ্গ এসেছে পুত্র ঘটোৎকচের সম্পর্কে নানান কথা বলার সূত্রে। সরাসরি হিড়িম্বা আর মহাভারতে আমাদের দেখা দেয় না। মহাভারতকারের লক্ষ্য অনেক বৃহৎ ও প্রসারিত, মহাভারতের মধ্যে আরও অনেক কিছু বলার আছে তার, ফলে সামান্য অরণ্যের কোলে বেড়ে ওঠা এক রাক্ষসীর বিষয়ে অধিক বাক্যের অপচয় ব্যাসদেব করে নি। কিন্তু গল্পকার দীপক চন্দ্র এইখানেই তাঁর দৃষ্টি মেলে ধরতে চেয়েছেন। দেখিয়েছেন প্রেমের সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর কিছু দিন কাটানোর পর ভীমের তাকে ছেড়ে যাওয়াতে হিড়িম্বার মনে কী প্রভাব ফেলেছিল। অত্যন্ত যন্ত্রণা ও বেদনাতে একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল হিড়িম্বা। গল্পকার দীপক চন্দ্র মহাভারতের এই না বলা আখ্যান তাঁর পাঠকদের যত্ন সহকারে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত ‘অরণ্য স্বাক্ষর’ গল্পতে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

হিড়িম্বার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সজোরে শ্বাস ত্যাগ করে বলল, তোমার কথাই সত্য স্বজন হারানো বনভূমিতে আমাকে ত্যাগ করে ওরা তো স্বচ্ছন্দে নিজের গন্তব্যপথে চলে গেল। একবারও ফিরে দেখল না আমাকে। সেই মুহূর্তে মান অভিমান সব ভাসিয়ে দিয়ে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো জননী কুন্তীকে বললাম, মাগো ভালোবাসলে কত কষ্ট পেতে হয় মেয়ে হয়ে তুমি তো তা জান।...^{৭০}

ভীম আমার প্রেমে মজলে হয়তো এই শর্তের কোনো দাম থাকবে না। সন্তান হলে হয়তো তার স্নেহ মমতার আকর্ষণে আমার কাছেই রয়ে যাবে। শর্তগুলো শিথিল করবে। কিন্তু আমার অনুমান যে কত মিথ্যে ভীমের ইদানিং কথাবার্তার মধ্যে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সন্তানের মুখ দেখেই ওরা সকলে চলে যাবে নিজের গন্তব্যপথে। আমার প্রতি তার কোনো দায় নেই, সন্তানের প্রতি কর্তব্য নেই— এমন নিষ্ঠুর ওরা। কেবল প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কটা মাস রয়ে গেল। সেজন্য কত অনুতাপ, পরিতাপ ছিল তার। মনের বন্ধন নয় শর্ত পালনই ছিল তার কাছে একমাত্র সত্য। এই বন্ধনের যন্ত্রণায় আর্ত মনের বিলাপ আমাকেও সর্বক্ষণ বিধুর করে রাখে। বড় অপমানিত মনে হয় নিজেকে। কিন্তু কী আশ্চর্য তবু মুখ ফুটে বলতে পারিনি বন্ধন থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।^{৭১}

দীপক চন্দ্র ভীষ্ম এবং অম্বার মধ্যে চমৎকার একটি প্রেমের সম্পর্ক অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন তাঁর ‘দহন’ গল্পে। মহাভারতের কবির দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রসারিত, ব্যাসদেবের সময় নেই শুধুমাত্র অম্বাকে কেন্দ্র করে ভীষ্মের মনের গভীর অরণ্যে কী চলেছে তা উপস্থাপনের, তাই মহাভারতে অম্বা তথা শিখণ্ডীর মানসিক টানাপোড়েনের ছবি গভীরভাবে আমরা পাই না। ভীষ্ম এবং অম্বা উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়েছিল কিনা তার উত্তর মহাভারতকার স্পষ্টভাবে দেয় নি। কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারতে পাই রাজা শাল্বের সঙ্গে প্রণয় এবং ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল রাজকুমারী অম্বার। অন্যদিকে রাজা শাল্বের যুক্তি ছিল কাশীরাজের রাজসভায় ভীষ্মের স্পর্শের কারণেই অম্বা অপবিত্র হয়েছে এবং ভীষ্ম তাকে নিজের রথে তুলে নিয়েও যায়। নিজের প্রেমিক পুরুষের থেকে যথার্থ স্বীকৃতি না পেয়ে ভীষ্মের ওপরে অত্যন্ত রাগান্বিত হয় অম্বা এবং নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হতে চেয়েছিল সে। যারই ফলস্বরূপ পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধ, অম্বাকে মহাদেবের আশীর্বাদ এবং পরিশেষে শিখণ্ডীকে ঢাল করে অর্জুনের একগুচ্ছ তীর নিক্ষেপ ও ভীষ্মের ভূমিতে ঢলে পড়া। মহাভারত আমাদের এটুকুই বলে। কিন্তু এই ‘দহন’ গল্পে দীপক চন্দ্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন অম্বার প্রতি ভীষ্মের গভীর সংবেদনশীলতাকে। মহাভারতে অম্বাকে নিয়ে ভীষ্মের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকটের জায়গা ছিল না। কিন্তু এই গল্পে সেইটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অম্বার এই পরিণতির জন্য ভীষ্ম নিজেকে দায়ী করেছে গল্পে, এক অপরাধবোধও তার মধ্যে কাজ করেছে। উল্টে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেও শান্তনুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কারণে অম্বাকে বিবাহ করতে পারে নি ভীষ্ম। এই নিয়ে দীর্ঘ মানসিক সংকটের মধ্যে দিয়েও যাত্রা করতে হয়েছে তাকে। অবশেষে

রাজমাতা সত্যবতীর উজ্জ্বল ভেঙে যায় ভীষ্মের নিজের করা প্রতিজ্ঞার গর্ব। সত্যবতী দেখিয়ে দেয় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার প্রকৃত সমস্যাটা কোথায় আছে।

এই গল্পে সত্যবতী জোরালোভাবে ভীষ্মকে বিয়ে করতে বলে এবং একমাত্র বিবাহই অম্বাকে এই পথ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আরও জানায় যে ধর্মকে ভীষ্ম রক্ষা করতে শেখে নি, তাকে হরণের অধিকারও তার নেই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ত্রুটি ধরিয়ে সত্যবতী বলে যে ভীষ্মের প্রতিশ্রুতি শান্তনুর কাছে নয়, বরং দাসরাজার নিকটে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় রাজা শান্তনুর সম্মতি ছিল না। এই প্রতিশ্রুতি ভীষ্মের সম্পূর্ণ একার। সত্যবতী বলেছে যে ভীষ্ম নিজের প্রতিজ্ঞার অপব্যাখ্যা করে নিজেকে ও অম্বাকে ঠকাচ্ছে। সত্যবতীর পিতার বক্তব্য ছিল ভীষ্মের আজীবন কুমার থাকা নিয়ে নয়, বরং হস্তিনাপুরের সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকার গ্রহণ না করা নিয়ে। কিন্তু ভীষ্ম নিজের জেদের বশে আরও অতিরিক্ত কিছু করে বসল। এখানেই আমাদের মনে হয় দীপক চন্দ্রের সত্যবতী মহাভারতের রাজমাতা নয়, বরং বিশ শতকের একজন আধুনিক মননশীল ও মানবতাবাদী নারী। যে সহজেই তুলে ধরেছে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ত্রুটিপূর্ণ দিকটি। গল্পের শেষ অংশে ভীষ্মের মনের গোপন কামনাটি উপস্থাপিত হয়েছে দীপক চন্দ্রের গল্পে। গল্পকারের লেখায় উঠে এসেছে:

এক লহমায় বিদ্যুৎ চমকের মতো এত সব কথা মনে পড়ল ভীষ্মের। কয়েক মুহূর্তের অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে ভীষ্ম অবাক চোখে দেখল শিখণ্ডীকে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। ভীষ্ম সহসা নিজের অজ্ঞাতে এক আবেগ অনুভব করল। বলল, আজ তুমি যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার সব শান্তি তোমার হাতে। এ পৃথিবীতে আর কেউ নয়, তুমিই আমাকে তৃপ্তি দিতে পার।^{৭২}

এরকম একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ উক্তি শুনে শিখণ্ডী চমকাল। বুকের ভেতর কেমন উথলে ওঠার ভাব হল। বলল, আপনার সে আনন্দের শরিক হতে পারাও ভাগ্য। হঠাৎ, এমন কথা আপনার যে কেন মনে হল কে জানে?^{৭৩}

এভাবেই দীপক চন্দ্রের প্রতিটি মহাভারত মূলক গল্পেই আধুনিক মননের ছবি ফুটে উঠেছে। মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রকে সামনে রেখে অন্যান্যদের মতো তিনিও বস্তুত সমকালকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাবনার এই জায়গা থেকে তাঁর অন্যান্য মহাভারতধর্মী গল্পগুলিকেও পড়তে পারা যায়। ভাবনার এই জায়গা থেকেই লপিতা এসেছে ‘পূর্ণ-অপূর্ণ’ গল্পতে, দেবযানী এসেছে ‘প্রসন্ন বিদায়’ গল্পে, গঙ্গা এসেছে ‘প্রতিশ্রুতি’ গল্পে, সুকন্যা এসেছে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ গল্পে, শকুন্তলার কাহিনি এসেছে ‘অঙ্গুরীসংবাদ’ গল্পে, যযাতি ও শর্মিষ্ঠার আখ্যান স্থান পেয়েছে ‘প্রণয়কন্টক’ গল্পে। তাঁর মহাভারতধর্মী প্রতিটি গল্পই স্বতন্ত্র, নিজস্ব আবেদনে হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং সব গল্পগুলিতেই নারী

চরিত্রকে গল্পকার প্রাধান্য দিয়েছেন এমনও নয়। ‘প্রসন্ন বিদায়’ গল্পে দেবযানীর ব্যর্থ প্রেমের পাশে কচের বেদনা ও গভীর অনুভবের বিষয় হতে পেরেছে। ‘প্রণয়কন্টক’ গল্পে যযাতির যন্ত্রণা সামান্য পরিসরেই ফোটাতে পেরেছেন গল্পকার। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত গঙ্গা তো যথাসময়ে স্বর্গে ফিরে যাবেই। তাই গঙ্গার ভূমিকাকে স্মরণীয় করে রাখতে উপস্থাপিত হয়েছে চমৎকার একটি লাইন- ‘পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমায়’। যথার্থ প্রেমিক শান্তনু চরিত্রটিকে সজীব করে তুলেছেন গল্পকার। ভাবনার এই জায়গা থেকে ‘প্রতিশ্রুতি’ গল্পটিও কম অসাধারণ নয় একেবারেই।

২.৬।। মহাভারত কেন্দ্রিক প্রধান ও অপ্রধান গল্পকারগণ

আসলে মহাভারত ভারতীয় উপমহাদেশে এবং এর বাইরেও এশিয়া মহাদেশের এক বিস্তৃত অংশের জনমানসে সুবিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব শুধুই কিছু দশক বা শতকের নয়, বেশ কয়েক হাজার বছরের বলে আমাদের মনে হয়। ভাবনার এই পরিসর থেকে এই কথা বলাই বাহুল্য যে, উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের গল্পগুলির মতো বাংলা ভাষার একাধিক গল্পগুলিও মহাভারতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাই আমাদের আলোচনার এই অংশে বেশ কিছু বাঙালি গল্পকারের মহাভারত কেন্দ্রিক গল্পগুলিকে নিয়ে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাকে বুঝতে চেষ্টা করব। রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, দীপক চন্দ্রের মতো হয়তো এই গল্পকারেরা মহাভারতকে নিয়ে অনেক গল্প লেখেন নি। কিন্তু, বাঙালির মহাভারত চর্চাকে বুঝতে গেলে এঁদের গল্পগুলিকেও আলোচনায় রাখতেই হবে। এই তালিকায় বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রধান ও অপ্রধান গল্পকারেরা রয়েছেন। যেমন- গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্নী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী বসু, বিমল কর, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল, সমরেশ বসু এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন প্রমুখেরা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ একজন কথা সাহিত্যিক। বেশ কিছু মহাভারতমূলক গল্প ও উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। *পাঞ্চজন্য* নিয়ে এর পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এই অধ্যায়ে যেহেতু আমরা আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র ছোটগল্প কেন্দ্রিকই রেখেছি, তাই গজেন্দ্রকুমারের মহাভারত কেন্দ্রিক অনেকগুলি রচনার থেকে দু’টি গল্পকে না উল্লেখ করে পারছি না। গল্পগুলি হল- ‘যাজ্ঞসেনী’, ‘জরা বাসুদেব’। মহাভারতে অন্যতম নারী চরিত্র তো বটেই, এমনকী মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির মধ্যে দ্রৌপদীকে রাখতেই হবে। কারণ তার কারণেই শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে। ধর্মযুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়ী হয়ে হস্তিনাপুরে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সেই ব্যক্তিত্বময়ী, অসাধারণ সুন্দরী এবং প্রখর বুদ্ধিমতী রমণী

দ্রৌপদী নিজেই মহাভারতে এক বড়ো জায়গা দখল করে আছে। মহাভারতে আমরা পেয়েছি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অন্যান্য পাণ্ডব ভাইদের স্বামী হিসাবে বরণ করে নিলেও ধনঞ্জয় অর্জুনই ছিল তার একমাত্র সুপ্ত অহংকার। যদিও অর্জুনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ও প্রেম দেখিয়ে অন্য পাণ্ডবদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যে দ্রৌপদী অবহেলা করেছে তা নয় একেবারেই। কিন্তু, অর্জুনের প্রতি তার প্রেম অন্য পাণ্ডবদের থেকে অধিকতর বেশিই ছিল, এর একাধিক প্রমাণ ও ইঙ্গিত মহাভারতেই আছে। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর পতনের কারণ হিসাবে যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতি অধিকতর ভালোবাসা এবং প্রেমকেই দায়ী করেছিল। ‘যাজ্ঞসেনী’ গল্পে গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুপথযাত্রী পাঞ্চালীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত অনুভূতিকে উন্মোচন করেছেন। এখানে অর্জুনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ও প্রেমের কারণে দ্রৌপদী নিজেকে অপরাধী ভাবে নি। কিন্তু তার মনের কোথাও নিভৃত একটি গোপন স্থানে কর্ণের জন্য দুর্বলতা ছিল। শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী কর্ণ নিজের দক্ষতা ও গুণাবলীর সাহায্যে দ্রৌপদীর মনে জায়গা করে নিয়েছে। অবশেষে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এবং নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার জন্যই কর্ণ কুরুক্ষেত্রের ময়দানে মৃত্যুবরণ করে, কর্ণের এই চরম পরিণতির জন্য দ্রৌপদী নিজেকে দায়ী করেছে এবং অনুশোচনাগ্রস্তও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বাধা ও সামাজিক অনুশাসন অতিক্রম করে দ্রৌপদী কামনা করেছে আগামী জন্মে কর্ণের প্রেমিকা তথা পত্নী হওয়ার জন্য। গল্পকার গজেন্দ্রকুমার মিত্রের এই গল্পে মহাভারতীয় দ্রৌপদী চরিত্রের নবনির্মাণ ঘটেছে।

গল্পকার মিত্রের মহাভারত কেন্দ্রিক অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্পের নাম ‘জরা বাসুদেব’। আসলে মহাভারতে কৃষ্ণের চরিত্রের অনেকগুলি দিক আছে। যার মধ্যে অন্যতম দুইটি হল- অপরাধীকে দণ্ড প্রদান এবং ধর্মরাজ্য স্থাপনা। মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রগুলির থেকে কৃষ্ণের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি গভীর এবং জটিলও বটে। শুধুমাত্র নিজের কূটনীতি ও রাজনৈতিক ভাবনার উপর ভিত্তি করে সমগ্র আর্যাবর্ত ও হস্তিনাপুর নিয়ন্ত্রণ করেছে। এগুলি সত্ত্বেও এই কথা বলতেই হয় যে, মহাভারতে কৃষ্ণকে ব্যাসদেব আদর্শ মানুষ হিসাবেই উপস্থাপন করেছে। কিন্তু আবার একই সঙ্গে কৃষ্ণ আদর্শ মানুষের পাশাপাশি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অংশীদারীও বটে। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণ চরিত্রটি সামগ্রিকভাবে মহাভারতে বহুস্তরীয় এবং বহুমাত্রিক। মহাভারতের এই বিশাল চরিত্রকে নিয়ে বিশ শতকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস লেখা হয়েছে। সেই বিষয়ে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণ চরিত্রের জনমানসে জনপ্রিয়তা কত গভীর। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন *পূর্ণাবতার*, দীপক চন্দ্রের *শ্রীকৃষ্ণপুরাণোত্তম*, কালকূটের *শাস্ত্র*। এছাড়াও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় থেকে বাণী বসু পর্যন্ত সবাই কৃষ্ণকে নিয়ে একাধিক আখ্যান লিখেছেন। ঠিক এমনই চল্লিশের দশকের

সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র কৃষ্ণকে নিয়ে লিখেছেন ‘জরা বাসুদেব’। এই গল্পে কৃষ্ণ উপস্থাপিত হয়েছে একজন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারদর্শী ব্যক্তি হিসাবে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ শতকের ফসল ছোটগল্প, তাই সমকালীন ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও সংকট গভীরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ওই গল্পে। কৃষ্ণকেও আমরা এখানে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে পাই না। বরং গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন জীবনের শেষ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানুষকে যে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মসমালোচনায় দগ্ধ হয়েছে।^{৭৪}

কাশীরাম দাসের মহাভারতের হাত ধরেই বাঙালি মহাভারতের কৃষ্ণকে গভীরভাবে চিনেছে। মধ্যযুগের সেই কাশীরামের কৃষ্ণ যুগের চাহিদা অনুসারে পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়েছে অনেকটাই। নবীনচন্দ্র তাঁর ‘ত্রয়ী মহাকাব্যে’ কৃষ্ণকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তুলে ধরেছেন। আবার বাঙালির জাতীয়তাবাদের আইকন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে নির্মাণ করেছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই নয়, কৃষ্ণ সেখানে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগে অনুশীলিত একজন মানুষ। ঠিক একইভাবে বিশ শতকের চল্লিশের দশক অনেক সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও সমানভাবে পড়েছে। ফলে এই নৈরাজ্যের সময়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর গল্পে দেখালেন যে, আদর্শ ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ যে সকল পন্থা অবলম্বন করেছিল সেগুলির সবকটিই মানবিকতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় নি। কৃষ্ণ নিজেকে শান্ত স্বভাবের এবং ক্রোধহীন মানুষ হিসাবে এতকাল ভেবে এসেছে, কিন্তু পরে সে বুঝতে পেরেছে ভয় এবং ক্রোধ সম্পূর্ণ সে অতিক্রম করতে পারে নি। ফলে আত্মসমালোচনায় রীতিমতো দগ্ধ হতে হয়েছে তাকে, নিজের একাধিক মনের সত্তার সঙ্গে কথোপকথনে নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছে সে। স্বাভাবিকভাবেই যে ধর্মযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিল কৃষ্ণ তা শেষপর্যন্ত অধরাই থেকে গেছে। জীবনের শেষ পর্বে এসে কৃষ্ণকে দেখতে হয়েছিল যাদবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ ও মারামারি। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধ শেষে সমগ্র যাদব বংশকেই বংশহীন করে দেয়। এমনকী অর্জুনের সঙ্গে যে যাদব নারীরা হস্তিনাপুরে ফিরে আসছিল, তারাও দস্যুদের হাতে লাঞ্চিত হয়েছে। তাই কৃষ্ণ ও বলরামের নির্মিত সভ্যতা এভাবেই শেষ পর্যন্ত ধুলোয় মিশে গেছে। জরা নামক ব্যাধের তীর নিষ্ক্ষেপে কৃষ্ণের মৃত্যু সাধারণ জৈব বার্ধক্যের রূপকল্প। অন্যদিকে এই জরা তৎকালীন সময়েও সমানভাবে সত্য। গজেন্দ্রকুমার দেখতে পেয়েছেন ধীরে ধীরে একটি দেশ ও জাতি মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। আসলে ব্যক্তি কৃষ্ণের এই ট্রাজিক রূপের মধ্য দিয়ে গজেন্দ্রকুমার আসলে ১৯৪০ পরবর্তী ও সমকালীন যুগের মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকেই দেখতে পেয়েছেন। সমসাময়িক চারের দশকেও ভারতের ওই ধূসর, কালিমালিণ্ড রূপ গজেন্দ্রকুমার দেখতে পেয়েছিলেন। এভাবেই মহাভারতের কৃষ্ণের শেষ জীবনের

সঙ্গে আমাদের চারের দশকের ক্ষয়িষ্ণু ভারতকে মেলাতে চেয়েছেন গল্পকার গজেন্দ্রকুমার মিত্র। এরকম কৃষ্ণকে নিয়ে মহাভারতমূলক গল্প খুব কমই লেখা হয়েছে।

যুদ্ধের বাজারে এরকম আরও তিনটি গল্পের নাম আমরা মনে করতে পারছি যেগুলিও এভাবে মহাভারতের মোড়কে আসলে সমকালকেই উপস্থাপিত করেছে। এগুলির মধ্যে অবশ্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসনীয়’ এবং ‘রাঘব মালাকার’ গল্প দু’টির নাম উল্লেখ করতেই হবে। অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসন’ গল্পটিও কিন্তু একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার নয়। মানিক তাঁর গল্পে মহাভারতের দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ দ্বারা বস্ত্র যোগানোর ঘটনাটিকে অন্যভাবে নিয়েছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইমেজ নির্মাণ করেছেন মানিক। আসলে মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনায় সমগ্র পাণ্ডবরাই হাজির ছিল, উপস্থিত ছিল পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিদুর এবং অন্যান্যরা। রাজসভায় উপস্থিত ছিল আরও অনেকেই। সবার উপস্থিতিতেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রয়াস করেছিল দুঃশাসন। কিন্তু দুঃশাসনের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি, কারণ কৃষ্ণ অদৃশ্য থেকে পোশাক যোগানোর মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। মহাভারতীয় যুগে এভাবেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল সেই সময়ের অন্যতম সুন্দরী নারী তথা কৌরব-পাণ্ডব বংশের বধূ যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বা সমকালীন চারের দশকে পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় হয়ে ওঠে যে তা অনেকাংশে মহাভারতের ঘটনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই চূড়ান্ত আশাভঙ্গের সময়ে এবং চোরাবাজারের দিনগুলিতে ভোলা নন্দী ও আনোয়ারেরা কৃষ্ণের ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। তাই রাবেয়ার মতো নারীরা নিজের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য কোনও কৃষ্ণের দেখা পায় না। ভোলা নন্দী-র মতো লোকজনও সেখানে কৃষ্ণ হয় না। তাই শেষ পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়। নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার জন্য শেষ পথ অবলম্বন করা ছাড়া অন্য উপায় কিছু অবশিষ্ট থাকে না।^{৭৫} এভাবেই গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে মহাভারতকে মিলিয়েছেন।

অন্যদিকে গল্পকার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য গল্প ‘রাঘব মালাকার’ কিন্তু এই যুদ্ধকালীন চারের দশককেই উপস্থাপন করে। এটাও একটি ক্ষয়িষ্ণু সময়কালকেই উপস্থাপন করে। গল্পতে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় বন্ধনীর মাধ্যমে গল্পের প্রারম্ভে একটি কটাক্ষ করেছেন। এই গল্পে একদিকে পৌরাণিক ভাবকল্প যেমন ভেঙে গেছে, তেমনি আবার সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ উপস্থাপিতও হয়েছে। গল্পের রাঘব কৃষ্ণের ভূমিকায় এলেও নতুন যুগের নিকৃষ্ট দুঃশাসনদের হাতে তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে হয়। এই চরম সত্য আমাদেরও মনে নিতে কষ্ট হয়। কী অসাধারণ নিপুণতায় গল্পকার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারতের সঙ্গে সমকালকে মিলিয়ে পড়েছেন তা আমাদের ভাবলে অবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না!

[পুরাণে বলে একদা নররূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন— বহুকাল পরে আবার তিনি....এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কী পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন.... তবে দুঃশাসনকে জন্ম করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকার, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিয়ো— আশা করি এই ছোট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন...]^{৭৬}

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসন’ গল্পটিকেও এর ব্যতিক্রম বলা যাবে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও পরবর্তী সময়ের ক্ষয়িষ্ণু সময়কে তুলে ধরেছে। এই গল্পে কাপড়ের বড়ো ব্যবসা আছে দেবীদাসের। সে যাত্রার আসরে ‘দুঃশাসনের রক্তপান’- এর অভিনয় দেখে তার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল; পাপকর্মার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাবশেই সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে ওঠা শ্রমিকদের হাতে ধারালো হেঁসোগুলো দেখে ভীত হয়ে সে ভাবতে লাগল, যে-দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে? এই গল্পের শিল্পকৌশল কথকতার ভঙ্গি আশ্রয় করেছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহারী দুঃশাসনের হত্যা প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত যাত্রার অভিনয় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শুধু দেবীদাসের মনের প্রতিক্রিয়াই নয়, পাঠকের মনেও এর প্রতিশ্রুতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মহাভারতের যুগের দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন তার নিজের কর্মের জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শাস্তি পেয়েছিল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাজটি যার হাত ধরে হয়েছিল, এক্ষেত্রে তার বুক চিরে ভীমসেন রক্তপানের মধ্যে দিয়ে নিজের পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। কিন্তু বর্তমানের এই অবক্ষয়ের যুগে, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যখন এতটাই হাহাকার উঠেছে, তখন এইকালের দুঃশাসনেরা নিজেদের স্বার্থ ও লোভ চরিতার্থ করতে সফল হয়। একালের বস্ত্রহীন বা ছেঁড়া বস্ত্র পরে থাকা কোনও নারীর সম্মান রক্ষায় কোনও কৃষ্ণের আগমন হয় না। এইভাবে বিশ শতকের মাঝের দশকগুলিতে ভয়াবহতা, অভাব এবং ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা কৃষ্ণ চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে যেন ব্যঞ্জিত হয় সমকালের গল্পগুলিতে। যুদ্ধের বাজারে বেশি আর্থিক লাভ করার জন্য বদ্ধপরিকর দেবীদাস, তাদের তৈরি করে তোলা কৃত্রিম সংকটের কারণেই আজকের দ্রৌপদীদের ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। গল্পের শেষ অংশটি পড়তে গিয়ে যেকোনও পাঠকেরই বুক কেঁপে ওঠে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থাপনায় উঠে এসেছে:

ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌর দাসের দৃষ্টি, ছলছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই— কাপড়

পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।

ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত নারীকণ্ঠ শোনা গেল: লক্ষণ বেরিয়ে গেছে।

— ওঃ আচ্ছা।

দু'জনে আবার নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। গৌরদাসের মনে হল- যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?^{৭৭}

আমরা জানি মহাভারত একটি বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরীয় মহাকাব্য। যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে মহাভারত লিখিত হয়েছে বা এর সংকলন হয়েছে, তাই মানব চরিত্রের জটিলতা এবং বৈচিত্র্যকে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছে মহাভারত। বলা বাহুল্য, ভারতীয় উপমহাদেশে মহাভারতের মতো অপর কোনও মহাকাব্য বা সাহিত্য মানব মনের এত গভীর অন্বেষণ করে নি। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ঈর্ষা, ভালোবাসা, লোভ এবং মোহ সমস্ত কিছুই চরমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মহাভারতে। যে কারণে বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও আমাদের এখনো সমানভাবে হাত পাততে হয় মহাভারতের কাছে। তবে আমাদের আধুনিক লেখকেরা বা গল্পকারেরা মহাভারতের কাহিনিকে বা চরিত্রকে হুবহু সরাসরি গ্রহণ করেন নি, তাকে রূপান্তরিত করেছেন সমকালের যুগের চাহিদা অনুসারে। তাই তাদের গল্পের নায়ক নায়িকারা মহাভারতের সময়ের প্রতিনিধি নয়, বরং তারা সমকালীন সময়কেই তুলে ধরে। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম একজন অন্যতম চরিত্র। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সংকল্প মহাভারতের পাঠক মাত্রই প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার ইচ্ছামৃত্যুর বর। জীবনের শেষে পিতামহ ভীষ্মের যন্ত্রণা ছিল একক। তাই মহাভারতের ভীষ্মকে নিয়ে গল্প লিখেছেন গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

যদিও ভীষ্মের শরশয্যা প্রসঙ্গকে অবলম্বন করেই বনফুল গল্প লিখেছেন, কিন্তু তার গল্পে একটি যুগ ও সময়ের অসুখের কথা উঠে এসেছে। ‘শরশয্যা’ গল্পের কথক চরিত্র খবরের কাগজে নারীত্বের লাঞ্ছনার সংবাদে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সংকল্পও করে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে আপস করতে হয়। যুবতী নারীর শোয়ার ঘরে উঁকি দেওয়া যে লোকটিকে কথক শিক্ষা দেওয়ার কথা ভেবেছিল, সেই ব্যক্তি আসলে চাকরির চিঠির সুপারিশকারী ব্যক্তি। তাই যে হাত দিয়ে কথক উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা ভেবেছিল সেই হাতকেই নমস্কার করার স্তরে নামিয়ে আনতে হয়েছে। আমরা জানি মহাভারতের ভীষ্ম দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করতে পারে নি। ধর্মের সূক্ষ্ম ভেদ সম্পর্কে ভীষ্ম নিজেই

দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পড়েছিল। ঠিক একইভাবে সমকালীন যুগের ভীষ্ম অন্যায়ে দেখেও জোরপূর্বক প্রতিবাদ করতে অক্ষম হয়েছে। তাই তার মানসিক যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখে চাকরির জন্য উমেদারি করে এবং প্রতাপের কাছে নতজানু হয়। সমকালীন যুগের এই অবক্ষয়কে ধরার জন্য বনফুল আশ্রয় নিয়েছেন মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্রের কাছে।

আবার গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী পিতামহ ভীষ্মকে নিয়ে লিখেছেন ‘ভীষ্মের পিপাসা’ নামক গল্প। এই গল্পে মহাভারতের ক্লাসিকাল নায়কের পিপাসার সঙ্গে প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের পিপাসার পার্থক্য গল্পকার দেখিয়েছেন। মহাভারতে শরশয্যায় থাকা অবস্থায় পিতামহের ইচ্ছা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল অর্জুন। অর্থাৎ পিতামহকে তীরের সাহায্যে জলপান করাতে পেরেছিল অর্জুন। কিন্তু এই গল্পে কৃষক ভীষ্ম গরানির পিপাসা মেটে না। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে শস্যে ভরপুর ধানক্ষেত অথবা মানুষের খামার ভরা ধান দেখার ইচ্ছে পূর্ণ হয় না আধুনিক যুগের এই ভীষ্মের। জীবনধারণের জন্য সামান্যতম চাহিদা মেটানোর অতৃপ্ত পিপাসা বুকে নিয়ে ভাইপো অর্জুনের কোলে মাথা রেখে এই ভীষ্মের জীবন শেষ হয়। বলা বাহুল্য, এই যুগ আসলে অবক্ষয়ের তথা স্বপ্নভঙ্গের। তাই বাস্তব আর স্বপ্ন মেলে না। নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখতে পায় তার দু’চোখ ভরা স্বপ্ন কীভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। এভাবেই মহাভারতীয় ব্যঞ্জনাকে ব্যবহার করে মহাশ্বেতা দেবী নিম্নবর্ণীয় মানুষদের নানান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে উপস্থাপন করেছেন। এভাবেই মহাভারত হয়ে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে আধুনিক মানুষের জীবনের আখ্যান উপস্থাপনের অন্যতম মাধ্যম।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পটির নাম আমরা সবাই জানি। মহাশ্বেতা মহাভারতীয় মিথকে নতুনভাবে তাঁর গল্পে রূপ দিয়েছেন। এই গল্পটি মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম জনপ্রিয় গল্পও বটে। মহাভারতের দ্রৌপদী পাশা খেলার বিরুদ্ধে এবং কৌরবদের অন্যায়ে ও অপরাধের বিরুদ্ধে জোরালো স্বর তুলেছিল। সেই ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই কালের একজন প্রতিবাদী নারী চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। গল্পকার দেখিয়েছেন প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি একজন নারী কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে ক্ষমতাসালী প্রতিনিধিদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে। মহাভারতের সময়ে অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত নারী দ্রৌপদীর লজ্জা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল কৃষ্ণের সাহায্যে। কিন্তু মহাশ্বেতার গল্পের নায়িকার প্রতি হওয়া অত্যাচার ও অবিচার যেন কোথাও মহাভারতকেও ছাড়িয়ে যায়। মহাশ্বেতার দ্রৌপদীকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে কোনও কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না, একটি কাপড় দিয়ে কেউ তার লজ্জা নিবারণের সহায়ক হয়েও ওঠে না। আমাদের সময়ের দ্রৌপদী নিজেরাই নিজেদের প্রতিবাদের অন্য রূপ নির্মাণ করতে পেরেছে।

এই গল্পে গল্পকার নির্মাণ করেছেন এক অভিনব পুরাণ। জোতদার সূর্য সাহু দ্রৌপদীর হাতে খুন হলে তার নামে সহকারী বের হয়। খুনিকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে টাকার কথাও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যে অরণ্যের বুকে এতকাল দ্রৌপদীরা বেড়ে উঠেছে, যে অরণ্যকে ভালোবেসে সে আপন করে নিয়েছে, সেখানে সহজে সে ধরা পড়ে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের গোষ্ঠীর লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদী ধরা পড়ে। দু'ঘন্টা জেরার পর সেনানায়ক তাকে বানিয়ে আনতে বলে, নির্দেশ যায় নিচের শ্রেণির লোকেদের কাছে। এরপর দ্রৌপদীকে ধর্ষণ করা হয়। সারারাত ধরে তাকে ধর্ষণের পর তার পরিধেয় জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হলে দ্রৌপদী তা পরিধান করতে অস্বীকার করে। পরিধেয় শাড়ি পরতে চায় না সে। তার শাড়ি মুখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে সে সেনানায়কের সামনে দিয়ে নগ্নভাবেই চলে যায়। দ্রৌপদী ঘৃণার সঙ্গে তার রক্তমাখা থুতু সেনানায়কের জামায় ছিটিয়ে দিয়ে বলে যে, এখানে কোনও পুরুষ নেই যে লজ্জা করবে। এই দৃষ্ট ভঙ্গিতে দ্রৌপদী যখন সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে, তখন এই প্রথম সেনানায়ক দ্রৌপদীর অস্ত্রহীন টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়। ভীষণ সেই ভয়। দ্রৌপদীর এই প্রতিবাদ যেন কোথাও আমাদের মহাভারতের দ্রৌপদীর থেকেও অধিকতর জোরালো বলে মনে হয়। কারণ মহাশ্বেতার দ্রৌপদীর এই প্রতিবাদের এক ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য আছে। যে সমাজে এখনো মেয়েদের ওপর এভাবে অত্যাচার হয়, সেই সমাজ কীভাবে সভ্যতার দাবি করে! তাই এই গল্পে গল্পকার তার দ্রৌপদীর প্রতিবাদ, সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে এক নতুন স্বপ্নকে নির্মাণ করেন। যেখানে সে বা তার স্বামী অথবা গোষ্ঠীর অন্য কেউ ধরা পড়লেও তাদের সংগ্রামের বিনাশ নেই। রাষ্ট্রশক্তি তার বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রৌপদীদের এই আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে পারবে না।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। সাস্ত্রি এবংবিধ আচরণ দেখে বাউরা হো গিয়া— বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদিকে, কিন্তু কয়েদি দুর্বোধ্য আচরণ করলে কী করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওয়ালাকে শুধোতে যায়।

... ... একী? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরও কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?

কাপড় কই ওর, কাপড়?—

পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।—

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চোটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মতো ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?

চারিদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শাটটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্ —?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।^{৭৮}

মহাশ্বেতার এই গল্পের গ্লট নির্মাণ এবং শব্দ চয়ন আমাদের মুগ্ধ করে। কী অসাধারণ নৈপুণ্যে গল্পকার দ্রৌপদীর প্রতিবাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। মহাভারতকে আশ্রয় করে আসলে সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির বল প্রয়োগ কেমন ছিল তা বোঝানোর জন্য এই গল্পটি পাঠকদের কাছে অসামান্য দলিল হয়ে থাকবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সৌরভ মুখোপাধ্যায় মহাভারতের নানান উপাদানকে কাজে লাগিয়ে একাধিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে তাঁর মহাভারত মূলক উপন্যাসগুলি নিয়ে কিছু কথা বলেছি। এখন তাঁর রচিত ‘অবরোহিনী’ নামক একটি ছোটগল্প আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তাই গল্পটি নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। এই গল্পটি ছাড়াও ‘উত্তর ফাল্গুনী’ এবং ‘শেষ সূর্যোদয়’ তাঁর রচিত অন্যতম মহাভারত মূলক গল্প। ‘অবরোহিনী’ গল্পটি শুরু হয়েছে পাণ্ডবদের সুদীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে রাজ্য শাসন করার পর যখন তারা জগতের সমস্ত মায়া মমতা ও প্রেম দূরে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়ার জন্য স্বর্গে যাত্রা শুরু করে সেই পটভূমিতে। স্বর্গে যাত্রার সময় মহাভারতে যা যা ঘটনা ঘটেছিল তা এই গল্পে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। আধুনিকতার প্রয়োজনে গল্পকার নিজের মতো করে কাহিনীতে কিছু পরিবর্তন এনেছেন। এখানে দ্রৌপদী অবলা নারী নয়, রীতিমতো প্রতিবাদী একুশ শতকের একজন নারীবাদী ও মানবতাবাদী শিক্ষিত নারী। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই স্বর্গে যাত্রার সময় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী নানা বিষয়ে তর্ক জুড়েছে। রীতিমতো কঠিন শব্দ বন্ধনীতে এবং যুক্তিতে দ্রৌপদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে একেবারে পরাজিত করে ছেড়েছে। এই গল্পে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর করা প্রশ্নগুলির যথা উপযুক্ত উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্রৌপদীর করা এই প্রশ্নগুলি আমাদের চির পরিচিত মহাকাব্যকে নতুন দৃষ্টিকোণ সহযোগে পড়তে সাহায্য করেছে। যুধিষ্ঠিরের

প্রতি করা দ্রৌপদীর মন্তব্যগুলি বা সমালোচনাগুলি একেবারে একজন আধুনিক তार्কিক ও যুক্তিবাদী মানুষের ভাবনার ফসল। তাই এই গল্পে দ্রৌপদী একজন মহাভারতীয় নারী নয়, বরং বিশ বা একুশ শতকের একজন মানবতাবাদী রমণী। যে বিনা বাক্যে যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তগুলি মহৎ হিসাবে মেনে নেয় না, সেগুলির দুর্বলতাও যে একটি বড়ো জায়গা দখল করে আছে তা সমবেতভাবে স্বর্গে যাত্রাকালে যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দেয়। তাই গল্পে দ্রৌপদীর স্বর্গে যাত্রার সময় মহাভারতে পড়ে যাওয়া বা মৃত্যুর যে কাহিনিটি আছে সেইটি এখানে গল্পকার নবরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমবার মৃত্যুর পরেও তাই দ্রৌপদী বেঁচে উঠেছে এই গল্পে। জীবন্ত মানুষ হিসাবে স্বর্গে প্রবেশের প্রাক মুহূর্তে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সামনে দ্বিতীয়বার বেঁচে ফিরে আসে এবং পৃথিবীতে থাকাকালীন তার অনেকগুলি সিদ্ধান্তেরই মহানতা বা ভালোত্বকে খারিজ করে দেয়। প্রশ্নের মুখে পড়ে যুধিষ্ঠিরের ভাবনাগুলি বা পূর্বের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি। এখানে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলে— শুধুমাত্র চরিত্রের দোষেই কী পাণ্ডবদের স্বর্গযাত্রার কালে পতন হয়েছে? যদি হয়েও থাকে তা শুধুমাত্র চরিত্র দোষে, তাহলেও যুধিষ্ঠির নিজে সম্পূর্ণ নির্দোষ বা নিরপরাধ নয়। দ্রৌপদী এখানে মনে করিয়ে দিয়েছে যে অন্যান্য পাণ্ডবদের মতো যুধিষ্ঠিরেরও চরিত্রের দোষ বা ত্রুটিগুলি। দ্রৌপদী অভিযোগের সুরে যুধিষ্ঠিরকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, যুধিষ্ঠির নিজে ধর্মরাজ ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান হওয়া সত্ত্বেও কখনো উপদেশ বা আদেশ অথবা অভিযোগের মাধ্যমে অন্যান্য পাণ্ডবদের ত্রুটিগুলি অবহিত করে নি। যেখানে পিতার অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুতে বড়ো ভাইকে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য বা শাস্ত্র পিতার সমান হিসাবে দেখিয়েছে, সেখানে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা উচিত রূপে পালিত হয় নি। সে কারণে দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে অন্যান্য পাণ্ডবদের চরিত্র দুর্বলতাই যদি মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের গৃঢ় উদাসীনতা বা সত্য বচনে অনীহা সম পরিমাণে দায়ী হবে না কেন?

গল্পে আমরা দেখতে পাই দ্রৌপদীর এই অভিযোগের যথাযথ উত্তর যুধিষ্ঠির দিতে পারে না। পরিবর্তে নিজের মহানতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অনেক পুণ্য অর্জনের দ্বারাই সম্ভব এবং ক্ষুদ্র নারী বুদ্ধিতে সেইটি বোঝা যায় না। এই কথার পরের অংশে দ্রৌপদী তার যুক্তিবাদী মননের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছে যুধিষ্ঠিরের সেরকম পুণ্যের কাজ কিছুই নেই। ভীম ও অর্জুনের শারীরিক শক্তিতে এবং কৃষ্ণের কুটনৈতিক বুদ্ধির সৌজন্যে ধর্মরাজের গায়ে পরাজয়ের আঁচ লাগে নি। দ্রোণাচার্য বধে ‘অশ্বখামা হত’ এইটি বলা ছাড়া তার গুরুত্বপূর্ণ কিছুই কাজ নেই। মহাভারতের রচয়িতা মহামতি ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে মহান প্রতিপন্ন করার জন্য তাকে ধীমান, জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তার জ্যোতি দিয়ে পাতার পর পাতা শ্লোক লিখে গেছে। যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে আরও একগুচ্ছ অভিযোগ দ্রৌপদী জানিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল যুধিষ্ঠিরও ব্যক্তি জীবনে

একাধিক মিথ্যা কথা বলেছে। কুন্তী যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য দখলের বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়েছে, সেখানে মাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ না করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির মায়ের কথাকে অবহেলা করেছে। কিন্তু উল্টোদিকে মাতৃ আঞ্জাকে হত্যার করে অর্জুনের বিয়ে করা পত্নীকে সমস্ত ভাই মিলে উপভোগ করেছে। দ্রৌপদীর মতো সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করার জন্য সমস্ত পাণ্ডবরাই সমানভাবে লালায়িত ছিল। এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সেইটি প্রতিরোধের চেষ্টা করে নি। উল্টে ‘ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম’— এইটি বলে ভাতৃ বধূকে ভোগ করেছে।

এগুলির পাশে দ্রৌপদীর মানসিক যন্ত্রণার দিকটিও গল্পকার আধুনিকতার দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে উঠে এসেছে যৌবনের কষ্টকর দিনগুলির কথা। পছন্দের মানুষের পরিবর্তে অন্যান্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যৌবনের দিনগুলি ভাগ করে নিতে হয়েছে। ফলে মানসিক তৃপ্তি তার হয় নি। এই বেদনা গল্পকারের কলমে উঠে এসেছে:

সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা! যজ্ঞভাগ! হায়..., পাঞ্চালীর স্বর হতাশ, অন্যমনস্ক শোনাল মুহূর্তের জন্য, তারপরই যন্ত্রণাদীর্ঘ হয়ে উঠল, অনাহ্বাতা অস্পৃষ্ট যৌবনকুসুমটি যার পায়ে উপহার দেব বলে দেহমনকে উৎসুক করে রেখেছিলাম, সহসা দেখলাম সেই শৌর্যমণ্ডিত উজ্জ্বল শ্যাম যুবার পরিবর্তে আমার প্রথম মধুনিশির সঙ্গী হয়ে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়প্রায় জ্যেষ্ঠ... সমাজবিধিমনতে যাঁর সঙ্গে বাক্যালাপই নিন্দনীয়! আমার কৌমারী তনুর অনাস্বাদিত অক্ষত যোনিকে ভেদ করার অধিকার তাঁরই, হায় মাতৃ-আদেশ! অতঃপর নারদ বিধান মেনে প্রত্যেক পতির অধীনে এক-এক বর্ষ যাপন... প্রথমে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, অতঃপর মধ্যম পাণ্ডব...। একজন প্রবীণ— যান্ত্রিক ও নিরুত্তাপ, অন্যজন অমানুষিক শক্তিধর— যাঁর সামান্যতম নিষ্পেষণেও তীব্র শ্বাসরোধী যন্ত্রণা ভোগ করেছি দিনের পর দিন! মহারাজ, যে নারীর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিবসযামিনীগুলি কাক্ষিত পুরুষের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির বাহুপাশে যাপিত হয়, নিতান্ত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও অনুৎসুক দেহকে তুলে দিতে হয় হৃদয়সংযোগরহিত সম্ভোগকারীর হাতে— নিজেকে গণিকা ভিন্ন আর কী মনে হতে পারে তার? কুরুসভায় সুতপুত্রের সেই কটুভক্তি আসলে এক নির্মম সত্যবচনই ছিল হে মহাভাগ! বৎসরের পর বৎসর এই আত্মদহনের জ্বালার উপশম কি যজ্ঞভাগ কিংবা রাজ্ঞীর আসনলাভের মাধ্যমে সম্ভব? ওই সব মর্যাদাব্যঞ্জক শব্দগুলিকে আমার তীব্র পরিহাস ছাড়া কিছুই মনে হয়নি।^{৭৯}

তবে দ্রৌপদীকে নিয়ে আরও অনেক গল্পকার গল্প লিখেছেন। বলা বাহুল্য, দ্রৌপদীর মতো বহুস্তরীয় ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্রকে নিয়ে গল্প রচনা করাটাই স্বাভাবিক বিষয়। বাণী বসু তাঁর ‘পাঞ্চজন্য’ গল্পে দ্রৌপদীর বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন একটু ভিন্নভাবে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আধুনিক কোনও নারীর জীবন যাপনের সঙ্গে দ্রৌপদীকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন গল্পকার বাণী বসু। তিনি মহাভারতের নারীর মানসিক যন্ত্রণাটিকে ভেবে দেখেছেন, কুন্তীর বচনের সত্যতা রক্ষা

করার জন্য অন্য পাণ্ডবদের সঙ্গেও দ্রৌপদীর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু এই জীবন কি দ্রৌপদী হৃদয় থেকে মেনে নিয়েছিল? মহামতি ব্যাসদেব এ বিষয়ে আমাদের কিছু না জানালেও গল্পকার বসু নারীর যন্ত্রণাদঙ্ক রূপটিকে উপস্থাপন করেন। বর্তমান সময়ের শিক্ষিত নারী, যারা একসময়ের কলেজের সহপাঠী, তাদের বৈবাহিক জীবনের যন্ত্রণার প্রতিবেদনের মাধ্যমে দ্রৌপদীর হৃদয়ের যন্ত্রণাকে খানিকটা স্পর্শ করতে পারেন বাণী বসু। গল্পকার দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গটিকে আশ্রয়, সম্মান এবং প্রেমের বস্ত্র হিসাবে দেখেছেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাক হরণের মধ্যেই থেমে নেই, তার অর্থ আরও গভীরভাবে অন্বেষণ করেছেন তিনি। বর্তমানের দ্রৌপদীরা রুঢ় বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে যে তাদের জীবন থেকে একে একে বস্ত্র লুপ্তিত হয়ে গেছে। তাদের সম্মানও অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে। এভাবেই গল্পকারের উপস্থাপিত দ্রৌপদীরা মিশে গেছে মহাভারতের দ্রৌপদী তথা যাঙ্কসেনীর সঙ্গে।

গল্পকার বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘দ্রৌপদী’ নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। আমরা জানি যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলাকে কেন্দ্র করে সমস্ত সমস্যার সূচনা হয়েছিল। পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে পণ হিসাবে রেখে পাশা খেলা হয়েছিল। প্রকাশ্য রাজসভায় অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চ স্বামী সহ কুরু বংশের কেউই দ্রৌপদীর পাশে দাঁড়ায় নি। নারীর প্রতি এই অপমান প্রতিটি যুগেই সমানভাবে ঘটে চলেছে। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। মহাভারতের এই প্রসঙ্গটি মনে করানোর পাশাপাশি গল্পকার ফিরে এসেছেন বর্তমানের সময়ে, যেখানে দেখতে পাই পাঁচ জন বন্ধু পুরীতে ঘুরতে গিয়ে লতা নামক একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। বলা বাহুল্য, মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে সমানভাবেই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রত্যেকেই লতাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে লতাকে আকর্ষণ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। নিজেদের পঞ্চপাণ্ডব বলে তারা অভিহিত করে এবং লতা তাদের কাছে হয়ে ওঠে মহাভারতের দ্রৌপদী। শেষ পর্যন্ত লতার মনোনীত বা পছন্দের লোকটি কে তা না বুঝতে পেরে তারা পৌরাণিক স্বয়ম্বর সভার আদলে বর্তমানের জুয়া খেলার আশ্রয় নেয়। সমস্ত স্তরের সামাজিক অবক্ষয় এবং সার্বিক অবনমন যখন আমাদের যুবক সমাজকে প্রভাবিত করে, তখন সমাজে এরকম ছবিই দেখা যায়।

গল্পকার পূর্ণেন্দু পত্নী তাঁর ‘দ্রৌপদী’ নামক গল্পে মহাভারতের দ্রৌপদীর যে চরিত্রগত গুণাবলীগুলি ছিল (যেমন- দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব, বুদ্ধিমতী তार्কিক প্রভৃতি), সেগুলি আধুনিক সংগ্রামী নারীর মধ্যে খুঁজে দেখতে চেয়েছেন। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে সংগ্রামী নারী চরিত্র সনকা মাহাতো নামক একটি নারীকে কেন্দ্র করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী এবং সাক্ষরতা অভিযানের ‘অ্যাক্টিভ মেম্বার’ সনকা মাহাতো নিজের জীবন সংগ্রামে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে। সেই জন্য নিজেকে মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে সে তুলনা করেছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর

মতোই তাকেও কেন্দ্র করে থাকে একাধিক কুৎসা, মুখরোচক খবর, নানারকম ষড়যন্ত্রের জাল। গল্পতে জানা যায় মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো তার জীবনেও পাঁচজন স্বামী আছে। যথা- নিজের স্বামী, নিজের সন্তানেরা, কমিউনিস্ট পার্টি, পঞ্চায়েত এবং সাক্ষরতার আন্দোলন। অত্যন্ত পরিশ্রমী মাহাতো গোষ্ঠীর বা জনসমাজের এই আধুনিক দ্রৌপদী নিজের দক্ষতা, প্রতিবাদ এবং সাধনার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট অভিমুখে যাত্রা করেছে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির নিজে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। মহাভারতে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা ও দর্শন যুধিষ্ঠিরের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে যা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু আবার সঠিক সময়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে বা পাশা খেলার মতো অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য সমস্ত অর্থ ও সম্মান এবং রাজ্য তাকে খোয়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যার ফল কুরুক্ষেত্রের মতো যুদ্ধ। ফলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এই দুইটি দিক মহাভারতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সে যথেষ্টই সমালোচিত আবার অন্যদিকে মহাভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারিতও হয়েছে। গল্পকার বিমল কর তাঁর ‘সত্যদাস’ এবং ‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’ নামক দু’টি গল্পে ধর্মের রক্ষক এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের ইমেজ ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

‘সত্যদাস’ গল্পে আমরা পাই মুদিখানা দোকানের মালিক রঘুনাথকে, যে নিজে হৃদয়বান, দরিদ্র এবং ধার্মিক। কিন্তু তার স্বভাবজাত যে গুণ তাকে মহৎ করে তুলেছিল সেই চরিত্রে এক সময় দাগ লেগে যায়। অর্থাৎ হৃদয়বান ও ধার্মিক রঘুনাথ সত্যদাসের মোহর চুরি করে ফেলে। ফলস্বরূপ লোভ তাকে পরাজিত করে। সামান্য মোহরের মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় সে। আমাদের জীবনে সততা ও ধর্মের গুরুত্ব সত্যদাস গল্পের আকারে বা গল্প বলার ঢঙে বুঝিয়ে বলে। আরও বলে যুধিষ্ঠির তার এই সততা ও ন্যায়ধর্মী দৃষ্টির জন্যই শেষ পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় স্বর্গে গিয়েছিল, কিন্তু পৃথিবীবাসী মানুষ বারংবার লোভের কারণে এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। সার্বিকভাবে এই গল্প আমাদের এক গভীর দার্শনিক পথের সন্ধান দেয়।

অন্যদিকে ‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’ গল্পটিও অসাধারণ। আসলে গল্পকার এখানে প্রতীকের আড়ালে জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। আয়না বস্তুতপক্ষে এখানে ব্যক্তি মানুষের নিজেকে দেখার একটি বস্তু, যেখানে ব্যক্তি মানুষ নিজেকে মাপতে পারে, যেখানে মানুষ নিজের অভ্যন্তরীণ মনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। এই গল্পেও প্রকৃতপক্ষেই সেইটি হয়েছে। রোহিনী এবং কমলার কদর্য মানসিকতা বা ছবি একটি আয়নাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে ফিরে এসেছে। আসলে গল্পের অন্যতম চরিত্র গগনচন্দ্র তার প্রাণ রক্ষাকারী যুধিষ্ঠিরকে বাড়িতে রাখতে চাইলে তার উপস্থিতি একেবারেই পছন্দের ছিল না গগনের পত্নী এবং আশ্রিতা দিদির। এরকম অসহনীয় পরিস্থিতির

দাপটে যুধিষ্ঠির সেই বাড়ি থেকে চলে যায়। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে গগনচন্দ্রকে একটি পুরনো আয়না দিয়ে যায়। এই আয়না গল্পে একটি প্রতীক। এখানে গগনচন্দ্রের স্ত্রী নিজের মুখ দেখে ভয়াবহ চিৎকার করে ওঠে এবং তার হাত থেকে আয়নাটি পড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এর পর পড়ে যাওয়া আয়নার কাঁচে আশ্রিতা দিদি কমলার হাত কেটে যায়। পরে এই বিষয়টি যুধিষ্ঠিরের থেকে গগনচন্দ্র বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারে। গগনকে যুধিষ্ঠির একটি গল্পের আড়ালে বিষয়টি উপস্থাপন করে, যেখানে মানস সরোবর থেকে উড়ে আসা হাঁস আমাদের পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তির প্রতীক এবং কাক জীবনের সংকীর্ণতার প্রতীক। এই বিষয়টি বোধগম্য হলে সহজে বুঝতে পারা যায় যে, আয়নাতে রোহিনী আসলে নিজের মনের তথা হৃদয়ের কদর্য রূপ দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এবং রোহিনীর কাজের সমর্থক কমলাও এখানে শাস্তি পেয়েছে সেই কাঁচে হাত কেটে যাওয়ার মাধ্যমে। এভাবেই অপরাধী এবং অপরাধের সমর্থক অন্য একজন উভয় ব্যক্তিরই পরিণাম সমান হয়েছে। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে একটি ইমেজ হিসাবে এখানে ব্যবহার করার মাধ্যমে গল্পকার সততা, ন্যায় এবং ধর্ম বিষয়টিকে গভীরভাবে বোঝাতে চেয়েছেন।

একদিকে বিমল কর তাঁর দুইটি মহাভারতীয় গল্পে যেমন যুধিষ্ঠিরের চরিত্রকে সামনে রেখে আমাদের সততা, ন্যায় এবং ধর্মকে বোঝাতে চেয়েছেন। ঠিক তার সম্পূর্ণ উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে গল্পকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যুধিষ্ঠিরের অন্য একটি চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। যেখানে যুধিষ্ঠির অন্যান্য মানুষের মতোই। একজন সাধারণ পৃথিবীর মানুষ হিসাবে আমাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা এবং ঈর্ষার মতো খারাপ প্রবৃত্তিগুলি আছে। আবার ঠিক এর উল্টোদিকে ভালো চারিত্রিক গুণাবলীও আমাদের মধ্যেই সমানভাবে রয়েছে। ফলে এই ভালো এবং খারাপ উভয় প্রবৃত্তির সহযোগেই একজন মানুষের চারিত্রিক নির্মাণ ঘটে। তাই সুনীলের ভাবনার এই অবস্থান থেকেই তাঁর ‘স্বগদপনি’ গল্পে যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখেছি। গল্পে আগাগোড়া কৌতুকের আবহ বজায় রেখে তিনি মহাভারতীয় যুধিষ্ঠিরের যে চারিত্রিক গুণাবলী বা চিত্রকল্প রয়েছে সেটিকে ভেঙে টুকরো করে দিয়েছেন।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মতো কুন্তীও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। শুধুমাত্র পাণ্ডুর বিবাহিত স্ত্রী হয়েই থেকে থাকে নি কুন্তী, পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পুত্রদের যত্ন করে বড়ো করে তোলা এবং উপযুক্ত শিক্ষায় দীক্ষিত করে তোলা কুন্তীর অন্যতম সাফল্য বলে আমাদের মনে হয়। শুধু তাই নয় বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবদেরকে কৌরবদের অত্যাচার হতে বাঁচার মন্ত্র শেখানো বা পরবর্তীকালে যুদ্ধবিমুখ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নেওয়ার জন্য প্রণোদনা দেওয়া কুন্তীর বড়ো কাজ। এই ধর্মযুদ্ধের জন্য উৎসাহ দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে বিদুলার আখ্যান যুধিষ্ঠিরকে কুন্তী শোনায় যা মহাভারতে ধর্ম বা ন্যায় সম্পর্কে অন্য একরকম ‘ন্যারেটিভ’ নির্মাণ করে। ফলে কুন্তীকে নিয়েও গল্পকারেরা গল্প লেখার উৎসাহ পাবেন এটাই

স্বাভাবিক। তবে এ কথাটি ঠিক যে, কুন্তীর কথা বলতে গিয়ে কর্ণের কথাও পরপর মহাভারতে এসেই যায়। তাই অনেক গল্পকারকে কুমারী মাতার সামাজিক লজ্জা এবং সন্তান বিসর্জনের পরে মাতৃত্বের যন্ত্রণার বিষয়টি অনেকভাবেই নাড়া দিয়েছে। আবার একইভাবে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে নিজের সন্তানদের মৃত্যুকে আটকানোর জন্য কর্ণকে তার জন্ম বৃত্তান্ত (এতদিনের গোপন সত্য কথাটি) বলার মাধ্যমে কুন্তীর সুবিধাবাদী মনোভাবটিও আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। ফলে কুন্তীর স্বার্থবোধ এবং কর্ণের সংকটময় মনের দ্বন্দ্ব আধুনিক গল্পকারদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে সুবোধ ঘোষ লিখেছেন ‘কৌন্তেয়’ নামক একটি গল্প।

এই গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, বয়স্ক মহিলা সুহাসিনী পল বড়ো বড়ো বাড়িতে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই ভিক্ষাবৃত্তির আসল উদ্দেশ্য যে দান, সে কথাও জানায় সে। এভাবেই চলছিল দিনগুলি। কিন্তু একদিন দত্ত বাড়ির গৃহিণী তাকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিলে সুহাসিনী এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এরপর একদিন মাধব দত্তকে সুহাসিনী জানায় যে সে তারই সন্তান। আজ থেকে অনেক বছর পূর্বের ভালোবাসার ফল মাধব। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই মাধবের মনে গভীর দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। উল্টোদিকে সুহাসিনীর কথা মাধব প্রবলভাবে অবিশ্বাস করলেও নিজের মনের অন্তরে একটা সংকট বইতেই থাকে। বর্তমান সময়ের যুক্তিবাদী মনের অধিকারী মাধব দত্ত প্রবলভাবে সুহাসিনীর কথা অবিশ্বাস করলেও সুহাসিনীর স্বপ্ন অন্ধকার ঘরে বসে অল্প সময়ের জন্য মাধব মানসিকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে সে ছুটে পালাতে চায়। আসলে দত্ত বাড়ির গৃহিণীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা থেকে সুহাসিনী এই ভাবনার নির্মাণ করলেও শেষ পর্যন্ত তার আচরণেও একপ্রকার স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। তাই চালাকির আড়ালে মা এবং সন্তানের মধ্যকার চিরাচরিত মানবিক সম্পর্কটি গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পকার সমরেশ বসু ‘কুন্তী সংবাদ’ নামে একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন। গল্পে তিনি মহাভারতের কুন্তীর কুমারী মাতা চিত্রকল্পটি গ্রহণ করলেও এই গল্পে প্রকৃতপক্ষে তিনি এর বিনির্মাণকেই দেখাতে চেয়েছেন। আসলে এই গল্পটি গ্রামের অল্প বয়সের একটি কন্যা মুনিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই মুনিয়াকে একদিন গ্রামের নির্জন মাঠে অপরিচিত কেউ সম্ভোগ করে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে মুনিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ গ্রামীণ জনসমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করা যায় তাই নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত বিচার বসায়। মুনিয়ার ওপরে ক্রমশ অত্যাচার বাড়তে থাকে। বিচার সভায় সরল মনের মানুষ মুনিয়া তার সঙ্গে ঘটা সমস্ত ঘটনার বিষয়ে পরপর বলে যায়, কিন্তু এই কাজটির পেছনে কোনও মানুষ নাকী দেবতা বা অপদেবতা আছে তা সভার বিচারকেরা ঠিক করতে পারে না। তখন সেই স্থানে

উপস্থিত একজন বৃদ্ধার কথা অনুসারে ঠিক হয় একাজের পেছনে কোনও দেবতারই হাত আছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে এরপর আর জটিলতা বাড়ে না। উল্টে মুনিয়ার অনাগত সন্তানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত মুনিয়ার সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। আসলে এই গল্পে পৌরাণিক মহাভারতীয় কুন্তীর বিনির্মাণ ঘটেছে। মহাভারতের কুন্তী কিন্তু কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি জনসমক্ষে কখনো স্বীকার করতে পারে নি। মহাভারতের কুন্তীর মধ্যে সর্বদাই একপ্রকার ভয় ও লজ্জা কাজ করে এসেছে। কিন্তু উল্টোদিকে গল্পকার এই গল্পে লোকসমাজে কুমারী নারীর পরিণাম এবং সংস্কার ও বিশ্বাসকে দেখিয়েছেন, যেখানে বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্কে গর্ভে সন্তান এলেও তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সেই সন্তান মুক্ত মনেই খোলা আকাশে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পায়। আমাদের শিক্ষিত নাগরিক সমাজকে এই গল্পের মাধ্যমে এক হাত নিয়েছেন গল্পকার। শহুরে নাগরিক সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে থাকলেও কুমারী মাতা নিয়ে তাদের মধ্যে এক প্রকার 'ট্যাবু' কাজ করেই, কিন্তু লোকসমাজ বা লোকজীবনে এই নিয়ে কোনও লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই, বিষয়টি নিয়ে তারা অনেক বেশি মানবিক।

মহাভারতে কর্ণ অন্যতম একজন প্রতিনায়ক। প্রতিনায়কের মধ্যে নায়কের সমস্ত গুণাবলীই থাকে, কিন্তু পরিস্থিতি এবং অবস্থা তাকে প্রতিনায়ক করে তোলে। মহাভারতের মধ্যে কর্ণ একটি বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরীয় চরিত্র। বিভিন্ন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে এবং জন্মের পরবর্তী সময় থেকেই নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে কর্ণের জীবন এগিয়েছে। ফলে দ্বন্দ্ব এবং সংকট কর্ণকে অনেক বেশি মহাভারতে নিঃসঙ্গ ও বিষম্ব করে তুলেছে। কর্ণকে নিয়ে অনেক বাঙালি গল্পকারই গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে তিনটি গল্প নিয়ে আমরা এখন কথা বলব। গজেন্দ্রকুমার মিত্র যেমন কৃষ্ণকে ও দ্রৌপদীকে নিয়ে গল্প লিখেছেন, ঠিক তেমনই কর্ণকে নিয়েও তিনি 'হোমান্সিসম্ভবা' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পটি পড়তে আমাদের চমৎকার লাগে। কারণ গল্পে কর্ণ চরিত্রের নবনির্মাণ ঘটেছে। গল্পে দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের অপ্রকাশিত প্রেমই প্রধান হয়ে উঠেছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে মহাভারতের অন্যতম প্রতিনায়ক কর্ণ হৃদয়ের অব্যক্ত প্রেম ও ভালোবাসাকে রুদ্ধ রাখে নি। পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদীর প্রতি গোপন মনের ভালোবাসাই তাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমস্ত পরাজয় বরণ করে নিতে শক্তি দিয়েছে। প্রতিনায়ক কর্ণের এই অপরূপ আবেগের প্রকাশই এই গল্পটির মূল বিষয়। কর্ণ এবং দ্রৌপদীর মধ্যকার এই স্বীকৃতি না পাওয়া প্রেমকে নিয়ে অনেক বাঙালি সাহিত্যিকই তাঁদের মতো করে আখ্যান রচনা করেছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যকার এরকম সম্পর্ক সম্পর্কে মহাভারতকার ব্যাসদেব বিন্দুমাত্র কিছু ইঙ্গিত রাখে নি।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন আমাদের অন্যতম বড়ো একটি বিপর্যয়। যেখানে নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজভূমি ছেড়ে পরবাসী হতে হয়েছিল। এই দেশভাগের

পটভূমিতেই গল্পকার অমলেন্দু চক্রবর্তী লিখেছিলেন ‘অধিরথ সূতপুত্র’ নামে একটি গল্প। যেখানে নিজ দেশহারা যুবকের অন্তরের বেদনা ও হাহাকারের সঙ্গে প্রতিনায়ক কর্ণের ভাবমূর্তিকে মিলিয়ে দেখতে চাওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে মহাভারতের কর্ণকে জন্মের পরবর্তী সময় থেকেই নানান সামাজিক বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, গ্লানির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ হওয়ার কারণে নানান সামাজিক বিধি ও নিষেধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে তার জীবনের যাত্রাপথ খুব একটা মসৃণ ছিল না। ঠিক অমলেন্দু চক্রবর্তী’র এই গল্পেও মূল বিষয়বস্তু প্রতিকূল পরিবেশে নিজের পরিচয় সন্ধান। আসলেই দেশভাগের পর নিজের পরিচিত সমস্ত কিছু থেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বৃহৎ একটি গোষ্ঠীর মানুষকে বাস্তবহারা হতে হয়েছে। তার ফলে জীবনের পথে বহুমাত্রিক সংকট হাজির হয়েছে, গল্পকার চক্রবর্তী সেই দিকটিকেই দেখাতে চেয়েছেন। মহাভারতের প্রতিনায়ক কর্ণের জীবনের যন্ত্রণা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল মাতৃস্নেহ না পাওয়ার কারণে, আর একালের যুবক সনাতন নিজেও দেশ হারিয়ে প্রিয়তমাকে হারিয়ে তার মাকে খুঁজেই চলেছে। তবে সনাতনের এই যন্ত্রণা শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের নয়, এই যন্ত্রণার সীমা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যুগ ও দেশকে স্পর্শ করেছে।

মহাভারতের কর্ণ এবং কুন্তী চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবী’র রচিত ‘কর্ণ-কুন্তী কথা’ গল্পে। এখানে পুরাণ চিত্রের বৈপরীত্য গল্পে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। এই গল্পের কর্ণ হল আধুনিক যুগের মানুষ সুদেব। আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্ব অনেক বেশি জটিল। এ যুগের মানুষেরা অনেক বেশি স্বার্থপর। গল্পে দেখা যায় একদিন যে ব্যক্তি দুধের শিশুসহ অসহায় ও বিধবা নারীকে মানবিকতার খাতিরে আশ্রয় দিয়েছিল, সুদেব জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যার কারণে, সেই কাকা ও মাকে সন্দেহের চোখে সে দেখেছে। ফলস্বরূপ তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবী’র গল্পে বুক ভরা ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে কুন্তী কর্ণকে মানুষ করে তুললেও সন্তানের থেকে প্রাপ্য সম্মানটুকু পায় না। কাশীতে সুদেবের মাকে জীবনের একটা বড়ো সময় ধরেই একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে। মৃত্যুর আগেও সন্তানের মুখ সে দেখতে পায় নি, এই যন্ত্রণা জীবনভর বুক বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সুদেবের মা। মহাভারতের কর্ণ মা কুন্তীর ডাকে সাড়া দেয় নি, তার প্রধান কারণ ছিল নিজের পৌরুষ রক্ষার জন্য। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় পেতে চেয়েছিল সে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সময়ে দুর্যোধন তার পাশে থেকেছে, তাই সেই ঋণের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতই কুন্তীর কাছে ফেরা তার একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। যাই হোক, এই গল্প আমাদের মহাভারতের অন্য এক পাঠ নির্মাণে সাহায্য করেছে।

ভোগের ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনার প্রকাশকে উপস্থাপন করতে গিয়ে আধুনিক লেখকেরা এবং গল্পকারেরা যযাতির কাহিনিকে বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এরকম

গল্পের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। আমরা আমাদের আলোচনায় এগুলির থেকে বেশ কয়েকটিকে নিয়ে কথা বলতে চাইছি। রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং মল্লিকা সেনগুপ্ত পর্যন্ত অনেকেই যযাতিকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। এর পূর্বে রাজশেখর বসু'র 'যযাতির জরা' নামে বিখ্যাত গল্পটি নিয়ে আমরা কথা বলেছি। পরশুরাম তাঁর নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের প্রয়োগের মাধ্যমে যযাতি চরিত্রের স্বার্থপরতা ও ভোগের মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা জানি মহাভারতের যযাতি সম্পূর্ণ কামনা ও ভোগের জীবন অতিবাহিত করার পর মোহমুক্ত হয়েই নিজের পুত্রকে পুনরায় যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরশুরামের গল্পে দেখি পিতা ও পুত্র উভয়েই ভোগের ফাঁদে পা দিয়েছে, যযাতিও যুবতী নারীকে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে। আসলে মহাভারতের চরিত্রদের ব্যবহার করে পরশুরাম একটি অসুস্থ ও অস্বাভাবিক সময়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'দুটি নাম' গল্পে যযাতিকে নিয়ে শারীরিক ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্তির বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পের মূল বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে মানসিক অতৃপ্তির ওপরে। গল্পের অন্যতম দুইটি চরিত্র পঞ্চগনন দত্ত এবং ভুবনবাবু উভয়ের বাসনা শুধুমাত্র শরীর কেন্দ্রিক হয়েই থাকে নি, মানসিক সাহচর্যই সেখানে অন্যতম হয়ে উঠেছে। পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে তারা নিজেদের যৌবনকে ফিরে পেতে চেয়েছে। মহাভারতের গল্প থেকে এখানেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পটি আধুনিক হয়ে উঠেছে। গল্পকার সুবোধ ঘোষ 'গালব ও মাধবী' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। আমরা গল্পকার ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা' নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। যেখানে মাধবীর পিতা যযাতি যে কোনও উপায় অবলম্বন করেই স্বর্গে থাকতে চেয়েছে, তার জন্য নিজের কন্যাকে ভোগ্য বস্তু হিসাবে দান করে দিতেও পিছিয়ে আসে নি। যদিও এই গল্পে শেষ পর্যন্ত পিতা যযাতি কন্যা মাধবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। গালবও মাধবীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যযাতি চরিত্রের ভোগী সত্তাকে কেন্দ্র করে গল্পটি এগিয়েছে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য 'আমি মাধবী' নামক গল্পে যযাতি চরিত্রটি পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের প্রতিভূ রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানেও যযাতি নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ স্বর্গ লাভের ইচ্ছায় প্রবলভাবে মোহিত হয়ে গিয়ে কন্যাকে ভোগের বস্তুতে পরিণত হতে বাধ্য করেছে। আধুনিক গল্পকার সুচিত্রা ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন কীভাবে কন্যা মাধবীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মূল্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন আত্মসচেতন নারী হিসেবে মাধবীর মনের দ্বন্দ্ব ও সংকট এবং যন্ত্রণাকে। গল্পের প্রথমেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য অঙ্কন করতে চেয়েছেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের ছবিটিকে।

আমি পুণ্যলোক রাজা যযাতির মেয়ে মাধবী। মাতৃপরিচয়? কী হবে জেনে? মা তো শুধুই গর্ভধারণের আধার, তাঁর পরিচয় কোন কাজে লাগে? আমি জন্মেছি অমিতবীর্য রাজা যযাতির ঔরসে, এই আমার একমাত্র পরিচয়। ‘কুমারী’ মেয়ের এ ছাড়া আর কোনও পরিচয় থাকতে নেই যে। পরিচয় কেন, আমার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বও আছে কি?^{৮০}

আবার গালবের কাছে মাধবীর অজান্তেই তাকে তুলে দেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এই কথাটি জানার পর সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মাধবী হয়ে উঠেছে বাকরুদ্ধ। গল্পে তিনি লিখেছেন:

আমি স্তম্ভিত। বাকরুদ্ধ। এ কী বলছেন গালব? মেয়ে হতে পারি কিন্তু মানুষ তো বটে। ইনি আমাকে ভাড়া খাটাতে চান? ছি ছি।

সম্মিত ফিরতে সোজাসুজি তাকালাম, আমার বাবা এসব জানেন?

— অবশ্যই। তিনিই তো আমাকে পরামর্শটা দিলেন।

রাগে দুঃখে অভিমানে চোখে জল এসে গেল। আমার জন্মদাতাই জেনেগুনেন.....!^{৮১}

আবার অধিক বয়সের কোনও অবিবাহিত নারী যদি আমাদের বাড়িতে থাকে তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত ও বিশ্বাসী আমাদের বাড়ির বড়োরা খুবই বিব্রত হয়। ভাবটা এমন হয় যে, যত দ্রুত সম্ভব কন্যার বিবাহ হলে পিতা-মাতা সহ বাড়ির অন্যান্যরা বড়ো বিপদ থেকে মুক্ত হয়। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর অবস্থান এখনো অনেকটাই এরকম। তাই গল্পকার সুচিত্রা ভট্টাচার্য মাধবীর বিবাহ সভার বিষয়ে লিখতে গিয়ে লিখেছেন:

কিন্তু বিধি বাম। মহাপুণ্যবান রাজা যযাতি দু’বেলা কানের কাছে এসে হুশহাশ নিঃশ্বাস ফেলেন, ঘরে অবিবাহিতা মেয়ে রয়েছে বলে তাঁর নাকি রাতে ঘুম হয় না! আরও দুঃখ, মেয়েটা পতিহীন থাকলে মরার পরে স্বর্গে তার নাকি ঠাঁই হবে না! অতএব মেয়েকে পাত্রস্থ করতেই হবে। ওদিকে মনে আবার সঙ্কোচও আছে, চারটে বাচ্চা হওয়া মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে অন্য রাজারা হাসাহাসি না করে!

অনেক ভেবেচিন্তে পাঁচ ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন রাজা। শেষ পর্যন্ত নিজেরা নিজেরা একটা উপায়ও বার করে ফেললেন। আমাকে ডেকে হুকুম জারি করা হল, প্রস্তুত হও। তোমার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে।^{৮২}

গল্পকার বিমল কর তাঁর ‘যযাতি’ গল্পের মধ্যে মহাভারতের যযাতির বৈশিষ্ট্য বর্তমানের মানুষ নীলকণ্ঠের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র নীলকণ্ঠর বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মতো। মূলত সে যাত্রার পালা লেখে এবং গায়। মহাভারতের যযাতির মতো এই যুগের নীলকণ্ঠেরও ভোগ ও সুখের ইচ্ছা সমানভাবেই আছে। মহাভারতের অনেক পালার কথাই এই গল্পে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু নীলকণ্ঠের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা প্রবল হওয়ার কারণে বিদুর বা যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কিত পালাগুলি তার পছন্দের তালিকায় স্থান পায় না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠর যৌবন ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তাই এখনো কুসুমের প্রতি নীলকণ্ঠ অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করে। এদিকে ছেলে ললিতও কুসুমকে পছন্দ করে। গল্পের শেষ অংশে দেখতে পাই নীলকণ্ঠ যযাতিকে নিয়ে একটি পালা গান লিখেছে, সেখানে পুরুকে উদ্দেশ্য করে যযাতি যা বলতে চেয়েছে তা বস্তুতপক্ষে নীলকণ্ঠের একেবারে মনের কথা। বিমল কর এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

নীলকণ্ঠের স্বরে অদ্ভুত এক বেদনা এবং বিষণ্ণতা আর ব্যাকুলতা। কী কাতর কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছিল না, এটা নাটকের অভিনয়। বুক থেকে প্রত্যেকটি কথা যেন স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসছিল। শাপগ্রস্ত জরাভীত, ভোগী এক পুরুষ কাতরকণ্ঠে যৌবন শিক্ষা করছে। আমি সুখের অভিনাষী, আমি ভোগের ভিক্ষুক, আমি বিলাসে ক্লান্ত হই নি, আমার দেহ এই অকালে শ্লথচর্ম, লোল হয়ে যাবে—; না, না— এ আমি সহ্য করতে পারব না। এখনো যে আমার ভোগ্য ধেনু আছে, সুরা আছে, ফল আছে, পুষ্প আছে, নারী আছে, শত সহস্র মুখ আছে এই বসুন্ধরায়। তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করো না। ‘তৃপ্ত নহি, ক্লান্ত নহি—; আসঙ্গ জ্বালায় জ্বলে এ দেহ নিয়ত।’^{৮৩}

আমরা জানি মহাভারতের পুরু পিতার ইচ্ছা পূরণ করেছিল, তেমনই এই যুগেরও সম্পূর্ণভাবে ভোগের ইচ্ছায় নিমজ্জিত থাকা নীলকণ্ঠকে পুত্র ললিত নিজেই কুসুমকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। গল্পকার লিখেছেন:

ললিত খুব মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বললে, ‘মেয়েছেলে বাসায় না থাকায় বড় অসুবিধা ঘটছে। একটা বিয়া করুন আপনি। কুসুমকেই করুন। ভাল মেয়ে।’^{৮৪}

সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন ‘অম্বোপাখ্যান’ নামে একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন। মহাভারতের অম্বা পরবর্তী জন্মে শিখণ্ডী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মহাভারতের অম্বা এবং শিখণ্ডীর কাহিনির কথা আমরা সবাই জানি। এছাড়াও এই অম্বাই যে পরবর্তী সময়ে অর্জুনকে সামনে রেখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের প্রাণ হরণ করে নিয়েছিল সে কথাও আমরা ভুলে যাই নি। তবে মহাভারতের এই আখ্যান নবনীতা দেবসেনের হাত ধরে আধুনিক একটি গল্প হয়ে উঠেছে। তাই তো গল্পকার নবনীতা দেবসেন এই গল্পের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র মহাভারতের ঘটনাটিকেই পুনরায়

বলে যান না, তাঁর নির্মিত অম্বা এখানে সম্পূর্ণভাবেই বিশ শতকের একজন নারী, যে নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে ভীষণভাবে সচেতন। মহাভারতে অম্বার অনুরোধে এবং সমস্যা সমাধানে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পরশুরামের আগমন হয়েছিল। ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে গুরু পরশুরামও জয়ী হয় নি। কারণ ভীষ্মের কর্ম ও প্রতিজ্ঞা অত্যন্ত দৃঢ় ও সত্য ছিল। তবে এই গল্পে নবনীতা দেবসেন পরশুরামকে টেনে আনেন নি। অম্বার সম্মান রক্ষার জন্য এই গল্পে পরশুরামকে যুদ্ধ করতে হয় নি। পরিবর্তে ভীষ্ম সরাসরিই অম্বার সঙ্গে মিলনের প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে বলেছে কৌমার্য রক্ষার প্রতিজ্ঞা থাকার কারণে জীবিত অবস্থায় তার পক্ষে মিলন অসম্ভব, কিন্তু মৃত্যুর পর ভীষ্ম অবশ্যই অম্বার মনের প্রার্থনা পূরণ করবে। গল্পকার দেবসেন এ বিষয়ে লিখেছেন:

ভীষ্ম এবারে এক মধুর, গভীর, বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। দক্ষিণহস্ত অম্বার দিকে সন্মুখে প্রসারিত করে দিয়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন— “তথাস্তু। তাই হোক, অম্বা। তোমার কথাই সত্য হোক। শুভাননা, শোনো, তোমাকে সন্তান দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কিন্তু মিলনের ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে। প্রণয়ে যা সম্ভব হলো না, শত্রুতায় সেটাই সম্ভব। প্রেমিক হিসেবে তোমার কাছে আজ আত্মনিবেদনে আমি অসমর্থ, অম্বা, কিন্তু শত্রু হিসেবে একদিন আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করবো। জীবনে না পেলেও মরণে তুমি আমাকে তোমার স্ববশে আনতে পারবে। একমাত্র তুমিই, অম্বা।”

অম্বা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলেন। পরিচ্ছন্ন, রজতশুভ্র দৈববাণীর মতো ভীষ্মের মধুর গভীর স্বর ধ্বনিত হলো সেই শীতল নৈশ বাতাসে— “অম্বা, আমার জীবনে আর কোনো নারী নেই, শুধু তুমি। শুধু তুমিই আমৃত্যু আমার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকবে। এমন কী মৃত্যুর সহস্র বৎসর পরেও অম্বার নাম ভীষ্মের নামের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হবে। তুমি আমার উত্তরপুরুষদের মুখে মুখে ঘুরবে। অম্বা, তুমি ভীষ্মকে জয় করতে চেয়েছিলে, তুমি ভীষ্মকে জয় করবে। আমি তোমার হবো।”^{৮৫}

তবে ভীষ্মের মতো একজন মানুষ যে কর্তব্য পালনের জন্য সংসারের মধ্যে থেকেই সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন কাটিয়ে গেছে, অর্থাৎ তার প্রেমিক রূপ বা সত্তা আমরা সেভাবে মহাভারতে পাই না। কিন্তু নবনীতা দেবসেনের এই গল্পে গল্পকার ব্যাসদেবের মহাভারতের ভীষ্মের নির্মিত রূপটিকে অনেকটাই ভেঙেছেন এবং নতুন করে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই গল্পে। তাই অম্বা যখন ভীষ্মের কাছে এসে তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য কাতর আবেদন জানায়, তখন গল্পকার ভীষ্মের প্রতিক্রিয়া জানানোর পূর্বে লিখেছেন:

মহাবল ভীষ্মের বুকের মধ্যে উষ্ণ শোণিত ছাড়া করে আছড়ে পড়লো, বিশাল সিঁকুতীরে যেমন লবণাক্ত ফেনিল কল্লোল। এক পলকের জন্য বুঝি তাঁর নাড়ীর গতি রুদ্ধ হলো, তাঁর কানে

সহস্র ভ্রমরের গুঞ্জন বিমবিম করে উঠলো, কানে, চোখে, গালে, এক গূঢ় অভূতপূর্ব উষ্ণতা অনুভূত হলো, যেন জ্বরতপ্ত বোধ করে ভীষ্ম আহ্নিকের চেষ্টা বন্ধ করলেন।^{৮৬}

গল্পের শেষ অংশে মৃত্যু পথযাত্রী ভীষ্মের সঙ্গে অম্বার কথোপকথনটিও ভারী চমৎকার। প্রেমিক ভীষ্মের অসাধারণ একটি চিত্রকল্প এখানে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

ভীষ্ম অম্বার কোমল হাতে মৃদু চাপ দিলেন। নক্ষত্রের আলোয় তাঁর অধরের তৃপ্ত হাসিটি অম্বার মুগ্ধ চোখ এড়ালো না। সেই দৃশ্য দেখে স্বর্গের দেবতারা স্মিত মধুর হাস্য করলেন। মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রবৃন্দ আলোকবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আর অন্ধকারের অন্তরালে সূর্যদেব উত্তরায়ণে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হলেন।^{৮৭}

এই গল্পে অম্বার তার প্রেমিক শাল্ব রাজের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত নাকী অনুচিত সে সম্পর্কে দীর্ঘ ভাবনা এবং আত্মবিশ্লেষণ আছে। এটি একান্তভাবেই বিশ শতকের আধুনিক ব্যক্তির জটিল মানসিক ভাবনার ফসল। মহাভারতে অম্বা এত গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবে নি। এগুলির পাশে যক্ষ এবং যক্ষিণীদের রাত্রে জলকেলির ঘটনা গল্পকারের গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বস্তুতপক্ষে এগুলি কোনওটাই মূল মহাভারতে ছিল না। এগুলি নবনীতা দেবসেনের একান্তভাবেই নিজস্ব আবিষ্কার ও নির্মাণ। তবে গল্পটি পড়তে গিয়ে বারবার আমাদের মনে হয়েছে যে গল্পকার আসলে মহাভারতের আড়ালে সমসাময়িক সমাজের মানসিকতা এবং আমাদের পিতৃতান্ত্রিক ভাবনার কাঠামোকে দেখাতে চেয়েছেন। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও এখনো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সতীত্ব নিয়ে ভালোই ‘ট্যাবু’ আছে। তাই গল্পটির প্রথমে শাল্ব রাজের মুখ দিয়ে যে শব্দগুলি উঠে আসে, তা আসলে আমাদের সমাজেরই কঠোর বাস্তব চিত্রটা ফুটিয়ে তোলে।

এখন অম্বা কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু শাল্ব বললেন, “তাছাড়া লোকেই বা বলবে কি? অন্যপূর্বা কন্যা তুমি, অপরে চুরি করে নিয়ে গেছে যাকে, তাকে কোনো ভদ্রলোক কুলবধু করে নিয়ে আসে? আমাদের রাজবংশের একটা মানসম্মান নেই?”^{৮৮}

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

- ১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোট গল্প*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৮৭-১০৪
- ২। চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদিত), *বোধ*, কলকাতা, অক্টোবর ২০০১, পৃষ্ঠা ১০-২৬
- ৩। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, কলকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন সংস্করণ, অক্টোবর ২০১০, পৃষ্ঠা ৬৮০
- ৪। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮০
- ৫। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭৬
- ৬। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭৭
- ৭। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭০
- ৮। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭০
- ৯। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬৮
- ১০ ও ১১। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), *কোরক*, কলকাতা, শারদীয় ২০১৪, পৃষ্ঠা ২১৯
এছাড়াও গীতা নিয়ে রাজশেখর বসু'র ভাবনা আমরা অনেকটাই পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন গবেষক সঞ্চিতা বসু'র পিএইচ.ডি গবেষণার গবেষণা পত্র থেকে। তাঁর গবেষণা পত্রের শিরোনাম ছিল- 'পরশুরামের ছোটগল্প: নির্মাণের শিল্প'।
তাঁর গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২৭ ও ২৮ পৃষ্ঠায় এই সংক্রান্ত বিবরণ পাই।
- ১২। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৫
- ১৩। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৪
- ১৪। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৪
- ১৫। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), *কোরক*, কলকাতা, শারদীয় ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯৭
- ১৬। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মে ২০১১, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২
- ১৭। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪
- ১৮। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫
- ১৯। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬
- ২০। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭
- ২১। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৬
- ২২। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৯
- ২৩। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র ২*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩২

- ২৪। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯২
- ২৫। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৮
- ২৬। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৪-২১৫
- ২৭। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৪
- ২৮। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৭
- ২৯। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২১
- ৩০। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২
- ৩১। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৫ব, পৃষ্ঠা ৩ (ভূমিকা অংশ)
- ৩২। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১ (মুখবন্ধ অংশ)
- ৩৩। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২ (মুখবন্ধ অংশ)
- ৩৪। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮১
- ৩৫। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০০
- ৩৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, কলকাতা: ইউনাইটেড পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১
- ৩৭। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭
- ৩৮। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮
- ৩৯। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬
- ৪০। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭
- ৪১। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯০
- ৪২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৫৫
- ৪৩। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮
- ৪৪। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০০
- ৪৫। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০
- ৪৬। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩২
- ৪৭। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
- ৪৮। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
- ৪৯। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
- ৫০। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৫
- ৫১। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮

- ৫২। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৯
- ৫৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬১
- ৫৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭১-৭৭২
- ৫৫। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১
- ৫৬। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫
- ৫৭। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২
- ৫৮। ঘোষ, সুবোধ, ভারত প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪
- ৫৯। দীপক চন্দ্র এই সময়ের অন্যতম একজন কথা সাহিত্যিক। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্কিত একাধিক গল্প ও উপন্যাস তিনি লিখেছেন। তাঁর রচিত মহাভারত সংক্রান্ত অনেকগুলি গল্পকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত পৌরাণিক প্রেমকথা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে অরুণকুমার বসু'র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধটির নাম- 'কথা-পুরাণের নবভাষ্যকার ড. দীপক চন্দ্র'। আমরা দীপক চন্দ্র'র ছোটগল্পে মহাভারত কথা বিষয়ক কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক অরুণকুমার বসু'র প্রবন্ধের বেশ কিছু অংশ নিয়েছি। এক্ষেত্রে বর্তমান অংশটি প্রবন্ধের আট নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- ৬০। এই অংশটিও প্রাবন্ধিক অরুণকুমার বসু'র উক্ত প্রবন্ধের এগারো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- ৬১। এই অংশটিও প্রাবন্ধিক অরুণকুমার বসু'র উক্ত প্রবন্ধের এগারো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- ৬২। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৭
- ৬৩। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬
- ৬৪। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২
- ৬৫। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩
- ৬৬। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮
- ৬৭। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯
- ৬৮। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮
- ৬৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮৯
- ৭০। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮
- ৭১। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৯
- ৭২। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬
- ৭৩। চন্দ্র, দীপক, পৌরাণিক প্রেমকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬

- ৭৪। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), কোরক, কলকাতা, শারদীয় ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৬০
- ৭৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক (সম্পাদিত), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৪তম মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা ৯৭
- ৭৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাছাই গল্প, কলকাতা: নাতানা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২০৯
- ৭৭। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৮ব, পৃষ্ঠা ৫৮
- ৭৮। দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২৯-৩৯
- এছাড়াও মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পটির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সাহায্য পেয়েছি সময় তোমাকে পত্রিকার ‘আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মিথ’ নামক সংখ্যাটির কাছে। কলকাতা থেকে ২০১১ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকাতে দু’টি প্রবন্ধ আমাদের আলোচনাতে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে প্রথমটি অধ্যাপক নির্মাল্য কুমার ঘোষের লেখা প্রবন্ধ- ‘পুরাণী আখ্যান’ ও বাংলা ছোটগল্প; এবং দ্বিতীয়টি অধ্যাপক আত্রেয়ী সিদ্ধান্তের রচিত প্রবন্ধ- ‘মিথের আলোকে মহাশ্বেতার ছোটগল্প’।
- ৭৯। মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, গোল গল্প চৌকো গল্প, কলকাতা: দ্যা ক্যাফে টেবিল, তৃতীয় প্রকাশ, ২০২২, পৃষ্ঠা ১৮১
- ৮০। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: পুষ্প, অজ্ঞাত, পৃষ্ঠা ৪৯
- ৮১। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১
- ৮২। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮
- ৮৩। কর, বিমল, বাছাই গল্প, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, একাদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৩ব, পৃষ্ঠা ১৮৫
- ৮৪। কর, বিমল, বাছাই গল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৫
- ৮৫। দেবসেন, নবনীতা, গল্পসমগ্র ২, কলকাতা: সুপ্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২৫৭
- ৮৬। দেবসেন, নবনীতা, গল্পসমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৬
- ৮৭। দেবসেন, নবনীতা, গল্পসমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯
- ৮৮। দেবসেন, নবনীতা, গল্পসমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলা নাটকে মহাভারত অনুষ্ঙ্গ: বিচার ও বিশ্লেষণ

বিশ শতকের বাঙালির মহাভারত চর্চাতে সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের মতো নাটক ও যাত্রাপালারও একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। অন্যান্য সাহিত্য সংরূপে (মূলত ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং প্রবন্ধ) রচনাকারের দৃষ্টিভঙ্গি, মহাভারতের গল্প ও কাহিনি এবং বিনির্মাণ যতো দ্রুত উপস্থাপিত হতে পারে, নাটক ও যাত্রাপালাতেও বিষয়টি অনুরূপভাবেই হয়ে থাকে। তবে নাটক ও যাত্রাপালার প্রভাব এক্ষেত্রে অন্যান্য সংরূপের থেকে অল্প হলেও বেশি। মহাভারত সম্পর্কিত কথাসাহিত্য, কবিতা ও প্রবন্ধ আমাদের বিদ্যায়তনিক স্তরে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে নাটক ও যাত্রাপালা বিদ্যায়তনিক স্তরের গণ্ডি পেরিয়ে সহজেই পৌঁছে যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও মাপের দর্শকের কাছে। যেখানে নাটক ও যাত্রাপালা অন্য সংরূপের থেকে আলাদা। মহাভারতের কাহিনি ও গল্প এবং নাট্যকারের অভিপ্রায় ও দৃষ্টিভঙ্গি দর্শকের আসনে বসে থাকা দর্শকদের সরাসরি প্রভাবিত করে। কারণ নাটক শুধুমাত্র পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে তা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিতও হয়ে থাকে। ফলে দর্শক ও শ্রোতা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। উনিশ শতকের সময়কাল থেকেই শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষদের পাশাপাশি গ্রাম বাংলার সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মহাভারতের নানা আখ্যান, উপাখ্যান ও চরিত্র সম্পর্কে পরিচয় যাত্রাপালা ও নাটকই বেশি মাত্রায় করাতে পেরেছে। এর কারণ আনন্দাজ করা খুবই সোজা। অন্যান্য সংরূপের মাধ্যমে মহাভারত চর্চায় যেখানে সময় ও সাংস্কৃতিক পরিসর এবং সাংস্কৃতিক পুঁজি মানুষের প্রয়োজন হয়, সেখানে নাটক বা যাত্রাপালার অভিনয় গ্রাম মফস্বলের স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেই কারণে উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত বাঙালির মহাভারত চর্চায় নাটক ও যাত্রাপালার পরিমাণ অন্যান্য সংরূপের থেকে অনেকটাই বেশি। যার একটি তালিকা অধ্যায়ের শেষে আমরা যুক্ত করে দেব। আমরা জানি যে মধ্যযুগীয় সময়কাল থেকে জনপ্রিয় কৃষ্ণভিত্তিক কাহিনিগুলি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চের মধ্যে অভিনীত হতো, গ্রাম বাংলার স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষেরা ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরিচিত হয়েছে এরই মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে গ্রাম বাংলার সন্ধ্যা বেলায় চণ্ডী মণ্ডপে বয়স্ক মানুষেরা সুর করে জনপ্রিয় এই আখ্যানগুলিকে পড়ত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরাই পড়তে না জানার কারণে কেবলমাত্র মন ও হৃদয় দিয়ে শোনার কারণেই মহাকাব্যের গল্পগুলি বা কৃষ্ণের বিভিন্ন কাহিনিগুলি সমস্ত স্তরের শ্রোতার মধ্যে পরিচিতি লাভ করার মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছে। এভাবে সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়া বা ভারতীয় পুরাণের গল্পগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই ‘পারফরম্যান্স’ ছিল। কারণ মধ্যযুগীয় সময়কাল থেকে সুর করে এগুলিকে পড়া এবং একদল শ্রোতাকে মনোযোগ সহকারে শোনানো অবশ্যই ‘পারফরম্যান্স’। এভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি

যে, নাটক ও যাত্রাপালা বাঙালির মহাভারত চর্চায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত বা তারপরেও দু'টো দশক আমাদের মহাভারত চর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যায় নাটক ও যাত্রাপালার এই উৎকৃষ্ট ইতিহাসকে ছাড়া। পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর যাত্রাপালা বা মহাভারতীয় আখ্যানের উপস্থাপনা বরাবরই আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে বহুল জনপ্রিয়। এটির সাংস্কৃতিক অভিঘাত এতটাই গভীর যে এখনো গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে বা বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় হয়, সেখানে কাহিনির উপাদান নেওয়া হয়ে থাকে আমাদের মহাকাব্য বা ভারতীয় পুরাণ থেকেই। বিশ্বায়নের এই যুগে দাঁড়িয়েও খোলা মাঠের মধ্যে মঞ্চ বেঁধে এই নাটকের বা যাত্রাপালার উপস্থাপনা এখনো সমস্ত স্তরের মানুষেরা সমানভাবে উপভোগ করে। মহাভারতের কাহিনিগুলি নিয়ে গ্রাম বাংলার পাশাপাশি শহর কলকাতাতেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল নাটক অভিনয় করে থাকে। যেগুলি আজকের দিনেও শহর কলকাতার মতো স্থানেও সমানভাবে সফল। ভাবনার এই জায়গা থেকেই আমরা বিশ শতকের যে সমস্ত খ্যাতিমান ও প্রতিনিধি স্থানীয় নাটককারেরা ও নাট্যকারেরা বাঙালির মহাভারত চর্চার পরিসরে নিজেদের স্থান উজ্জ্বলভাবে রেখে গেছেন, তাঁদের নাটক ও যাত্রাগুলিকে আমাদের আলোচনায় রাখতে চাইছি। যেগুলি থেকে মোটামুটিভাবে আমরা বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় নাটক ও যাত্রাপালার ভূমিকা বুঝতে পারব। এরই সঙ্গে এই সময় পর্বের মধ্যে অভিনীত হওয়া থিয়েটারগুলিও আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। যার ফলে দেখতে পেয়েছি নাটক, থিয়েটার, যাত্রাপালা কীভাবে আমাদের মহাভারত চর্চাকে আরও প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। যেখানে মহাভারতের চরিত্র বা দেবদেবীরা শুধুমাত্র শব্দের পাত্র হয়ে থাকে নি, তাদের মুখ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালের দ্বন্দ্ব ও সংকটও। এখানে মহাভারতীয় চরিত্র অনায়াসে হয়ে উঠেছে বর্তমানের মুখ। আবার কোথাও ব্যক্তি মানুষের বা সমাজ জীবনের নীতি নির্ধারণে মহাভারত হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যক্তি মানুষের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান থেকে মানব জীবনের অর্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এই মহাভারতীয় নাটক ও যাত্রাপালাতেই পাওয়া যাবে।

৩.২।।

বিশ শতক যে পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে আনবে তা ১৯০৫ সালেই বোঝা গিয়েছিল। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান আঁচে এবার ছোঁয়া লাগলো প্রবল উৎসাহের বীররস। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে স্বদেশী চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি যখন ইংরেজ বিরোধিতায় পূর্ণমাত্রায় জড়িয়ে পড়েছে, তখন বাঙালির সামনে দু'টি আইকন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একটি যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়, তবে অন্যটি অবশ্যই মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবের মহত্ব এবং মহাত্মা চেনালেন দেশের আপামর জনসাধারণের

কণ্ঠস্বরকে। সেখানেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় একদিকে জাতীয়তাবাদ এবং অন্যদিকে বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব আত্মত্ববোধের ছোঁয়া। এরকম পরিবেশেই বাঙালির মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ এই সময়ে একইসঙ্গে পুরাতনের অনুসরণ এবং নতুনের আগমন বাংলা নাটকে উঠে এসেছে। তবে জাতির প্রয়োজনেই উনিশ শতকের পৌরাণিক নাটকে যেমন দেবতার প্রতি ভক্তিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, দেবতার অভিশাপ ও ক্ষমতা এবং পাপ পুণ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে; সেখানে বিশ শতকের পৌরাণিক বাংলা নাটকের অভিমুখ অনেকটাই আলাদা। সমকালের সংকট, দ্বন্দ্ব এবং বক্তব্যই পুরাণ ও মহাভারতীয় নানা চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীন এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

বাংলা মঞ্চের শুরু হয়েছিল পুরাণ ভাঙার শিল্প রচনা দিয়ে। মধুসূদনের হাতে এ আশ্চর্য উদ্ঘাটন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাট্যেও এর সূক্ষ্মতা আরও ব্যাপ্তভাবে বিস্তারিত। মানুষ পুরাণ বিদীর্ণ করে সমকালের প্রয়োজনে; কিংবা বলা যায়, পুরাণ থেকে তার নিজের অর্থ খুঁজে পেতে চায়।^১

বাংলা নাটকের সঙ্গে মহাভারতের আত্মিক যোগ কম নয় একেবারেই। বিভিন্ন পারফর্মিং আর্ট তথা যাত্রাপালা ও পাঁচালির মতো নাট্য অঙ্গিক, যেগুলিকে আমরা ঐতিহ্যবাহী নাট্য বলছি, এগুলির সৌজন্যে মহাভারতের আখ্যান দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রসদ যুগিয়ে গেছে। বাঙালিরা পাশ্চাত্যের সাহেবদের থেকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জ্ঞান আহরণ করেছে, কিন্তু সেই জ্ঞান প্রয়োগের জন্য প্রথমে সে হাত পেতেছে তার নিজস্ব রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের কাছেই। ধর্মীয় আচরণের মধ্যে ডুবে থাকা শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের অনুসারীদের জন্যই এই সকল নাটকের প্রচার ও প্রসার এত দ্রুত হতে পেরেছিল। বিশ শতকের শুরুর দিকে যে নাটককার মহাভারত চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি অবশ্যই ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তাঁর মহাভারত মূলক প্রথম বাংলা নাটক *বক্রবাহন*, যেখানে অর্জুন ও পুত্র বক্রবাহনের যুদ্ধের ঘটনাটাই নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। নাটকটি ১৯০০ সালে প্রথম মঞ্চায়িত হয়। মহাভারতের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনি নিয়ে *বক্রবাহন* নাটকটি রচিত হয়েছে। বক্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, পরে উলূপীর মণির কারণে প্রাণ ফিরে পায় অর্জুন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই নাটকে প্রতি পদে পদে ভক্তি রস আছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অষ্টম দিনের যুদ্ধে ইরাবান মারা যায়। কিন্তু এই নাটকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও নাটককার তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আসলেই ইরাবানকে বক্রবাহনের প্রতিনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই তাকে নাটকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে সঞ্জীবনী মণির প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে, অর্জুনের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করার একটি পন্থা হিসাবে। কিন্তু নাটকে প্রথম থেকেই নাটককার মণির উপরে অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। নারদের হাত থেকে নাটকে

মণিটি এসেছে এবং সেই সঙ্গে এসেছে ভক্তি রসের বন্যা। এই সঞ্জীবনী মণির এক অপর গুরুত্ব নাটকে উঠে এসেছে। নাটকে দেখানো হয়েছে যে এই সঞ্জীবনী মণি বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র জীবন দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তা কান দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয়ের মাঝে জায়গা করে নেয়। এইটি উপস্থাপনের জন্য এই নাটকে নারদের আবির্ভাব হয়েছে, মহাভারতে এই ঘটনা ছিল না।

নিজের স্বামীকে নরক ভোগের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এই নাটকে উলূপী যা যা করেছে তা পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করে না। উলূপী বস্তুতপক্ষে এখানে একটি যান্ত্রিক চরিত্র হয়েই থেকে গেছে। নাটকে বক্রবাহনের কাছে অর্জুনের আপাত পরাজয় দ্র্যাজিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। নাটকের শেষে কৃষ্ণের প্রতি অতি ভক্তি নাটকের ভরকেন্দ্র বিচ্যুত করেছে। তবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পরবর্তী সময়ে বক্রবাহনের পরিমার্জিত রূপ হিসাবে উলূপী (১৯০৬) নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। পূর্বের তিন অঙ্কের নাটকটি এখানে পাঁচ অঙ্কের রূপ পেয়েছে। কিন্তু তবুও মূল বক্তব্য মোটামুটি একই। নাটকের কেন্দ্র বিন্দুতে উলূপী থাকার কারণে এরূপ নামকরণ বলে মনে হয়। তবে এই নাটকটি কাহিনির অতিরঞ্জন। উলূপী অর্জুনের নাগবংশীয়া অন্যপূর্বা পত্নী যে স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ পুত্র ইলাবন্তের মৃত্যুকে মেনে নেয়। নাটকের রস একই সঙ্গে মিলনান্তক এবং করুণ। নাটককারের খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে ভীষ্ম নামক পঞ্চগঙ্গ নাটকটির জন্য, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাটকটি। জন্মের পূর্ব থেকেই গঙ্গা পুত্রের বৃহৎ জীবনের নাট্যরূপ এই নাটকটি। নাটকের প্রধান নারী অম্বা তথা শিখণ্ডী। তবে নাটকের দ্র্যাজিক রস অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে প্রবল কৃষ্ণভক্তির জন্য।

নাটককারের পরবর্তী মহাভারত মূলক নাটক ১৯২১ সালে প্রকাশ পায়। নাটকটির নাম *মন্দাকিনী*। গঙ্গা ও মহারাজ শান্তনুর পরিণয় নাটকটির প্রধান বিষয়। পরবর্তী ১৯২৬ সালে তাঁর মহাভারতীয় নাটক *নর-নারায়ণ* প্রকাশ পায়। এখানে কর্ণের জীবনের ভিত্তিতে কৃষ্ণের দেবত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, অঙ্গরাজ কর্ণের করুণ পরিণতি নাটকের প্রধান বিষয়। যে দ্বন্দ্ব ও সংকট মহাভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার উপর ভিত্তি করে মহাভারতের মতো মহাকাব্যের জন্ম হয়েছে, সেখানে নাটককারের এই নাটকেও দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নাটকের শেষে কর্ণ মারা যায়। কর্ণ চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও সংকটই এই নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়।

মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা – বাসুদেব।

মর্ম ভাঙা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি

গুনাতে আসিলে তুমি মনঃ ক্ষোভ কথা !^২

বিশ শতকের প্রথম অর্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র মহাভারত মূলক নাটক হল ভীষ্ম। নাটককার রায় এই নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারে সফল হয়েছেন। যেখানে প্রাচীন ভারতীয় এক উজ্জ্বল ছবি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। যেখানে উদারতা, মহত্ত্ব, বীর্য এবং প্রেম ও ক্ষমার চমৎকার এক মিশেল আমাদের দৃষ্টিকে বিহ্বল করে রাখে। নাটকে অস্বাভাবিক ও উচ্ছ্বসিত প্রেম বারবার ভীষ্মের অটল সংকল্পের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। কুমার দেবব্রত থেকে পিতামহ ভীষ্মের যে পরিণতি নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এঁকেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। নাটকের ট্রাজিক চরিত্রের মধ্যে অম্বিকা ও অম্বালিকা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু সত্যবতী চরিত্রের ক্রম বিবর্তনের দিকটি দ্বিজেন্দ্রলাল সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যে অসামান্য সুন্দরী দাস রাজার কন্যা সত্যাবতী অসামান্য রূপ ও যৌবনের অহংকারে অধিষ্ঠিত ছিল, যে নিজের পুত্রদেরই পরবর্তীকালে হস্তিনাপুরের সাম্রাজ্যের ভার দিতে চেয়েছিল, যার জন্য গঙ্গা পুত্র ভীষ্মকে আজীবন নিজের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকতে হয়েছে, সেই সত্যবতীকেই পরবর্তী সময়ে সকলের কাছে উপেক্ষিত ও অনুকম্পার পাত্রী হতে হয়েছে। তার এই শোচনীয় পরিণাম বিশেষ ট্রাজিক হয়েছে। ভীষ্ম চরিত্রের অনমনীয়তা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সংকল্পই এই নাটকের প্রধান বিষয়। অম্বা ও সত্যবতী এই নাটকের ট্রাজিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করেছে। ১৯১৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকটি প্রকাশ পায়। নাটকের ভূমিকা অংশে নাটককার ভীষ্ম চরিত্রকে মহাভারতের মধ্যে সবথেকে মহৎ হিসাবে মনে করেছেন, তাই নাটকেও সেই মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে ভীষ্ম উপস্থাপিত হয়েছে। তাই ভীষ্ম চরিত্রের মুখ দিয়ে নাটকে ফুটে ওঠে:

ভীষ্ম- (হাত ছাড়াইয়া)

রমণী! তোমার এই নিষ্ফল প্রয়াস।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই— অটল অচল।
নহে ইহা ভীরুর ভঙ্গুর অঙ্গীকার।
নহে ইহা যাত্রার তপস্যা সকাম।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ইহা, ত্যাগীর শপথ।
গ্রহ যদি কক্ষচ্যুত হয়; চন্দ্র যদি
অগ্নিবৃষ্টি করে; নক্ষত্র নিভিয়া যায়;
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে বালুস্তূপ সম;
শুষ্ক হয় সিন্ধুবারি গোপ্পদের মত;
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না কদাপি।
ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মাঝে, বিক্ষোভিত
সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের
মিথ্যাবাদ মাঝে, এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

অটল উজ্জ্বল, সব নক্ষত্রের মাঝে
যেমতি ভাস্বর স্থির ঐ ধ্রুবতারা।^৩

বিশ শতকের প্রথমে মহাভারত মূলক নাটক রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদের পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্ম নাটকটি নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। কিন্তু মঞ্চ সাফল্যের দিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাই বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন:

সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদেরই জিত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকখানা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।^৪

মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথও অনেকগুলি কাব্যনাট্য রচনা করেন। বাঙালির মহাভারত চর্চার ইতিহাসে যা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। যেগুলির প্রায় সবকটিই উনিশ শতকের শেষে লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে *চিত্রাঙ্গদা*, *নরকবাস*, *বিদায় অভিষাপ*, *গান্ধারীর আবেদন* এবং *কর্ণকুন্তীসংবাদ*। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার স্পর্শে নাটকের চরিত্রগুলো মহত্তর হয়ে উঠেছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনায় *চিত্রাঙ্গদা* অভিনীত হয় নি। ১৯২৯ সালে জানুয়ারির প্রথম ও দ্বিতীয় তারিখে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে দুই দিন ধরে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের অভিনয় হয়। ১৯৩৬ সালে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যকে কবিগুরু নৃত্যনাট্যে রূপ দেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রয়োজনায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে এই নৃত্যনাট্য ১১ই মার্চ ১৯৩৬ সালে অভিনীত হয়। এভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যটিই বিশ শতকে তাঁর রচিত একমাত্র মহাভারতমূলক নাট্যরচনা। রবীন্দ্রনাথের এই অমর নৃত্যনাট্যের সঙ্গে *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২) কাব্যনাট্যের তত্ত্ব ও বিষয়বস্তু অভিন্ন। মহাভারতে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয় উপাখ্যান অবলম্বনে এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই রচনাটি নিয়ে আমরা কিছু কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যকে নিয়ে কথা বলতে গেলে পূর্বের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যকে নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাটক রচনা শেষ হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে, উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া নামে এক পল্লী গ্রামে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের রচনা সমাপ্তি ঘটে। চিত্রাঙ্গদার কাহিনিটি যথেষ্টই পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়। মহাভারতের অর্জুন নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করে এসে মহাসাগরের তীরে মহেন্দ্র পর্বত অতিক্রম করে মণিপুরে এসে পড়ে। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন তাকে বিবাহ করতে চাইলে রাজা চিত্রবাহন তাদের পূর্বপুরুষ রাজা প্রভঞ্জনের শিব আরাধনা এবং শিব দ্বারা প্রভঞ্জনের পুত্রলাভের বরদানের কথা বলে। কিন্তু তার একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়েছে এবং তাকে রাজা পুত্র হিসাবেই এতদিন পালন করে এসেছে, সেই পুত্ররূপী কন্যা সন্তানের গর্ভে পরবর্তীকালে আগত পুত্রই মণিপুর রাজবংশের উত্তরাধিকারী হবে। অর্জুনকে

এমনটা জানানোর পর অর্জুন সম্মত হলে তারপর উভয়ের বিবাহ হয়। এরপর অর্জুন তিন বছর সেই মণিপুর রাজ্যের রাজপুরীতে বসবাস করে। স্বাভাবিকভাবেই চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সন্তান আসার পর অর্জুন আবার ভ্রমণে চলে যায়। পরে কিছু সময় বাদে পুত্র বক্রবাহনের সঙ্গে দেখা করতে এসে রাজপুরীতে আরও কিছুকাল অর্জুন থাকে। এরপর আবার ভ্রমণে বেরিয়ে প্রভাস তীর্থে গিয়ে সুভদ্রা হরণের পর্ব শুরু হয়। মহাভারতের এই কাহিনিকেই *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন। আমরা জানি *সোনার তরী*-র কবিতাগুলি এবং *চিত্রাঙ্গদা* মোটামুটি একই সময়েই লেখা হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের দেহাতীত বা রূপাতীত ধারণার দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রেমের দেহাতীত প্রতিমূর্তি অঙ্কনের কাজ রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী করে গেছেন। *চিত্রাঙ্গদা*-র মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লিপ্ৰাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এই পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যা পাওয়া বলে একটি নিভৃত পল্লিতে গিয়ে।^৫

চিত্রাঙ্গদা-তে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে বাঁধলেন তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে। এদের মধ্যে একটি দেহজ এবং অন্যটি দেহাতীত বা রূপাতীত। দেহজ প্রেম ক্ষণিকের জন্য, শুধুমাত্র মুহূর্তের কামনা বাসনা মেটানোর জন্যই তার প্রকাশ। বিশুদ্ধ গভীর প্রেম এটি নয়। অন্যদিকে দেহাতীত বা রূপাতীত প্রেমে হয় যথার্থ আত্মিক মিলন। যাবতীয় বস্তুগত কামনা-বাসনার উপরে গিয়ে যে যথার্থ আত্মার মিলন, তাই ইন্দ্রিয়াতীত মিলন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে এই প্রেমকেই অধিক মর্যাদা

দেওয়া হয়েছে। চিত্রাঙ্গদ-র মর্মবস্তু মূলত এটার উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রূপহীনা চিত্রাঙ্গদার প্রেমের অপূর্ণতা তার মনকে অতৃপ্ত ও যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে রেখেছিল। পরস্পর অপরিচয়ের অস্বচ্ছতা এবং প্রেমের অনিশ্চয়তা তাকে বিভ্রান্ত করেছিল। তার মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকট নাট্যরসকে ঘনীভূত করে নারীর সৌন্দর্যের অট্টালিকা গড়ে তুলেছে। বর প্রাপ্তির ফলে রূপের সৌন্দর্যে তার প্রেমিককে চিত্রাঙ্গদা ভুলিয়ে রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে চিত্রাঙ্গদা-কে যখন রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তর করলেন, তখন চিত্রাঙ্গদার মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকটকে রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন অসামান্য কাব্যিক উপস্থাপনায়।

এ কী দেখি!

এ কে এল মোর দেহে

পূর্ব-ইতিহাসহারা !

আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন;

বিশ্বের অপরিচিত আমি।

আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,

আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা

অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,

এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,

তারপরে ধূলিশয্যা,

তারপরে ধরণির চির-অবহেলা।

... ..

মীনকেতু,

কোন্ মহা রাক্ষসীকে দিয়েছ বাঁধিয়া

অঙ্গসংহরী করি।

এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!

ক্ষণিক যৌবনবন্যা

রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া

উন্মাদ করেছে মোরে।^৬

প্রথম যৌবনের দৃষ্টিকে পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ রোমাঞ্চ দ্বারা ভরিয়ে তুলেছেন। এক সময়ে যে চিত্রাঙ্গদা ঈশ্বরের কাছে দৈহিক রূপ, সৌন্দর্য কামনা করেছিল, পরবর্তী সময়ে চিত্রাঙ্গদার রূপের প্রতি মোহ ভেঙ্গে যায়। শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মোহমুক্তি ঘটে আর চিত্রাঙ্গদার আত্মগ্লানি এই নাটকে অসামান্য কাব্যিক নাট্য মুহূর্ত তৈরি করেছে। শেষ পর্যন্ত সত্য পরিচয় দানের মাধ্যমে ও দৃষ্ট কণ্ঠে সংকল্প ঘোষণায় চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে গৌরব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তার দেহজ প্রেম পরিবর্তিত হয়েছে দেহাতীত প্রেমে।

লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর,
হে অনঙ্গদেব।
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
এই মিথ্যার জাল,
হে অনঙ্গদেব।
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা;
অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
অশোকবনে, হে অনঙ্গদেব।
যাক যাক যাক এ ছলনা,
যাক এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব।।^৭

... ..
আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্ব
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্ব রাখো মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন-
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।।^৮

এই চিত্রাঙ্গদার মধ্যে বহুবিধ নারীর প্রকাশ বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে পেয়েছেন। চিত্রাঙ্গদা একাধারে জননী, প্রেমিকা ও গৃহিণী। আবার অন্যদিকে বীরাজনাও বটে।

রূপের ছলনামুক্ত চিত্রাঙ্গদা আত্মিক মহিমায় জ্যোতির্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুদ্রত আদর্শেই দেহনিষ্ঠ প্রেমের দিব্য রূপান্তর। অর্জুন একটি ক্ষুদ্র বাক্যে নিজের ধন্যতা ঘোষণা করিয়া এই পুণ্য প্রেমের পাবক-দীপ্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কাব্য-বর্ণিত যে প্রেম ভস্ম-অপমান শয্যায়

বিলীন প্রায় হইয়াছিল তাহা নাট্য-সংঘাত সৃষ্টিতে অগ্নিময় সত্তার উত্তাপে আবার ভাস্করতা লাভ করিয়াছে।^১

যুদ্ধের ভয়াবহতা, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং অসংখ্য অগণিত মানুষের মৃত্যু যে কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে যুদ্ধের নেতিবাচক দিকটিকে প্রথমেই প্রকট করে তোলে। এটা ঠিক মহাভারতে পাণ্ডবদের ওপরে হওয়া অবিচার ও লাঞ্ছনার একটি ন্যায়সঙ্গত বিচার হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের অনেক চেষ্টার ফলেও শেষ পর্যন্ত তা অধরাই থেকে গেছে। যেটি যে কোনও মহাভারতের পাঠক বা দর্শককে প্রতিক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব ও সংকটের মুখোমুখি করে তোলে। যার ফল হিসাবে শেষ পর্যন্ত আমাদের বৃহৎ ধর্মযুদ্ধ দেখতে হয়েছে। এটা আদৌ কি ধর্মযুদ্ধ? এই তর্ক ও চর্চার প্রয়াস আমরা অন্যত্র করেছি। কিন্তু একটা যুদ্ধের ফলে যে সার্বিক সংকটের ও মৃত্যুর চেহারা ফুটে ওঠে (প্রিয়জনকে হারানো, রাজ্যের প্রজারা নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও অকারণে মৃত্যুবরণ করা, সম্পদের লুণ্ঠন) সেইটি অনেক মানবতাবাদী মানুষদের মতো নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, অরবিন্দ দাশগুপ্ত-দেরও সমানভাবে ভাবিয়েছে। ভাবনার সেই স্তর থেকেই তাঁরা তাদের নাটকগুলির মধ্যে যুদ্ধ নয়, শান্তিকামী মানুষের মনের কথাই বলতে চেয়েছেন। দুর্যোধনের মতো প্রবল যুদ্ধকামী, পাণ্ডব সম্পদে অপরিসীম লোভী মহাভারতের অন্যতম প্রতিনায়কও কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'উরুভঙ্গ' নাটকে ধরা দিয়েছে শান্তিপ্রিয় ও যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন একজন আধুনিক মানুষ হিসাবে। তাই মহাভারতের প্রতিনায়ক দুর্যোধন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে যুধিষ্ঠিরকে, সঞ্জয়কে এমনকী বলরামকেও যুদ্ধের নেতিবাচক দিক এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে বলে গেছে। মহাভারতের যুদ্ধপ্রিয় দুর্যোধন এই নাটকে তার পূর্বের করা অপরাধগুলি সম্পর্কেও প্রকাশ্যেই স্বীকার করেও নিয়েছে। মৃত্যুর মুখে নিজের পুত্রকে ভবিষ্যতের দায়িত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিতেও ভোলেনি। পাণ্ডবদের ও তাদের সন্তানদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার সুপরামর্শ ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের কর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়েছে। নিজের স্ত্রীদের চোখের জল ফেলতে বারণ করেছে কারণ কাপুরুষ ও ভীতুর মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে দুর্যোধন মারা যাচ্ছে না। নিজের গুরু ও শিক্ষক বলরামকে অনুরোধ করেছে ভীমের সমস্ত দোষ যাতে ক্ষমা করা হয়। আরও বলে সে পাণ্ডবদের প্রতি হওয়া পূর্বের একাধিক অপরাধের ফল হিসাবে ভীম শুধুমাত্র তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে মাত্র। আধুনিক যুগের মানুষ হিসাবে যে কোনও দায়িত্ববান, মানবতাবাদী মানুষের মনের কথাই যেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় দুর্যোধনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। নাটকের অসামান্য কিছু সংলাপ এখানে আমরা উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।

দুর্যোধন- (ললাটে করতল রেখে) ধিক, ধিক, ধিক আমার যুদ্ধ স্পৃহায় ! মহাত্মা বিদুর কৌরবদের এই সর্বনাশের কথা আগেই অনুমান করে আমাকে সাবধান করেছিলেন। পাণ্ডব

ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি কর্ণপাত করিনি। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্রদের সূচাগ্র মেদিনীও আমি দেব না- এই ছিল আমার পণ। সেই সূচাগ্র আজ আমারই পৃথিবী বিদীর্ণ করল! এরই নাম যুদ্ধ! মহাযুদ্ধ! আমার অভিলাষ, অহঙ্কার কুরুক্ষেত্রের চিতায় দগ্ধ হচ্ছে। তবু এই বৈনাশিক যুদ্ধে আপনি যে জীবিত রয়েছেন, এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়।^{১০}

দুর্যোধন- স্বজনক্ষয়, লোকক্ষয়, সম্পদক্ষয়- এই তো যুদ্ধ ! তার চেয়ে আমার মতো অবস্থায় মৃগচর্ম পরিধান করে বনবাসী হওয়াই কী উচিত কর্ম নয়?.... থাক, এসব কথা। আমি বিদায় নিচ্ছি সঞ্জয়।^{১১}

দুর্যোধন- আবার সেই লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। জয়ী হলে রাজ্য লাভ হবে। এতে সুখী হবার মতো আমরা মাত্র এই চারজন অবশিষ্ট আছি। এই চারজনের মধ্যে যুদ্ধে সকলে যে জীবিত থাকব, তাতেও তো সংশয় রয়েছে। কুরুক্ষেত্র চিতার আগুনে ছারখার হয়ে আছে। সে আগুন বরং নিভে যাক, নতুন করে আবার আমরা চিতা সাজাতে তৎপর হব?^{১২}

বলরাম তার লাঙল বা হল নিয়ে ভীমকে আক্রমণে উদ্যত হলে দুর্যোধন বলরামকে কাতর মিনতি জানায় নিম্নলিখিত ভাষায়:

দুর্যোধন- আপনার এই উদ্যত হল যদি ভীমসেন এবং পাণ্ডবদের সবংশে নিহত করে তাহলে তো কুরুকুলের পিতৃপুরুষদের তর্পণ বারি দেবারও কেহ অবশিষ্ট থাকবে না ! ভগবান, এই যুদ্ধ এক মহা সর্বনাশ— আমার ইন্ধনেই তা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। ভগবান, যুদ্ধের মূর্তি যে কী বিকট, ভয়াবহ, আমি তা বিলম্বে উপলব্ধি করেছি। কুরুকুল প্রায় নিঃশেষ। আমার আয়ুষ্কাল শেষ হতে আর দেরী নেই। আমার কারণে আর হত্যা চাইছি না গুরুদেব। বৈরিতা শেষ হোক।^{১৩}

যুদ্ধ শুধুমাত্র যোদ্ধা, রথী, মহারথীদেরই বিনাশ থেকে আনে না; সাধারণ মানুষ থেকে সাধারণ সৈনিক যাদের রাষ্ট্র চালনায় সেভাবে কোনও ভূমিকা নেই, শুধুমাত্র রাজা বা যুবরাজদের মনের যুদ্ধলিপ্সা মেটানোর জন্যই তাদের অকারণে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। সেই সমস্ত প্রান্তিক হতভাগ্য সৈনিক তথা মানুষদেরও হৃদয়ের কথা নাটককার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম সৈনিক- আমরা সৈনিক। আমরা পাণ্ডব বা কৌরব কোনো পক্ষেরই ছিলাম না। অন্নের বিনিময়ে যে পক্ষ আমাদের যুদ্ধে নিযুক্ত করেছে, আমরা সে পক্ষের হয়ে গেছি।^{১৪}

দ্বিতীয় সৈনিক- আমরা কারুর শত্রু ছিলাম না। যে পক্ষের প্রভুগণ অন্নের বিনিময়ে আমাদের যুদ্ধে নিযুক্ত করেছেন, তাদের শত্রুই আমাদের শত্রু হয়ে গেল। এও বড় আশ্চর্য। কিন্তু যুদ্ধ ঘটলে এরকমই হয়।^{১৫}

দ্বিতীয় সৈনিক- অসংখ্য মৃতদেহ। এক এক জায়গায় স্তূপাকার মৃত শরীর। যুদ্ধস্থল তাই আর সমতল নেই। পার্বত্য ভূমির রূপ নিয়েছে। মৃতদেহের ঢেউ তোলা পাহাড়ে কি বিচিত্র ঐ কুরক্ষেত্র।^{১৬}

তৃতীয় সৈনিক- দ্যাখো, দ্যাখো, শৃগালীরা মৃত শরীর মুখে করে টেনে নিচ্ছে। একটা রথকে টেনে চলেছে একপদ খঞ্জ এক অশ্ব।^{১৭}

প্রথম সৈনিক- ওদিকে দ্যাখো না, এক মৃত রাজার অঙ্গ থেকে ঠুকরে ঠুকরে একটা স্বর্ণালংকার খসিয়ে ফেলেছে একটা শকুন। হয়তো তার সখি শকুনির গলায় পরাবে!^{১৮}

যুদ্ধের এই ভয়াবহতা এবং বিকট বীভৎস স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে কৃষ্ণ ধর এবং অরবিন্দ দাশগুপ্তও নাটকের হাত ধরেছেন। নাটকের চরিত্র ও কাহিনি মহাভারত থেকে নিলেও বাস্তবে তাঁরা বলে গেছেন শান্তি, প্রেম, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না। তাই তো *অভিমন্যু* নাটকে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের প্রবল যুদ্ধলিপ্সার বিপরীতে দাঁড়িয়ে উত্তরা ও সুভদ্রারা জানিয়ে দেয় যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন নেই। মায়ের কোল খালি করা ছাড়া যুদ্ধ আর কিছুই দিতে পারে না।

সুভদ্রা- আর যুদ্ধ নয়, এখনই থামাও মৃত্যুর মহোৎসব
আমাদের স্বামী সন্তান ও ভাইদের আর তুলে দেব না
রণ অপদেবতার হাতে
বন্ধ করো এই যুদ্ধ, শিবিরে শিবিরে উঠুক
শান্তির আর মৈত্রীর পতাকা
যোদ্ধারা খুলে ফেলে দাও বর্ম
অস্ত্র ভেঙে বানাও লাঙল আর কাস্তে
ভাই ভাইকে ফিরে পাক বুকে
ভুলে যাক সব শত্রুতা বিদ্বেষ
জ্ঞাতিশত্রুতাকে ধর্মযুদ্ধের মুখোশ পরানো হয়েছে^{১৯}

উত্তরা- শবের পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠবে মহাভারত
শ্মশানের ওপর উড়বে বৈজয়ন্ত পতাকা !
আমি সে রকম দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি চাই
এই মৃত্যু, এই লোকক্ষয় আর সহিতে পারি না^{২০}

যুযুৎসু নাটকেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু যুদ্ধপরায়ণ যোদ্ধা কর্ণকে তার ভুল ধরিয়ে বলেছে:

যুযুৎসু – সবাই উন্মুখ এই যুদ্ধের জন্য
কিস্ত কর্ণ, কার জন্য এই যুদ্ধ?
শুধুই কি পাণ্ডব-কৌরব?
মদ্রদেশ থেকে চেদিরাজ সমগ্র ভারতবর্ষ কি
বিধ্বস্ত হবে না? ২১

যুযুৎসু – ভাবো কর্ণ, আরও একটা রাত বাকি আছে হাতে
যুদ্ধ কি খুবই প্রয়োজন?
রক্তের বিনিময়ে কেন
এই জয়?
শুধু দুই জাতি লাভবান হবে বলে
ভেসে যাবে সারা দেশ তীব্রতর ক্ষুধার
আগুনে! ২২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *নন্দনকাননে দ্রৌপদী* নামে মহাভারত মূলক একটি কাব্য নাটক রচনা করেন। যেটি প্রথম প্রকাশ পায় দেশ পত্রিকায় ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯২ সালে। অনেকটা কৌতুক ও মজাদার এই কাব্য নাটকটি। আখ্যান শুরু হয়েছে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে আগমনের মধ্যে দিয়ে। স্বর্গে এসে ধর্মরাজ বুঝতে পারে যে এখানকার নিয়ম-কানুন, রীতি রেওয়াজ পৃথিবীর থেকে আলাদা। পৃথিবীতে তার শত্রুরা এখানে আপন ও মিত্র। স্বর্গে দেখা পায় দুর্যোধন ও কর্ণের। আলিঙ্গনে প্রাথমিক জড়তা থাকলেও পরে যুধিষ্ঠির তাদের আপনজন হিসাবে মেনেও নেয়। তবে এই কাব্য নাটকে দ্রৌপদীর মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষেপ দেখা যায়। মনে মনে সে কর্ণের প্রচ্ছন্ন প্রেমিকা। পৃথিবীতে বসবাসের সময় কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর যে প্রেম, ভালবাসা ও সান্নিধ্য পেতে হৃদয় চাইত- তা মৃত্যুর পর স্বর্গে আসার ফলে দ্রৌপদী কর্ণকে জানিয়েছে। এই কাব্য নাটকে বিনির্মাণ ও নবনির্মাণে মিথের ভাঙা এবং নতুন করে সাজা ও গড়ার খেলায় বাংলা নাট্য সাহিত্যের নতুন দিশা দেখা যায়।

কর্ণ- এসব তো রাষ্ট্রনীতি, বংশের স্পর্ধার ইতিকথা
প্রণয়ের ব্যাকুলতা মহাকাল- ইতিহাস কিছুই মানে না
যাজ্ঞসেনী, তোমাকে চেয়েছি আমি
নিঃসঙ্গ এ হৃদয় জুড়োতে ! ২৩

দ্রৌপদী- তুমি ফিরে গেলে তাতে আমিও কি প্রত্যাখ্যাতা নই?
একটি বাক্যও তুমি বলোনি আমার দিকে চেয়ে

দু'চক্ষু অন্যত্রগামী। তুমি দাতা, সেই অহংকারে
অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে গেলে কাম্য রমণীকে।
কর্ণ, তবু সমস্ত জীবন আমি তোমাকে খুঁজেছি
ভেবেছি যে- কোনওদিন তুমি এসে দাঁড়াবে সহসা
কুন্তীর প্রথম পুত্র এবং আমার অগ্রগণ্য স্বামী হবে
শোনোনি কৃষ্ণের দৈত্যে আমার আত্মহান? ২৪

.....
দ্রৌপদী- না, না, কোনও ক্রোধ নেই। শুধু খেদ এই
যখন নীরব ছিল নতমুখে মহা শক্তিধর পঞ্চপতি
আশা ছিল, তখন কর্ণকে পাব পাশে
যে আমার প্রথম প্রণয়ী! ২৫

মহাভারত মূলক নাটকের পাশে থিয়েটারও এই সময় খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই সকল নাটকগুলি ছাড়াও অনেক মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকই সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েও চলেছিল। এগুলির বিষয়ে অল্প বিস্তর আলোকপাত করা দরকার। গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* নাটকটি বিখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্ত ১৯৮২ সালে মঞ্চস্থ করতে পেরেছিলেন। নাটকটি হাওড়া কদমতলা ইউ.বি.আই- এর নিমন্ত্রণে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে হয়েছিল। নাটকে উৎপল দত্ত কীচকের ভূমিকায় অভিনয় করেন, যা সমস্ত স্তরের নাট্যপ্রেমী মানুষদের মন জয় করেছিল। পি.এল.টি এর পরের মহাভারত মূলক নাটক *কিরাত পর্ব*। নাটকটি উৎপল দত্তের লেখা হলেও, নির্দেশনা দিয়েছিলেন অসিত বসু। নাটকটি উৎপল দত্তের মৃত্যুর দিনে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। *নন্দন* পত্রিকায় প্রকাশিত উৎপল দত্তের মহাভারতমূলক অপর একটি নাটক হল *অর্জুন অপেরা*। আজ পর্যন্ত *অর্জুন অপেরা* নাটকের কোনও অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায় নি।

মহাভারতের উপর একাধিক বিভিন্ন লেখা লিখেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সেরকমই একটি বিখ্যাত তাঁর লেখা নাটক *চক্রব্যূহ*। বহুরূপী নাট্য সংস্থা এই নাটকের নির্বাচিত কিছু অংশ একাডেমি মঞ্চে অভিনয় করে। প্রথম অভিনয়ে নির্দেশক ছিলেন অমর গাঙ্গুলি। ১৯৮১ সালে প্রথম অভিনীত হয়েছিল নাটকটি। নাট্য সংস্থা বহুরূপীর পরবর্তী নাটক *ধর্ম/ধর্ম*, শ্যামল সেনগুপ্ত ছিলেন এই নাটকটির নাট্যকার। ভারত কাহিনিকে কিছুটা লোকনাট্যের আঙ্গিকে এই নাটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে বহুরূপীর পরবর্তী নাটক গিরিশ করনাডের *যযাতি*, নাটকটির নির্দেশক ছিলেন কুমার রায়। পরবর্তীকালে এই কুমার রায়ের নির্দেশনাতেই মহাভারতমূলক আরও দু'টি নাটকের অভিনয় নাট্য প্রেমীরা দেখতে পেয়েছিল। এরমধ্যে একটি বুদ্ধদেব বসু'র *কাল সন্ধ্যা* এবং অন্যটি শিশিরকুমার দাসের

ইতিহাসের আত্মা। মহাভারতের উপর লেখা অমিত মৈত্র'র বীর্যশৃঙ্খা একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক, যা তুলিকা দাসের নির্দেশনায় ২০০৮ সালে অভিনীত হয়। নাট্যকার অলখ মুখোপাধ্যায়ের লেখা নাটক নানা ফুলের মালা বহুরূপী সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা। নাটকটি দেবেশ রায়চৌধুরী'র নির্দেশনায় একাডেমির মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

মহাভারতের আধারে নান্দীকারের রচিত মাধবী ভীষ্ম সহানী'র নাটক অবলম্বনে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও নির্দেশিত মহাভারতমূলক এক অনবদ্য সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে নারীর প্রতি হওয়া অত্যাচার ও অবদমনের ইতিহাস রয়েছে আমাদের সমাজে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের দ্বারা হওয়া নারীর প্রতি নানা প্রকার পীড়নের নিদর্শন মহাভারতেও রয়েছে। সেরকমই একটি ছবি ফুটে উঠেছে এই নাটকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কখনও ধর্ম বা রাজনীতির নামে অথবা নানারকম অজুহাতে নারীকে পণ্যরূপে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহার করে আসছে। অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর উপর হওয়া অত্যাচার সত্য। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবশঙ্কর হালদার, পার্থপ্রতিম দেব, সোহিনী সেনগুপ্ত প্রমুখেরা। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী'র শকুনির পাশা মহাভারতের দর্শক ও পাঠকদের কাছে আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। নাটকটি ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে এক সময় একক অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। নাটকে মহাভারতের পটভূমি থাকলেও এখানের শকুনি মহাভারতের শকুনি নয়। তিনি সর্বকালের প্রতিভাবান মানুষের প্রতিনিধি। যেই প্রতিভা আজও ক্ষমতাবানেরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে চলেছেন। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৯৮৩ সালে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কলকাতা আকাশবাণী থেকে সম্প্রসারিত হয়। কলকাতা দূরদর্শন থেকেও পরে এই নাটকটি সম্প্রচারিত হয়। এই সময় শকুনির ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সকলের মন জয় করেছিল। পরবর্তীকালে অন্যছন্দের প্রযোজনায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও মহাভারতপ্রেমী মানুষদের আকর্ষিত করেছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে উরুভঙ্গম্ নাটকটি অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে দর্শকমহলে। নাটকটি কসবা অর্ঘ্য প্রযোজিত এবং নির্দেশনায় মনীশ মিত্র। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় তারিখে। তবে নাটকের নামকরণ উরুভঙ্গম্ হলেও তা শুধুমাত্র সংস্কৃত নাট্যকার ভাসের নাটকের সঙ্গে মেলে না। নানা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী নাটককে বাঁধতে চেয়েছেন মনীশ মিত্র। এই কাজটি করতে গিয়ে তাকে হাত পাতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু'র কাছেও। সারারাত ধরে মঞ্চস্থ এই বহু সাংস্কৃতিক নাটকটি বাংলা মঞ্চায়নের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখানে পাণ্ডবগীর সঙ্গে মিলে গেছে নৌটঙ্কির। অভিনেতাদের পাশাপাশি নৃত্যশিল্পীরাও আনন্দের সঙ্গে এতে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি হাত ধরে থেকেছে ভরতনাট্যম,

কথাকলি এবং কুড়িয়াউম। শহুরে শিল্পী অভিনেত্রীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পুরুলিয়া ও ছত্রিশগড়ের আদিবাসী শিল্পীরা। মহাভারতের এরূপ ব্যাখ্যান সাধারণভাবেই এই দেশে বিরল। কলকাতার থিয়েটার হলগুলিতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উপচে পড়া দর্শকের সমাগম হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে চেতনা উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে দেখা দিয়েছে, সেই বিষয়কে আধার করে বিভিন্ন আঙ্গিকের একজোট হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এদিক থেকে মহাভারত এমনই একটা আখ্যান যা বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, বর্ণ ও জাতিতে বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে সহজভাবেই বাঁধতে পারে। নাট্যকার মনীশ মিত্রের এই সর্বভারতীয় সংস্কৃতিমন্ডন এই প্রয়োজনাকে সম্ভব করেছে।

মহাভারতমূলক অপর একটি নাটক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী আমাদের উপহার দিয়েছেন, নাটকটির নাম *যাঙ্গসেনী অগ্নিকন্যা*। এই একক নাটকটি কানাড়ি ভাষায় এইচ.এস. ভেঙ্কটেশমূর্তির লেখা *উবিয়া উয়ালে*-র অবলম্বনে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী রচনা করেছেন। বিশিষ্ট অভিনেত্রী বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ নাটকটিতে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। নাটকটি ২০০৯ সালে *পূর্ব-পশ্চিম* নাট্য সংকলনের পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এগুলি ছাড়াও মহাভারতমূলক অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে দেবাশিস সেনগুপ্ত রচিত ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত নির্দেশিত *বৃত্তান্তে* নামে একটি নাটক ২০১৪ সালে অভিনীত হয়েছিল। *ঐশ্বরিক* নামে কিছু পৌরাণিক চরিত্রের নাট্যরূপ ১৯৭৪ সালে অভিনীত হয়েছিল, যার লেখক ছিলেন শিব মুখোপাধ্যায়। এই নাটকের অন্যতম বিষয় ছিল দ্রোণাচার্য ও একলব্যের ঘটনা। এই শিব মুখোপাধ্যায়ের মহাভারতমূলক দ্বিতীয় নাটকের নাম *মহাভারত*। একাডেমি মঞ্চের নটধা-র প্রয়োজনায় এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ২০০২ সালে। কলকাতা ও গ্রামের একাধিক নাট্য দল যৌথভাবে নাটকটি প্রযোজনা করতে পেরেছে। *কর্ণ এখন* নামে মহাভারত মূলক অপর একটি নাটকের রচয়িতা শিব মুখোপাধ্যায়। হাওড়া রামগোপাল মঞ্চের নাটকটি ২০০৪ সালে প্রথম অভিনীত হয়। নাটককার অভিজিৎ কর গুপ্ত লিখেছেন *অতঃকিম মহাযুদ্ধ*, এখানে শকুনি পাণ্ডবদের প্রতি অভিযোগ করে যে ‘ওদের রক্ত বিশুদ্ধ নয়’ এবং ‘ওরা অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল বিরাট দেশে’। প্রসঙ্গ বলাই বাহুল্য উপরের কথাগুলি পড়লে আমাদের মনে হতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ইরাক যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অজুহাতগুলিকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তো এভাবে বারবার আক্রমণ করে এসেছে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়ার মতো দেশগুলিতে। তাই অভিজিৎ কর গুপ্তের এই নাটক পড়লে আমরা বিগত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনগুলির সঙ্গে মহাভারতীয় অনুষঙ্গকে মেলাতে পারি।

নাট্যকার ও নির্দেশক অচিন্ত্য চৌধুরী *একালের একলব্য* নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি ১৯৭৮ সালে প্রথম অভিনীত হয়। শ্যামল সেনগুপ্তের লেখা *পাণ্ডু* নাটকটি একাডেমি মঞ্চের

২০১১ সালে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। ব্রাত্য বসু জুতুগৃহ নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকে মহাভারতের এক খণ্ডদৃশ্যের নির্মাণ করেছেন। শান্তিপুর সাংস্কৃতিক ও সংসৃতি এটির প্রযোজনা করেছে। শাহাদ ফিরদৌসে'র উপন্যাস অবলম্বনে হাওড়ার টোটাল থিয়েটার করেছিলো ব্যাস, নির্দেশক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসেনিয়ামের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে ইন্টিমেট স্পেস খুঁজতে চেয়েছিলো এই প্রযোজনা।

তবে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশেও মহাভারতমূলক নাটক কম অভিনীত হয় নি। ভারতীয় উপমহাদেশে যে মহাভারতের ভূমিকা নিতান্ত কম নয় তা সাহিত্যই হোক অথবা সমাজ জীবনেই হোক— সেটি বাংলাদেশও সমানভাবে বুঝতে পেরেছে। তাই সেই দেশেও মহাভারতমূলক বিভিন্ন নাটক রচনা হয়েছে এবং মঞ্চ সাফল্যও পেয়ে আসছে। বাংলাদেশে অভিনয় হওয়া অসংখ্য মহাভারত মূলক নাটক থেকে বেশ কিছু আমরা বলার চেষ্টা করব। এদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় সেলিম আল দীনে'র *শকুন্তলা* নাটকের কথা। ১৯৭৮ সালে ঢাকা থিয়েটারের নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফে'র সৌজন্যে তা স্মরণীয় প্রযোজনা হয়ে উঠেছিল। নাটকটি ১৮৮ বার মঞ্চস্থ হয়ে নজিরও গড়েছিল। ওই দলের অন্য কোনও নাটক এই খ্যাতি আর অর্জন করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের নাট্য থেকে ক্রমশ সরতে সরতে সেলিম পৌঁছে যান মধ্যযুগীয় বাংলা নাটকের কাছে। সেখানে যে অমৃতের সন্ধান সেলিম পেয়েছিলেন তার আলম্ব বিন্দুতে অবস্থান করেছে তাঁর নাটকটি। সেটির মূলে ছিল পুরাণের নবীকরণ এবং সম্প্রসারণের বাসনা। ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনা বইতে লেখা হয়েছিলো নাটকটির বিষয়ে:

কবিগুরু গ্যেটের জীবনে শকুন্তলা এনেছিলো আলোড়ন। শকুন্তলার প্রশস্তিতে লেখা একটি অবিস্মরণীয় কবিতাও আছে গ্যেটের। যাতে তিনি মর্ত্যের ও স্বর্গের একীভূত এক অত্যাশ্চর্য রূপ দেখেছিলেন। কিন্তু স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনের দৃষ্টান্ত শকুন্তলা কিভাবে হতে পারে? যার জন্ম বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গে, স্বর্গ ও মর্ত্যের বিরোধে, তার জীবন দ্বন্দ্বহীন গল্প হয় কি করে? কালিদাস আর গ্যেটে শকুন্তলার মধ্যে কেবলই সৌন্দর্য আর মিলনই দেখেছেন, বিরোধকে নয়; আমরা এই বিরোধকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের শকুন্তলা এই বিরোধ প্রত্যক্ষকরণের ফল। ২৬

সেলিমের নাটকের গড়ন সংস্কৃত নাটকের আদলে। নাটকে অঙ্ক দৃশ্যের বিভাজন নেই, কিন্তু আছে খণ্ড বিভাজন। কালিদাসের নাটকের আভাস শুধুমাত্র আছে, অন্য সমস্ত বিষয়টা নির্মাণ করেছেন সেলিম। শকুন্তলার কথা বলতে গিয়ে দ্বিধা বিভক্ত এই নাটকের গোড়ায় স্বর্গের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সেলিম উপস্থাপন করেছেন। সেখানে মেনকার আগমন যে শুধুমাত্র বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই— তা স্পষ্ট হয়েছে। তবে অনেক নাটকের সমালোচক বলে থাকেন যে সেলিম তাঁর নাটকে শকুন্তলার মধ্যে বোধহয় বাংলাদেশের রূপককেই

খুঁজেছিলেন। তাই মেনকা এখানে রাষ্ট্রক্ষমতার সম্মোহনের প্রতীক, আবার শিশু শকুন্তলা যেন কীটদষ্ট পূর্ব পাকিস্তান। আবার যুবতী শকুন্তলা যেন মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের কোনও রমণী।

বাংলাদেশের আরেক নাটককার আব্দুল মতিন খান *শকুন্তলা* নামে আরেকটি নাটক লিখেছিলেন। তবে তিনি কালিদাসকে অনুসরণ করলেও তাঁর নাটকে যোগ করে দিয়েছিলেন সমসাময়িক রাজনীতিকে। এই ধারার নাটকে নবতম সংযোজন অবশ্যই মাসুম রেজা'র *নিত্যপুরাণ*, যা নাটককারের নির্দেশনায় একাধিকবার মঞ্চে এসেছে। নাটকের নায়ক একলব্য। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত ছিল মহাভারতের সমাজ। তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল সেই যুগে। তারই প্রতিচ্ছবি একলব্যের প্রতি হওয়া অবিচার ও অত্যাচার এবং বিভেদীকরণের নানা দিক। নাটককার একলব্যের গুরুদক্ষিণা নেওয়ার মধ্যে দিয়ে আসলে যে তাকে সমাজের মূল স্রোতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে, সেটি উপস্থাপন করেছেন। মাসুম রেজা এক্ষেত্রে রামায়ণের শম্বুকের সঙ্গে মহাভারতের একলব্যের মিল খুঁজে পেয়েছেন। এই নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাটককার এনেছেন। সেটি হলো একলব্য ও দ্রৌপদীর নিভৃত আলাপ, যে দৃশ্য মহাভারতে নেই। এখানে একলব্যের কাছে দ্রৌপদী এসেছে এবং পেয়েছে স্তুতি সম্ভাষণ।

মহাভারতের মূল আখ্যানের বা কাহিনির থেকে বাংলাদেশের নাটককারদের বেশি আকর্ষণ করেছে মহাভারতেরই বিভিন্ন প্রান্তিক ও নিম্নবর্ণীয় চরিত্রেরা। এরই ফলে তানভীর আহমেদ সিডনী'র হাত হতে বেরিয়েছে *অধিরথ সূতপুত্র রাধা যার মাতা*। এই নাটকে কর্ণ হয়ে উঠেছে প্রধান নাটকের বিষয়। অবয়বের প্রযোজনা হিসাবে মঞ্চস্থ হয়েছে *কর্ণকথা*, নির্দেশক ছিলেন জসিমউদ্দীন। এরকমই আনন জামানের লেখা *শিখণ্ডী কথা* মঞ্চস্থ করেছে রংপুর নাট্যকেন্দ্র। সম্প্রতি রুবাইয়াত আহমেদ লিখেছেন *হিড়িঙ্গা*। একেবারে বর্তমান সময়েও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা পরীক্ষা প্রযোজনা হিসাবে *হিড়িঙ্গা* অভিনীত হয়েছে, নির্দেশক ছিলেন হাবিব মাসুদ। সংস্কৃত নাটককার ভাস্কর্য'র *মধ্যম ব্যাঙ্গোপ*-এর কথা বলার পরেও এই নাটকের মৌলিকতা প্রশংসার যোগ্য। নাটকের মৌলিকতা ও মঞ্চ অভিনয় মানের দিক থেকে খুবই উন্নত ছিল।

মধুসূদন দত্তের *বীরঙ্গনা কাব্য* মহাভারতের চারটি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছিল। সেই পত্রগুলি নিয়ে নতুনভাবে ২০১০ সালে কাব্য নির্মাণ করেছে মণিপুর থিয়েটার। নির্দেশক ছিলেন শুভাশিস সিনহা। নাটকের নাম *কহে বীরঙ্গনা*। এই প্রযোজনা ইতিমধ্যে ভালোই প্রশংসা পেয়েছে, ৭০ বারের বেশি সফলভাবে মঞ্চস্থ হতেও পেরেছে। এগুলির মতোই একাধিক ছোট বড়ো

নাট্যদল মহাভারত কেন্দ্রিক নানা নাটক বাংলার বাইরেও মঞ্চস্থ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের মহাভারত কেন্দ্রিক কাব্যনাট্যগুলি আমরা সবাই জানি, সেগুলি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় করেছে *নাট্যত্রয়ী*, নির্দেশক ছিলেন আতাউর রহমান। ঠিক একইভাবে ২০১১ সালে স্বপ্নদল করেছে *চিত্রাঙ্গদা*, নির্দেশক ছিলেন জাহিদ রিপন। এভাবে বুদ্ধদেব বসু'র নাটকেরও সফলভাবে প্রযোজনা হয়েছে, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* করেছে ১৯৯৫ সালে লোক নাট্যদল। আব্দুল্লাহ আল মামুন থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনীর *প্রথম পার্শ্ব* ২০১৭ সালে ভারত রঙ্গ মহোৎসবে সফলভাবে অভিনীত হয়েছে। নির্দেশক ছিলেন জয়িতা মহলানবীশ।

এভাবেই মঞ্চের প্রয়োজনে আজও মহাভারতের আখ্যান ও নানা চরিত্রকে কেন্দ্র করে আমরা নাট্য নির্মাণ করে চলেছি। এই নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তার ভৌগোলিক অবস্থানের বাইরেও থেমে নেই। ভারতের বাইরেও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনবরত হয়ে চলেছে এই রচনাগুলি। এগুলির মধ্যে হিন্দি ভাষায় লেখা ধর্মবীর ভারতীর *অক্ষয়ুগ* এবং হাবিব তানভীরের *এক আর দ্রোণাচার্য* অন্যতম। মণিপুরী ভাষায় রতন থিয়মের *কর্ণভরম*, *চক্রবাহু*, *উত্তর-প্রিয়দর্শী*, *উরুভঙ্গম* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।

৩.৩।। ক। মন্মথ রায়- *কারাগার*

বাঙালির মহাভারত চর্চায় মন্মথ রায়ের *কারাগার* খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। এমনকী বিশ শতকে যে সব নাটক ও যাত্রাপালা জনমানসে ও মঞ্চে অত্যন্ত সফলতা লাভ করেছে, তার মধ্যেও মন্মথ রায়ের নাটকটি অন্যতম। ১৯৩০ সালে নাটকটি প্রথম রচিত হয়। ওই বছরেরই ২৪ শেই ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম নাটকটি অভিনীত হয়। উনিশ শতকের মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক ও যাত্রাপালা থেকে বিশ শতকের পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য আছে। ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং দেবতার প্রভাব উনিশ শতকের পৌরাণিক নাটকের মূল বিষয়, যেখানে বিশ শতকে প্রাধান্য পেয়েছে যুক্তিবাদ এবং দেবতার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে মানব মনের গভীরে জন্ম নিয়েছে একাধিক প্রশ্ন। এরই সূত্র ধরে বিশ শতকে মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনিকে সরাসরি নাটককারেরা তাঁদের নাটকে নেননি। বরং মহাভারত ও পুরাণের আখ্যানের মোড়কে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন সমকালীন সমস্যা ও নাটককারের স্বাধীন ভাবনাকে। এর ফলে মহাভারতের অনেক আখ্যানেরই আমরা বিনির্মাণ দেখতে পেয়েছি। এই ধারায় রবীন্দ্রনাথ হলেন এই শতকের মহাভারত ও পুরাণকেন্দ্রিক নাটকের প্রথম সার্থক রূপকার। যাই হোক, নাটককার মন্মথ রায় ও *কারাগার* নাটকের প্রসঙ্গে এইবার ফিরে আসি আমরা।

কারাগার নাটকের বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের অনেকটা পেছনে যেতে হবে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের যুগে যখন বাঙালি পুরো মাত্রায় আত্মনিয়োগ করেছে, তখন ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভেঙে গান্ধী গ্রেপ্তার হলে সারা ভারত জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে অসংখ্য দেশপ্রেমী মানুষ নিজেরাই আইন অমান্য করে কারাবরণ করে। নাটককার মন্থরায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

দেশে তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। মহাত্মাজীর নির্দেশও ছিল তাই। এ পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগারের কথা আমার মনে এসেছিল।^{২৭}

আবার কারাগার নাটকের নামকরণটিও একেবারে সার্থক হয়েছে। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সর্বাত্মক বিরোধিতার সময়ে যখন আমরা রাষ্ট্রের রক্ত চক্ষুর নির্দেশকে অমান্য করেছিলাম, তখন মহাভারত ও ভারতীয় পুরাণের অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারকে নাটককার ব্রিটিশের নির্মিত কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নাটকের মধ্যে এই ইঙ্গিত খুব স্পষ্টভাবেই রয়েছে, তাই তৎকালীন সরকার নাটকটিকে অল্পদিনের মধ্যেই রদ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কারাগারে থাকে অপরাধীরা, কিন্তু ক্ষমতার দন্ডে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্যই অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তিকে জেলে ঢুকিয়েছিল ব্রিটিশরা। একই রকমভাবে মহাভারত ও ভারতীয় পুরাণে অত্যাচারী কংসও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অনুরূপ কাজ করেছিল। কিন্তু অন্ধকারের শেষে যেমন আলোর উদয় হয়, ঠিক তেমনি কংসের অত্যাচার থেকে যাদবদের মুক্তির জন্য ভগবান কৃষ্ণের ধরাধামে আবির্ভাব ঘটে এবং সর্বশেষে কংসের নিধন হয়। নাটকেও তাই কংসের কারাগার ভাঙার মধ্যে দিয়ে বাস্তবে ভারতবাসীর ইংরেজ শাসন হতে মুক্তির দিকটিও ফুটে ওঠে। নাটকের শেষে দেবকীর মুখ থেকে তাই উচ্চারিত হয়েছে:

দেবকী- (কারা-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) তুমি পারবে না। কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মান্ধা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা... কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন— কারাগার আজ পুণ্য-তীর্থ! কারাগার আজ স্বর্গ। তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের এই স্বর্গে পাতকী তুমি...তোমার প্রবেশ নিষেধ; শয়তান তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে মরছ! ...কিন্তু কেনই বা এই চেষ্টা..., আমাকে চাও? আমি নিজেই বাহিরে আসছি ঐ লৌহদ্বার আর আমার পথ রোধ করতে পারবে না... আমি আজ... আমি আজ—তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতের দমনের জন্য, সাধুদের পরিব্রাণের জন্য, ধর্ম সংস্থানের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে থাকেন—, আমার তপস্যায় এ যুগেও আমারই গর্ভে আজ জন্মগ্রহণ করেছেন—^{২৮}

নাটককার রায় মোটামুটি পৌরাণিক কাঠামোকে বজায় রেখেছেন। মহাভারত ও পৌরাণিক চরিত্রগুলি এবং ঘটনাকে অবিকৃত রেখেই তিনি শিল্পীর স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় পুরাণ ও মহাভারতে দেখতে পাই বসুদেব ও দেবকী কারাগারে বন্দি অনেক কাল থেকেই, সেখানে প্রহরীদের থেকে সংবাদ পেয়ে রাজা কংসই শিলাখণ্ডে নিক্ষেপ করে নবজাতকদের হত্যা করত। কিন্তু নাটকে বিদূরথ ও নরকের মাধ্যমে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু কংস চরিত্রটিকে আধুনিকতার দৃষ্টিতে নির্মাণ করা হয়েছে, তাই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকট এই চরিত্রে বিদ্যমান। যা পুরাণ ও মহাভারতের কংস থেকে নাটককার রায়ের কংসকে পৃথক করে। এই নাটকে তাই কংস নিজ হাতে বসুদেব ও দেবকীর সন্তানদের হত্যা করে না। পুরাণের কংস নিষ্ঠুর দানব, একেবারে নির্দয়। পৌরাণিক নাটকে সাধারণভাবে দ্বন্দ্ব ও সংকটের অবকাশ থাকে না, যেখানে চরিত্ররা একেবারেই ঘটনা নির্ভর হয়। কিন্তু নাটকের নায়ক যেহেতু কংস, তাই মন্থ রায় কংস চরিত্রে অসাধারণ দ্বিধা ও জটিলতা এনেছেন। যার ফলে এখানে কংস এমন কিছু আচরণ করে বা এমন কিছু কথা বলে থাকে, যেগুলি তাকে পুরাণ ও মহাভারতের কংস থেকে আলাদা করেছে, যার ফলে কংস চরিত্রটি এই নাটকে বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় হয়ে উঠেছে।

পুরাণের কংসের মতোই নাটকের কংসও তার অত্যাচারের মাত্রা বজায় রেখেছে, নিজ বংশের ও সাম্রাজ্যের প্রজাদের ওপর চরম অত্যাচারের নিদর্শনও রয়েছে এই নাটকে। দেবতা বিদ্বেশী রাজা কংস দেব মূর্তিকেও পাষণ্ড কারাগারে বদ্ধ করে রেখেছে এবং সারা রাজ্যেই নারায়ণ পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে তার দম্ভের চরমতম প্রকাশটি উপস্থাপন করেছে। এতদূর পর্যন্ত কংস চরিত্রে আমরা কোনও সমস্যা দেখি নি, কিন্তু চন্দনার সঙ্গে তার পরিচয়ের পরেই অনেক মানবিক সংবেদনশীলতা কংসের মুখ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত চন্দনা চরিত্রটি ভারতীয় পুরাণ ও মহাভারতে থাকে নি। কিন্তু নাটকে এই চন্দনা চরিত্রের হাত ধরেই নাটককার মন্থ রায় কংস চরিত্রের পাষণ্ড হৃদয়ে ফাটল ধরিয়েছেন। যে কংসের প্রবল প্রতাপে কোনও কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, বস্তুগত ভোগলালসার যার কোনও বাধা নেই। সেও প্রকৃত একজন প্রেমিকের মতো চন্দনাকে কাছে পাওয়ার জন্য সামান্যতম বল প্রয়োগ করে নি। নাটকের মধ্যে একাধিক স্থানে বেশ কিছু উক্তি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কংস- (যাদবগণের প্রতি) হুঁ।... যে স্বেচ্ছায় আসে, সে-ই ভালোবেসে আসে... তারই শুশ্রূষা... শুশ্রূষা। কিন্তু যে তা আসে না... তাকে আমি চাই না—

যাদবগণ- (নিছক চাটুকারের মতো) যথার্থ বলেছেন সম্রাট!

কংস- তখন আমি চাই তাদের, যারা আমার প্রাসাদে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক প্রেরণ করবার জন্য অত্যাচার করেছে, লোষ্ট্রাঘাত করেছে! ২৯

চন্দনা-- এ প্রাসাদে আমার ওপর এতটুকু অত্যাচার হল না।

কংস-- কিন্তু অত্যাচার যে হবেনা, তা কি করে জানলে?

চন্দনা-- না, তা জানি না। হয়ত হবে। কিন্তু এতক্ষণও যে হয়নি কেন, তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

কংস-- হয় তো তোমাকে আমার ভালো লেগেছে! ৩০

চন্দনার সম্পর্কে আরও দুটি উক্তি এই পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে কংসের হৃদয়ের সংবেদনশীলতা আরও সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।

কংস-- আমার প্রাসাদে সব আছে, সব ছিল... শুধু নাই এই উত্তপ্ত ললাটের অগ্নিদাহ দূর করতে পারে এমন একখানি প্রিয় হাতের চন্দন-পরশ! ৩১

কংস-- যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে। কিন্তু এ কথাও সত্য নরক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে তৃষ্ণার্তকে দেখে নদী শুকিয়ে যায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায়, তখন সম্মুখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়— এই উত্তপ্ত ললাট যখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন পরশ চায়...তখন... তখন ঐ চন্দনা—(বোধ হয় কাঁদিয়াই ফেলিল!...) ৩২

আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে উপরের কথাগুলির মধ্যে একজন প্রকৃত প্রেমিকের অনুভব প্রকাশ পেয়েছে। কংসের দম্ভ ও ঐশ্বর্য বস্তুতই মিথ্যা এবং এগুলির কোনওটাই তার মনের শূন্যতা দূর করতে পারে নি। এই নাটকের কংসের চরিত্রের মধ্যে আমরা রক্তকরবীর রাজাকে খুঁজে পাই অনেকটা। তবে কংস নাটকের ট্রাজিক চরিত্র, গ্রিক নাটকের মতো এখানেও দৈব তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিজের হাতে গড়া কারাগারে প্রবেশ করতে কংস পারে নি, শেষ দৃশ্যে নায়ক কংস বড়োই অসহায়। অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মতোই এখানেও আত্ম উপলব্ধির বিষয়টি রাখা হয়েছে। যেখানে আমরা দেখেছি কংস শুনতে পাচ্ছে— ‘তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।’ আমরা দেখেছি যে শত্রুভাবে সাধনা করলেও দেবতাকে পাওয়া যায়। রামায়ণের রাবণ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই এই নাটকে কংসের সাধনাও সেই শত্রুভাবের। নাটকের শেষে কংস বলছে— “আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যেই টেনে এনেছি...” ৩৩ একবার ভগবানকে দেখার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে নাটকে। এভাবেই দানব কংসকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাটককার মন্মথ রায়।

এই নাটকের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নাটককারের রসবোধ। কংসের মতো একটি পৌরাণিক ও মহাভারতীয় চরিত্রকে নিয়ে অনেকটা হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন মন্মথ রায়। নাটকের

অনেক জায়গাতেই এর দৃষ্টান্ত আছে, আমরা তার থেকে একটি না বলে পারছি না। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নৃত্যশালায় রাজা কংস প্রবেশ করতেই নর্তকীগণ একাধিক স্তুতিবাচক বিশেষণ রাজাকে শোনায়। সবার সমস্ত বিশেষণ শেষ হয়ে গেলে রাজা নিজেকে ‘শয়তান’ বলে নবতম বিশেষণটি যোগ করে, যা হাস্যরস সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এরপর কংস ব্যঙ্গের সঙ্গে জানতে চায়- ‘ভগবান কি মদ খান?’^{৩৪} এদিকে আবার নরকের ভয় আছে রাজার, তাই বিদূরথকেও রাজা মদ খাওয়ায়, যাতে একসঙ্গে নরকে যেতে পারে। এরকম নাটকের মধ্যে দিয়ে সাবলীল রসবোধ আমাদের মহাভারত চর্চাকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

নাটকে বসুদেব চরিত্রটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নায়কের বিপরীতে অবস্থানের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাহিনিকে এগোতে সাহায্য করেছে বসুদেব। তাই সে এখানে প্রতিনায়ক। তার আত্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ এই নাটকের অন্যতম সম্পদ। ধর্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বর বিশ্বাসী এই মানুষ আত্মবিশ্বাসের উপরে ভর করেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। এই নাটকের মধ্যে দেশপ্রেমের যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে তারও পুরোধা বসুদেব। দাসত্বকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে বসুদেব, গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের প্রতিধ্বনিও শুনতে পাই তারই মুখ থেকে। এভাবেই নাটককার রায় পৌরাণিক ও মহাভারতীয় চরিত্রের মধ্যে সমকালীন আন্দোলনের ভাষাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

বিদূরথ ও নরক চরিত্র দু’টি মহাভারত ও পুরাণে নেই। নাটককে বেশি আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করার জন্যই উপরের দুইটি চরিত্রকে মন্থন রায় এনেছেন। দাসত্ব শৃঙ্খল যে কতো ভয়াবহ হতে পারে বিদূরথ তার প্রমাণ। নিজে ধর্ম ও জাতি ত্যাগ করে প্রতি মুহূর্তেই বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। দানব কংসের আনুগত্য বজায় রাখতে গিয়ে প্রিয় পুত্রকে ও স্ত্রীকে হারাতে হয়েছে। পাঠক ও দর্শকের গভীর সহানুভূতি সর্বহারা বিদূরথ আদায় করে নিয়েছে। অন্যদিকে নরকের মাধ্যমে কংস চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনের পরিকল্পনা ছিল নাটককারের। একেবারেই আত্মসম্মান বর্জিত ও দাসত্বে চির অভ্যস্ত কিছু মানুষ সর্বদাই আমাদের সমাজে থাকে, নরক তাদেরই একজন প্রতিনিধি। পুরনো দিনের প্রত্যেক রাজার কাছেই একজন মোসাহেব থাকত। রাজাকে সৎ ও অসৎ উভয় পরামর্শই দিত এরা। চাটুকারিতা নরকের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং কংসের সমস্ত অপকর্মের সহায়ক সে। নরকের এই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ অপর একটি দিক হল যে কংসের সঙ্গে তার কথোপকথন। রাজা কংসের চরিত্রের একাধিক লুক্কায়িত দিক যা সাধারণের কাছে অজ্ঞাত, তাই কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকট হয়েছে। যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় কংসের আচরণ, যা জীবন্ত কংসের থেকে অনেকাংশে পৃথক। নরকের হাত ধরেই যা নাটকে উঠে এসেছে।

অন্যদিকে দেবকী নাটকে অন্যতম একজন নারী। তার বিবাহ সভায় দৈববাণীটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ— ‘ভগিনী নন্দন হতে কংসের নিধন।’ পুরাণ ও মহাভারতের কাহিনির মতো এখানেও রাজা কংসকে সারা জীবন এই ধ্বনিটি তাড়া করে বেড়িয়েছে। জেগে থাকা ও ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়েছে। ফলে দেবকীর অজ্ঞাতে অনাগত সন্তানদের কংসের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বসুদেব দিয়েছিল। নাটকে দেবকী নিরস্ত্র প্রতিবাদের প্রতিনিধি। সে বলে নাটকে— ‘সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে ভগবান তখন জাগেন না। ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে।’ তাই যাদবগণকে অস্ত্র পরিত্যাগের পরামর্শ সে দেয়। নাটককার মন্মথ রায় দেবকী চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— ‘পাষাণে আজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমার নিদ্রিত নারায়ণ জাগ্রত হয়েছেন।’ দেবতাকে গর্ভে ধারণ করেছে দেবকী। এই সর্বহারা নারীর কাছে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করেছে নাটকের নায়ক কংস। এই নারীর মধ্যে দিয়ে দেব মহিমার এক অপূর্ব প্রকাশ মন্মথ রায় উপস্থাপন করেছেন। নাটকে বসুদেব পত্নী দেবকী হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল নারী মূর্তির প্রতীক। ভগবান কৃষ্ণের জন্ম দানের মাধ্যমে ধরাধামে ধর্মের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সে। তাই সে মহীয়সী এক নারী।

শেষে আমাদের একটি কথা বলতেই হয় যে মহাভারত ও পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাটককার রায় যে নাটকটি রচনা করেছেন, তার বহুমাত্রিক অভিঘাত আমাদের সমাজে পড়েছে। এটি যেমন একাধারে বিগত শতকের বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় বিখ্যাত একটি নাটক, ঠিক তেমনই পৌরাণিক নাটক হয়েও এই নাটকটির তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অভিঘাত অত্যন্ত প্রবল। যেখানে পৌরাণিক নাটকের রসনিষ্পত্তিই শেষ কথা নয়। দেশে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তখন দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কালে কালে ও যুগে যুগে দেবতার আবির্ভাব ঘটে। মহাভারত ও পুরাণের সাপেক্ষে এই কথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনই তা সর্বকালের জন্যও সত্য। অদৃষ্টবাদ এবং অলৌকিকতা এই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটককার রায়ের রচিত বেশ কিছু উক্তি নাটকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এগুলি যথার্থ অর্থেই বহুমাত্রিক। যেমন পৌরাণিক বিখ্যাত দৈববাণী— ‘তোমারে বধিবে যে— গোকূলে বাড়িছে সে।’ অথবা ধরা যাক— ‘এরা ঘুমিয়ে আছে—এদের জাগাতে হবে’। তাই এ কথা বলতেই হবে যে পুরাণ ও মহাভারত কেন্দ্রিক যেই সমস্ত নাটক উনিশ শতক জুড়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক মনন ও বৌদ্ধিক চর্চার জগতে স্থান পেয়েছিল, বিশ শতকের *কারাগার* নাটকটি তারই যথার্থ উত্তরাধিকার বহন করেছে।

৩.৩।। খ। বুদ্ধদেব বসু'র কাব্যনাট্য

(প্রথম পর্থা, অনামী অঙ্গনা, কালসন্ধ্যা, সংক্রান্তি এবং তপস্বী ও তরঙ্গিনী)

বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু বড়ো একটি জায়গা নিয়ে রয়েছেন। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু'র মহাভারতের কথা নিয়ে পরের অধ্যায়ে আমরা কথা বলেছি, দেখেছি সেখানে কী অসাধারণ ভাবনা ও যুক্তিবিন্যাসে যুক্তিটির ওপর নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। রামায়ণ থেকে শুরু করে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি ও অন্যান্য কালজয়ী রচনাগুলির সাপেক্ষে তাঁর প্রতি পদে পদে মহাভারতকে বুঝে নেওয়ার দিকটিও আমাদের মুগ্ধ করেছে। তবে আমাদের আলোচনার এই অংশে তাঁর রচিত মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকগুলিই বা বলা ভালো 'কাব্যনাট্যগুলিই' আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়। ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটেছে এই কাব্যনাট্যগুলিতে। এগুলির মধ্যে আছে— প্রথম পর্থা (১৯৬৯), অনামী অঙ্গনা (১৯৭০), কালসন্ধ্যা (১৯৬৮ সালে আকাশবাণীর একটি অনুষ্ঠানে প্রথম সম্প্রচারিত হয়) এবং সংক্রান্তি (১৯৭৩)। এগুলি ছাড়াও তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬) কাব্যনাটকেও কিন্তু মহাভারতের বনপর্বের আখ্যান মিশে রয়েছে, যদিও এই কাব্যনাট্যে মহাভারতের পাশাপাশি রামায়ণ ও জাতকেরও স্বতন্ত্র কাহিনির প্রভাব রয়েছে।

বস্তুতপক্ষে মহাভারতকেন্দ্রিক বুদ্ধদেব বসু'র প্রত্যেকটি কাব্যনাট্যই কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার শৈল্পিক সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। সাধারণভাবে সাহিত্য সৃষ্টির জগতে লেখকদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্বে তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রভূত বৈচিত্র্য দেখা যায়, ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন সর্বদা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কখনও তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় অথবা একেবারেই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ হয়ে ওঠে। আমরা জানি ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরেও সমানভাবে রয়েছে। ভারতীয় পুরাণ ও মহাভারতে এমন কিছু চিরন্তন বিষয় এবং মানবকল্যাণের শাস্ত্র উপাদান আছে যাকে বারবার আধুনিক মন ও যুগের উপযোগী করে নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। জাতি বা সভ্যতা যখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন সাহিত্যিকেরা পুরাণ বা মহাভারত থেকে কাহিনি উপাদান সংগ্রহ করে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে অতিক্রম করতে চান। অথবা, আধুনিক কোনও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুরনো ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ণও করেন কবি ও সাহিত্যিকেরা। যার মাধ্যমে একটি জাতির পরম্পরাগত ইতিহাসের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা। তাঁর হাত ধরেই আধুনিকতার নানা দিক আমরা জেনেছি। এক কথায় বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের গঠনরীতি অনেকটাই বুদ্ধদেবের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। বিদ্যায়তনিক ভাবনার এই পরিসর থেকেই বুদ্ধদেবকে যেমন আমরা

আধুনিকতার পরিপোষণা করতে দেখেছি, ঠিক তেমনই তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই তাকেও নবনির্মাণের চেষ্টা করে গেছেন। বুদ্ধদেব বসু'র মহাভারতের উপাদান নিয়ে রচিত প্রত্যেকটি কাব্যনাট্যই আমরা এদিক থেকে পড়তে পারি।

অনামী অঙ্গনা কাব্যনাটকের প্রধান বিষয়টি হল বিদুরের জন্ম। শূদ্র মায়ের গর্ভে জন্ম লাভের কারণে বিদুরের সামাজিক অবস্থান রাজ পরিবারে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মতো ছিল না। ফলে ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মানোর পরেও অনেক কটুবাক্য ও গঞ্জনা প্রতিনিয়তই তাকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু বিদুর এই নাটকের মূল চরিত্র নয়, এমনকী তখনো সে পৃথিবীতে এসেও পোঁছায় নি। নাটকের মূল বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে হস্তিনাপুর রাজ পরিবারের সেই শূদ্রা দাসী যার নাম মহাভারতকার ব্যাসদেব পর্যন্ত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। রাজবংশের অসংখ্য দাস-দাসীদের মধ্যে একজন যে যথার্থ অর্থেই অনামী বা নামহীন বা মহাভারতের বৃহৎ কালপর্বে যার পরিচয় হয়তো একেবারেই মূল্যহীন। কিন্তু আধুনিক সময়ের মানুষ বুদ্ধদেব বসু'র ভাবনায় সেই তথাকথিত নামহীন শূদ্রা দাসীই হয়ে উঠেছে প্রধান। ব্যাসদেবের ঔরসে গর্ভে সন্তান লাভের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে পণ্ডিত ন্যায়শীল ব্যক্তির জননী হওয়ার গৌরব তার মধ্যে প্রোথিত হয়েছে। ফলে সাধারণ দাসী থেকে মাতায় রূপান্তরের এই অধ্যায় প্রকৃতভাবেই মহাভারতের পর্দার আড়ালে থেকে গেছে। নামহীন এই নায়িকার উত্তরণের মধ্যেই বুদ্ধদেব'র কাব্য নাটকটির পরিণতি লাভ করেছে।

আমরা জানি শান্তনু ও সত্যবতী'র দুইজন পুত্র অকালে মারা গেলে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন জরুরি হয়ে ওঠে। রাজমাতা সত্যবতী হস্তিনাপুরের ভবিষ্যৎ ও রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লে ব্যাসদেব সমাধানের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু বিকটরূপ ব্যাসদেবের সঙ্গে সুস্থ স্বাভাবিক যৌন মিলনের অভাবে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক সন্তান না আসবার বিষয়টি ব্যাস সত্যবতীকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সময়ের সমাজের নিয়মে পঙ্গু ও অস্বাভাবিক কেউ রাজা হতে পারত না, তাই পুনরায় অম্বিকাকে ব্যাসের শয্যাসঙ্গিনী হতে বললে অম্বিকা কৌশল অবলম্বন করে তার একজন দাসীকে ব্যবহার করে। মহাভারতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটককার তাঁর নাটকটি রচনা করেছেন। এই নাটকে আধুনিকতার নানা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। তর্ক বিতর্ক, কূটনীতি ও স্বার্থপরতার মতো বিষয়গুলি দিয়ে বর্তমান সময়ের মতো করে নাটককার নাটকটি নির্মাণ করেছেন। তাই সত্যবতীর প্রস্তাব অম্বিকা সহজ ভাবে না মেনে প্রতিবাদী আধুনিক নারীর মতোই বলেছে—

আমি রাজকন্যা, রাজবধূ— বিদগ্ধা!
রুচিরহিত গাভীর মতো
যে-কোনো বৃষের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি না।^{৩৫}

এভাবে মহাভারতীয় চরিত্রগুলি বুদ্ধদেব বসু'র কলমে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। উপেক্ষিত নারী চরিত্র তথা অম্বিকা দাসীর ক্ষেত্রেও তাঁর আধুনিক ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। সাধারণ এক নারী যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় একেবারেই নিম্নবর্গের, নাটককার বুদ্ধদেব বসু তাঁর অসামান্য শিল্প নৈপুণ্যের সাহায্যে দাসীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরলেন। কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে—

আমি চাই আমার আপন ঘর, আপন কাজ, আমার নিজের
তৈঁতুলতলার ছায়া।
—কিন্তু আমরা উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী।^{৩৬}

নিম্নবর্গের এই নারীর মুখে আক্ষেপের পাশাপাশি শোনা যায় ব্যক্তিত্বময়ী নারীর মতো কণ্ঠস্বরও। উন্নত ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি শ্রেণিসচেতনতা ও প্রতিবাদী ভাবনাও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নবর্গের নারীর মুখে উচ্চবর্গের মানুষের প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গ নাটকের অনেক জায়গাতেই প্রকট রূপে ফুটে উঠেছে। যেগুলি থেকে আমরা বঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত এক নারীর প্রতিবাদকে উপস্থাপিত হতে দেখেছি। নাটককার বুদ্ধদেব'র কলমে ফুটে উঠেছে অসামান্য সেই শৈল্পিক কাব্যময় ভাষা।

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ— তাঁরা দেবতার প্রিয়।
ভূমি নয়, বিভূ নয়, বেদমন্ত্র নয়—
তাঁদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ— স্বাধীনতা।
বেশ্যারমণ, পরদারগমন, পরপুরুষের সংস্রব,
বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান—
সব শ্লাঘ্য তাঁদের পক্ষে। কেননা তাঁরা
তৃপ্তিহীনভাবে দোহন করেন বসুন্ধরা ও বৈকুণ্ঠ,
হরিৎ ও নীলবর্ণ দুই কামধেনুর মতো।
কেননা তাঁরা প্রবল।
আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন,
আমরা শুধু দেখে যাবো— মেনে নেবো— কথা বলবো না।^{৩৭}

মূল মহাভারতে ব্যাসদেব সাধারণ এক দাসীর মুখ থেকে এমন প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং কঠোর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অবস্থান উপস্থাপন করে নি, মহাভারতের কবি ব্যস্ত ছিল বৃহৎ কর্মযজ্ঞে। ব্যাসের এক অনামী শূদ্রা দাসীকে নিয়ে ভাবনার এত সময় ছিল না। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুললেন। দাসীর মুখে এই জোরালো উক্তি বসিয়ে তাকে আধুনিক সচেতন ও ব্যক্তিত্বময়ী এক নারীতে রূপান্তর করলেন। আমরা জানি বুদ্ধদেবের নাটকের কাহিনি মূল মহাভারত থেকে আলাদা নয়। কিন্তু, নাটকে বড়ো হয়ে দেখা দেয় তথাকথিত সামান্য এক দাসীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যে জটিল ও বহুমাত্রিক ভাবনা তাকে আধুনিক নারীকে পরিণত করেছে। নিজের স্বপ্নের পুরুষকে না পেয়ে শুধুমাত্র অস্বিকার নির্দেশে ব্যাসদেবের শয্যায় যাওয়া এই নারীর মানসিক বিবর্তনের প্রতিটি মুহূর্তকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাটককার। এমনকী ব্যাসদেবের সঙ্গে অতিবাহিত হওয়া প্রত্যেকটি পরম মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই জীবনের সমস্ত সুখও সে ত্যাগ করেছে। মহামহিম ব্যাসদেবের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার জন্য বাঞ্ছিত প্রেমিক পুরুষকে আর চায় নি অঙ্গনা। এতকাল ধরে যে জীবন সে কাটিয়ে এসেছে তা থেকে মুক্তিও আর চাইল না। সামান্য এক দাসী থেকে তার যে মানসিক উত্তরণ ঘটল তা আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। নামহীন দাসী তার মাতৃত্বের জায়গা থেকেই সন্তানকে ব্যাসদেবের যোগ্য উত্তরাধিকারী করে তুলতে চেয়েছে। মহাভারতের অন্যান্য খ্যাতনামা নারীদের মানসিক টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ বা মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের কথা অনেক মহাভারত গবেষকই ভেবে দেখেছেন। কিন্তু মহাভারতের মতো বৃহৎ মহাকাব্যের কোনও এক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ শূদ্রা দাসীর চরিত্রকে নতুন আঙ্গিকে রূপদান বাস্তবিকই এক নবনির্মাণ। নাটককার বুদ্ধদেব এভাবেই আধুনিকতার সঙ্গে মহাভারতীয় ঐতিহ্য ও অনুসঙ্গকে মিলিয়ে দিয়েছেন। নাটকের শেষে অঙ্গনা অস্বিকাকে বলেছে—

না, দেবী, পুত্রের জন্য নয়—

আমার নিজেরই জন্য। আমি দেখতে চাই দূরযাত্রীকে তীরে
দাঁড়িয়ে,

দেখতে চাই আকাশে আমার জয়ধ্বজা—

একমাত্র ধবলতার সংকেত—

ঘোর যুদ্ধে পৃথিবী যখন রক্তাক্ত।

সে:

পিতার মতো বিদ্বান, মাতার মতো নেপথ্যচারী,

মাতার মতো দীনতায় ধন্য, পিতার মতো উদাসীন,

ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র নয়,

এক শত্রু বা মিত্র, সংসারী বা সন্ন্যাসী :

এক অখণ্ড স্থির ভাবনায় মগ্ন,

ভুক্তভোগী, তবু সুদূর—

আমার স্মরণচিহ্ন, আমার প্রমাণ, আমার অভিজ্ঞান।
তাই, দেবী,
আমার পক্ষে দাসীত্ব আজ বরণীয় গুণন,
নামহীন অস্তিত্ব এক দুর্গধাম,
যার অন্তরালে আমার বীজময় রাত্রি—
বিনা বিক্ষেপে, বিনা অপব্যয়ে—
ফ'লে উঠতে পারে গুচ্ছ- গুচ্ছ সোনালি ধানের মতো,
আমারই মধ্যে উৎপন্ন, কিন্তু ভোজ্য যার ভবিষ্যৎ।
দয়াময়ী, আমাকে আশ্রয় দিন। ৩৮

প্রথম পার্শ্ববুদ্ধদেব বসু'র অন্যান্য কাব্যনাটকগুলির মতো ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে সৃষ্ট। নাটকের বিষয়বস্তু মোটামুটি মহাভারতের সকল গবেষকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তথা পাঠকও জানে। কুমারী অবস্থায় দুর্বাসা মুনির সেবা করে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল কুন্তী। ঋষির বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য কুন্তীর প্রথম জীবনে যে দুর্ঘটনা নেমে এসেছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে কর্ণের জন্ম। সামাজিক ভয় ও লজ্জার জন্য যে সন্তানকে একদা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল, আজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে সেই সন্তান কর্ণ মাতার প্রত্যাখ্যানকে দ্বিগুণ আঘাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। কুন্তীর শত অনুরোধ উপেক্ষা করে কর্ণ অটল থেকেছে দুর্যোধনের পক্ষেই। ব্যাসদেবের মহাভারত আমাদের এটুকুই জানিয়েছে।

কুন্তী ও কর্ণের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের যে দ্বন্দ্ব ও সংকট তা অনেক কবি ও সাহিত্যিকদেরই প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক মহৎ সৃষ্টিকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখলেও রবীন্দ্রনাথের *কর্ণকুন্তীসংবাদ*-কে উল্লেখ করতেই হবে। কারণ বাঙালির মহাভারত চর্চায় এইরূপ কাব্যনাটক দ্বিতীয় আর নেই। এমন হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী কুন্তী ও কর্ণের কথোপকথন প্রত্যেক পাঠক ও গবেষককে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। যাই হোক, এই আলোচনা অন্যত্র আমরা করেছি। বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের অলৌকিকতা দূরে সরিয়ে রেখে যুক্তি দিয়ে ঘটনা পরম্পরা আলোচনা করেছেন। ফলে পাঠকের কাছে তা অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তাই কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎকারকে তিনি এককেন্দ্রিক না করে বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় করে উপস্থাপন করেছেন।

জন্মের পর যে কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কুন্তী, আজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে তারই কাছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে হাজির হয়েছে সে। মহাভারতের এই ঘটনা সকল পাঠকের কাছেই বেদনা ও করুণা বয়ে নিয়ে আসে। বুদ্ধদেব বসু এই কাজটিকে আরও বেশি স্পষ্ট ও

জোরালো করার জন্য দ্রৌপদী ও কৃষ্ণকে কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই কাব্যনাটকে দ্রৌপদী, কুন্তী এবং কৃষ্ণ প্রত্যেকেই কর্ণের ওপর ভয় ও ভীতি এবং প্রলোভনের সঞ্চারণ ঘটানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কর্ণ নিজের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের ওপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই মাতা কুন্তীর কাছে ‘সূর্যপুত্র’ অভিধাটি শোনার পরেও কর্ণ জানিয়েছে:

কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা-কিছু আছে সপ্রাণ,
তৃণ, বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ— যারা পরস্পরকে আহার ক’রে
বংশপরস্পর বেঁচে থাকে, জন্ম জন্মান্তরে ঘূর্ণিত হয়—
সূর্য তাদের সকলেরই পিতা, সকলেরই প্রতিপালক।
পশুর মলজাত যে-কীট, সেও তো সূর্যের সন্তান।^{৩৯}

প্রত্যেকটি জীব ও প্রাণীর উৎপত্তি ও শক্তির উৎস সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু’র কর্ণ যে কথা বলে তা আসলে বিশ শতকের মনন সমৃদ্ধ কর্ণের কথা। আমরা জানি মহাভারতের কর্ণ এই ভাষায় তার উত্তর ব্যক্ত করে নি। তাই বুদ্ধদেবের কর্ণের দ্বারাই বলা সম্ভব:

আমি শাস্ত্র মানি না: আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব
যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই।
যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব।^{৪০}

মহাভারতে চারটি বিষয়ের কথা বারবার উপস্থাপিত হতে থাকে। যথা- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বস্তুতপক্ষে এই চারটি স্তম্ভই মহাভারতের মূল কথা। এই চারটি বিষয় প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সমানভাবে থাকা আবশ্যিক। এর কম বেশি হলে ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি সমাজেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কুন্তীর দেওয়া প্রত্যেকটি লোভ-লালসা ও ভোগের প্রস্তাবকে তুড়ি মেরে দূরে সরিয়েছে বুদ্ধদেব বসু’র কর্ণ। এই ভোগ থেকে ত্যাগের প্রতি যে যাত্রা তা মহাভারতে বারবার ফিরে এসেছে। ঋষি পরাশর থেকে সত্যবতী এবং আরও অনেক চরিত্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই কুন্তীর প্রস্তাবিত প্রত্যেকটি ভোগ্যবস্তুকে ত্যাগের মাধ্যমেই কর্ণ মহাভারতের পাঠকদের অন্তরে অমর হয়ে থেকেছে। নাটকে কুন্তী কর্ণকে বলেছে:

কর্ণ, ফিরে এসো। এসো তোমার মাতৃহৃদয়ের স্বরাজ্যে,
এসো তোমার স্বাভাবিক সাম্রাজ্যে, সিংহাসনে:
যেখানে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধারণ করবেন,
নিত্য তোমার অনুগামী হবেন অর্জুন,
আর ষষ্ঠ কালে, আমার অনুমতি নিয়ে, রত্নে মাণ্যে

ভূষিত হ'য়ে

তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন দ্রৌপদী।^{৪১}

এই নাটকে দ্রৌপদী চরিত্রটি বুদ্ধদেব বসু'র অনবদ্য একটি সৃষ্টি। কর্ণের কাছে দ্রৌপদী জানায় যে কর্ণের সঙ্গে বন্ধুতা সে কামনা করে। 'আমি তোমার বন্ধুতা চাই'- এরকম একটি জোরালো প্রার্থনা তৎকালীন সময়ে সমাজে একেবারেই একজন নারীর পক্ষে বলা সহজ ছিল না। এরকম একটি অত্যন্ত কঠিন কাজকে বুদ্ধদেব বসু দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। ফলে মহাভারতের মতো একটি পৌরাণিক ঐতিহ্যময় কাহিনি এখানে হয়ে উঠল আধুনিকতার বার্তাবাহী। প্রাচীন ভারতে মানবিকতার চর্চা মূলত ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, কিন্তু এখানে এসেছে তা ব্যক্তিক উপলব্ধিজাত। আধুনিক মানবতাবাদের উপজাত হিসেবে। এখানেই উভয়ের পার্থক্য।

দ্রৌপদী ও কুন্তীর পাশাপাশি কৃষ্ণও এই নাটকে নানাবিধ লোভ ও ভয় প্রদর্শন করেছে। কিন্তু কর্ণের নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থেকে যখন কোনওমতেই তাকে যুদ্ধ থেকে সরানো গেল না, তখন কৃষ্ণ মানব কল্যাণের দোহাই দিয়ে কাজে সফল হতে চেয়েছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে এক ধরনের মহানতা ও পরিত্রাণ কর্তা রূপে অবস্থান আছে। ব্যাসের মহাভারতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কৃষ্ণ সর্বদাই বৃহত্তর ধর্ম পালনের কথা বলে। এই ধর্ম বা নীতি পালনের মধ্যে এক ধরনের মঙ্গলবোধ সর্বদাই থাকে। কিন্তু বুদ্ধদেবের কৃষ্ণ কর্ণকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অস্ত্র প্রয়োগের কথা বলেছে। কর্ণকে শুনতে বাধ্য করা হয়েছে তার মৃত্যুর শেষ করুণ বর্ণনা। তাই কৃষ্ণ এখানে কর্ণ বা পাণ্ডবদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত হয় নি, বরং কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে যেমন তেমন উপায়ে কর্ণকে যুদ্ধ হতে দূরে রাখার চেষ্টা করে গেছে। বুদ্ধদেবের কৃষ্ণের এই সংলাপটিই তার প্রতি ধারণা স্পষ্ট করে:

যেহেতু তোমাদের মধ্যে

সম্ভব নয় একের হাতে অন্যের পরাভব—

আমাকে তাই

বিনা স্পর্শে, অতি মৃদু হাতে

খসিয়ে দিতে হবে গ্রস্থি,

এগিয়ে আনতে হবে সমাপন।

আমি করবো কী, জানো—

মায়াবলে ডুবিয়ে দেবো তোমার রথের চাকা

মাটিতে। ভুলিয়ে দেবো তোমাকে সেই দিব্যাস্ত্রের নাম,

যা পরশুরাম তোমাকে দিয়েছিলেন।

আর তারপর
তুমি যখন রথের চাকা টেনে তোলার চেষ্টায়
ঘর্মান্ত, উদ্বিগ্ন, ধনুর্বাণহীন,
আমি তখন বলবো, ‘অর্জুন,
দ্বিধা কোরো না!
এ-ই তোমার সুযোগ! সংহার করো শত্রুকে!’
ক্ষিপ্ত হবে অর্জুনের উত্তর:
বজ্রতুল্য অঞ্জলিক বাণের আঘাতে
তোমার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে রশ্মির মতো
উর্ধ্বাকাশে, সূর্যমন্ডলে।^{৪২}

বুদ্ধদেব বসু’র প্রথম পার্থকাব্যনাট্যটি টি.এস.এলিয়টে’র *মার্ভার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল* নাটক থেকে প্রভাবিত বলে মনে হয়। এলিয়টে’র নাটকের দু’টি অংশ। প্রথম অংশে আছে আত্মদ্বন্দ্বদীর্ণ বিশপ টমাস বেকেট এবং রাজার পাঠানো চারজন টেম্পটারের কথোপকথন এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বেকেটের সঙ্গে চারজন নাইটের কথোপকথন। এই নাটকে টেম্পটাররা এসে বেকেটকে ভয় ও প্রলোভন দেখায় এবং শেষে নাইটরা এসে তাকে হত্যা করে। তাই বুদ্ধদেব বসু’র নাটকেও কর্ণ চরিত্রটি এলিয়টের বেকেটে’র মতোই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব মানসিকভাবে দীর্ণ। শেষে নাটককার বুদ্ধদেব বসু’র একটি অসাধারণ মুসলীয়ানার কথা বলতেই হয়। গ্রিক ট্রাজেডির অনুকরণে কোরাস চরিত্র হিসেবে দুইজন বৃদ্ধের উপস্থিতি, যারা রাজ পরিবারের অনেক গুপ্ত রহস্য ও কথা জানে এবং তা সহজভাবে ব্যাখ্যাও করে। এভাবেই বারবার বুদ্ধদেব বসু প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু’র মহাভারতের উপর রচিত দ্বিতীয় নাটক *কালসঙ্ক্ৰা*। এই নাটকের মর্মবস্তু অনেক গভীর ও পাশাপাশি দার্শনিকও বটে। সমস্ত কিছুই সৃষ্টির পাশাপাশি ধ্বংসও থাকে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে মানুষের জীবন পর্যন্ত কোনও কিছুই চিরকাল স্থায়ী হয় না। মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক পুরুষ অর্জুনও কালের নিয়মে সাধারণ দস্যুদের হাতে পরাজিত হয়েছে, অহংকার ও ক্ষমতা কালের নিয়মে একসময় হারিয়ে যায়। সারা নাটক জুড়ে এই কথাটাই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাই ভূমিকা অংশে বলেছেন:

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন: ‘তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে- আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।’ কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘দেবী, আমি সবই জানি।। যা অবশ্যস্বাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হ’লো।’..... বলা বাহুল্য, দ্বারকাপুরী ও যদু বংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই

কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব-ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।^{৪৩}

নাটকের মূল কাহিনি নেওয়া হয়েছে মহাভারতের মৌষল পর্ব থেকে। আইনশৃঙ্খলা থেকে প্রশাসন সমস্ত কিছুতেই সমৃদ্ধ নগর ছিল কৃষ্ণের দ্বারকা। এমনকী যাদব বংশ থেকে অনেক বীর নারী ও পুরুষ মহাভারতে তাদের স্থান রেখে গেছে। কিন্তু ধ্বংসের সময় যখন আসে তখন বীরত্ব, অহংকার ও ক্ষমতা সমস্ত কিছুই কালের কাছে ম্লান হয়ে পড়ে। নাটকে স্ত্রীলোকদের কথোপকথনে জানা যায় সমগ্র নগরে পশু পাখির অমঙ্গলসূচক ডাক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুরা পান করে মত্ত হয়ে রয়েছে, এছাড়াও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কীর্তিমান পুরুষ শাস্ত্র থেকে সাত্যকি পর্যন্ত সবাই কেলিকর্দমে রাজপথে উত্তাল হয়ে রয়েছে। এরপর কালরূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং যাদব বংশের সমস্ত যোদ্ধাকে পরাজিত করে হত্যার ঘটনা নাটকে ঘটে। কৃষ্ণের হাতেই মারা যায় প্রায় সমস্ত জ্ঞাতি আত্মীয়রা। এভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠে গান্ধারীর অভিশাপ। বুদ্ধদেব বসু'র কৃষ্ণ তাই বলে ওঠে:

মহিলারা, বিলাপ কোরো না।
এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট, অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোম্বীহত জলের কম্পন শুধু।
জেনো, যাঁরা ছিলেন বিক্রান্ত বীর, তাঁরা অনাবশ্যক এখন,
তাই প্রত্যাহত।
জেনো, এই ধ্বংস- এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এলো বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।
— সত্যভামা, সুভদ্রা, বিদায়।^{৪৪}

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন সমস্ত যাদব নগরীর নারী ও শিশুদের রথে করে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু, কালের নিয়মে প্রবল পরাক্রান্ত ও অসংখ্য ঈশ্বর প্রদত্ত অস্ত্রে দীক্ষিত অর্জুন সামান্য দস্যুদের হাতে পরাজিত হয়। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রকে স্মরণে সে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় যাদব নগরীর নারীদের রক্ষার্থেও। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মহাভারতের কথা* নামক বইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছিলেন যে, যুধিষ্ঠির যেখানে অনেক কিছু হারানো সত্ত্বেও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং মোক্ষের উপর ভর করে সশরীরে স্বর্গে যেতে পেরেছিল, সেখানে অর্জুন সারা জীবনের সন্ধিতে জ্ঞান বিদ্যা অহংকার সমস্ত কিছুই হারিয়েছে। তাই বাস্তবিক অর্থে জীবনের মানে কী? এই প্রশ্নের গভীর উত্তর অর্জুনের থেকে আমরা পাই না। তাই *কালসন্ধ্যা* নাটকের শেষ অংশে যখন অর্জুনের সঙ্গে

অনাকাক্ষিত উপরিউক্ত বিষয়গুলি ঘটে গেল, তখন ব্যাসদেবের কাছে অর্জুন এগুলির কারণ জানতে চাইলে ব্যাস জানায় গভীরতম সেই সত্য কথাটি:

ভূমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো

অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ।

শেখো:

অনাচার, সদাচার, ধর্মাধর্ম, সব আপাতিক।

যা- কিছু সময়োচিত, তা-ই যথাযথ।

শেখো:

অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,

সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।

শেখো:

কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,

যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,

আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,^{৪৫}

বুদ্ধদেব বসু'র মহাভারতকেন্দ্রিক শেষ নাটক হল *সংক্রান্তি*। নাটকটি শারদীয় দেশ পত্রিকায় ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থ আকারে সম্ভবত ১৯৭৩ সালে প্রকাশ পায়। দীর্ঘ আঠারো দিন ধরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলেছে। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ থেকে শুরু করে জয়দ্রথ, অভিমন্যু এবং অসংখ্য সাধারণ সৈনিক ইতিমধ্যে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। দুঃশাসন থেকে শুরু করে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর পুত্র দুর্যোধন বাদে সমস্ত পুত্রই মারা গেছে এই যুদ্ধে। এমনই পরিস্থিতিতে হস্তিনাপুর সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের শেষ ধারা বিবরণী শুনছে। সম্রাট বিভিন্ন আত্মজিজ্ঞাসা ও সমালোচনার মাধ্যমে বুঝে নিতে চাইছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কি আদৌ ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধ? কৃষ্ণ কি অন্যায়াভাবে প্রত্যেকজন কৌরব সেনাপতিদের যুদ্ধে পরাজিত করেনি? এরকম নানা প্রশ্নে ও ভাবনায় ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সঙ্গে কথোপকথন এগিয়েছে, এরই মাঝে গান্ধারীর মঞ্চ আবির্ভাব ঘটেছে এবং বুদ্ধদেবের গান্ধারী নানাভাবে চেষ্টা করে গেছে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ সন্তান প্রেম থেকে তাকে বাস্তবিক ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে। কিন্তু গান্ধারী তার পতিকে ধর্মের স্বরূপ বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়ও নানাভাবে ধর্মের পথে ন্যায়ের কথা বলেও ব্যর্থ হয়েছে। তবে *সংক্রান্তি* নাটকে গান্ধারী মুক্তদৃষ্টি, তার চোখ নাটকে অনাবৃত। বুদ্ধদেব হয়তো গান্ধারীর এরকম একটি রূপের মাধ্যমে পৌরাণিক প্রথাকে সরাসরি অস্বীকার করলেন। তবে বুদ্ধদেবের অন্যান্য কাব্যনাটকগুলির থেকে এখানেই জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য এবং ন্যায় ও অন্যায় নিয়ে গভীর দার্শনিক অন্বেষণ করা হয়েছে। ভাবনার এই জায়গা থেকে দেখলে *সংক্রান্তি*-র ভাবগত সত্তা মূল মহাভারতের তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে অনেক বেশি

সম্পূর্ণ। এই আধ্যাত্মিকতা দুর্যোধনের মৃত্যুতে এসে মূলত একটি প্রমায় পরিণতি পেয়েছে, যা ছিল মহাভারতীয় মিথের অনুষঙ্গে নিতান্ত গৌণ একটি উপলক্ষ। এদিক থেকে দেখলে *সংক্রান্তি* নাটকটি গভীর এক দার্শনিকতা থাকা সত্ত্বেও মহাভারতের মৌলিক প্রবণতা থেকে অনেকটা সরেও গেছে।

সংক্রান্তি কাব্যনাটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের হাহাকার ও বুকফাটা বিলাপ। অন্ধ পুত্রপ্রেম ধৃতরাষ্ট্রের ছিলই, কিন্তু একসঙ্গে এত পুত্রের একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা কোনওভাবেই একজন পিতা মেনে নিতে পারছে না। তাই বুদ্ধদেবে'র ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে যে হাহাকার ও বেদনা এবং যন্ত্রনা ফুটে উঠেছে, তা অসাধারণ। মুগ্ধ হতে হয় বুদ্ধদেবে'র কাব্যিক সংলাপগুলির জন্য।

অস্থির নিদ্রার পরে গাঢ়তর ক্লান্ত
আমি শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছি তোমার কাছে,
হে সূর্য, ধর্মের প্রতিভূ, পৃথিবীর প্রতিপালক,
তোমার অনন্ত দানসত্র থেকে একমুঠো তাপের জন্য প্রার্থী—
আশা নয়, শান্তি নয়, সান্ত্বনা নয়—
শুধু একমুঠো জৈব উত্তাপ, দেবতার স্পর্শ,
যার কিছু নেই, সেই বৃদ্ধেরও যা প্রাপণীয়।

... ..

আজ সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার।
আমি ছিলাম ভরতবংশীয় রাজা, রাজপিতা,
জঠরাগ্নিতে অগ্নের মতো জীর্ণ সেই রাজত্ব আজ,
এমনকি আমার পিতৃত্ব
একটিমাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান।

... ..

বসুন্ধরা, মাতা পৃথিবী, শাস্ত্রী,
লক্ষ যুগ ধরে ধর্ষিত হ'য়েও নিত্যযৌবনা,
মানুষের পাপে নিষ্পিষ্ট হ'য়েও স্বাস্থ্যবতী,
লোভে, কামে বিক্ষত হ'য়েও বরদাত্রী—
আজ, এক ভীষণ দিনের প্রত্যয়ে
তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই, দেবী,
তোমার অফুরান ভাণ্ডার থেকে ভিক্ষা দাও আমারে
একবিন্দু ক্ষমা, কণামাত্র ধৈর্য,
যাতে বিনা আক্ষেপে সহ্য করতে পারি
আমার অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট এই জীবন—

বুদ্ধদেব বসু'র মহাভারতকেন্দ্রিক অন্য একটি বিখ্যাত নাটক হল *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*। যা গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে *দেশ* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। প্রকাশ পাওয়ার পরেই বিভিন্ন বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে এই নাটকটি। পূর্ণাঙ্গ, অভিনয়যোগ্য ও শিল্পমূল্যে উজ্জ্বল এই নাটকের পৌরাণিক পাত্র পাত্রীর মধ্যে তিনি সঞ্চারণ করেছেন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব ও বেদনা এবং রোমান্টিক আবেগ। লোকে যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিজস্ব হলো— *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* নাটকের মূল বিষয় এটাই। কেমন করে, কোন কোন স্তর পেরিয়ে, কত বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নায়ক নায়িকার এই উদ্বর্তন ঘটল, তা উদঘাটিত হয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নিপুণ নাটকীয় কৌশলে, গম্ভীর সজীব শাণিত কাব্যধর্মী মনোমুগ্ধকর ভাষায়। এর কাহিনি রামায়ণ ও জাতকের পাশাপাশি মহাভারতের বনপর্বেও আছে।

বিভাণ্ডক মুনি তার পুত্রকে নিয়ে বনে বাস করত। অনাবৃষ্টির ফলে খরায় শুষ্ক দেশে যজ্ঞ করার জন্য বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বেশ কিছু গণিকার সাহায্যে নিয়ে আসা হল। মুনি এসে যজ্ঞ করার ফলে বৃষ্টি হয়। রাজার রাজত্বে সবাই সংকট থেকে মুক্তি পায়, রাজাও খুশি হয়ে রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে মুনির বিয়ে দিয়ে তাকে অঙ্গদেশে রাখতে চাইল। কিন্তু স্ত্রী শান্তাকে সঙ্গে নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ফিরে গেলো পিতা বিভাণ্ডক মুনির কাছে। এই নাটকের মধ্যে এমন কিছু মিথ আছে যার সঙ্গে জাপান দেশীয় প্রাচীন মিথ এবং *গিলগামেশের* মূলখণ্ডের সঙ্গে অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গ অভিষেকস্থ হরিণীরূপী দেবীর পুত্র যে বিভাণ্ডকের সঙ্গে আশ্রমেই বড়ো হয়েছিল। ঋষ্যশৃঙ্গকে অরণ্য থেকে নগরে আনার জন্য রাজা লোমপাদ বারাজ্ঞাদের নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে এসে বারাজ্ঞা তরঙ্গিনীর যে ভাবান্তর ঘটে সেটি নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। নাটককার এখানে শান্তার সঙ্গে অংশুমানের প্রেম কাহিনি দেখিয়েছেন। যদিও এমন ঘটনা পুরাণে ও মহাভারতে কোথাও থাকেনি। ঋষির সব ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং বারাজ্ঞা তরঙ্গিনীর গৃহ পরিত্যাগ, শান্তার কৌমার্য ফিরে পাওয়া ও অংশুমানের সঙ্গে বিবাহ, আবার চন্দ্রকেতু তরঙ্গিনীর মাতা লোলাপাঙ্গীর সঙ্গী হওয়ার মধ্যে দিয়ে নবজীবনগুলিকে গেঁথে দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু।

এই যে তরঙ্গিনী এবং ঋষ্যশৃঙ্গের শেষে নিরাসক্তিময় জীবনে যাত্রা— মহাভারতে এইটি খুব বড়ো কথা। পূর্বেও আমরা একথা বারবার বলেছি। প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর আবার আসক্তিহীন, স্বাধীন জীবনে প্রবেশের উদাহরণ মহাভারত অনেকবার দিয়েছে। এভাবেই জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের অর্থ সম্পর্কে বারবার মহাভারত আমাদের কাছে এক অর্থ তৈরি করে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’ কবিতায় পৌরাণিক এই মিথের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনা দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে তরঙ্গিনীর জন্মান্তর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, সেখানে বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী উভয়েরই নতুন জন্মের বিষয়ে বলেছেন। এই যে কাম থেকে প্রেমে উত্তরণ এবং আত্মদর্শনের জন্য দু’জনেরই নিষ্কমণ—এটি যেমন নাটকটির ক্ষেত্রে বড়ো ঘটনা, ঠিক তেমনই মহাভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কথার মধ্যে এটিও একটি।

ঋষ্যশৃঙ্গ—হয়তো আমার সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। অগ্নিহোত্রে আর প্রয়োজন হবে না। মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়— আমাকে হ’তে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।^{৪৭}

ঋষ্যশৃঙ্গ— কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিনী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ’য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ’য়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন ক’রে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধান তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিনী।^{৪৮}

৩.৩।।গ। মনোজ মিত্র

(অশ্বখামা, তক্ষক, যা নেই ভারতে)

সমকালীন বাংলা নাটকের সাংস্কৃতিক জগতে নাট্যকার ও নাটককার মনোজ মিত্র অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। নাটক রচনা করা এবং তার পাশাপাশি অভিনয়েও যথেষ্টই বিখ্যাত মনোজ মিত্র। বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় জন্ম, শিক্ষা লাভ করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শনের অধ্যাপনা দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করলেও অবসরের পূর্বে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের ‘শিশির কুমার ভাদুড়ি প্রফেসর’ হয়েছিলেন। বাংলা নাটকের জগতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মঞ্চ সফল নাটকের রচয়িতা তিনি। *মৃত্যুর চোখে জল* নামক নাটকের মাধ্যমে নাটক রচনার কাজ শুরু করলেও *চাঁক ভাঙা মধু* নাটকের মাধ্যমে নাট্যপ্রেমীদের কাছে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পৌরাণিক নাটক থেকে শুরু করে ইতিহাস আশ্রিত সামাজিক নাটক, পারিবারিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক এবং রহস্যকেন্দ্রিক একাধিক নাটক লিখেছেন। শুরুতে সিরিয়াস বা গুরুগম্ভীর বিষয়কেন্দ্রিক নাটক লিখলেও পরবর্তীতে হাস্যরসাত্মক বা কমেডিধর্মী নাটকের দিকে তিনি চলে গেছেন। তাঁর বেশ কিছু নাটকের মধ্যে অন্যতম হল— *অশ্বখামা*, *তক্ষক*, *যা নেই ভারতে*, *শিবের অসাধি*, *নরক গুলজার*, *পুঁটি রামায়ণ*, *ভেলায় ভাসে সীতা*, *হনুমতী পালা* বা *মন্দোদরী হরণ*, *সাজানো বাগান*, *রাজদর্শন*, *নৈশভোজ*, *আত্মগোপন*,

আমি মদন বলছি, মদনের পঞ্চকাণ্ড, কাকচরিত্র, প্রভাত ফিরে এসো, বৃষ্টির ছায়া ছবি, পরবাস, দম্পতি, কেনারাম বেচারাম, শোভাযাত্রা, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, টাপুর টুপুর, সত্যি ভূতের গল্পো, দর্পণে শরৎশশী, কিনু কাহারের খেটোর ইত্যাদি।

যাই হোক, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি। মনোজ মিত্রে'র অন্যান্য নাটক নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। বাঙালির মহাভারত চর্চা নাটক বা যাত্রাপালায় কীভাবে বিকশিত হয়েছে বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটাই খুঁজে দেখা আমাদের কাজ। এরই সূত্রে নাট্যকার ও নাটককার মিত্রে'র বিখ্যাত গ্রন্থ *রামায়ণী মহাভারতী*-র কথা বলতেই হয়। ২০০৯ এর এপ্রিলে দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত এই বইতে মহাভারতকেন্দ্রিক তিনটি নাটক মনোজ মিত্রে'র রয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিতে এই নাটকগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র নিলেও মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে সমকালীনতাকে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এই তিনটি নাটকের মধ্যে *অশ্বখামা* লেখা হয় ১৯৬৩ সালে, নাটকটির প্রথম প্রকাশ বহুরূপী শারদীয় সংখ্যায়। তক্ষক নাটকটি লেখা হয় ১৯৬৭ সালে এবং *যা নেই ভারতে* রচিত হয় ২০০৫ সালে। *যা নেই ভারতে* নাটকটি ১৪ই আগস্ট ২০০৭ সালে কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-তে প্রথম অভিনীত হওয়ার পর প্রবল জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভেসে যায়। এর ফলে দীর্ঘ ৭-৮ বছর সেইটি কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে একাধিকবার প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে পৌরাণিক নাটক রচনা এবং অভিনয়ের একপ্রকার স্বর্ণযুগ ছিল। ভারতের প্রাচীন উপাখ্যান, মহাকাব্য, প্রাচীন ধর্মীয় আখ্যান, প্রাচীন কোনও লোককথা থেকে আঠারোটি ভারতীয় পুরাণ এগুলিকে কেন্দ্র করেই আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি লিখিত হয়েছে। ঘটনা, উপাদান ও চরিত্র প্রধানত ভারতীয় পুরাণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বাঙালি চরিত্রের ভক্তিভাব ও অলৌকিকতা এবং দৈবি ঘটনার প্রতি শ্রদ্ধাই তাকে পৌরাণিক নাটকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রেখেছিল। মহাকাব্য ও পুরাণের অনেক আখ্যানকেই নাটকে রূপান্তরের বেশ কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও নাটকের দুনিয়াতে এটি রমরমিয়ে এগিয়ে চলার জন্য কিছু কারণ আছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক* গ্রন্থে বলেছেন:

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই যদিও বাংলা দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙালী তার পুরাণকে কখনই ত্যাগ করে নি। কৃষ্ণিবাস-কাশীরাম দাসের রচনা উনবিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ বলা চলে।^{৪৯}

ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য এবং মহাভারত কেন্দ্রিক যে নাটকের ধারা বাঙালিকে তার অমূল্য সাহিত্যের সম্পদ উপহার দিয়েছে, তার প্রকৃত সার্থক রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মহাভারতকেন্দ্রিক অনেক নাটকই তিনি বাঙালিকে উপহার দিয়েছেন, যা পরে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব। তবে এর পাশাপাশি তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, রাজকৃষ্ণ রায়, ডি এল রায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখদের মতো একগুচ্ছ নাটককার বাংলা সাহিত্যে পুরাণ এবং মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকের জোয়ার এনেছিলেন। বাঙালির পুরাণ এবং মহাভারত চর্চা দীর্ঘদিনের আগ্রহের বিষয়। তাই পুরাণ ও মহাভারতের কাহিনি ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা বা অভিনয় হলে বাঙালি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে সেইটি বুঝতে চায়। তাই আধুনিক কালেও অনেক নাটককারই সামাজিক সত্য উপস্থাপনে পুরাণ নির্ভর বা মহাভারতকেন্দ্রিক নাটক রচনা করে থাকেন, ভাবনার এই স্তর থেকেই মনোজ মিত্রকেও আমরা এইভাবে পড়তে পারি। কারণ মহাভারতের চরিত্র ও উপাদান সংগ্রহ করে নাটক রচনা করলেও তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন সমকালের সংকট ও দ্বন্দ্ব। যা আধুনিক যুগের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে চমৎকার একটি কথা বলেছেন।

এগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, এদের বলা চলে ‘পুরাণ নির্ভর নাটক’। সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসারী পৌরাণিক নাটক রচনা আর সম্ভব নয়। পুরাণের পরিচ্ছদে সমকালই সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়, যেমন পাচ্ছে *লোহার ভীম*, *কুরুক্ষেত্র*, *মারীচ সংবাদ*, *নরক গুলজার*, *শিবের অসাধি* ইত্যাদি নাটকে। উত্তরকালেও এমনই ভাবে আরো অসংখ্য পুরাণ নির্ভর নাটক লেখা হতে পারে যার নায়ক-নায়িকা হয় অভিমন্যু, নয় মেঘনাদ কিংবা সীতা— অবশ্যই তাঁদের জীবন সমস্যার সঙ্গে ভবিষ্যতের মানুষের সমস্যা মিলবেই। এইভাবেই জন্ম নেবে নতুন পৌরাণিক নাট্যধারা।^{৫০}

নাটককার ও নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটক রচনার শিকড় বঙ্গদেশের মাটিতেই প্রোথিত রয়েছে। তাঁর বেশিরভাগ নাটকই একাধিক সামাজিক বার্তা ও রাজনৈতিক ভাষ্য বহন করে আনে। স্বদেশীয় সংস্কৃতির মোড়কে অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে চেয়েছেন মনোজ মিত্র। *অশ্বখামা* নাটকটির কাহিনি উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব থেকে। নাটকটি যখন শুরু হয়েছে সেই সময়ের কাহিনিটি একটু বলা দরকার। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে দুর্যোধন। যে আশা নিয়ে মহাযুদ্ধে এগিয়েছিল যুবরাজ দুর্যোধন, সেই আশা হতাশা ও নিরাশায় নেমে এসেছে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পরাজিত নায়কের মতো একাকী মৃত্যুর দেখা পাবার জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক এমনই সময় অশ্বখামা ও কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য মৃত্যুপথযাত্রী যুবরাজ দুর্যোধনের পতিত দেহের সম্মুখীন হলে অশ্বখামা সমস্ত সত্য জানতে পারে এবং পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যার বিষয়ে

দুর্যোধনকে কথা দেয়। এরপর কৃপাচার্যের বারণ সত্ত্বেও অশ্বথামা নিজ প্রতিজ্ঞা বজায় রাখার জন্য পাণ্ডবদের হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের শিবিরে যাত্রা করে। মহাদেবের স্তবে দেবাদিদেব প্রীত হলে অশ্বথামা শিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদী'র পঞ্চপুত্রকে পঞ্চপাণ্ডব ভেবে হত্যা করে। সর্বশেষে তারা দুর্যোধনের কাছে এসে দেখে নির্বংশ হবার শোকে হস্তিনাপুরের যুবরাজ ইতিমধ্যে দেহত্যাগ করেছে। মহাভারতের এই কাহিনি সামান্য রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে মনোজ মিত্র তাঁর *অশ্বথামা* নাটকটি রচনা করেছেন।

অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও চমৎকার এই নাটকের বিষয়বস্তু। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আত্ম জিজ্ঞাসার ও প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে এই নাটকটি। আধুনিক নাটকের কারণেই পাণ্ডব শিবিরের রক্ষক মহাদেব এবং মহাদেবের সঙ্গে অশ্বথামার সাক্ষাতের বিষয়টি নাটককার মিত্র এড়িয়ে গেছেন। এর পাশাপাশি পাণ্ডব শিবিরের অসতর্কতার কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন শোকরজনী পালনকে। মহাকাব্যের বর্ণনামূলক অংশকে তিনি করে নিয়েছেন দ্বন্দ্বমূলক নাটকের উপযোগী হিসেবে। ব্যাসদেবের মহাভারতের এই জায়গায় দ্বন্দ্ব ও সংকট আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু নাটককার মিত্রের নাটকে আমরা ভিন্ন বিষয়কে দেখতে পাই। মহাভারতের কৃপাচার্য অশ্বথামার সেনা অধিনায়কত্বে কোনও বিরোধিতা করেনি। কৃতবর্মার সঙ্গে অভিষেক গ্রহণের সময় সেও পাশেই ছিল। কিন্তু পাণ্ডব ও কৌরবদের অজ্ঞগুরু কৃপাচার্যের অন্য ভাবনার কথা ব্যাসদেবের মহাভারতে ছিল। ঘুমন্ত পাণ্ডবদের হত্যার পরিকল্পনায় কৃপাচার্য এইখানে বাধা দিয়েছে, অন্যায়ের প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়েছে। ভাবনার এই স্থান থেকে মনোজ মিত্র তাঁর নাটকের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। তাই এই নাটকে কৃপাচার্য আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে আধুনিক শাসকের যুদ্ধবাসনার বিপ্রতীপে একজন ব্রাহ্মণ হিসেবে। তাই কৃপাচার্য একাধিকবার নাটকে অশ্বথামার হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। কৃপাচার্য অশ্বথামাকে নাটকে বলেছে পাণ্ডবদের কাছে সমস্ত অন্যায় স্বীকার করে মার্জনা চাওয়ার কথা বা এই সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে কোনও গভীর অরণ্যে কুটির নির্মাণ করে জীবন অতিবাহিত করার কথা। সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা থেকে গভীর লালসার জন্ম হয়, সেই লোভই মানুষকে অধর্মের পথে পরিচালিত করে। আমাদের উচিত ধর্মকে জানা এবং ধর্মের চর্চা করা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অনুভবটি আমাদের কাছে। কারণ যুধিষ্ঠির সারা মহাভারত জুড়ে ধর্মকে যেমন ভাবে দেখেছেন এবং দেখতে চেয়েছেন তার অনেকটা অংশই আচার্য কৃপাচার্য তাঁর বক্তব্য দ্বারা অশ্বথামাকে বোঝাতে চেয়েছে। অশ্বথামাও মাতুল আচার্যের কথা প্রাথমিকভাবে কিছুটা বুঝেছিল, তার মধ্যেও যথার্থ বোধ ও চেতনা গড়েও উঠেছিল। কিন্তু অশ্বথামার মধ্যে লক্ষ্যহীনতা বা দিকভ্রান্তি প্রবলভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি। নাটককার মনোজ মিত্রের এই প্রসঙ্গে কিছু উক্তি তুলে ধরেছি:

কৃপ- আমি যে একজন অন্নদাস শাস্ত্রজীবী। কোন দিন নিঃসংশয়ে প্রতিবাদ করতে পারিনি।
নীরবে গুমরে গুমরে যা বলে করে যাই। (অল্পক্ষণ থেমে থাকে) তখন ভরা শ্রাবণের ঝরঝর
বর্ষণ চলেছে! মূর্খ! মূর্খ ছিলাম! বুঝিনি রাজার উদ্দেশ্য কখনো এমন জলের মতো
স্বচ্ছ নয়। বুঝিনি রাজা ধীরে ধীরে তার শক্তি সংগঠিত করছে! সব দিয়ে সর্বস্ব কিনে নিচ্ছে।
বুঝিনি একদিন তোমাকে আমাকে তোমার পিতাকে হাতে অস্ত্র দিয়ে তার হয়ে লড়তে হবে!

অশ্ব-আমি তোমায় আর কোন রাজদ্বারে ভিক্ষা করতে দেব না। কৌরব কিংবা পাণ্ডব, যেই
হোক!

কৃপ- পুত্র!

অশ্ব- অন্ন হোক জীবন হোক..... দুয়ার হতে দুয়ারে অধিক সুখ খুঁজে কী হবে! এসো আমরা
স্বাধীনভাবে বাঁচি!

কৃপ- (অভিভূত) অশ্বখামা!

অশ্ব- স্বাধীনতা! তার চেয়ে বড় সুখ বড় নিরাপত্তা আর কীসে! পিতা, আমরা এই প্রান্তরে বাস
করবো!

কৃপ- এই প্রান্তরে?

অশ্ব- এই নির্জন উষর প্রান্তরে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে। ওরা জানতেও পারবে না,
আমরা কোথায় আছি। আদৌ বেঁচে আছি কিনা.....

কৃপ- এখানে কি বসবাস সম্ভব?

অশ্ব- কেন কেন কেন? আমার সঙ্গে শিলাখণ্ডে শয়ন করতে পারবে না তুমি!

কৃপ- না হয় হলো! কিন্তু সামনে বর্ষাকাল—

অশ্ব- ভেবো না, ভেবো না। আবার শ্রাবণ নামার আগে গুল্মালতায় কুটীর বেঁধে ফেলবো। একটা
ছোট্ট পাতার ঘর.....

কৃপ- তারপর? দুরন্ত শীতে?

অশ্ব- আগুন জ্বালব শুষ্ক কদম্বের মূলে!

কৃপ- আহার তৃষ্ণা?

অশ্ব- শৈলচূড়া থেকে এনে দেব দ্রাক্ষাফল! বনে বনে শিকার করব কচি হরিণ, বৃদ্ধ সজারু.....

কৃপ- এ বিলাসহীন জীবন তো তোমার নয় বৎস। কীবা বয়স তোমার। এ জীবন বনচারী সন্ন্যাসীর। আমি কাটাতে পারি। তোমার কতো ভোগতৃষ্ণা-

অশ্ব- কিছু নেই- আজ আমার কিছু নেই। ভোগতৃষ্ণা কিছু না। ঐ নীল শৈলপারে চাঁদ উঠলে আমার কুটীরের দ্বারে তোমার পায়ের কাছে বসে শুনব পিতা, ভুলোক দুলোক নভোমণ্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা!^{৫১}

আবার অশ্বখামার এই সংলাপগুলি থেকে তার যে চিত্র নাটকে ফুটে ওঠে, এর পরের অংশতেই সম্পূর্ণ বিপরীত অশ্বখামাকে আমরা আবিষ্কার করি। সেখানে দেখব এই নির্জনতাপ্রিয় ও নির্মোহ অশ্বখামা রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। মনোজ মিত্রে'র এরকম সংলাপ থেকে সহজেই বুঝতে পারি অশ্বখামার প্রতি মাতুল কৃপাচার্যের এক ধরনের ভালোবাসা ও স্নেহ ছিলই। কিন্তু এইসব স্নেহ ও প্রেম রাষ্ট্র শক্তির কোপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। পাণ্ডবদের হত্যার জন্য অশ্বখামার যে যাত্রা সেখানেও অশ্বখামার অভিষেকের জন্য কৃপাচার্যকে মূল ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। প্রজা কল্যাণকামী ব্রাহ্মণ হিসাবে কৃপাচার্য আজীবন কৌরবদের ও দুর্যোধনের রক্ষাকর্তা হিসাবে থেকেছে। কিন্তু নাটকে কৃপাচার্যের মধ্যে দিয়ে আমরাও বুঝতে পারি যে রাজার অন্ত সত্যিই গুরুপাক, যার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার প্রভাব স্বাধীন মানুষের গলা টিপে ধরে এবং যথার্থ স্বাধীনতায় যা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। যার চোখ দিয়ে আমরা সুস্থ-সবল মানব জীবনকে দেখতে পাই, শাসকের ইচ্ছার প্রভাবে তারই ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়ে ওঠে। আবার নাটকে কৃপাচার্যের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেয়েছি রাষ্ট্রের পালিত ও প্রেরিত ঘাতকও শেষ পর্যন্ত মহান ধর্মকে একেবারে অবলুপ্ত করতে পারে না।

অন্যদিকে কৃতবর্মা কিন্তু মহাভারতে খুব একটা কথা বলেনি। কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতার ফল হিসাবে সে কৌরব শিবিরে যোগদান করে। মহাভারতের ভারত যুদ্ধে কৃতবর্মা শেষপর্যন্ত একজন প্রতিনায়ক হিসাবেই রয়ে গেছে। কিন্তু নাটককার মিত্রে'র নাটকে রাষ্ট্রের আদেশ ও অশ্বখামাকে আশু কর্তব্যগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কৃতবর্মার মাধ্যমেই। অশ্বখামাকে নিয়ে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার টানাপোড়েনই শেষ পর্যন্ত নাটকটিকে উপযুক্ত করে তুলেছে। রাজার প্রতি আনুগত্য এবং রাজ ক্ষমতার আশ্বাদনই কৃতবর্মা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাণ্ডবদের নিধনে যে তার ভূমিকা থাকছে, এটা ভেবেই কৃতবর্মা আনন্দিত হয়েছে। অশ্বখামা যতবার হতাশায় ডুবে গেছে বা শোকে ভেঙে পড়েছে, ততবারই কৃতবর্মা তাকে যুদ্ধের উন্মাদনায় উৎসাহিত করেছে।

অশ্বখামার মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয়েছে ধ্বংসের উদ্দীপনা। কৃপাচার্য ও অশ্বখামার দুর্দিনে দুর্যোধন নানাভাবে সাহায্য করেছে, তাই এখনই উপযুক্ত সময় সেই দানকে প্রতিদান হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়ার— দুর্যোধনের অনুপস্থিতিতে এই কথাটি বারবার কৃতবর্মা উভয়কে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রাষ্ট্রশক্তি নিজের প্রতিকূলতার সময়ে এভাবেই বারবার সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষদের প্রতিদানের স্বরূপটি মনে করিয়ে দেয়। তাই কৃতবর্মার মতো মানুষ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তাদের মতোই যারা সবকিছুকেই বিচার করে স্বার্থের মাপকাঠিতে। কৃপাচার্যের চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কৃতবর্মা জেনে নিয়েছে পাণ্ডব শিবিরের অসতর্কতার বিষয়টি এবং অশ্বখামাকে বারে বারে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করেছে।

ব্যাসের মহাভারতে অশ্বখামাকে নিয়ে সেরকম সংকট বা জটিলতা উঠে আসেনি। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটকে প্রথম থেকেই অশ্বখামা একাধিক দ্বন্দ্ব ও মানসিক বিভ্রান্তিতে জর্জরিত। এই মানসিক যন্ত্রণা ও বেদনা এবং বিভ্রান্তিই শেষ পর্যন্ত চরিত্রটিকে ট্রাজিক করে তুলেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অশ্বখামা যখন সেনাপতির দায়িত্বে আসে তখন পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, শল্য নিহত হয়েছে। লাখ লাখ সৈন্য ও সাধারণ মানুষ যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু পাণ্ডবরা এখনও বেঁচে রয়েছে। যাদেরকে পরাজিত করার জন্য এই যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে সেই লক্ষ্য এখনও অধরাই থেকে গেছে। এই বেদনার গ্লানি ও কষ্টের হাহাকার অশ্বখামাকে নাটকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তাই নাটকে অশ্বখামার মুখ থেকে শুনি যে শুরুতে তাকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলে ফলাফল অন্য হতে পারত। কিন্তু এখন আর সেই সময় নেই, রাত্রির এই অন্ধকার প্রহরেই সে পাণ্ডবদের হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু অশ্বখামার দ্বন্দ্ব প্রকট রূপে প্রকাশিত হয়েছে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের জন্যই। এদের একজন যখন অশ্বখামাকে মহাযুদ্ধের দিকে ও প্রতিশোধের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে, তখনই অন্যজন দ্রোণ পুত্রকে নির্জন অরণ্যে শাস্ত্র চর্চা এবং ধর্মের জ্ঞানের রাস্তা দেখিয়েছে। এই জটিলতাই তাকে আধুনিক জীবনের সংক্ষুব্ধ চরিত্র করে তুলেছে। যার ফলেই সে ভেবেছে মামাকে নিয়ে গভীর অরণ্যে চলে যাওয়ার কথা, অত্যন্ত শীতে কদম গাছের নিচে আগুন জ্বালাবার প্রসঙ্গ, অরণ্য থেকে বৃদ্ধ সজারু ও কচি হরিণ শিকারের কথা এসেছে এবং শৈলচূড়া থেকে ফলের আসার প্রসঙ্গও এসেছে ইত্যাদি। এরই পাশাপাশি রাজ কর্তব্য স্মরণ ও প্রতিশোধস্পৃহায় পাণ্ডবদের হত্যার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে বটে। রাষ্ট্রের জটিলতা ও শৃঙ্খলা কোনওভাবেই অশ্বখামাকে শেষ পর্যন্ত পালাতে দেয় না। ইতিমধ্যে কৃতবর্মা কৃপাচার্যের থেকে পাণ্ডব শিবিরের নিশীথ রহস্য জানতে পারে এবং অশ্বখামাকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোতে নির্দেশ করে। পাণ্ডব শিবিরের হত্যাযজ্ঞ লীলার পরিসমাপ্তি ঘটলে অশ্বখামা বিজয়ের ভঙ্গিতে ও আত্ম সন্তুষ্টির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু, হত্যার পরেও কৃপাচার্য বেশ কিছু প্রশ্ন

অশ্বখামার কাছে রাখে। যে ভাবনা ও প্রশ্নগুলি অশ্বখামাকে আরও একবার গভীর সংকটে ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলি মনোজ মিত্রে'র মহাভারত চর্চার অন্যতম সম্পদ হয়ে রয়েছে।

কৃপাচার্যের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে ধর্মরাজ্য স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পাপ নয় একেবারেই। পাণ্ডবরা বস্তুতপক্ষে তারই পিতা দ্রোণের অধীনে অস্ত্রশিক্ষা নেওয়া শিষ্য এবং শৈশব থেকেই সেই কারণে উভয়ের মাঝে শত্রুতা থাকা ঠিক নয়। সম্পূর্ণ ভুল ও পাপের কাজে অশ্বখামা এগিয়েছে। কৃপাচার্যের কথায় সে বুঝতে পারে যাদেরকে শত্রু হিসাবে এতোকাল ভেবে এসেছে, তারাই এখন আপনজন হিসাবে মনের মণিকোঠায় ভেসে আসছে। তাহলে কি ভুল পথে চালিত করে রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য অশ্বখামার মাধ্যমে সম্পূর্ণ করল? এই সমস্ত ভাবনা ও প্রশ্নে অশ্বখামার অন্তর ব্যাকুল ও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এরফলে নাটককার মনোজ মিত্রে'র অশ্বখামা বলে ওঠে নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তি:

(গভীর ক্লান্তিতে) মহারাজ, এই চৈত্র নিশীথ আমার মর্মে মর্মে কী দাহ ছড়ায়! কী ঘোর চতুর্দশী নিশি... প্রবল বায়ু... মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করো... আমি বড় একা! (থেমে) একটা পাহাড়, কয়েকটা নদী, গুরু প্রান্তর— কী দুর্গম অন্তহীন পথ অতিক্রম করে এসেছি...দুচোখে তপ্ত বালুকা... দাও মহারাজ, আলিঙ্গন দাও... মহারাজ, তুমি আমাকে ঘিরে থাকো। দূর করো যতো লজ্জা সংশয় ভয়... শক্তি দাও!^{৫২}

কে, কে বলে রে পাপ... কে বলে রে গুণঘাতক আমি... নীতিহীন অববেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই... দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই— তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ শ্মশান শকুনি! এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী! ওরে কোথা হতে আসে নীতি... কোথায় বাস করে পুণ্য? (থেমে) মহারাজ, বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয়— সৃজন! এই মুহূর্তে একটা বৃহৎ সৃজনের বাসনা আমায় অস্থির করে তুলেছে। বলো মহারাজ এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব। তাকে লালন করব। অনাবৃত ধরিত্রীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে ...

অশ্বখামার মুখখানি পবিত্র দেখায়।

(পেটিকার চেয়ে দিকে চেয়ে) যাও বন্ধুগণ, যাও আমার স্বজন আমার প্রিয় পাণ্ডব, যাও মন্দার মালিকায় ভূষিত হয়ে স্বর্গের অক্ষয় অমরতা লাভ করো। আমরা রইলাম এই ভাঙাচোরা পৃথিবীতে— বলিষ্ঠ সমাজ... মানব সমাজ গড়তে। তোমাদের স্বপ্ন সার্থক করতে। যাও বন্ধুগণ...^{৫৩}

কিন্তু, অশ্বখামার আবার ভুল হয়। পাণ্ডবদের মাথাগুলির পরিবর্তে সে খুঁজে পায় পাণ্ডব সন্তানদের মাথা। এই চরম অপরাধে ও গ্লানিতে নাটকের অশ্বখামা বলে ওঠে:

(ক্রমাগত দুর্বোধ্য চিৎকারে) ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি... কাদের মারতে কাদের মেরেছি!! অন্ধ! অন্ধ! আমি ভীষণ অন্ধ! ৫৪

মনোজ মিত্রে'র নাটকে খুব স্পষ্টভাবেই একটি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া থাকে। তাঁর অনেক নাটকেই এই বিষয়টি আমরা খেয়াল করি। নাটককারের রাজনৈতিক অবস্থান এই নাটকেও একেবারেই স্পষ্ট। আমরা সহজেই তাই *অশ্বখামা* নাটকটি পড়তে পড়তে বিগত সাতের দশকের উত্তাল বঙ্গদেশীয় রাজনৈতিক ছায়া দেখতে পাই। মহাভারতের অশ্বখামার মধ্যে নকশাল আন্দোলনে উত্তাল বঙ্গদেশীয় যুবকের ভাবনার মিল পাই। শ্রেণিশত্রু ধ্বংসের নামে মানুষ হত্যার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দিন বদলের স্বপ্ন দেখা একদল যুবকের এই ভ্রান্ত রাজনৈতিক পথ আদৌ যেমন সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, ঠিক তেমনি নাটকে অশ্বখামাও কর্তব্য বনাম অকর্তব্য সম্পর্কে ক্রমাগত মানসিক দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত ভুগেছে। মহাভারতের অশ্বখামাকে আমরা এই রূপে দেখি না। তার প্রতিটি পদক্ষেপেই গভীর ভাবনা ছিল। দ্রৌপদী পুত্রদের হত্যার সিদ্ধান্তও সেখানে তারই থেকেছে, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য মূল মহাভারতে শুধুমাত্র অশ্বখামার সহায়ক ছিল। শাসক শ্রেণির তথা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি সমস্ত কালেই একই ধরনের থাকে। এই যে ভালো-মন্দের বোধ লুপ্ত হয়ে যাওয়া অশ্বখামাকে আমরা নাটকে দেখি, রাষ্ট্রের বিকৃত বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য তার যৌবনকে কাজে লাগিয়েছে শাসক শ্রেণি এবং রাষ্ট্রের বিকৃত কামনার ফলে সে হয়ে উঠেছে 'নরঘাতী'। যে যৌবনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটা সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ সম্ভবপর ছিল, সেখানে পাপী ও অবিবেচকের মতো শাসকের বুদ্ধিতে প্ররোচিত হয়ে নিজের স্বজনদেরই সে হত্যা করেছে।

ক্রমাগত ভুল করে যাওয়া যুবক শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হতে চায়। যে যৌবন আদর্শের প্রতি অনুগত ছিল, এখন সেই আদর্শের মধ্যেই সে খুঁজে পায় স্বার্থের ভূমিকা। পথ হারানো যুবক অশ্বখামা খুঁজে পায় দুর্যোধনের আশ্রয় ও সাহায্য নিঃস্বার্থ ছিলো না একেবারে। সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে এখন তাকে দিয়ে এই হত্যার লীলা করিয়ে নিয়েছে। মনোজ মিত্র মহাভারতের এই অংশটিকে নিয়ে নাটক রচনা করেছেন কারণ সমকালীন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্য। যে রাজনৈতিক অবস্থান সর্বদাই জানান দিয়ে গেছে যে কালে কালে ও যুগে যুগে বিজয় শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই হয় এবং অধর্মের বিনাশ ধর্মের হাত ধরেই ঘটে। মহাভারতের যুগেও অন্যায় ও পাপ থেকে ধর্মকে রক্ষা করেছিল কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরা। এই নাটকেও নাটককার মিত্র পাঠক ও দর্শকদের বোঝাতে চান অশ্বখামার মতো তরুণেরা রাষ্ট্রের আদেশে বিভ্রান্ত হয়ে অধর্মের পথে যাত্রা করলেও শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মতো ধর্ম যোদ্ধারা অশ্বখামাদের নিধন করে 'ধর্ম রাষ্ট্র'ের প্রতিষ্ঠা করবেই। এই সত্যটি

চিরকালীন। যেখানে স্পষ্টই ইঙ্গিত থাকে অধর্মের প্রতীক দুর্যোধন ও অশ্বখামারা এভাবেই ন্যায়ের হাতে পরাজিত হয়, একই ভাবে সাতের দশকের সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা একদল তরুণের যাত্রাপথ অধর্মে কালিমালিগু থাকার কারণেই শেষ পর্যন্ত তারাও মহাভারতের অশ্বখামার মতো পরাজিত হয়। বস্তুত মহাভারতের আড়ালে সমকালের কথাই নাটককার মিত্র আমাদের বলেছেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বলে যাওয়া সেই অমর ও কালজয়ী বাণীটির কথা মনোজ মিত্রের নাটকে কৃপাচার্যের মুখ থেকেই আবার আমরা শুনে থাকি:

ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক!...আমাদের সাধ্য কী কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি!
যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে— অধর্মের বিনাশে!
ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গাণ্ডীবধারী অর্জুন! নাশ করবে...নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের!
মহাকালের বিচার! মুক্তি নেই...আমাদের মুক্তি নেই... ৫৫

মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক রচনা করলেও নাটককার মিত্র এখানে সংলাপ রচনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে মহাভারতের গাষ্ঠীর্থ রক্ষিত হয়েছে এবং ভাষাও ওজস্বিনী হতে পেরেছে। নাটকে একসঙ্গে কৃপাচার্যের আক্ষেপ ও হাহাকার, কৃতবর্মার চাতুর্য এবং অশ্বখামার ট্রাজিক পরিণতি নাটকে রস নিষ্পত্তি ঘটাতে সাহায্য করেছে। নাটকের অনেক সংলাপই কাব্য সৌরভে ভরপুর হয়েছে। যার ফলে মহাকাব্যের গাষ্ঠীর্থ রক্ষার পাশাপাশি পাঠক ও দর্শক হৃদয়ে কিন্তু প্রাণের আরাম পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

কৃপ- চলে এসো অশ্বখামা...
অশ্ব-...বেলা ডুবে যায় গোধূলি হারায়...
কৃত- হ্যাঁ হ্যাঁ এগিয়ে আসে সে রাত্রি! পরম রাত্রি!
কৃপ- হ্যাঁ হ্যাঁ বিকট হাঁ করে নেমে আসে এক কৃষ্ণকায় দানব....
অশ্ব- আঁধার ঘনায় শিলায় শিলায়....
কৃত- আঁধার.... আঁধার নামছে! প্রশস্ত লগ্ন....
অশ্ব- আঁধার ঘনায় শৈলচূড়ে গুল্মলতায়.....
কৃপ- দৃষ্টি জ্বলে পেঁচার চোখে....
অশ্ব- রাত্রি নামে নদীর কূলে.... বৃক্ষশাখায়.... চরাচরে..... ৫৬

আবার নাটককার মিত্র তাঁর নাটকে কিছু সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন ও ক্রিয়া পদের সামান্য স্থান পরিবর্তন করে নাটকের গদ্যে অসম্ভব সুন্দর কাব্যময়তা এনেছেন। কখনও উদ্ভাসিত করে তুলেছেন রক্তস্নাত ভারতের স্বরূপ বা কখনও বিশ্লেষণ করেছেন চরিত্রের অন্তর্লোক। সমগ্র নাটক

জুড়েই এই অভিনব আয়োজন তিনি করে গেছেন। মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাটক লিখলেও পাঠক বা দর্শক অনেক সময়ই একে গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো ভেবে মুগ্ধ হয়। ফলে নাটক পাঠ করার সময় সংলাপের গান্ধীর্যের সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশের যথাযথ সঙ্গত অপূর্ব স্বাদুতার সৃষ্টি করে। যেমন শুরুতেই আমরা পেয়েছি:

তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধ রথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। রথচূড়ার ধ্বজাটি ছিল ভাঙ্গা এবং অবনত। প্রান্তরে রথটিকে আগলে শিলাখণ্ডের উপর বসেছিল দুই রাজপুরুষ। মধ্যবয়সী বিপুলদেহী ঋতুনির্মিত শিরস্রাণপরা ভোজরাজ কৃতবর্মা এবং দীর্ঘ শুভ্র শাশ্রুকেশমণ্ডিত সুপ্রবীণ আচার্য কৃপ। কৃপের বিস্ফারিত দৃষ্টি সম্মুখে দূরদূরান্তে স্থির, অনিমেঘ। কৃতবর্মাও নীরব নিশ্চল ভয়াবর্ত। চরাচর নিঃশব্দ।^{৫৭}

প্রায় একই রকম উপমা ব্যবহারে নিশীথ পর্বের সূচনাটিও পাঠকের কাছে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর লাগে। নিশীথ সন্ধ্যায় যুবরাজ দুর্যোধনের কাছে অশ্বখামার আগমনকে তিনি যেন নিজের মানসনেত্রে দেখেছেন। ফলে পাঠক বা দর্শকের কাছে পুরো নাটকটাই টানটান উত্তেজনা ভরপুর হয়ে ওঠে। নাটকে যেমন একদিকে কাব্যময়তায় পাঠক বা দর্শক মুগ্ধ হয়, তেমনই অন্যদিকে সে সমকালীন ঘটনার সঙ্গে মহাভারতকে মিলিয়ে পড়তে পারে এবং এরই পাশাপাশি আধুনিক মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও দূষিত রাজনীতির প্রভাবে মানবতার লাঞ্ছনার করুণ কাহিনি আমাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তখন মধ্যরাত্রি। ঘনঘোর তমসা। প্রান্তরে পরিত্যক্ত রথখানির ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছিল। তারই আলোছায়ায় চতুর্ধার চিত্রিত।
দিখলয়ে বিন্দু বিন্দু তিনটি মশাল জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রমে অশ্বক্ষুরধ্বনি ভেসে এলো। তিনটি বেগবান তুরঙ্গম মধ্যনিশীথ প্রকম্পিত করে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করছিল। রথের মধ্যে নিদ্রা টুটলো সেই অদৃশ্য রথী দুর্যোধনের। তার চেতনা দলিত মথিত করে অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে। অক্ষম দেহভারে রথটা কাঁপছিল ঠক ঠক করে। রথারূঢ়ের দুর্বোধ্য একটানা চিৎকার উচ্চ পর্দায় উঠে সহসা থেমে গেল। ঘোড়াগুলি নিকটে এসে থামল। সর্বাঙ্গে ছুটে এলো কৃতবর্মা। পিঠে তুণ, কাঁধে ধনুর্বাণ, হাতে প্রজ্বলিত মশাল আর সূরাপাত্র।^{৫৮}

মহাভারতকেন্দ্রিক মনোজ মিত্রের অপর গুরুত্বপূর্ণ নাটকটি হল তক্ষক। এই একাঙ্ক নাটকটি ১৯৬৭ সালে রচিত হয়। অশ্বখ/মা নাটকে মহাভারতের কাহিনি উপাদান ব্যবহার করে বস্তুত উপস্থাপিত হয়েছে নাটককারের রাজনৈতিক অবস্থান এবং সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আঘাত করার প্রয়াসও দেখেছি আমরা। কিন্তু তক্ষক নাটকে নাটককার মিত্র উপস্থাপন করেছেন জীবন সম্পর্কিত একটি দার্শনিক ভাবনাকে। যেখানে ফুটে উঠেছে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা

এবং মৃত্যুকে ভয়হীন ভাবে জয়ের প্রয়াস। নাটকটি পৃষ্ঠা সংখ্যার দিক থেকে খুবই ছোট, কিন্তু স্বল্প আয়তনের মধ্যেও গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞার ছাপ মনোজ মিত্র রেখেছেন। মৃত্যুর আলোকে জীবনকে দেখা হয়েছে নাটকে এবং নাটকের শেষে মৃত্যুরূপী তক্ষক পরাজিত হয়ে পরীক্ষিতের পায়ের কাছে ছটফট করেছে।

মহাভারতের আদি পর্বে মহারাজ পরীক্ষিতের অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনাটি রয়েছে। এরই সঙ্গে বর্ণিত আছে পরীক্ষিতের মৃগয়ার নিমিত্ত যাত্রা এবং ঋষি শমীকের গলায় মৃত সাপ জড়িয়ে দেওয়ার আখ্যানটি। মহাভারতের মূল কাহিনি এই নাটকে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। প্রাথমিকভাবে রাজা পরীক্ষিৎ তন্ত্রিপাল ও মহামন্ত্রীকে নিয়ে জঙ্গলে মৃগয়াতে গিয়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। অতঃপর জলের খোঁজে রাজা ঋষি শমীকের আশ্রমে হাজির হলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঋষিকে মৌনব্রত রূপে দেখে রাগান্বিত হয়ে পড়ে। বিপন্ন ও তৃষ্ণার্ত রাজাকে ঋষি পুত্র শৃঙ্গী শমীক মুনিকে বিব্রত করার জন্য একপ্রকার জোরালো তিরস্কার করে, কিন্তু অপরদিকে রাজা ঋষির মৌনব্রতের প্রতিজ্ঞার বিষয়ে অবগত ছিল না। এরই ফলে রাজার মনে হয় যে সে অপমানিত হয়েছে এবং ফল হিসাবে রাজা একটি মৃত সাপকে ঋষির গলায় জড়িয়ে চলে যায়। কিন্তু পুত্র শৃঙ্গী এই দৃশ্যে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ হয় এবং অভিশাপ হিসাবে রাজাকে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে মৃত্যুর কথা জানায়। প্রাথমিকভাবে রাজা পরীক্ষিৎ এই অভিশাপকে তুচ্ছ ত্যাগ করে ঋষির আশ্রম থেকে চলে যায়। কিন্তু শৃঙ্গীর অভিশাপের ফলে এরপর পিপাসার জল দেখলেই রাজা তার মধ্যে সাপকে দেখতে পায়। এভাবেই জীবন ও মৃত্যুর লড়াইটি সমগ্র নাটক জুড়েই এগিয়েছে।

মহাভারতের আদি পর্বে এই আখ্যানে ঋষি ও পুত্র শৃঙ্গীর মধ্যে বিরোধের আভাস ছিলই। পুত্রের কৃতকর্মের জন্য মহাভারতেও শমীক পুত্র শৃঙ্গীকে তার কাজের জন্য সমালোচনার মাধ্যমে বকেছে। স্মরণ করিয়েছে পুত্রের অবিবেচকের মতো কাজের নমুনাকে। কিন্তু এই নাটকে মনোজ মিত্র শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, পিতা ও পুত্র উভয়কে দাঁড় করিয়েছেন জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক হিসাবে। ঋষির কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন শাস্ত্রত সত্য বাণী। যেখানে ফুটে উঠেছে পুণ্য অর্জনই সব নয়, তাকে জগতের কল্যাণে ব্যবহার করতে জানতে হয়। অভিশাপের ফলে রাজা ঋষির জলের মধ্যে সাপকে দেখতে পায়, তন্ত্রিপালের পাঠানো সুমিষ্ট ফলের মধ্যে সাপকে খুঁজে পায় এবং সবশেষে বন্ধু তথা মহামন্ত্রীকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করে। এরই মধ্যে নাটকের মাঝে সেই কাক্ষিত মুহূর্তটি আসে। সারথির মুখ থেকেই রাজা পরীক্ষিৎ বুঝতে পারে জীবনের চরম সত্যটি। তক্ষকের কামড়ে যদি সপ্তম দিনে মরতেই হয়, তাহলে সামনের ছয়টি দিন কেন প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর ভয়ে রাজা থাকবে? আগামী ছয়দিন ভরপুর আনন্দের মাধ্যমে বাঁচা যুক্তিযুক্ত

নয় কি? প্রত্যেক মানুষকেই তো একদিন পরলোক গমন করতেই হবে। কিন্তু, তাই বলে জীবনের প্রতিটি দিন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে বাঁচা অর্থহীন। এই চরম দার্শনিক সত্যটি নাটককার মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে সহজ ভাবে উপস্থাপন করেছেন। সারাথি তন্ত্রিপাল নামক চরিত্রটি মূল মহাভারতে ছিল না। দার্শনিক সত্য কথাটি নাটককার মিত্র এই চরিত্রটির মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছেন। ফলে মহাভারতের ঘটনার ক্রম এখানে খাটে না। তক্ষকের কামড়ে মৃত্যুর পরিবর্তে এখানে মৃত্যুরূপী শৃঙ্গী রাজার পায়ের কাছে নিজ পরাজয় স্বীকার করে। নাটককার মিত্রের রচিত সেই অসামান্য সংলাপ:

তন্ত্রিপাল- (গোঙাতে গোঙাতে) মৃত্যু সে তো জীবনের ভবিষ্যৎ! (থেমে) সেই তো মূর্খ, যে সেই ভবিষ্যতকে মানে না— আবার সেই তো কাপুরুষ যে তার ভয়ে ভীত হয়! (থেমে) মহারাজ আপনি বীর, আপনি জ্ঞানী... ভেবে দেখুন, সপ্তম দিন কতো দূরে—

পরীক্ষিৎ-সপ্তম দিন... কতো দূরে....

তন্ত্রিপাল- অনেক দূরে! জীবনের একটা দিন একটা সমুদ্র যদি হয়, তবে সে তো আজ হতে সপ্ত সমুদ্র দূরে! আজই কেন মরবেন... কেন হার মানবেন! এখনো তো সাতটা দিন। ...বাঁচুন... বাঁচুন ...মহারাজ বাঁচুন... ৫৯

নাটকের শেষের অংশে দেখি শৃঙ্গী ও রাজা পরীক্ষিতের মধ্যে হওয়া অসামান্য সেই সংলাপ। একটু দেখা যাক।

শৃঙ্গী- আমি পাপ করেছি। সাধনা আমাকে অহংকারী করেছে, বিদ্যা আমাকে সৃজন শেখায়নি, বিনাশের মন্ত্র দিয়েছে! তাই তক্ষকের কামড়ে আমি মরবো পিতা! আমি আমার নিজের ব্রহ্মতালুতে দংশন করে নিজের বিষ নিজের ওপর ঢালবো! পরীক্ষিৎ, তুমি বেঁচে যাবে....

পরীক্ষিৎ- (প্রসন্ন কণ্ঠে) কিন্তু আজ তো আমি আর তা চাই না শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী- পরীক্ষিৎ!

পরীক্ষিৎ- হ্যাঁ শৃঙ্গী, মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না! প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায়! এতো আজ তোমার কল্যাণেই শিখেছি শৃঙ্গী—

শৃঙ্গী- না না পরীক্ষিৎ....

পরীক্ষিৎ- মিনতি করি, সাতদিনের দিন সহস্র ফণায় ভয়ংকর সাজে সজ্জিত হয়ে তুমি দেখা দিয়ে। সত্য হোক শৃঙ্গী তোমার ব্রহ্মশাপ সত্য হোক!

শৃঙ্গী- না, না, পরীক্ষিৎ.....

পরীক্ষিৎ- এসো মৃত্যু, এসো প্রিয়! তুমি ফণা তুলবে.... সেই হবে আমার রাজছত্র! আমাকে না হারিয়ে তুমি জিতবে না..... জিততে দেব না.....

শৃঙ্গী- (পরীক্ষিতের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে) ক্ষমা করো... ক্ষমা করো পরীক্ষিৎ... আমি হেরে গেছি... দয়া করো! দয়া! দয়া !

ঋষি- মহারাজ, তোমার পায়ের কাছে একটা তক্ষক ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে! দ্যাখো হতভাগ্য নিজের বিষে জ্বলছে আর ছটফট করছে!... পরীক্ষিৎ তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ! ধন্য ধন্য রাজা! ধন্য পরীক্ষিৎ!

পরীক্ষিৎ- সপ্তম দিন... সে সপ্ত সমুদ্র দূরে! তার পূর্বে ছটা দিন আমি বাঁচব, বিরাট হয়ে বাঁচব !^{৬০}

দর্শনের ছাত্র ও প্রথম জীবনে দর্শনের অধ্যাপক মনোজ মিত্রের এখানে দার্শনিক মনের দিকটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপকে এখানে দেখতে চেয়েছেন। মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। তন্ত্রিপাল সারথি হয়েই যথার্থ কথা বলেছে, মনোজ মিত্র তার মুখ দিয়েই জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যটি উপস্থাপন করেছেন। মৃত্যুর ভয়ে প্রতি মুহূর্তেই ভীত না হয়ে প্রতি পদে পদে জীবনকে উপভোগ করে অন্তিমে মরণকে বরণ করে নেওয়া যথার্থ বীরের কাজ। নাটকের সংলাপও মোটামুটি ভাবে মহাভারতের গান্ধীর্যকে রক্ষা করতে পেরেছে। নাটকে পরিবেশ ও অনবদ্য ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে মনোজ মিত্র নাটকের সাহিত্যগুণ ও রসের মাত্রা বজায় রেখেছেন।

মহাভারত কেন্দ্রিক মনোজ মিত্রের অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে *যা নেই ভারতে* সবথেকে বেশি জনপ্রিয়। রাজা শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর শান্তনুর কোনও ঔরস পুত্র আর বেঁচে থাকে না। এতো বৃহৎ হস্তিনাপুর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিকট সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু ঔরসজাত পুত্র ছাড়াও তৎকালীন সমাজে আরও একাধিক সমাজ নির্দিষ্ট সন্তান উৎপাদনের বা স্বীকৃতির অনুমোদন ছিল। মহামহিম ভীষ্মও নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছে। ফলে পরাশর সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেবকে নিয়োগের মাধ্যমে শান্তনুর বংশ রক্ষা হয়। মহাভারতে পরিবারের মধ্যে ঘটে যাওয়া এরকম সাধারণ বিষয়গুলি সবাই জানে। কিন্তু নাটককার মনোজ মিত্র তাঁর

নাটকে দেখতে চেয়েছেন সাম্রাজ্যের মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থান ও সম্মানের দিকটি, তাঁর নজর এড়ায়নি রাজ অন্তঃপুরের রাজা যুবরাজদের কেচ্ছা ও ভোগ-বিলাসের নানা দিকটিও। রাজার পত্নীর গর্ভ থেকে ছাড়াও অসংখ্য সন্তানদের জন্ম রাজমহলের মধ্যে হতো, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ ও সুনিপুণভাবে তাদের নগরের বাইরে মানুষ করা হতো। এই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য মনোজ মিত্র মহাভারতের বাইরে থাকা ‘পাতকিনী’ নামের একটি চরিত্রকে হাজির করেছেন। পাশাপাশি বৃহৎ একটি সাম্রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থা থেকে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবাধ লুণ্ঠন ও অপহরণকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নাটককার মিত্র উপস্থাপন করেছেন। ফলে আমরা সমকালীনতাকেও এই নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারি। সেই প্রসঙ্গেই দু’একটি কথা আমরা এখানে বলব। যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই মনোজ মিত্র তাঁর মহাভারত চর্চার মাধ্যমে কীভাবে বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদী ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের প্রকৃত শোষণের কর্মপন্থাকে উপস্থাপন করেছেন। নাটকটির মঞ্চ সাফল্যকেও আমাদের প্রশংসা করতে হয়। একুশ শতকের অনেকটা সময় পেরিয়ে আসার পরেও আমরা *যা নেই ভারতের* সফল মঞ্চ অভিনয় প্রায়শই দেখতে পাচ্ছি।

মহাভারতের একাধিক ভাবসত্যকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন মনোজ মিত্র। তাঁর এই নাটকটি পড়লে বা মঞ্চে দেখলে আমাদের মহাভারত সম্পর্কিত একাধিক জিজ্ঞাসা ও ভাবনা নতুন করে মনের মধ্যে উঠে আসতে বাধ্য। আমাদের প্রিয় মহাকাব্যে শাসকের যুদ্ধপ্রিয়তা, পুরুষতান্ত্রিকতা, বর্ণভেদ প্রথার সমস্যা ও সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কিত ভাবনাগুলিকে একেবারেই সমকালীন জাতীয় ও বৈশ্বিক রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারা যায়। মহাভারতকে নতুনভাবে পড়তে গিয়ে পিতামহ ভীষ্ম হাজির হয়েছেন যুদ্ধবাজ ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র উপস্থাপিত হয়েছে শান্তিপ্রিয় ও কল্যাণকামী মানুষদের প্রতীক হিসাবে। কণ্ঠকী ও পাতকিনী নামের চরিত্র দু’টির ব্যবহারের ফলে মহাভারতের রাজকীয় গাভীর্য ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, বাইরে লোকসমাজের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে রাজমহলের অন্তঃপুরে ঘটে চলা কেচ্ছা ও কলঙ্ক। পিতামহ ভীষ্ম ও ব্যাসের মহৎ চরিত্রের আড়ালে ধরা পড়েছে একাধিক স্বার্থপরতা ও তঞ্চকতা। নারীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার আড়ালে বরাবরই গুরুত্ব পেয়েছে পুরুষের অভিপ্রায়। এই বিষয়ে একাধিক কথা পূর্বেই আমরা বলেছি। মনোজ মিত্র মহাভারতে নারীর মতামতের গুরুত্বহীনতার কথা বলতে গিয়ে টেনে এনেছেন অম্বিকার উক্তি। হস্তিনাপুরের রাজবধু ভীষ্মকে উদ্দেশ্য করে জানায় :

অম্বিকা-(গভীর অকম্পিত কণ্ঠে) অম্বিকা ধন্য হবে প্রভু, যদি স্বপ্নের সন্তানটি সে আপনার কাছ থেকে লাভ করে।

ভীষ্ম- (চমকে) অম্বিকা!

অম্বিকা- যবে স্বয়ংবর সভায় আপনাকে দেখেছিলাম, মনে মনে আপনাকেই বরণ করে নিয়েছিলাম। দেবব্রাহ্মণের সামনে মিথ্যা বলব না, কোনওদিন আপনার ভ্রাতাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। ভেবেছি ওই বালকের হাতে সমর্পণ করে আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। দেব, ভাগ্যগুণে যখন সেই বালক স্বামীর ছায়াটি আজ সরে গিয়েছে, আর অন্য পুরুষে সমর্পণ করবেন না। কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি এই অভাগীকে গ্রহণ করো... তোমা ভিন্ন কাউকে জানেনা অম্বিকা।

ভীষ্ম- স্তম্ভিত তোমার স্পর্ধায় স্তম্ভিত! পতনের পথ দেখায় নারী!

পুরোহিত- তাই বটে!

ভীষ্ম- সত্য রক্ষার পণ থেকে বিচ্যুত করে অপযশের অনন্ত পক্ষে নিক্ষেপ করতে চাও?

অম্বিকা- (আহত সর্পিণীর মতো) ও, তবে বংশরক্ষা দেশরক্ষার উর্ধ্ব আপনার সত্যরক্ষা প্রতিজ্ঞাপালন!

ভীষ্ম- স্বর্গের ঐশ্বর্যের বিনিময়েও ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাব্রষ্ট হতে পারে না। ভীষ্ম যা সংকল্প করে—

অম্বিকা- ওঃ! ভীষ্ম তার সংকল্প ত্যাগ করতে পারে না, ত্যাগ যা করার করতে হবে অম্বিকাকে! যত দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীকে। তার বেলা পক্ষে পতন নয়! স্বপ্ন সাধ পূরণের প্রত্যাশী সে হতে পারে না! যুপকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে তাকে? ^{৬১}

আবার সুবল কন্যা গান্ধারীর মতামত উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। যার ফলস্বরূপ বিবাহ পরবর্তী জীবনের কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা গান্ধারীর মুখ থেকে নাটকে ফুটে উঠেছে। নাটককার মিত্রের নাটকে তাই গান্ধারী বলে:

গান্ধারী- আমি তোকে আমার সর্বস্ব দেবো ইরা। হস্তিনাপুরী ছেড়ে চলে যাবি!

(একটানে নিজের চোখের বস্ত্রটি খুলে নিয়ে ইরার চোখে বাঁধছে)

লাঞ্ছনা কি তোর একার? আমার নয়? ছোট্ট দেশের ছোট্ট রাজ্যটিকে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে আমার ভুবন চির-আঁধার করে দেয়নি কৌরব! ঘৃণা হয় পৃথিবীর মুখ দেখতে। (বাঁধা শেষ করে) পাণ্ডুর ওই অবস্থা... আমিও জরায়ু বিনষ্ট করব। দেখি কে বাঁচায় কুরুবংশ? ^{৬২}

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এই যে সামাজিক অবস্থান সেইটি মনোজ মিত্র চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন। তাইতো অম্বিকা ও গান্ধারীর মুখ থেকে এরকম উক্তি উঠে এসেছে। সন্তান

উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে নারী উপস্থাপিত হয়েছে। অধিকারকে যেমন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলনের বিষয়ে, অথচ অধিকার হৃদয় চায় ভীষ্মকে।

পিতামহ ভীষ্ম ও পাণ্ডু নিয়ন্ত্রিত রাজবংশের মধ্যে মনোজ মিত্র খুঁজে পেয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। এই রাজবংশ একদিকে যেমন গান্ধারের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যকে লুণ্ঠন করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, তেমনি আবার সেই রাজ্যকে পুনর্গঠিত করার নামে তার ওপর অধিকার কায়েম করে বসেছে। এই রূপ আধুনিক উপনিবেশ কেন্দ্রিক শোষণকেই মনে করায়। সিংহাসন ত্যাগ করে পাণ্ডু বনবাসে গেছে, আর এদিকে ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন গ্রহণ করেই অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সাম্রাজ্য লুণ্ঠন বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে। গড়ে তুলতে চেয়েছে প্রজাকল্যাণকর ও শান্তিকামী একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাইতো নাটকের ধৃতরাষ্ট্র জানায় অশ্বমেধ যজ্ঞ বাস্তবে কোনও যজ্ঞই নয়, ওটা অবাধ লুণ্ঠনের একটি শাস্ত্রীয় পন্থা মাত্র। এখানে ভীষ্ম সংসার অর্থাৎ বিয়েও করবে না আবার রাজত্বও করে না। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য যুদ্ধই একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে। এভাবে লুণ্ঠনের সম্পদ ভোগ করার জন্য পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে গ্রহণ করা হয়। যাতে বংশ-পরম্পরায় এভাবেই ভোগ ও লুণ্ঠন চলতে থাকে। নাটকে পাণ্ডবদের আগমন ও পরিচয় নিয়ে নাটককার মিত্রে'র সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র— একটাই খটকা। দেবতারা যদি ক্রন্দনে সাড়াই দিলেন তাহলে পাণ্ডুর ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে তার পুত্র উৎপাদনের অক্ষমতাই তো দূর করতে পারতেন। সেটাই হতো দেবতার পক্ষে শোভনসুন্দর। তা না করে নিজেরাই সন্তান দান করতে গেলেন কেন.....? দেবতাদের কেমন যেন সুযোগসন্ধানী আর চতুর লাগছে না পিতা?^{৬৩}

ধৃতরাষ্ট্র— তোমাকেও বুঝতে হবে গান্ধারী, যারা আমাকে কোনওদিন সিংহাসনে দেখতে চাননি, আজও মেনে নিতে পারছেন না.... যাদের পেশীশক্তি আর অস্ত্রশক্তির গৌরব আমি কেড়ে নিছি.... ওই অজ্ঞাতকুলশীল বালকগুলিকে দাঁড় করিয়েছেন তাঁরাই। পাণ্ডব বলে পৃথিবীতে কিছু নেই, কিছু হয় না রানী।^{৬৪}

মহাভারতের কাহিনি উপাদান গ্রহণ করে নাটকটি রচিত হলেও সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির ও যুদ্ধের নিরিখে নাটকটিকে পড়া যায়। এ কথা আমরা আগেও বলেছি। নাটকের একদিক যদি ধারণ করে থাকে যুদ্ধবাজ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা, তবে নাটকের অন্যপ্রান্তে থাকে অবহেলিত ও প্রান্তিক মানুষের একতা। নাটকের শেষেও সেই ইঙ্গিত রয়েছে। যেখানে দেখতে পাচ্ছি নগরের প্রান্তে অবহেলায় বড়ো হতে থাকা পাতকিনীর সন্তানেরা এগিয়ে আসে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে নিজেদের অধিকারের ও প্রাপ্যের সীমাটুকু বুঝে নিতে। সভ্যতার সংগ্রামের এই চির পরিচিত দ্বন্দ্ব ও সংকটের দিকটি নাটককার মিত্র তাঁর নাটকে দেখাতে পেরেছেন। যুদ্ধ ও

শান্তির এই যে চির পরিচিত সংকট নাটককার দেখিয়েছেন তা বস্তুতপক্ষে সমকালকেই আমাদের মনে করায়। আমাদের মনে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক গতি সমৃদ্ধ রাখার জন্য ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনে দেশ পুনর্গঠনের নামে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। বাস্তবে আমরা দেখেছি আমেরিকাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও একটি অজুহাতের নাম করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যুদ্ধ লাগায় এবং পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের সুনাম রক্ষার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দও করে। আমরা মিল পাই নাটকের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বছরের আফগানিস্তানের শান্তিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াসকে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে উপসাগরীয় গলফ দেশগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, ফলে পেট্রো ডলারের যাবতীয় বিষয় তার হাতের মুঠোয়। ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র ক্ষমতা তার হাতেই রয়েছে। এভাবেই আধুনিক যুগের শোষণের মাত্রাটিকে মহাভারতের সঙ্গে মনোজ মিত্র মিলিয়েছেন।

এই নাটকের অপর গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল ভীষ্ম চরিত্রের পর্দার আড়ালে থাকা সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বৈশিষ্ট্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করা। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব যেন ভীষ্মের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। তবে মহাভারতে ভীষ্মের মধ্যে যে মহানতা, গাম্ভীর্য, উদারতা এবং বিশালতা ছিলো, যা নেই ভারতে নাটকে তা ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। পাতকিনী ও কঞ্চুকী চরিত্র দু'টির ব্যবহারের মাধ্যমে মহাভারতীয় গাম্ভীর্য নাটককার ভেঙেছেন এবং কথোপকথনের মাধ্যমে এরা ভীষ্মের ভেতরের উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপিত করতে সাহায্য করেছে।

ভীষ্ম— কী হল, প্রভাত না হতে কীসের কোলাহল? গান্ধাররাজ সুবল নিজের প্রয়োজনেই এখানে অবস্থান করছেন! যুদ্ধবিধ্বস্ত গান্ধাররাজ্য গড়ে তুলতে তিনি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী। এতে তোমাদের বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ দেখি না।

ধৃতরাষ্ট্র— সে কী! আমরাই যে দেশ ধ্বংস করেছি— সেই দেশ গড়ে তুলতে আমরাই এখন অর্থ সাহায্য করব। জ্যাঠামশাই, গান্ধাররাজ কী স্বেচ্ছায় সাহায্য নিতে এখানে রয়েছেন?— নাকি আমরাই তাঁকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করছি...? ^{৬৫}

কঞ্চুকী— জটিল প্রশ্ন। জ্যাঠামশাইকে চিন্তায় ফেললে!

ভীষ্ম— যাক, তোমরা সবাই আছো, অম্বিকাও আছো— ভালোই হল। ক'দিন ধরে একটা কথা ভাবছি। পুত্রেরা বড় হয়েছে, রাজ্যের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে। এবার বোধহয় শাসনভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমার মতো প্রবীণের সরে দাঁড়ানোই ভালো।

কঞ্চুকী-নিশ্চয় ভালো। বোধহয় কেন, অবশ্যই ভালো। যে ব্যক্তি পণ করেছে কোনওকালে কোনও অবস্থাতেই রাজমুকুট মাথায় তুলবে না— তার পক্ষে বছরের পর বছর অন্যের হয়ে রাজত্ব করায় যে কী বিড়ম্বনা—(ভীষ্মের পাশে এসে চোখ মটকে) সত্যি ছাড়বে? নাকি আরও কিছুদিন যেমন চলছে চালাবে?

ভীষ্ম- না। আর না। বড় দীর্ঘকাল চালানো গেল। আমার তো ক্লান্তিও আসতে পারে কঞ্চুকীমশাই.....

কঞ্চুকী-আসতে পারে কী, আসা উচিত! না এলে বুঝতে হবে— তোমার কোনও অভিসন্ধি আছে। সত্যি বলতে কি, রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারতে না। (চোখ মটকে) সব ছেড়ে দেবে, নাকি কিছু কিছু হাতে রাখবে?^{৬৬}

৩.৩। ঘ। শাঁওলী মিত্র

(নাথবতী অনাথবৎ এবং কথা অমৃতসমান)

নাট্যকার ও নাটককার শাঁওলী মিত্র সমসাময়িক বাংলা নাটকের জগতে অন্যতম এক নাম। বিখ্যাত নাট্যকার শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের কন্যা শাঁওলী মিত্র। শুধুমাত্র নাটকের অভিনয়েতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। করেছেন বেশ কিছু বিখ্যাত নাটকের অনুবাদ, লিখেছেন প্রবন্ধ ও ছোটগল্পও। জাতীয় ও রাজ্য স্তরে পেয়েছেন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। যার মধ্যে রয়েছে পদ্মশ্রী, বঙ্গবিভূষণ, আনন্দ পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র সুমথনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার ইত্যাদি। তবে বাঙালির মহাভারত চর্চার জগতে তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন বিখ্যাত দু'টি নাটক রচনার কারণে। এগুলি হলো 'নাথবতী অনাথবৎ' এবং 'কথা অমৃতসমান'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স হতে প্রকাশিত বইতে শাঁওলী নাটকের ভূমিকা অংশে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর পাঠকদের জানিয়েছেন কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন তিনি এরকম নাটক লিখেছিলেন। বস্তুত বিশ শতকের শেষের দিকে এমন কিছু ঘটনাবলীর সঙ্গে তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন যা তাঁকে নতুন করে মহাভারত চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই দিক থেকেই নারীর চোখে মহাভারতের নারীদের তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। যার ফলস্বরূপ উঠে এসেছে তাঁর হাত থেকে অসামান্য এই দু'টি নাটক। নাটক দুইটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভূমিকা অংশে তিনি বলেছেন:

আমার কল্পিত সেই কথক মহাকাব্যের অসামান্য নারী দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে দেখে মহাভারতের সময়ের সমাজকে। সেই অনুযায়ী সে সাজায় তার গল্প। বিশাল মহাভারত থেকে সে বেছে নেয় কেবল দ্রৌপদী— সংশ্লিষ্ট সময়টুকুই। কিন্তু কেবল গল্প বলেই সে থেমে থাকে না। সে কেবলই তুলনা করে সেই সময়ের সঙ্গে তার নিজের সময়কে। আর এই তুলনা-প্রতিতুলনা চলতে থাকে

সারা নাটক জুড়ে। তাই আজকের যে-কোনো সাধারণ মানবীও হয়তো সেই মহাভারতের অতুলনীয়ার সঙ্গে, তাঁর ভয়ানক অসম্মানের জীবনযাপনার সঙ্গে, নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেন। এমন একাত্মবোধ ঘটতে এই প্রায় ৩০ বছর ধরে আমি বহুবার দেখেছি!^{৬৭}

আবার *কথা অমৃতসমান* নাটকটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন শাঁওলী:

১৯৮৩-র পরে ১৯৮৯-এর শেষে *কথা অমৃতসমান* নাটকটি লেখা হয়। আর ১৯৯০ এর জানুয়ারিতে মঞ্চস্থ হয়। এ-নাটক কিন্তু কোনো বিশেষ চরিত্রের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে এগোয় না। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই মহাভারতীয় যুগ। কোন স্তরের রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং কোন কোন ব্যক্তির অহংকার, ঈর্ষা, মতিভ্রম এবং একের পর এক ভুল পদক্ষেপ এ যুগকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এ নিয়ে এ লেখকের এক অদম্য কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল নইলে অমন এক সফল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে গেল কেন?^{৬৮}

আজকের এই পৃথিবীতে, মনুষ্যসভ্যতায়, বাঁচার প্রক্রিয়াতেই নানা দুর্লক্ষণ দেখতে দেখতে কথকের অনুসন্ধিৎসু মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছিল— এই বিলুপ্তির বীজ রোপিত হল কবে? কোথায়? কেমন-কেমন করে তা তৈরি করল অমন জটিল আবর্ত? যে-ঘূর্ণাচক্রের মধ্যে থেকে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হল না সে-যুগের মানুষগুলোর পক্ষে! আর ঐ আবর্ত ঐ যুগটিকে নিষ্ক্ষেপ করে দিল অন্ধকারের অতল গহ্বরে! কোন ঘটনা-পরম্পরা সেই দ্বাপর যুগকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিল? কী করে ঘটল এমনটা? কেন বারে বারে পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটে?^{৬৯}

শাঁওলী মিত্র তাঁর এই দু'টি নাটকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবেশে নারীর অবস্থান উপস্থাপন করেছেন। মহাভারতের সময়কালের নারীর ইচ্ছা ও অবস্থানকে বুঝতে গিয়ে নাটককার তার সঙ্গে বর্তমানের সামাজিক কাঠামোকেও মিলিয়েছেন। যেখানে স্পষ্টতই দেখা গেছে কালের পরিবর্তন সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীর সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার উন্নতি হয়নি। যদিও তিনি এগুলিকে ‘নারীবাদীদের তরফের নাটক’ বলে চিহ্নিত করেননি। তবুও মহাভারতের উপর ভর করেই তিনি তাঁর নারী অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন এই দু'টি নাটকেই। নাটকের কথক কিন্তু দু'টি নাটকেই একজন নারী, যার সংলাপ ও বিভিন্ন চরিত্রের ভঙ্গি আমাদের অসামান্য নাট্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। এই কথকের চোখ দিয়েই আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি দ্রৌপদী, সত্যবতী, কুন্তী ও উত্তরাদের। নাটকের ভাববস্তু যদি দ্রৌপদী হয়, তবে মঞ্চ ও নাট্যপ্রকরণ অনিবার্যভাবেই এক কথকের। শাঁওলী মিত্র যাকে বলেছেন ‘কথক ঠাকরণ’। যেখানে স্পষ্টই আমরা দেখতে পাই সেকাল ও একালের এক বিনিময়যোগ্য সাযুজ্য সূত্র। প্রথম নাটকে যেখানে আমরা দেখছি পিতৃতন্ত্র ও তার নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যান, দ্বিতীয় নাটকে তা হয়ে গেল একটি ‘যুগের ধ্বংসের কাহিনি’। শাঁওলী জানাতে চান যে তার নাটকের নায়ক হল ঐ যুগটা। যা

ওই যুগেরই আত্ম-পরিচয়কে খুঁজে নেওয়ার এক অবলম্বন হয়ে উঠতে চায়— মিথের মধ্যে যে সম্ভাবনা আর বিস্তার অবশ্যই প্রত্যাশিত।

বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্বে'র যুগান্ত বইটির দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন নাটককার। সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারতের চরিত্রদের ইরাবতী দেখেছেন এবং আমাদেরও দেখতে সাহায্য করেছেন। ইরাবতীর অনেক মতামতকেই মহাভারতের পাঠক ও গবেষকেরা সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্জনও করেছেন বটে। বইটির দশটি প্রবন্ধে ('অন্তিম প্রয়াস', 'গান্ধারী', 'কুন্তী', 'পিতা-পুত্র', 'দ্রৌপদী', 'ময়সভা', 'পরধর্মো ভয়াবহ', 'আমি কে', 'কৃষ্ণ বাসুদেব' ও 'যুগান্ত') ইরাবতী মহাভারতকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন সেখানে সেটি শুধু পুরাণেরই পুনরায় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা হয়ে থাকেনি। তা হয়ে উঠেছে একালের নারীর নতুন জীবনবোধের এক অনন্য রূপকল্প। নাটককার মিত্রে'র মহাভারত চর্চায় এখানেই ইরাবতীর প্রভূত প্রভাব রয়ে গেছে। জীবনকে বোঝার যে অন্তর্দৃষ্টি ইরাবতীর ছিল, বিশেষ করে ভারতীয় নারীর জীবনকে নারীর চোখেই দেখার এই দৃষ্টিকোণ নাটককার মিত্রও ইরাবতী'র থেকেই অনেকাংশে পেয়েছেন। এখানেই তাই দ্রৌপদীর উপরে হওয়া অন্যায় ও অবিচার সম্পূর্ণরূপে মিলে যায় সমকালীন একজন নারীর মতোই। তখনই মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে একজন বর্তমানের ভারতীয় নারীর ওপরে হওয়া অবিচারের কোনও পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই না। ইরাবতী এবং নাটককার মিত্র উভয়ই এই জায়গাটিকে তুলে ধরেছেন। 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে ইরাবতী জানিয়েছেন:

দ্রৌপদীর ওপর যে সংকট ঘনিয়েছিল তা মানুষী, এই জগতের মানুষের সৃষ্টি করা ও স্বামীদের নিজেদের ওপর জোর করে টেনে আনা নিষ্ক্রিয়তার জন্য ঘটে যাওয়া। আদিপর্বে ধৃতরাষ্ট্র ভাষণ দিচ্ছেন। সেইখানে ও সেখান থেকে প্রায় প্রত্যেক পর্বে দ্রৌপদীর বিড়ম্বনা বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি শব্দ বারংবার এসেছে। 'নাথবতী অনাথবৎ'। পাঁচজন স্বামী থেকেও অনাথের মতো। পিতৃকুল সর্বশ্রী মণ্ডিত হয়েও অনাথের মতো।^{৭০}

নাটককার মিত্র ইরাবতী'র মতো করেই অনেকাংশে মহাভারতের নারীদের ভেবেছেন। নাটকের কথকতার ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমেই দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি সম্বোধনের সুযোগও রেখেছেন। তাই দ্রৌপদীর কথা বলার পাশাপাশি তিনি বলতে পেরেছিলেন বর্তমানের নারীদের প্রসঙ্গও। দ্রৌপদীর বিবাহ সভায় উপস্থিত রাজাদের সম্পর্কে তাই নাটকের কথক বলে ওঠে:

সব পুরুষ মানুষ যে! ভাবে-যাব, জয় করব, মালাটি পরব, কন্যোটিকে চেপে ধরব। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলে আসব।^{৭১}

‘সব পুরুষ মানুষ যে!’- এই কথা বলার মাধ্যমেই নাটককার পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর জোরালো স্বর উচ্চারণ করেছেন। মিল খুঁজে পেয়েছেন মহাভারতের সময়ের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানের। আমরা দেখি বিবাহ সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ সফল হলে সভা আলোড়িত হয়েছে। আবার মহাভারতীয় যুগের ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় বিরোধকে কথক পড়তে চাইলেন বর্তমানের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে।

...ব্রাহ্মণেরা সব লাফাতে আরম্ভ করল তাদের লোক বেশ জিতেছে বলে! আর ক্ষত্রিয়েরা লাফাতে আরম্ভ করল- তাদের লোক জেতেনি বলে!

... (হেসে) এখন যেমন আমরা হিন্দু- মুসলমানের বেলায় বলে থাকি আর কি!^{৭২}

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা নিয়েও একরাশ প্রশ্ন ও ভাবনার অবকাশ রেখেছেন নাটককার মিত্র। কথকতার ভঙ্গিতে তিনি আধুনিক সভ্য নাগরিক সমাজের দিকে ধারালো অস্ত্র শানিয়েছেন। প্রথমেই কথকের মনে হয়েছে বর্তমান সময়ের মতো হয়তো সেকালেও পাশা না খেলতে চাইলে ভীতু ও কাপুরুষ বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার ভয়ে যুধিষ্ঠির পাশা খেলেছে। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে কথকের যে, তৎকালীন সময়ে কোনও রাজা বা ক্ষত্রিয়কে পাশা খেলার আমন্ত্রণ জানালে তা করতেই হতো। বিষয়টিতে বাধ্যবাধকতা ছিলোই। আবার সুশীল সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ শানিয়ে তিনি বলেছেন- আমাদের সকলেরই তো মনের মধ্যে একটা জুয়াড়ী কোথাও থাকে, যুধিষ্ঠিরের মনের মধ্যের সেই জুয়াড়ীটা কি কোনো কারণে হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠেছিল? আবার সে চিন্তা করে শাস্ত্রে পাশা খেলাকে অন্যায় হিসেবে দেখা সত্ত্বেও মহাভারত কেন তাকে মেনে নিল? এরকম একাধিক ভাবনার সূত্রগুলি খুঁজে দেখার পর শাঁওলী বুঝতে পারেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ব্যাধিগুলি আজকেও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তাই নাটকের কথক বলে ওঠেন:

আসল কথাটা হচ্ছে যে ভালো কথা, নীতি কথা- এসব তো কেউ কখনো শোনে না! সে তখনো কেউ শোনেনি, আজও কেউ শোনে না...^{৭৩}

পাশা খেলার জন্যই যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সম্পদ ও রাজত্ব কৌরবদের হস্তান্তরে আসে। দ্রৌপদী নামক সম্পত্তিকে কাছে পেয়ে কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসনদের চোখে মুখে কামনার তীব্র প্রকাশ পাচ্ছে। মহাভারতের এই অশোভনীয় ও অসহনীয় পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী যেমন বোবা হয়ে থাকেনি, তেমনি এ সময়ের নাটকের ‘কথক’-ও প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বলেছে:

বাবুমশায়েরা, এইরকম এক একটা কাল আসে পৃথিবীতে, যখন এইসব গুণীজনেরা সব চূপ করে থাকে, আর যে অত্যাচারিত হয়, সে হয়েই যায়, হয়েই যায়! ...^{৭৪}

এটা তো ধারাবাহিক আত্ম-অভিজ্ঞতারই এক বয়ান। যেখানে নিরপেক্ষতার কোনও সুবিধেজনক ভান নেই। মহাভারতের মহাপ্রস্থানের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে স্বর্গ অভিমুখে যাত্রার সময়ে নাটককার মিত্র তাঁর *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে অসামান্য কিছু মুহূর্ত গড়ে তুলেছেন। এমন কিছু সংলাপ কথকের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে যা সত্যিকারের নাটকটিকে অসামান্য করে তুলেছে। সুদীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তিতে দ্রৌপদী পড়ে গেলে মহাভারতে দ্রৌপদীর কাহিনি এখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু, ইরাবতীর পথ অনুসরণ করে শাঁওলী খুঁজতে চেয়েছেন আরও গভীর সত্যকে। যেখানে নাটককার বুঝতে চেয়েছেন মহাপ্রস্থানে পড়ে যাওয়ার অনেক পূর্বেই দীর্ঘকালের অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় দ্রৌপদী প্রতিনিয়তই মৃত্যুতে পতিত হয়েছে। দ্রৌপদীর চলার ক্ষমতা হারিয়ে গেলে ভীম যুধিষ্ঠিরকে এর কারণ জানতে চাইলে যুধিষ্ঠির ভীমকে জানায় যে অর্জুনকে অধিক ভালোবাসার জন্যই আজ যাজ্ঞসেনী পাঞ্চগলীর এই পরিণতি। অথচ দ্রৌপদী প্রতিটি স্বামীর ওপরেই শ্রদ্ধাশীল ছিলো, যত্ন ও সেবাও মনোযোগ সহকারে করেছে। বিবাহ সভায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেই অর্জুন দ্রৌপদীকে পেয়েছিল, ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিজ অন্তরের প্রেম ও ভালোবাসা অর্জুনকেই দিয়েছিল পাঞ্চগলী। অথচ বনবাসকালে প্রায় পুরো সময়টাই অর্জুন দ্রৌপদীর থেকে দূরে দূরে কাটিয়েছে। চিত্রাঙ্গদা, উলূপি ও সুভদ্রার প্রতিও অর্জুনের ভালোবাসা ভালোই ছিল। সেই দিক থেকে দ্রৌপদী নিজের মতো করে অর্জুনকে খুব কম সময়ই পেয়েছে। ফলে দ্রৌপদীর অভিমান ও বিরহ যন্ত্রণা তাকে আজীবন যন্ত্রণা ও বেদনাই কেবল দিয়ে গেছে। অথচ ভীমের মাধ্যমেই দ্রৌপদী সমস্ত বিপদ থেকে একদা মুক্তি পেয়েছে। সেটা দুঃশাসনের রক্তপানই হোক অথবা কীচক হত্যাই হোক। ভালোবেসে দ্রৌপদীর অনেক মানসিক চাওয়া পাওয়াই মিটিয়েছে ভীম। তাই দ্রৌপদীর মৃত্যুর এই সময়ে ভীমের সঙ্গে নিজের অনেক সমধর্মিতাই উপলব্ধি করে দ্রৌপদী। ভাবনার এই জায়গা থেকেই ইরাবতী'র দ্রৌপদীর শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল সামনের জন্মে সমস্ত পাণ্ডবের বড়ো ভাই হয়ে ভীম যেন পৃথিবীতে আসে। ইরাবতী'র এই ভাবনা শাঁওলীকেও অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে তাই নাটককারের দ্রৌপদীও একই কামনা করেছে। শাঁওলীর দ্রৌপদীর এই কামনা এবং আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদীর এই সংলাপ যখন কথক উচ্চারণ করে, তখন নারীত্বের স্পষ্ট এক অভিমান জেগে ওঠে সেই সংলাপে। শাঁওলীর দ্রৌপদীর এই সংলাপ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাটকে অসামান্য নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টিও করে এই সংলাপটি।

কথক- দ্রৌপদী: ‘আর জন্মে তুমি কেবল আমার হোয়ো ভীম। তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি তবে একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবো। কেবল তুমি আমার হোয়ো ভীম। তুমি, কেবল তুমি আমার হোয়ো।’^{৭৫}

মহাভারতে নেই এমন অনেক কথাও এসে পড়ে শাঁওলী'র *কথা অমৃতসমান* নাটকে। আমরা আগেই দেখেছি, *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকের শেষ অংশে কথক স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয় যে 'সেটা মহাভারতে নেই'। 'ওটা ইরাবতীদিদির কথা'। একটা যুগের জটিলতার কাহিনি বলতে গিয়ে ক্রমাগত তুলনা প্রতিলোচনায় চলে আসে বর্তমান সময়। বলতে হয় বর্তমান সময়েও নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণির জীব। বলতে হয় নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থানের কথাও। যে অবস্থানে বেশিরভাগ সময়ই পিতৃতন্ত্রের আরোপিত মর্যাদাকে মান্য করতে বাধ্য করে। কুন্তীর পুত্র সন্তান লাভের প্রসঙ্গে মাদ্রীর প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে *কথা অমৃতসমান* নাটকের কথক বলে ওঠে:

...ওদিকে কুন্তী তিন পুত্রের জননী হলো ব'লে মাদ্রী তো ঈর্ষায় পুড়তে লাগলো। সে রাজার প্রেয়সী বটে! কিন্তু পুত্রের জননী হবার গৌরব? সেইখানেই তো নাকি নারীর প্রকৃত মর্যাদা!^{৭৬}

আজও নাকি তাই! নইলে, ভেবে দেখুন, সুযোগ হতেই ভ্রূণ পরীক্ষা ক'রে ঠিক করা হয় যে যদি কন্যা সন্তান হবার হয় তো সেই ভ্রূণকে— (ইঙ্গিত ক'রে টিপে মেরে ফেলার। তারপর এবার একগাল হেসে বলে—) কতরকমই হয়! বলুন!^{৭৭}

এরকম অনেক স্পষ্ট কথাই নাটককারের নাটকে 'কথক' আমাদের জানান দেয়। আমাদের তথাকথিত সভ্য নাগরিক সমাজকে জানিয়ে দেয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাবনার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন কয়েক হাজার বছরেও হয়নি। সত্যিই তো, আজও আমাদের সমাজে কন্যা সন্তানের জন্ম খাটো দৃষ্টিতে দেখা হয়। নারীর গৌরব এখনও সন্তান জন্মের জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে। বস্তুত নাটককার মিত্র দ্রৌপদীকে সামনে রেখে আমাদের সমাজেরই এক অমানবিক নগ্নচিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমাজ বারবার একজন নারীকে কেবলই মনে করিয়ে দেয় শৈশবে সে বাবার অধীনে থাকবে, বিয়ের পর স্বামীর অধীনে এবং বয়সকালে সন্তানের ইচ্ছামতো চলাফেরায় বাধ্য থাকবে সে। এই পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের অধীনে নাটককার মিত্রও পড়েন, এই ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতাও তাঁর নেই। কিন্তু সমাজের নেতৃত্ববৃন্দের চেতনা ফেরাবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টার কোনও ফাঁক তিনি রাখেননি।

শাঁওলীর দু'টি নাটকেই কথকতার আঙ্গিক ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতকে এভাবে দেখতে হলে অবধারিতভাবে নাট্যকারের প্রয়োজন হয় ভিন্ন একটি নাট্য আঙ্গিক। তবে মহাভারতের আখ্যানকে এভাবে উপস্থাপনের জন্য নাট্যকারকে একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তার এই কথকতার আঙ্গিক ব্যবহার ও অভিনয় রীতি নাটকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। শাঁওলীর আগে এই বর্ণনাত্মক রীতির ব্যবহার বাংলা নাটকে তেমন দেখা

যায়নি। কথকতার দেশজ আঙ্গিক আত্মস্থ করার মাধ্যমে এবং তার মধ্যে নারীবাদী ভাবনার মিশেল এক অপূর্ব নাট্যরূপকে প্রকট করে তোলে, এরই সঙ্গে কথকের সাহায্যার্থে তারই পাশে থাকে জুড়ির দল। শাঁওলী'র প্রথম নাটকটি যখন শুরু হয় তখন কথক মঞ্চের মাঝে উঁচু চৌকিতে বসে থাকে। নাটক শুরুর পর কথকের ওপর কম আলো পড়ে এবং জুড়ির দলের ওপর বেশি আলো পড়ে। এভাবেই নাটকে গান ও বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ক্রমে সুর ও ছন্দ কথকের শরীরে দোলার সৃষ্টি করে এবং এরপরেই সে বলে ওঠে- ‘গড় হয়ে নমস্কার করি গো মশায়েরা’। কথকতার ভঙ্গিতে মহাভারত বলতে গিয়ে কথকের মনে পড়ে যায় একাধিক আখ্যানের কথা। মনে পড়ে এক ‘রানীর কথা’ বা ‘সম্রাজ্ঞী কিন্তু সম্রাজ্ঞী নয়’, অথবা ‘রাজ্যেশ্বরী হয়েও রাজ্যহারা’ প্রভৃতির মতো নানা আখ্যান।

দ্রৌপদীর কথা বলতে গিয়ে কথক শাস্ত্রীয় নৃত্যের মুদ্রা ব্যবহার করেন। পদ্মগন্ধা, কৃষ্ণবর্ণা, ভ্রমরচক্ষু, দীর্ঘাঙ্গিনী এবং সুকেশিনী প্রভৃতি প্রতিটি বিশেষণকে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নাচের মুদ্রায় সে ব্যাখ্যা করে। এর ফলে দর্শকের কল্পনায় দ্রৌপদীর প্রতিটি রূপ ভেসে ওঠে। যেটি বোঝানোর জন্য কোনও অভিনেত্রীকে সাজিয়ে মঞ্চে আনার প্রয়োজন হয় না। দৃশ্য চিহ্নের অভাবকে অন্য দৃশ্য চিহ্ন দিয়ে অতিক্রম করার পদ্ধতিটি নাটককার ও নাট্যকার শাঁওলীই আমাদের দেখান। কথকতার এই দেশীয় ঘরানার রীতিতে দৃশ্য ও শ্রাব্য মিলেমিশে অসাধারণ এক নাট্য মুহূর্ত গড়ে তোলে।

কিন্তু শাঁওলী স্পষ্টতই আমাদের জানিয়েছেন ‘বিষয়’কে ভাবনাতে রেখেই এই কথকতা। বিষয়ের জন্যই এই আঙ্গিক নির্বাচন, আঙ্গিকের জন্য বিষয় নয়’। এই আঙ্গিককে শাঁওলী বলেছেন বর্ণনাত্মক থিয়েটার। এই কথকতাকে তিনি আয়ত্ত করতে চান আধুনিক নাটকে। একে আধুনিক বলার কারণ হিসাবে শাঁওলী জানিয়েছেন:

‘আধুনিক’ বলছি, তার কারণ, পরে দেখেছি, কথকতায় কেবল বর্ণনাই থাকে সাধারণত। কোনও ব্যাখ্যা থাকে না। আর এই নাটকের কথক কেবলই যুক্তি খোঁজে, প্রশ্ন তোলে, তারপরে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে। ... সে মহাভারতের অতীত থেকে কেবলই যাতায়াত করে বর্তমানে। ... এক একটি চরিত্রের সম্ভাব্য মানসিক চলনকে ব্যাখ্যা করে যুক্তিসহ, উদাহরণসহ। সেই জন্যই মনে হয় এই নাটকটি শুধুমাত্র বর্ণনা নয়। ‘কথকতা’-র আঙ্গিককে ব্যবহার করে নেওয়া নিজের মতো করে।^{৭৮}

এভাবে বর্ণনা এবং আঙ্গিক অভিনয়ের এক সাযুজ্য সূত্র গড়ে তোলে। সেই সময় আর বর্তমান, এই দুই সমাপতনের জরুরি উপকরণ হয়ে ওঠে কথকতা। ফলে মঞ্চ নির্মাণের আলাদা

কোনও প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে কথক তার মতো করে নাট্য পরিবেশ তৈরি করে নেয়। দ্রৌপদীর বিবাহ সভার ক্ষেত্রে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এগিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথক বলে যে তারা যেন এটাকেই বিবাহ সভা হিসাবে ধরে নেয়। রাজারা মঞ্চে কীভাবে প্রবেশ করেছিল তা বোঝানোর জন্য জুড়ির দল নৃত্য সহকারে গান পরিবেশন করে বুঝিয়ে দেয় রাজাদের প্রবেশের ভঙ্গিটি কেমন ছিল। এভাবেই কথক ও জুড়ির দল বিভিন্ন নৃত্য গীত সহকারে বা শারীরিক বিভঙ্গের মাধ্যমে প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিব্যক্তি ও প্রকাশ মঞ্চেই উপস্থাপন করে। এভাবেই কথক কখনও ছড়া কাটে, কখনও গান গায় অথবা নৃত্যের সাহায্য নেয়। কথক এভাবেই দ্রৌপদীর কথা বলতে বলতে একসময় নিজেই দ্রৌপদী হয়ে যায়, তখন তার নিবিড় চোখ যেন দেখতে পায় অর্জুনকে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীর মাল্যদান এই পুরো পর্যায়টিতে কথক ও দ্রৌপদীর যেন অভিনয় একাত্ম হয়ে যায়। কথকের স্বর ও ভঙ্গিতে জড়িয়ে থাকে একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ। তারপর হঠাৎ সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে কথক বলতে থাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধের কথা। এভাবেই পরিস্থিতির প্রয়োজনে কখনও চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া এবং আবার সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ ঘটনা বর্ণনাই কথককে অসাধারণ খ্যাতি এনে দিয়েছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ নাটকটি পড়ে এবং শাঁওলীর অভিনয় দেখে *নাথবতী অনাথবৎ* -এর ভূমিকা অংশে লিখেছিলেন:

মঞ্চে যখন শাঁওলী নাথবতীকে নির্মাণ করেন, তখন তাঁর হাতে অনেক উপকরণ। মঞ্চে শাঁওলীর সহায়করূপে জুড়ির দল থাকে, থাকে বাদ্যকরবৃন্দ। থাকে শাঁওলীর অপূর্ব কণ্ঠস্বর, অননুকরণীয় বাগভঙ্গিমা, অর্থাশ্রয়ী উচ্চারণ। থাকে সংগীতের সার্থক আবহ। থাকে অবয়বে যথাযথ অভিব্যক্তি এবং ললিত শরীরে বাঙময় ব্যঞ্জনা। শাঁওলী একটি বিচিত্র পদক্ষেপ দিয়েই সেখানে একটি চরিত্রকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পারেন। পারেন ভুরু ও চোখের একটি মাত্র ভঙ্গি দিয়েই দ্রৌপদীর কুমারী মনের প্রথম প্রণয়ের লজ্জা জড়তা এবং চাপা হৃদয়ে নিরাবরণ করে দিতে দর্শকদের সামনে।^{৭৯}

শাঁওলী নিজে তাঁর নাটক দু'টির নাটককার এবং নাট্যকার। অর্থাৎ নাটকের রচয়িতাও তিনি, আবার নাটকটিকে মঞ্চায়নের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি প্রধান অভিনেত্রীও তিনিই। নাটকের ভিন্ন আঙ্গিক ও ঘরানার জন্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে উক্ত নাটক দু'টি ক্লাসিক গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। মহাভারতের কাহিনির নতুন রূপায়ণ যেমন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই নাট্যরস নিষ্পত্তিতেও অবশ্যই এগুলি উঁচু মার্গের। কথকতার মতো দেশীয় লোকসংস্কৃতির একটি মাধ্যমকে যে দক্ষতায় ও স্বাভাবিকতায় তিনি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন তা এককথায় অনন্য। ফলে সামগ্রিকভাবে বিশ শতকের বাঙালির মহাভারত চর্চার ইতিহাসে নাটককার মিত্রের এই নাটক দু'টি পাঠক ও দর্শকদের পাশাপাশি মহাভারতের গবেষকদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে এসেছে।

৩.৪।। বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চায় যাত্রার স্থান:

যাত্রা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘পারফর্মিং আর্ট’। শহরের মধ্যে বা থিয়েটার হলে যে নাটক অভিনয় হয় তার দর্শক মূলত শহর বা শহরকেন্দ্রিক স্থানের দর্শকেরা। কিন্তু এর বাইরেও থেকে যায় দর্শকদের একটি বড়ো অংশ। যাদের কাছে যাত্রা একটি অবসর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। এরই পাশাপাশি তা আমাদের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম একটি মাধ্যমও বটে। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো যাত্রা বাঙালির মহাভারত চর্চার জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেই উনিশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাভারতের আখ্যান বা গল্প বা কোনও বিশেষ চরিত্রকে নিয়ে খুব কম একটা যাত্রা হয়নি। আমরা এই অধ্যায়ের শেষে সেই বিপুল যাত্রার তালিকা থেকে বেশ কিছুকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছি। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক মহাভারত মূলক যাত্রার পরিসরে মতিলাল রায় একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। মহাভারত মূলক তাঁর পালার সংখ্যা মোটামুটি ভাবে ১১ টি। যেগুলির মধ্যে আছে *যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ*, *দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ*, *পাণ্ডব নির্বাসন*, *ভীষ্মের শরশয্যা*, *কর্ণবধ*, *যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক*, *যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ*, *যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ*। এগুলি ছাড়াও *দ্রোণিদণ্ড*, *কমলে কৃষ্ণ* এবং *নহুষ চরিত্র*। তবে মতিলাল চেষ্টা করেও তার সমস্ত যাত্রাপালাগুলি মুদ্রণে সফল হতে পারেননি। তাঁর পুত্র ধর্মদাস চেষ্টা করে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে *যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ* প্রকাশ করেছিলেন। তবে ধর্মদাসও পিতার সমস্ত পালাগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়েছেন। কারণ হিসাবে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে ১৯৫৬ সালের বন্যায় মতিলালের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়ে যায়। মহাভারত মূলক যাত্রার একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন যে কোনও পৌরাণিক নাটকেরও কিছু না কিছু উদ্দেশ্য থাকেই। কেউ দেবতার প্রতি ভক্তিভাব প্রকাশ করতে চান, আবার অনেকে পৌরাণিক চরিত্র ও নাটকের আড়ালে আসলে বলে যান সমকালীন রাজনীতি থেকে সমাজনীতির সংকট ও দ্বন্দ্বকে। সেরকম মতিলাল রায়েরও কিছু গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যার ফলে মহাভারতের আখ্যানকে তিনি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনে মতিলালের এই ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে যখন বাঙালির সমাজ জীবনে যাত্রার ভূমিকা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে যাত্রার মাধ্যমে মহাভারতের উজ্জ্বল বিষয়গুলিকে তুলে ধরা খুবই মহৎ কাজ বলে মনে করি আমরা। যুধিষ্ঠিরের মহৎ ও ধর্মপরায়ণ চরিত্রের ব্যাখ্যায় *ভীষ্মের শরশয্যা* পালাতে মতিলাল বলেছিলেন:

লোকে যদি যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য অংশও গ্রহণ করে, তাহলে জনসমাজে ধার্মিকাগ্রগণ্য বলে বিখ্যাত হবে। লোকে দেখুক, যারা দেখতে না পাবে তারা যেন এই ধর্মরাজের জীবনচরিত্র শ্রবণ করে আত্মাকে পবিত্র করে।^{৮০}

মতিলাল একাধিকবার ঐক্যের বিষয়টি তার পালাগুলির মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে বার্তা দিতে চেয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকাটা কাম্য ছিলো না একেবারেই। তাই পাণ্ডবদের একতার কথা বলতে গিয়ে মতিলাল *যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক* পালায় কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন:

এই পাঁচজনের মধ্যে যে, যে কোনো সুখলাভ করুক, পরস্পরের তাতে কেউ অসুখী মনে করে না, যে আমি সে সুখে বঞ্চিত হলাম। ধন্য পাণ্ডব। ধন্য পাণ্ডবের একতা, একতায় যে কত দূর কি হয়, তা জগতের লোক পাণ্ডবদের লক্ষ্য করে শিক্ষা করুক।^{৮১}

ওরা ধর্ম জানে না, কর্ম জানে না, কোন বিষয়েরই মর্ম জানে না। জানে ধর্মরাজের সেবা, মানে ধর্মরাজের আজ্ঞা, গানে ধর্মরাজের গুণ গায়, লোকে দেখুক ভ্রাতৃত্বভক্তি কিরূপ কর্তে হয়।^{৮২}

মতিলালের পর বাংলা যাত্রাপালাতে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন বেশ ভালো মতোই। মহাভারতমূলক যাত্রাগুলির মধ্যে *বিদুর* বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পালাটি মথুরানাথ সাহা এবং নীলকান্ত দাসের দলে অভিনীত হয়েছিল। তবে মতিলালের পুরনো আদর্শকে মনে রেখেই হরিপদ কিন্তু বিদুর চরিত্রকে উপস্থাপন করেছিলেন। তবে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য এই চরিত্র সৃষ্টিতে পালাকারের নীতি আদর্শ কীভাবে কাজ করেছে সে সম্পর্কে বলেছেন:

নাটকে ধার্মিক ও কৃষ্ণভক্ত বিদুর চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।...রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্বক কুটিরে বাস করিয়া বিদুর ভিক্ষান্ন জীবনযাপন করেন ও ধর্ম চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ধর্মপ্রাণ বলিয়াই কৃষ্ণ দৌত্য করিতে আসিয়া রাজভোগ ছাড়িয়া বিদুরের ঘরে ক্ষুদ গ্রহণ করেন।^{৮৩}

এসব ছাড়াও ১৩৩১ বঙ্গাব্দে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কাশীরাম দাসের *মহাভারত* গ্রন্থের বিরাট পর্বের আখ্যান অনুসরণ করে লিখেছিলেন *পঞ্চরাত্র*। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে শেষ পাঁচটি রাত্রের ঘটনা অবলম্বনে এই পালাটি তৈরি হয়েছে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের *জনা বা প্রবীর পতন*, *দাতা কর্ণ* নামে আরও দু'টি পালায় নাম আমরা পেয়েছি। এরই সমসাময়িক সময়ে ধনকৃষ্ণ সেন মহাভারত অবলম্বনে *অভিমন্যু* ও *কর্ণবধ* নামে দু'টি পালা রচনা করেছিলেন। এই একই সময়ে অনন্যদাস গোঁসাল লিখেছিলেন *কার্তবীর্য সংহার* এবং *জয়দ্রথ বধ*। অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ লিখেছিলেন *অনন্ত মহাত্ম্য* (১৩২৩) পালা। পালাটি রচনার ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের শান্তিপর্বের অনন্তব্রত উপাখ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এগুলি ছাড়াও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষের ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতি অবলম্বন করে লিখেছিলেন *কুরু-পরিণাম*। তবে মহাভারত অবলম্বনে অন্য যে পালাগুলি তাঁর হাত হতে আমরা পেয়েছি সেগুলি হলো- *দাতাকর্ণ, সপ্তরথী, কংস বধ, চিত্রাঙ্গদা এবং প্রতিজ্ঞাপালন*।

তবে যাত্রার আধুনিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছেন বেশ কিছু পালাকার। তাদের মধ্যে ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী অন্যতম। মহাভারতের বনপর্বকে কেন্দ্র করে তিনি লিখেছিলেন *যজ্ঞাহুতি* (১৩৩৭), যা গনেশ অপেরার পার্টিতে অভিনীত হয়েছিল। আবার এই বনপর্বকেই অবলম্বন করে রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ লেখেন *ভুবনেশ্বরী* পালা। রামদুর্লভের অপর যে দু'টি যাত্রাপালা বিখ্যাত হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে- *ভীষ্মবিজয়* এবং *ভীষ্মার্জুন*। এদের মধ্যে প্রথমটি যামিনী ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয় এবং দ্বিতীয়টি অভিনীত হয় ষষ্ঠীচরণ অপেরা পার্টিতে। এরপর পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ও মহাভারতের বনপর্ব অবলম্বনে লিখেছিলেন *শিবশক্তি ও নটীর অভিশাপ*। তাঁর রচিত অপর একটি পালা *সপ্তরথী*, যা লেখা হয়েছিলো ভাণ্ডারী অপেরার জন্য।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা যাত্রার জগতে একেবারে পেশাদার ব্যক্তিদের আগমন ঘটে। যারা একাধারে নট, পালাকার এবং শিক্ষক। এদের মধ্যে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ অবশ্যই অন্যতম। তিনিও কাশীরাম দাসের *মহাভারত*-এর বনপর্ব হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, মহাভারতের বনপর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। বাহির থেকে দেখলে এর যথার্থ স্বরূপ হয়তো বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু, বনপর্ব জন্ম দিয়েছে একাধিক গভীর আত্ম জিজ্ঞাসার। ইতিমধ্যে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আমরা করেছি। ভাবনার এই স্তর থেকেই মহাভারতের এই সমস্ত পালাকারেরাও হয়তো বনপর্ব হতে গভীর প্রভাবিত ছিলেন। কাশীরাম দাসের *মহাভারত*-এর বনপর্ব থেকে লিখেছিলেন *মায়াচক্র* (১৯৩৩)। এছাড়াও তিনি লেখেন *সৈরিকী* (১৯২৮)। এই দু'টি অভিনীত হয়েছিলো ভাণ্ডারী অপেরার সৌজন্যে। অন্যদিকে *চন্দ্রহাস* (১৯৪০) নামে মহাভারত মূলক পালাটি তিনি কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বন করে লিখেছিলেন। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বাংলা যাত্রাপালার জগতে 'বড়ো ফণী' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন।

ফণিভূষণ মতিলাল বয়সে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের থেকে ছোট হওয়ার কারণে যাত্রাপালার জগতে 'ছোট ফণী' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ছোটবেলাতেই তিনি একাধিক মহাভারতকেন্দ্রিক যাত্রাপালা করে নাম অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে নাট্যভারতী দলের জন্য *উপেক্ষিতা* পালাটি তার যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। এরপর বাংলা যাত্রার জগতে ব্রজেন্দ্রকুমার দে নবযুগ নিয়ে উঠে আসেন। তাঁর রচিত পালাগুলি বাণিজ্যিকভাবে সফলতা প্রাপ্তির পাশাপাশি বিষয় ভাবনা ও উপস্থাপনার জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছে। মহাভারত অবলম্বনে মোটামুটি ভাবে

দশটি পালার কথা আমরা জানি। তার *ভক্তাধীন* (১৯২৬) পালাটি বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে যখন গণেশ অপেরা পার্টিতে পেশাদার পালা লেখার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন তার *প্রবীরার্জুন* (১৯৩২) এবং *লীলাবসান* (১৯৩৪) জনপ্রিয় হয়। তবে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধের বিপরীতে থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে তার মহাভারত চর্চাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিউ গণেশ অপেরায় যখন তার পালা *সারথি* (১৯৪৯) অভিনীত হয়, তখন অধিকাংশ দর্শক তাকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। পালার শেষে দুর্যোধনের মানসিক ভাবনার পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন। দুর্যোধন বুঝতে পেরেছে তার অধর্ম ও অন্যায়ের স্বরূপ। যাই হোক, মহাভারত অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রকুমারের অপর যে পালাগুলি দর্শকমহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল সেগুলি হচ্ছে- *বীর অভিমন্যু* (১৯৬২), *কৃষ্ণ শকুনি* (১৯৭১)। এই দু'টি ছাড়াও *পাণ্ডব প্রদীপ* এবং *পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ* তাঁর রচিত অন্যতম পালা, কিন্তু এগুলি অভিনীত হয়নি।

পরবর্তী সময়ে সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন বসাক এবং প্রসাদ ভট্টাচার্য যাত্রাপালার জগতে নিত্য নতুন চমৎকার সব পালার আবির্ভাব ঘটাইলেন। আনন্দময় নট্ট কোম্পানির জন্য লিখেছেন *কৃষ্ণ ভগবান* (১৯৮৬), আর্য অপেরার জন্য *শকুনির পাশা* (১৯৮৮) এবং জিতেন বসাক নট্ট কোম্পানির জন্য লিখেছিলেন *কৃষ্ণ কালিন্দী* (১৯৫৯), প্রসাদ ভট্টাচার্য তপোবন নাট্য কোম্পানির জন্য লিখেছিলেন *কুরুক্ষেত্রের কান্না* (১৯৭৫), *সম্ভবামী যুগে যুগে* (১৯৭৯) এবং *নরনারায়ণ*। তপোবন নাট্য কোম্পানির স্বত্বাধিকারী যিনি পুরাণ বিষয়ে পালা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, সেই দুলাল চট্টোপাধ্যায় *সূর্যপুত্র কর্ণ* (১৯৮৪) লিখে জনপ্রিয়তা ভালোই অর্জন করেছিলেন। বাংলা যাত্রার জগতে দর্শকদের মনোরঞ্জে সাহায্য করতে বা নীতি শিক্ষা দিতে এইসব পালাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র পরবর্তী যুগে মহাভারত মূলক যাত্রাপালায় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় একটি বিশেষ নাম। বাণিজ্যিকভাবে সফল একাধিক যাত্রাপালা তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। *গাঙ্গারী জননী* (১৯৮৩), *ভীষ্ম জননী গঙ্গা* (১৯৮৬) এবং *পাণ্ডব জননী কুন্তী* (১৯৮৭) তাঁর রচিত পালা। যাত্রাপালাকার ভৈরবের সমসাময়িক সত্যপ্রকাশ দত্ত বিখ্যাত একজন পালাকার। তাঁর নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত পালাগুলির মধ্যে *গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম* (১৯৮২), *কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ* (১৯৮৩) এবং *ধর্মসিংহাসন* (১৯৮৪) বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

তবে কালের নিয়মে পৃথিবীতে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। যাত্রাপালার ক্ষেত্রেও মানুষের রুচি ও আগ্রহের অনেকটাই ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ক্রমশ বিকল্প পেশার প্রতি ঝুঁকছিলেন। যাত্রাপালায় অন্যান্য সংকটের পাশাপাশি কম অর্থলাভ বা উপার্জন অনেকের কাছেই নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করছিল। মূলত আটের দশকের শেষ থেকেই অভিনেতা

অভিনেত্রীরা সিরিয়াল ও সিনেমার প্রতি অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। ফলস্বরূপ বাংলা যাত্রাপালা তার গৌরব ও ঐতিহ্য ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল। তবুও কিছু পালাকার এর মধ্যেও মহাভারত মূলক পালা রচনা করে যাচ্ছিলেন। যাদের মধ্যে সুনীল চৌধুরী একজন। তিনি লিখেছিলেন *সতী চিত্রাঙ্গদা* (১৯৮৩), *নাগিনী বিমাতা* এবং *বিষ্ণু ভক্ত গরুড়*।

আরও অনেক বাঙালি পালাকার মহাভারত অনুসরণে একাধিক পালা রচনা করেছেন। আমাদের দেওয়া এর তালিকা একেবারেই হয়তো সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু মহাভারত মূলক যাত্রাপালার সংখ্যা বা পালাকারদের নামের তালিকা তৈরি করা— আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আমাদের কাছে সবথেকে বড়ো বিস্ময় লাগে যা যাত্রাপালা সমাজ জীবনে তৈরি করে গেছে, সেটি হলো মহাভারতমূলক যাত্রাপালা বা পৌরাণিক যাত্রাপালা আমাদের গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষদের ধর্মজ্ঞান ও লোকশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় এই যাত্রাপালার ভূমিকাকে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ‘স্বদেশী সমাজ’ নিবন্ধে। যেখানে নতুন নতুন যাত্রাপালা, কথকতা বা কীর্তনের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের গ্রাম বাংলার অনেক মানুষ আজও দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। যাই হোক, যাত্রাপালার এই ভূমিকাটির গুরুত্বকে উপস্থাপন করার জন্য দু’জন বিখ্যাত মানুষের স্মরণীয় উক্তিকে তুলে ধরলাম। এদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং অন্যজন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

অল্পদিন পূর্বেও যাত্রা ছিল দেব-দেবীর পূজার অঙ্গ। শুধু পূজার অঙ্গ নয়, লোকশিক্ষারও অঙ্গ। আমাদের দেশে লোক অক্ষর-পরিচয়কেই শিক্ষার একমাত্র সোপান মনে করতেন না। বর্ণজ্ঞান না থাকলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক এই পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক যাত্রার সাহায্যে হিন্দু ধর্মের ও দর্শনের সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে সক্ষম হতো। জীবনের উচ্চ উচ্চ আদর্শগুলি— সত্যানুরাগ, পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সতীধর্ম, পিতৃভক্তি সৌহার্দ্য ও দেবদ্বিজে ভক্তি লোকের মনে সংক্রামিত হতো; কিন্তু অত্যধিক পুরাণপ্রিয়তা শেষকালে যাত্রাকে সমসাময়িক জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। নাটকে মানুষের সাধারণ জীবন ও তার বিভিন্ন সমস্যা আমাদের যাত্রার পালায় কোনোরকম স্থান পেল না।^{৮৪}

আমাদের যাত্রা কথকতার অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নতুন করিয়া আরো একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভূতের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তা শিখিব, সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নূতন করিয়া আমাদের গান করিতে হইবে।^{৮৫}

উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে মহাভারতকেন্দ্রিক বা মহাভারতের কোনও ঘটনা অথবা চরিত্রকে নিয়ে নাটক তো কম হয়নি। মূলত উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জোয়ার এসেছিল, সেই তুলনায় বিশ শতকে মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক অনেক কম পাওয়া যায়। আমাদের গবেষণা মূলত বিশ শতক নিয়ে হলেও ভবিষ্যতের কোনও স্বাধীন বা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকের একটি তালিকা রেখে যেতে চাই। যদিও এই তালিকা একেবারেই সম্পূর্ণ নয়, এর বাইরেও অসংখ্য নাটক থেকে যাবে যেগুলি হয়তো এক সময়ে দর্শক মহলে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। তবুও এই তালিকা থেকে একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা মিলে যায়, যেটি হল আমাদের বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির সংস্কৃতিতে মহাভারতের প্রভাব কতটা গভীর। তবে নাটকের পাশাপাশি অনেক যাত্রাপালাও এই বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং আজও করছে। সেগুলিরও একটি উল্লেখপঞ্জি দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় এই ধরনের বাংলা নাটকের উদ্ভব। মহাভারতের ঘটনা অবলম্বন করেই এই নাটকগুলির যাত্রা শুরু হয়। কিছু সময় পর বাঙালি দর্শকদের নাটকগুলি এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচয়িতারা মহাভারতের বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচুর নাটক লিখতে থাকেন। দর্শকদের বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে গড়ে উঠলো একাধিক সাধারণ রঙ্গমঞ্চও।

৩.৫।।

উনিশ শতকে রচিত মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক:

তারিচরণ সিকদার- *ভদ্রার্জুন*

লং সাহেবের তালিকা অনুসারে জনৈক মিলম্যান রচনা করেন- *নলদময়ন্তী পালা*

নন্দকুমার রায়- *শকুন্তলা*

রামনারায়ণ তর্করত্ন- *বেণীসংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, রুক্মিণী হরণ, কংসবধ, হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান* নিয়ে *ধর্মবিজয়* নাটক

কালীপ্রসন্ন সিংহ- *বিক্রমোর্বশী, সাবিদ্রী-সত্যবান*

কবি মধুসূদন দত্ত- *শর্মিষ্ঠা*

হরচন্দ্র ঘোষ- *কৌরববিয়োগ*

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর- *মালবিকাগ্নিমিত্র*

উমাচরণ দে- *নলদময়ন্তী*

অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়- নলদময়ন্তী
 যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন- কীচকবধ
 মণিমোহন সরকার- উষা অনিরুদ্ধ, ধ্রুব চরিত্র
 দুর্গাদাস কর- স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বিষয়ক)
 হরিশচন্দ্র মিত্র- জয়দ্রথ বধ, কীচক বধ, প্রহ্লাদ
 জীবনকৃষ্ণ সেন- কিরাতাজর্জুন
 কালীদাস সান্যাল- নলদময়ন্তী
 অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়- শকুন্তলা গীতাভিনয়, উষাহরণ
 হরিমোহন কর্মকার- শ্রীবৎসচিন্তা
 বিদ্বজজনয়- উর্বশী
 পূর্ণচন্দ্র শর্মা- শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান নাটক
 গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর- বিক্রমোর্বশী
 কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- দ্রৌপদী বিলাপ নাটক, সাবিত্রী সত্যবান, দুর্যোধনের দর্পচূর্ণ, জরাসন্ধ
 বধ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, অভিমন্যু বধ
 কামিনী সুন্দরী দেবী- উষা নাটক
 নফর চন্দ্র দত্ত- অভিমন্যু বধ যাত্রা, হরিশচন্দ্র যাত্রা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
 হরচন্দ্র দেব- যদুবংশ ধ্বংস
 হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়- পাঞ্চালী বরণ
 নিমাইচাঁদ শীল- ধ্রুব চরিত্র
 রাজকৃষ্ণ দত্ত- দ্রৌপদী হরণ নাটক
 তিনকড়ি ঘোষাল- সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়
 মনোমোহন বসু- সতী নাটক, হরিশচন্দ্র নাটক, পার্থপরাজয় এবং যদুবংশ ধ্বংস
 পার্বতীচরণ তর্করত্ন- হরিশচন্দ্র নাটক
 বেণীমাধব ঘোষ- ঋষিচরিত্র
 হরলাল রায়- মাত্রাসংহার এবং বৃহন্নলা নাটক
 দ্বারকানাথ রায়- সৈরিক্রী
 রাজকৃষ্ণ রায়- পতিব্রতা (সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনি অবলম্বনে), প্রহ্লাদ চরিত্র, দুর্বারসার পারণ,
 যদুবংশ ধ্বংস, প্রমদ্বরা
 ভোলা মুখোপাধ্যায়- নল দময়ন্তী, ধ্রুবযোগাপাখ্যান, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
 হরিনাথ মজুমদার- সাবিত্রী নাটিকা
 যদুনাথ বসু- সুভদ্রাহরণ

রাধামাধব হালদার- শৈব্যাসুন্দরী, নাগযজ্ঞ
 তিনকড়ি বিশ্বাস- দক্ষযজ্ঞ, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, অভিমন্যু বধ, বক্রবাহনের যুদ্ধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
 ব্রজমোহন রায়- অভিমন্যু বধ, সাবিত্রী সত্যবান, কংস বধ নাটক
 প্রাণচন্দ্র দাস- অভিমন্যু বধ, হিড়িম্বা বধ, জয়দ্রথ বধ, নল দময়ন্তী
 অক্ষয়কুমার দেব- অভিমন্যু বধ যাত্রা
 কানাইলাল সেন- অভিমন্যু বধ
 রাসবিহারী শীল- উত্তরবিলাপ
 গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়- অর্জুনবধ
 নন্দলাল রায়- অর্জুনবধ, ধ্রুব চরিত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ)
 প্রমথনাথ মিত্র- বীর কলঙ্ক নাটক (অসমাপ্ত), অভিমন্যু বধ পালা, গুপ্ত সংহার
 মহেশচন্দ্র দাস দে- প্রহ্লাদ চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ নাটক
 কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়- দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, হরিশচন্দ্র নাটক
 বিনোদবিহারী মল্লিক- যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক
 রাধানাথ মিত্র- উষাহরণ, শ্রীবৎসচিন্তা
 গিরীশচন্দ্র ঘোষ- পাণ্ডবগৌরব, অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, দক্ষযজ্ঞ, নলদময়ন্তী, ধ্রুবচরিত্র, বৃষকেতু দৃশ্যকাব্য, শ্রীবৎসচিন্তা, জনা, প্রহ্লাদ চরিত্র
 বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়- অহল্যাহরণ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দুর্যোধন বধ, ভীষ্মমহিমা, সুভদ্রাহরণ, রুক্মিণী রঙ্গ, পাণ্ডব নির্বাসন, পরীক্ষিতের ব্রহ্মাশাপ, বাণযুদ্ধ, ধ্রুব, প্রভাস মিলন
 মতিলাল রায়- দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, পাণ্ডব নির্বাসন, কর্ণবধ, ভীষ্মের শরশয্যা
 শ্যামাচরণ দাস- কুরুক্ষেত্র উপাখ্যান
 ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য- গন্ধর্ববণিতা বা কীচক বধ এবং দ্রৌপদীর চিতারোহণ বা দুর্যোধনবধ
 অমৃতলাল বসু (মতান্তরে নৃত্যগোপাল রায়)-হরিশচন্দ্র
 রামকৃষ্ণ রায়- ভীষ্মের শরশয্যা, প্রহ্লাদ চরিত্র
 নন্দকুমার রায়- শকুন্তলা
 রাইচরণ ঘোষ- আশামুকুবভঙ্গ নাটক- দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও অশ্বখামার পাণ্ডব পুত্র নিধন বিষয়ক
 হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়- পাঞ্চালী বরণ
 মাইকেল মধুসূদন দত্ত- শর্মিষ্ঠা
 যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়- অজ্ঞাতবাস নাটক
 প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়- অন্ধবিলাপ এবং পঞ্চম বেদ বা মহাভারত নাট্যকাব্য
 অতুলকৃষ্ণ মিত্র- আদর্শ সতী- সাবিত্রী সত্যবান কাহিনী, ভীষ্মের শরশয্যা, নন্দবিদায়

কুঞ্জবিহারী বসু- শ্রীবৎসচিন্তা এবং শকুন্তলা নাট্যগীতিকা, হরিশচন্দ্র
ভুবন কৃষ্ণ মিত্র- ধর্মপরীক্ষা নাটক
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- জয়দ্রথবধ নাটক
অঘোরনাথ ঘোষ- কীচকবধ নাটক (দ্বিতীয় সংস্করণ)
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়- সমুদ্রমহ্ন
কেদারনাথ চৌধুরী- ছত্রভঙ্গ- কৌরবের পরাজয় কাহিনী এবং উলুপী, পাণ্ডব নির্বাসন
গিরিশচন্দ্র ঘোষ- অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ধ্রুব চরিত্র, নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা, জনা,
পাণ্ডব গৌরব
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- ধ্রুব চরিত্র
গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য- পঞ্চরাত্র
যোগেন্দ্রনাথ তর্ক চূড়ামনি- মহাপ্রস্থান নাটক
তারাপদ ভট্টাচার্য- হরিশচন্দ্র নাটক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ।
বিশ শতকে কবিগুরু চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য লিখেছিলেন

৩.৬।।

বিশ শতকে রচিত মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক ও থিয়েটার:

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত- শ্রীকৃষ্ণ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর- অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বেণীসংহার, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, ধনঞ্জয়
বিজয়
অমৃতলাল বসু- যাজ্ঞসেনী, হরিশচন্দ্র
উৎপল দত্ত- কিরাত পর্ব (অনার্যদের মহাভারত ভাষ্য পাবো এখানে), কুন্তী
অমিত মৈত্র- বীর্যশৃঙ্খা
অলোক চট্টোপাধ্যায়- নানা ফুলের মালা
অভিজিৎ করগুপ্ত- অতঃকিম মহাযুদ্ধ
নান্দীকার প্রযোজিত ভীষ্ম সহানী-র রচিত নাটক- মাধবী (গালব-মাধবীর আখ্যান অবলম্বনে)
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী- শকুনির পাশা, যাজ্ঞসেনী অগ্নিকন্যা
মনীশ মিত্র- উরুভঙ্গম
দেবাশিস সেনগুপ্ত- বৃত্তান্তে
শিব মুখোপাধ্যায়- ঐশ্বরিক, মহাভারত, কর্ণ এখন
অচিন্ত্য চৌধুরী- একালের একলব্য

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়- একলব্য (নাট্য কাব্য)

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ- যাজ্ঞসেনী

উপেন্দ্রনাথ নাগ- দুর্যোধন

কেদারলাল রায়- কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ- বক্রবাহন, সাবিত্রী, উলূপী, ভীষ্ম, নরনারায়ণ, মন্দাকিনী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য- চক্রবূহ

অহিভূষণ ভট্টাচার্য- উত্তরাবিলাপ

শশাঙ্কমোহন সেন- সাবিত্রী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- ভীষ্ম

কামিনী রায়- অম্বা

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়- কর্ণার্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শকুন্তলা

মন্মথ রায়- কারাগার

বুদ্ধদেব বসু- প্রথম পার্থ, অনাসী অঙ্গনা, সংক্রান্তি, কালসন্ধ্যা, তপস্বী তরঙ্গিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- নন্দনকাননে দ্রৌপদী

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- অমৃতমহন

মায়া চট্টোপাধ্যায়ের একক সংলাপী কাব্য নাটকগুলি এক্ষেত্রে অন্যতম ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাভারতের যুদ্ধ ও অন্যান্য একাঙ্ক নাটকগুলি মহাভারত ভক্তদের মধ্যে পরিচিত ।

মনোজ মিত্র- তক্ষক, অশ্বখামা, যা নেই ভারতে

সুনীল দত্ত- কংস বধ পালা

শীলভদ্র- কচ ও দেবযানী

সুধাংশু সেন- অলৌকিক চন্দ্র

শাঁওলী মিত্র- নাথবতী অনাথবৎ, কথা অমৃতসমান

মোহিত চট্টোপাধ্যায়- উরুভঙ্গ

অরবিন্দ দাশগুপ্ত- যুযুৎসু

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- মা নিষাদ

কৃষ্ণ ধর- অভিমন্যু

হারাধন রায়- পার্থপরীক্ষা

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়- বিদুর, ভক্তের ভগবান, যদুবংশধ্বংস

ব্রাত্য বসু- জতুগৃহ (স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি নাটকে মহাভারতের খণ্ড দৃশ্যের পুনরায় নির্মাণ করেছেন)

শাহ্যাদ ফিরদৌসে'র উপন্যাস অবলম্বনে হাওড়ার টোটাল থিয়েটার করেছে ব্যাস নাটকটি, নির্দেশক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঞ্চয়িতা বসু- *বিশ্ব চিত্রাঙ্গদা* (প্রযোজনা মধ্যমগ্রাম নৃত্যবিতান)

সুমন সাহা (নির্দেশক) - বেঙ্গল রেপার্টরি'র সাহায্যে *অশ্বখামা দ্য ওয়ার মেশিন*।

মলয় রায়- *বিদুর* (প্রযোজনা সুখচর পঞ্চম)

ধরমবীর ভারতী- *অঙ্কা যুগ* (নির্দেশক কল্লোল ভট্টাচার্য)

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ অনুসরণ করে বেশ কিছু প্রযোজনা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে।

নটধা দল এমনটি করেছে ২০১৪ সালে, নির্দেশক ছিলেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। ভাসের *কর্ণভরম্* করেছে বেঙ্গল রেপার্টরি, নির্দেশক ছিলেন সুমন সাহা।

সেলিম আল দীনে'র *শকুন্তলা*

আব্দুল মতিন খান- *শকুন্তলা*

মাসুম রেজা- *নিত্যপুরাণ*

তানভীর আহমেদ সিডনী- *অধিরথ সুতপুত্র রাধা যার মাতা*

অবয়বের প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চস্থ হয়েছে কর্ণকথা, নির্দেশক জসিমউদ্দীন।

আনন জামানে'র লেখা *শিখণ্ডী কথা*, মঞ্চস্থ করেছে রংপুর নাট্যকেন্দ্র।

রুবাইয়াত আহমেদ- *হিড়িম্বা*

বীরাঙ্গনা কাব্যের মহাভারতীয় চার চরিত্রের অবতারণা নিয়ে নাটকের নির্মাণ করেছেন মণিপুর থিয়েটার। কহে *বীরাঙ্গনা* নামের এই প্রযোজনা ইতিমধ্যে ৭৫ বারের বেশি মঞ্চস্থ হয়েছে।

রাবীন্দ্রিক সূত্র আহরণ করে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় করেছে *নাট্যত্রয়ী*, নির্দেশক আতাউর রহমান। এতে জুড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের মহাভারত কেন্দ্রিক ৩ টি অমর সৃষ্টি- *কর্ণ কুন্তী সংবাদ*, *বিদায় অভিশাপ ও গান্ধারীর আবেদন*।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যকে আহরণ করে স্বপ্নদল করেছে *চিত্রাঙ্গদা*। নির্দেশক ছিলেন জাহিদ রিপন।

আরামবাগ থিয়েটার মঞ্চ এনেছে প্রবীর দত্তে'র নাটক *দ্রৌপদী পরম্পরা*।

মঞ্চের প্রয়োজনে বাংলা নাটক ১৯ শতক থেকে আজ পর্যন্ত মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি এবং চরিত্রকে সাদরে গ্রহণ করে এসেছে। বাংলা নাটকের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাতেও ভারত কাহিনির নাট্যরূপ মঞ্চ এ এসেছে। এরকম প্রচুর নাটক সফলভাবে মঞ্চ সাফল্য পেয়ে গেছে। এদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হাবিব তানভীর বিরচিত *এক আর দ্রোণাচার্য*, মণিপুরী ভাষায় রতন থিয়মে'র *কর্ণভরম্*, উত্তর প্রিয়দর্শী এবং চক্রবর্তী। ছত্রিশগড়ি ভাষায় লোকগাথার ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে তিজনবাস্তি'র *পাণ্ডবাবী*-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩.৭।।

মহাভারত কেন্দ্রিক যাত্রাপালা:

মহাভারতের কাহিনি নিয়ে উনিশ শতক থেকেই যাত্রাপালার প্রভূত প্রচলন শুরু হয়েছিল। সেই ধারা বিশ শতকে এসেও জনপ্রিয়তা হারায়নি, এমনকী একুশ শতকের প্রথম দুই দশকে আজও গ্রাম শহর নির্বিশেষে যেকোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে মহাভারত কেন্দ্রিক যাত্রাপালা দেখতে পাওয়া যায়। এই যাত্রাপালার সুনির্দিষ্ট তালিকা করা সম্ভব নয়। কারণ এর ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। তাই তারও মধ্যে কিছু উল্লেখ করা গেল। প্রচলিত ধারার নাটকে মহেন্দ্র গুপ্তের *উত্তরা*, *চক্রধারী*, *গয়াতীর্থ* অত্যন্ত সফলতা লাভ করেছিল। উৎপলেন্দু সেনের *পার্শ্বসারথি*, সুধীরেন্দ্র রাহা'র *বক্রবাহন*, ভোলানাথ রায়ে'র *জরাসন্ধ*-ও যথেষ্ট মঞ্চ সফলতা পেয়েছিল। মহাভারতের আখ্যান নিয়ে যে সমস্ত পালাকারেরা যথেষ্ট নাম ডাক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

মতিলাল রায়– *যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ*, *দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ*, *পাণ্ডব নির্বাসন*, *ভীষ্মের শরশয্যা*, *কর্ণ বধ*, *যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক*, *যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ*, *যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ*, *দ্রোণিদণ্ড*, *কমলে কৃষ্ণ (মারুতিমিলন)*, *নহুষ চরিত্র*। তবে মতিলালের যাত্রাপালাগুলি বিখ্যাত উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। যেগুলির মধ্যে বেশিরভাগ পালাই উনিশ শতকের।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়– *বিদুর*, *পঞ্চরাত্র*, *জনা*, *প্রবীর পতন*, *দাতাকর্ণ*

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল– *কার্তবীর্য সংহার*, *জয়দ্রথ বধ*

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ– *অনন্ত মাহাত্ম্য*, *কুরু পরিণাম*, *দাতাকর্ণ*, *সগুরথী*, *কংস বধ*, *চিত্রাঙ্গদা* এবং *প্রতিজ্ঞাপালন*

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য– *কর্ণের দান পরীক্ষা*, *প্রবীর পতন*

ধর্মদাস রায়– *চিত্তার চিন্তামণি লাভ*

মতিলাল ঘোষ– *অভিমন্যু বধ*

কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়– *প্রতিজ্ঞা পালন*

হারাধন রায়– *ধর্মের জয়*, *তাম্রধ্বজ* (মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব নিয়ে লেখা)

নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়– *শ্রীবৎসচিন্তা* (কাশীরাম দাসের বনপর্ব অবলম্বনে)

ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী– *যজ্ঞাহুতি* (মহাভারতের বনপর্বের ওপর ভিত্তি করে)

রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ- ভুবনেশ্বরী পালা, ভীষ্মবিজয়, ভীষ্মার্জুন
 পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়- শিবশক্তি, নটীর অভিশাপ, সপ্তরথী
 ফনীভূষণ বিদ্যাবিনোদ- মায়াচক্র, সৈরিকী, চন্দ্রহাস
 ফনীভূষণ মতিলাল- উপেক্ষিতা
 ব্রজেন্দ্র কুমার দে- ভজাধীন, প্রবীরার্জুন, লীলাবসান, সারথি, বীর অভিমন্যু, কৃষ্ণ শকুনি, পাণ্ডব
 প্রদীপ, পরীক্ষিতের ব্রাহ্মশাপ
 সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়- চক্রছায়া
 আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়- কৃষ্ণ ভগবান, শকুনির পাশা
 জিতেন বসাক- কৃষ্ণ কালিন্দী
 প্রসাদ ভট্টাচার্য- কুরুক্ষেত্রের কান্না, সম্ভবামী যুগে যুগে, নরনারায়ণ
 দুলাল চট্টোপাধ্যায়- সূর্যপুত্র কর্ণ
 ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়- গান্ধার জননী, ভীষ্ম জননী গঙ্গা, পাণ্ডব জননী কুন্তী
 সত্যপ্রকাশ দত্ত- গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ, ধর্মসিংহাসন
 সুনীল চৌধুরী- সতী চিত্রাঙ্গদা, বিষ্ণু ভক্ত গরুড়, নাগিনী বিমাতা

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দগোপাল রায়চৌধুরীও মহাভারতের উপর একাধিক পালা
 লিখেছিলেন। কিন্তু কালের ঘূর্ণিপাকে যাত্রাপালার ব্যয় অনেক বেড়ে গেলে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা
 সিনেমা ও সিরিয়ালের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলস্বরূপ মহাভারতের যে যাত্রাপালার ঐতিহ্য বাঙালি
 সমাজকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল, তার গরিমা এর ফলে অবশ্যই কিছুটা নষ্ট হয়েছিল। আমাদের
 প্রদেয় যাত্রাপালার সূচি অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়, এর বাইরেও একাধিক নাম থেকে যাবে। তবে
 প্রদেয় যাত্রাপালাগুলি ছাড়াও বেশ কিছু যাত্রাপালার নাম দর্শক সমাজের মধ্যে আজও উজ্জ্বল হয়ে
 আছে, সেগুলি তালিকায় যোগ করে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।

গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম
 মহাসতী দ্রৌপদী
 মহারাজা পরীক্ষিৎ
 পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
 দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
 শকুনির পাশা
 দানবীর কর্ণ
 মহামতী বিদুর

ଅକ୍ଷରାଜା ଧୂତରାସ୍ତ୍ରୀ
ଦାତା କର୍ଣ
ପାର୍ଥ ପରାଜୟ
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ
ପାଣ୍ଡବଗୌରବ

তথ্যসূত্র—

- ১। এবং জলঘড়ি, প্রথম বর্ষ ও প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৭৫
- ২। ঘোষ, অজিত কুমার, *জেনারেল*, কলকাতা: অজ্ঞাত, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৫২
- ৩। রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, *ভীষ্ম*, কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, বৈশাখ ১৩৫৪, পৃষ্ঠা ১৪৬
- ৪। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫৪
- ৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৫১
- ৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৪২
- ৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫১
- ৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৩
- ৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৩৭২ব, পৃষ্ঠা ১৫৫
- ১০। বোধ, অক্টোবর ২০০১, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১
- ১১। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮১
- ১২। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫
- ১৩। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪
- ১৪। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯০
- ১৫। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯০
- ১৬। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১
- ১৭। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১
- ১৮। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১
- ১৯। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১১
- ২০। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১১
- ২১। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৫
- ২২। বোধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৫
- ২৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'নন্দনকাননে দ্রৌপদী', *নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৫১
- ২৪। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'নন্দনকাননে দ্রৌপদী', *নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১
- ২৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'নন্দনকাননে দ্রৌপদী', *নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২

- ২৬। এবং জলঘড়ি, প্রথম বর্ষ ও প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫
- ২৭। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা ৩২
- ২৮। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩
- ২৯। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫
- ৩০। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
- ৩১। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫
- ৩২। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫
- ৩৩। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪
- ৩৪। রায়, মন্মথ, *কারাগার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২
- ৩৫। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৭
- ৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮
- ৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১
- ৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০
- ৩৯। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮
- ৪০। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯
- ৪১। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০০-১০১
- ৪২। বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১
- ৪৩। এই অংশটি আমরা বুদ্ধদেব বসু'র *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যের ভূমিকা অংশ থেকে নিয়েছি। এক গভীর দর্শনের কথা ভূমিকা অংশে বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। মূলত সেই দর্শনকে কেন্দ্র করেই এই কাব্যনাট্যটি রচিত হয়েছে।
- ৪৪। বসু, বুদ্ধদেব, *কালসন্ধ্যা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৫
- ৪৫। বসু, বুদ্ধদেব, *কালসন্ধ্যা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩
- ৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, *সংক্রান্তি*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা ১২-১৪
- ৪৭। বসু, বুদ্ধদেব, *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২২, পৃষ্ঠা ৮৭
- ৪৮। বসু, বুদ্ধদেব, *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮
- ৪৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০, পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬
- ৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭২
- ৫১। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৬-১৯

- ৫২। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
- ৫৩। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪
- ৫৪। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
- ৫৫। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫
- ৫৬। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২
- ৫৭। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫
- ৫৮। মিত্র, মনোজ, 'অশ্বখামা', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
- ৫৯। মিত্র, মনোজ, 'তক্ষক', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০
- ৬০। মিত্র, মনোজ, 'তক্ষক', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪
- ৬১। মিত্র, মনোজ, 'যা নেই ভারতে', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭১-৭২
- ৬২। মিত্র, মনোজ, 'যা নেই ভারতে', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬
- ৬৩। মিত্র, মনোজ, 'যা নেই ভারতে', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮
- ৬৪। মিত্র, মনোজ, 'যা নেই ভারতে', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯
- ৬৫। মিত্র, মনোজ, 'যা নেই ভারতে', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩
- ৬৬। মিত্র, মনোজ, 'যা নেই ভারতে', *রামায়ণী মহাভারতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪
- ৬৭। মিত্র, শাঁওলী, 'কিছু প্রাসঙ্গিক কথা', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৬, পৃষ্ঠা ৫
- ৬৮। মিত্র, শাঁওলী, 'কিছু প্রাসঙ্গিক কথা', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮
- ৬৯। মিত্র, শাঁওলী, 'কিছু প্রাসঙ্গিক কথা', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮
- ৭০। এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি ইরাবতী কার্ভের লেখা *যুগান্ত* থেকে। বইটির অনুবাদ করেছেন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বইটি সাহিত্য অকাদেমি নতুন দিল্লি থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।
- ৭১। মিত্র, শাঁওলী, 'নাথবতী অনাথবৎ', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩
- ৭২। মিত্র, শাঁওলী, 'নাথবতী অনাথবৎ', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
- ৭৩। মিত্র, শাঁওলী, 'নাথবতী অনাথবৎ', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০

- ৭৪। মিত্র, শাঁওলী, 'নাথবতী অনাথবৎ', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২
- ৭৫। মিত্র, শাঁওলী, 'নাথবতী অনাথবৎ', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০
- ৭৬। মিত্র, শাঁওলী, 'কথা অমৃতসমান', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬
- ৭৭। মিত্র, শাঁওলী, 'কথা অমৃতসমান', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬
- ৭৮। মিত্র, শাঁওলী, *মহাভারত ও আমার কথকতা*, কলকাতা: নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৪২
- ৭৯। মিত্র, শাঁওলী, 'প্রস্তাবনা- গৌরকিশোর ঘোষ', *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭
- ৮০। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯০
- ৮১। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯০
- ৮২। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯০
- ৮৩। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯২
- ৮৪। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯৬
- ৮৫। কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা প্রবন্ধে বাঙালির মহাভারত চর্চা: রূপে ও রূপান্তরে

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ভারতের বাইরেও মহাভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি মহাকাব্য আবহমানকাল ধরে জনমানসে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এই অর্থে ভারতীয় শিল্প, কলা এবং সাহিত্য মহাভারতের কাছে গভীরভাবে ঋণী। ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাটি মূলত শুরু হয়েছিল মধ্যযুগীয় সময়পর্বে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। বলা বাহুল্য, মহাভারতের অনুবাদগুলির প্রতিটি স্তরে স্তরে বাঙালি কবি ও অনুবাদকেরা বাঙালিয়ানার এক অপরূপ ছোঁয়ার নিদর্শন রেখেছেন, ফলে অনুবাদগুলি সর্বত্রই আক্ষরিক মূলানুগ অনুবাদ হয় নি। মহাভারতের অনুবাদকদের তালিকাটিও খুব একটা সংক্ষিপ্ত নয়। এই তালিকায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুবাদকেরা হলেন- কাশীরাম দাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ হরিদাস, গদাধর দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, অনন্ত মিশ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ রায়, পণ্ডিতপ্রবর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং রাজশেখর বসু'র মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ। তবে আমরা হলফ করে বলতে পারি যে, বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারা শুধুই অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রন্থ, যাত্রাপালা, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাসের মতো একাধিক সংরূপের মধ্যে। আমরা এই অধ্যায়টিতে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করব।

আমাদের গবেষণাপত্রের অপর একটি উদ্দেশ্য হল যে, বিদ্যায়তনিক চর্চার জগতে মুক্তচিন্তার অভিমুখটি মুক্ত রাখা। বলা বাহুল্য, মহাভারতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্যের চর্চার ধারাটি সর্বদাই বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরীয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাঙালি মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত এবং হিন্দু পুরাণগুলিকে মধ্যযুগীয় সময়পর্ব থেকেই মুক্তমনে চর্চা করে এসেছে। ভারতীয় পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলির হিন্দু দেবদেবীর চরিত্র ও কাহিনিকে বাঙালি বরাবর নিজের মতো ঐঁকেছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি যে, বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাটি গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এটির অন্যতম কারণ হল উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাব। ভারতবর্ষের মতো একটি বহুত্ববাদের দেশে বিভিন্ন উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন যে 'প্রোপাগান্ডা' প্রতিনিয়ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, সেখানে মুক্তমনে মহাভারত চর্চার দিকটি প্রতিমুহূর্তে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালির মহাভারত চর্চার প্রবাহমান ধারাটি অধিকাংশ সময়েই উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের গ্রাস হতে নিজেকে পৃথক রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মহাভারতকে কেন্দ্র করে ভারতীয়

অতীত গৌরবময় ইতিহাস নির্মাণের যে প্রয়াস আমরা দেখতে পাই, তার একটা বিপরীত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ তৈরির প্রয়াস আমরা করতে চাইছি।

আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতীয় সংস্কৃতি বহুত্ববাদের। আমাদের সংস্কৃতির মূল বহু গভীর। সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে পৃথক পৃথক জাতিগত গোষ্ঠী ভারতে এসেছে এবং এই দেশকে আপন করে নিয়েছে। তাদের কৃষ্টি, কলা, রীতি, ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ বর্তমানে মিশ্র সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে আমাদের আশ্রয় নিতে হয় কবীর, নানক, চৈতন্য, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী'র কাছে। ভারত সর্বদাই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-কে খুঁজে পেতে চেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতে সেই সমন্বয় যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্যকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, ভেদবুদ্ধির বশে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরকে হীন বলে প্রতিপাদন করছে।

বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ এই সংকট এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা হতে উত্তরণ আমরা মহাভারত থেকে পেতে পারি। প্রাচীন ভারতে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থান ছিল। মহাভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিত্রভাবে বসবাস করেছে। সম্প্রদায়ের সংখ্যাও কম ছিলো না। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল- সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, বাসুদেবক, পাণ্ডপত, শৈব এবং নারায়ণীয়। এছাড়াও আমরা বেদান্তের মধ্যেই পাব শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত- এই সকল মতাবলম্বী মানুষ, যারা মিলেমিশেই বাস করেছে, কেউ অপরের শত্রু হয়ে ওঠেনি। সাকার এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও চলেছে পাশাপাশি। এই সমস্ত চিন্তাভাবনার 'স্কুলিং'গুলির মধ্যে বৌদ্ধিক স্তরে বিরোধ সীমাবদ্ধ ছিল, একপক্ষ অন্যকে মতামত দ্বারা পরাজিত করতে চাইত। কিন্তু বলা বাহুল্য, মতামতের এই বিরোধ কখনোই বাহ্যিক ভয়াবহ রূপ নেয় নি, অর্থাৎ একপক্ষ অন্যের প্রত্যক্ষ অনিষ্টসাধন করে নি। এই উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের সময়কালে মহাভারত চর্চা আমাদের লড়াইয়ের পথে আয়ুধ হয়ে উঠতে পারে, সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন হতে মুক্তির কথা বরাবর উচ্চারিত হয়ে এসেছে মহাভারতের মতো মহাকাব্যে। কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

মহাভারতের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম নিজের মৃত্যুকালে দুর্যোধনকে বলেছেন, 'আমার মৃত্যুতেই যুদ্ধ শেষ হোক! বৎস কৌরবরা শান্ত হোক।'^১

মহাভারতের অপর একটি মহাকাব্য, যা এই মহাকাব্যকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। এখানেই সকল ধর্মবিরোধের নিরসন আছে।

‘একটি গোপন সত্য তোমাকে বলি, যুধিষ্ঠির, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।’^২

বিশ শতকে বেশ কিছু খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও সমালোচক মহাভারতকে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা রেখেছেন। উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন সেনের বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণকে জাতীয় বীরের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার যে বিনির্মাণের ধারাটি শুরু হয়েছিল, বিশ শতকে এসে সেটা পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেল। এই বিনির্মাণের ধারা সাহিত্যের অন্যান্য সংস্কৃতির মতো প্রবন্ধতেও লক্ষণীয়। বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রটি শুধুমাত্র একরৈখিক নেই, সেটি বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরীয়। মহাভারত চর্চার বিদ্যায়তনিক একটি দিক যদি ভারতীয় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শাখা স্পর্শ করে থাকে, তবে অপরদিকটি অবশ্যই ছুঁয়েছে ভাষাতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের মতো আধুনিক জ্ঞানচর্চার শিখরকে। বস্তুত, মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বহুমাত্রিক হওয়াটাই কাম্য। এটার সূত্র ধরেই বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাতে বেশ কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় প্রাবন্ধিক তথা আলোচকের লেখালেখি নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব। এই সমস্ত প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন- রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুখময় ভট্টাচার্য, প্রতিভা বসু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, অমলেশ ভট্টাচার্য, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এবং শামিম আহমেদ প্রমুখ। এছাড়াও আছেন একগুচ্ছ অপ্রধান প্রাবন্ধিকেরা।

৪.২।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও চেতনার ওপর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের সুবিপুল প্রভাব ছিল। ভারতীয় দর্শন, উপনিষদ ও মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই বিষয়ে পম্পা মজুমদারের ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস’ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় আদর্শ ও উপনিষদ এবং মহাকাব্যের ভাব ও উপাদান নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের একাধিক লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় যেহেতু মহাভারতকেন্দ্রিক, তাই এখানে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চায় মহাভারত কীভাবে এসেছে এবং প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের নানা ঘটনা ও বিষয়কে কীভাবে পড়তে চেয়েছেন— সেইটি আলোচনা করতে চেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে ও প্রবন্ধের বইতে মহাভারতের অনুষ্ণ এসেছে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল— *আধুনিক সাহিত্য, ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, A*

Vision of India's History, প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্যে মহাভারতের প্রসঙ্গ ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় এসেছে। তবে মহাভারতের উপকরণ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ খুব একটা বেশি সাহিত্য রচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে মহাভারত যেমন একাধারে শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, ঠিক তেমনই এই মহাকাব্যের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের আবহমান প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেয়েছিলেন। ঠিক সেই কারণেই তাঁর প্রথম জীবনের লেখালেখি থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধর্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং ইতিহাসের বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনায় বারবার মহাভারতীয় অনুষ্ণ ফিরে ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরাকে খুঁজে পেতে গেলে আমাদের বেদ, গীতা ও বেদান্তের সঙ্গে মহাভারতকেও অবশ্যই পাশে রাখতে হবে।

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে মহাভারত কীরকম প্রভাব ফেলেছে তা বলবার আগে একটু পূর্বে ফিরে যেতে চাইছি। আমরা জানি ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে ভারতীয় পরম্পরার ঐতিহ্য বজায় ছিল। ফলে সেই ঐতিহ্যের পরম্পরা কিশোর রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। ভাবনার এই জায়গা থেকেই রামায়ণ ও মহাভারতের গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। উনিশ শতক আমাদের একধারে যেমন প্রগতির উচ্চস্তর দেখিয়েছে, ঠিক তেমনই এই শতকের শেষ পর্বে জড়তা ও রক্ষণশীল মানসিকতা বাঙালি সমাজের একটি অংশকে সহজেই কাবু করেছিল। তারই বিরুদ্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’-র ভূমিকা অংশে চমৎকার বলেছেন :

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সম্ভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে একদিকে লোভহিংসা ভয় ঘৃণা অসংযত অহংকার, অন্যদিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুজলৌপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন! তখনকার সমাজ ভালোয় মন্দয় আলোকে অন্ধকারে জীবন-লক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংস্কৃতি বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যুৎপত্তি শালপ্রাণ্ড সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।^৩

মহাভারতে বর্ণিত জীবন ও মহাভারতের অনেক চরিত্রকেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে মানতেন। বিশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের যুগকে দেখতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত জীবনাদর্শের প্রতিভূ হিসাবে। তিনি মনে করেছেন এই সংকটময় পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের চর্চার মাধ্যমে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের বীর্যকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মহাভারতের মহান শৌর্যের ও বীর্যের আগমন না ঘটতে পারলে আমাদের বর্তমান জঞ্জালপূর্ণ সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। প্রাবন্ধিকের চিঠিপত্র গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা বলা আছে:

আমাদের এক কালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এক কালে বড়ো বড়ো বীর সকল জন্মিয়াছিলেন— কিন্তু বাঙালির কাছে ইহার কোনো ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম- দ্রোণ- ভীমার্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া, ধূলা ঝাড়িয়া, সভাস্থলে পুতুল নাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাহারা যে বাতাসে ছিলেন সে বাতাস এখন আর নাই। আমার বিশ্বাস, আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে, আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে।^৪

আবার মহাভারতীয় যুগকে যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শের দৃষ্টান্ত হিসাবে ভেবেছেন, তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রচিত ‘হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়’ নামক প্রবন্ধের মধ্যে ফুটে উঠেছে। মানুষের জ্ঞান, বোধ ও বিচার এবং বুদ্ধি যখন অপ্রধান বা গৌণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তার পরিবর্তে যখন সমাজব্যবস্থা প্রচলিত আচার ব্যবস্থা ও শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে চলতে চায়, তখনই রবীন্দ্রনাথ মহাভারত থেকে বলেন:

পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।^৫

প্রাচীন ভারতের সময়কালে ফিরে যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের আকৃতি আমরা অনেক জায়গাতেই পেয়েছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যায় মহাভারত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাধান। তবে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছেই একান্তভাবে মহাভারত আশ্রয় হয়ে ওঠে নি, মহাভারত থেকে আমাদের জীবনের ও সমাজ-রাষ্ট্রের বহুবিধ সমাধান এখনও আমরা পেয়ে চলেছি। *কালান্তর* বইয়ের ‘বিবেচনা ও অবিবেচনা’ প্রবন্ধে দেশের যুবকদের স্পন্দন জাগিয়ে তোলার জন্য মহাভারতীয় কর্মের উদ্দীপনায় ভরা জীবনের প্রসঙ্গের কথা বলেছেন তিনি। তাঁর কথায়: ‘আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে-যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে-যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে-যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন।’^৬

প্রত্যেকটি প্রাচীন সমাজই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। বলাই বাহুল্য, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতাতেই এভাবেই এগিয়েছে। আমাদের ভারত রাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের ভারতীয় সভ্যতাতেও আর্য বনাম অনার্য এবং ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পাশাপাশি মহাভারতেও খেয়াল করা গেছে। এই দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমাদের প্রাচীন সভ্যতার যাত্রা সামনের অভিমুখে এগিয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই তাত্ত্বিক বিষয়টি আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিয়েছিলেন রামায়ণ ও মহাভারতের ওপর। পরবর্তী সময়ে ১৯২১ সালে এরই বর্ধিত রূপ প্রকাশ পায় ‘*A Vision of India’s History*’ নামে। এখানে আর্য বনাম অনার্য উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে হওয়া বিরোধকে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের জনমেজয়ের সর্পহত্যা সম্পর্কিত যজ্ঞের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। এই যে নাগেদের হত্যা তা আসলেই বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মানুষদের বিনাশকেই উপস্থাপিত করে। তাই এই বিনাশের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন গোষ্ঠীবৈরিতাই উঠে এসেছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংকট আমরা পরের অংশে যখন সুকুমার সেন, অমলেশ ভট্টাচার্য ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী’র মহাভারত চর্চা আলোচনা করব, তখন বিস্তারিতভাবে দৃষ্টান্তযোগে বিষয়টিকে বুঝে নিতে চাইব। কিন্তু আমাদের অবাক হতে হয় যে রবীন্দ্রনাথও অনেক আগেই এই কথা আমাদের বলে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আসলে শুধুমাত্র রাজ্যলাভের জন্য নয়, এই যুদ্ধ মূলত দুইটি ধর্মপন্থার বিরোধের ইতিহাসও বটে। এই দুইটি ধর্মপন্থার মধ্যে একটি কৃষ্ণের অনুসারী অর্থাৎ কৃষ্ণপন্থা এবং অন্যটি অবশ্যই কৃষ্ণবিরোধী। তাঁর মতে:

In this latter version of the Epic the fact is suppressed that it was an unorthodox religious movement, acknowledging Krishna to be its

prophet, that gave rise to the most desperate Fight in the ancient ages in India. The very fact that Krishna was the charioteer of Arjuna is proof enough that it was a war of rival creeds; and for that very reason the Battleground of Kurukshetra has ever remained a sacred spot of pilgrimage.⁹ (*A Vision of India's History*,)

এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্মের দ্বন্দ্ব ও সংকটের ফলেই বৈদিক ধর্মের সঙ্গে ভক্তিধর্মের মধ্যকার সংঘর্ষ লেগেছিল। যেখানে ক্ষত্রিয়ধর্মের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কৃষ্ণ। আমাদের মনে আছে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী জরাসন্ধের সঙ্গে এই কারণেই মূলত যুদ্ধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমস্ত নিয়ম রীতি মেনে চলা জরাসন্ধ ছিল বাস্তবিকই ভক্তিধর্মের বিরোধী, যে কারণে ভক্তিধর্মের অনুসারী প্রচুর রাজাকে মগধরাজ নিজের কাছে বন্দি অবস্থায় রেখেছিল। শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধও এই তত্ত্ব মেনে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অংশটিকে যথার্থ অর্থেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। মহাভারত সংকলনের পেছনে যে সামাজিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সেটিও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝেছেন। এছাড়াও বর্তমানে মহাভারতের যে আকার আমরা দেখি শুরুতে একেবারেই সেটি ছিল না। শুরুতে কয়েক হাজার শ্লোক থাকলেও বর্তমানে তা এক লক্ষাধিক হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই সংযোজন অনেক কালের ও অনেক যুগের মিলিত চিন্তাভাবনার ফসল। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সহ আলোচনা সুকুমার সেন, বুদ্ধদেব বসু, অমলেশ ভট্টাচার্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র লেখালেখিতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় এই বিষয়টিকে ছুঁয়ে গেলেও তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন যে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও জোয়ারে আর্য সমাজের সামনে যখন বহু সংখ্যক দেশি ও বিদেশি অনার্য হাজির হয়, তখন আর্য সমাজের মধ্যে অগ্রগতির স্বাভাবিক ছন্দ কেটে যায়। ফলে চরম অসংগতি উপস্থিত হয়। সেই চরম অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল সমাজে ঐক্য এবং বাঁধন। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখি বর্তমান মহাভারত এতটা বিপুল। মহাভারতকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেকড় বা মূল হিসাবেই মনে করেন, মহাকাব্যের কাহিনিকে সত্য হিসেবে মনে না করলেও মহাভারতের ভাবগত সত্যতায় তিনি বিশ্বাসী। তাই *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে তিনি বলেন— 'রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে;..... রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।'^৮ আবার *সাহিত্যের স্বরূপ* গ্রন্থের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ের কথাকে একেবারেই ফেলতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছেন— 'মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের

হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবাস্তব আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে।”^৯

মহাভারত যে ইতিবৃত্তের সংকলন তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় বলার চেষ্টা করেছেন। আমরাও এই মতকে সমর্থন করি। কিন্তু যে সুন্দর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছেন, তার পরে আমরা আর মহাভারত যে ‘ইতিবৃত্তের সংকলন’ তা বিশ্লেষণের জন্য এগোচ্ছি না। শুধুমাত্র প্রাথমিক রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি তুলে ধরতে অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করছি:

আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস হইতে পারে না, কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত।^{১০}

ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কালে দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাস কথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমনকি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল।.....মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন ‘মহাভারত’ নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ।^{১১}

তবে মহাভারত যেমন একাধারে ইতিবৃত্তের সংকলন, তেমনি আবার তা রূপকাত্মকও বটে। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন যে মহাভারতের রূপকগুলির মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে। যার মধ্যে প্রতিবিশ্ব লক্ষ্য করে অর্জুনের তীর নিক্ষেপ বা গীতার বাণী— এগুলি সবই রূপকের ধারক। অর্জুনের প্রতিবিশ্ব লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপকে ধ্রুব সত্যের দিকে আমাদের যাত্রার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মাছের বাকি অংশটি শুধুই ঘুরছিল। এই ঘোরাকে সংসারের চাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মন যদি কেবলমাত্র লক্ষ্যবস্তুর দিকে থাকে তবেই আমাদের চরম উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব, কিন্তু মন ও দৃষ্টি যদি মাছের বাকি অংশ তথা সংসারের চাকার উপরে থাকে, তবে উদ্দেশ্য পূরণ অসম্ভব। বিশ শতকের অনেক মহাভারত গবেষকদের লেখালেখিতেই আমরা যেমন দ্রৌপদীকে তত্ত্ব হিসাবে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পেয়েছি। যেখানে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী এমনই এক গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, যাকে নিয়ে মহাভারতের বড়ো বড়ো গবেষকদের অনেক গভীর ভাবনা-চিন্তার ফসল আছে। পরবর্তী যথাস্থানে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখিয়েছেন, অনেক চরিত্রই যেমন নৈতিকতার পরাকাষ্ঠার জন্য মানব হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে, ঠিক তেমনই আবার নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়েও ভীম বা ধৃতরাষ্ট্র বা কর্ণ সাহিত্যেরসের বিচারে সার্থকতা লাভ করেছে। পিতামহ ভীষ্ম চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পসৃষ্টির বিচারে নাকী অসার্থক, কারণ অর্জুনের তীরে শয্যাশায়ী হওয়ার পর ভীষ্মের মুখ থেকে যে চরিত্রনীতি বা উপদেশ মহাভারতে উচ্চারিত হয়েছে, তাতেই ভীষ্মের চরিত্র নাকী উপদেশের তলায় তলিয়ে যায়।^{১২} ‘সাহিত্যের মাত্রা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এরকমই জানিয়েছেন। তবে মহাভারত তো বাস্তবিক অর্থেই মহাগ্রন্থ, তার পাঠক বা শ্রোতা নির্দিষ্ট কোনও ‘ডিসিপ্লিনে’র নয়। তাই চরিত্রের রস বিচারের ক্ষেত্রে এই উপদেশমালা বা নীতি-আদর্শের কথা কতটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা সাহিত্যেরসের পণ্ডিতরা বিচার করবেন। কিন্তু মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে ভীষ্মের এই নীতি আদর্শের গল্প ও তত্ত্বের কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারত শেষ পর্যন্ত শান্তরসের মহাকাব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যেরসের পাশাপাশি ভীষ্মের এই ন্যায়-নীতি-ধর্ম সমৃদ্ধ উপদেশগুলির গুরুত্বের কথা বললে আরও ভালো হতো।

মহাভারতের সমাজনীতির সমালোচনাতেও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। মহাভারতের নারীমর্যাদার বিষয়ে সমালোচনা করে তিনি বলেছেন- ‘অনুশাসনপর্বে অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যে কথোপকথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে।’^{১৩} তবে একথা অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে, সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর মহাভারতের আলোচনায় দেখিয়েছেন কীভাবে গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার খর্ব করা হয়। ফলে পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে নারী সম্পর্কিত যে কথাগুলি উঠে এসেছে তা হয়তো ওই সময়কালের সমাজপতিদেরই মনের কথা। এগুলো প্রক্ষিপ্ত অংশ হতেই পারে, কারণ মহাভারতের সংকলন অনেক দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছে, তাই বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন যুগের ভাষ্য মহাভারত বহন করে চলেছে। তবে মহাভারত শুধুমাত্র নারীর সামাজিক অবনমন বা মর্যাদাহানির কথাই কেবল বলে না, আমাদের প্রাচীন ভারতের নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির কথাও বলেছে। রবীন্দ্রনাথ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও বিরাট সভায় কীচক দ্বারা নারীর সম্মান নষ্টের বিষয়টি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট দিনে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকার বিষয়টিও প্রাবন্ধিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এরই সঙ্গে তিনি মহাভারতে বর্ণিত বহুবিবাহ প্রথাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তবে এসব সত্ত্বেও মহাভারতের মধ্যে প্রাবন্ধিক খুঁজে পেয়েছেন মানবতার আদর্শ। তাই তিনি বলেছেন:

যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সব অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করা যেতে পারে।.....বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত....আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো.... মানুষকে যথার্থভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।^{১৪}

তবে মহাভারত শেষ পর্যন্ত শান্তরসের মহাকাব্য, অর্থাৎ সমগ্র মহাকাব্য জুড়ে অন্যান্য রসের উপস্থিতি থাকলেও মহাকাব্যটির মূল কেন্দ্রীয় রস হচ্ছে শান্তরস। বলা বাহুল্য, রসতত্ত্বের ও অলংকারশাস্ত্রের তাত্ত্বিকরা তাই বলে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মহাভারত প্রেমের অন্যতম একটি কারণ অবশ্যই গীতার বৈরাগ্য এবং নিরাসক্তি। সমগ্র মহাকাব্য জুড়ে এত যুদ্ধ, হানাহানি, সম্পত্তির ভোগের জন্য লড়াই ছাড়িয়ে মহাভারত শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্যকেই বড়ো করে দেখিয়েছে। জীবনের মূল কথা হয়তো এটাই। যুদ্ধ জয়ের পর পাহাড় প্রমাণ সম্পদ লাভ, যশ, খ্যাতি ও মর্যাদালাভ ছাড়িয়ে ছত্রিশ বছর সমগ্র আর্যাবর্ত শাসন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে অবশেষে সন্ন্যাসীর মতো রাজ্যপাট অন্যের হাতে সমর্পণ করে ঈশ্বরের স্মরণে মহাপ্রস্থানে যাত্রা— এটাই তো জীবনের চরম সত্য, যা মহাভারত বারবার বিভিন্ন উপদেশ ও নীতিকথা এবং বিভিন্ন উপাখ্যানের গল্পের মধ্যে বলতে চেয়েছে। ভারতীয় সমাজজীবনের আদর্শকেই এই রাজ্যত্যাগ ও মহাপ্রস্থানের যাত্রা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করে তোলে। এই বৈরাগ্যপন্থাই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মহাভারত থেকে প্রাপ্ত পরম ও চরম সম্পদ। আমরা *প্রাচীন সাহিত্য* ও *কালান্তর*— এই দুইটি বই থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্ত বিষয়ে ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করব।

এক স্বর্গারোহণপর্বেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। গল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছে গল্পের অবসান যেখানে মহাভারত সেখানে থামিলেন না— অতবড়ো গল্পটাকে বালুনির্মিত খেলাঘরের মতো এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন; সংসারের প্রতি এবং গল্পের প্রতি যাহাদের বৈরাগ্য তাহারা ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল এবং ক্ষুব্ধ হইল না।^{১৫}

মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগদ্বৈষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শাসন হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।^{১৬}

মহাভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা অধিকৃত— কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে পাণ্ডবদের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয়নি। এতে দেখা যায়, জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ করে বিজয়ী

পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন— এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ।^{১৭}

উনিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার সঙ্গে বিশ শতকের মহাভারত চর্চার পার্থক্যটি খুব প্রকটভাবে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখালেখিও এর বাইরে নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন সেনদের লেখালেখিতে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব দেখা যায়, বিশ শতকের মহাভারত চর্চায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে বাঙালি প্রাবন্ধিক ও কবি এবং সাহিত্যিকেরা মহাভারতের বিনির্মাণেই বেশি জোর দিয়েছেন। ভাবনার এই জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথই হলেন এই ধারার বিশ শতকের প্রথম ব্যক্তি। তাই গীতার অন্যান্য দিকের পরিবর্তে শুধুমাত্র দার্শনিক দিকটিকেই নিয়েছিলেন তিনি। তবে রবীন্দ্রনাথের উপর মহাভারতের প্রভাব কেমন থেকেছে— তা আমরা তাঁর লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোকে ইতিমধ্যে বোঝার চেষ্টা করেছি। তবে তাঁর নিজের লেখালেখির বাইরেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উদ্যোগে মহাভারত চর্চার একটা ঘরানা শান্তিনিকেতনে তৈরি হয়েছিল, সেটাও আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মূলত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাভারতের মূল আখ্যানের একটি নতুন রূপ বা বলা ভালো পুনর্লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। এছাড়াও মহাভারতের মূল আখ্যান যাতে ছোটদের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেই কারণে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে ছেলেদের মহাভারত রচনায় উৎসাহ প্রদান করেছিলেনও তিনি। শুধু তাই নয়, পুরো পাণ্ডুলিপির অংশটিও সংশোধনও করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য, ছোটদের এই মহাভারতটি বাঙালির সকল মহাভারতপ্রেমী কিশোরদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এটি ছাড়াও ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডব ও কৌরবদের কাহিনি অবলম্বনে *কুরুপাণ্ডব* রচনা করেন, যা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে থাকা বালকদের জন্য সংকলিত হয়েছিল। এছাড়াও বিখ্যাত মহাভারতের গবেষক সুখময় ভট্টাচার্যও মহাভারতের চর্চা রবীন্দ্রনাথের আদেশেই শুরু করেছিলেন, যা সুখময় ভট্টাচার্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। ফলে পরবর্তীকালে *মহাভারতের সমাজ* ও *মহাভারতের চরিতাবলী* প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রাবন্ধিক সুখময় রবীন্দ্রনাথের আদেশ ও প্রেরণাতেই আমাদের দিতে পেরেছেন। *মহাভারতের সমাজ* বইটির ভূমিকা অংশটি ভালো করে পড়লেই বুঝতে পারব যে, রবীন্দ্রনাথের মহাভারত ভাবনার ও চর্চার দ্বারা সুখময় ভট্টাচার্য কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভারতের মহাভারত চর্চার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কাজটি ছিল মহাভারতের ক্রিটিক্যাল এডিশান তৈরি করা। অধ্যাপক সিলভ্যা লেভি চলে যাবার পর শান্তিনিকেতনে আসেন অধ্যাপক মরিৎস উইন্টারনিৎস এবং গবেষক ভি. লেসনি। সেই সময় পুণেতে ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ

ইনস্টিটিউটে মহাভারতের এই এডিশান তৈরির কাজটি শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কাজের জন্যই মরিৎস উইন্টারনিংসকে ভারতে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হলে প্রাচ্য বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা কেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো পণ্ডিত মানুষেরা। পুণের ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করলে রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে বলেন বা বলা ভালো প্রায় একপ্রকার নির্দেশই দেন যে এই বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্যের জন্য। তৎকালীন সময়ে শিক্ষক তথা গবেষক হিসাবে বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষ, প্রায়ই আসা-যাওয়া লেগে থাকত প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, সুকুমার সেন, শহীদুল্লাহ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো গবেষকদের। বিদেশ থেকে এসেছিলেন বহু ভাষাবিদ মার্ক কলিন্স, ১৯২৬ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তিনি থেকে যান। সেই সময় শান্তিনিকেতন পত্রিকায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে পুথি সংগ্রহ ও চর্চার যে কাজটি এগিয়ে চলেছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায়। গবেষণার উপকরণ, বইপত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে মহাভারতের পুথি সম্পাদনার কাজটি বিধুশেখর মহাশয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সমগ্র কর্মযজ্ঞটি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ও পরামর্শে এগিয়ে চলেছিল। ফলে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি ও ভাবনার মধ্যে মহাভারত তো নানাভাবে এসেছেই, কিন্তু তার পাশাপাশি শান্তিনিকেতনের প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রে যে মূল্যবান গবেষণা এগিয়ে চলেছিল সেখানেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের তাই এই কর্মযজ্ঞটিকেও একেবারে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারতের অনুবাদ ও চর্চা রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ প্রভাবিত করেছিল।

৪.৩।।

সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)

সুকুমার সেন অন্যতম বিখ্যাত বাঙালি ভাষাবিদ হওয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সমালোচনামূলক লেখালেখির রচনাগুলিতেও তাঁর জ্ঞানের বিচ্ছুরণ প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে-*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* প্রভৃতি। বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় সুকুমার সেন একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত সুকুমার সেনের *প্রবন্ধ সংকলন* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ‘ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন’ নামের স্বল্প আয়তনের প্রবন্ধটি বিদ্যায়তনিক জ্ঞানচর্চার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রামকথার আলোচনার সূত্র ধরেই সুকুমার সেন সম্ভবত

মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তারই ফলশ্রুতি এই ‘ভারতকথার গ্রন্থিমোচন’। প্রাবন্ধিক অনুমান করেছেন যে, রামায়ণের কাহিনির মতো মহাভারতের মূলসূত্র এসেছে প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহির থেকে, যেটি এশিয়া মাইনর নামে অধিক পরিচিত। ইন্দো-ইরানীয় শাখার মধ্যে ফাটল অর্থাৎ ইরানীয় ও ভারতীয় আর্থের মাঝে বিরোধের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন যুক্তি সহকারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এটির সূত্র ধরেই প্রাবন্ধিক মহাভারতের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সোমযাজী ও অগ্নিহোত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কাহিনি। বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় এইটি একেবারে নতুন একটি তত্ত্ব।

অন্যদিকে প্রাবন্ধিক দেখাতে পেরেছেন যে, রামকথার নামগুলি কাল্পনিক হলেও মহাভারতের মূল চরিত্রের নামগুলি অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের জন্ম রহস্যের সঙ্গে কেলটিক ভাষার প্রাচীন মিথগুলিতে সন্তান উৎপাদনের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে প্রতিটি পাণ্ডব পুত্রদের জন্মগুলি বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক উপরের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, কুরু নামের কোনও সম্রাট ভারতে ছিল না, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যে কুরু নামধারী রাজা ছিল। ‘কুরু’ নামটি আসলে কোনও গোষ্ঠী অথবা প্রজার নামের (clan অথবা tribal name) মিথ হতে এসেছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।^{১৮} এই দিক থেকেই ‘কুরুক্ষেত্র’, ‘কুরুজাঙ্গল’ প্রভৃতি নামগুলিতে উচ্চারিত কুরুকে ব্যক্তির নাম হিসাবে ধরতে চান না প্রাবন্ধিক। নানা সূত্র থেকে আসা মিথগুলি নানাভাবে ভারত কথার সঙ্গে মিশে গেছে। প্রাবন্ধিক সুকুমার সেনের অনেক ব্যাখ্যাগুলি ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য তার এই বিশ্লেষণ নয়, মহাভারতের মতো মহাকাব্যের ব্যাখ্যা বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় হওয়াটাই কাম্য। বর্তমানের হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন মহাভারতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যেই দৃষ্টিকোণ থেকে করে থাকে, সেটির একটি বিপরীত বিকল্প পাঠ সুকুমার সেনের ‘ভারত কথার গ্রন্থিমোচন’ নামের প্রবন্ধতে পাব।

প্রাবন্ধিক প্রথমেই মহাভারত নিয়ে জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু করেন নি। প্রাথমিক কিছু আলোচনার সূত্র ধরে গ্রন্থ-মহাভারতের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির লেখা *মহাভাষ্য*-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। সেখানে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের বিষয়ে দু’একটি শ্লোক উঠে এসেছে। এই বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে অল্প আলোচনার পরেই প্রাবন্ধিক ‘মহাভারত’ শব্দটির অর্থ বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্র ও ব্যাকরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এখানে প্রাবন্ধিক পাণিনির ব্যাকরণের কথাও এনেছেন। সুকুমার সেন ‘ভরত’ এবং ‘যজত’ দুটি শব্দকে একই প্রত্যয়জাত এবং একই অর্থসম্বন্ধ যুক্ত শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। ‘যজত’ শব্দটির অর্থ পূজনীয় অথবা পূজা পাওয়ার যোগ্য, অতএব দেবতা। অনুরূপভাবে ‘ভরত’ মানে বন্দনীয়,

শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজা। এছাড়া ঋগ্বেদে অগ্নির এক নাম ভারত। রাজাদেরও প্রজারা কর দিয়ে ভরণ করত, ফলে তাদেরও ঐ একই নামে অভিহিত করা যায়। আবার যে স্তব করে, সে ভারত। এদিক থেকে ভারত মুনির কথা মনে পড়ে। প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন এখানে মনে করেছেন যে ‘ভারত’ মানে ভারতদের বর্ণনীয় বিষয়, অর্থাৎ রাজাদের কথা যে কাব্যে আছে। মূলত এই শব্দটাতাই ‘মহাভারত’-এর মূল অর্থ নিহিত আছে। এরই সূত্র ধরে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন মহাভারতের প্রাচীন নাম ভারত-সংহিতা অর্থাৎ ভারত বস্তুর সংকলন। স্বাভাবিকভাবেই যা পূর্বে অল্পকায় ছিল, পরে আঠারো পর্ব হয়েছে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভারত-সংহিতাই পরে হয়েছে মহাভারত-সংহিতা, যাকে আমরা সংক্ষেপে মহাভারত বলি।

মহাভারতের পর্ব আঠারো হওয়ার পেছনে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ অন্বেষণ তুলে ধরতে প্রাবন্ধিক সক্ষম হয়েছেন। যেগুলি প্রাবন্ধিকের অত্যন্ত বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার স্পষ্ট ছবি তুলে ধরে। আঠারো পর্বের কথা বলতে গিয়ে উঠে এসেছে দেবী চণ্ডী মহামায়ার প্রসঙ্গ, চণ্ডীর অষ্টাদশভুজা মূর্তিই প্রাচীনতম। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যে দেবী তারা মহামায়ার এক বিশিষ্ট এবং পূর্ব ভারতে পূজিত দেবীরূপ হিসাবে পাওয়া যায় ‘কুরুকুল্লা’ নামে। এখানে কুরু নামটি বংশনাম হিসাবে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। এই দেবীর বাহন নাগ, গঙ্গা- সরস্বতীর মতো কুরুকুল্লা জলস্রোতের অধিদেবতা গন্ধর্ব (হংস ও নাগ) রূপে কুরুবংশের প্রাচীনতম মিথের সঙ্গে যোগসূত্র জানিয়ে দেয়। এদিক থেকে অষ্টাদশ পর্বের একটি ব্যাখ্যা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। অন্য একটি যুক্তিও এই বিষয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। সুকুমার সেন এই বিষয়ে তুলে এনেছেন অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের শেষ দিকের *কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতার* পাঠান্তরের কিছু দৃষ্টান্ত। যেখানে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বাজপেয় অনুষ্ঠানে কুরুরদের এক নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পদ্ধতির অবস্থান ছিল। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ‘কুরু-বাজপেয়’ নামে পরিচিত ছিল। যেখানে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত সতেরো দিন ধরে এবং যুদ্ধের ও লড়াইয়ের যোগাড়যন্ত্রে একদিন বরাদ্দ থাকত, প্রতিযোগিতায় এখানে দক্ষিণা অর্থাৎ পুরস্কার থাকত সতেরটি করে নির্দিষ্ট কিছু বস্তু। এখান থেকে প্রাবন্ধিক অনুমান করতে চেয়েছেন কুরুপাণ্ডব বিরোধের কাহিনিটি। এইখান থেকেই আঠারো দিনের যুদ্ধের কাহিনি আঠারো পর্বে পরিণত হওয়াকে একেবারেই অসম্ভব হিসাবে প্রাবন্ধিক দেখছেন না। মহাভারতের আঠারো পর্ব হওয়ার পেছনে এরকম যুক্তিপূর্ণ ভাবনা এর পূর্বে অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের লেখায় আমরা সহজে পাই না।

প্রাবন্ধিক সুকুমার সেনের ‘মহাভারত সংক্রান্ত প্রধান আবিষ্কারই হল সোমযাজ্ঞী ও অগ্নিহোত্রীর মধ্যে ক্ষমতা লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব। পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধকে কেবলমাত্র

পরিবারের মধ্যে হওয়া বিরোধ হিসাবে প্রাবন্ধিক পড়তে চান নি। এই বিষয়ে প্রবন্ধের এক জায়গায় সুকুমার সেন স্পষ্টতই উল্লেখ করছেন:

দ্রোণের নাম নিয়ে একটু আলোচনার অবকাশ আছে। শব্দটির আসল মানে কাঠের পাত্র, কাঠের জলাধার। ঋগ্বেদে গৌণ অর্থই প্রধান হয়েছিল- সোমরসের আধার, সোমকলস। (-মনে হচ্ছে মহাভারতে বা অন্যত্র বলা আছে যে দ্রোণের উৎপত্তি সোমকলসে।) দ্রোণকে যদি সোমকলসের পুত্র এই রূপক কল্পনা করা যায় তবে দ্রুপদের কাছ থেকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চলে আসার একটা ভালো মিথিক ব্যাখ্যা মেলে। প্রাকবৈদিক আমলে-ভারতবর্ষের বাইরে-সোমযাজী ও অগ্নিহোত্রীদের মধ্যে একদা বেশ বিরোধ ছিল। আবেস্তায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এইরকম বিরোধের ফলেই আর্যদের মধ্যে ইরানীয়- ভারতীয় ফাটল স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। সোমযাজী অগ্নিহোত্রীদের আদিম দ্বন্দ্বের রেশ কোনও কোনও বৈদিক গল্পে ছাপ ফেলেছে। আগে সোম ছিল গন্ধর্বদের একচেটে ভোগ্যবস্তু। অগ্নিহোত্রপায়ী দেবতার তা প্রথমে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিতে চেষ্টা করেন, ব্যর্থ হয়ে তাঁরা দাম দিয়ে কিনেছিলেন।.....পাঞ্চগলের রাজা দ্রুপদ অগ্নিহোত্রী ছিলেন-সে কথা পরে বলব। আর কৌরব রাজা ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্ব সম্পর্কিত বলে-এবং নাগ/ হংস বলেও-সোমযাজী সুতরাং অগ্নিহোত্রবিরোধী ছিলেন। দ্রুপদ হয়তো আগে অগ্নিহোত্রী ছিলেন না, পরে হয়েছিলেন। তাই দ্রোণ তাঁকে ছেড়ে সোমযাজী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চলে আসেন।^{১৯}

প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যে তীব্র সংকট ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক রয়েছে- সেটিই মূলত প্রধানভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। এই তাত্ত্বিক ভাবনা কাঠামোর উপরে দাঁড়িয়েই প্রাবন্ধিক মহাভারতের একাধিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন দ্বারা খাণ্ডব অরণ্যে অগ্নিসংযোগ এবং বনের অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা- বিষয়টিতে দুইটি মিথিক তাৎপর্য দেখানো হয়েছে। একটি হল সোমযাজীর জায়গায় অগ্নিহোত্রের প্রতিস্থাপন এবং অন্যটি প্রাচীনতর কিন্তু বিরুদ্ধবাদী সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন। *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুও খাণ্ডবদাহন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই আদিম অরণ্য সংস্কৃতির ওপর আধুনিক নগরায়নের প্রতিষ্ঠাকেই তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন। এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু আগুন ও জলের মধ্যে যে দ্বন্দ্বিক সম্পর্কটি আছে, সেটিও দেশ-বিদেশের নানা সাহিত্য সহযোগে সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে রাখতে পেরেছিলেন।^{২০} সুকুমার সেন প্রাচীন ভারতীয় মিথ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, পালি জাতক, বেদ এবং আবেস্তার সঙ্গে প্রবন্ধের একাধিক জায়গায় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন কৌরবরা আসলেই গন্ধর্ব (হংস ও নাগ)। মানব এবং গন্ধর্ব (হংস ও নাগ) কৌরব-কৌরব্যদের মধ্যে সাধারণ নামও রয়েছে। যেমন, নাগ ধৃতরাষ্ট্র (মহা,পালি); হংস দুর্যোধনের পিতা ধতরট্ট গন্ধর্ব রাজা-নাগ রাজা (পালি)। আবার ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পুত্রদের জন্মের কাহিনি উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক সেটি নাগদের জন্ম বৃত্তান্ত বলেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কারণ ঘিয়ের ভাঁড়ের পাত্র থেকেই পরে একশোটি পুত্র জন্মায়। স্বাভাবিকভাবেই এটি নাগদের জন্মকেই ইঙ্গিত করে। অনুরূপভাবে দুর্যোধনের হৃদের

মধ্যে আত্মগোপনটি প্রাবন্ধিক নাগাশয় রূপে চিহ্নিত করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষের পর ধৃতরাষ্ট্র দ্বারা লৌহ নির্মিত ভীম মূর্তি ভেঙে ফেলার আখ্যানকে নাগবলরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবল অজগরের সঙ্গে মহাভারতে তুলনা করা আছে। গান্ধারীর দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের আঙ্গুলের নখ শুকিয়ে যাওয়ার আখ্যানকে মনসার বিষ দৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে এগুলি সোম-যাগের প্রতীক। সুকুমার সেনের এরকম অসাধারণ মিথিক ব্যাখ্যায় আমরা অভিভূত হয়েছি।

অন্যদিকে অগ্নিহোত্রের অনুসারী পাণ্ডবেরা ঠিক কুরু বংশের উত্তরাধিকারী নয়। প্রতিভা বসুও তাঁর *মহাভারতের মহারণে* দেখিয়েছেন যে কুরু বংশ থেকে বিশুদ্ধ রক্তের উত্তরাধিকার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। অশ্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভের পুত্রদের তো জৈবিক পিতা মহাভারতকার ব্যাসদেব। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, বেদ এবং মহাভারতেও স্বামীর অবর্তমানে অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভধারণের প্রথা আইনত স্বীকৃত ছিল। সেদিক থেকে অশ্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভের সন্তানের পিতার নাম বিচিত্রবীর্য। এদিক থেকে ধৃতরাষ্ট্ররা যথার্থই কুরু বংশের। কিন্তু পাণ্ডবেরা কুরু বংশের একেবারেই কেউ নয়, সুকুমার সেন এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। এর পেছনে মূলত দু'একটি কারণ প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, কুরুদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে কন্যাকে গৃহে এনে বিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু কুন্তীর ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। বরং কুন্তী নিজে তার স্বামীকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং কুরুদের প্রথা অনুসারে এই বিবাহ বিধিসিদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, পাণ্ডবদের জন্মকালে স্বয়ং তাদের বাবা বেঁচে ছিল, সুকুমার সেন এখানে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে স্বামীর জীবনকালে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদনের ইঙ্গিত ঋগ্বেদেও নেই। তাই এই কাহিনি যারা তৈরি করেছিল তাদের মনেও এ সম্বন্ধে বেশ দ্বিধা লক্ষণীয়। তাই কুন্তী পুত্রদের বলা হয়েছে দেবতাদের আশীর্বাদস্বরূপ। তবে এই কল্পনার মাধ্যমে হয়তো বড়ো একটি উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, মহাভারতের কাহিনি পৌরাণিক বৈদিক সাহিত্যের মতো দেবতা বনাম অসুর- এই দ্বন্দ্বের আবরণ পেয়েছে। এগুলির মাধ্যমে প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন স্পষ্টতই দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই দ্বন্দ্ব ও বিবাদ শুধুমাত্র দু'টি ভাইয়ের পুত্রদের মধ্যেই নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠী দুইটির মধ্যে। যাদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক একেবারেই নেই।

সোমযাজী এবং অগ্নিহোত্রীর মধ্যে তুলনামূলক নানা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সেন মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে বৈদিক দেবাসুর দ্বন্দ্বের কিছু মিল দেখিয়েছেন। যা এই জটিল তাত্ত্বিক আলোচনাটিকে সহজবোধ্য করতে সাহায্য করেছে:

কৌরবরা (আসলে গন্ধর্ব নাগ মানুষ যাই হোন না কেন) অসুরস্থানীয়, পাণ্ডবেরা স্পষ্টতই দেবতাস্থানীয়। অসুর-দেবতার মতো কৌরব-পাণ্ডবরাও পরস্পর ভায়াদ (বৈদিক গদ্যের ভাষায়

ভ্রাতৃত্ব)। অসুররা বুদ্ধিমান শিল্পজ্ঞ দক্ষ স্থিতিশীল, দেবতারা হৃদয়বান্ হাসিখুশি যাযাবর বা পর্যটক।^{২১}

দেবতা ও অসুর, উভয়ে প্রজাপতির সন্তান, আড়াআড়ি করতে শুরু করলেন। দেবতারা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, অসুররা ঘরে বসে রইলেন।^{২২}

এই বিষয়টি প্রাবন্ধিক সেন মহাভারতের ক্ষেত্রে পাণ্ডব বনাম কৌরবের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। বৈদিক দেবতাদের মতো পাণ্ডবরা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ী না থেকে ঘুরত, অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র সহ কৌরবরা হস্তিনাপুরে অচলভাবে অধিষ্ঠিত ছিল। এদিক থেকে শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যও সোম-যাগের প্রতীক, কারণ দ্রোণের জন্ম সোমকলসে। অন্যদিকে দ্রুপদ কথাটির অর্থ কাঠের পা, কাঠপোড়ার চিহ্ন। এই ক্ষেত্রে পাঞ্চাল রাজ্যের অধিপতির জন্য দ্বিতীয় অর্থটি প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। অগ্নির পদচিহ্ন যজ্ঞকুণ্ডের প্রতীক ধরা যায়। সেই দিক থেকে পাঞ্চাল অধিপতি অগ্নি-যাগের প্রতীক। এই পাঞ্চাল রাজ্যে পাণ্ডবেরা যখন এসে চিত্ররথ গন্ধর্বের পরামর্শে ধৌম্যকে পুরোহিত রূপে নিযুক্ত করল, তখন তাদের মধ্যে অগ্নিহোত্রের প্রথম ছাপ পাই। দ্বিতীয় অগ্নিহোত্রের সবথেকে বড়ো দৃষ্টান্ত হল কৃষ্ণা-দ্রৌপদীর পরিগ্রহ। তাই কৌরব-পাণ্ডব সম্পর্কে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী হল অগ্নিহোত্রে যজ্ঞবেদীর প্রতীক।

এগুলি ছাড়াও প্রবন্ধের মধ্যে মহাভারতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক অন্বেষণের উপস্থাপনা রেখেছেন প্রাবন্ধিক সেন। আলোচনার সীমিত পরিসরের মধ্যে উঠে এসেছে ঋগ্বেদের মার্তাণ্ড বনাম ইন্দ্রের বিরোধের কাহিনি, সেইটির সঙ্গে মহাভারতে কর্ণ বনাম অর্জুন দ্বৈরথকে মিলিয়েছেন প্রাবন্ধিক। মহাভারতে যেমন কর্ণ কুন্তীর প্রথম সন্তান, ঠিক তেমনই বৈদিক মার্তাণ্ডও অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র। তবে জন্মানোর পর উভয়কেই পরিত্যাগ করা হয়েছিল। পাণ্ডবদের মায়ের অন্য নাম পৃথা এবং দেবমাতা অদিতির নামান্তর পৃথিবী। এদিক থেকে দু'টি নামই সমধাতুজ শব্দ। মহাভারতে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়ে অরক্ষিতভাবে কর্ণ অর্জুনের কাছে প্রাণ ত্যাগ করে, অন্যদিকে বৈদিক ইন্দ্র মার্তাণ্ডের রথের চাকা চুরি করেছিল। এতো গেল বৈরিতার সম্পর্কের কথা। প্রাবন্ধিক সেন ঋগ্বেদের ইন্দ্র-কুৎস সম্পর্কটিকে মহাভারতে অর্জুন-কৃষ্ণ সম্পর্কের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন। এই বৈদিক কুৎস ইন্দ্রের সারথ্যও করত।

প্রাবন্ধিক সেনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অন্বেষণ হল বৈদিক ইন্দ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধের সঙ্গে মহাভারতের অর্জুন দ্বারা ভীষ্ম বধের ঘটনাকে মিলিয়ে দেখা। এটিকে তুলনামূলকভাবে আলোচনার জন্য ঋগ্বেদের পাশাপাশি ইরানের আবেস্তাকে নেওয়া হয়েছে। ভীষ্মের মৃত্যুর মতো করুণ পরিণতি গিলগামেশের মতো প্রাচীন কোনও মহাকাব্যের মধ্যে থেকে থাকতে পারে। ফলে সেই অতি প্রাচীন মিথের মূল কাঠামো ঋগ্বেদ, মহাভারত এবং আবেস্তার কাহিনির মধ্যে এসেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের কিছু অনুসন্ধান আমরা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি:

অথর্ব-সংহিতা থেকে জানতে পারি যে একদা এক অসুর-নারী ইন্দ্রকে দেব-সমাজ থেকে ভুলিয়ে এনে বশ করে রেখেছিল। কাঠক-সংহিতায় সে অসুর নারীর নাম পাওয়া যায়-বিলিস্তেঙ্গা। বিলিস্তেঙ্গার প্রেমাসক্ত হয়ে ইন্দ্র অসুরদের মধ্যে ছদ্মবেশে-পুরুষদের মধ্যে পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে মেয়ে হয়ে-বাস করেছিলেন। এই বৈদিক ব্যাপারের সঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা-কাহিনীর তুলনা সহজেই মনে আসে। বিরাট-রাজাস্তঃপুরে নপুংসক হয়ে বাস করার বৃত্তান্তও এই সঙ্গে তুলনীয়।..... বৈদিক ইন্দ্রের সঙ্গে মহাভারতের অর্জুনের আরও একটি অসাধারণ সাধারণ লক্ষণ হল পর্যটন- বাহুল্য। পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শম্বর অসুরকে খুঁজে বার করতে ইন্দ্রকে চল্লিশ বছর ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। অর্জুনের বারো বছর বনবাস আর অন্যত্র ভ্রমণ ও পর্যটন তো মহাভারতে প্রসিদ্ধ।^{২৩}

বৈদিক ইন্দ্রের সঙ্গে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ মিল ব্যক্ত করার পর ভীষ্মের সঙ্গে বৃত্রের মিলও দেখানো হল। বৈদিক বৃত্রের হাত ও পায়ের উল্লেখ নেই, কিন্তু মুখের উল্লেখ পাই। সুতরাং বৃত্রাসুর নিজে নাগের আকৃতি। অন্যদিকে ভীষ্ম মহাকায় মানুষ। এই দুই চরিত্রই নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করতে পেরেছিল। এছাড়াও মৃত্যুর সময়ে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মিল প্রাবন্ধিক চিহ্নিত করেছেন।

মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্ভের অনুমান ছিল যে যুধিষ্ঠিরের পিতা আসলে বিদুর। মহাভারতের মহারণ্যে প্রতিভা বসু'ও অনেকাংশেই আরও জোরালোভাবে এই মতটিকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তবে বুদ্ধদেব বসু'র মতো প্রাবন্ধিক সেন'ও বিষয়টিকে অন্যভাবে ভাবতে চেয়েছেন, এই ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন তৎসময়ে জনমানসে ধর্ম বলতে বিশেষ কোনও স্পষ্ট দেবতার চিত্রকল্প ফুটে ওঠে নি। লোকসমাজে ধর্ম শব্দটি অর্থ ছিল আদর্শ জীবন চর্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র অনুসারে জীবন কর্ম করে, সমাজের আদর্শ রীতি-নীতি মেনে চলে- সেই ধার্মিক। তাই যম দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কিছু মিল থাকলেও যম যুধিষ্ঠিরের পিতা নয়। এইদিক থেকে সৎ আচরণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার কারণেই যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ ও ধর্মপুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মহাভারতের কাহিনীর দুর্দান্ত একটি আখ্যানকেন্দ্রিক বিশ্লেষণও পেয়েছি প্রাবন্ধিক সেন'র আলোচনায়। আমরা বুঝতে পেরেছি যে মহাভারতের মধ্যে দু'টি একেবারে স্বতন্ত্রকাহিনি ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। এদের মধ্যে একটি বীজ-গল্প, অন্যটি ছোবড়া-গল্প। বীজ-গল্পের কাহিনি হল দুইটি ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ (যা এখানে কৌরব বনাম পাণ্ডব), ছোবড়া গল্পের বিষয়টি এসেছে প্রাক্ বৈদিক যুগের কোনও প্রিমিটিভ মিথ থেকে যেখানে দেবতা বনাম অসুর বৈরিতার দিকটি প্রতীয়মান হয়েছে। মহাভারতের বীজ গল্পের নায়ক ভীম, কারণ ভীম নিজের পরাক্রমী

শক্তির বলে ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান দুই পুত্রসহ অন্যান্যদেরও নিধন করেছিল। ফলে যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্র লোহার ভীম চূর্ণ করার মধ্যে দিয়ে বায়ুপুত্রের উপরই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। প্রাবন্ধিক সেনে'র মতো আমাদেরও মনে হয় রূপকথার গল্পগুলির আদলে যদি বীজ গল্পটির আখ্যানকে ভাবা হয়, তাহলে এই ধরনের আখ্যানের গল্পে দুই ভাইয়ের মধ্যে চরিত্রের পারস্পরিক বৈপরীত্য দেখা যায়। বৈপরীত্যের এরকম দিকটি সারা পৃথিবীর রূপকথার গল্পগুলির মধ্যেই মেলে। এই দিক থেকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমের একেবারে বিপরীত একটি মুখ। যেখানে বড়ো ভাই বোকা মানুষ, তাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে কাজ উদ্ধার করে ছোট ভাই। এদিক থেকে ভাবলে সুকুমার সেনে'র আখ্যানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়। অন্যদিকে ছোবড়া গল্পটি অলংকারের মতো কাজ করেছে। প্রাবন্ধিক সেন তাই মনে করেছেন অর্জুন হল এই দুই ধরনের গল্পের মাঝে সংযোগের প্রধান শৃঙ্খল। অর্জুন মহাভারতকারের কল্পনার এমন এক চরিত্র, যাকে প্রায় নায়ক চরিত্রের সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে মহাভারতকার তার প্রয়াসের কোনও সীমা রাখে নি।

এই প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে ছোবড়া গল্পের একটি সমাজতাত্ত্বিক উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা প্রাবন্ধিক সেন উল্লেখ করেছেন। ছোবড়া গল্পের মধ্যে সেই সময়ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং সাধারণ প্রজাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ছবিটি উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত যাগ-যজ্ঞ এবং পূজার কারণে সমাজের পুরোহিত স্তরের মানুষেরা রাজত্ব ও দৈনন্দিন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজকর্মে নিজেদের উপস্থিতি জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারে নি, তার ফলে সমাজে স্তরভেদ দেখা দেয়। এই ছোবড়া গল্পে তার একাধিক উদাহরণ প্রাবন্ধিক সেন উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়ে ঋষি পরশুরাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজন্যশ্রেণিকে ধ্বংসের বিষয়টি উঠে এসেছে এবং দ্রোণাচার্য বনাম পাণ্ডবরাজ দ্রুপদের লড়াইটাও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিরোধের ছবিটি আমরা অমলেশ ভট্টাচার্য রচিত *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে আরও ভালো পেয়েছি। পরে আমরা তা নিয়ে কথা অবশ্যই বলব।

প্রাবন্ধিক দেবীদাস আচার্যের *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* নামের বইতে সুকুমার সেনে'র ছোবড়া গল্পকেন্দ্রিক মহাভারতের যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে, তার জোরালো সমর্থন খুঁজে পাই। পুরোহিত এবং ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে এই যে একপ্রকার ক্ষমতার উচ্চস্তরে থাকতে চাওয়ার জন্য লড়াই, সেই সম্পর্কে পিতামহ ভীষ্ম বারবার যুধিষ্ঠিরকে সচেতন করেছে। সেই কারণে ভীষ্মের পরামর্শ হল একজন রাজার উচিত সর্বদা পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে রাজ্য শাসনের নানান খুঁটিনাটি দিক জেনে নেওয়া। সমাজের ব্রাহ্মণেরা যদি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে, তাহলে রাজার পক্ষে রাজত্ব চালানো কঠিন হয়ে যায়। তৎকালীন সমাজে এই

দ্বান্দ্বিক সংকট ভালোই ছিল, সেই কারণেই ভীষ্ম মহাভারতের একাধিক জায়গায় যুধিষ্ঠিরকে এই বিষয়ে সতর্ক করে গেছে। প্রাবন্ধিক দেবীদাস আচার্য লিখেছেন:

এ দেশের জাতি-বর্ণসংকুল শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মৈত্রী খুবই প্রাচীন। মহাভারতের মতে, দেবতারা একই উপাদান দিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণের রয়েছে তপোবল ও মন্ত্রবল। আর ক্ষত্রিয়ের ভাগে অস্ত্রবল ও বাহুবল। ভীষ্ম এই প্রসঙ্গে কুবের-মুচুকুন্দ সংবাদ যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছেন। যুধিষ্ঠির বিলক্ষণ জানেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই সমস্ত জগতের উন্নতির মূল। রাজ্যের বৃদ্ধি ও সুরক্ষা তাঁদেরই অধীন। কিন্তু তাঁর এই ভাবনায় একটু ভুল ছিল, যা শুধরে দিলেন ভীষ্ম। বললেন-রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজার অধীন, আবার রাজার বৃদ্ধি ও রক্ষা তাঁর পুরোহিতের অধীন। মহাভারত বারবার বলেছে, যে রাজা সম্পদশালী হতে চান, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চান, তিনি পুরোহিতের পরামর্শ মতো চলবেন।^{২৪}

তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চাওয়ার যে দ্বন্দ্ব সেটার বাইরেও সাধারণ জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক রুচি মেনে চলার বিষয়টি খেয়াল রাখত রাষ্ট্রপ্রধানেরা। প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন তাঁর আলোচনায় ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের বিষয়ে আলোকপাত করলেও সাধারণ প্রজা ও জনসাধারণের বিষয়টি বলেন নি। দেবীদাস আচার্যের *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* নামের বইতে স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে, সাধারণ প্রজাদের রুচি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্য চালাতে গিয়ে অনেক সময়তেই রাজাকে সিংহাসন হারাতে হয়েছে। তাই আমাদের মনে হয়েছে যে, সুকুমার সেন ছোবড়া গল্পের বিশ্লেষণে এই বিষয়টি আলোচনা করলে অধিকতর যুক্তিসম্মত হতো। দেবীদাস আচার্য রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজাদের বিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন রাজা বেণের মৃত্যুর ঘটনা, প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে রাজা যযাতি ছোট ছেলেকে পরবর্তী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার জন্য জনসাধারণের আপত্তি ও ক্ষোভ এবং সেজন্য যযাতিকে নিজ সিদ্ধান্তের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার কাহিনিটি উঠে এসেছে। হস্তিনাপুরে রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণতা দেখার পর সাধারণ প্রজাদের আশীর্বাদ পাণ্ডবদের পক্ষে যায়, প্রজারা পরবর্তী যুবরাজ হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে চায়। ফলে তাদের ক্ষোভ দূর করার জন্য দূরবর্তী বারণাবতে পাঠিয়ে দুর্যোধন তার কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। এছাড়াও বনবাসে যাওয়ার আগে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়ই রাজ্যের প্রজাদের কাছে হাতজোড় করে নিজেদের ত্রুটিগুলি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলির জন্য আমাদের মনে হয়েছে ব্রাহ্মণ শ্রেণি বনাম ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিরোধের দিকটি আলোচনার পাশাপাশি সাধারণ জনসাধারণের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দিকটিও আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরি।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বিশ শতকে যে সমস্ত সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক ‘বাঙালির মহাভারত চর্চা’ নিয়ে ভেবেছেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অবশ্যই অন্যতম। *মহাভারতের কথা* নামে বিখ্যাত প্রবন্ধের বইটি রচিত হয়েছিল ১৯৭১-৭২ এর হেমন্ত এবং শীতঋতুতে। এরপর তা ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ১৮ ই চৈত্র থেকে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ পর্যন্ত দেশ পত্রিকায় আঠারোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। সামান্য সংশোধনের পর ১৯৭৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি যথার্থভাবে পড়ে থাকলে মহাভারতের নানা দিক নতুন করে তা আমাদের ভাবতে সাহায্য করে। এই আশ্চর্য বইটি শুধুমাত্র বুদ্ধদেব বসু’র মহাভারত চর্চার নতুন এক দিগন্তই কেবল নয়, বইটির খ্যাতির অন্যতম প্রধান একটি দিক হল বইটিতে স্থান পাওয়া ১৬২টি টীকা। সমগ্র বইটির সঙ্গে টীকাগুলিকে মিলিয়ে একত্র পাঠ করা গেলে তবেই গ্রন্থটির আলোচনার পরিধি এবং বক্তব্য বিষয় পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থটিতে বুদ্ধদেব বসু’র মহাভারত চর্চা মোক্ষলাভ স্পর্শ করেছে। একই সঙ্গে আমরাও গর্ব অনুভব করেছি বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যকে এমন একটি সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ দেওয়ার জন্য।

মহাভারতে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের সামনে দাঁড়ানো এক কিশোর রাজকুমারকে আমরা দেখেছিলাম, মহাভারতের বিশাল পটভূমির তীরে এই ঘটনার হয়তো তেমন গুরুত্ব নেই। মহাভারতের পাঠকেরা কিছুটা কৌতুকের সঙ্গেই যুধিষ্ঠিরের অসাফল্যকে দেখতে পেয়েছিল। শুধুমাত্র বয়সে জ্যেষ্ঠ বলেই গুরুর পরীক্ষায় যুধিষ্ঠির প্রথম সুযোগ পেয়েছিল, শ্রেষ্ঠ বলে নয়। আর অস্ত্র পরীক্ষাতে সেরার শিরোপা তার মুকুটে কোনওদিনও একটি অতিরিক্ত পালক হিসাবে স্থান পায় নি। পাখির চোখের দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত সে কোনওদিনও করে উঠতেই পারে নি। তার বদলে তার নজরে এসেছে সমগ্র পাখিটি, গাছের ডালপালা, মাথার ওপরে নীলাভ আকাশ ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু অস্ত্র পরীক্ষাতে পরাজিত এক রাজকুমারকে জীবনের পরীক্ষায় নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়, তাকে করে তুলেছেন আমাদের অন্যতম প্রিয় মহাকাব্যের নায়ক যুধিষ্ঠির। বলা বাহুল্য, এমন একটি চরিত্রকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মহাভারতের কথা* গ্রন্থটিতে শ্রেষ্ঠ নায়ক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করলেন, এর পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এরকম মূল্যবান এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য কেউ সেরকমভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি। মহাভারতের একাধিক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি তুলে এনেছেন দেশ-বিদেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য, উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গ। বিশ শতকে যে সমস্ত প্রাবন্ধিক মহাভারত নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বই

লিখেছেন, তাদের প্রায় অনেকেই যুধিষ্ঠিরকে খুবই দুর্বল একটি চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। মহাভারতের কথা-র গুরুত্ব এইখানেই যে, যুধিষ্ঠিরকে তিনি বৌদ্ধিক যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে উচ্চতার এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন।

সমগ্র মহাভারত জুড়েই যুধিষ্ঠির বারবার পাঠকের সামনে এসে হাজির হয়ে থাকে, অনেক সময়তেই যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি আমাদের বিচলিত করলেও মহাভারতের পাঠক সচেতনভাবে তা এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে অসত্যভাষণ এবং পাশা খেলার নেশাকে ঘিরে তার অপরিণামদর্শিতা। পাশা খেলায় মত্ত এবং প্রায় সম্পূর্ণ বাহ্যিক বোধশূন্য সম্রাট নিজ ভাইদের ও দ্রৌপদীর জীবনে নামিয়ে এনেছিল ঘোর অনিশ্চয়তার ছায়া। নিশ্চেষ্ট মূঢ়তায় দ্রৌপদীর জীবনে অকল্পনীয় লাঞ্ছনার ভবিতব্য ডেকে আনার জন্য আমরা যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করতে পারি নি। যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে ভাবতে গেলে যখন আমাদের মনের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলি ক্রমশ উঠে আসে, তখন মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ অন্য একটি দিক বুদ্ধদেব বসু আমাদের সামনে তুলে আনেন।

বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘বনবাসের শেষ দিন’। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমগ্র বইটি জুড়ে যে কথাগুলি বলবার চেষ্টা করেছেন, তার পূর্বাভাস ও পূর্বরূপ এই প্রথম অধ্যায়ে পাই। নায়ক হিসাবে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুদ্ধদেব বসু প্রথমেই আমাদের নিয়ে যান সামান্য এক জলাশয়ের ধারে, যেখানে যুধিষ্ঠিরের দিগ্বিজয়ী অমিতশক্তিমান ভাইরা ভুলুষ্ঠিত। প্রত্যেকেই চেতনা লুপ্ত হয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ধর্ম বকের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের এই কথোপকথনের বৃহৎ পটভূমিতে প্রাবন্ধিক আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ধর্ম বকের উত্থাপিত একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে সে হারানো ভাইদের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। অন্যান্য ভাইদের মতো যুধিষ্ঠির সফল যোদ্ধা নয়, দিগ্বিজয়ী ভাইদের মতো গুরুর কাছে দীক্ষা হয় নি তার। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় ছাড়িয়ে যুধিষ্ঠির যা কিছু পারে, আর তো কেউ পারে না ঠিক এমনি করে চেতনালুপ্ত শরীরে প্রাণের আভা ফিরিয়ে দিতে। এই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তটিকে আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন। বনবাসের এই সময়কাল থেকে শুরু করে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রিয় নায়ক চরিত্রটিকে কেবলই ভালোবাসায় খুঁজে ফেরেন। প্রাবন্ধিক মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহ অনেকখানি পেছনে ফেলে এসে, বনপর্বের এই যুধিষ্ঠির এবং যক্ষের কথোপকথনটিকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাভারতের ব্যাপকতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন। প্রাবন্ধিক আমাদের অনুভব করিয়েছেন মহাভারতের দার্শনিক, নাটকীয়, অতিরঞ্জিত এবং প্রক্ষেপযুক্ত এই সুবিশাল কাহিনিকে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এই বিষয়ে ভাব-নিরপেক্ষ। বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের অনেক প্রক্ষিপ্ত

অংশকে মেনে নিলেও, ভারতীয় জনপ্রিয় এই মহাকাব্যটিকে একটি ‘টেক্সট’ হিসাবে দেখার দৃষ্টিটি তাঁর নিরপেক্ষ। মহাভারতকে তিনি নির্দিষ্ট কোনও গ্রন্থ হিসেবে দেখতে রাজি নন, মহাভারত তাঁর কাছে কেবল ধর্মগ্রন্থ বা পুরাণ নয়। এটি কাব্য, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, বিশ্বকোষ ও সমকালীন ভারতের নানান ছবি সম্বলিত এক বিরাট গ্রন্থ।

কিন্তু শুধু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে নয়, সমগ্র মহাভারতেও একটি ঐক্য আমরা খুঁজে পাবো, যদি তার বহিরাশ্রয় বিশ্লেষণ করি। বহিরাশ্রয়-মানে গল্পাংশ, যাকে বলে ‘প্লট’ অথবা মূল কাহিনী। প্রশ্ন উঠতে পারে, সেটি কী, কতটুকু, কোন কোন অংশ নিয়ে তার সংগঠন, আমরা তার সীমারেখা টানবো কোথায়? এ-বিষয়ে আমার যা ধারণা তা আশা করি এই আলোচনাক্রমে প্রকাশ পাবে; এখানে শুধু দু-একটি কথা ব’লে রাখতে চাই। প্রথমত, তা নিছক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নয়-কোনোমতেই নয়; কোনো রুধিরাক্ত নিবেলুঙ্গেন-গাথার হিন্দু প্রকরণরূপে মহাভারতকে কল্পনা করা অসম্ভব। যদি কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষই মূল কাহিনী ব’লে নির্দিষ্ট হয়, তাহ’লে তো আদিপর্বের শেষার্ধ, সভাপর্ব, উদ্যোগপর্ব আর গীতা-বর্জিত ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্যন্ত পাঁচটি পর্বকে সংক্ষেপিত ক’রে নিলেই আমরা ‘বিশুদ্ধ’ মহাভারতটিকে হাতে পেয়ে যাই, অন্য সবই অনাবশ্যক হ’য়ে পড়ে। কিন্তু এ-ভাবে সম্পাদিত হ’লে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই ভারত-কথাটি ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার বাইরে প’ড়ে থাকতো, গ্রন্থাগারে সুখনিদ্রায় মগ্ন, যা থেকে তাকে মাঝে-মাঝে টেনে তুলতেন শুধু শ্যামল অথবা অরুণবর্ণ পণ্ডিতেরা। অথবা যদি ভারতবংশের বিবরণ ব’লে ভাবি তাহ’লে প্রথমেই বন ও মৌষলপর্বকে ছেঁটে ফেলতে হয়-মহাভারতকে বর্বর হাতে মর্মাঘাত ক’রে। আমার কাছে এ-কথা অতি স্পষ্ট যে মহাভারতের মূল কাহিনী তার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত-অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে-মরুপ্রতিম শান্তি ও অনুশাসনটিও সর্বতোভাবে এর ব্যতিক্রম নয়। ২৫

প্রাবন্ধিকের মহাভারতের মতো একটি সমৃদ্ধশালী মহাকাব্যকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি যথেষ্ট আধুনিক। বুদ্ধদেব বসু’র উক্তি থেকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যে, মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্য আক্ষরিক অর্থেই ‘মহাভারত’ হয়ে ওঠার পেছনে গ্রন্থটির সমস্ত পর্বগুলি সমান ভূমিকা পালন করেছে। প্রাবন্ধিকের এই ভাবনাটিকে আমরাও গ্রহণ করেছি। মহাভারতের কথা বইটিতে তিনি স্পষ্টতই আমাদের দেখাতে পেরেছেন যে, মহাভারতের মূলরস শান্ত রস। শুধুমাত্র সাম্রাজ্য দখলের জন্য ক্ষমতার লড়াই ও যুদ্ধ মহাভারতের অন্যতম বিষয় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই যুদ্ধ ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বৃত্তের বাইরেও মহাভারতের একটি বড়ো পরিসর আছে। আমাদের জীবনবোধ ও সমাজ জীবনেও মহাভারতের এই পরিসরটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই বিষয়ে দু’একটি কথা বলে বিষয়টিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

আমাদের জীবনবোধ, ধর্ম ও দর্শন চেতনা এবং ব্যক্তি জীবনের সংকট থেকে উত্তরণের উপায় প্রভৃতি মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্বগুলিতে পাওয়া যায়। ধরা যাক,

ধর্মের স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সেই সম্পর্কিত নানা গল্প, রাজা কীভাবে তার সাম্রাজ্য চালাবেন, রাজা কীভাবে কোনও উপায় অবলম্বন করে শত্রুর আক্রমণ রোধ করবেন, রাজা কীভাবে দেশের কর ব্যবস্থা উন্নত করবেন, রাজার শত্রু ও মিত্র কারা হতে পারেন, একজন আদর্শ রাজার গুণাবলী কেমন হবে, ন্যায় কী, এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি ও গল্প এই পর্বগুলিতে ভরে আছে। এই পর্বগুলি ঈশ্বর, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্বের গভীর ভাষ্য বহন করে চলেছে। মহাভারতের প্রধান রস এই পর্বগুলোর মধ্যেই নিহিত আছে। নীতিকথা, গল্প, পুরাণকথার মধ্যে দিয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু যুক্তিনির্ভর এক আলোচনার মাধ্যমে মহাভারতের এই কম আলোকপ্রাপ্ত একটি দিক সুন্দরভাবে উত্থাপন করেছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, এই তিন পর্বগুলির গল্প ও পুরাণকথাগুলি বর্তমান ভারতের ঘটে চলা নানা সংকটের আয়ুধ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে বিবিধ রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের উত্তর লুকিয়ে আছে এই সমস্ত নীতিকথা, গল্প, পুরাণকথাগুলির মধ্যে। একুশ শতকে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিরিখে এই সমস্ত পুরাণ কথাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

এই বিষয়ে আমরা কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করছি। পাশা খেলায় পরাজিত সম্রাট যুধিষ্ঠির সমস্ত মহামূল্যবান সম্পদ হারিয়ে, নিজ রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের উপরে কর্তৃত্ব হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় সম্পূর্ণ বনবাসীর মতো জীবন কাটাচ্ছে। হারিয়েছে সম্পূর্ণ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ, সামনের দিনগুলির বিষয়ে ক্রমশ উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে। যাবতীয় বিপর্যয়ের জন্য ধর্মরাজ নিজেকে এবং ভাগ্য বিপর্যয়কে অনবরত দোষ দিয়ে চলেছে। কীভাবে পরবর্তী বছরগুলিতে জীবন অতিবাহিত করবে - ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোনওভাবেই বুঝে উঠতে পারছে না। এরকম এক চূড়ান্ত সংকটময় পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠির বিভিন্ন ঋষি এবং মুনিদের সান্নিধ্যে বারো বছর কাটিয়েছে, মার্কণ্ডেয় এবং লোমশ ঋষিদের কাছে অধীর আগ্রহে শুনেছে প্রত্যেকটি তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ও জ্ঞানমূলক নানা বাণী। একেবারে সাধারণ সন্ন্যাসীর মতো পায়ে হেঁটে আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধু প্রদেশ ঘুরে এসেছে। যেখানে এই বছরগুলিতে অর্জুন ও ভীম ক্রমাগত নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করেছে, সেখানে যুধিষ্ঠির একাগ্রচিত্তে বাধ্য ছাত্রের ন্যায় কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জন করেই চলেছে। অনেক সময় যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থান আমাদের গভীরভাবে পীড়া দেয়, মেনে নিতে কষ্ট হয় যে সমস্ত কিছু বিনষ্টের পরেও একজন মানুষ এতটা নির্লিপ্ত হয় কীভাবে! কিন্তু প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখাতে পেরেছেন যে, এই বারো বছরগুলিতে যুধিষ্ঠির যা কিছু শিখবে ও অনুধাবন করবে সেইসব জ্ঞান তার পরবর্তী বছরগুলিতে রাজত্ব চালাবার কাজে সহায়ক হবে। প্রাবন্ধিক খুবই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, ঋষিদের সান্নিধ্যে যুধিষ্ঠির জীবনযুদ্ধে বাঁচবার রসদ পাচ্ছে। জীবনের রণক্ষেত্রে পরাজিত, অপমানিত একজন মানুষ ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

লোমশ এবং মার্কণ্ডেয় মুনি ও ঋষিদের সান্নিধ্যে থাকার সময় যুধিষ্ঠিরের মনে এক গভীর প্রশ্নের উদয় হয়, সে প্রশ্ন করে জানতে চায় যে কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরই কি জগতে সবচেয়ে বেশি দুঃখী? বলা বাহুল্য, প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু যত্নসহকারে দেখাতে পেরেছেন যে বনপর্ব মহাভারতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আত্মজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। শুধুমাত্র গভীর দার্শনিক বোধের জন্ম দিয়েই বনপর্ব শেষ হয় নি, সেখানে এগুলির উত্তরও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেওয়া আছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে লোমশ জানাচ্ছে যে, রাজা শুধুমাত্র আপনি একাই এই পৃথিবীর চরম যন্ত্রণা, কষ্ট, বেদনা, হাহাকার পান নি। মহারাজ আপনার থেকেও নল অনেক বেশি বেদনা অনুভব করেছিল, আপনিই কেবলমাত্র একা নন। এরপর লোমশ মুনি রাজা নল কীভাবে সমস্ত সম্পদ অর্জন করেছিল এবং যুধিষ্ঠিরের মতো পাশা খেলায় হেরে যাবার ফলে রাজা নলের ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া করুণ অবস্থার বর্ণনা যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছিল। লোমশ আরও বলেন কীভাবে কোন উপায় অবলম্বন করলে রাজা নলের মতো যুধিষ্ঠিরও সমস্ত কিছু পূর্বের ন্যায় ফিরে পেতে পারে। আমরা খেয়াল করলে সহজেই বুঝতে পারব যে, এই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলি থেকে যুধিষ্ঠির ক্রমশ মানসিক দিক থেকে দৃঢ় হতে পারছে এবং এই মানসিক ক্ষমতা সামনের দিনে যুদ্ধের ময়দানে তার পাথেয় হবে। এর পাশাপাশি এই পর্বেই আমরা দেখতে পাই যে দ্রৌপদীও ঋষিদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে। ঋষিরা দ্রৌপদীকে আরও জানিয়েছে যে সাবিদ্রীর হাহাকার, বেদনা দ্রুপদ তনয়া অপেক্ষা অনেকাংশে তীব্র ছিল। ব্যাসদেব, নারদ, স্বর্গের দেবতাদের, মহাদেব ও ঋষিদের থেকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য, ধর্ম সম্পর্কে যুধিষ্ঠির এই পর্বগুলিতে বিশদে জ্ঞানলাভ করেই চলেছে। আমরা শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্ব জুড়েও দেখতে পাই যে যুধিষ্ঠির শুধুই বাধ্য ছাত্রের মতো শিখে চলেছে।

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু *মহাভারতের কথা* বইতে এই বিষয়টি খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আর যখন, বনবাসের অন্তিম দিনে, সেই রহস্যময় বকপক্ষীর সামনে যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখতে পাই, তখনই উপলব্ধি করি যে এই অরণ্য-যেখানে দ্রৌপদী মনোদুঃখী, আর ভীম-অর্জুন অবিশ্রান্ত সংগ্রামশীল-তা ছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে এক বিদ্যালয়, এক মহান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে বারো বছর ধরে শিক্ষা পেয়েছেন তিনি-অস্ত্রবিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয়- আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধান, বিশ্বচেতনায়।^{২৬}

মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্বে-র এইরকম একটি চমৎকার বিশ্লেষণ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু উপস্থাপনের পরেই আমাদের আবারও নিয়ে গিয়েছেন মহাভারতের জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব

যুধিষ্ঠিরের নিকট। বইটির প্রথম চারটি অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে প্রারম্ভিক সামান্য আলোচনার পর প্রাবন্ধিক আমাদের সামনে হাজির করেন ‘নায়কের সন্ধানে’। এরপর কার্যত পুরো বইটি জুড়েই বুদ্ধদেব বসু আমাদের সামনে তাঁর মহাভারতের নায়ক চরিত্রটিকে উত্থাপন করেছেন। বইটির চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে প্রাবন্ধিকের একটি বক্তব্য তুলে ধরেছি:

কিন্তু ঐক্যসাধনও অবলম্বননির্ভর, আর আমার কাছে এ-কথাও স্পষ্ট যে সেই অবলম্বন বা উপায় হিশেবে ব্যাসদেব একটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন-একটি চরিত্র, যাঁকে কেন্দ্র করে অন্য সব বিষয় দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ হ’তে পারে-অর্থাৎ মহাভারতে আমি একজন নায়কের উপস্থিতি অনুভব করি। এবং সেই নায়ক বা কেন্দ্রিক চরিত্রটি-বহুযুদ্ধজয়ী বহুনারীসেবিত শ্রুতকীর্তি অর্জুন নন, সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তর বাসুদেবও নন-তিনি এক ধীর মৃদু লজ্জাশীল অস্থিরমতি মানুষ: তিনি যুধিষ্ঠির।^{২৭}

মহাভারতে বর্ণময়, রঙিন এবং বহুমাত্রিক চরিত্রের অভাব একেবারেই নেই। সেখানে যুধিষ্ঠিরের মতো একটি বর্ণহীন ও প্রায় একমাত্রিক একটি চরিত্রকে নায়কের আসনে বসানো বেশ অনেকটা সমস্যাডায়ক বিষয়। প্রাবন্ধিক সম্ভবত এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই প্রাথমিকভাবে দু’একটি কথা তিনি উত্থাপন করেছেন। প্রাবন্ধিক যুধিষ্ঠির সম্পর্কে বলেছেন-মহাকাব্যের নায়কোচিত কোনও লক্ষণেই তেমনভাবে কখনও সে ভূষিত হয় নি, কাহিনির মধ্যে তার অগ্রসরণও অতি মন্থর এবং সবশেষে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে বাঙালি সেরকমভাবে কোনও সাহিত্য রচনা করে নি। এরকম কোনও একটি চরিত্রকে আমরা কীভাবে নায়কের আসনে বসাতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রাবন্ধিক তাঁর পুরো *মহাভারতের কথা* জুড়ে খুঁজে দেখতে চেয়েছেন। যুধিষ্ঠিরকে নায়কের আসনে বসাতে গিয়ে প্রাবন্ধিক দেশ-বিদেশের বিখ্যাত এবং প্রতিনিধি স্থানীয় স্তরে আলোচিত বেশ কিছু সাহিত্য গ্রন্থের (টেক্সট) দৃষ্টান্ত এনেছেন। তুলনা- প্রতিতুলনার নানা চেহারায় উঠে এসেছে আকিলেউস-হেজোরের *ইলিয়াড*, দান্তের *ইনফের্নো*, গ্যেটে-র *ফাউস্ট*, এসেছে অন্ধ রাজা অয়দিপৌস ও আগামেন্নন প্রসঙ্গ, এসেছে ভার্জিলের *ঈনিয়াস*-দিদোর কাহিনি। *রামায়ণে*-র রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনামূলক একাধিক আলোচনা আমাদের নজর এড়িয়ে যায় নি। এছাড়াও লিও তলস্তয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চার অধ্যায়* আলোচনায় নানা সময় উঠে এসেছে। যুধিষ্ঠিরকে মহাকাব্যের নায়ক চরিত্রের আসনে বসানোর জন্য প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর এই বিপুল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমাদের ঋদ্ধ করে।

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু’র যুধিষ্ঠিরের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কিত বিশ্লেষণটি আমাদের খুবই মূল্যবান মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব প্রতিভা বসু’র *মহাভারতের মহারণো* -র সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত উত্থাপন করেছেন। মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্ভে’র মতামতের

সঙ্গে প্রতিভা বসু অনেকাংশে সহমত পোষণ করেছেন। প্রতিভা বসু তাঁর পুরো বইটি জুড়ে এক দক্ষ গোয়েন্দার চোখ দিয়ে যুধিষ্ঠির, বিদুর, ব্যাসদেব, সত্যবতী-র নানা কার্যকলাপ এবং বক্তব্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিভা বসু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়েছেন যে, মহাভারত নামত ভরতবংশের ইতিহাস হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা সত্যবতী-দ্বৈপায়নের বংশের ইতিকথা। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন ধর্মাচরণ-ই যুধিষ্ঠির ও বিদুরের মধ্যে সম্পর্কের মূল যোগসূত্র। যেখানে প্রতিভা বসু'র বইটির মূল প্রতিপাদ্যই হল উভয়ের সম্পর্কের ভিত্তি ধর্মে নয়, রাজা শান্তনুর সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্তে। অন্যদিকে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু'র বক্তব্যটি অনেক বেশি উদার ও মুক্ত। তিনি ইরাবতী কার্ভের তত্ত্বটিও সযত্নে উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্রে ধর্ম ও যমের স্বরূপ এবং অবস্থান উল্লেখ করতে ভোলেন নি, বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যকার সাদৃশ্যগুলি দেখিয়েছেন এবং উভয়ের চরিত্রের মধ্যে মিলগুলিও উত্থাপন করেছেন। কিন্তু প্রাবন্ধিকের মতো আমরাও মনে করি যে, বিদুর ও যুধিষ্ঠিরকে পিতা ও পুত্ররূপে মেনে নিলে মহাভারতের পরিচিত কাঠামোটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন যে, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যদি মানবসন্তান হতো, তাহলে সেটি মহাভারতের ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী ইঙ্গিতপূর্ণ একটি ঘটনা হয়ে থাকত। সূর্যপুত্র কর্ণের জন্মের মতো সেটিও খুব সহজেই প্রকাশিত হয়ে যেত। প্রাবন্ধিক যুধিষ্ঠির-বিদুরের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের মাত্রাটি স্বীকার করেন নি, পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন উভয়ের ধর্মবোধ ও সাধুতা এবং সদাচার।

‘আগুন-জলের গল্প’ হল বুদ্ধদেব বসুর নিজের আবিষ্কার। যাঁরা মিথ নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা মিথ ভাবনার অন্তরাল থেকে আবিষ্কার করেন বাস্তব বা পরাবাস্তবের এক সত্যকে। সেই সত্য আমাদের বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সঙ্গে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত। প্রাবন্ধিক খাণ্ডবদাহনের কাহিনিকে একটি নগর সভ্যতা বিকাশের ধারা হিসাবে পড়তে চান। খাণ্ডবদাহনের তাৎপর্য বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আমাদের আগুন-জলের গভীরতর এক বিন্যাসের গল্প বলতে থাকেন। বিশ্বসাহিত্য থেকে উঠে আসে আকিলেউস-স্কামান্দ্রাসের সেই *ইলিয়াড* কাহিনি, যেখানে আগুন জয়লাভ করে, দেবতার প্রবল রোষান্বিতে যেখানে নদীর স্রোত ধ্বংস হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, খাণ্ডবদাহনতেও ইন্দ্রের পরাজয় ঘটে। জয়ী হয় অগ্নি, বৃষ্টির বিরুদ্ধে জয় হয় দাবানলের। এই পরস্পর বৈপরীত্যের মধ্যেও *মহাভারতের কথা*-র লেখক খুঁজে পান ‘একটি মৌলিক মৈত্রী’।

নারীর গর্ভে জল, পুরুষের বীর্ষে আগুন-এদের সহকর্মিতার ফলে জন্ম হয় প্রাণীর, সৃষ্টি ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়। এবং বিপরীতের এই সন্ধির উপরেই নির্ভর করে আছে অন্য সব জন্ম ও উৎপাদন: বৃষ্টি ও রৌদ্রের সমবায়ে শস্য ফল সজ্জাত ও পরিপুষ্ট হয়, আগুন জলের সংযোগে আমাদের অন্ন স্বাদু ও সুপাচ্য হয়ে ওঠে।^{২৮}

প্রাবন্ধিকের গুরুত্বপূর্ণ এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই খাণ্ডবদাহন শুধুমাত্র অগ্নি ও বরুণের বিরোধের এক কাহিনি হয়েই থেকে যায় না, প্রকাশিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরও একাধিক অর্থ নিয়ে। প্রাবন্ধিক আমাদের মনে করিয়ে দেন মহাপ্রস্থানের পথে বীর ও পরাক্রমশালী অর্জুনকেও তার গাণ্ডীব ও তূণ সাগরজলে নিক্ষেপ করতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু আরও দেখিয়েছেন কৃষ্ণের নগরীকে বরুণই শেষ পর্যন্ত গ্রাস করেছিল এবং বলরামও যোগবলে নিজের দেহ সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এভাবে ‘আগুন-জলের গল্প’ একটি পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে। এর মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে ধরা দেয় যে, প্রত্যেক সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য। এভাবে প্রাবন্ধিকের আগুন ও জলের আবিষ্কৃত প্রতিপাদ্যটি একটি সুন্দর উপস্থাপনা হয়ে ওঠে।

মহাকাব্যের নায়ক রূপে কোনও চরিত্রকে বেছে নেওয়ার পেছনে কিছু মানদণ্ড ও যুক্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। এগুলির মধ্যে থাকতে পারে- প্রণয়যোগ্যতা, ত্যাগ, বীরত্ব, মহৎ কার্যকলাপ, কাহিনির মধ্যে অগ্রসরণ, নায়কোচিত লক্ষণ ইত্যাদি। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরকে নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন মূলত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ধর্মবোধ। এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই *মহাভারতের কথা*-র নায়ক দাঁড়িয়ে আছে।

মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্যের নানা বিশ্লেষণ বহুমাত্রিক হওয়াটাই কাম্য। ফলে প্রাবন্ধিকের নায়ক রূপে যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠাকে আমাদের সর্বদা মেনে নিতে অসুবিধা হয়। শৌর্য, বীরত্ব, প্রতিভা-র মতো নায়কোচিত গুণগুলি মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের থেকে অন্যান্য অনেক চরিত্রের মধ্যে নিশ্চিত রূপেই বেশি পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক কিছু ক্ষেত্রে নীতিবাগীশের ভূমিকা পালন করেছে বলে আমাদের মনে হয়। যুধিষ্ঠিরকে একটি জায়গায় ‘অতি সাত্ত্বিক’ আখ্যায়িত করা হচ্ছে, কারণ সে অর্জুনের মতো অধিক নারীসঙ্গ করে নি। বলা বাহুল্য, এইরকম যুক্তিগুলি যথাযথ শক্তিশালী বলে মনে হয় নি। কারণ কম বা বেশি নারীসঙ্গ ভোগের সঙ্গে নায়ক হওয়ার বিষয়টি একেবারেই জড়িয়ে নেই। মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রকে যদি তর্কের খাতিরে আপাতত সরিয়ে রাখা হয়, তাহলেও তাই অর্জুনের সঙ্গে নায়ক হিসাবে যুধিষ্ঠির বেমানান। কিন্তু প্রাবন্ধিক নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ধর্মবোধকেই যেহেতু প্রধান বিবেচ্য হিসাবে ধরেছেন, তাই এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ধর্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে নায়কত্ব, সেটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এই বিষয়ে কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ নেই।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর আলোচনায় যুধিষ্ঠিরকে নায়কের আসনে বসাতে গিয়ে রাম এবং অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রাম সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন রাম দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ, কর্তব্যে অবিচল, প্রজানুরঞ্জে যা উচিত মনে করে সেটিই দ্রুত করতে বদ্ধপরিকর। বংশ, কৌলীন্য, সম্মান- এগুলিকে শিরোধার্য করে রাম এগিয়ে যায়। রাম ধর্ম ও লোকাচারের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে না। বাল্মীকির রাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তন্নিষ্ঠভাবে তার কুলধর্ম, রাজধর্ম, স্বধর্ম পালন করে এসেছে। সাধারণ মানবিক বৃত্তির অনেক উপরেই সাধারণভাবে মহামানবেরা অবস্থান করে। প্রাবন্ধিক রামচন্দ্রের নানাবিধ কাজের দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে রামচন্দ্রের মতো দৃঢ়তা নেই, তিনি অনেকটা সাধারণ মানুষের মতো অনুভূতিসম্পন্ন ও মননশীল। যুধিষ্ঠিরের শাস্ত্র জ্ঞান থাকলেও তিনি সংশয় ও মানসিক টানাপোড়েনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যুধিষ্ঠির বৈরাগ্যসাধক মানুষ নন, ধর্মপুত্র হয়েও তিনি কাম ও অর্থকে অবজ্ঞা করে না।

রামচন্দ্রের পাশাপাশি অর্জুনের সঙ্গেও তুলনামূলক আলোচনা আছে *মহাভারতের কথা*-র দু'টি অধ্যায়ে। এই অধ্যায়গুলিতে তুলনীয়ভাবে বিচারের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরকেই আমরা চিনি না, চিনে নিতে থাকি 'বিশ্বপ্রকৃতির আদুরে ছেলে' অর্জুনকেও। সারাজীবন ধরে অর্জন করা খ্যাতির পরিমাণ নিতান্তই কম নয় অর্জুনের, অর্জুনের মতো ভ্রমণ অভিজ্ঞতাও আর কোনও চরিত্রের নেই। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত তার ভ্রমণের পরিধি, অর্জুন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে নাগলোক থেকে ইন্দ্রের স্বর্গপুরী পর্যন্ত, প্রণয়যোগ্যতায় তার সমকক্ষ কাউকে পাওয়া দুষ্কর এবং অপ্রতিরোধ্য ও মহাপরাক্রমশালী সফল যোদ্ধা তিনি। প্রাবন্ধিকের ভাষায়, 'আমাদের যৌবনের যা চরম অভীক্ষা, আমাদের পৌরুষের যা দুঃসাহসিক দাবি, আমাদের ঋদ্ধিকামি প্রবৃত্তির যত প্রণোদনা', এইসব ধরা পড়েছে অর্জুনের মধ্যেই। এককথায় মানব জীবনের কাম্য যেই সকল বিষয় আছে, তার প্রায় সবকিছুই অর্জুন লাভ করেছে। অথচ জগতে ঘটে চলা ঘটনার অর্থ বুঝতে পারল না অর্জুন, একটি ঘটনাকেও সত্যিকার অর্থে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে অপারগ অর্জুন, প্রাবন্ধিকের ভাষায় 'পরিণতিহীন চিরপ্রফুল্ল বালক'ই জীবনভর রয়ে গেল সে। অথচ যুধিষ্ঠিরের জীবন অর্জুনের সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবন যত এগিয়েছে ততই চলার পথে সমস্যা জড়িয়ে থেকেছে, প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে তার জীবন, নিজের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি বিপরীত দায়িত্বে সংকট হাজির হয়েছে। এই সংকট ও টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই ন্যায়, ধর্ম, জীবনের অর্থ প্রভৃতি জটিল দার্শনিক ভাবনাগুলি যুধিষ্ঠিরের বোধগম্য হয়েছিল। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছে যে এই জ্ঞান, বোধ এবং প্রজ্ঞাই যুধিষ্ঠিরকে 'নায়ক' চরিত্রে নিয়ে গেছে।

প্রাবন্ধিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মহাভারতের কাহিনি এগিয়ে চলার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের পরিবর্তনগুলি তুলে ধরেছেন। পাশা খেলায় মত্ত যুধিষ্ঠিরকে যেমন 'এক বিশ্ববিদ্যালয়'-

এর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মেলানো যায় না, ঠিক তেমনই যুদ্ধের আগে ও পরের যুধিষ্ঠির আলাদা। যুদ্ধে হয়তো বেশি শত্রু যুধিষ্ঠির নিধন করতে পারেনি, কিন্তু তার রণভূমিতে উৎসাহ এবং শত্রু-নিপাতনে উল্লাস চোখে পড়ার মতো। এই যোদ্ধা যুধিষ্ঠিরের চেহারাটা আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। যুদ্ধে শল্য বধের কাহিনি সঞ্জয়ের মুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে। ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই তার পরিচিত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধরত যুধিষ্ঠিরকে মেলাতে পারছে না। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু'র লেখায় যুধিষ্ঠির চরিত্রের এই পরিবর্তন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু'র *সংক্রান্তি* নাটকেও ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে:

কিন্তু যুধিষ্ঠির-

অসূয়াহীন, মৃদুভাষী, নির্লোভ,

আমরা যাঁর কথা মান্য করলে যুদ্ধ কখনো হ'তো না-

তিনি চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট, নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচারী -

সঞ্জয়, এও কি সম্ভব হ'লো আজ?*

যুধিষ্ঠিরের শল্য বধের পর তাকে অপরাধী করে নি ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু দ্বৈপায়ন হৃদের তীরে রণক্লান্ত দুর্য়োধনের সঙ্গে ভীমের অন্যায় যুদ্ধে একমাত্র সন্তানের পরাজয় ধৃতরাষ্ট্র মেনে নিতে পারে নি। ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, 'ধর্মপুত্র তুমিও তবে বিশ্বাসহস্তা।' যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এই পরিবর্তন প্রথম থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন। বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠিরের এই চারিত্রিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে প্রাবন্ধিক যথোচিত ও সুসংগত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্য সমস্ত ঘটনার মতো এই পরিবর্তনও যুধিষ্ঠিরের জীবনে প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধদেব বসু আমাদের দেখিয়েছেন যে, ধর্ম শব্দটির বহুমাত্রিক ও গভীর অর্থ। কালের নিয়মে এবং পরিবর্তনশীল সমাজে ধর্মের অর্থ অভিন্ন হতে পারে না, ধর্ম শেষ পর্যন্ত একটি আপেক্ষিক বিষয়। 'ধর্ম: অধর্ম: স্বধর্ম'-অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় বুদ্ধদেব বসুর এই বিশ্লেষণ বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এত হিংসা, রক্তপাত, হত্যা, অসত্যভাষণ পেরিয়ে অবশেষে যুদ্ধে জয় লাভ করে পাণ্ডবরা। রাজা হলেন যুধিষ্ঠির। প্রাবন্ধিক আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করে 'রাজচক্রবর্তী' সম্রাট হয়েছিল যুধিষ্ঠির, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সে সমগ্র আর্যাবর্তের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। যুদ্ধের যে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রভূত অনিষ্টসাধন উভয়পক্ষের হয়েছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর যুধিষ্ঠিরের উচিত ছিল প্রজা মঙ্গলের জন্য এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু যুধিষ্ঠির নামেমাত্র রাজা ছিল, বিদুর এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা

পরবর্তী বছরগুলিতে আর্ষাবর্তকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাবন্ধিক খুব সুন্দরভাবে এই অংশে যুধিষ্ঠিরের রাজার ভূমিকাটিকে সমালোচনা করেছেন। একজন দক্ষ রাজা হিসেবে যুধিষ্ঠির এখানে পুরোপুরি অকৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু এই সময়তে যুধিষ্ঠির নারদ সহ অন্যান্য জ্ঞানী ঋষি ও মুনির সান্নিধ্যে থেকে রাজনীতির জটিল তত্ত্বগুলি করায়ত্ত করতে সফল হয়েছিল। *অনুশাসনপর্ব* এবং *শান্তিপর্বের* একটা বড়ো অংশ জুড়ে মহাভারতে এই সমস্ত গম্ভীর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু বলতে চান যে, এই সমস্ত গুরুগম্ভীর জ্ঞান এবং তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করার মাধ্যমেই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হয়ে উঠেছে মহাভারতের ‘নায়ক’ চরিত্র। এই মহামূল্যবান জ্ঞান, বোধ এবং প্রজ্ঞাই যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতে অন্যান্য পাণ্ডব এবং প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রগুলির থেকে পৃথক উচ্চতর স্থান দিয়েছে। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মহাভারতের কথা-*র শেষ দুটো অধ্যায়ে অর্জুনের সঙ্গে চমৎকার একটি তুলনার মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে মহাভারতের কাহিনি অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের ভূমিকা ও গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। মহাভারতের মহাপরাক্রমশালী এবং সমস্ত অস্ত্রে পারদর্শী যে সব্যসাচী অর্জুনকে পাঠক দেখতে অভ্যস্ত, তাকে শেষ পর্বে একেবারেই অসহায় এবং সর্বস্বহারা এক সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা দেখতে পাই। মহাদেব ও দেবরাজ ইন্দ্র এবং গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট হতে অর্জিত অস্ত্রের ব্যবহার অর্জুন ভুলে যায়, সমস্ত যুদ্ধে জয়ী অর্জুনের পরাজয় ঘটে সামান্য দস্যুদের কাছে, যাদব নারীদেরও সুরক্ষায় একেবারে ব্যর্থ হয় অর্জুন। এসবের পরেও জীবন থেকে কোনও শিক্ষা কি সে নিতে পেরেছে? আমাদের মনে পড়ে *কালসন্ধ্যা* নাটকে ব্যাসদেবের উচ্চারণ, সব্যসাচীকে যেখানে বলা হয়েছে:

তুমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ । তবু শেখো

অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ ।.....

শেখো:

অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,

সব দান ছদ্মবেশী ঋণ ।^{৩০}

মহাপ্রস্থানের পূর্বেও অর্জুন এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে তুলনামূলক চমৎকার একটি বক্তব্য বুদ্ধদেব বসু রেখেছেন:

যুধিষ্ঠির এমন কিছু অর্জন করলেন যা পূর্বে তাঁর অধিকারভুক্ত ছিলো না, আর অর্জুন হারাতে-হারাতে চললেন যা কিছু তাঁর জীবনজোড়া সম্পদ ছিলো।^{৩১}

মহাভারতের শেষ মুহূর্তে, যেখানে সামান্য একটি কুকুরের জন্য স্বর্গসুখ বর্জনে বদ্ধপরিকর ছিল যুধিষ্ঠির, হয়তো সমস্ত পার্থিব মোহ এবং লোভ যথার্থই সে পৃথিবীতে ফেলে রেখে যেতে পেরেছিল। ফলে সমগ্র মহাভারত জুড়ে ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকা যুধিষ্ঠিরকে এখানে আমরা পাই ‘এক বিশ্ববিদ্যালয়ে’র সময়পর্বের যুধিষ্ঠিরের মতো করে। সেই যুধিষ্ঠির যে ধর্মবকের ‘সুখী কে’-এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিল যে, অঞ্চলী অপ্রবাসী স্বগৃহে শাকান্নভোজী একটি মানুষের কথা। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে আবার মনে করিয়ে দেয়:

আমি অর্জন করবো গ্রাম্য সুখ, বর্জন করবো প্রিয়-অপ্রিয় ভেদজ্ঞান, সহ্য করবো শীত উত্তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রথশ্রম, স্থাবর-জঙ্গম কোনো সত্তাকে হিংসা করবো না কখনো, কোনো কার্যেই লিপ্ত হবো না, স্পৃষ্ট হবো না শোকে অথবা হর্ষে, আমি মুন্ডিতমুন্ড মুনি হয়ে অরণ্যপথে একাকী প্রাণত্যাগ করবো। শুধু সে-ই সুখী, অর্জুন, জন্ম মৃত্যু ব্যাধি বেদনায় পরিকীর্ণ এই সংসার যে পরিত্যাগ করতে পারে।^{৩২}

৪.৫।।

সুখময় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৯৯)

বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় সুখময় ভট্টাচার্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন সমালোচক। তাঁর *মহাভারতের সমাজ*, *মহাভারতের চরিতাবলী* এবং *মহাভারতের চতুর্বর্গ* এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা তিনটি গ্রন্থ। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য ১৯০৯ সালে শ্রীহট্ট জেলার কালীজুরি গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক শিক্ষার হাত ধরে প্রাথমিক পড়াশোনা বাড়িতেই টোলে করেছেন, পরবর্তী সময়ে শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ এবং কলকাতার বিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে সাহিত্য, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, মীমাংসা সাংখ্য এবং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। এই সমস্ত ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে অগাধ প্রজ্ঞার কারণেই তিনি ‘শাস্ত্রী’ এবং ‘তীর্থ’ উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন, তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল সংস্কৃত সাহিত্য, অলংকার এবং দর্শনশাস্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রজ্ঞাবান মানুষ ভারতীয় দুইটি মহাকাব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু মহাভারতের রস বা সামাজিক ছবি মূল মহাকাব্য পাঠের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের আশ্বাদন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ হল মহাভারতের মতো মহাকাব্যের আকার ও ব্যাপ্তি। প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্যের ভারতীয় মহাকাব্য, দর্শনশাস্ত্রে প্রভূত আগ্রহ ও প্রজ্ঞা থাকার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে মহাভারতের সামাজিক চিত্র সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আদেশ করেছিলেন। মূলত সেই কারণেই আমরা *মহাভারতের সমাজ*

নামে অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তথ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ হাতে পেয়েছি। মহাভারতের সময়ের সমাজকে বুঝতে গেলে সুখময় ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থটি যথার্থ অর্থেই একপ্রকার বাইবেল। মহাভারতের সমাজ সম্পর্কিত এরকম বই আর সহজে দেখতে পাওয়া যায় না।

মহাভারতের পাঠক বা গবেষক হিসাবে আমাদের অবাক হতে হয় বইটির আলোচনার পরিধি এবং গভীরতা দেখে। বইটির প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনায় এসেছে বিবাহ, গর্ভাধানাদি সংস্কার, নারী, বর্ণাশ্রম সমাজ, চতুরাশ্রম, শিক্ষা, বৃত্তি ব্যবস্থা, কৃষি পশুপালন ও গো-সেবা, বাণিজ্য, শিল্প, আহার আহার্য্য, প্রসাধন ও পরিচ্ছদ, সদাচার, পারিবারিক ব্যবহার, প্রকীর্ণ ব্যবহার, অতিথিসেবা, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা, দান ও প্রকরণ, অহংকার ও কৃতঘ্নতা।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য আলোচনার সূত্রে এনেছেন ধর্ম, সত্য, দেবতা, উপাসনা, আত্মিক ও কৃত্য, প্রায়শ্চিত্ত, শবদাহ ও অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, দায়বিভাগ।

তৃতীয় খণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় যথা- রাজধর্ম, সাধারণ নীতি এবং যুদ্ধ। সুখময় ভট্টাচার্যের এই অংশের উপস্থাপনটি আমাদের বিস্মিত করে। মহাভারতের সময়ে রাজধর্মের গভীরতার বিষয়টি এ থেকে বোঝা যায়। মহাভারত এখানে আদর্শ রাষ্ট্রের রাজার গুণসমূহ উল্লেখ করেছে, বহু প্রজা এবং রাজকর্মচারী দ্বারা যে জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেখানে রাজার আবশ্যিক কিছু গুণাবলী মহাভারত আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। যেমন- রাজার সত্যনিষ্ঠা, পুরুষকার, মৃদুতা, প্রজার হিত, যথার্থ বিচারবোধ, সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে যথোপযুক্ত নীতির প্রয়োগ, রাজার শত্রু ও মিত্র সম্পর্কে জ্ঞান, ভোগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মের পথে অর্থব্যয় প্রভৃতি। এছাড়াও রাজার একার পক্ষে রাষ্ট্রপরিচালনা কার্যত অসম্ভব, তাই আমলাতন্ত্রে কে কোন পদে থাকবে এবং কাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া উচিত- সেই বিষয়ে একাধিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই দিক থেকে বইটির এই অংশটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমাদের।

চতুর্থ খণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে আয়ুর্বেদ, পশু ও বৃক্ষের চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি, বেদ ও পুরাণ, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, সাংখ্য যোগ, আত্মশিক্ষা, পূর্বোক্তর মীমাংসা, গীতা, প্রক্ষিপ্তবাদ, পঞ্চরাত্র এবং বিভিন্ন অবৈদিক মতবাদ।

প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য বইটির প্রথম খণ্ডের একেবারে প্রথমেই ‘বিবাহ’ নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। মহাভারতের সময়কালের সমাজে কত প্রকার প্রচলিত বিবাহ ছিল অর্থাৎ বিবাহের প্রকারভেদ, সমাজসিদ্ধ কোন কোন ধরনের পুত্রকে তৎকালীন সমাজ স্বীকৃতি দিয়েছিল, বিবাহের

উদ্দেশ্য কি শুধুই পুত্রলাভ নাকী আরও কিছু, অতি প্রাচীনকালে স্ত্রী-পুরুষের স্নৈরাচার, শ্বেতকেতু দ্বারা বিবাহের মর্যাদা স্থাপন, দীর্ঘতমার একটিমাত্র স্বামীর বিধান, স্ত্রী হলো ত্রিবর্গের প্রধান, সমাজে ধর্মপত্নীর স্থান, বিবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সামাজিক আচার ও সংস্কার, বিবাহে বর্ণবিচার, বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন সন্তানের পরিচয়, নিয়োগ প্রথা, সমাজে দাসীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ জীবনে স্ত্রীদের বিভিন্ন প্রকার বিধিনিষেধ প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে।

প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজে বিবাহের স্থান সর্বপ্রথম। কারণ বিবাহের মতো প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনেই মানবসমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সামাজিক সচলতা বজায় থাকে। বলা বাহুল্য, ভাবনার এই স্তর থেকেই আলোচনাটি ক্রমশ এগিয়ে গেছে। প্রাবন্ধিক মহাভারতের সময়ের বিবাহকে কত গভীর ও বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেটি দেখলে তাঁর মহাভারতের সমাজ সম্পর্কিত গবেষণাকে শ্রদ্ধা করতে মন চায়। বর্তমান সময়ের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের মতো প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যৌনতা সম্পর্কিত প্রথাকে লুকিয়ে রাখেন নি। অত্যন্ত উদার হৃদয়ে তিনি বহুগামী ও যৌন সম্পর্কের স্নৈরাচারের বিষয়টিকে প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, পৃথিবীর যে কোনও প্রাচীন সমাজেই নর-নারীর মাঝে অবাধ যৌন সম্পর্কের মাত্রাটি খুবই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি মানুষের জীবনে, সমাজ জীবনে এবং ব্যক্তি মানুষের অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলস্বরূপ বিবাহ নামের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। *মহাভারতের সমাজ* নামের বইটিতে তাই প্রাবন্ধিক সুখময় শ্বেতকেতু এবং দীর্ঘতমার অনুশাসনের আখ্যান বলেছেন। বিবাহ নামের প্রতিষ্ঠানের এরকম একটি সামাজিক রূপ দেওয়ার কথা যেখানে বলা হয়েছে মহাভারতে, ঠিক তেমনই *দাম্পত্যের স্বরূপ* নামের প্রবন্ধ সংকলনের ‘ক্ৰীতদাসী’ নামের প্রবন্ধে সুকুমারী ভট্টাচার্য সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলেছেন যে, আদিম সমাজের স্বেচ্ছাচার ও বহুগামী সম্পর্ক থেকে বর্তমানে ব্যক্তি নারী-পুরুষের মধ্যে যে সমাজ অনুমোদিত সম্পর্ক তার মূলে আছে অর্থনীতি। পিতার সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী কে বা কারা? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই বহুগামী সম্পর্ক থেকে একক বিবাহ সম্পর্কে মানব সমাজ যাত্রা করে। এই ‘ক্ৰীতদাসী’ প্রবন্ধে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন:

ঐতিহাসিক ভাবে আদিম সমাজে নারী পুরুষ সম্পর্ক ছিল যৌথ। একটি প্রজন্মের সব নারী ও পুরুষেরই অধিকার ছিল সেই প্রজন্মের সব নারীর ও পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পৃক্ত হওয়ার। পরের ধাপে বাদ যায় ভাই বোনের যৌন মিলন। তার পরে, অনেক পরে এল ঐক্যদাম্পত্য; অন্য স্তরগুলির মতো এই স্তরেও সম্পর্কের নির্ণায়ক ছিল অর্থনীতি।^{৩৩}

এছাড়াও প্রাবন্ধিকের আলোচনায় এসেছে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা। সাধারণ মানুষের উচিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার ও সমাজের প্রতি একপ্রকার দায়বদ্ধ থাকা। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে নিন্দা করেছে মহাভারত। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ধর্মপত্নীকে পরিবারে স্থান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পুরুষ কেবল স্ত্রীর সহায়তায় প্রধান তিন পুরুষার্থ তথা ধর্ম, অর্থ ও কামকে যথার্থরূপে ভোগ করতে পারে। নারীর পরিবারের দায়িত্বগুলি মহাভারতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, বনপর্বে দ্রৌপদী সারা দিন ধরে যে যে কাজগুলি করে তার উল্লেখ রয়েছে। নারীর কন্যাত্ব, সহধর্মিণীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে যে চমৎকার ভক্তি ও প্রেমের নিদর্শন রয়েছে, মহাভারতের সমাজ গ্রন্থ তা আমাদের সামনে তুলে ধরে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন তৎকালীন সময়ের সামাজিক মূল্যবোধের ছবিই এখানে উঠে এসেছে। কিন্তু, পরিবারের প্রতি ভক্তি এবং মাতৃত্বের বাইরেও যে একজন নারীর প্রভূত স্বাধীনতা থাকা উচিত- মহাভারতের সমাজ সেই ধরাবাঁধা ছকের বাইরে খুব একটা কথা বলেনি। ফলে সহজেই আমরা সমাজের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সুখময় ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে পুরুষ-নারীর বিবাহের বয়স উঠে এসেছে, যথাযথ বয়সে মহাভারতের প্রায় সমস্ত নারীরাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রৌপদী, শকুন্তলা, সাবিত্রী, দেবযানী, সত্যবতী, গান্ধারী এবং কুন্তী প্রভৃতি নারীদের কথা বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় ও বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর বিয়ে না হওয়া নারীকে সমাজে ‘গলগ্রহ’ হিসাবে মনে করা হতো। সুখময় ভট্টাচার্য এই বিষয়ে বলেছেন:

সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতিকে নারদঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘কন্যা তো যুবতী হইল, বিবাহ দাও না কেন?’ অশ্বপতিও সাবিত্রীকে বর স্থির করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘যে পিতা যথাকালে কন্যার বিবাহ না দেন তিনি সমাজে নিন্দনীয়।’^{৩৪}

প্রাবন্ধিকের আলোচনায় মহাভারতের সময়ের আট প্রকার বিবাহের ধরন উঠে এসেছে। মহাভারতের সমাজকে বুঝতে গেলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। পাত্র পাত্রীর শারীরিক শুভ ও অশুভ লক্ষণগুলিও উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন মহাভারতের যুগেও পণপ্রথা সমাজে নিন্দনীয় ছিল, ফলে জানা যায় সমাজে বিবাহ উপলক্ষে শুষ্কের আদান-প্রদান ঘটত। বিবাহের অন্তর্গত শাস্ত্রীয় আচার যথা সপ্তপদীগমন, হরিদ্রাঙ্গন, পাণিগ্রহণ, কনকাঞ্জলি প্রভৃতি আচারগুলির উপস্থিতি পাওয়া যায়। বিবাহ বর্ণ- বিচারের কথা বলতে গিয়ে অনুলোম ও প্রতিলোম বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। মহাভারতের সময়ে বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন হওয়া সংকরজাতীয় সন্তানদের বিষয়ে

আলোচনা উঠে এসেছে। যার হাত ধরে দেখতে পেয়েছি দেবতা ও গন্ধর্বের সঙ্গে মানুষের বিবাহ, নাগদের সঙ্গে মানুষের বিয়ে, ভীম এর সঙ্গে হিড়িম্বার বিয়ে, মহর্ষি মন্দপালের ও শারঙ্গীর বিবাহ প্রভৃতি। নারী-পুরুষের মিলনের ফলে উৎপন্ন হওয়া বারো প্রকার পুত্রের বিষয়ে মহাভারত ধারণা দিয়েছে। এখান থেকে সহজেই মনে করতে পারি যে, এগুলি নিশ্চিতভাবেই সমাজে স্বীকৃত ছিল। যথা- স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্বেরিণীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, সহোঢ়, জ্ঞাতিরেতা, হীনযোনিধৃত। মহাভারতের যুগে নিয়োগ প্রথা সমাজ স্বীকৃত ছিল, স্বয়ং বিচিত্রবীর্য-র পুত্ররা এই প্রথার মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছিল। এছাড়াও প্রাচীন ভারতের নারীদের মতো মহাভারতের দাসী ও নারীদের বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের দান করা হতো। গৃহের পরিচারিকারা স্বামীর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হতো। মহাভারতের সময়ের সমাজে দুশ্চরিত্রা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। তবে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন সমাজব্যবস্থাতেই নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কমবেশি একইরকম ছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্যের ‘প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ’ প্রবন্ধ সংকলনের ‘নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব’ নামের প্রবন্ধে এই বিষয়ে বেশ কিছু কথা বলেছেন।

প্রাচীন ভারতে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার তো ছিলই না, বরং তারা নিজেরাই (অন্যের) সম্পত্তি গণ্য হত। তাই তাঁদের প্রসঙ্গে হিংসা বলতে তাঁদের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতনই বোঝাত।^{৩৫}

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, কোনও স্ত্রী যদি তার পতির শয়্যায় আসতে অসম্মতি জানায়, (প্রথমে) মিষ্টি কথায় তাকে আদর ও অনুনয় করা যেতে পারে; তাতে কাজ না হলে গয়নাপত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ‘কিনে নেওয়া’ও যেতে পারে; আর তার পরও যদি রাজি না হয় তাহলে পতির উচিত লাঠৌষধি কিংবা চড় খাপ্পড় প্রয়োগ।^{৩৬}

বারো বছর ধরে পুত্র প্রসব করতে না পারলে সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মত, ঠিক যেমন মৃতবৎসা হলে পনেরো বছর আর বক্ষ্যা হলে দশ বছর পর তাকে ত্যাগ করা যায়।^{৩৭}

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লেখা তৈত্তিরীয় সংহিতা জানাচ্ছে, নারীর শরীর তার নিজস্ব অধিকারে নয়; সুতরাং চিরটা কাল ধরে নারীদেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করা চলে, ইচ্ছেমতো তার ওপর অত্যাচার করা চলে এবং পুরুষ খুশিমতো তাকে ত্যাগ করতেও পারে।^{৩৮}

নারী ও স্ত্রী হিসাবে তার কর্তব্যকর্ম আগেই নির্ধারিত ছিল; সে কাজে ব্যর্থতা বা ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ নির্যাতন অবধারিত। এমনকী কর্তব্যহানি হয়নি এমন ক্ষেত্রেও বলাৎকার, যৌন নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহার ঘটতে পারত।^{৩৯}

প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর *মহাভারতের সমাজ* গ্রন্থের পরবর্তী আলোচনা করেছেন ‘গর্ভাধানাদি সংস্কার’ বিষয়ে। মহাভারতের সমাজকে বুঝতে গেলে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন এবং বিবাহ এই প্রধান বিষয়গুলি দেখতে হয়। মহাভারতের সময়ে উপনয়ন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল, বাকি সংস্কারগুলি অন্যান্য সমস্ত শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। ঋতুসংস্কারের ক্ষেত্রে মহাভারত স্পষ্টতই জানিয়েছে হোমের সময় বহি যেমন কালের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ ঋতু কালেও স্ত্রীরা পুরুষকে কামনা করে। ঋতুকালে সন্তান কামনা করলে সন্তান বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী, ধার্মিক এবং সত্যপরায়ণ হয়। খুব স্পষ্টতই আমরা এখানে দেখতে পাই যে, পুরুষের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ও ধর্ম হল ঋতুকালে আবশ্যিকভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের জন্য মহাভারতে নারীকে তপস্যা, ব্রত, উপবাস এবং বন্দনার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহাভারত এখানে বিস্তারিতভাবে স্ত্রী সন্তোগের স্থান, কাল ও পদ্ধতির বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে। এর পরবর্তী সময়ে সন্তান পৃথিবীতে আসার পর যে সংস্কার করতে হয়, তার নাম জাতকর্ম। পুত্র ও কন্যা জন্মানোর ক্ষেত্রে একই জাতকর্মের কথা বলা হয়েছে। সন্তান জন্মের পর সন্তানের মঙ্গলার্থে দান-দক্ষিণার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। সন্তান জন্মের এগারো বা বারো দিনের দিন বৈদিক শাস্ত্রমতে নামকরণ আবশ্যিক। সর্বশেষ সংস্কার হল উপকর্ম, যেখানে প্রবাস থেকে ফেরার পর পিতা পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে কতগুলি মন্ত্র পড়বেন। এই কাজটি উপকর্মের প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য।

মহাভারতে নারীকে নিয়ে একাধিক পরস্পর বিরুদ্ধ নানা মত প্রচলিত আছে। ফলে অনেক সময় মহাভারতের পাঠক বা দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য তৎকালীন সময়ে সমাজে নারীর বিষয়ে বিভিন্ন ধারণাগুলি যত্নসহকারে উপস্থাপন করেছেন। পিতামহ ভীষ্মের কথাতে নারীকে বিষধর সাপ, ক্ষুরধার ছুরির সঙ্গে যেমন মিলিয়ে দেখা হয়েছে; ঠিক তেমনই নারীকে স্বর্গারোহণের সোপান হিসাবেও কল্পনা করা হয়েছে। আমরা ‘বিবাহ’ অংশে নারীর একপ্রকার সামাজিক অবস্থান আলোচনা করেছি। তবে এর বাইরেও বেশ কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। যেমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যারা জন্ম নিলে পুত্র সন্তানের মতোই পরিচর্যা পেত। মহাভারতে গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সত্যভামা প্রভৃতি রমণীদের চরিত্রে ওজস্বিতা ও কমনীয়তার মেলবন্ধন দেখা যায়। মহাভারতের সমাজে পিতৃগৃহে নারীর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পিতার গৃহে কন্যারা গৃহের নানাবিধ কাজকর্মে যুক্ত থাকত। তবে আশা করা যায় কিছু সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশ এবং ঋষি বংশের কন্যারাই অধ্যয়নের প্রাথমিক সুবিধাগুলি পেত, বর্ণাশ্রমের সমাজে অধিকাংশ নিম্নস্তরের নারীরা উপরিউক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকেছে। মহাভারতে তাই নারীর স্বাধীনতার বিষয়ে বলা হয়েছে:

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক মহাভারতে স্বীকৃত হয় নাই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে তাঁহাকে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। অবশ্য যাঁহারা চিরকৌমার্য অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদের বেলা এই নিয়ম খাটিত না।^{৪০}

বর্তমান সমাজের মতো মহাভারতের সমাজেও নারীর মাতৃত্ব এবং সতীত্ব খুবই গুরুত্বসহকারে দেখা হয়েছে। এই বিষয়গুলিকে নারীর প্রধান ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে আমরা স্পষ্টতই নারীত্বের একটি সমাজ নির্মিত রূপ বা ‘আর্কিটাইপ’ খেয়াল করি, পতিব্রতার বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য মহাভারতে একাধিক উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে অন্যতম গান্ধারী দ্বারা কৃষ্ণকে অভিশাপ দেওয়া, দময়ন্তীর ব্যাধকে ভস্মীভূত করার কাহিনি, সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান ইত্যাদি। এই ধরনের সামাজিক নির্মাণ আজও আমাদের সমাজে কঠোরভাবে অবস্থান করছে। মল্লিকা সেনগুপ্তের *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ* নামের বইতে ‘মাতৃত্ব ও সামাজিকীকরণ’ নামের অধ্যায়ে প্রাবন্ধিকের গলায় এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর ভেসে উঠতে দেখি:

সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মাতৃত্ব যখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে, নারীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা মা হওয়া- এই প্রচার যখন থেকে পল্লবিত হয়েছে, যখন থেকে মাতৃত্বের ও নারী শরীরের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে পুরুষ, যখন থেকে গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সঙ্গে নারীর কাঁধে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শিশু পালনের একচ্ছত্র দায়, তখন থেকেই মাতৃত্ব নারীকে পিছিয়ে দিয়েছে। পেছতে পেছতে একদা মুক্ত সঞ্চরণশীল উপার্জনকারী স্বাধীন নারী যে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছে তার নাম হারেম, অন্তঃপুর, অন্দরমহল, প্রাইভেট ডোমেইন। তার নাম পরিবার। যে মাতৃত্ব ছিল নারীর নিজস্ব সম্পদ, তাকে করায়ত্ত করেই নারীর মালিক হয়ে উঠল পুরুষ। নিরন্তর প্রসব ও শিশুপালনে নারীকে ব্যস্ত রেখে সেই অবসরে উৎপাদন ও অর্থনীতির চাবিকাঠি চলে এল পুরুষের হাতে। সম্পত্তির মালিক হল পুরুষ। যৌনতা-মাতৃত্ব-গৃহিণীপনায় জড়িয়ে পড়া নারী নির্বাসিত হল উৎপাদনের জগৎ থেকে, ভাত-কাপড়ের জন্য সে নির্ভরশীল হয়ে উঠল ক্রমশ। বৃত্তি সম্পূর্ণ হল।^{৪১}

মহাভারতের সমাজ বইতে এরপর প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য মহাভারতের সময়ের প্রচলিত বর্ণভেদ এবং চতুরাশ্রম নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সমাজে চারটি বর্ণ ছিল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। সমাজে বর্ণভেদ প্রথা জোরালোভাবেই অবস্থান করছিল। মহাভারত স্বাভাবিকভাবেই জানাচ্ছে যে ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ও উরু থেকে বৈশ্যের জন্ম এবং পা হতে শূদ্রের জন্ম। ভাবনার এই স্তর থেকেই জাতি ও বর্ণে বিভক্ত সমাজের প্রতিটি মানুষেরই কর্ম পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকত। ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের আগন্তুক সন্তান পরবর্তী সময়ে বর্ণভেদ প্রথার সঙ্গে সম্পর্কিত পারিবারিক পেশাকেই পেশা

হিসাবে বেছে নিত। তবে শুধুমাত্র জন্ম হতে পাওয়া পরিচয়ই মহাভারতে শেষ কথা নয়, মানুষ নিজ কর্মের মাধ্যমেও সমাজের উঁচু স্থান পেতে পারেন- এমন দৃষ্টান্তের কথাও মহাভারত জানিয়েছে। সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের লক্ষণের বিষয়ে জানিয়েছে- কোনও ব্যক্তির মধ্যে সত্য, দান, ক্ষমা, তপস্যা এবং দয়া থাকলেই সে ব্রাহ্মণ। শূদ্র মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পরেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সৎ কর্মের মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রাখলে ক্রমশ সে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। মহাভারত প্রত্যেক ব্যক্তির কুলোচিত কর্মের বিষয়ে মেনে চলার কথাও বলেছে, এক্ষেত্রে জন্মসূত্রে নির্ধারিত কর্মের যথোচিত প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যক্তি ধর্ম পথে অবস্থান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ধর্মব্যাবধানের কথা জানি। তবে স্বাভাবিকভাবেই বর্ণাশ্রমের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলা যে কোনও সমাজব্যবস্থাতেই অসম্ভব বিষয়। এরই ফল হিসাবে মহাভারতের যুগেও সঙ্কর জাতির বেশ কিছু দৃষ্টান্ত প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য দিয়েছেন। যথা- অতিরথ, উগ্র, বৈদেহক, নিষাদ, সূত, সৈরন্ধ্র, আয়োগব, মদগুর প্রভৃতি।

প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর বইতে চতুরাশ্রমের প্রতিটি কাজ অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মহাভারতের মহাসমুদ্র থেকে তুলে এনেছেন। সাধারণভাবে এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে গবেষকরা জেনে থাকলেও প্রাবন্ধিক এখানে উপস্থাপন করেছেন- আশ্রমধর্মের ব্যবস্থা ঈশ্বরকৃত, চারি বর্ণের অধিকার, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য, সমাবর্তন, স্নাতক, গার্হস্থ্যের জীবিকা ও কর্তব্য, পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ঐশ্বর্য লাভের উপায়, লক্ষীছাড়ার আচার, মানুষের ঋণ চতুষ্টয়, গার্হস্থ্যের শ্রেষ্ঠতা, সাধু গৃহস্থগণের মুক্তি, বানপ্রস্থের কাল, সপত্নীক বানপ্রস্থ, চারিপ্রকারের বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসীর কৃত্য, চার প্রকার সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস আশ্রমের ফল প্রভৃতি। ফলে এই আলোচনার পরিধি ও গভীরতা প্রত্যেক মহাভারতের গবেষকের কাছে রীতিমতো সমীহ জাগায়। আমাদের মহাভারত তথা প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনে চতুরাশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ মানব জীবনকে একটি সুশৃঙ্খল ছন্দে নির্দিষ্ট কাঠামোর ভেতরে স্থান দিতে পেরেছে চতুরাশ্রম প্রথা। প্রাবন্ধিকও যথাযথ তথ্য ও যুক্তিপূর্ণভাবে স্বাভাবিকভাবেই গার্হস্থ্য ধর্মকেই প্রধান হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যদিও পটু গৃহস্থ হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্যের গুরুত্বকেও মর্যাদার সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রাবন্ধিকের আলোচনা থেকে সহজেই আমরা বুঝতে পারি সমস্ত আশ্রম প্রথাগুলির মধ্যেই এক নিবিড় যোগসূত্র আছে, যেইটি ছিন্ন হলে জীবনের মূল সুর বাজবে না। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি তৎকালীন সমাজ জীবনে চতুরাশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।

প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য এরপর তৎকালীন সময়ের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। স্বাভাবিক নিয়মেই বাল্যকালে শিশুদের গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বেদ, তর্কবিদ্যা, বার্তা (কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি), যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র,

পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যান ও কলাবিদ্যা অবশ্যই থাকত। রাজাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল- হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র, রথসূত্র, ধনুর্বেদ এবং নাগরশাস্ত্র প্রভৃতি। বিভিন্ন ভাষা জানা লোকের কদর সমাজে বিদ্যমান ছিল। উপযুক্ত ও আদর্শবান ছাত্রের কথা বলতে গিয়ে আরুণি ও উপমন্যু'র গুরুভক্তির বিবরণ মহাভারত দিয়েছে। ভক্তি এবং নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতের একাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্রকে ধরে আলোচনা করেছেন। যথা- কচের শিক্ষালাভ, দ্রোণাচার্যের শিক্ষা, অর্জুনের তপস্যা, বেদে শূদ্রের অনধিকার প্রসঙ্গ, একলব্যের শিক্ষা, উত্কলের শিক্ষা, কৌরব ও পাণ্ডবের শিক্ষালাভ, গালবের গুরুদক্ষিণা শোধের ঘটনা, বিশিষ্ট নারী হিসাবে শকুন্তলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শিখণ্ডী, সত্যবতী, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী এবং মাধবী প্রমুখদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়ের কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। যথা- গুরুর কৃষিকাজে সহায়তা, গোপালন ও হোমের জন্য কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি। তবে মহাভারতে একমাত্র ব্রাহ্মণই যে উপদেশ ও শিক্ষাদানের অধিকারী ছিল তা নয়, সমাজের নিম্নস্তরের অনেক ব্যক্তিত্বের কথা ও উপদেশ মহাভারতে উঠে এসেছে। এখানেই মহাভারত মহান। সুখময় ভট্টাচার্যের আলোচনাতে এড়িয়ে যায় নি শিক্ষার্থীর পরিচ্ছদ, বিদ্যার্থীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা যেমন ছিল, অনধ্যায় অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট যে যে কারণে পঠন পাঠন বন্ধ থাকত, পরীক্ষা ব্যবস্থা যেমন ছিল, সমাবর্তনের পর যে যে শিষ্যকে গুরু কন্যাদান করতেন প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

স্বাভাবিকভাবেই প্রাবন্ধিকের নজর এড়িয়ে যায়নি বৃত্তিব্যবস্থা, কৃষি পশুপালন ও গো-সেবা, বাণিজ্য, আহার এবং অতিথি সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও। মহাভারতের সময়ের সমাজকে বুঝতে গেলে এগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের রীতিমতো অবাক হতে হয় সুখময় ভট্টাচার্যের আলোচনার পরিধি দেখে। বৃত্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মহাভারত কুলোচিত ধর্মের কথা অনেকবারই বলেছে। মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বৃত্তিকেই বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে অধ্যাপনা, গুচি এবং যাজন প্রধান কর্তব্য। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি গৌরবের ছিল। তবে ব্রাহ্মণ কুলোচিত ধর্মে ব্যর্থ হলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত। এছাড়াও প্রাবন্ধিক আপদকালীন সময়ে ব্রাহ্মণের বর্জনীয় কর্ম, ব্রাহ্মণের সম্ভ্রুতি, পৌরোহিত্য বৃত্তির নিন্দার কারণ, ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে কৃপণ বৈশ্য হতে রাজার ধন গ্রহণ, অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য প্রভৃতির মতো বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তির ক্ষেত্রে মহাভারত দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করা এবং যুদ্ধে পরাক্রম ইত্যাদির মতো বিষয়কে বলেছে। বৈশ্যের বৃত্তির ক্ষেত্রে কৃষিকাজ ও পশুপালন এবং বাণিজ্যকেই প্রধান হিসাবে ধরা হয়েছে। তবে সুখময় ভট্টাচার্য বৈশ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু অবিক্রম্য বস্তুর কথা বলেছেন। যথা- তিল,

গন্ধদ্রব্য, লবণ, দই, দুধ, তেল, ঘি, মাংস, ফলমূল, শাক, লাল রঙের কাপড় এবং গুড় ইত্যাদি। শূদ্রের ক্ষেত্রে উপরের তিন বর্ণের সেবাই তাদের জীবনের ব্রত হিসাবে নির্ধারিত ছিল। প্রধান তিন বর্ণের ব্যবহৃত উপকরণগুলি পুরনো হলে জীবিকা নির্বাহের জন্য শূদ্রকে দেওয়া হতো। এছাড়াও কিছু সঙ্কর জাতির বৃত্তি হিসেবে সৈরঙ্গীদের কথা এসেছে, যারা অন্তঃপুরের মহিলাদের অলঙ্করণে সাহায্য করত। সূত জাতীয় ব্যক্তিদের জীবিকা ছিল সারথ্য। বৈদেহকদের কাজ ছিল অন্তঃপুরের পাহারায় নিযুক্ত থাকা। নিষাদ জাতির কাজ ছিল মাছ ধরা প্রভৃতি।

কোনও একটি সমাজ ব্যবস্থার অর্থনীতির সচলতা বজায় রাখার প্রধান চাবিকাঠিই হল কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্য। এটি বর্তমান সমাজের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। সুখময় ভট্টাচার্যের বইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে মহাভারতের সময়ে রাষ্ট্রনেতারা বা নীতি নির্ধারকেরা কতটা সচেতন ছিলেন সেই বিষয়ে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রাজাদের একগুচ্ছ ব্যবস্থা ছিল। যথা- কৃষকের সন্তুষ্টি বিধান, কৃষকের জন্য ও চাষাবাদের জন্য জলাশয় খনন, দরিদ্র কৃষককে বীজ প্রদান, সংশ্লিষ্ট কর্মে দেখাশোনার জন্য সৎ রাজকর্মচারী নিয়োগ, কৃষক প্রতিপালন, মাসিক নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে কৃষিক্ষণ প্রদান, দরিদ্র কৃষকের জন্য দান, সংশ্লিষ্ট ভূ-প্রকৃতির উপর নজর রেখে কৃষি কর্মের ব্যবস্থা ইত্যাদি। কৃষির পাশাপাশি পশু পালনের জন্যও একগুচ্ছ এরকম বিধান রাষ্ট্রনেতারা বানিয়েছিল। গোরু, ঘোড়া ও হাতি'র রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য রাজাদের সুনির্দিষ্ট বিভাগের কর্মচারীরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। বিরাট রাজার রাজসভায় নকুল ও সহদেব এইসব বিভাগে কর্মরত ছিল।

অন্যদিকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বাণিজ্যেরও একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়টি রাষ্ট্রকে দেখতে হতো। বণিকের উন্নতি প্রতিহত হলে রাজাকেই দায়ী করা হতো। সেই কারণেই রাজাকে বাণিজ্যের সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে আইনকানুন তৈরি করতে হতো। বৈদেশিক বণিকের প্রতি রাজার বিশেষ খেয়াল রাখতেই হতো, রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে রাজা বেশি পরিমাণে কর এদের থেকেই পেতো। যদিও কর আদায়ে খুব কড়া আইন একেবারেই ছিল না। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনেক সময় দেখি যে, বিদেশের কোনও কোনও দ্রব্যে অধিক পরিমাণে আমদানি শুল্ক (ইমপোর্টেড ট্যাক্স) আমদানিকারক দেশ বসিয়ে থাকে। রাজসভায় দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট সমাদর বজায় ছিল, যেটিকে বর্তমানে আমরা আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার তরফে আয়োজিত 'গ্লোবাল বিজনেস সামিট'/ 'বাণিজ্য সম্মেলন'-এর সঙ্গে মেলাতে পারি। ভারতের বাহিরেও চীন ও সিংহলের সঙ্গে দ্রব্য আমদানি রপ্তানির খবর পাওয়া যায়। এই বিষয়ে অনেক প্রথিতযশা বিদগ্ধজনের লেখা আমরা পাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত ও

সমৃদ্ধ ছিল। *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস* (অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ)-তে ‘প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য’ নামক প্রবন্ধে দেখতে পাই:

হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর থেকেই বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। মহেঞ্জোদারো নগরী আবিষ্কৃত হওয়ার পর মার্শাল পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেন যে এই সভ্যতার সঙ্গে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের শুধু সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিল তা নয়, মিশর থেকে শুরু করে সিন্ধুর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় একটি সমজাতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।^{৪২}

পশ্চিমি দেশগুলির পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও জাপানের সঙ্গেও ভারতের নৌ বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মালাক্কা প্রণালী হয়ে চীনে যাওয়ার সমুদ্রপথ ভারতীয়দের নিকট অজানা ছিল না। উত্তর থেকে শুরু করলে তাম্রলিঙ্গ বন্দর থেকে নিজ্জান্ত হয়ে বঙ্গদেশ এবং মায়ানমারের উপকূল ধরে অথবা বঙ্গোপসাগর সোজাসুজি অতিক্রম করে জাহাজগুলি মালয় উপদ্বীপে পৌঁছোত এবং সেখান থেকে ইন্দোচীন ও অন্যত্র রওনা হত।^{৪৩}

মহাভারতের সমাজে মূল্যবান ধনরত্নের মধ্যে মুক্তা, প্রবাল, সোনা ও রূপা প্রভৃতিকে মেনে চলা হতো। তবে সমাজে অন্যান্য ধাতুর মধ্যে সোনার গুরুত্ব অবশ্যই বেশি ছিল। তবে রূপার থালা, তামার পাত্র, কাঁসার বাসন প্রতিদিনকার জীবনে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হতো। হস্তীর দাঁত দিয়ে নির্মিত প্রচুর শিল্পকলার দৃষ্টান্ত সুখময় ভট্টাচার্য দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া দিয়ে অন্যান্য আবশ্যিকীয় দ্রব্য নির্মাণের কথা প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। এরমধ্যে গাণ্ডীব যেমন আছে, ঠিক তেমনই গোরুর অস্ত্রি, চামড়া, শিং এবং লোমের কথাও এসেছে। বাঘের চামড়া দিয়ে গজকম্বলের আচ্ছাদন দেওয়া হতো। এছাড়াও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ছাতা, চামর ও পতাকা, কুশাসন, শিবিকা, উশীরচ্ছদ, রথ, বিভিন্ন প্রকার তৈল জাতীয় দ্রব্য, তাঁবু/পটগৃহ, ভেলা, পেটিকা, নৌকা, পূর্ত শিল্প, জলযন্ত্র, বিভিন্ন প্রকার কাঠের উপকরণ, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতির কথাও উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের শিল্পগুলি রক্ষার কাজে রাজাদের ভূমিকা কেমন ছিল এবং সমাজের খ্যাতনামা অর্থবান শিল্পীদের থেকে কতটা রাজকর আদায় হতো- সেটিও প্রাবন্ধিকের বইতে এসেছে। শিল্পের সমাদর ও বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রশংসার বিষয়টিও প্রাবন্ধিকের নজর এড়িয়ে যায় নি।

মহাভারতের যুগে প্রতিদিনকার জীবনযাপনে আহারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুখময় ভট্টাচার্যের অন্যান্য বিষয়গুলির মতো এক্ষেত্রেও আলোচনার গভীরতা আমাদের বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। কী নেই সেই আলোচনায়! সুদীর্ঘ খাদ্যের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। মানব প্রকৃতি ভেদে

আহারের ভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক দেহ গঠনের জন্য উপযুক্ত ও পরিমিত আহারের কথা বারবার উঠে এসেছে এবং আহারে সংযম থাকার বিষয়টিও মহাভারত একাধিকবার মনে করিয়েছে। দিনে দুইবার খাবার খাওয়াকে সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরা হয়েছে। ভারতীয় খাদ্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান ছিল ধান, যব, পিঠা, গুড়, দই, দুধ, ঘি, তিল, মাছ, মাংস এবং নানাজাতীয় শাক প্রভৃতি। তবে মাংস খাওয়ার বিষয়ে মহাভারতে বিতর্ক দেখা যায়। বৌদ্ধ দর্শনের গভীর প্রভাব মহাভারতে এসেছে; তাই পশুবধ নিয়ে দীর্ঘ সমালোচনা লক্ষণীয়। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য মহাভারতের সমাজকে গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ব্যক্তিভেদে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করে গেছেন। এরই মধ্যে এসেছে- ঋষি ও মুনিদের খাদ্য, পার্বত্য জাতির খাদ্য, সাধারণ নাগরিকের খাদ্য ইত্যাদি। সোমরস ও সুরাপানের কথাও এসেছে। তবে কেবলমাত্র প্রধান খাবারগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানই প্রাবন্ধিক করেন নি, সাধারণভাবে মহাভারতের সমাজে বিধিনিষেধ প্রাপ্ত খাদ্যগুলিও তিনি উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রধান হল- ছোট পাখি, কচ্ছপ, ভিন্ন চতুষ্পদ জলজন্তু, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, বাজপাখি, উলুক প্রভৃতি।

তৎকালীন সমাজে সমস্ত ব্যক্তিদের পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের বিষয়েও সুখময় ভট্টাচার্য গবেষণা করেছেন। ঋষি মানুষ এবং ব্রাহ্মণের কাপড় ও পরিচ্ছদ, রাজাদের পরিহিত পোশাক, যুদ্ধের জন্য পৃথক বস্ত্র, যাগ-যজ্ঞে যজমানের জন্য বিশেষ পরিচ্ছদ, মহিলাদের জন্য পোশাক প্রভৃতি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সমাজে নারীদের সাজসজ্জা ও প্রসাধনের বিষয়ে বিশদ তথ্যপূর্ণ বক্তব্য এসেছে। প্রসাধন হিসাবে চন্দন, মালা, বিভিন্ন প্রকার বিশেষ তেল, আতরের কথা উত্থাপিত হয়েছে। মহাভারত সদাচার এবং ব্যক্তি মানুষের পারিবারিক ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও একাধিক মূল্যবোধ এবং আদর্শের কথা বলেছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই সকল মূল্যবোধগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা ও মাতাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদানের কথা একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এঁদেরকে যথাযথ সেবা ও পরিচর্যা করলে ইহলোক ও পরলোক এবং ব্রহ্মলোককে সহজেই জয় করা যায়। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের রসায়ন কেমন হবে, ভাই বোনের সম্পর্ক, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের আচরণের প্রকৃতি, প্রিয়জনের সঙ্গে বন্ধুতা, যৌথ তথা একান্নবর্তী পরিবারের গুরুত্ব, কনিষ্ঠের স্ত্রীর প্রতি ভাণ্ডরের ব্যবহার, জ্ঞাতির দোষ ও গুণ, জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার এবং সমস্ত প্রাণীতে প্রেম, স্নেহ ও ভালোবাসার কথা মহাভারতে গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শেষে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য অতিথিসেবা, দান, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা, অহংকার ও কৃতজ্ঞতার মতো বিষয়গুলিকে নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি যে প্রাচীন ভারতীয়

সমাজব্যবস্থায় অতিথিকে দেবতা হিসাবে ভাবা হয়েছে, সংকটাপন্ন অতিথিকে নানাবিধ সুবিধা সহযোগে সাহায্য করলে গৃহস্থামীর সার্বিক পুণ্য হয়- সাধারণের মধ্যে এরকমই মূল্যবোধ ছিল। এই কারণে মহাভারতে অতিথি পূজার পদ্ধতি, বিশিষ্ট অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, অতিথি সংস্কারের জন্য আড়ম্বরের নিষেধ প্রভৃতি গুরুত্বের সঙ্গে প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন। এরপর শ্রদ্ধা ও ক্ষমার মতো বিষয়গুলিকে আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে মহাভারতে ত্যাগ ও ক্ষমার মতো বিষয়গুলিকে খুবই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই উক্ত গুণগুলির মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য একাধিক কাহিনি বা গল্পের উপস্থাপনা মহাভারতে এসেছে। তাই মৈত্রী, দয়া ও দানের মাহাত্ম্যের বিষয়টি যুধিষ্ঠির, বিদুর অথবা অন্যান্য ঋষিদের মুখ থেকে একাধিক বার উচ্চারিত হয়েছে। তবে মহাভারত এটাও বলে যে সর্বদা ক্ষমা অনুচিত। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ক্ষমাকে দুর্বলতা ভাবে তবে তা সমাজে সংকট ডেকে আনে, তাই ক্ষমা ও তেজস্বিতা পরিস্থিতির ওপর এবং ব্যক্তিবিশেষের ওপর ভিত্তি করে প্রদর্শন করা উচিত। তাই ক্ষমার পাত্রাপাত্র ও কালের বিবেচনা করবার পরামর্শ মহাভারত দিয়েছে। অহংকার ত্যাগের পরামর্শও মহাভারত দিয়েছে, অহংকারের দোষ প্রদর্শন করে হাজার হাজার উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। শান্তিপর্বের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই এই বিষয়ে শ্লোক পাওয়া যায়। সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতের সমাজ বইতে অহংকার যে পতনের মূল কারণ সেইটির কথা বলতে গিয়ে দুইটি আখ্যান উপস্থাপন করেছেন। প্রথমটি হল যযাতির স্বর্গ হতে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা এবং দ্বিতীয়টি রাজা নহুষের সাপে পরিবর্তিত হওয়ার কাহিনি। মহাভারতের এই মূল্যবোধ ও শিক্ষা তৎকালীন সময়ের পাশাপাশি বর্তমান সময়েও ব্যক্তি মানুষের চরিতাবলী ও উন্নত সমাজ গঠনে অত্যন্ত সহায়ক। মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান ও আখ্যানের গল্পগুলি এভাবেই আমাদের নৈতিক চরিত্রের বিকাশে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করে এসেছে। এখানেই এদের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে।

প্রথম অধ্যায়ের শেষে দান-প্রকরণের বিষয়ে সামান্য কিছু কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব জানিয়েছিল যে, দান এবং তপস্যার মধ্যে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নেই। মানুষ সম্পদ বা অর্থ উপার্জনের জন্য সমস্ত কাজই করতে রাজি থাকে। ন্যায় পথে উপার্জিত ধন তাই সংপাত্রে দানের অপেক্ষা মহৎ আর কিছুই নেই। তাই দানের ফলে যে পুণ্য লাভ হয় তা মহাভারতে বারবার বলা হয়েছে, এছাড়াও প্রাবন্ধিক অনেকগুলি দানের বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। যথা- সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। যদিও মতান্তরে দানকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার কথাও বলা হয়েছে। যথা- ধর্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও করুণা এই পাঁচটি কারণে দান করা হয়। তবে মহাভারত সর্বদাই নিকাম দানের পরামর্শই দিয়ে এসেছে, এই প্রকার দানকেই সবথেকে উত্তম দান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দান সম্পর্কিত মহাভারত যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছে, প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য সেগুলির প্রায় সবকটি ক্ষেত্রেই আলোচনায় ছুঁয়ে গেছেন।

এগুলি হল- অশ্রদ্ধার দান অতি নিন্দিত, নিষ্কাম দানের প্রশস্ততা, দানের উপযুক্ত পাত্র, অপাত্রে দানে দাতার অকল্যাণ, প্রার্থীকে দান থেকে বিতাড়িত করতে নেই, দানতে জাতি ও ধর্ম বিভাজন মেনে চলা অপ্রয়োজনীয়, বিশেষ কালে দান অধিক পুণ্য অর্জনে সহায়ক হয় প্রভৃতি।

মহাভারতের সমাজ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম, দেবতা, প্রায়শ্চিত্ত, শবদাহ ও অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, আহ্নিক ও কৃত্য, উপাসনা, দায়বিভাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি সুখময় ভট্টাচার্য উপস্থাপন করেছেন। বলাই বাহুল্য যে কোনও একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার সমাজকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে উপরের বিষয়গুলিকে বিদ্যায়তনিক স্তরে চর্চা করা একেবারেই আবশ্যিক। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য আলোচনার এই স্তরে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যা/ 'কালচারাল অ্যান্থ্রোপলজি'-র চর্চা করেছেন। অবশ্য মহাভারতের সমাজকে বুঝতে গেলে এভাবেই একাধিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাকে মিলিয়ে মিশিয়ে চর্চার প্রয়োজন আছে। যাই হোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে 'ধর্ম' বিষয়কে সামনে রেখে। আমরা ইতিমধ্যে বাঙালির মহাভারত চর্চার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধর্মের বিষয়ে অনেকগুলি কথাই বলেছি। যেমন- প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও শাস্ত্রে ধর্মের স্বরূপ এবং ধর্মের নানাবিধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক ইত্যাদি। প্রাবন্ধিক এখানে চতুর্বর্গতে ধর্মের স্থান, ধর্মের প্রয়োজন, ধর্ম উভয় লোকে কল্যাণপ্রদ, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রধান লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, জাতি ধর্ম ও কুলধর্ম, দেশধর্ম, ধর্ম লাভের উপায়, সর্বজনীন ধর্ম, ধর্মের সার্বভৌমিকতা, অহিংসা ও মৈত্রী, ধর্মের সনাতনতা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম, ধর্মের পথে সরল ও সত্য, ধর্মে কুটিলতার স্থান নেই এবং সত্য ও ধর্মের সম্পর্ক অটুট প্রভৃতি। সমাজে আদর্শবান ধার্মিক মানুষের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সাবিত্রী, দময়ন্তী, কৌশিক মুনি প্রমুখদের নানান উপাখ্যানের কথা বলেছেন। খুবই বিস্তারিত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধে পাই আমরা। এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জটিল বিশ্লেষণ দেখেছি নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র 'মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব' নামের প্রবন্ধে এবং বিমলকৃষ্ণ মতিলালের প্রবন্ধগুলিতে।

মহাভারতের দেবতাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যও দিয়েছেন প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন বৈদিক দেবতা এবং সেই সংক্রান্ত নানা উপাখ্যান, দেবতাদের স্বরূপ, প্রধান তেত্রিশজন দেবতা, আহুতি প্রদান ও উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রচুর পৌরাণিক গল্প ও আখ্যান ইত্যাদি। আমাদের মহাভারত দেবতার সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক উদার; মানুষের অসাধারণ মূল্যবান কাজের ফলস্বরূপ আমাদের কাব্য এবং বাঙালি হিন্দু মন তাঁদের অনেককেই মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত করেছে। তাই সুখময় ভট্টাচার্যের গভীর আলোচনার পরিসরে এই বিষয়টিকে আলাদা করে আমরা খেয়াল করি। বলাই বাহুল্য, যে মহাভারতের বাইরেও এরকম

দৃষ্টান্ত ভারতীয় উপমহাদেশে বিরল নয়। আবহমানকাল ধরেই বাঙালি হৃদয়ে শ্রী রামচন্দ্র, চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, সারদা মা প্রমুখদের স্থান মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত হয়েছে। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন:

অন্যদিকে লক্ষ্য করিলে মহাভারতেই দেখিতে পাই- উপাসক তাঁহার দেবতাকে পরমেশ্বর বুদ্ধিতেই উপাসনা করিতেছেন। পরমেশ্বর ও উপাসকের দেবতার মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে, তাহা বোঝা যায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন ইষ্টদেবতাকে পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করেন। গীতাতে ভগবানও বলিয়াছেন- ‘যে ভক্ত যে মূর্তিরই পূজা চান না কেন, আমি সেই মূর্তিতেই তাঁহার অচল শ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকি’।.....উপাসক তাঁহার ইষ্টদেবতা ও ভগবানের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পান না।^{৪৪}

দেবতাদের মধ্যে প্রধান তেত্রিশজন আমরা পেয়ে থাকি। এঁরা হল- অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং ইন্দ্র। এগুলো ছাড়াও আলোচনা করা হয়েছে মহাভারতে ইন্দ্র ও অগ্নির বিভিন্ন ভূমিকার বিষয়ে, দেবী কালীর বিভিন্নরূপের অর্থ, ধনের অধিপতি দেবতা কুবের, দেবী গঙ্গার মাহাত্ম্য, দুর্গার একাধিক রূপের বর্ণনা এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকৃত স্তুতি, জলের অধিপতি বরুণ, দেবতাদের শিল্পী বিশ্বকর্মা, বিষ্ণুর সহস্রনাম এবং বিষ্ণু উপাসনার ফলশ্রুতি, যম, শিব, দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ, মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং পূজা বিধান, শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, সূর্য উপাসনা ও সূর্য স্তুতি, দেবসেনাপতি রূপে কার্তিকের পরাক্রম, মহাভারতে অধিক পূজিত দেবতা এবং সমস্ত দেবতাই ভগবানের বিভূতি ইত্যাদি।

তবে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য শুধুমাত্র মহাভারতের দেবতাদের পরিচয় দিয়েই থেমে থাকেননি, উপাসনার বিষয়টিও উপস্থাপন করেছেন। মহাভারতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায়ের উপাসনার বিষয়ে কর্মপদ্ধতি বর্ণিত আছে। তবে মহাভারতে নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলা হলেও নিরাকার ঈশ্বর উপাসনার বিষয়টি জটিল হওয়ার কারণে রূপযুক্ত বা নির্দিষ্ট আকারময় ঈশ্বরের উপাসনার কথা এসেছে। দেবতাদেরকে পূজা অর্চনার পাশাপাশি লোকান্তরিত পিতৃগণের পূজার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। মহাভারত বলেছে এঁদের পূজা ও উপাসনাতে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য ত্রিসন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র এবং অর্চনাকে প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে ধরেছেন, এগুলি প্রত্যেকটি বাহ্য উপাসনার অঙ্গ। এছাড়াও গৃহপ্রবেশ, বিদেশযাত্রা, তীর্থযাত্রা, প্রত্যাবর্তন, সন্তানজন্ম উপলক্ষে এবং নির্দিষ্ট বিশেষ তিথি উপলক্ষে নির্দিষ্ট দেবতাদের পূজা অর্চনা করার বিধান আমরা দেখতে পাই। বাহ্য পূজাতে উপচারের মধ্যে চন্দন, ফুল, ধূপ এবং প্রদীপের কথা এসেছে। পূজা সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্ম এবং অধর্মের বিষয়ে বেদ ও অনুমোদিত স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশই শেষ কথা। সকালে শয্যা ত্যাগের সময় বিষ্ণু, অম্বিকা প্রমুখ দেবতাদের এবং ঋষি হিসাবে অত্রি,

কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, ব্যাসদেব, বিশ্বামিত্র প্রমুখ মহর্ষিগণকে স্মরণের কথা বলা হয়েছে। সমাজজীবনকে গভীরভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই উপাসনার ভূমিকা একপ্রকার অসীমই।

প্রাবন্ধিক ‘আহ্নিক ও কৃত্য’ অংশে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের বিভিন্ন কাজকে কীভাবে শাস্ত্র অনুমোদিত রূপে এবং সংশ্লিষ্ট পথ অবলম্বনে সম্পন্ন করা যায়, তারই কথা বলেছেন এখানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বইতে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন শয্যাভ্যাগের সময়, দাঁত ধোয়ার পদ্ধতি, সন্ধ্যা উপাসনার নানা দিক, বলিদানে আত্মতুষ্টি, অমাবস্যায় গাছ কাটার নিষেধ, যাগ-যজ্ঞে অবিহিত দ্রব্য, স্নানের দশটি গুণ, সংকল্প বিধান ও ব্রতের নিয়ম ইত্যাদি। শয্যা ভ্যাগের সময় বিষ্ণু, স্কন্দ, অম্বিকা, পরাবসু, ঋষি বশিষ্ঠ, গৌতম, কাশ্যপ, ব্যাস প্রমুখদের নাম স্মরণ করার কথা মহাভারত বলেছে। প্রাতঃকালে স্পর্শযোগ্য একগুচ্ছ দ্রব্যের নামও মহাভারত করেছে, এগুলির ফলে সকল অশুভ দূরীভূত হয়। জীবনে চলার পথে ধর্মীয় অনুশাসনের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে মেনে চলার পরামর্শ মহাভারত জুড়ে পেয়ে থাকি। মলমূত্র ভ্যাগের নিয়ম থেকে শুরু করে সন্ধ্যা-আহ্নিক, অগ্নিহোত্র, অগ্নি প্রতিনিধি, যজ্ঞের অধিকার নির্ণয় প্রভৃতিও উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও শুভ কাজে তাম্রপাত্রের প্রশস্ততা, গোশৃঙ্গাভিষেক, সোম-বলি, আকাশশয়ন যোগ, ব্রতের ফল, উপবাসের নানা নিয়ম, দক্ষিণা দান, অনুকল্প ব্যবস্থা, প্রতিগ্রহের যোগ্যতা, অপ্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য, তীর্থ পর্যটন, তীর্থফল লাভের অধিকারী, শয়নের দিক নির্ণয় এবং আচার পালনে দীর্ঘায়ু প্রভৃতি বিষয়গুলি তথ্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ নানা কাজকর্মের ফলে এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশ না মানা হলে পাপ হয়। সেক্ষেত্রে যথাযথ শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনেই প্রায়শ্চিত্ত করার প্রসঙ্গ মহাভারতে এসেছে। মহাভারত এক্ষেত্রে আচার্য মনু’র নির্দেশকেই মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে। প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতে উপস্থাপিত বেশ কিছু পথের সন্ধান বা প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে আমরা সহজেই তৎকালীন সমাজের যথার্থ চেহারাটি গভীরভাবে ভাবতে পারি। সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতের সমাজ বইতে একগুচ্ছ পাপের তালিকা দিয়েছেন। যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল- জন্মান্তরে অবিশ্বাস, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে দারপরিগ্রহ, মিথ্যা কথা বলা, ব্রহ্মহত্যা, অপাত্রে দান, মাংস বিক্রয় ও বিদ্যা বিক্রয়, স্ত্রীবধ, গুরুকে হত্যা, শরণাগতকে পরিত্যাগ, অভক্ষ্যভক্ষণ, স্বধর্ম পরিত্যাগ প্রভৃতি। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপরের বিষয়গুলিতে মানুষের পাপ জন্মায় না, সে বিষয়তেও মহাভারত স্পষ্ট জানিয়েছে। একগুচ্ছ প্রায়শ্চিত্তের কথা প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, যার মধ্যে প্রথমেই অনুশোচনার কথা বলা হয়েছে। অনুশোচনার পরে যথাযথ তপস্যার প্রসঙ্গ এসেছে, এ বিষয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা প্রথমে উত্থাপিত হবে। প্রাবন্ধিক আমাদের মহর্ষি শৌনক, দেবরাজ ইন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলেছেন।

মানুষের মৃত্যুর পর শবদেহের সাজসজ্জা এবং অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি সম্বন্ধে মহাভারতের যুগে প্রচলিত আচার-ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ‘শবদাহ অশৌচ’ অংশে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। এখানে আলোচনায় এসেছে পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর পর তার পবিত্র দেহকে কীভাবে সাজানো হয়েছিল। অর্জুন এবং ভীম চামর ব্যজন করেছিল। যুয়ুৎসু মৃতদেহের উপর ধরেছিলেন ছাতা। নকুল সহদেব মাথার ওপর উষ্ণীষ ধরেছিল, যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র পায়ে কাছ বসেছিল। এখান থেকেই মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ওপর একটি সামগ্রিক পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। দেহকে দাহ করার জন্য চন্দন কাঠের কথা বলা হয়েছে। মৃতদেহ অগ্নিসংযোগের সময় শ্মশানে পণ্ডিতরা সামগীত গাওয়ার কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। এছাড়াও আলোচিত হয়েছে শবদেহকে দাহ করার পদ্ধতি, দাহের অন্তে স্নান করার রীতি, স্নানের শেষে উদকক্রিয়া, অশৌচবিধি প্রভৃতি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আলোচনায় আসে ‘শ্রাদ্ধ ও তর্পণ’। সাধারণভাবে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মাধ্যমে পিতৃঋণ শোধ করা যায়। তাই উক্ত ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ তার পূর্বপুরুষের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, জন্ম ও মৃত্যুর মতো চিরন্তন সত্য আর নেই। আমরা জানি যে পিণ্ডদানের সঙ্গে সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানকেই শ্রাদ্ধ বলে। অন্যদিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি অর্পণের নামই হল তর্পণ। মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের শ্রাদ্ধ ও তর্পণের বিবরণ প্রাবন্ধিক তথ্যপূর্ণভাবে এবং আদর্শ সমাজতত্ত্বের গবেষকের ন্যায় উপস্থাপন করেছেন। যেমন- শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল হিসাবে অমাবস্যার কথা বলা হয়েছে, কৃষ্ণপক্ষেও অপরাহ্নের সময়কে এই ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শ্রাদ্ধের পদ্ধতির বিষয়েও মহাভারত অনেক কথাই বলেছে। যেমন- প্রশস্ত দ্রব্যের বিষয়ে ঘি, তিল, মধু ও দুধ খুবই উল্লেখযোগ্য। শ্রাদ্ধে বিভিন্ন প্রাণীর মাংসের কথাও এসেছে। যেমন- এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক মেঘ মাংস, শশ মাংস, ছাগ মাংস, বরাহ মাংস, মহিষ মাংস ইত্যাদির কথা বলেছেন। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সহকারে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ তৃপ্ত থাকে। আবার শ্রাদ্ধের সময় বর্জনীয় কিছু দ্রব্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে- কোদ্রব, পুলক, পলাণ্ডু, কোবিদার, কৃষ্ণ লবণ, শীতপাকী, শৃঙ্গাটক, লবণ, জম্বুফল ইত্যাদি। বর্জনীয় ব্যক্তির মধ্যে আছে- চণ্ডাল, গৈরিকবস্ত্রধারী, পতিত, রজস্বলা নারী, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি প্রমুখ। সুখময় ভট্টাচার্য এছাড়াও গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন- শ্রাদ্ধের ফল, শ্রাদ্ধে দান, নক্ষত্র বিশেষে ফল, মঘাত্রয়োদশী, গয়াশ্রাদ্ধ, সাবিত্রীজপ, ব্রাহ্মণবরণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের বরণ প্রশংসনীয়, সামর্থ্য অনুসারে খরচের বিধান, শ্রাদ্ধের অধিকারী এবং শ্রাদ্ধের মাধ্যমে সমাজের উপকার ইত্যাদি।

আমরা জানি যে মহাভারত চার প্রকার পুরুষার্থের কথা বলে। অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের লেখায় যার গভীর বিশ্লেষণ আমরা পরে আলোচনা করব। এরই মধ্যে অন্যতম হল অর্থ। কোনও ব্যক্তির

অর্জিত ও গচ্ছিত সম্পদের যথার্থ বন্টন কীভাবে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে বিভাজিত হবে; তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুখময় ভট্টাচার্য আমাদের দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক ‘দায়বিভাগ’ নামের অংশে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন:

সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ও ধর্মশাস্ত্রীয় আলোচনার অন্তর্গত। পিতার পরিত্যক্ত ধনে পুত্রেরই প্রাথমিক অধিকার। সর্বগা পত্নীর গর্ভজাত সকল পুত্রেরই অধিকার সমান, শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন একভাগ বেশী পাইবেন।^{৪৫}

এছাড়াও সুখময় ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন- ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা একাধিক হলে সেই ক্ষেত্রে সম্পদের বন্টন কীরূপ হবে, ক্ষত্রিয়ের ধনবিভাগ কেমন হবে, বৈশ্যের ধনের বন্টন কেমন হবে, সম্পদে শূদ্রের অধিকারের স্বরূপ, পুত্রিকাকরণের পর ঔরসের জন্মে ধনবিভাগের প্রকৃতি, পত্নীকে ধন দানের বিধান, মাতার ধনে দুহিতার অধিকার, ধনের অতিবৃদ্ধি শাস্ত্রবিহিত নয়, অঙ্গহীনের অনধিকার, নিজের উপার্জিত সম্পদে স্বতন্ত্রতা এবং শিষ্যের ধনে গুরুর অধিকার ইত্যাদি। সম্পদের বন্টনে মহাভারতের এই ভাবনার গভীরতা আমাদের অবাক করে।

প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্যের ‘মহাভারতের সমাজ’ বইটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ‘রাজধর্ম’ অংশটি। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয় এবং যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হওয়ার মধ্যে দিয়ে মূল কাহিনির আর সেরকম অবশিষ্ট কিছু থাকে না, এরপর শান্তি পর্ব এবং অনুশাসন পর্বগুলির মধ্যেই মহাভারতের অত্যন্ত মূল্যবান কথাগুলি লুকিয়ে আছে। সেগুলিরই অংশ হিসাবে সুখময় ভট্টাচার্য ‘রাজধর্ম’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে মহাভারতের ন্যায় মহাসমুদ্রের মধ্যে থেকে ছেঁকে এনে উপস্থাপন করেছেন। একটি সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা কীভাবে চলবে, রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রাজার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, প্রশাসনকে কর্মঠ ও মজবুত রাখার জন্য রাজা কোন ভূমিকা নেবে, এমনকী রাজার চরিত্রগত গুণ কেমন হবে এবং রাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থার সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান পরামর্শ মহাভারত দিয়ে এসেছে। প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্যের ‘মহাভারতের সমাজ’ বইটির এই অংশটি গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালির মহাভারত চর্চায় মাইলফলক হয়ে থাকবে। সমকালীন ভারতের একজন অন্যতম ভারতাত্ত্বিক তথা মহাভারত গবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী’র একাধিক গ্রন্থের বিভিন্ন অন্বেষণগুলি আমাদের আলোচনায় সহায়ক হয়ে উঠবে, সেগুলির কিছু কিছু কথা আমরা আমাদের আলোচনায় তুলে ধরব। *দণ্ডনীতি* বইতে তিনি রাজার একাধিক গুণের বিষয়ে বলেছেন:

কৌটিল্যের মতে, রাজা প্রজাশাসন করবেন পিতার মতো- সর্বত্র চোপহতান্ পিতেবানুগৃহীয়াৎ।
তবে এই পিতৃত্ব প্রজার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ নয়, এই পিতৃত্ব একধরনের দর্শন,

একধরনের আদর্শ, যা মহাভারত এবং ধর্মসূত্রগুলিতে সাড়ম্বরে কীর্তিত হয়েছে।.....কৌটিল্য এই গুণগুলিকে চারভাগে ভাগ করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রথমটি হল অভিগামিক গুণ, যার সংখ্যা ষোলোটি। তার মধ্যে প্রধান হল- বড় বংশে জন্ম, বিপদে এবং সম্পদে ধৈর্যশালী, ধার্মিক, সত্যবাদী, কথায় এবং কাজে একরকম, পরের উপকার স্মরণে রাখেন, দাতা, আরন্ধ কর্মে সদোৎসাহী, অনলস (অদীর্ঘসূত্রী), শক্যসামন্ত (সামন্ত রাজাদের যিনি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন), দৃঢ়নিশ্চয়, অক্ষুদ্রপরিষৎক (যার পার্শ্বদ অমাত্যের গুণবান) এবং বিনয়কাম।^{৪৬}

এভাবে রাজার একাধিক গুণের কথা নৃসিংহপ্রসাদ বলেছেন। দ্বিতীয় গুণ প্রজ্ঞা, যেটাকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে আবার। তৃতীয় গুণ উৎসাহ, এটাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ হল আত্মসম্পদ। এছাড়াও বইটির সপ্তম অধ্যায় জুড়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড এবং মিত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। রাজধর্ম নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা এগোনোর পর প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতের রাজধর্ম বিষয়ক তাত্ত্বিক প্রণেতাগণের নাম নিয়েছেন। এরা হল- বৃহস্পতি, বিশালান্ধ, কাব্য, মহেন্দ্র, ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা প্রমুখ।

সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষক হল রাজা, রাজাকে অনেক জায়গাতেই ভগবানের বিভূতিস্বরূপ হিসাবে মনে করা হতো। তাই যেহেতু রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব রাজাকেই বিচক্ষণতার সঙ্গে খেয়াল রাখতে হতো, তাই তার মধ্যে উন্নত গুণাবলীর সমাবেশ থাকা একপ্রকার আবশ্যিকই ছিল। সুখময় ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে কিছু গুণাবলীকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন- আদর্শ রাজচরিত্র, পুরুষকার, সত্যনিষ্ঠা, মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা পরিত্যাগপূর্বক মধ্যম পন্থা অবলম্বন, প্রজাহিতের নিমিত্ত গর্ভিণীধর্মাবলম্বন, ধীরতা, গৃহের কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবহারে আপন মর্যাদা রক্ষা করা, কঠোর ত্যাগ, বর্ণপ্রথার সংস্থাপন, বিচারবুদ্ধি, প্রজারঞ্জন, ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্পর্কে সচেতন, বিশ্বস্ততা, জিতেন্দ্রিয়তা, দানশীলতা, অবধানতা, কাম এবং ক্রোধ জয় করা, রাজধর্ম অনুসারে কৃত্য সম্পাদন, পূজ্যকে পূজন, দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন, রাজার যথেষ্ট ভোগ নিন্দনীয়, অতি বিশ্বাস বিপজ্জনক, আদর্শ গৃহীর সমস্ত ভালো গুণ রাজাতে থাকা চাই, মন্ত্রগুপ্তি এবং সময় বিশেষে অবস্থার পরিবর্তন, ধর্ম পথে অর্থ ব্যয়, দক্ষ কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি, অমাত্যদের দোষপরিজ্ঞান, কূটনীতি এবং পরস্পরীতে আসক্ত না থাকা প্রভৃতি।

এছাড়াও আমরা জানি যে রাজা একাকী রাজ্য চালাতে পারে না, এমনটা অসম্ভবও বটে। তাই মহাভারত রাজকর্মচারী ও অমাত্যদের নিয়োগের বিষয়েও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে। সুখময় ভট্টাচার্য'র মতো মহাভারতের লঘু-গুরু বইতে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও বলেছেন:

রাজশাসনে অমাত্য-নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং তাঁদের সঙ্গে রাজার আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও নারদের একটা বিশিষ্ট মত আছে। মহাভারতে নারদীয় মতের প্রস্তাবনায় আমরা বলেছিলাম- নারদ উত্তম ব্যক্তিকে উত্তম স্থানে, মধ্যম ব্যক্তিকে মধ্যম এবং অধম ব্যক্তিকে অধম স্থানে নিয়োগ করার পক্ষপাতী।.....মহাভারতের টীকাকারে উত্তম স্থান বলতে সেনাপতি, অমাত্য, আকর এবং কোষরক্ষার জায়গা, মধ্যম স্থান হিসাবে কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য এবং অধম স্থান বলতে সাধারণ রাজকর্মগুলি বোঝাতে চেয়েছেন।^{৪৭}

নারদ বলেছিলেন- তাঁকেই অমাত্যপদে নিয়োগ করা উচিত, যিনি পূর্বাঙ্কেই বোঝাতে পেরেছেন- এই কাজটা করলে রাজার এই আয় হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে সেই কাজে নিয়োগ করলে তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, যেমনটি তিনি বলেছিলেন, তেমনটি আয় হয়েছে, অথবা তার চেয়ে বেশি অর্থাগম হয়েছে রাজকোষে, তবে তাঁকেই রাজা অমাত্য নিয়োগ করবেন।^{৪৮}

আমরা জানি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য উন্নত আমলাতান্ত্রিক গঠন এবং দক্ষ রাজকর্মচারী একান্ত আবশ্যিক। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র সঙ্গে এক্ষেত্রে সুখময় ভট্টাচার্য'র অনেক মিল আমরা খুঁজে পাই। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য বলেছেন- রামায়ণ ও মনুসংহিতার অনুসরণে কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি দেখতে, মন্ত্রীর গুণাবলী পরীক্ষা প্রয়োজন, শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ সচিব নিয়োগ, রাজা ও সচিবের মধ্যে ভালো সম্পর্ক, ন্যূনতম তিন বা পাঁচ জন মন্ত্রী নিয়োগ, রাজসভায় বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন, অরণ্যে ও তৃণশূন্য ভূমিতে মন্ত্রণার পরামর্শ, মন্ত্রণাতে মন্ত্রী ছাড়া অপরের উপস্থিতি নিষিদ্ধ, রাজপুরোহিতের মত সবচেয়ে অগ্রগণ্য, সম্মানের মাধ্যমে অমাত্যের মন জয়, হিতবক্তা অমাত্যই উত্তম, বিদ্বান ও উৎসাহী পুরুষ প্রশস্ত, লুব্ধ ও নৃশংস পুরুষ পরিত্যাজ্য, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই মিত্র, রাজার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বিশ্বস্ত, ব্যসনে ভীত পুরুষ আত্মতুল্য, পরোক্ষে নিন্দাকীর্তন ইত্যাদি শত্রুর কাজ, শত্রু ও মিত্র নির্ণয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর করতে হয়, শত্রু ও মিত্রের উৎপত্তি কারণাধীন, বিদ্বান ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের নিয়োগ আবশ্যিক, ব্রহ্মশক্তি ও ক্ষত্রশক্তি মিলনে শ্রীবৃদ্ধি, পুরোহিতের পরামর্শে চললে উন্নতি নিশ্চিত (বৃহস্পতি ও বশিষ্ঠ মুনিদের পৌরোহিত্যের ফলের বিষয়টি প্রমাণ স্বরূপ প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য দিয়েছেন এবং পাণ্ডবদের মঙ্গলার্থে পুরোহিত ধৌম্যের নানা উপদেশের কথা বলা হয়েছে), ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণের পরামর্শ, যোগ্য দূতকেই দৈত্যকাজে নিযুক্তি দেওয়া প্রয়োজন, দূতের প্রতি ব্যবহার, অন্তঃপুর রক্ষার কাজে বৃদ্ধ পুরুষের নিয়োগ, রাজাই সবার বেতন ঠিক করবেন, অবাধ্য কর্মচারীর অপসারণ, সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানি অমঙ্গলজনক, পুরোহিত ধৌম্যের প্রচুর উপদেশ প্রাবন্ধিক আলোচনায় এসেছেন (যেমন-প্রতিহারীর নির্দেশ ছাড়া রাজসভায় প্রবেশ না করা, অন্তঃপুরের কর্মচারীর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বলা, 'রাজা অপেক্ষা আমি বেশি বুদ্ধিমান'- এমন বিষয় না ভাবা, রাজার কোনও মিথ্যে কথা অন্যত্র বলা নিষেধ, সর্বদাই কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ইত্যাদি)।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় করের উৎস কি কি হতে পারে, কাদের থেকে অর্থ কর হিসাবে নিতে হবে এবং কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে করকে মুকুবের পথে হাঁটতে হবে- সেই সংক্রান্ত বিষয়তেও মহাভারত অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গেছে- যা সমকালীন বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনীতির ‘রোল মডেল’ হতেই পারে। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য প্রথমেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, রাজার সম্পত্তি প্রজাদের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত কারণ ধনের মত্ততা প্রাচীন ভারতের রাজার আদর্শ নয়। রাজ সম্পত্তি রাজার আমোদপ্রিয়তা ও মনোরঞ্জনের জন্য নয়। এই ব্যবস্থার বড়ো একটি প্রভাব বর্তমান বৈশ্বিক ওয়েলফেয়ার স্টেটগুলির ভূমিকায় দেখতে পাই। ভারতের ক্ষেত্রেও বর্তমানে সরকার বন্যা, বিপর্যয় ও মহামারির মতো পরিস্থিতিতে জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত খরচ করে থাকে। ন্যায় পথে এবং প্রজার শক্তি অনুসারে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ মহাভারত দিয়েছে। যেখানে ধনী ও অর্থবান বণিকের থেকে প্রতিবছর অধিক কর সংগ্রহের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেখানেই আবার দরিদ্র প্রজা ও দরিদ্র কৃষক থেকে যৎসামান্য কর সংগ্রহ অথবা কর প্রত্যাহারের কথাও উঠে এসেছে। কর সংগ্রহের বিষয়ে মহাভারত জোঁকের রক্ত খাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে, কারণ জোঁক রক্ত খাওয়ার সময় সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না।^{৪৯}

কর হিসাবে ঘোড়া, বস্ত্র, ধান ও মণিমাণিক্য ইত্যাদি গ্রহণের রীতি ছিল। অর্থাৎ যে জনপদে যা উৎপাদিত হতো তাই কর হিসাবে গ্রহণ করা হতো। বণিক ও শিল্পীদের ওপর যে কর ধার্য ছিলো তা তাদের বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত লাভের অনুপাতে ধরা হতো। একইরকম ভাবে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য আলোচনায় এনেছেন- অর্থ ক্ষুধায় কাতর রাজা অশ্রদ্ধার পাত্র, প্রজাদের ব্যয় নির্বাহ করতে রাজা বাধ্য, অতি লোভী রাজার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ধর্মের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন, ধন নষ্ট হলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য ধনী ব্যক্তির থেকে সংগ্রহ, বিভিন্ন খনি থেকে আয়ের উপর কর ব্যবস্থা, লোভী ব্যক্তিকে কর সংগ্রহ থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন, দস্যু ও কৃপণের অর্থ সংকাজে ব্যয়, সর্বদা ধর্মপথে থেকে সঞ্চয়ের জন্য মনোযোগী হওয়া, আপদকালীন সময়ের জন্য অর্থ সঞ্চয়, অর্থহীন রাজা অবজ্ঞার পাত্র, আপদকালীন সময়ে করের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি। যদিও সুখময় ভট্টাচার্য কোন কোন ব্যক্তির থেকে কর গ্রহণ অনুচিত সেটিও আলোচনা করেছেন, এই বিষয়ে স্থান পেয়েছে বিধবা, অনাথ, দরিদ্র অথচ বৃদ্ধ, অন্ধ, রাজার অধীনস্থ রাজন্যবর্গ এবং স্বধর্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ। কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত প্রদেশের যাবতীয় খরচ বছরে ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ) হওয়ার কথা মহাভারত জানায়, আবার যে বছর অর্থ মোটামুটি রাজকোশে এসেছে সেই বছরে রাজ্য পরিচালনায় ২/৪ (দুই-চতুর্থাংশ) ব্যবহার করা যাবে এবং আর্থিক অনটনের বা সংকটপূর্ণ বছরতে ৩/৪ (তিন-চতুর্থাংশ) খরচের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্যের মাধ্যমে সহজেই প্রমাণিত

হয় যে, মহাভারতে কর ব্যবস্থা বা 'রেভিনিউ সিস্টেম' কতটা গভীর ছিল, আমাদের প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নত চেহারা সহজেই আমাদের সামনে আসে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র মহাভারতের লঘু-গুরু বইটির মধ্যে এরূপ চেহারা আমরা পাই:

কিন্তু আমার মনে হয়- এটা 'ইমপোর্ট ডিউটি'র পরিসর। নারদ বলছেন- দূরদেশ থেকে যেসব বণিকেরা লাভের আশা নিয়ে তোমার রাজ্যে বাণিজ্য করতে আসেন, তাঁদের বিক্রয় দ্রব্যের উপর শুল্ক ঠিক করাই আছে। তোমার শুল্কধিকারে থাকা কর্মচারীরা সেই যথোক্ত শুল্কই গ্রহণ করে তো। ইঙ্গিতটা কোন দিকে বোঝা যায়। অর্থাৎ নির্ধারিত শুল্কের বেশি নেন কিনা? যদি তেমন হয়, তবে বাইরের দেশের বণিকেরা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে ব্যবসা করতে আসবেন না।^{৫০}

ব্যবসাদার বলতে নারদ যেমন বড়ো বড়ো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি ধরেছেন তেমনই গরীব কৃষকের দুর্গতিগুলি সম্বন্ধেও তিনি সমান অবহিত। বারবার তিনি জিজ্ঞাসা করছেন- তোমার রাজ্যের কৃষকরা বীজধান পায় তো ঠিক ঠিক? তাদের খাবার কষ্ট নেই তো? নারদ তাই বলছেন- এমন অবস্থা হলে তুমি খুব কম সুদে ঋণ দিয়ে কৃষকদের অনুগ্রহ করো তো?^{৫১}

প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতে রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলি বলার পাশাপাশি রাজার শত্রু মিত্র সম্পর্কে এবং শত্রুকে কোন কোন উপায়ে জয় করতে হবে- তারও বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের অবাক হতে হয় মহাভারতের সমাজকে গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রাবন্ধিকের চেষ্টার পরিধি দেখে। 'রাজধর্ম'- এর তৃতীয় অংশে তিনি আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার সেই প্রাচীন ভারতীয় পন্থার বিষয়ে মনে করিয়ে দেন। যথা- সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। মহাভারতে রাজার চিন্তনীয় ছয়টি বিষয়কে 'ষড়বর্গ' নামে পরিচয় প্রদান করেছেন প্রাবন্ধিক, যা রাজাকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এগুলি হলো- সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা), আসন (শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন), দ্বৈধীভাব (সৈন্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা), সংশয় (বীর্যবান সাধু রাজার আশ্রয় গ্রহণ)। প্রাবন্ধিক এই অংশে আরও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। যথা- শত্রুতা জন্মানোর কারণসমূহ, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করেও নিশ্চিত হতে নেই, দানের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের সন্তোষবিধান, হৃত সম্পত্তি কৌশলে উদ্ধারের চেষ্টা, শত্রুর মূল উৎপাতন, ভেদনীতির প্রয়োগ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসাপেক্ষ, স্বপক্ষের ভেদে বিনাশ নিশ্চিত, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ কর্তব্য, পূর্বের উপকারী শত্রু অবধ্য, গুপ্তচর নিয়োগ এবং সেখান থেকে লোকচরিত্রপরিজ্ঞান, বিভিন্ন প্রকার দুর্গ, দুর্গ যুক্ত পুরীই রাজার বসবাসের উপযোগী, রাজদুর্গের কোন কোন স্থানে নিরাপত্তার জন্য সৈনিক থাকবে, দণ্ডনীতির প্রশংসা, দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগে শুভ ফল, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, অপরাধীর বিভিন্ন প্রকার সাজার ধরন এবং রাজধর্মের শ্রোতাই মোক্ষধর্মের শ্রোতা প্রভৃতি।

‘যুদ্ধ’- নামক অংশতেও মহাভারতে যুদ্ধের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধের বর্ণনা, যুদ্ধে অবধ্য, বিপন্নকে ক্ষমা করাই ধর্ম, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্নীতি, যুদ্ধের আদর্শ কাল, যুদ্ধের জন্য ব্যূহরচনা ও বিভিন্ন প্রকার ব্যূহ, যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহ, যুদ্ধের পরিচ্ছদ এবং যুদ্ধের নীতি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। আমাদের বিস্ময় জাগে যে, সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের বিভিন্ন দিকগুলি কত নিপুণভাবে প্রাবন্ধিকের জ্ঞাত ছিল। তবে যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, দেশরক্ষায় বা বিপদ হতে সমাজকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম। তবে সাম্রাজ্য লিপ্সা ছাড়াও একাধিক যুদ্ধের প্রসঙ্গ সুখময় ভট্টাচার্য দিয়েছেন। যেমন- পাণ্ডুর দিগ্বিজয়, পুরুষোত্তর দিগ্বিজয়, পাণ্ডব এবং কর্ণের অভিযান সমাজশাসনের উদ্দেশ্যে নয়। এছাড়াও যুদ্ধের আয়োজনে ব্যবহৃত নানা অস্ত্রসমূহ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িত সৈনিকদের কীভাবে সেবা শুশ্রূষা হয়- তারও বিস্তারিত বিবরণ আলোচনায় উঠে এসেছে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে দুর্গাস্তব, অস্ত্রাধিবাস, দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান, রথাভিমন্বন, রণবাদ্য ও শঙ্খনিবাদ- এই সকল প্রথাগুলিও গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত যাবতীয় অস্ত্রের ও দিব্যাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ ও বিশেষত্বের দিকটিও প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য এড়িয়ে যাননি।

মহাভারতের সমাজ বইটির চতুর্থ খণ্ডে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ কিছু কথাবার্তা রয়েছে। মহাভারতে দেখি যে প্রতিটি রাজসভাতেই রাজবৈদ্যের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, রাজা সহ রাজপরিবারের ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসার ভার তারই উপরে ছিল। সেক্ষেত্রে তৎকালীন সময়কে গভীরভাবে বোঝার জন্য আয়ুর্বেদকেও জানাটা দরকার। প্রাবন্ধিক সম্ভবত সেই বিষয়টি বুঝতে পেরেই এই বিষয়ে এগিয়েছেন। আলোচনায় এসেছে তাই- রাজসভায় আয়ুর্বেদের সম্মান, শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, চিকিৎসার উদ্দেশ্য, রোগের কারণ, মিতাহার ও প্রসাধনাদি, ভোজনের নিয়মাবলী, বর্জনীয় কর্ম, জ্বরের কারণ, শুল্কের উৎপত্তি, সন্তানের দেহে মাতা-পিতার দেহের উপাদান, সূতিকাগারের চিত্র, বায়ুপঞ্চকের কাজ এবং জাঠরাগ্নির নিয়ন্ত্রণে যোগসাধন প্রভৃতি।

পশু ও বৃক্ষাদির চিকিৎসা সম্পর্কেও মহাভারত দু-একটি কথা বলেছে। প্রাবন্ধিক এই বিষয়ে অশ্ব ও গোরুর চিকিৎসার নকুল ও সহদেবের দক্ষতার প্রসঙ্গ এনেছেন, দীর্ঘতমার গো-ধর্ম শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, বৃক্ষের জীবন ও পুষ্টির বিকাশ, বিষ প্রয়োগে বৃক্ষের চেতনা হারিয়ে যায় এবং বিভিন্ন প্রকার গাছপালার কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন যা যথাযথ রোপনের মাধ্যমে পরিবারের পুণ্য ও কল্যাণ হয়।

মহাভারতে ‘গান্ধর্ব’ শব্দের মাধ্যমে সঙ্গীত বিদ্যাকেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে জানার জন্য সঙ্গীত কলাকেও গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। বিভিন্ন রাজাদের রাজসভায় ও স্বর্গে দেবতাদের কাছে মনোরঞ্জননের জন্য সঙ্গীতের খুবই প্রচলন ছিল। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য আলোচনায় রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা এবং উর্বশী প্রমুখ অঙ্গরাদের নাচগানের কথাও বলেছেন। সঙ্গীতে ব্যবহৃত একগুচ্ছ বাদ্যযন্ত্রের কথাও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও আলোচনায় এসেছে- আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসবে গান বাজনার স্থান, যাগ-যজ্ঞে সঙ্গীতের বিশেষ জায়গা এবং গানের রাজসভায় বিশেষ সমাদরের প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি ধারা আছে, তা আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থগুলিতে অনেক সময়ই উঠে এসেছে। মহাভারতের মতো মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি অবশ্যই খাটে। সুখময় ভট্টাচার্যের বইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৌরব ও পাণ্ডবদের গ্রহ নক্ষত্র অনুসারে দিন গণনার প্রসঙ্গ, মানব জীবনের ওপরে বিভিন্ন প্রকার গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং একাধিক শুভ ও অশুভ লক্ষণের নানা দিক। এছাড়াও নক্ষত্র থেকে মল মাসের গণনা পদ্ধতি মহাভারতে পাই। প্রাবন্ধিকের আলোচনায় এসেছে- বিবাহতে শুভ দিন, যাত্রায় দিনক্ষণের বিচার, ভাগ্য গণনা এবং সামুদ্রিকাদির নিন্দা, শাকুন বিদ্যা, উৎপাত বা দুর্নিমিত্ত, পশুপক্ষীর দারুণ আচরণ (অজগররূপী নহুষের আক্রমণে ভীম পড়ে থাকা অবস্থায় যুধিষ্ঠির নানারকম উৎপাত দেখতে পায়, দিনের বেলায় শিবাগণ বিকট চিৎকার করতে থাকে, সমস্ত পশুপাখি দক্ষিণ দিক থেকে বিকট চিৎকার করতে থাকে), শুভাশুভের সূচক লক্ষণাবলী, গ্রহ-নক্ষত্রের বিপর্যস্ত ভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং গণিত জ্যোতিষে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইত্যাদি।

মহাভারতের সমাজ বইটির শেষের অংশগুলিতে পুরাণ ও বেদ এবং বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানগুলি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে একাধিক জায়গায় বাঙালির মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে এই অংশগুলির গুরুত্বের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের মূল কথাগুলিও বইটির এই অংশতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের একটি ছবি আমরা পাই। গভীর দার্শনিক উপলব্ধিগুলির মধ্যে একটা বড়ো অংশ প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন, এগুলির মধ্যে অন্যতম কিছু হল- ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতা, সুখ এবং দুঃখ নিত্য পরিবর্তনশীল, অর্থের লোভ ত্যাগ, অনুরাগ পরিত্যাগ, মনের স্থিরতা সাধন, অহিংসা, তপস্যা ও বিশুদ্ধ কর্ম, বিষয়ের প্রতি আসক্তি আধ্যাত্মিক তপস্যার প্রতিবন্ধক, সবার উপরে মানুষ সত্য, কর্মের দ্বারাই মানুষের প্রকাশ, জন্মান্তরবাদ এবং কালতত্ত্ব ইত্যাদি।

মহাভারতের সময়কাল বৈদিক ধ্যান ধারণার পাশাপাশি বিভিন্ন অবৈদিক মতবাদ ও দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। তার পরিচয় আমরা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পাই। বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন এবং তর্ক বিদ্যার প্রভূত প্রভাব মহাভারতেই আমরা পাই। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য বইটির শেষ অংশে ভারতীয় দর্শন চর্চার ‘সাংখ্য ও যোগ’ এবং ‘পূর্বোত্তর মীমাংসা’ বিষয় দুইটিকেও স্পর্শ করে গেছেন। এখানে সাংখ্য দর্শনের আচার্যদের একটি তালিকা প্রাবন্ধিক দিয়েছেন। যেখানে পরাশর, যাঙ্গবল্ক্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, গৌতম, সনৎকুমার, শুক্ল, কশ্যপ, জনক, রুদ্র এবং বিশ্বরূপ প্রমুখ আছে। প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্য আলোচনায় এসেছেন সাংখ্যের বিস্তৃতি, জনকের বিদ্যাপ্রাপ্তি, ব্রহ্মবিদ্যা ও সাংখ্যবিদ্যার ঐক্য, মহাভারতীয় সাংখ্যের বৈশিষ্ট্য, যোগের মহিমা, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এবং মহাভারতীয় যোগের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। অন্যদিকে ‘পূর্বোত্তর মীমাংসা’ নিয়েও কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার যাগযজ্ঞের প্রসঙ্গ এসেছে, যজ্ঞের উপকরণের বিষয়ে বিশদ তথ্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, যাগযজ্ঞের নিয়ম ও উপকারিতা, যাগ-যজ্ঞে পশু হত্যা বিষয়ে মতভেদ এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুতে ফলভেদ ইত্যাদিও প্রাবন্ধিক ছুঁয়ে গেছেন।

মহাভারতের চরিতাবলী সুখময় ভট্টাচার্যের মহাভারত চর্চার জগতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। বইটিতে মোট ৫২ টি মহাভারতের চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বইটি অনেকাংশে তথ্যমূলক এবং মূল মহাভারতের রসাস্বাদন করতে অক্ষম এমন পাঠকদের কাছে ছোট পরিসরে মহাভারতের কাহিনিকে বোঝার অন্যতম বইগুলির মধ্যে এইটি প্রধান। একেবারে মূল মহাভারতকে অনুসরণ করে চরিত্রগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে জটিল বিশ্লেষণ বলতে আমরা যা বুঝি তা এখানে তুলনামূলক কম আছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংকট এবং সেখান থেকে পাঠকের ভাবনার বহুমাত্রিকতা প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য সেভাবে উপস্থাপন করেননি। ফলে চরিত্রগুলো অনেকাংশেই মহাভারতের কাহিনি বর্ণনার মতো অর্থাৎ ‘স্টোরি টেলিং’- এর ন্যায় হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাশাপাশি এই কথাও আমরা বলতে বাধ্য হই যে, বইটি যথার্থই মহাভারতের চরিত্রগুলির ‘এনসাইক্লোপিডিয়া’, মূল মহাভারত থেকে প্রাবন্ধিক চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে যত্নসহকারে তুলে এনেছেন।

৪.৬।।

প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬)

প্রতিভা বসু’র রচিত মহাভারতের মহারণ্যে বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজীবন বয়ে বেড়ানো মহাভারতের নানা ভাবনাগুলিকে লিখিত আকারে প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু তাঁর বইতে যুক্তি সহকারে স্থান দিয়েছেন। প্রতিভা বসু

এমন এক ব্যক্তি যিনি বুদ্ধদেব বসু'র *মহাভারতের কথা*-র প্রতিটি বক্তব্য এবং উল্লিখিত রেফারেন্সগুলি নিজের চোখে গড়ে উঠতে দেখেছেন। কিন্তু রচনারীতি এবং বক্তব্য উপস্থাপনের দিক থেকে উভয়ই পৃথক মেরুতে অবস্থান করেছেন। প্রতিভা বসু'র লেখা আমাদের চিরপরিচিত মহাভারতকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ এবং যুক্তিবোধ দ্বারা পড়তে ও ভাবতে শেখায়।

প্রাবন্ধিকের মহাভারত বিশ্লেষণের অভিমুখটি ধরা আছে তাঁর *মহাভারতের মহারণে*-র একেবারে প্রথমেই। ভূমিকা অংশের মাত্র ছয় পৃষ্ঠার মধ্যেই প্রাবন্ধিক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন, এই অংশ থেকেই তাঁর ভাবনার গতিপথটিকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি।

এই বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে যে ব্যাপারটা প্রকট হয়ে ওঠে তা হলো, মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটে বিধৃত এক অনস্বীকার্য কালো-সাদার দ্বন্দ্ব। সংঘাত বৈধ-অবৈধের, আর্য-অনার্যের। লক্ষণীয়, যে ভারতবর্ষে আজও জাতিভেদ প্রবল, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ গাত্রবর্ণে প্রতিফলিত, সেখানে ক্ষত্রিয়-কুলের এই কাহিনীতে কৃষ্ণবর্ণের আধিপত্য সর্বত্র, অবৈধ অনার্য এবং মিশ্রবর্ণের জয়জয়কার, শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ শোণিতের চূড়ান্ত পতন ও বিলুপ্তি।^{৫২}

এই ব্যাখ্যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহাভারত নামত ভারতবংশের ইতিহাস হলেও, প্রকৃতপক্ষে সত্যবতী-দ্বৈপায়নের বংশের ইতিহাস।^{৫৩}

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, মহাভারতের গল্প বহিরাগত আর্যশাসকদের বিরুদ্ধে অনার্য, কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণসংকর, জাতিবৈষম্যে বিড়ম্বিত দেশবাসীর অন্তিম প্রতিশোধ। শুদ্ধ শোণিতের গরিমালুপ্তির ইতিহাস।^{৫৪}

মহাভারতে আর্য বনাম অনার্যের মাঝে দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতির বিষয়টিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু তাঁর বইটিতে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসু যেখানে দেখিয়েছেন রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধের কারণ এক নয়, মহাভারতের যুদ্ধ নারীর কারণে হয়নি, মহাভারতের যুদ্ধ একান্তভাবেই ভূমির অধিকারের লড়াই। সেখানে প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু পুরুষের যুদ্ধ, সংকট ও দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক যে ক্ষমতার লড়াই তার মধ্যে শকুন্তলা, সত্যবতীদের ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে অন্বেষণ করে দেখতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক তাঁর যুক্তিবাদী মন এবং গোয়েন্দার মতো অনুসন্ধানের সূত্র ধরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্যগুলির সঙ্গে যদিও সর্বদা আমরা সহমত হতে পারি না, তবুও প্রাবন্ধিকের উপস্থাপিত তথ্য এবং অন্বেষণগুলি আমাদের মহাভারত চর্চার পথে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।

প্রাবন্ধিকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের মধ্যে অন্যতম হল আর্য বনাম অনার্যের দ্বন্দ্ব। এই সংকট তিনি পুরো মহাভারতের মহারণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রাজা শান্তনুকে মোহিত করে রাজরানী হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গী সত্যবতী, মহাভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী চরিত্র দেবব্রতকে ভীষ্মতে পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল সত্যবতীই। বংশরক্ষার প্রয়োজনে নিজের কানীন পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে নিয়োগ করে সত্যবতী, মহাভারতের এই বিষয়গুলি আমরা জানি। কিন্তু প্রাবন্ধিক আমাদের দেখিয়েছেন যে, কুরুবংশ থেকে মুছে যাওয়া বিশুদ্ধ রক্তের অহংকার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী সত্যবতী-ব্যাসদেবের বংশধারা। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন অম্বিকা এবং অম্বালিকার ব্যাসদেবের সঙ্গে নিঃশব্দে অনিচ্ছাপূর্বক মিলন। বিদুর জননী অনাম্নী অঙ্গনাটিকে নিয়ে একটি নাটক রচনা করেছিলেন বুদ্বদেব বসু, অম্বিকাও স্থান পেয়েছিল সেই নাটকে, ছিল রানীর মর্যাদায়, ব্যস্ত ছিল ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসেবে দাসীকে ব্যবহারের কৌশল রচনায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য চোখে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রতিভা, নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বংশরক্ষার তাগিদে এবং রাজমাতা সত্যবতীর আদেশে নিরুপায় দুই রাজবধূর অসহায় আত্মদানটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঐক্যেছেন প্রতিভা বসু। এরপর ভিন্নভাবে সক্ষম দু'টি রাজপুত্রের জন্মের দায়ও যখন তাদেরই উপর আরোপিত হল, তখন প্রাবন্ধিকের রচনায় উঠে এসেছে, 'এই বধূ দুটির বেদনা নিয়ে কোনো হা-হুতাশ নেই কোথাও।'

পঞ্চপাণ্ডবের চরিত্র সম্পর্কে চিরকালের পরিচিত ন্যারেটিভকে চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু। যুধিষ্ঠির ও ভীমের আক্রোশ ও হিংস্র মনোভাব মহাভারতের অনেক জায়গাতেই নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডবদের আগমন থেকে শুরু করে আঠারো দিনের যুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চপাণ্ডবের কৌরবদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রগুলি পরপর উপস্থাপন করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রতিভা প্রশ্ন তুলেছেন কোন অপরাধের ফলে দুর্যোধন জন্মমুহূর্ত থেকেই 'পাপাত্মা' নামে অভিহিত হয়ে গেল? প্রাবন্ধিক আরও বলেছেন যে, পুরো মহাভারত জুড়ে দুর্যোধনের একটি 'নেগেটিভ ইমেজ' সচেতনভাবে বিদুরের নির্মাণ, কারণ যুবরাজ হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে উঠে আসতে হলে তার একমাত্র প্রবল প্রতিপক্ষ দুর্যোধন। ছোটবেলা থেকেই যুধিষ্ঠিরকে মহৎ ও সৎ এবং অপরপক্ষে দুর্যোধনকে অসৎ, লোভী ও পাপী বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে পঞ্চপাণ্ডবের দাবির যথার্থতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, পঞ্চপাণ্ডব কি যথার্থই পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্র? যদি তারা যথার্থই ক্ষেত্রজ পুত্র হতো, তাহলে পঞ্চপাণ্ডবের অস্তিত্ব পাণ্ডুর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হল কেন? দুর্যোধনের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বেই কেন যুধিষ্ঠিরের আগমন হল? প্রতিভা বসু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, পাণ্ডবরা কি তাহলে দুর্যোধনের অভিষেক হওয়ার বিষয়ে জানত?

প্রাবন্ধিক তুলনা এবং প্রতি-তুলনার মধ্যে দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্যোধনের এক উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। এক দিকে স্থান পেয়েছে পিতামহ ভীষ্মের কাছে আবাল্য অশ্রুশ্রদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত যে কিশোর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আপন ঔরসজাত পুত্র এবং কুরু রাজবংশের যথার্থ উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য; অন্যদিকে পর্বত জঙ্গলে বেড়ে ওঠা সংস্কৃতিহীন একদল পার্বত্য কিশোর। দুর্যোধনের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হবার পূর্বেই হস্তিনাপুরের রাজসভায় এসে কুন্তী ঘোষণা করে যে, পাণ্ডু ও মাদ্রীর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। তাই সে পঞ্চপুত্রের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছে। এখানে প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু প্রশ্ন তুলেছেন, পাণ্ডু-মাদ্রীর মৃত্যু কি যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করবার জন্য ষড়যন্ত্রের একটি অঙ্গ? পাণ্ডুর জীবনকালে পঞ্চপাণ্ডবের অস্তিত্বের কোনও খবরই হস্তিনাপুর জানত না, হঠাৎ এতগুলি বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর এই পাঁচ পার্বত্য কিশোরের আগমনকে প্রাবন্ধিক সন্দেহের চোখে দেখতে চেয়েছেন। এছাড়াও পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু স্বাভাবিক নাকী একপ্রকার গুপ্তহত্যা-এ নিয়েও প্রাবন্ধিক গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের বিনা যুদ্ধে সাম্রাজ্য দখলের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা থাকার কারণেই শকুনির সঙ্গে পাশা খেলা হয়েছে, পাশা খেলায় শকুনির দক্ষতা সর্বজনবিদিত। যুধিষ্ঠির চাইলেই অন্য রাজা ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কারোর সঙ্গেই পাশা খেলতে পারত। কিন্তু রাজত্ব দখলের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষার কারণেই সে একপ্রকার নিজের যাবতীয় সম্পত্তি ও দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় বাজি রাখে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের যে চিত্রকল্পটি আমাদের সামনে সর্বদাই ভেসে ওঠে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্রকল্প আমাদের সামনে প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন। তার মতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার নাম দিয়ে যাবতীয় নৈতিক হত্যালীলা পাণ্ডবরা করেছে। জরাসন্ধ ও শিশুপাল থেকে শুরু করে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং দুর্যোধনের নিধন পাণ্ডবরা যুদ্ধনীতি অনুসারে করে নি। তবে প্রতিভা বসুর প্রতিপাদ্যের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত হতে পারি না, কারণ যুদ্ধে নৈতিক কাজকর্ম ও চক্রান্ত উভয় পক্ষই করেছে। অভিমন্যুকে এবং পাঞ্চালীর পুত্রদেরও কৌরবরা নৈতিকভাবে হত্যা করেছে। যাই হোক, আমাদের প্রচলিত মহাভারত পাঠের বিপরীতে এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ও মতামত প্রতিভা বসু উপস্থাপন করেছেন।

মহাভারতের মহারণ্যে বিদুরকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিভা বসু। বইটির একটি বড়ো অংশ জুড়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ‘ভিতরে এবং বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই মানুষ’-বিদুর। মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্ভে’র মতো প্রাবন্ধিকও বিশ্বাস করেন যে বিদুরই যুধিষ্ঠিরের পিতা। বিদুর ও যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে ইরাবতীর প্রতিপাদ্য শুধুমাত্র পিতা-পুত্র সম্পর্কটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রতিভা বসু প্রতিষ্ঠা করেছেন পুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভের জন্য পিতা বিদুরের যাবতীয় ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ। এই ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে আছে পঞ্চপাণ্ডবের হস্তিনাপুরে আগমন থেকে শুরু করে প্রায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি। প্রতিভা বসু বলতে চেয়েছেন যে দুর্যোধন

অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরকে বয়সে বড়ো দেখানো, ধৃতরাষ্ট্রের মনে ও রাজ্যবাসীর কাছে দুর্যোধনকে সর্বদা খলনায়ক করে রাখা, পাণ্ডবদের যাবতীয় ত্রুটিগুলিকে জনসমক্ষে বেশি প্রকট হতে না দেওয়া এবং পাণ্ডবদের বারণাবতে নিষাদ পুত্রদের হত্যার পর পালাতে সাহায্য করা প্রভৃতি কাজগুলিতে বিদুরের প্রত্যক্ষভাবে পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত ছিল। যদিও বিদুরের চরিত্রের এই দিকগুলির সঙ্গে ইরাবতী কার্ত্তে সহমত পোষণ করেননি। বিদুর শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে নিরপেক্ষ এবং দক্ষতার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে গেছে। কিন্তু প্রতিভা বসু সচেতনভাবে জানিয়ে দেন বিদুর একজন ক্ষমতালোভী, কুচক্রী মহামন্ত্রী। শুধু তাই নয়, প্রাবন্ধিক হস্তিনাপুরের প্রতিটি ঘটনার ক্রম অনুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিজ পুত্রকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাই বিদুরের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিদুর তার এই উদ্দেশ্যকেই সারা জীবনের কাজের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছে। যদিও আমরা বিদুর সম্পর্কে প্রতিভা বসু'র এই মতামত ও নিরীক্ষণের সঙ্গে সহমত হতে পারি না। যেখানে ব্যাসদেব নিজের জন্মের রহস্য ও যথার্থ ঘটনাটি মহাভারতে উল্লেখ করেছে, এই বিষয়ে কোনওরকম রহস্যের আস্তরণ রাখেনি, মহাভারতের এরকম অনেক ঘটনাই ব্যাসদেব কুণ্ঠাহীনভাবে প্রকাশ করেছে, সেখানে যুধিষ্ঠিরের পিতা বিদুর হলে ব্যাসদেব সহজেই সেটি উল্লেখ করত। অঙ্গরাজ কর্ণের মতো যুধিষ্ঠিরের জন্মের রহস্য খুব সহজেই প্রকটিত হতে পারত। যুধিষ্ঠিরের পিতৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করলে মহাভারতের একটি ভিত্তিপ্রস্তর সরে যায়, যেটির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকরা যুধিষ্ঠিরের চিত্রকল্প গড়ে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, বিদুরকে নিয়ে প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু'র এই অবস্থানটি বুদ্ধদেব বসু'র বিদুর সম্পর্কে মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থান করেছে। আমরাও এই বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু'র সঙ্গে সহমত পোষণ করেছি। বিদুরের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের মিল শুধুই চরিত্রগত দিক থেকে, কারণ উভয়ের মধ্যেই সততা ও সাধুতা আছে। ব্যাসদেবও দু'জনের মিল বোঝাতে এই দিকটিতেই ইঙ্গিত করেছে। বিশ শতকের বেশির ভাগ মহাভারত গবেষকই প্রতিভা বসু'র এই মতকে অস্বীকার করেন। পাঠক বা গবেষকদের প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু'র প্রতিপাদ্যের সঙ্গে অনেক জায়গাতেই মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বিশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় প্রতিভা বসু'র এক বিশেষ স্থান আছে।

৪.৭।।

সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪)

মহাভারতকে নিয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সব ব্যক্তির চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সুকুমারী ভট্টাচার্য অন্যতম একজন। গাঙচিল প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের মহাভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছের নাম হল-*আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত*। এই প্রবন্ধগুচ্ছের মধ্যে মোট

ষোলটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মতো এখানেও মহাভারতকে নিয়ে আলোচনার সূত্রে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় পুরাণ, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির মতো একাধিক বিদ্যায়তনিক জ্ঞানচর্চার শাখাসমূহ। প্রাবন্ধিকের মহাভারত আলোচনাটি আয়তনে খুব একটা বড়ো না হলেও এ বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমরা পেয়েছি। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য মহাভারতকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রামায়ণের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনার মধ্যে দিয়ে মহাভারতের দ্বন্দ্ব, সংকট, জটিলতা এবং জীবনবোধ উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে আমাদের মনে হয়েছে যে রামায়ণের কাহিনি সহজ ও জনপ্রিয়; অন্যদিকে মহাভারত প্রথম থেকেই একাধিক কাহিনি ও উপকাহিনিতে বহুস্তর বিশিষ্ট, জটিল ও কম জনপ্রিয়। রামায়ণের সারল্যের বিপরীতে মহাভারতে নানান সামাজিক অসমতা ও নৈতিক সংকট নিয়ে যে জটিল বুনন তা পাঠক মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মহাভারত তাই পাঠক ও শ্রোতার কাছে দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা।

প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখাতে পেরেছেন যে, মহাভারতের দ্বন্দ্ব এবং সংকটের কারণেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া কখনোই একমুখী হয় না। মহাভারতের কাহিনির মধ্যে পাঠক অথবা শ্রোতা কারোরই জোরালো সমর্থন এক পক্ষের দিকে থাকে না, অন্যদিকে সীতা হরণের পর রামায়ণে পাঠকের সমর্থন প্রগাঢ়ভাবে রামের দিকেই। রামায়ণের পাঠক নিজেরাই চাইছে যে যুদ্ধে রাবণের পরাজয় এবং রামের বিজয়। কিন্তু মহাভারতের ক্ষেত্রে হিসাবটা অনেকটা জটিল, এখানে ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখাটি রামায়ণের মতো স্পষ্ট নয়। সেটা যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা হোক অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ, অভিমন্যু, শল্য অথবা যুবরাজ দুর্যোধনের মৃত্যুই হোক। যুধিষ্ঠির নিজে শাস্ত্র বিদ্যায় যথার্থ জ্ঞানী হওয়ার পরেও পাশাখেলা অন্যায় জেনেও তা খেলেছে- ফলে পাঠক এখানে দোষ একতরফাভাবে দুর্যোধনকে দিতে পারে না। পাঠকের প্রতিক্রিয়া দ্বিধাবিভক্ত স্বাভাবিকভাবেই হতে বাধ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রত্যেক জন মহারথীদের মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবে হল না, প্রতিটা ক্ষেত্রেই ছল-কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে, তাই সেই ক্ষেত্রে পাঠক ও শ্রোতার মনে একটি দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই অবস্থান করতে বাধ্য। রামায়ণের মধ্যেও কিছু কিছু নৈতিক সংঘাত অবশ্যই আছে, সেগুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য, তবু সেগুলি সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশ সংঘাতই পাঠককে উদ্ভান্ত বা যন্ত্রণাতুর করে তোলে না। সমাজপতিদের বাঁধা ছকেই রামায়ণের কাহিনি এগিয়েছে, মূলত পরিবারনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ মূল্যবোধ সরলরৈখিকভাবে রামায়ণে এসেছে। রামায়ণের মধ্যে অলৌকিকতার প্রচুর উপাদান আছে, কাব্যটি কাব্যিক উপমায় ও রসে ভরপুর, কাহিনির প্রয়োজনে যখন যেটা হওয়া প্রয়োজন

সেটাই ঘটেছে এবং বাস্তব অবাস্তবের মধ্যে ভেদ নেই। সাধারণ পাঠকের কাছে তাই রামায়ণের জনপ্রিয়তা মহাভারতের থেকে অনেক বেশি। অন্যদিকে মহাভারত দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা, মহাভারতের এই দাবিই তাকে অধিকতর জটিল করে তুলেছে। কিন্তু, প্রাবন্ধিক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে পেরেছেন মহাভারত জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কারণে যে মহাভারত আগ্রহ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করে, সে সমৃদ্ধ হয় বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতের স্ত্রীপর্বে-র একটি উপাখ্যান বলা যেতে পারে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য মানুষের জীবন সম্পর্কে স্ত্রীপর্বে-র একটি উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন, যেখানে জীবন সম্পর্কে মহাভারত যা বলতে চায় তা বিধৃত হয়েছে:

এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসবল্ল এক বনে প্রবেশ করেন। সেখানে অনেক সিংহ, বাঘ, হাতি চারিদিকে ঘুরছে। দেখে ব্রাহ্মণটির ভয়ে রোমাঞ্চ হল। দেখলেন চারিদিকে জালে ঢাকা এক বনভূমি তাকে এক নারী দু-হাতে বেঁধে ধরে আছে। পাঁচমাথাওয়ালা পাহাড়প্রমাণ হাতিরা ঘুরছে। সেই বনে লতায় ঢাকা এক জলাশয়, তার মধ্যে এক কূপ। ব্রাহ্মণ আচমকা সেই কুয়োয় পড়ে গেলেন, বুলন্ত লতা ধরে বুলতে লাগলেন- মাথা নিচে, পা ওপরে এই অবস্থায়। কুয়োর পাড়ে এক প্রকাণ্ড হাতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওই বুলন্ত শাখায় ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। মৌচাক থেকে মধুর ধারা নিঃসৃত হচ্ছে। ওই ব্রাহ্মণটির মুখেও মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা মধু পড়ছে, পান করে তার অতৃপ্তিই বাড়ছে। মহাভারত বলছে, ওইখানেই মানুষের বেঁচে থাকার বাসনা প্রতিষ্ঠিত। এ দিকে যে-গাছের লতা ধরে মানুষটি বুলছে সেই গাছের শিকড়গুলো কেটেই চলেছে কিন্তু ইঁদুর, অর্থাৎ যে কোনও সময়ে গাছটা পড়ে যাবে, লতাগুলো ছিঁড়ে যাবে এবং মানুষটি কুয়োর নীচে পড়ে যাবে আছে বিষাক্ত সাপ। মানুষ সংসারে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই ভাবেই বেঁচে থাকে। ৫৫

‘জীবনদর্শনের পার্থক্য’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য স্ত্রীপর্বে-র এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে মানব জীবন সম্পর্কে এক নতুন ধারণা দিলেন। জীবনের অর্থ, বেঁচে থাকার কারণ সম্পর্কে নতুন এক পথ মহাভারত এখানে বলছে। আমরা জানি মানব জীবনে ভয়, সংকট এবং আশঙ্কা থাকবেই। উপরের উপাখ্যানটি থেকেই দেখতে পাচ্ছি অনিবার্য মৃত্যুর বহুবিধ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। কীসের ইচ্ছা ও অতৃপ্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে? এখানেই মহাভারত বলছে মৌচাক থেকে পড়া ফোঁটা ফোঁটা মধু, যেটি পান করে মানুষ কখনওই তৃপ্ত হয় না, কিন্তু যার জন্য লোলুপতা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, জাগিয়ে রাখে পরবর্তী মধু পানের প্রত্যাশায়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই মধু-র স্বরূপ প্রত্যেক জীবনে ভিন্ন, কোথাও এটি কর্ম, কোনও জায়গায় প্রেম অথবা মানবিক আদর্শ, কোথাও আবার অন্য কিছু। এটির স্বরূপ যাই হোক, এই মধুর বিন্দু মানুষটিকে তার অতৃপ্তি ক্রমশ বাড়িয়েই দেয়।

স্রীপর্বে-র এই আখ্যানে মহাভারত মানব জীবনের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। মানব জীবন সম্পর্কে এরকম জটিল ভাবনা রামায়ণে নেই। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য খুব সুন্দরভাবে আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে পেরেছেন যে, এই রচনা বৌদ্ধ ধর্মের ‘নির্বাণ’ বা উপনিষদের ‘মোক্ষ’ কল্পনার পরবর্তী সময়ের কথা। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে মহাভারত তার পূর্ববর্তী সময়ের তত্ত্বকথাকে পেরিয়ে জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন বাণী উচ্চারণ করল। এখানে ‘নির্বাণ’ লাভের বাইরে গিয়ে মানুষের বাঁচার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে। এখানেই সুকুমারী ভট্টাচার্য মহাভারতের মধ্যে জীবনদর্শনের এই নতুন দিকটি উপস্থাপন করেছেন।

প্রাবন্ধিক সুকুমারী তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে একজন পাঠক অথবা শ্রোতার মহাভারত পাঠের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গটি নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রাবন্ধিক শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব নিয়েও বেশ কিছু পাঠক মনের সংকটের কথা বলতে চেয়েছেন। এই পর্বগুলির মধ্যে একাধিক স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে, যেখানে পাঠককে সহজেই বিভ্রান্ত হতে হয়। পাঠক বা শ্রোতার বোধগম্য হয় না, সে সংকট ও দ্বিধায় পড়ে। মৌর্য যুগের কাছাকাছি থেকে গুপ্তযুগের আরম্ভ পর্যন্ত সারা আর্যাবর্তব্যাপী সাম্রাজ্যের নির্দেশক শাস্ত্র হল মহাভারতের এই প্রক্ষিপ্ত পর্বগুলি। ফলে যুধিষ্ঠির এখানে পরোক্ষ শ্রোতা, প্রত্যক্ষ শ্রোতা হলো ওই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যবর্তী ও পরবর্তী কালের মানুষ। প্রাবন্ধিক যুক্তি সহকারে বোঝাতে পেরেছেন শান্তিপর্ব কোনও একজনের রচনা নয়; অনেক রচনাকারের সম্মিলিত সৃষ্টি। সেই কারণেই কোনও একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এখানে পরস্পর বিরোধী একাধিক স্বর উঠে আসতে দেখা গেছে। প্রাবন্ধিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই জায়গাগুলি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বিষয়ে দু’একটি প্রসঙ্গ তুলে ধরার চেষ্টা করছি :

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলছেন, তীক্ষ্ণ বিষ কালসাপ, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার, বিষ ও নারী একই রকম প্রাণনাশক; আর যা-ই করো, যুধিষ্ঠির, নারীকে কদাপি বিশ্বাস কোরো না।^{৫৬}

এখানে পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে যেটি উচ্চারিত হলো সেটি নারী সম্পর্কে তার মনোভাব স্পষ্ট করে। বক্তা চিরকুমার, ব্যক্তিগতভাবে নারী সম্পর্কে সুগভীর ধারণা থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক নারী সঙ্গ পেয়েছে, ফলে শ্রোতা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। এই পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয় হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয় বলে পাঠক মনে করে। ফলে পাঠকের কাছে পিতামহ ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখা যেতে পারে, আবার বিভিন্ন শাস্ত্র জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞ ও নিপুণ যুধিষ্ঠিরও ভীষ্মের উক্তি বিনা সমালোচনায় মেনেও নেয়। আমরা বুঝতে পারি গুপ্তযুগ থেকে যে সামাজিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল; সেখানে নারীর সামাজিক অবনমন এবং পুরুষ কর্তৃক অবদমন লক্ষণীয়। মূলত সেই কারণেই সামাজিকভাবে নারীর একটি চিত্রকল্প বা

ইমেজ নির্মাণের প্রয়াসটি এই পর্বগুলিতে পাওয়া যায়। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক, শরশয্যায় শুয়ে পিতামহের নারী সম্পর্কে এইরূপ উক্তি পাঠক মনে বিভ্রান্তি তৈরি করে। পাঠকের প্রতিক্রিয়া এখানে একেবারেই একমুখী হয় না। এরকম অনেক স্লামকেই নিম্নবর্ণের প্রতি হীনতা, রাজার প্রতি প্রজাদের বশ্যতা, পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্য, সম্ভোগের আনন্দ, নিয়তির প্রতি পুরুষকারের সম্বন্ধ প্রভৃতি-উপস্থাপন করা হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ মানুষের পৌত্রের হাতে শেষ উত্তরাধিকার তুলে দেওয়ার যথার্থ নমুনা কি এটি? পাঠকের কাছে এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর থাকে না।

আবার মহাভারতের শান্তিপর্বেই অন্য একটি জায়গাতে মানুষকে ঈশ্বরের ওপরেও স্থান দিয়েছে এই ভীষ্মই। ভাবতে অবাক লাগে এতক্ষণ ভীষ্ম নিম্নবর্ণ, নারী প্রভৃতির সামাজিক অবস্থান নিয়ে সমালোচনা করে এসেছে; সেই একই ব্যক্তি এখন আবার মানুষের স্থান সবার উপরে-এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বলছে।

তাই এক জায়গায় প্রায় অপ্রাসঙ্গিক তাবেই সহসা ভীষ্ম বলেন, ‘গোপন একটা রহস্য তোমাকে বলি। যুধিষ্ঠির, মানুষের চেয়ে বড় কোনও কিছুই নেই।’^{৫৭}

এখানেই আবার আমরা থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হই। কারণ ভীষ্ম নিজেই জানিয়েছে যে মানুষের স্থানই সর্বোপরে। তাহলে প্রশ্ন জাগে এতক্ষণ মহাভারত জুড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মীর মহিমা কীর্তন করা হল, তাদের জায়গা কোথায়? দেবতাদের স্থান মহাভারতের অন্যান্য জায়গায় সাধারণ মানুষের ওপরেই বরাবর থেকে এসেছে। কিন্তু ভীষ্মের কথায় এখানে বৈপরীত্যটি খুব সুন্দরভাবে প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য উপস্থাপন করতে পেরেছেন।

আবার দেবতার ক্ষমতা, কাজের ত্রুটি প্রভৃতি বিষয়েও একাধিক প্রশ্ন এবং সংকট উঠে এসেছে এই মহাভারতেই। দেবতারা সর্বদাই সঠিক, কোনও ত্রুটিপূর্ণ কর্ম তাদের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়- দেবতার উপর মানুষের এই বিশ্বাস মহাভারতেই ফাটল ধরেছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য* নামক প্রবন্ধ সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে বৈদিক যুগ ও সমাজের সংশয়ের নানা আখ্যান বলেছেন। সেখানে আমরা দেখেছি দেবতার প্রতি ভক্তি সহকারে পূজা ও যাগ-যজ্ঞ করা সত্ত্বেও অনেক সময় মানুষ তার কাজক্ষিত ফল পায়নি। এই নিয়ে বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনার শেষে আমরা দেখেছি যম ও নচিকেতার মধ্যে হওয়া কথোপকথন। সংশয়ের চূড়ান্ত রূপ আমরা সেখানে পেয়েছিলাম। মহাভারতের মধ্যেও এরকম কিছু সংশয়, সংকট ও দ্বন্দ্ব প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন:

ঋষি অণীমাণ্ডব্য মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করছিলেন নিজের কুটীরে। কয়েকজন চোরকে নগররক্ষীরা তাড়া করতে তারা নিরুপায় হয়ে চুপি চুপি চোরাই মাল ঋষির কুটীরে রেখে পালিয়ে যায়। রক্ষীরা কুটীরে ঢুকে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করে, লোকগুলো কোনদিকে গেল। কিন্তু ঋষি তখন মৌন অবলম্বন করে আছেন তখন, কাজেই উত্তর দিলেন না। রক্ষীরা চোরাই মাল কুটীরে পেয়ে ঋষিকেই চোর সাব্যস্ত করে রাজদ্বারে বিচার চায়। রাজা বলেন তাঁকে শূলে দিতে। শূলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ্য করে প্রণয় করেন, নির্দোষ হলেও কেন তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু। ধর্ম বলেন, শৈশবে তিনি একটি কীটের শরীরে একটি কাঁটা প্রবেশ করান, এ তারই প্রায়শ্চিত্ত। তখন অণীমাণ্ডব্য ধর্মকে উদ্দেশ্য করে অভিশাপ দিয়ে বলেন, অজ্ঞান বালকের লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড বিধান করার অপরাধে ধর্মকে মর্তে জন্মাতে হবে শূদ্রযোনিতে। ধর্ম শূদ্ররূপে অবতীর্ণ হলেন, বিদুর রূপে।^{৫৮}

এই অভিশাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাভারতে। কারণ পাঠক ও শ্রোতার মনে আজন্ম লালিত বিশ্বাসে এটি কুঠারাঘাত করেছে। ধর্ম নিজে দেবতা হয়েও সে অন্যায় করেছে। আবার দেবতার অন্যায়ের সাজা একজন মানুষ দিচ্ছে। এখানে একজন সৎ ঋষি মানুষ দেবতার দণ্ডদাতা হয়ে দেবতার উপরে স্থান পেল। মহাভারতের আদিপর্বে এইরকম আরেকটি উপকাহিনি পাওয়া যায়:

যমরাজের দূতেরা এক ব্যক্তিকে পরলোকে নিয়ে গেল; তাকে দেখে যম বললেন, ‘ভুল হয়ে গেছে। এরা অর্থাৎ যমদূতেরা নামসাদৃশ্যে ভুল লোককে ধরে এনেছে।’ পরে লোকটির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তাকে মর্তে ফেরত পাঠিয়ে দিলেনও।^{৫৯}

প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এই সকল দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরার দ্বারাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের মনের গভীরতম বিশ্বাসটি মহাভারতের মতো রামায়ণে পাঠক বা শ্রোতার কাছে এত জটিল হয়ে ওঠে না। রামায়ণের পাঠক বা শ্রোতা তার পূর্ব প্রত্যয়গুলির সমর্থন খুঁজে পায় মহাকাব্যে, কাব্যটি তার কাছে সহজেই সন্তোষ ও প্রশংসার আধার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মহাভারত তার পাঠককে প্রত্যয়ের প্রান্তে বরাবরের মতো দাঁড় করায়। ফলস্বরূপ পাঠক বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়া মহাভারতে দ্বিখণ্ডিত। এইসব সত্ত্বেও প্রাবন্ধিক মহাভারতের সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যথেষ্ট ধৈর্য ও বিবেচনার দ্বারা মহাভারত পাঠ করা গেলে আপাতত প্রত্যয়-ধ্বংসের অপরদিকে এক গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছানো যায়, যেখানে জীবনের জটিলতার বহুবিধ ব্যাখ্যা মেলে।

মার্কসীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাভারত চর্চার কারণে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য মহাকাব্যের মহাপ্রস্থান পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বে-র কিছু কম আলোচিত বিষয়কে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে সক্ষম হয়েছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য এখানে দ্রৌপদীর সঙ্গে অন্যান্য চার পাণ্ডবের মৃত্যুর কারণগুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের ইচ্ছাগুলিই

সাধারণত প্রথমে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচজন স্বামীর বিবাহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনাটি ঘটে। অন্যান্য খ্যাতিমান রাজপুরুষের সঙ্গে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে অর্জুন বিজয় লাভ করে এবং ফলস্বরূপ পাঞ্চগল কন্যা তার গলায় স্বেচ্ছায় মাল্যদান করে। পরে অন্যান্য পাণ্ডবের সঙ্গে দৈবদুর্বিপাকে বিয়ে হলেও বাকি চার স্বামীর প্রতি দ্রৌপদীর কর্তব্যে ত্রুটি ছিল না। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেম কি শাসন মানে? অন্যান্য পাণ্ডবের চেয়ে অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী বরাবরই একটু বেশি দুর্বল ছিল। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা; সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো আমরাও এটিকেই কাম্য বলে মনে করি। অথচ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে জানাল যে অর্জুনের প্রতি অধিক ভালোবাসা ও দুর্বলতার কারণেই দ্রুপদ কন্যার মৃত্যু হয়েছে। মহাভারতের পাঠক ও শ্রোতা এই জায়গাতেই থমকে দাঁড়ায়। তার যুক্তিপূর্ণ মনে বহু প্রতিক্রিয়া, সংকট ও দ্বন্দ্ব উঠে আসে। আধুনিক পাঠক মাত্রই আমরা জানি যে, ভালোবাসা ও প্রেম মানব মনের একান্ত গোপন একটি জিনিস, যেটা বস্তুগত অন্যান্য দ্রব্যের মতো সমানভাণ্ডে ভাগ করা যায় না। এখানে পাঠক হিসেবে আমাদের প্রতিক্রিয়া খুব সহজ হয়ে ওঠে না।

এই দ্রৌপদীর মতো অন্য চার পাণ্ডবের মৃত্যুর কারণ নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্ন পাঠকের মনে স্থান পায়। মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে যে মৃত্যুর কারণগুলি তুলে ধরল, সেগুলি নিয়ে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অপরাধ ও অপরাধের ফলে সাজার বিষয়টি একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। সমতা ও ভারসাম্যের অভাব আমরা দেখতে পাই। যেমন যুদ্ধের সময় প্রবল ক্ষোভে ও আক্রোশের মুহূর্তে অর্জুন হঠকারীর মতো দাস্তিক প্রতিজ্ঞা করে বসল। একদিনেই সমস্ত শত্রু নিপাত করতে চায় অর্জুন। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অর্জুনের এই উত্তেজিত দস্তোজিটি সেই সময়ের অসহিষ্ণু রোষের প্রকাশ। কিন্তু এই উক্তিটিকেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে যুধিষ্ঠির তুলে ধরেছে, ফলে পাঠকের মনে এখানেও একরৈখিক প্রতিক্রিয়া উঠে আসে না। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য নকুল, সহদেব ও ভীমের মৃত্যুর ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণগুলিরও সমালোচনা করেছেন। নকুল-সহদেবের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও রূপের অভিমান কখনও উগ্ররূপে প্রকাশিত হয়নি, অথচ যুধিষ্ঠির বলেছে প্রজ্ঞা এবং রূপের অহংকারেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। ভীম অসামান্য বলশালী, দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে আহায়ে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রয়োজন বেশি। এই ভীমের দৈহিক শক্তি পাণ্ডবদের অরণ্যবাসকালে অনেকাংশে সহায়তা করেছিল। অথচ শুধুমাত্র ভোজনপ্রিয়তার জন্যই নাকী ভীমের মৃত্যু! ফলে এখানেও স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে পাপ ও দণ্ডের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্যই নেই। মহাভারতের এই অসম দণ্ডে পাঠক ও শ্রোতার সাড়া দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মহাভারতের পাঠকের মনের মধ্যে যখন দ্রৌপদী সহ চার পাণ্ডবের মৃত্যুর কারণটি যথার্থ বলে মনে হয় না, পুরো বিষয়টিতে পাঠক বা শ্রোতা যখন প্রতি পদে পদে অসামঞ্জস্যতা দেখতে পায়। তখন আমাদের যুক্তিবাদী মনে প্রশ্ন জাগে পাশাখেলা, দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হিসেবে অর্ধসত্য উচ্চারণ করা সহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের কারণে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু স্বর্গ আরোহণকালে হল না কেন? যুক্তিবাদী পাঠক বা শ্রোতার কাছে আপাতভাবে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলে না। পাঠক এইখানে এসে যুধিষ্ঠিরের নিষ্পাপ ধর্মান্বিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, পাশা খেলা গুরুতর অন্যায় কাজ- এগুলি জেনেও যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর দখলের লোভে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছে। ফলস্বরূপ পাশা খেলায় হার এবং প্রকাশ্য রাজসভায় দুঃশাসন দ্বারা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা। এই উপাখ্যানের মধ্যেই নিহিত আছে মহাভারত সম্পর্কে জনসাধারণের সংবেদনে একটা গুরুতর প্রত্যবায়। দ্রৌপদী যে প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিত হল সেই বিষয়ে সেরকম কোনও সরব প্রতিবাদ হল না। বিদুর ও বিকর্ণ প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিপত্তি ছিল না। ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্যই এক অর্থে এই লাঞ্ছনার অভিঘাত পাঠকের বিবেক ও বোধের কাছে তীব্রতর হল। এদিক থেকে ধর্মরাজের অপরাধ গুরুতর। আবার পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা যুধিষ্ঠির কীভাবে পণ রাখে? যে পাশা খেলায় নিজেকেই হারিয়েছে, নিঃস্ব হয়েছ, সে কীভাবে নিজের স্ত্রীকে পণ রাখতে পারে? ফলে তার পূর্ণ শরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ মহাভারত যুধিষ্ঠিরকে ‘ধর্মান্বিতা’ হিসাবেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এরপর খুবই যত্নসহকারে আমাদের দেখাতে পেরেছেন যে, নানাবিধ দোষ ও পাপ কর্ম সচেতনভাবে করা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরই কেন ‘ধর্মান্বিতা’। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেবলমাত্র এই স্থানটিতেই প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসু’র সঙ্গে সহমত হতে পেরেছেন। এর পরে আমরা দেখবো অমলেশ ভট্টাচার্য ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী’র মতো প্রাবন্ধিকও যুধিষ্ঠির সম্পর্কে সুকুমারী ভট্টাচার্যের পরের মতামতগুলির সঙ্গে সহমত হয়েছেন। যেখানে বেশ কিছু গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও কেন যুধিষ্ঠির বস্তুতই ধর্মরাজ তা সকলেই মেনে নেন। যার ফলে ধর্মরাজের পক্ষে জীবিত অবস্থায় স্বর্গবাস যথার্থই হয়ে ওঠে।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে একাধিক বিচ্যুতি ছিল, এ কথা সত্য। মহাভারতে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখতে চাইলে যুধিষ্ঠিরের অপরাধগুলি একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য। মূলত যুধিষ্ঠিরের মাত্রাতিরিক্ত লোভের কারণেই পাণ্ডবদের পাশা খেলায় হার এবং পরবর্তীতে যেটির শেষ পরিণতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। কিন্তু মহাভারতের এই সমস্ত ঘটনাগুলি পাঠকের মনে সংকট ও চিন্তার উদ্বেক করলেও শেষ পর্যন্ত আমরা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এমন কিছু বিষয় দেখতে পাই, যার কারণে শেষ পর্যন্ত যা যুধিষ্ঠিরকে

‘ধর্মান্না/ধর্মপুত্র’ নামে অভিহিত করতে একপ্রকার বাধ্য থাকে মহাভারতকার। এখানে অবশ্যই বলতে হয় যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের মনের মধ্যে হওয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব, আচার্যদের পায়ে ধরে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি কামনা করা যুধিষ্ঠিরের কথা এবং সামান্য পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে সিংহাসনের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের দাবিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ধর্মপুত্রের কথা। এই যে সামগ্রিকভাবে পুরো যুদ্ধ বিষয়টাতাই তার অসম্মতি, এখানেই যুধিষ্ঠির মহাভারতের অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা আলাদা হয়ে যায়। আপাতত লাভ, যশ, খ্যাতি ও সাম্রাজ্য পরিচালনার লোভকে ছাপিয়ে সে দেখতে পেয়েছে নরহত্যা পাপ। মূলত এই কারণেই শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির পূর্ণ শরীরে স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী। মহাভারত জীবনের চূড়ান্ত শিখরে এইভাবে মানবতার জয়গান করেছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এইভাবে মহাভারতের বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার দিকটি দেখতে চেয়েছেন। ফলে কোনওভাবেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া সহজ হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে রামায়ণে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি নিয়ে দুরূহ জটিল বোধ নেই। সেখানে কর্তব্য এবং অকর্তব্য অধিকাংশ স্থানেই সরলরৈখিক। রামায়ণে বালীকে হত্যা, শম্বুক বধ এবং সীতাকে পরিত্যাগ-মূলত এই তিনটি ঘটনা ছাড়া কোনও গভীর নৈতিক সংকট দেখা যায় না। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য এই বিষয়গুলি যত্নসহকারে উত্থাপন করতে পেরেছেন।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার পাশাপাশি প্রাবন্ধিকের নজর এড়িয়ে যায়নি মহাভারতের একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির উপর। সুকুমারী ভট্টাচার্যের নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সংকলনটির মধ্যেই উঠে এসেছে জতুগৃহের প্রসঙ্গ, একলব্যের প্রতি হওয়া অবিচার, পিতামহ ভীষ্মের নিজ কৌমার্য রক্ষার প্রতিজ্ঞা ও তার ফলে সৃষ্ট সংকট, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধের প্রতি আপাত অনীহা এবং সেই কারণে সৃষ্ট সংকট, প্রতিনায়ক কর্ণের মৃত্যুতে পাঠক বা শ্রোতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া, শল্যের ও দুর্যোধনের হত্যাকে নিয়ে একাধিক বিতর্ক, মহাভারতে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মহাভারতে নৈতিক অভিঘাত, সংশয়ের উজ্জ্বলতা এবং এইরকম আরও একাধিক প্রসঙ্গ যেগুলি পাঠকের ভাবনাতে বহু প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটায়।

‘মহাভারতের দ্বন্দ্ব’ নামের প্রবন্ধে সুকুমারী ভট্টাচার্য পাণ্ডবদের দ্বারা নিম্নবর্গের ছয়টি নিষাদ হত্যার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। *মহাভারতের মহারণে* প্রতিভা বসু এবং *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* বইতে প্রাবন্ধিক দেবীদাস আচার্যও এই নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। দেবীদাস আচার্য ঘটনাটি নিয়ে বলেছেন যে:

জতুগৃহে তার মানে ছক ছিল নিখুঁত। ভাবতে অবাক লাগে, মহাভারতের আদ্যোপান্ত যাঁর ধর্মনিষ্ঠার জয়গান, যাঁকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে বারবার-সেই যুধিষ্ঠির এমন কাণ্ড ঘটালেন, অথবা ঘটতে দিলেন! যুধিষ্ঠির, না দুর্যোধন -কে রাজা হবেন, তাই নিয়ে রাজনীতি। আর প্রাণ

দিতে হল এমন লোকেদের, যাদের সঙ্গে দূর দূর পর্যন্ত ওই সম্পত্তির বা কৌরব-পাণ্ডবদের কোনও লেনাদেনা নেই। ধরাধামে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ওই নিরপরাধদের হত্যা করা কি জরুরি ছিল? না কি, তাঁরা নিম্নবর্ণের বলে এই হত্যায় অধর্ম নেই? ৬০

জতুগৃহের ঘটনাটি মহাভারতের মধ্যে অন্যতম একটি গর্হিত কাজ। সুকুমারী ভট্টাচার্য ও এই বিষয়ে স্পষ্টতই দেখাতে পেরেছেন যে নিম্নবর্ণ নিষাদ হওয়ার কারণেই খুব সহজে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এর আগে ব্রাহ্মণ ভোজন কুস্তী করিয়েছে, কিন্তু তাদেরকে হত্যার কথা ভাবনাতেও আনা হয়নি। একদিকে মহাভারতে পাণ্ডবদের বেঁচে থাকা দরকার, কারণ তারাই দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ কৌরবদের ধ্বংস করবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ময়দানে। পাঠকের মাথায় এই বিষয়টি থাকলেও তারা নিচুস্তরের নিষাদ মানুষগুলোর মৃত্যু যথাযথ বলে মনে করতে পারে না। ফলে সাধারণ পাঠকের মনে এই বিষয়ে সরলরৈখিক প্রতিক্রিয়া হয় না, সংকট ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পাঠক অবধারিতভাবেই পড়ে যায়।

আমরা জতুগৃহের এই ঘটনাটির সঙ্গে বর্তমান ভারতের ঘটে চলা অনেকগুলি বিষয়কেই পাশাপাশি রেখে ভাবতে পারি। তবেই মহাভারত পাঠ আমাদের পূর্ণতা পায়। সমাজের উচ্চবর্ণ দ্বারা নিম্নবর্ণের প্রতি এই বিভেদীকরণ সামাজিক জীবনেও সমানভাবে লক্ষণীয়। আজও ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা প্রান্তিক মানুষজন নানাভাবে শোষিত হয়, শিশুশ্রমে আজও সমাজের প্রান্তিক শিশুদের বেশি কাজে লাগানো হয়, উত্তর ভারতীয় গো-বলয়ের রাজ্যগুলিতে প্রান্তিক নারীরা প্রতিনিয়তই লাঞ্ছনার শিকার ও ধর্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রথম সারির শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিয়ত ভেদভাবের শিকার হতে হয় সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-গবেষকদের। আমাদের রাষ্ট্রীয় সরকারি পরিসংখ্যানগুলিতে নজর দিলেই এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা জন্মায়। এই সময়ের রোহিত ভেমুলা'র আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটার পর, বিষয়টি জোরালোভাবে সবার সামনে এসেছে। ৬১ যদিও এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে, উদাহরণও অনেক আছে। আর্য শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার 'বাধ্যবাধকতার' জন্যই নিষাদী সমেত পঞ্চ পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে মারাটা একপ্রকার 'আবশ্যকই' ছিলো।

জতুগৃহের এই পরিকল্পিত হত্যার পরে সুকুমারী ভট্টাচার্য একলব্যের বিষয়েও অনুরূপ একটি টানাপোড়েন দেখাতে চেয়েছেন। এখানেও পাঠক হৃদয় সচেতনভাবে সাড়া দিয়ে থাকতে পারে না। আমরা জানি যে অর্জুনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্রোণাচার্য। অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত আচার্য দ্রোণ চেষ্টা করে গেছে। ফলে সেদিক থেকে বিষয়টিকে কিছুটা মানা গেলেও শুধুমাত্র নিম্নবর্ণ চণ্ডাল হওয়ার কারণে একলব্যের এমন পরিণতি একেবারেই মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা মানতে পারে না। চণ্ডাল নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার কারণে জীবনের

আপেক্ষিক মূল্য কম। মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা একলব্যের গুরুদক্ষিণা প্রদান এবং দ্রোণাচার্যের দক্ষিণা গ্রহণ- এই বিষয়টিকে সহজ স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতে একেবারেই অক্ষম। কারণ নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার জন্য একলব্য শিষ্য হতে পারল না, কিন্তু গুরুদক্ষিণা নেওয়ার সময় তাকে আবার তো প্রকারান্তরে শিষ্য হিসেবে মেনে নেওয়া হল। এর ফলে পাঠকের ভাবনার মধ্যে বহুমুখী এক প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। আবার এটাও আমরা দেখি বাস্তবে দ্রোণাচার্য একদিনের জন্যও একলব্যের শিক্ষার বিষয়ে ভেবে থাকে নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দক্ষিণা তার পাওয়ার কথাই নয়।

আবার গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতেও মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়া সহজ হয় না। দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটছে একটি মিথ্যা উজ্জির কারণে, এই ক্ষেত্রে পাঠকের সহানুভূতি সহজেই দ্রোণের অভিমুখে যায়। কিন্তু সেও তো জীবনে একাধিকবার অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে, কাজেই মিথ্যার দ্বারা দ্রোণের মৃত্যু যেন কোনও এক নৈতিক সুবিচারের ক্ষেত্রে পাঠক বা শ্রোতা মেনেও নেয়। যুদ্ধের শুরুতে যে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের আবেদনে সাড়া দেয়নি, সে সমস্ত দায়বদ্ধতা অস্বীকার করলো কেবলমাত্র পুত্র-স্নেহের বশে। অশ্বখামার মৃত্যু সংবাদে সে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে গেল। সমস্ত বিষয়টির মধ্যে একটা করুণ দিক থাকা সত্ত্বেও একজন ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে একটি অনৌচিত্যও আছে। তাই দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে পাঠকের প্রতিক্রিয়া বহুমাত্রিক। নৈতিকতা ও আবেগের দিক থেকে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া পাঠক বা শ্রোতার কাছে ভিন্ন। রামায়ণে কোনও মৃত্যুতেই এত বহুমুখী দ্যোতনা নেই।

প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এরকম আরও বেশ কিছু সংকট ও দ্বন্দ্ব আমাদের দেখাতে পেরেছেন। যেগুলির মধ্যে অন্যতম পিতামহ ভীষ্মের আজীবন অবিবাহিত কুমার থাকতে চাওয়ার ইচ্ছে। প্রাবন্ধিক যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, মহাভারতের এইরকম চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের কারণেই মহাভারতের মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। ভীষ্ম শান্তনুর সুখের জন্য নিজে আজীবন কুমার থাকার বচনে আবদ্ধ হল, বাবার প্রেমকে সার্থক করার জন্য ভাবী বিমাতার কাছে চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এটি এতটাই অমানবিক যে পাঠক ও শ্রোতার কাছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

ভীষ্ম চরিত্রের এই দ্বিধা ও সংকট একান্তই মৌলিক এবং নিরতিশয় জটিল। এই টানাপোড়েন তাকে রামায়ণের বিভীষণের থেকে আলাদা করেছে। বিভীষণের কাছে রাবণ ছিল অন্যায়কারী ও পরজ্ঞী অপহরণকারী। তাই ধর্মের প্রতিভূ রামের নিকটে থেকেই ধর্মযুদ্ধে বিজয় কামনা করেছিল

বিভীষণ। এখানে বিভীষণের বিবেকের দ্বন্দ্ব খুবই সরলরৈখিক। অন্যদিকে ভীষ্ম এই তীব্র মানব সংহারক যুদ্ধ না চাইলেও নিজ কর্তব্য মনে করে করতে বাধ্য হয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন:

যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির ছুটে এসে ভীষ্মের পায়ে পড়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে মিনতি করলেন। ভীষ্ম উত্তর দিলেন: ‘মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কখনও মানুষের দাস নয়। এ কথা সত্য, মহারাজ, অর্থের জন্যেই আমি কৌরবপক্ষে আবদ্ধ। তাই এখন ক্লীবের মতো বলছি যুধিষ্ঠির, এ ছাড়া অন্য কিছু চাও।’ ৬২

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, ভীষ্ম একেবারেই যুদ্ধ চায় না। দ্বিতীয়ত, হস্তিনাপুরের কাছে রাজার সিংহাসন রক্ষার জন্য পূর্বপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভীষ্ম আবার জানিয়েছে যুদ্ধের দিনগুলিতে অসংখ্য পাণ্ডব সৈন্য নিধন করলেও পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ কৌরবের আশ্রয়ে থেকে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছে করে পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতিসাধন না করা সেনাপতির কর্তব্যে প্রধান একটি ত্রুটি, কৌরবদের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। এদিক থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য রামায়ণের বিভীষণের সঙ্গে ভীষ্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে চরিত্রটির দ্বন্দ্বিক ও জটিল দিকটি উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রের এই সংকটময় পরিস্থিতি শুধুমাত্র মহাভারতেই মেলে, তাই মহাভারতে পাঠক বা শ্রোতা জীবনদর্শনের একটি পাঠ পেয়ে থাকে।

এরপর আমরা দেখেছি মহাভারতকার ব্যাসদেবের আচরণ। ব্যাস নিজে একজন তপস্বী। ঋষি মানুষদের দৃষ্টি সদাই নির্মোহ থাকা উচিত এবং সংসারের কোনও মানুষের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকা অনুচিত। কিন্তু রাজপ্রাসাদের অন্যান্য পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির একের পর এক যা যা বাজি রেখে হেরেছে সেগুলির অনেকটাই যে যুধিষ্ঠিরের অনধিকারের সীমাতে তা ব্যাসদেব বলল না। ব্যাস কৌরবদের নিন্দা করেছে। কিন্তু ব্যাসের আনুগত্য ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, পক্ষপাতশূন্য আচরণ চেষ্টা করলেও পারেনি। মহাভারত-প্রণেতা ঋষির প্রতি এখানে পাঠকের প্রতিক্রিয়া সহজ হয় না। ব্যাস যদি বাণ্মীকির মতো সহজ চরিত্র হতো, তাহলে বাণ্মীকির মতো সেও অপমান ও প্রত্যাখ্যান পেত। তখন পাঠকের প্রতিক্রিয়ায় যন্ত্রণা, কষ্ট, বেদনা ও জটিলতা মিশে থাকত না। তবে আমাদের এটিও মনে রাখতে হবে যে ব্যাসদেব নিজে ঋষি হওয়ার পাশাপাশি সমানভাবে ঘরমুখীও বটে। তাই এখানে তিনি অন্যান্য ঋষিদের থেকে আলাদা। সংসারে থেকেই ঈশ্বরে সাধনা ব্যাস করেছে। তাই মহাভারতকার সন্তানদের জন্ম দিয়েও সংসারের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি, বারবার ফিরে এসেছে ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর হস্তিনাপুরে। মহাভারতে ব্যাস যে সাধনার কথা বলতে চেয়েছে তা আমাদের অত্যন্ত সহজ ভাষায় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন। তাই ঋষির

পাশাপাশি সাধারণ মানুষের গুণাবলী ব্যাসদেবের মধ্যে থাকার জন্যই মহাভারতকার সর্বদা নির্মোহ থাকতে পারেনি, অনেক সময়ই কোনও এক পক্ষ নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য ব্যাসকে নিয়ে আলোচনায় শুধুমাত্র মহাভারতকারের মধ্যে সংকটকেই তুলে ধরেছেন, কিন্তু আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব ব্যাসদেবের মধ্যে এইরূপ প্রতিক্রিয়ার যথার্থ কারণ। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী *মহাভারতের ছয় প্রবীণ* নামের বইতে ব্যাস নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। ব্যাসদেব ও ভীষ্মকে পাশাপাশি রেখে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে একজন ঋষি হয়েও আগাগোড়া সংসারের সমস্ত খোঁজ রেখে গেল এবং নিজ কর্তব্য মনে করে সন্তানের জন্ম দিল, অন্যদিকে অপরজন সংসারে থেকে সংসারের প্রতিটি কাজ মনোযোগ সহকারে করে যাওয়া সত্ত্বেও রয়ে গেল সন্ন্যাসীর মতোই। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র ব্যাসকে দেখবার এই দৃষ্টিটি আমাদের মুগ্ধ করেছে।

মহাভারতে কর্ণ এবং দুর্যোধনের মৃত্যুতেও পাঠক বা শ্রোতার মনের মধ্যে এক টানাপোড়েন কাজ করে। প্রাবন্ধিকের সঙ্গে আমরা সহমত যে কর্ণের জীবনের উপাখ্যানটি অত্যন্ত মর্মবিদারক, কারণ ক্ষত্রিয় হিসাবে জন্মালেও সারা জীবন সে সমাজের থেকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অস্ত্রশিক্ষা সে সহজে পায়নি। পরশুরামের কাছে অসত্য পরিচয়ে বিদ্যাশিক্ষা ও ব্রাহ্মণের কাছে না জেনে গোহত্যার জন্য মর্মান্তিক অভিশাপ পাওয়ার কারণে পাঠকের কাছে কর্ণের প্রতি অবশ্যই সহানুভূতি জন্মায়। কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার প্রতিশোধ নিতে যখন কর্ণ দ্যুতসভায় দ্রৌপদীকে ‘দাসী ও বহুভোগ্যা’ বলে অভিহিত করল, তখনই কর্ণ বীরের মর্যাদা থেকে আপনিই বিচ্যুত হয়ে নেমে এল অমার্জিত কামুকের পর্যায়ে। অভিমন্যু বধের সময় কর্ণ সক্রিয় ছিল, তাই কর্ণপুত্র বৃষসেনকে যখন অর্জুন হত্যা করে তখন পাঠক বা শ্রোতার সহানুভূতি প্রতিহত হয়। পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত প্রলোভন থাকলেও কর্ণ যখন দুর্যোধনের পক্ষেই থাকতে চাইল, সেই সময়ে মহাভারতের পাঠকের হৃদয়ে দ্বিধাহীনভাবে কর্ণের স্থান হয়। জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে একগুচ্ছ অভিশাপের হঠাৎ নেমে আসা এবং অন্যায় যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়ের কারণে পাঠকের সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই তার দিকে যায়। কিন্তু কৌরবদের সঙ্গে মিলিতভাবে কর্ণ পাণ্ডবদের প্রতি একগুচ্ছ অত্যাচার ও অবিচার করেছে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম- জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও শকুনির সঙ্গে মিলিতভাবে নানা কুপরিকল্পনা প্রভৃতি। আবার কর্ণ প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি না হওয়া সত্ত্বেও আজীবন সূতপুত্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে, যা একেবারেই কাম্য নয়। তাই সুকুমারী ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন যে কর্ণের মৃত্যু আমাদের মানবিক সংবেদনে একটি জটিলতার সৃষ্টি করে।

মহাভারতকে নিয়ে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্যের এই সকল বৌদ্ধিক অন্বেষণগুলি আমাদের মহাভারত চর্চায় নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিভিন্ন অভিমুখ থেকে বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই মহাকাব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংকট ও জটিলতা প্রতিটি স্তরে স্তরে জড়িয়ে থাকার কারণেই জীবনের মহত্তম সত্যে পৌঁছাতে তা পথ দেখায়।

৪.৮।।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল (১৯৩৫-১৯৯১)

প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল গত শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় অন্যতম এক সমালোচক। প্রাবন্ধিকের মহাভারত সম্পর্কিত অধিকাংশ বইগুলিই ইংরেজিতে, বাংলা ভাষায় *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ* তাঁর মহাভারত সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার প্রবন্ধ সংকলন। কর্মসূত্রে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ন্যায় শাস্ত্রে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এককথায় ছিল অসাধারণ। বিমলকৃষ্ণের অন্যতম দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল- *লজিক ল্যাপ্সয়েজ এন্ড রিয়ালিটি* এবং অন্যটি হল *লজিক্যাল এন্ড ইথিক্যাল ইস্যুজ অফ রিলিজাস বিলিফ*। মহাভারত বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় বাঙালি গবেষক ও অধ্যাপকেরা বিমলকৃষ্ণ মতিলালের ন্যায় ও নীতিতত্ত্বের উপরে অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচিত প্রবন্ধের বইটিও ন্যায় ও নীতির তাত্ত্বিক কাটাছেড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আলোচনায় প্রায়ই রামায়ণের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধ সংকলনতে কৃষ্ণ ও রামকে দেবতা হিসাবে চিত্রিত না করে চরিত্র দু’টির নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারতের সাহিত্য বিচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন প্রাবন্ধিক বিমলকৃষ্ণ। *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ* বইটির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের বাইরেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূচিপত্রের বিষয়গুলি একটু উল্লেখ করা যাক- ধর্মযুদ্ধ, নরচন্দ্রমার কলঙ্ক, ধর্মস্য তত্ত্বম্, ন্যায় অন্যান্যের নানা দিক, সত্য মিথ্যা ও সত্য, সন্তান ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার, প্রতিমা-ভরত ও কৈকেয়ী, জুয়া ভাগ্য ও দৈব, প্রিয়েরে দেবতা, মুঘল-মুদগর, ইতিহাসের রামায়ণ, শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, দর্শনচর্চা ও ভারতীয় মহিলা, হিন্দুধর্ম: ঔদার্য নিষ্ঠা ও উন্মাদনা।

বইটির মুখবন্ধে প্রাথমিকভাবে স্বল্প কিছু আভাস প্রাবন্ধিক দিয়ে রেখেছেন, যেটা পড়ে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠক ধারণা করতে পারে। পেশায় দর্শনের অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ রামায়ণ ও

মহাভারতের কাহিনিকে যথাযথভাবে মন্তনের মাধ্যমে ভারতীয় নৈতিকতার একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্রই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক মুখবন্ধতেই বলেছেন:

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা যাঁরা করেন তাঁরা জানেন যে আমাদের দেশে দু'হাজার বছর ধরে প্রমাণশাস্ত্র প্রমেয়শাস্ত্র এবং ন্যায়শাস্ত্র-প্রভৃতি বিভাগের যতটা প্রবাহমান আলোচনার ধারা চলেছে নীতিধর্মশাস্ত্র বা নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা ততটা হয়নি। অর্থাৎ আমাদের এপিষ্টেমোলজি, মেটাফিজিক্স ও লজিক নিয়ে যে আলোচনা তার কাছে এথিক্স-এর আলোচনা প্রায় নিষ্প্রভ। বিশেষ করে 'রিলিজেন'-বহির্ভূত নৈতিকতার আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত। এ ধরনের আলোচনার সূত্র কিছুটা পাওয়া যায় 'ধর্মশাস্ত্রে'- অর্থাৎ মনু যাজ্ঞবল্ক্যের লেখায় এবং তাঁদের ভাষ্য ও টীকাকারদের আলোচনায়। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা কিছুটা নীরস এবং নৈর্ব্যক্তিক। নৈতিকতার আলোচনায় প্রায়-শূন্যস্থানের পরিপূরক হিসাবে পাওয়া যায় আমাদের অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী কাহিনী-সাহিত্যকে—রামায়ণ মহাভারত পুরাণের গল্প এবং বহু বৎসর ধরে এই গল্পসামগ্রীর উপর লেখা টীকা-টিপ্পনী। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে এই গল্পগুলি নানাভাবে পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত হয়েছে— আর সেই পরিবর্তনের মধ্যে আমরা বিবর্তনশীল নীতিধর্মবোধের ভারতীয় মানসিকতাকে পাই— অন্তত দেখতে যে পাই এটা আমার নিজস্ব অভিমত। কাজেই আমার বিশ্বাস এই কাহিনী- সমুদ্রকে যথাযথভাবে মন্তন করলে এদেশীয় নৈতিকতার রেখাচিত্র স্পষ্ট ধরা পড়বে। এই গ্রন্থ তারই সামান্যতম দিগদর্শনের চেষ্টা মাত্র। ৬৩

বইটির প্রথম অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক বিমলকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতে ধর্মের বহুমাত্রিক অর্থটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনের দ্বারা রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণের কাজগুলিকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বুঝতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক মতিলাল তাঁর আলোচনার পরিসরে কখনও এনেছেন রবীন্দ্রনাথকে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্য উনিশ শতকের বঙ্কিমের তুলে ধরা কৃষ্ণের প্রসঙ্গও এসেছে, বুদ্ধদেব বসু'র *মহাভারতের কথা* এবং অধ্যাপক অশোক রুদ্রে'র *ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন* গ্রন্থের কথাও বিভিন্ন সূত্রে তিনি এনেছেন। এছাড়াও ন্যায় ও নীতির একাধিক বিষয় বোঝাতে গিয়ে দেশি ও বিদেশি দার্শনিকদেরও বিভিন্ন লেখালেখির প্রসঙ্গ এনেছেন।

বইটির প্রথম প্রবন্ধের নাম 'ধর্মযুদ্ধ'। এখানে রাম ও কৃষ্ণকে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করার পরিবর্তে মানুষ হিসাবেই প্রাবন্ধিক দেখতে চেয়েছেন। কারণ নৈতিকতা মানবতাকেন্দ্রিক, চরিত্রের ভুলত্রুটিগুলি মানুষের চরিত্রতেই দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে রাম ও কৃষ্ণকে তাই দেবতা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। প্রাবন্ধিকের মতো আমরাও এদের মানুষ হিসাবেই দেখতে চাই। এইদিক থেকে বাঙালির মহাভারত চর্চা কটর হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনের থেকে একেবারেই আলাদা। রাম ও কৃষ্ণকে মানুষ হিসাবে দেখার মধ্যে একপ্রকার মুক্তচিন্তার অন্বেষণের

বিষয় লুকিয়ে আছে। রাম ও কৃষ্ণকে উভয় মহাকাব্যেই আতর্নাদ এবং ক্রন্দনে দেখা গেছে, ঘটোৎকচের মৃত্যুতে আনন্দের আতিশয্যে রথের উপর নাচতে দেখেছি আমরা, দৈত্য প্রভৃতির মতো কাজে বিফলতা, যদুবংশ ধ্বংস রোধ করতে অসফল, জরাসন্ধের মতো পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে হারাতে ব্যর্থ হওয়া অথবা স্ত্রীর কথাতে স্বর্ণ মায়ামৃগের পেছনে দৌড়ানো—এই সমস্ত বিষয়গুলিতে তাদের মানবিক চরিত্রেরই মহাকাব্যে উপস্থাপনা ঘটেছে।

প্রাবন্ধিক মতিলাল রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রের দিকটি ন্যায় ও নীতির আতসকাঁচের তলায় রেখে বুঝতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিশ শতকের মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচকদের মতো একতরফাভাবে শম্বুক নিধন, লক্ষ্মণকে বর্জন, সীতাকে পরিত্যাগ এবং বালিকে হত্যা করা—বিষয়গুলিতে রামের জোরালোভাবে সমালোচনা করেননি। কিন্তু বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই বিষয়ে রামচন্দ্রের উপরের কাজগুলিকে নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মবিরুদ্ধ বলেছেন। রামের এই কাজগুলিতে নৈতিকতার সংকট হাজির হলেও, রাম ‘লোকমর্যাদা’ অথবা লোকব্যবহারকে কখনও অতিক্রম করেনি। তার ফলে রাম চরিত্রের দোষগুলি এই মর্যাদা অতিক্রম না করার ফলেই হয়েছে। নিজের সুখ ও আনন্দের জন্য তৎকালীন সমাজের বক্তব্য এবং প্রজার সুখকে এড়িয়ে যাওয়া যায়নি। কারণ সমাজে ধারণা ছিল যে আদর্শ রাজা কখনও প্রজার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করে না, তাই রামের নীতিধর্মবিরুদ্ধ কাজগুলি যথার্থভাবেই প্রজার মঙ্গলার্থে করা। এই সময়ের বিখ্যাত পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও তাঁর বিভিন্ন লেখালেখির মধ্যে এই মতামতকেই প্রাধান্য দেন। অপরপক্ষে মহাভারতের কৃষ্ণের নীতি ও ধর্ম আলাদা। কৃষ্ণ নিজে লোকমর্যাদা মাঝে মাঝে অতিক্রম করেছে এবং লজ্জনের পরামর্শও দিয়েছে। মহৎ কোনও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কৃষ্ণ লোকমর্যাদা ভাঙতে বলে। এক্ষেত্রে নীতির নিয়মের নিগড় মাঝে মাঝে ভাঙলেই তবে মানুষ উন্মুক্ত আকাশের স্বাধীনতা পায় এবং বৃহত্তর নীতির সংবাদ পায়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে দুইটি চমৎকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাবন্ধিক বলেছেন। যেখানে প্রথমটিতে দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির অর্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করার কারণে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কারণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল তার দেবদত্ত গাণ্ডীবকে যে গালাগালি করবে তাকে সে হত্যা করবে।^{৬৪} কৃষ্ণ এই ক্ষেত্রে অর্জুনকে বোঝায় বড়ো ভাইকে হত্যা করা মহাপাপ ও একান্ত অনুচিত। আবার আমাদের মনে হয় কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ যেহেতু ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও পাণ্ডবদের যথাযথ ভূমির অধিকার পাওয়া, তাই এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের হত্যা তাদের যুদ্ধভূমির বাইরেই পরাজিত করবে। কৃষ্ণ তাই অভিমত দেয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গের। এক্ষেত্রে ন্যায়নীতির সূচকগুলি কৃষ্ণের মতে চিরন্তন সত্য এবং অপরিবর্তনশীল নয়, বরং সমাজের চাহিদা অনুসারে ও বৃহত্তর মঙ্গলকামনায় পূর্বের করা প্রতিজ্ঞাকে বিবেচনা করা উচিত। আমরাও তাই দেখেছি পুরো

মহাভারত জুড়ে ধর্মের নীতিগুলি অনেক সময়েই পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনিতে প্রাবন্ধিক বলেছেন কৌশিক মুনির আজীবন সত্য রক্ষার ব্রতের বিষয়ে।^{৬৫} সর্বদা যেকোনও পরিস্থিতিতে সত্য কথার প্রতিজ্ঞা কৌশিক মুনির ছিল, একদিন দস্যুরা লুটপাট ও হত্যার জন্য কিছু পথিকের পথ অনুসরণ করে। পথিকেরা যাওয়ার পথে মুনিকে বলে যায় — প্রাণভয়ে পালাচ্ছি মুনিবর, দস্যুদের আপনি অন্য পথ দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মুনি দস্যুদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেয় এবং দস্যুরা নিরপরাধ পথিকদের হত্যা করে। এই ক্ষেত্রে যথার্থ ধর্ম হওয়া উচিত ছিল কৌশিক মুনির মিথ্যা বলা, তাহলে প্রাণ বেঁচে যেত পথিকদের। সত্য রক্ষার বচনের থেকে আরও বড়ো কর্তব্য মানুষের প্রাণ বাঁচানো। এভাবেই নীতি ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করা যায় আরও বড়ো ধর্ম রক্ষার খাতিরে। কৃষ্ণ এভাবেই নীতি ধর্মের প্রচলিত সীমারেখা অতিক্রম করতে বলেছে।

অনুরূপ একটি সংকট দ্রোণাচার্যের নিধনকে কেন্দ্র করেও আমরা দেখতে পাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত পরাক্রমী দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ কৌশলে পাণ্ডবরা যখন একেবারে ছন্নছাড়া, সে সময় কূটকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে আচার্যকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাণ্ডব শিবির যখন এই হত্যার বিষয়ে গভীর সংকটে, এক প্রকার দ্বিধা এবং ঔচিত্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, তখন কৃষ্ণের অভিমত ছিল যে দ্রোণাচার্য আচার্যোচিত ব্যবহার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথীর আক্রমণে নিধন করার বিষয়টি দ্রোণাচার্যের মস্তিষ্কপ্রসূত। ফলে অন্যায় যুদ্ধে আচার্যকে হত্যার বিষয়টি চরম নিন্দাসূচক হলেও বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য এরূপ নিধন কার্য কোথাও যুক্তিযুক্ত মনে হতেও পারে। ধর্মনীতির নিগড় ভাঙার যুক্তি— নৈতিকতার মূল উচ্ছেদের সম্ভাবনা থেকে নৈতিকতাকে রক্ষা করা। নৈতিকতা ও ঔচিত্যের এই সংকটের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কারণ দুই পক্ষেরই অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও ন্যায়ত পাণ্ডবদের রাজ্যটা পাওয়া উচিত ছিল এবং প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর অপমান অত্যন্ত ধর্মবিরুদ্ধ ও গর্হিত কাজ। এইদিক থেকে প্রাবন্ধিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল যথাযথ যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছেন বলে আমাদের মনে হয়।

‘ন্যায়-অন্যায়ের নানা দিক’ প্রবন্ধে হিতবাদ এবং ইথিকস নিয়ে প্রাবন্ধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক অশোক রুদ্রে’র বইতে নীতি ধর্মের সূত্রগুলির সর্বজনীনতার বিষয়ে বলা হয়েছে, অধ্যাপক রুদ্র এই বিষয়ে মনে করেছেন নীতিধর্মের নিয়মগুলি সবার ক্ষেত্রেই সমান হওয়া উচিত। না হলে সেটি বেনিয়মের পর্যায়ভুক্ত হয়। মার্ক্সবাদী সমালোচকদের এই ধরনের যুক্তির বিপরীতে প্রাবন্ধিক মতিলাল খুবই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, যুগের ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক চেতনার পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে। রামায়ণ ও মহাভারতের

সময়কালের মধ্যে নীতিধর্মের পার্থক্য এখানেই। তাত্ত্বিক পরিভাষায় তাই প্রাবন্ধিক মতিলাল রামায়ণের নীতি ধর্মের যুক্তিতর্কের ধারাকে ‘প্রাথমিক স্তরের যুক্তিতর্ক’/ ‘প্রাইমাফিসি ইনটুইটিভ রিজনিং’ এবং মহাভারতের অবধারিত যুক্তিতর্ককে ‘ক্রিটিক্যাল লেভেল থিঙ্কিং’ নামে অভিহিত করেছেন। নীতিধর্ম বিচারে রামকথার সঙ্গে কৃষ্ণকথার এখানেই পার্থক্য। এই বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধটিতে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলেছেন:

কর্ণপর্বে গৃহবিবাদের ফলে অর্জুনের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদন হলে জগতের কি উপকার সাধিত হত তা বোঝা দুর্গম। তবে হয়ত একটা ‘ধর্ম’ রক্ষা পেত যে ‘ধর্ম’টি তার ‘ভালত্ব’ গুণটিকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে হারিয়েছে। কিন্তু বলার কথা তা নয়, অধ্যাপক রুদ্রও তা বলতে চাইছেন না। তাঁর বক্তব্য এই নীতিধর্মের সূত্রগুলির যে সর্বজনীনতা রূপ গুণ—তা এতে কিভাবে রক্ষা পাবে। নিয়ম ব্যক্তিবিশেষে বা ক্ষেত্রবিশেষে পৃথক পৃথক হতে পারে না। তাহলে তো তাকে নিয়মই বলা যাবে না। প্রতিজ্ঞা রক্ষণ করা যদি ‘ভাল’ হয় এবং সেজন্য এটা নিয়ম হয় তবে একে ক্ষেত্রবিশেষে আমরা কি করে লঙ্ঘন করব? এটিই মূল প্রশ্ন। এর উত্তরে বলা যায় যে, সর্বজনীনতা-রূপ গুণটি ‘ভালত্ব’-রূপ গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় ওতপ্রোতভাবে। কাজেই কোন বিশেষ কর্ম যদি তার ‘ভালত্ব’ রূপ গুণটি হারায় তবে তার সর্বজনীনতাও লোপ পাবে। অথবা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা রূপ গুণের आधार যে কোন বিশেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা রূপ ক্রিয়া বা কর্ম তাতে সর্বজনীনতা রূপ গুণ ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তাতে ‘ভালত্ব’ রূপ গুণ থাকবে। ‘ভালত্ব’ লোপ পেলে তা সর্বজনীনতাভূষিত নীতিধর্মসূত্রের বিশেষ একটি উদাহরণ রূপে গৃহীত হবে না।^{৬৬}

‘জুয়া ভাগ্য ও দৈব’-নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মতিলাল মহাভারতের নল দময়ন্তী কাহিনির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় পরাজয় এবং ভাগ্য বিপর্যয় ও পরিবর্তনের বিষয়টিকে সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, নলের উপাখ্যানটি মহাভারতের অন্তর্গত আরেকটি ছোট কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাভারত। নল দময়ন্তী বিবাহসভায় দেবতারাও পাত্র হিসেবে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু দেবতাদের সন্তুষ্ট করে এবং আশীর্বাদ সহযোগে নলকেই পতি হিসাবে দময়ন্তী পায়। বিয়েতে চারজন দেবতাই সন্তুষ্ট হয়ে নলকে বর দেয়, এখানে মনে হতেই পারে যে নল একাধারে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্তি। পাণ্ডবরা দেবতাদের ঔরসে জন্মায়, এখানেও ইন্দ্র এবং ধর্মরাজ উপস্থিত আছে। নলকে যম রক্ষন শিল্পে নৈপুণ্যের বর দেয়, পরে বাহুক হিসাবে অজ্ঞাতবাসের সময় নল অশ্বাধ্যক্ষ এবং পাকশালার দায়িত্ব পায়। আমার আমরা জানি বিরাট রাজার আশ্রয়ে ভীম রক্ষনশালার এবং নকুল অশ্ব রক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছিল। পাণ্ডবদের মতো নলকেও ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস করতে হয়েছিল এবং দময়ন্তীও চেদিরাজ সুবাহুর রাজপ্রাসাদে রাজমাতার সৈরিন্দ্রী হিসাবে দায়িত্ব পায়। দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী চারজন দেবতা এবং নল—এদের মধ্যে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের

ছদ্মবেশে যেখানে উপস্থিত ছিল, সেখানে দময়ন্তীকেও বিভ্রান্ত করার জন্য দেবতারা নলের প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থিত ছিল। এইরকম একাধিক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নল দময়ন্তীর কাহিনিকে প্রাবন্ধিক মহাভারতের মধ্যে আর একটি ছোট মহাভারত হিসাবে পড়েছেন।

কৃষ্ণকে আমরা কীভাবে দেখতে পারি? কৃষ্ণকে আমরা একজন আদর্শ মানুষ হিসাবেই দেখব, নাকী ‘ভগবত্তা’ এবং ‘ঈশ্বরত্ব’ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যেই একীভূত করে দেখা উচিত? এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক মতিলাল ‘প্রিয়েরে দেবতা’ নামক প্রবন্ধে একাধিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বিষয়টিকে বুঝতে চেয়েছেন। বিষয়টিকে সহজে মহাভারতের পাঠকরা যাতে বুঝতে পারে, সেই কারণে আলোচনার সুবিধার জন্য বিমলকৃষ্ণ মতিলাল প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র* এবং বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারতের কথা* বই দুইটির বক্তব্যকে নিদর্শন হিসাবে তুলে এনেছেন। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ হিসাবেই উপস্থাপন করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে ঈশ্বরত্বের গুণগুলিকে সচেতনভাবে তিনি এড়িয়ে গেছেন। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক মতিলালের মতো আমরাও মনে করি যে, একুশ শতকের বিদ্যায়তনিক সমালোচনার জগতে মহাভারতের কৃষ্ণকে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে দেখবার দৃষ্টিটি ঠিক নয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর কৃষ্ণ সম্পর্কে অবস্থানটি অধিক যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কৃষ্ণকে একজন মানুষ হিসাবে দেখার পাশাপাশি তার চরিত্রের মধ্যে ঈশ্বরত্বের বা ভগবত্তার দিকটিকেও মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। প্রাবন্ধিক মতিলাল তাঁর ‘প্রিয়েরে দেবতা’ নামের প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বসুর মতামতের সঙ্গেই নিজের বক্তব্যকে মিলিয়েছেন এবং এই বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সংযোজন রেখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কাছে কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর- এই ঈশ্বর ভক্তের ভগবান বা প্রেমের ঠাকুর অথবা পরমপুরুষ নয়, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ সময়ে কৃষ্ণ তার নতুন রূপে আত্মবিস্মৃত। বিভিন্ন দৈব ঘটনায় এবং নিয়তির হাতে কৃষ্ণ একেবারেই অসহায়। এই অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে জরাসন্ধের অত্যাচারে পলাতক কৃষ্ণের আচরণে, কৃষ্ণের দূত হিসাবে ব্যর্থতায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল বা অবগত থাকা সত্ত্বেও মহাযুদ্ধ রোধের ব্যর্থতায় এবং শেষে যদুবংশ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে না পারার প্রভৃতির মধ্যে। এই জায়গাতেই মহাভারতের কৃষ্ণ ভারতীয় তথা আপামর বাঙালির প্রিয় পাত্র, যেখানে মানুষ হয়েও তাকে ভগবান রূপে আমরা দেখে থাকি।

প্রাবন্ধিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

এই কৃষ্ণ রামের মত মনোরম নন, এঁর চরিত্র ও কার্যকলাপ আমাদের ভাবায়, পীড়া দেয় এবং ক্রোধের উদ্রেক করে আর পরিশেষে হয়তো শ্রদ্ধারও উদ্রেক করে। কিন্তু এঁকে নিতান্ত

আপনজন ভাবতে দ্বিধা হয় না— যেমন অর্জুন বা দ্রৌপদীর হত না। ইনি যেন ‘কাছের মানুষ’।
ইনি যদি ঈশ্বর হন তবে তিনি এক বিশেষভাবে ঈশ্বর। ৬৭

কৃষ্ণের মহাভারতে বিশেষ একটি ভূমিকার বিষয়ে প্রাবন্ধিক মতামত দিয়েছেন। এখানে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ মতামতটিকে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি:

প্রথমদিকেও বলেছি যে সমগ্র মহাভারতের নানা ঘটাপ্রতিঘাত পূর্ণ বিচিত্র কাহিনীর প্রায় সন্ধিক্ষণগুলিতেই কৃষ্ণ ছিলেন প্রয়োজককর্তা। প্রয়োজক কর্তার কাজ প্রয়োজনায প্ররোচনায় ও প্রবর্তনায়— সাক্ষাৎভাবে তিনি বিশেষ কিছু করেন না। যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে অর্জুনের ‘বিষাদযোগে’র সময় তাঁর ভূমিকা স্পষ্টত প্ররোচনায় ও প্রবর্তনায়। পাণ্ডবদের উপদেষ্টা হিসাবেও তিনি প্রয়োজক কর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। সারথির কাজ নিয়ন্ত্রণায়, প্রয়োজকের কাজ প্ররোচনায়। কৃষ্ণের মধ্যে এই দু’য়ের মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। ৬৮

কৃষ্ণের ভগবত্তা বা ঈশ্বরত্বের বিষয়ে বেশ কিছু গুণ প্রাবন্ধিক মতিলাল উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই পূজ্যত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ কৃষ্ণ মহাভারত জুড়েই পূজ্যপাদ হিসাবে স্থান পেয়েছে। প্রাবন্ধিক এই বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত সহকারে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। কৃষ্ণের ভগবত্তার অপর গুণগুলি হল- নৈতিকতাকেন্দ্রিক, ন্যায়বিচার, মঙ্গলবিধাতৃত্ব। তবে প্রাবন্ধিক ভগবত্তার গুণ হিসাবে মঙ্গলবিধাতৃত্বকে উল্লেখ করা সত্ত্বেও মহাভারতের যুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অধর্মযুক্ত কাজগুলির সঙ্গে কৃষ্ণের যোগ থাকার বিষয়টিকেও বলেছেন। তবে মহাভারতের কৃষ্ণ যেহেতু ঈশ্বরের পাশাপাশি মানুষও, তাই শেষ পর্যন্ত ন্যায় বিচারের অংশটুকু যাতে পৃথিবীতে থেকে যায় তার জন্যই অতিমানব বা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ আশ্রয় চেষ্টা করে গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কৃষ্ণ একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে আদর্শ মানুষ এবং অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু’র নজরে ঈশ্বর।

৪.৯।।

অমলেশ ভট্টাচার্য (১৯৩৫-)

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু’র মতো অমলেশ ভট্টাচার্যেরও মহাভারতের উপর রচিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম হলো *মহাভারতের কথা*। পড়াশোনায় বরাবর মেধাবী হিসাবে পরিচিত অমলেশ ভট্টাচার্য ইংরেজিতে স্নাতকোত্তরের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে শ্রীঅরবিন্দের একান্ত সচিব এবং অরবিন্দের আশ্রমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মূলত প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্যের

পন্ডিচেরিতে অরবিন্দের আশ্রমে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার ফলেই একাধিক জ্ঞানীগুণী সাধকদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছিল। তারই সূত্র ধরে তিনি বেদ, ভারতীয় দর্শন এবং যোগের প্রথম পাঠগ্রহণ করেছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীমৎ অনিবার্ণের কাছে। এভাবেই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় পুরাণ ও ভাগবতেরও নিবিড় পাঠগ্রহণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাঁর সেই বোধ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের মিলিত সমাবেশ রামায়ণ ও মহাভারতের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্যের বেদগ্রন্থ, মহাভারতের কথা ও রামায়ণ কথা গ্রন্থগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল মহোদয়ের হাত থেকে পুরস্কার পান। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রিত লেখক হিসাবে ‘এনসাইক্লোপিডিয়া এশিয়াটিকা’-তে রামায়ণ এবং মহাভারতের উপর বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য তাঁর এই বইতে মোট ছত্রিশটি প্রবন্ধকে স্থান দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলি প্রত্যেকটি আকারে খুব একটা বড়ো নয়, তারপরেও অত্যন্ত দক্ষ হাতে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাবন্ধিকের আলোচনায় মহাভারতের সঙ্গে আনুষঙ্গিক হরিবংশাদি পুরাণ গ্রন্থ, আর্য রামায়ণ এবং বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দিকগুলি উত্থাপিত হয়েছে। এগুলির পাশাপাশি দেশীয় ও পাশ্চাত্যের একাধিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রয়োজন অনুসারে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অন্যতম প্রবন্ধগুলি- প্রস্তাবনা, আলো-অন্ধকার দুই তটে, অগ্নিঢালা সুধা, দুঃখ যখন দীক্ষা, অরণ্যের আশীর্বাদ, অশ্রুমুখী শ্বেতপদ্ম, মেঘ ও রৌদ্র, ব্যথিত ফুলের গন্ধরেণু, ব্রাহ্মণ বিপ্লব: ওঙ্কারে টঙ্কার, দুইটি অরণিকাঠ, আত্মহোমের বহিজ্বালা, বসুধে কৰ্ণ: দৈব না পুরুষকার?, এ পরবাসে-, কোন পথে ধর্ম?, ধর্ম- অধর্ম, পতঙ্গের পাখা ওঠে, অশনিসম্পাত, রাজনীতি- কূটনীতি, মুখোশপরা রাজনীতি, ভগ্ন হল সুধাপাত্র, অনলগর্ভা কুন্তী, বজ্রে বাজে বাঁশি, ঘোর অমাবস্যা, গীতার কথা, অস্ত্রপাত না প্রণিপাত?, রক্তের ঋণ, ব্রাহ্মণ বীর, অধর্মের আর্তনাদ, দুই হাতে রক্ত- দুই চোখে জল, কর্ণের যুদ্ধ না আত্মহত্যা?, সব শেষ-, কালরাত্রি, ধ্বংস না সৃষ্টি?, মহাভারতের মহাফল, বেলা যায়....., যুগান্ত ত্বরমাণ্- মহাপ্রস্থান।

পুরো বইটি জুড়ে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার ছোঁয়া রেখেছেন। তিনি ‘প্রস্তাবনা’ অংশে মহাভারতকে নির্দিষ্ট একটি সংরূপের মধ্যে ফেলতে চাননি। এই বিষয়ে আমরাও জানি যে মহাভারতকে আসলে এরকম যেকোনও সাহিত্য সংরূপে বেঁধে ফেলাটা কার্যত একপ্রকার অসম্ভব, বুদ্ধদেব বসুও এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য প্রাথমিকভাবে মহাভারতের মধ্যে সমস্তরকম সাহিত্যের সংরূপকেই খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু, মহাভারতের ব্যাপ্তি এগুলিকে ছাড়িয়ে আরও অনেকটা প্রসারিত। ঠিক যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হিসাবে ভাবতে চেয়েছিলেন। ভাবনার এই স্তরে এসে অমলেশ

ভট্টাচার্যের ‘মহাভারতের মহাফল’ নামের প্রবন্ধে তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই আমাদের বলেছেন যে, ভারতবর্ষের সমস্ত চাওয়া পাওয়া মহাভারতের মধ্যেই আছে। আমরা প্রাবন্ধিকের কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরিছি:

আদিপর্বে বেদব্যাস প্রথমেই তার উত্তর দিয়েছেন। মহাভারত কেবল কাহিনি নয়। ঘটনার ইতিহাস নয়। মহাভারত জীবনবেদ। চিরকালের ইতিহাস। সমগ্র জাতির অস্তিত্বের গভীরে সর্বত্রসঞ্চরী মূল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশবিসারী শাখাপল্লবে সমুন্নত একটা বৃহৎ বনস্পতি— “ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ”(আদিপর্ব, ১/১১১)। —যার ছায়ায় আমাদের প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি। “বেদ ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষের মূল— মূলং কৃষ্ণে ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ” (আদিপর্ব, ১/১১১)। এই ধর্মবৃক্ষের মহিমা মহাভারতের পর্বে-পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আদিপর্ব হল এই বৃক্ষের বীজ (“সংগ্রহাধ্যায়বীজো”)। পৌলোম ও আস্তিক পর্বে দেখানো হয়েছে কেমন করে এই বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। সম্ভবপর্ব তার বিস্তৃত কাণ্ড। সভা ও বনপর্ব বৃক্ষের বিটক, যেখানে পাখিরা আশ্রয় নেয়। যেখানে বিচিত্র সব কথা ও কাকলি জেগে ওঠে। বনপর্ব গভীর ভাবের ও তত্ত্বের রহস্যগ্রন্থি (“অরনীপর্বরূপাঢ্যো”) বিরাট ও উদ্যোগপর্ব বৃক্ষের সারভাগ। ভীষ্মপর্ব মহাশাখা। দ্রোণপর্ব পত্রাবলী, কর্ণপর্ব তার শুভ্র পুষ্প সম্ভার। শল্যপর্ব ওই পুষ্পরাজির গন্ধ। স্ত্রী ও ঐষীক পর্ব তার ছায়া। শান্তিপর্ব ভারতবৃক্ষের মহাফল (“শান্তিপর্ব মহাফলঃ”)। আশ্বমেধিকপর্ব তার অমৃতরস। আশ্রমপর্ব শান্তির আশ্রয়। মৌষলপর্ব সংক্ষিপ্ত শ্রুতি। এই হল সর্বভূতের অক্ষয় ভারতবৃক্ষ— “ভূতানামক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ” (আদিপর্ব, ১/৯২)।^{৬৬}

ভাবনার এই জায়গা থেকেই মহাভারত হয়ে ওঠে আপামর ভারতবাসীর একান্ত আশ্রয়ের জায়গা। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য মহাভারতের এই গভীরতাকে আত্মস্থ করেই বলেছিলেন যে, রামায়ণ কাব্য হিসাবে অধিক জনপ্রিয় হতে পারে। কিন্তু, মহাভারতের পাঠ যিনি গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন তিনি জীবনবোধ ও জীবন দর্শন সম্পর্কে এক প্রগাঢ় ধারণা লাভ করেন। মহাভারতের গুরুত্ব এখানেই অন্যান্য মহাকাব্য হতে আলাদা।

প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য ‘আলো-অন্ধকার দুই তটে’ নামের প্রবন্ধে যথাযথ যুক্তিপূর্ণভাবে দেখাতে পেরেছেন সমগ্র মহাভারতের ঘাত ও প্রতিঘাত, যন্ত্রণা ও উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও বেদনা প্রধানত দু’টি চরিত্রের উপরই পড়েছে। চরিত্র দু’টি হল যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র। মহাভারতের যে শক্তি তার সবখানি তোড় আছড়ে পড়েছে এই দু’ই চরিত্রের উপরেই, এই মহাকাব্যের অন্য কোনও চরিত্র এত প্রবলভাবে আনন্দ, বিষাদ, উচ্ছ্বাস, শোক নিজেদের বুকে ধারণ করেনি। মহাভারত সম্পর্কে এই ভাবনা এর আগে অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধে আমরা পাই না। মহাভারতের মধ্যে আমরা বারবার খেয়াল করেছি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তাপিত বক্ষ এবং ধার্মিক ও বিবেকবান্ যুধিষ্ঠিরের ব্যথিত

হৃদয়। এই যে প্রবল শক্তির ধাক্কায় দু'ই তীরের ভাঙাগড়া তাই নিয়েই মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহ। ভারত শক্তির বিপুল চাপকে একদিকে যদি ধর্মের প্রতিভূ হিসাবে যুধিষ্ঠির ধারণ করে, তবে তার বিপরীত দিকটি অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্র। যে অন্ধরাজা বিদুর, পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য দ্বারা যথা সময়ে মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র পুত্র প্রেমে অন্ধ হয়ে সমগ্র হস্তিনাপুরের ও কুরুবংশের ধ্বংস ডেকে এনেছে। সঞ্জয়ের মুখ হতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের বিবরণ শুনেছে এবং পরাজয়ের গ্লানি অন্তর থেকে ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখানে তার অন্ধত্ব যেন তার জীবনেরই প্রতীকী একটি দিক।

অন্যদিকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, যে সামান্য একটি পিপড়ের মৃত্যুতেও দুঃখ পায়, যার তীব্র অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ের জন্য নিকট প্রিয়জনদের কাছে গঞ্জনা ও ধিক্কার বারবার পেয়েছে। পাশা খেলায় নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে স্ত্রী ও পাঁচ ভাইকে নিয়ে বনবাসী হতে হয়েছে। এর যন্ত্রণা ও দুঃখ এবং গ্লানি পুরো বনপর্বতে আমরা পেয়েছি। এই সময়ে ঋষি বৃহদশ্ব নল-দময়ন্তীর কাহিনি যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছে, যাতে জগতের সবথেকে দুঃখী মানুষ যে সে নয়-সেটির বোধ তার মধ্যে জন্মায়। দ্রৌপদীর থেকেও কম গঞ্জনা যুধিষ্ঠির শোনেনি। ফলে একসময়ের বিবেকবান, সহৃদয়, ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ের জন্য একপ্রকার উদগ্রীব হয়েছিল। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর জন্য অর্ধসত্য বলেছে, নিজ হাতে শল্যকে হত্যা করেছে, এমনকী ধনঞ্জয় অর্জুনকেও সামনাসামনি গাণ্ডীবের নিন্দে শুনিয়েছে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যখন যথার্থ রাজধর্ম পালনের সময় এসেছে তখন যুধিষ্ঠির আবার বিষণ্ণ এবং নিরুৎসাহী। আবার শুধুমাত্র একটি কুকুরের জন্য জীবিত অবস্থায় স্বর্গলাভের সুযোগ থেকে পিছিয়ে আসতে পেরেছে। এখানেই আমরা দেখেছি যে যুদ্ধের পূর্বে ও পরে একই ঢেউ উভয় কূলেই উঠেছে, কিন্তু তাদের ঘাত প্রতিঘাত একেবারে বিপরীতমুখী। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রকে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হতে দেখেছেন, যেটি আমাদের কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের একাধিক দিকগুলি এবং বাঁক বদল খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এর পূর্বে আমরা দেখেছিলাম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের নানা দিক যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু ও সুকুমারী ভট্টাচার্য। অমলেশ ভট্টাচার্যও এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের দেখানো পথে হেঁটেছেন। রাজা হিসাবে ও কূটনৈতিক প্রশাসক হিসাবে যুধিষ্ঠির খুবই অদক্ষ এবং কাঁচা। ইন্দ্রপ্রস্থ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল শুধুমাত্র কৃষ্ণের পরামর্শে এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের বাহুবলের সাহায্যে। যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার অভাব খুবই প্রকট। আমরা দেখেছি রাজসূয় যজ্ঞের মাধ্যমে সারা আর্যাবর্তে ইন্দ্রপ্রস্থের একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা স্বয়ং মধ্য ও উত্তর

ভারতের অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ। অথচ যুধিষ্ঠির নামই শোনেনি জরাসন্ধের। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন:

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির যে প্রশ্ন করলেন তাতে আমরা হতবাক। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন,
“ হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধ কে? তার বীর্য ও পরাক্রম কি প্রকার?”
যুধিষ্ঠিরের একি জিজ্ঞাসা? সমগ্র উত্তর ভারতে যিনি প্রায় অপ্রতিহত সম্রাট, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই পক্ষের মোট সৈন্যসংখ্যা যেখানে ছিল আঠারো অশ্বোহিণী, সেখানে একা জরাসন্ধেরই সৈন্যবল ছিল বিশ অশ্বোহিণী এমন প্রতাপশালী জরাসন্ধের নাম পর্যন্ত শোনেনি যুধিষ্ঠির? আশ্চর্য! এতখানি রাজনৈতিক অজ্ঞতা নিয়ে তিনি সম্রাট হতে চান? ^{৭০}

প্রবল পরাক্রমশালী জরাসন্ধের রাজ্যের পরিধি নিতান্ত কম ছিল না, এসব ছাড়াও জরাসন্ধের বন্ধু রাজারাও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। যাদের মধ্যে অন্যতম- শিশুপাল, পৌণ্ড্র বাসুদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত, মধ্য ভারতের রাজা কালযবন প্রভৃতিরা। মগধরাজ জরাসন্ধের প্রবল প্রতাপ ও অত্যাচারে কৃষ্ণও দ্বারকায় একসময় চলে আসতে বাধ্য হয়। রাজা হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল রাজা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির রাজাদের সম্পর্কে ও নিজ রাষ্ট্রের এবং প্রতিবেশীদের কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবগত থাকবে। রাজা হিসাবে যুধিষ্ঠিরের এসব গুণগুলি ছিল না, এছাড়াও রাজার তেজ, অঘোর সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবও আমরা দেখেছি। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য রাজা হিসাবে যুধিষ্ঠিরের এই দিকগুলি যেমন ভাবতে পেরেছেন, ঠিক তেমনই যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের যে গুণগুলি তাকে ‘ধর্মরাজ’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেগুলিও প্রবন্ধের বইতে যত্ন সহকারে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ বিষয়টাতাই যুধিষ্ঠিরের তীব্র আপত্তি ছিল। কেবলমাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে সম্পূর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়তে চেয়েছিল যুধিষ্ঠির, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় অবগত সে ছিল। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের চরণে প্রণাম করার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করে ধর্মরাজ। এই বীরত্ব ও বৃহৎ ভাবনাই অন্যান্য চরিত্রদের থেকে যুধিষ্ঠিরকে আলাদা করে। অরণ্য প্রবাসের সময় যুধিষ্ঠির বিভিন্ন মুনি ঋষিদের পায়ে তলায় বসে জীবনের পাঠ ও জীবনের দর্শন সম্পর্কে সুদীর্ঘ পাঠ নিয়েছে। এই জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধ এবং ধর্মের যে পাঠ যুধিষ্ঠির ঋষিদের থেকে পাবে, সেগুলিই মহাভারতে তাকে ধর্মরাজ করেছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মহাভারতের কথা* গ্রন্থের ‘এক বিশ্ববিদ্যালয়’ নামের প্রবন্ধে বলেছেন:

কিন্তু যা তিনি স্বপ্রণোদনায় শুনছেন- সাগ্রহে, সতৃষ্ণভাবে, অবিরল— তা হ’লো মুনিদের মুখে পুরাণ-কথা —ভরতবংশের ধূসর ইতিহাস নয়, নয় পূর্বপুরুষের গতানুগতিক গুণকীর্তন, কিন্তু

সেইসব অজর ও অশ্লৈয় কাহিনী, যার দ্বারপথ দিয়ে আমরা যেন বিশ্ব জীবনের অন্তঃপুরে চ'লে যাই, দেখতে পাই অনির্ণেয় এ জ্যোতি— আমাদের সুপ্রিয় ও সুপরিচিত সব নীলিমা ও শ্যামলিমা থেকে বহুদূরবর্তী এক বিন্দুর মতো।.....কিন্তু আমরা দেখছি যে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, লোমশ ও বৃহদশ্ব ও মার্কণ্ডেয়র কাছে, জিজ্ঞাসু শুধু যুধিষ্ঠির এবং শ্রোতাও শুধু তিনি, মুনিদের মুখে সম্বোধন শুধু তাঁরই উদ্দেশ্যে।^{৭১}

প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্য রামায়ণের সীতার সঙ্গে মহাভারতের দ্রৌপদীর নানা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেখানে স্পষ্টতই দেখতে পেয়েছি যে দ্রৌপদীর বনবাসকালের কষ্টকর জীবনের নানা দিকগুলি এবং অন্যদিকে চিত্রকূটের পুষ্পভারসমৃদ্ধ অরণ্যে সীতার উচ্ছ্বাস ও আনন্দ। বনবাসের শেষ দুই বছর বাদ দিলে সীতা এক প্রকার সুখ ও শান্তিতেই দিন কাটিয়েছে, অন্যদিকে নানান মানসিক সংকট ও দুশ্চিন্তা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দ্রৌপদীর দিনযাপন এগিয়েছে। শামিম আহমেদের *মহাভারতে দ্রৌপদী* নামের বইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পেয়েছি, এই নিয়ে পরে যথাস্থানে আমরা দু'একটি বিস্তারিত বিষয়ের কথা বলব। মহাভারতে কর্ণের চরিত্রের মধ্যে একাধিক বৈপরীত্যও প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখায় কর্ণের জীবনের শেষ পরিণতি নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে ও মনে যে সংকট উঠে আসে তা দেখেছিলাম। অমলেশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে তিনি কর্ণকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার চরিত্রের এমন পরস্পর বিরোধী বেশ কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যেগুলি আমাদের কর্ণ চরিত্রটিকে গভীরভাবে ভাবতে রসদ যোগায়।

কর্ণের জীবন একদিকে স্বর্গ থেকে যেমন আহরণ করেছে যত মহত্ত্ব বীরত্ব শ্রেষ্ঠ গুণবৈভব, অন্যদিকে আবার অন্ধকার নরক থেকে তুলে এনেছে যত নীচতা আর ক্রুর হিংসার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। ঘোর নরকরূপী নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহকে আশ্রয়করেছিল।.....তার অন্তরখানির একপিঠে আলো আর- এক পিঠে অন্ধকার। সৌন্দর্য- কলঙ্ক-মাখা এক পাণ্ডুর সুষমা। এমন পৌরুষদীপ্ত দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত বীর মহাভারতে আর দ্বিতীয় নেই। দৈব ও পুরুষকার, আশীর্বাদ ও অভিশাপ, দয়ার্দ্র হৃদয়ের সঙ্গে তীক্ষ্ণ কঠোর জিহ্বা, ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে সর্বনাশী অজ্ঞানতা, ধার্মিক হয়েও অধর্মের চির- সহচর, দেবতার ঔরসে উচ্চকূলে জন্মেও হীনকুলোদ্ভব বলে ধিক্কৃত, মাতা থাকতে মাতৃহীন, সব থেকেও যে কিছুই পেল না, এমন সাফল্যময় নিষ্ফল জীবন মহাভারতে আর দ্বিতীয় নেই।^{৭২}

প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্য মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিরোধের ছবিটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়ে তিনি প্রাথমিকভাবে মহাভারতের কিছু কাহিনিকে সামনে রেখে এগিয়েছেন। অমলেশ ভট্টাচার্য স্পষ্টতই দেখাতে পেরেছেন কৌরব ও পাণ্ডবদের জাতিবৈরিতার পশ্চাতে রয়েছে সেই সময়ের ভারতের বিস্তৃত রাজনৈতিক কার্য-কারণের সংঘাত। সেই সমস্ত ঐতিহাসিক কার্য-কারণের নানা চিহ্ন অভিজ্ঞান মহাভারতের নানা স্থানে

ছড়িয়ে আছে। মহাভারতের বিরাট কলেবরে অরণ্য পর্বতের গায়ে গায়ে আমরা আগুনের পোড়া ক্ষত দেখি। সহজেই বুঝতে পারি তৎকালীন সময়ে বেশ কিছু সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় ভারতের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরের যে তীর্থ ভ্রমণের কাহিনি আমরা পেয়েছি সেখানে এই ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। ঔর্ব ঋষি, চ্যবন, পরশুরাম, কাতবীর্যার্জুন, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ, শত্রু ও কল্মাষপাদের কাহিনিগুলির মধ্যে ইতিহাসের পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের দুইটি প্রভাবশালী ও নিয়ন্ত্রক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে ক্ষমতার মূল চাবিকাঠির নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কেন্দ্র করে লড়াই, সেটি ‘ব্রাহ্মণ বিপ্লব: ওঙ্কারে টঙ্কার’ নামের প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। বাঙালির মহাভারত চর্চাকে একটু অন্যরকমভাবে ভেবে দেখার স্বাদ পেলাম এই প্রবন্ধে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় ২০১৯ সালে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* নামের বইতে দেবীদাস আচার্য বিস্তারিতভাবে মহাভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের পাশাপাশি ক্ষত্রিয় বনাম সাধারণ জনগণের লড়াইয়ের বিষয়টিকেও তুলে এনেছেন। আমরা তাই আমাদের আলোচনায় এই প্রসঙ্গে দেবীদাস আচার্যের লেখাকেও পাশে রাখছি।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ হত্যার যখন মারণযজ্ঞ চলছিল, ক্ষত্রিয়রা নিজেদের অবস্থান শক্ত করার জন্য তখন ব্রাহ্মণ দেখলেই শিরশ্ছেদ করছিল। ফলে ব্রাহ্মণেরা নগর থেকে বিতাড়িত হয়ে অরণ্যে আশ্রয় লাভ করে। এরই প্রতিবাদে ঋষি ঔর্ব নিদারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠার ফলে হয়তো সাময়িকভাবে সমাজের শান্তি ফিরে আসে। (আদিপর্ব, ১৭৮ অধ্যায়) আবার দেখতে পেয়েছি ক্ষত্রিয় হৈহয় রাজবংশের কাতবীর্যার্জুনের সময়ে নির্বিচারে ব্রাহ্মণ হত্যা। পরশুরামের পিতা ঋষি জমদগ্নি পর্যন্ত উক্ত ক্ষত্রিয়ের হাতে প্রাণ হারায়, অনেক পরে ঋষি পরশুরাম পিতৃহত্যার চরম প্রতিশোধ হিসাবে একুশবার পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় রাজবংশ সরিয়ে দেয়। মহাভারতে বনপর্বে পেয়েছি রামচন্দ্র বনাম পরশুরামের যুদ্ধের ঘটনা, কিন্তু রাম পরশুরামের তেজ এবং প্রতাপ সংহরণ করে নেয়। ঋষি বশিষ্ঠ বনাম বিশ্বামিত্রের বিরোধের ঘটনা সাধারণ বালক থেকে বৃদ্ধ সবাই জানে। ঋষি বশিষ্ঠের কামধেনুকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে চরম লড়াই হয়। শেষে কামধেনুর শরীর থেকে বিভিন্ন অনার্য ও ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হলে তারা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। গল্পটি রূপক হলেও আমরা বুঝতে পারি ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে এখানে ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এইসব অনার্য জাতিই করেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম- যবন, কিরাত, শবর, খস, চিবুক, বর্বর, সিংহল, দ্রাবিড় প্রভৃতিরা। এইরকম বিরোধের কথা বশিষ্ঠ পুত্র শত্রু এবং ক্ষত্রিয় রাজা কল্মাষপাদ, ঋষি অষ্টাবক্র ও রাজা জনকের মধ্যেও দেখেছি। ঋষি অষ্টাবক্র এখানে জানাচ্ছে যে ব্রাহ্মণ ও রাজা যদি উভয়ই উপস্থিত থাকে তবে প্রথমে ব্রাহ্মণকেই রাজা পথ ছেড়ে দেবে। (বনপর্ব, ১৩৩/১) মহাভারতে রাজা জরাসন্ধ ক্ষত্রিয় বিরোধী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিল। প্রায় একশোজন রাজাকে আটক করার ঘটনাটি আমরা জানি, মধ্য ভারতে কুরু-

পাঞ্চাল ক্ষত্রিয় বংশের অন্যতম প্রধান বিরোধী একটি রাজনৈতিক জোট জরাসন্ধের মধ্যে লক্ষ্য করি। জরাসন্ধের রাজ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ছিল অবাধগতি। মহাভারতে দ্রোণাচার্য বনাম রাজা দ্রুপদের বিবাদের ঘটনাটিও আমাদের অপরিচিত নয়।

প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্য এই বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ক্ষমতার লড়াই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মহাভারতের কালেও সমানভাবে সত্য ছিল। ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয়ের এই বিরোধ শুধুমাত্র সৈন্যবল কেন্দ্র করে হয়নি। সমাজ বিধান ও ধর্ম বিধানকে আশ্রয় করেও এই বিরোধ তখনকার দিনে ছড়িয়ে পড়েছিল। মূলত এই জায়গা থেকেই সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণ ক্ষমতার মূল ভাগে চলে আসে, ফলস্বরূপ ক্ষত্রিয়রাও ব্রাহ্মণের অনুগত হয়ে গেল। এরপরও বিভিন্ন সময়ে কমবেশি বিদ্রোহ দেখা গেলেও, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব কমবেশি ছিলই। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন বিভিন্ন আখ্যানের মধ্যে থাকা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভুত্বের ইতিহাসের স্পষ্ট ছবি। এগুলির মধ্যে অন্যতম- বিষ্ণুর বৃকে ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদাঘাত, নহুষের স্বর্গচ্যুতি, চ্যবন ঋষির ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভন প্রভৃতি। আবার দুর্বাসা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র, লোমশ, বৃহদশ্ব এবং অগস্ত্য- এরা মহাভারতে রাজা অপেক্ষাও বেশি সম্মান পেয়েছে। প্রাবন্ধিক দেবীদাস আচার্য তাঁর *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* বইতে বলেছেন:

কশ্যপ: বিচক্ষণ লোকেরা জানেন, জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যখন পরস্পর বিরোধ করে, তখন ক্ষত্রিয়ের রাজ্য বিনষ্ট হয়, এবং দস্যুরা মিলিত হয়ে ওই দুই বর্ণ তো বটেই, অন্য বর্ণকেও আয়ত্ত করে ফেলে। আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সব সময় পরস্পরকে রক্ষার জন্য মিলিত থাকলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উন্নতির কারণ হয়, আবার ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের উন্নতির কারণ হয়ে থাকে।

এই সংলাপে এও স্পষ্ট যে, স্বভাব-সখ্যের পাশাপাশি বর্ণসমাজের শীর্ষে অবস্থান নিয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের স্বার্থসংঘর্ষও বিরল ছিল না। এ কথা ঠিক, ব্রাহ্মণের কলমের আঁচড়েই ধর্মশাস্ত্রে রাজা দেবপর্যায় উন্নীত, কিন্তু সেইসঙ্গে রাজার জন্য হুঁশিয়ারিও ছিল। প্রজাদের স্বার্থরক্ষাই যে রাজধর্ম, সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।^{৭৩}

তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সঙ্গেও রাজাদের বিরোধ অনেক সময় বেশ প্রকট ভাবেই দেখা গেছে। আমরা মহাভারতের মধ্যেই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে দেখেছি, প্রজা বিদ্রোহের অনেক সময় ইঙ্গিত মিলেছে, এমনকী রাজার কৃতকর্মের জন্য প্রজাদের কাছে একপ্রকার জবাবে বাধ্য হওয়ার দৃষ্টান্তও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

অমলেশ ভট্টাচার্য তাঁর *মহাভারতের কথা* বইতে ধর্ম ও অধর্ম এবং তাদের স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত দু'তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। খুবই বিস্তারিত ও সমৃদ্ধশালী যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমরা এখান হতে পাই। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে মহাভারতে 'ধর্ম' কথাটির অর্থ অত্যন্ত প্রসারিত। বর্তমানকালে 'ধর্ম' বলতে বিশেষ কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচরণকে বোঝায়। মহাভারতে ধর্ম বলতে তাই আমাদের মনে পড়ে নীতিধর্ম, রাজধর্ম ও দণ্ডনীতির মতো একাধিক বিষয়ের কথা। তবে মহাভারত ধর্মের বিষয়ে অনেকটা উদার, রামায়ণের নীতিধর্ম ও রাজধর্ম এক্ষেত্রে অনেকটা গোঁড়া। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য একাধিক দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়েছেন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, যুগধর্ম প্রভৃতি থাকে। সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই এগুলির উৎপত্তি। তবে যদি এগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ কখনও দেখা যায়, তখন মহাভারত বলেছে ক্ষুদ্র ধর্ম ত্যাগ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে এমন বিষয়কেই বেছে নিতে হবে। খুব সহজভাবে বললে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মের নিয়মাবলী তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অনুকূলে হওয়া আবশ্যিক।

প্রাথমিকভাবে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে ধর্মের বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠির ধর্ম সম্পর্কে বলেছে যে ধর্মকে সহজে বোঝা যায় না, কিন্তু তা ক্ষুরের ধারের থেকেও সূক্ষ্ম ও পর্বতের চেয়েও গরীয়ান। বনপর্বে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের দশটি শরীরের বিষয়ে তথ্য দিয়েছে। যেগুলি হল- যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, দান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও অচাপল্য। আবার আশ্বমেধিক পর্বে, ১৩ অধ্যায়ে ধর্মের সাতটি লক্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে। যথা- অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, অক্রুরতা, দম, শম ও সরলতা। এইভাবে মহাভারতে বনপর্বের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মের প্রবেশপথ পাঁচটি বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ধর্ম ছয়টি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সমাজ নির্ধারিত এই সকল গুণগুলি যদি কোনও মানুষ মেনে চলে তবে সে ধর্মের পথে থাকবে। প্রাথমিকভাবে ধর্মের এরকম একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে মহাভারতে। সেইটি ভালোভাবে বোঝার জন্য তপস্বী জাললি ও তুলাধার বণিকের উপাখ্যান প্রাবন্ধিকের আলোচনায় এসেছে।^{৭৪} যেখানে আমরা দেখলাম তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেও তপস্বী জাজলি কাশীর তুলাধার বণিকের সমান ধার্মিক নয়। কারণ বণিক জানায় যে সে তার কাজে ছল বা কপটতা কখনও অবলম্বন করেনি, সর্বদা সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেছে। তুলাধার বণিক আরও জানিয়ে বলে যে তার হাতের দাঁড়িপাল্লার মতোই পৃথিবীর সমস্ত কিছু তার কাছে সমান। অর্থাৎ বণিকের হাতের পাল্লা এখানে ধর্মের প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত। সৎভাবে নিজের কর্ম চালিয়ে যাওয়াটাই এখানে ধর্মের একটি দিক হিসেবে উঠে এসেছে। আবার কৌশিক মুনি ও মিথিলার ব্যাধের কাহিনিও আমরা জানি, যেখানে ধর্মের প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে সর্বভূতে

দয়া ও চিন্তের সমতা এবং তুল্য জ্ঞান।^{৭৫} এছাড়া ব্যাধ জানায় যে প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণধর্ম অনুসারে নিজের কর্ম করা আবশ্যিক। তাহলেই ব্যক্তি মানুষ ধর্মের পথে থাকবে।

কিন্তু ধর্মের পরিচয় কেবল এইসব সংশ্লিষ্ট গুণগুলির মধ্যেই থাকে না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারাটাও ধর্মের মধ্যে পড়ে। এই ক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে কৌশিক মুনির কথা বলেছে, যেখানে সত্য কথা বলার অর্থ হল অরণ্যের লোকেদের দস্যুদের হাতে মৃত্যু। সেখানে অসত্য বলাটাই ধর্ম। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে আমরা দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে ধর্মকে এক বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। চিরাচরিত যত নীতিশাসন সেগুলি আপেক্ষিক তত্ত্বে বিধৃত করা হলো। এখানে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি গুণগুলি আর অবিসংবাদী থাকলো না। মহাভারত এখানেই ধর্মের জটিল বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। প্রাবন্ধিক অমলেশ বলেছেন:

তিনি বললেন, “যাকে অন্যায় বলে ভাবছ, তাই অনেক সময় হয়ে ওঠে একমাত্র ন্যায়, মন্দ বলে অসত্য বলে অধর্ম বলে যাকে অস্বীকার করতে চাইছ, এক বৃহত্তর, সূক্ষ্মতর ধর্মের বিধানে অনেকসময় তাই হয়ে ওঠে একমাত্র ভাল, একমাত্র সত্য, একমাত্র ধর্ম।” শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টত মহাভারতে মনুসংহিতার গণ্ডি পেরিয়ে গেলেন। স্থানে স্থানে বেদকেও দিলেন প্রচণ্ড নাড়া। তিনি বললেন, “বিচারবিহীন হয়ে বেদবাদে অনুরক্ত যারা, যারা স্বর্গকামী, জন্মকর্মফলদায়ী ক্রিয়াকর্মে নিরত, যারা নানারকম শ্রুতিমধুর কথা বলে, তারা বিভ্রান্তচিত্ত (অপহৃতচেতসাং), তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।^{৭৬}

স্থান ও কাল ভেদে ধর্মেরও পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যদি পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে ধর্ম নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে, তখন উক্ত ধর্মের অসারতা এবং গুরুত্বহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। সমকালীন সময়ে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি* নামের বইতে অত্যন্ত সরল ভাষায় আমাদের আলোচিত বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র তুলে ধরা কিছু দৃষ্টান্ত আমরা এখানে বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তিনি দেখিয়েছেন যে একই অপরাধের দণ্ড বয়সের ভেদে ভিন্ন হওয়া উচিত। যেমন আমরা মহাভারতের ঋষি মাণ্ডব্যের উপাখ্যান সম্পর্কে কমবেশি সবাই অবগত। ঋষির অপরাধ হিসাবে ধর্মরাজ জানায় যে মাণ্ডব্য বাল্যকালে কিছু পতঙ্গের পুচ্ছদেশে নলখাগড়ার শিষ প্রবেশ করিয়েছিল, তাই বর্তমানে নিজের পুচ্ছদেশে শূলের অগ্রভাগ অর্থাৎ ‘অণী’ নিয়ে যজ্ঞগা ভোগ করছে। এখানেই প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র প্রবন্ধে আমাদের অস্বিষ্ট বিষয়টি খুঁজে পাই।

অণীমাণ্ডব্য এবার ঠান্ডা মাথায় ধর্মরাজকে প্রশ্ন করলেন- আমি কোন বয়সে এই অন্যায় কাজটা করেছিলাম, একটু ভেবে বলুন। ধর্মরাজ বললেন- আপনি নিতান্তই বাল্যবয়সে এই কাজ

করেছিলেন। অণীমাণ্ডব্য ঝাঁঝিয়ে বললেন-একটি বালক তার জন্মকাল থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত যদি অন্যায় কাজ করেও, তাহলেও তা পাপ বলে গণ্য হতে পারে না-এমনকী দেবতারাও সেটাকে পাপ বলে গণ্য করেন না।^{৭৭}

অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হলে ধর্মের অপর একটি ভালো উদাহরণ মহাভারত আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখলাম সত্যবতীর নীতিধর্মের প্রজ্ঞা কত গভীর! সত্যবতী এখানে মহাভারতের সময়ের অপেক্ষা নিজেকে আধুনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলো। পুত্রবধূদের যন্ত্রণা ও কষ্টকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিল সত্যবতী।

সত্যবতী ভীষ্মকে বলেছিলেন- ওদের এই বয়েস! এই রূপ-যৌবন! তুমি ওদের বিয়ে করো- দারাংশচ কুরু ধর্মেণ।^{৭৮}

ব্যক্তিগত লাভ ও রাজনৈতিক স্বার্থভাবনা হয়তো সত্যবতীর ছিল, কিন্তু এগুলির উপরেও কৌরব বংশে সুস্থিতি এবং বিধবা পুত্রবধূদের জীবনযাপনের বিকল্প ব্যবস্থা - এই বিষয়গুলিকে ধর্ম হিসাবে সত্যবতী দেখেছে। যেখানে সত্যবতীর কাছে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার থেকেও বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে পুত্রবধূদের জন্য আগামীদিনের জীবনযাপনের পথটি।

আবার আমরা দেখেছি জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে একপ্রকার বল প্রয়োগ করেই রথে তোলে, ভীমের দ্বারা হয়তো জয়দ্রথ নিহত হতো। কিন্তু যুধিষ্ঠির চোঁচিয়ে বলে থাকলো-

ভগিনী দুঃশলার কথা মনে রেখো, সে যেন বিধবা না হয়, জননী গান্ধারীর কথা মনে রেখো, তিনি যেন জামাতৃহীন না হন।^{৭৯}

প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের মহাফল' নামের প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। মহাভারত নামের বিশাল মহাকাব্যের ওজন দাঁড়িয়ে আছে চারটি স্তম্ভের ওপরে। যথা- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এই চারটি পুরুষার্থকে সরিয়ে রাখলে মহাভারতের যথার্থ রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য তাই আলোচনার এই ক্ষেত্রটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহাভারতে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন মতের অবস্থান এবং জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক ভাবনা- যা মহাভারতকে যথার্থ অর্থেই সেই উচ্চতায় নিয়ে গেছে। আমরা জানি যে ভীম কামকেই প্রধান হিসাবে ভেবেছে এবং অর্জুন অর্থকেই সর্বোপরি প্রাধান্য দিয়েছিল। কিন্তু অধার্মিক ব্যক্তি যদি অর্থবান হয় তাহলে জগৎসংসারের তা কোনও কাজে লাগে না। যুধিষ্ঠির তাই বলেছে ধর্ম, অর্থ ও কামের উপরে উঠেই তাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে

হয়। ব্যক্তি মানুষের জীবনে এই পুরুষার্থগুলির কোনও একটি না থাকলে জীবন শ্রীহীন ও পঙ্গু হয়ে যায়। আবার জীবনে যদি সমান অনুপাতে এই পুরুষার্থগুলির অবস্থান না হয় তাহলে শিরায় শিরায় বিষের মতো প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

আমরা এর পূর্বে ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি। ধর্মের পর অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষার্থ। মহাভারত বলেছে যা কিছু আয়ত্ত করা যায় তাই অর্থ, এখানে অর্থকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থের গুরুত্ব বোঝাতে প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্য মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব থেকে কুন্তী, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের উক্তিকে প্রমাণ স্বরূপ তুলে ধরেছেন। মহাভারত অর্থের যথার্থ সঞ্চয় এবং খরচের বিষয়টিকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এরপর আসে কাম। যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল যে সংসারের হেতুই হল কাম- কামঃ সংসারহেতুশ্চ (বনপর্ব, ৩১৩/৯৮)। মহাভারতে কামকেও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোনও কিছুর সংকল্পরূপ মনের ইচ্ছাই হল কাম। কিন্তু কাম আশুনের মতোই উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, ত্যাগ ও সংযমের মধ্যে দিয়ে তাকে শান্ত করা না গেলে জীবনকে ধ্বংসের দিকে তা টেনে নিয়ে যায়। মহাভারতে সাধনার মাধ্যমে তাই কামকে শোধনের কথা বলা হয়েছে, মানুষের কাম শোধনের পর তা অহংসর্বস্ব লিঙ্গা না থেকে প্রেমে পরিণত হয়। এই কামনার পরিণতি যাতে বিষবৃক্ষ না হয়, সে বিষয়ে মহাভারত আমাদের সর্বদাই সচেতন করে গেছে।

এরপর যে পুরুষার্থের বিষয়ে প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন তা হল মোক্ষ। মোহময় বিশ্ব এবং যাবতীয় ভোগ্য বস্তু থেকে মানব মনে বৈরাগ্যের হাওয়া এলে আমরা ধরে নিই ব্যক্তি মানুষের মোক্ষ লাভ হয়েছে। এই অবস্থাটা সমস্ত কামনা- বাসনা ও ভোগের ইচ্ছার উর্ধ্বে এক প্রশান্তময় অবস্থা। অমলেশ ভট্টাচার্য মহাভারত থেকে প্রচুর উদাহরণ সহযোগে মোক্ষের একাধিক স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন। এই রূপ মোক্ষ লাভের কথা বৌদ্ধ দর্শনেও বলা হয়েছে। মহাভারতে বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার তাই ত্যাগের কথা ও ত্যাগের মাহাত্ম্য বিষয়ে বলা হয়েছে। অমলেশ ভট্টাচার্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে এনেছেন, আমরা তা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি:

ভীষ্ম বলছেন, “জগতের এবং স্বর্গের যা- কিছু সুখ একত্রে ত্যাগের যে সুখ তার ষোলো ভাগের এক ভাগও নয়।”^{৮০}

এই একই কথা বলছেন সংসারে পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্দি (শান্তিপর্ব, ১৭৭/৫১)। জনকের রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুকদেব বলেছিলেন, “ কে শ্রেষ্ঠ? জীবনের সমস্ত কাম্যবস্তু যিনি লাভ করতে পারেন তিনি? না, যিনি সেগুলিকে ত্যাগ করতে পারেন তিনি? কামনা পূরণের চেয়ে তাদের ত্যাগই শ্রেষ্ঠ- প্রাপনাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে। (শান্তিপর্ব, ১৭৭/১৬)^{৮১}

বিশ শতকে যে সমস্ত বাঙালি প্রাবন্ধিক মহাভারত চর্চায় খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছিলেন তাদের মধ্যে অমলেশ ভট্টাচার্য অন্যতম। মহাভারতকেন্দ্রিক বিভিন্ন তাত্ত্বিক ভাবনা এবং মানব মনের বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি একাধিক প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধে আমরা পাই। মহাভারত আমাদের অমৃতরস এবং ভারতীয় সমাজ জীবনে এটির প্রভাব যে কত গভীর- তা প্রাবন্ধিক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি। পরিশেষে দৃষ্টির সঙ্গে আমরা বলতে পারি বিশ শতকে বিখ্যাত অন্যান্য বাঙালি মহাভারত সমালোচক তথা- রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুখময় ভট্টাচার্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতো প্রাবন্ধিক অমলেশ ভট্টাচার্যের ভারতীয় দর্শন, বেদ, পুরাণকথা, রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কিত জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। মহাভারতের অনেক বিষয়কেই তিনি সহজভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন।

৪.১০।।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী (১৯৫০-বর্তমান)

বিশ শতক থেকে একুশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিস্তারিতভাবে মহাভারত চর্চা করে চলেছেন বিখ্যাত পুরাণবিদ এবং খ্যাতনামা ভারততাত্ত্বিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। ভারতীয় পুরাণ ও উপনিষদ এবং মহাকাব্যের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ ‘এনসাইক্লোপিডিয়া’ বা জ্ঞানকোশ রচনায় বর্তমানে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী যুক্ত রয়েছেন, এরই পাশাপাশি সমকালের পাঠকের কথা ভেবে অত্যন্ত সহজ বাংলা ভাষায় মহাভারতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে হাত রেখেছেন তিনি। বিশ শতকের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিক বাঙালির মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের চর্চার বিষয় এবং অন্বেষণগুলিকে উপস্থাপন করে মহাভারতের গবেষক ও পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের থেকে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী আলাদা। বরং প্রাবন্ধিক ভাদুড়ীর মহাভারতকেন্দ্রিক প্রবন্ধের বইগুলি গবেষক ও পাঠকদের কাছে অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের অপেক্ষা অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং প্রভাবক। এর একটি কারণ হয়তো হতে পারে যে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় একেবারে সমস্ত শ্রেণির পাঠকদের মতো করে তাঁর মহাভারতীয় অন্বেষণগুলিকে পাঠক ও গবেষকদের কাছে রাখতে পারেন। এদিক থেকে তাঁর প্রবন্ধগুলি একেবারে কঠোর যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল হয়ে ওঠেনি। তাই নৃসিংহপ্রসাদের প্রবন্ধগুলি আমরা পড়তে একেবারে ক্লান্ত হই না।

মহাভারতের একাধিক বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধের বইগুলি হল- *মহাভারতের লঘু-গুরু*, *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি*, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, *কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়*, *মহাভারতের প্রতিনায়ক*, *মহাভারতের ছয় প্রবীণ*, *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ* ইত্যাদি। এছাড়াও *দেবতার মানবায়ন* সহ অন্যান্য একাধিক ভারতীয় পুরাণ সংক্রান্ত বইগুলিতে প্রাবন্ধিকের মহাভারত সম্পর্কিত নানান ভাবনা চিন্তার ছবি ফুটে উঠেছে। এগুলির সঙ্গে দে'জ পাবলিশার্স দ্বারা প্রকাশিত *কথা অমৃতসমান* নামের মহাভারতের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণধর্মী বইগুলিকে ভুলে গেলে হবে না। যা এখন পর্যন্ত ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে আমাদের হাতে এসেছে, এই মহান কাজটি এখনো শেষ হয়নি যা ধাপে ধাপে মহাভারতের পাঠকদের কাছে পরবর্তী সময়ে আসবে। ভবিষ্যতে চলিত এমন সুখপাঠ্য মান্য বাংলা ভাষায় মহাভারতের বিশ্লেষণটি শেষ হলে তা আমাদের কাছে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

তাঁর মহাভারতের উপরে লিখিত বিভিন্ন সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের বইগুলিই আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়। এপ্রিল ২০১২ সালে পত্রলেখা প্রকাশনা হতে প্রকাশিত গ্রন্থ *মহাভারতের লঘু-গুরু*, যা সমস্ত স্তরের মহাভারত প্রিয় পাঠকদের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। অসম্ভব মেধাযুক্ত প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র পক্ষেই হয়তো সহজে বলে দেওয়া সম্ভব যে কাব্যসাহিত্যে গৌণ বা অপ্রধান বলে কিছুই হয় না। মহাকাব্যের গৌণতা, গৌণ চরিত্র, গৌণ গুণ এবং মাধুর্য আসলে প্রকৃত বিষয়বস্তুকেই মুখ্য করে তোলে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ীই আমাদের দেখিয়েছেন যে মহাভারতের জায়গায় জায়গায় আপাত গৌণতার মধ্যেই এমন মুখ্য ভূমিকায় চলে আসেন ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, বিরাট রাজা এবং ঋষি নারদ ও অন্যান্যরা যে, তাদের সরিয়ে রেখে এই মহাকাব্য ব্যাসদেবের পক্ষে লেখা একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বইটির ভূমিকা অংশতেই এই তথাকথিত গৌণ বা অপ্রধান চরিত্রগুলির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন:

মহাভারতের বিরাট জীবন বিবরণ পড়তে পড়তে দেখেছি— ভীম-অর্জুন অথবা ভীষ্ম-দুর্যোধন যেমন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ সেই তথাকথিত ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি যাদের কখনও ‘পার্শ্ব’ কখনও ‘গৌণ’ অথবা কখনও উপচরিত্র বলে হেলা-ফেলা করা হয়। আপনারা তাকিয়ে দেখুন নকুল-সহদেবের দিকে। মহাভারতের রাজনীতি অথবা সেই বিরাট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁদের অবদান কতটুকু! কিন্তু তারা তথাকথিত ক্ষুদ্র বলেই একদিকে যেমন বিপ্রতীপভাবে ভীম কিংবা অর্জুনের মাহাত্ম্য তৈরি হয়, তেমনই সমাজ দর্শনের বৃহৎ সমাধিতে যুধিষ্ঠির যক্ষকে বলেন— আমার মায়ের এক সন্তান ‘আমি’ যেমন জীবিত রইলাম, তেমনই আমার বিমাতা মাদ্রীও যেন সপুত্রা থাকেন, আমাদের নকুল বেঁচে উঠুক— নকুলো যক্ষ জীবতু। ঠিক এইখানে বুঝি মহাভারতের কেউই পরিহার্য নন, মহাকাব্যিক জীবন সকলকে ধারণ করে।

আমি বোঝাতে চাই— এত তুচ্ছ, এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু এই হংসমিথুন, এই নদী, হরিণ— সব কিছু দুয্যন্ত-শকুন্তলার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত গৌণ, কিন্তু এই গৌণতার মূল্য কত বেশী তা শুধু সামগ্রিকতার মধ্যে আমরা তেমন করে খেয়াল করে দেখি না, আবার ব্যবচ্ছিন্ন করে নিলেও সেটা বোঝা যায় না। কিন্তু কবি সেটা বুঝিয়ে দেন চোখে আঙুল দিয়ে। সেখানে আবার এ কোনও সাধারণ কাব্য-নাটক নয়, এটা মহাভারত। এখানে কবে-কোথায় পাণ্ডব-কৌরবের কাহিনীর মধ্যে নারদ ঋষি এসে পৌঁছবেন, তিনি রাজনীতির বিষয়ে প্রশ্ন করবেন, সেটাই মহাভারতীয় শান্তিপর্বে ব্যাখ্যাত বিরাট রাজধর্ম পর্বের সূত্র স্থান হয়ে উঠবে। বনপর্বের শেষে যক্ষপ্রশ্ন—যার আরম্ভ হবে এক ব্রাহ্মণের অরণী-কাষ্ঠ শৃঙ্গ-লগ্ন করে একটি হরিণ পালিয়ে যাবে এবং পাণ্ডবরা তার পশ্চাদ্ধাবন করতে-করতে পিপাসার্ত হয়ে পড়বেন— এই ঘটনায়। মহাভারত এটাকে উপপর্ব ধরে নিয়ে এটার নাম দিয়েছে অরণী-পর্ব। সম্পূর্ণ মহাভারতের কাহিনি নিরিখে অরণী-পর্বের মূল্য কতটুকু, কিন্তু পণ্ডিত জনেরা এটাকে, বিশেষত পর্বস্থিত যক্ষ-প্রশ্নকে মহাভারতের গ্রন্থিস্থান বলে জানিয়েছেন। ৮২

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তাঁর মহাভারতের লঘু-গুরু বইটির বাকি অংশে এই সমস্ত অপ্রধান চরিত্রগুলির গুরুত্বের বিষয়ে যা যা বলতে চাইবেন তার সংক্ষিপ্তসার যেন ভূমিকা অংশেই আমাদের বলে দিয়েছেন। ভাবনার এই সূত্র থেকেই তিনি মহাভারতের সঞ্জয়, কচ ও দেবযানী, ভরত-দৌষ্যন্তি, পাণ্ডু, নকুল, সহদেব, ঘটোটকচ হৈড়িস্ব, অভিমন্যু, মৎস্যরাজ বিরাট, নারদ এবং ঋষি দুর্বাসা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। বইটির আলোচনা তিনি শুরু করেছেন সঞ্জয়ের মাধ্যমে। আমরা জানি যে মহাভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্যকে আমরা সঞ্জয়ের চোখ দিয়েই দেখেছি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ সাংবাদিকের মতো করে সঞ্জয়ই ধৃতরাষ্ট্র এবং পাঠকদের জানিয়ে এসেছে। এই সঞ্জয় যদি না থাকতো তবে মহাভারতের অদ্ভুত ঘটনাগুলি আমরা জানতেই পারতাম না। কিন্তু আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রের উপস্থিতি আমরা যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে মহামতি ব্যাসদেবের আশীর্বাদে পাই। কিন্তু প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র বিশ্লেষণে আমরা বুঝতে পারি যে সঞ্জয়ের উপস্থিতি মহাভারতের সূচনা পর্ব থেকেই আছে। যেখানে সঞ্জয়ের দেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ, নির্মোহ এবং পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণই সঞ্জয় চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভুল ত্রুটির বিষয়গুলো কখনও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সঞ্জয় রাজাকে শুনিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রের নীতিগত বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছে সঞ্জয়। যথার্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং কূটনৈতিক স্তরে তার বোঝাপড়া অদ্ভুত রকম উন্নত, যার পরিচয় প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী আমাদের দিয়েছেন। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর বিশ্লেষণে আমাদের দেখিয়েছেন সঞ্জয়ের দৌত্যকার্যের দিকটি, যেখানে যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শান্তির জন্য নানারকম প্রয়াস করে গেছে। কূটনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য সেই মানুষের প্রয়োজন, যিনি ব্যক্তি রাজার এবং রাজ্যের সমস্ত

ক্রিয়াকর্ম ও প্রক্রিয়া জানেন— নিজের পক্ষের জানেন এবং প্রতিপক্ষেরও। এখানেই সঞ্জয়ের গুরুত্ব। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তাই যথার্থই বলেছেন:

এর উত্তরে দু'টি কারণ বলা যায়। প্রথমত সঞ্জয় যতই ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধতায় কথা বলুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র যদি তাঁকে দূত করে পাঠান, তাহলে তিনি কোনওভাবেই ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করবেন না। কেননা যে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে পাঠানো হচ্ছে, তিনি সেই রাষ্ট্র বা রাজার স্বার্থ অতিক্রম করে বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না, রাজার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মতপার্থক্য থাকলেও, তিনি তাঁকে অতিক্রম করবেন না। দ্বিতীয়ত, সঞ্জয় পাণ্ডবদের কাছেও শ্রদ্ধেয় মানুষ, তাঁদের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব। সবচেয়ে বড়ো কথা, পাণ্ডবদের ব্যাপারে সঞ্জয়ের ব্যক্তিগত এবং নীতিগত সমর্থন আছে বলেই যুদ্ধোদ্যোগের ক্ষেত্রে তাঁরা কতটা এগিয়ে, কতটা তাঁদের বলাবল, সেটা জেনে আসাটা সঞ্জয়ের পক্ষেই সম্ভব, কেননা নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য যতখানি, তার চেয়ে বেশি ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করার জন্যই সঞ্জয় অনুপুঞ্জভাবে জেনে আসবেন যুধিষ্ঠিরের আকার, ইঙ্গিত এবং চেষ্টা। অতএব সঞ্জয়কেই একান্তে ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র।^{৮৩}

মূলত হস্তিনাপুরের বিরাট সম্রাজ্যকে যাতে আক্রমণের মুখে পড়তে না হয় এবং পাণ্ডবরা যাতে প্রতিশোধস্বপ্নহায় না ভোগেন তার জন্যই সঞ্জয়ের মতো বুদ্ধিমান এবং কূটনীতিতে দক্ষ দূতকে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে একাধিকবার যুদ্ধের পরিকল্পনা শুনে তাকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে সঞ্জয়, বুঝিয়েছে যে কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করে যুধিষ্ঠিরের আদৌ লাভ হবে না। প্রিয়জন ছাড়া পৃথিবীর সুখ ও সম্পদ ভোগ কীভাবে সম্ভব? বলাই বাহুল্য, সঞ্জয়ের এই প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ যায়নি। মূলত সঞ্জয়ের ধর্ম এবং অহিংসা সম্পর্কিত বাণীর জন্যই যুধিষ্ঠির শেষপর্যন্ত কেবলমাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়েই এই যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে আসতে রাজি হয়। সঞ্জয়ের দূত কার্যে যুধিষ্ঠির বলতে বাধ্য হয়েছে যে সঞ্জয় মধ্যস্থ দূত হিসাবে অত্যন্ত সফল।

তিনি বলেছেন— তুমি সকলের বিশ্বস্ত দূত এবং সকলের প্রিয় পাত্র, তোমার কথাবার্তাও অত্যন্ত মধুর। তুমি নিজে নির্মোহ এবং সদাসন্তুষ্ট বলেই তোমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না এবং কটু কথা বললেও তুমি রেগে যাও না।^{৮৪}

প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী *মহাভারতের লঘু-গুরু* বইটিতে সঞ্জয় চরিত্রটি ছাড়াও মৎস্যরাজ বিরাট এবং নারদ চরিত্র দু'টি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। যেখানে মহাভারতের মতো মহাকাব্যের বিপুল বিস্তৃত পরিসরে আমাদের চরিত্র দু'টির সম্পর্কে ভাবনার নতুন রসদ

যোগায়। মহাভারতে বিরাট রাজার বিখ্যাত থাকার কারণ হল পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের পূর্ণ বছরটি নিরাপত্তার সঙ্গে আশ্রয় প্রদান করার জন্য। এখানে সহজেই অনুমেয় যে অজ্ঞাতবাসের এই বছরটি যদি ফলপ্রসূ না হতো, তাহলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো আবার বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময়কাল অতিবাহিত করতে হতো তাদের। মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটি এই কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতে বিরাট রাজ্য দর্শনীয় শোভন স্থান হিসাবে বিখ্যাত, মরুদুর্গের কারণে বাইরের আবহাওয়ার শত্রুর পক্ষের রীতিমতো দুর্ভেদ্য জায়গা। বিরাটের গুণ হিসাবে যুধিষ্ঠির ক্ষমতাশালী এবং অতিথিপরায়ণতার বিষয়টি স্বীকার করেছে। প্রত্যেক পাণ্ডবরাই বিভিন্ন ছদ্মনামের আড়ালে রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ কাজে আশ্রয় নেয় এবং অজ্ঞাতবাসের সময়পর্বটিও পাণ্ডবদের মোটামুটি নিরাপদে ও সুখেই কেটেছিল। প্রাথমিকভাবে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এই কথাগুলি বলার পরেই বিরাট রাজার দুর্বল প্রশাসনের ছবি এবং অদ্ভুত মধ্যযুগীয় কিছু দৃষ্টিভঙ্গি যেমন মানুষ বনাম পশুর লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, যেখানে রাজ্যের রাজা এই অমানবিক ও পাশবিক এবং অন্যায় অসম দ্বন্দ্ব আনন্দ পায়। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন:

ব্রহ্মা-মহোৎসবে প্রধান আড়ম্বরের বস্তু হল- মল্লযোদ্ধাদের লড়াই। বিরাট রাজা অদ্ভুত আনন্দ পেতেন এই লড়াই দেখে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এবার যেসব মল্লবীরেরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের এক একজনের চেহারা প্রায় অসুরের মতো।..... প্রতিবছরেই যেহেতু এই ব্রহ্মা-মহোৎসব উদযাপিত হয়, অতএব মল্ল যুদ্ধের এই বাৎসরিক আমোদের জন্য বিরাট একটি স্থায়ী রঙ্গালয় তৈরি করেই রেখেছেন। মল্লরা সব সেখানেই উপস্থিত হয়েছেন এবং এক একজন নানা রকম দৈহিক কসরত এবং পেশির সংকোচন-বিমোচনের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগল। ৮৫

বিরাটের রঙ্গালয়ে উপস্থিত যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম হল জীমূত। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন কীভাবে জীমূতের সঙ্গে ভীমের মল্লযুদ্ধ এগিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয় জীমূত, কিন্তু জীমূতের মৃত্যুর পর বিরাট রাজা সাজোপাজ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে মেতে ওঠেন। এখানেই মহাভারতের পাঠক বা দর্শকের আধুনিক পরিশীলিত মন বেদনায় জর্জরিত হয়ে ওঠে। এরপর নির্মমতার আরও একধাপ এগিয়ে বিরাটের মনে হল মানুষ বনাম পশুর যুদ্ধের কথা, ভীমকে এগিয়ে দিলেন অধিক সংকটময় পরিস্থিতির দিকে। বিরাট চরিত্রের এই অস্বাভাবিকতার দিকটি নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী দেখিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

শুধু এই অন্যায় বিচিত্র আমোদ হলেও বুঝতাম, বিরাট রাজার এতে কতটা খুশি, সেটা বোঝা যায়, যখন তিনি দুহাতে টাকা পয়সা তুলে ভীমের হাতে পারিতোষিক দিলেন। তাই এত খুশির ফল কী হল? ভীমের সাহসিকতায় বিরাট এত মুগ্ধ হলেন যে, তিনি ভাবলেন— এ

লোকটাকে আর মল্লদের সঙ্গে লড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই, কেননা ভীমের শক্তির তুলনায় মল্লরা একেবারেই তুচ্ছ, বরঞ্চ ভীমকে বাঘ-সিংহ-হাতির সঙ্গে লড়াই করতে দিলে আরও বেশি মজা হবে।^{৮৬}

এটা তো গেল রাজার অস্বাভাবিক কুৎসিত মনোরঞ্জনের একটি দিক। দুর্বল রাজ্য প্রশাসনের চিত্র কতটা ভয়াবহ হতে পারে, কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে এবং অমনোযোগী আরামপ্রিয় রাজা রাষ্ট্রব্যবস্থার কতটা ক্ষতিসাধনে সক্ষম— তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অবশ্যই বিরাট রাজা। কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো যদি দুর্বল হয় তাহলে তা রাষ্ট্রের অবশ্যই সার্বিক হানি ঘটাতে সক্ষম হয়। মহাভারতের এই অংশটি প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বা জাতিরাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও যদি দুর্বল রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেন, তাহলে সেই রাষ্ট্রের অবস্থাও বিরাট রাজ্যের মতো হতে বাধ্য। একথা বুঝতে গেলে গভীর গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই ততটা। সমসাময়িক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুনিয়ার দিকে নজর ঘোরালেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উত্তর পাওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক উন্নয়নমূলক যাবতীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সাফল্য, ব্যর্থতা ও জনসাধারণের আনন্দ বা বেদনা সমস্ত কিছুই দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ওপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ, ১৯৯৫ সালের পর প্রথম তালিবান সরকার এবং ২০২১ সালের দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখলের পর দ্বিতীয় তালিবানের সরকারের আমলে আফগানিস্তানের নারী সুরক্ষা, মানবাধিকার, বিচার ব্যবস্থা, নাগরিক স্বাধীনতা এবং মুক্তচিন্তার ক্ষেত্র— প্রতিটি বিষয়েই সার্বিক অবনমন ঘটেছে।^{৮৭} দুর্বল নেতৃত্ববর্গের নেতৃত্বদানের কারণে ২০২২-২৩ সালে শ্রীলঙ্কার শাসন ব্যবস্থা ও বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ তলানিতে এসে ঠেকেছে।^{৮৮} অন্যদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্যই আজ জাপান ও জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি সামলে আজ বিশ্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের কথাও আমরা বলতেই পারি। যাই হোক আমরা আবার বিরাট রাজার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজা সর্বদা রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে নজরে রেখে চলে। রাষ্ট্রব্যবস্থার এই সমস্ত স্তম্ভগুলির কোনও সমস্যা ও উন্নতিকরণের প্রয়োজন দেখা দিলে রাজকে তা নিয়ে ভাবতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিরাট রাজার চরম উদাসীনতার বিষয়টি প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। রাজার শ্যালক কীচকের উপর বিরাটের একেবারেই নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ফলে কীচক রাজসভায় দ্রৌপদীর মর্যাদাহানি করলেও বিরাটের কিছু করার ছিল না। আবার ধরা যাক দ্রৌপদী সহ অন্যান্য পাণ্ডবরা যখন বিরাট রাজসভায় এসে নিজেদের ছদ্মনামে রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন বিরাট বিনা তদন্তে

তাদের সাদরে মৎস্য রাজ্যে বিভিন্ন পদে গ্রহণ করে নিল। এটাও দুর্বল রাজার গুরুতর এক প্রশাসনিক ব্যর্থতা। রাজার শ্যালকের মৃত্যুর পর উপকীচকদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আবার দ্রৌপদীকে হত্যার নিদান দেওয়া হল, ভেবে দেখার বিষয় এখানে দ্রৌপদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই সব কাজগুলিই দুর্বল প্রশাসনের অন্যতম দিক।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী বিরাট চরিত্রটিকে যথার্থই গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন। তাঁর মতে বিরাট রাজা এমনই, রাজা হিসাবে সর্বদা খামখেয়ালে চলে, সমস্ত রকম বিপদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে দূরে থেকে নিজের আমোদপ্রমোদ ও সুখে নিমজ্জিত থাকতেও ভালোবাসে। তাই মৎস্য দেশের রাজকর্মচারীরাও রাজারই মতো স্বভাবের হয়েছে। প্রজাদের উপর অকারণে অত্যাচার, নির্মম নিপীড়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নারী ধর্ষণ— সবগুলিই আসলে দুর্বল ভঙ্গুর প্রশাসনিক কাঠামোকেই চিহ্নিত করে। বিষয়টিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন রাজতন্ত্রের সেরকম কিছু পার্থক্য নেই। এখানেই নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র এই অন্বেষণ আমাদের সমৃদ্ধ করে, রাজা বিরাটের চরিত্রকে বিভিন্ন দিক থেকে ভেবে দেখার অবকাশ মেলে।

মহাভারতে নারদ চরিত্রটিকে নিয়েও অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ গভীর ভাবনা প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র আছে। বস্তুত নারদ একেবারেই মহাভারতে গৌণ চরিত্র, অথচ বিপুলাকার মহাকাব্যটিতে নারদের গুরুত্ব বা ভূমিকা অনেক। নারদকে নিয়ে আমাদের ভাবনারও বহুমাত্রিকতা রয়েছে। ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্যে নারদ তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয়। কোথাও তিনি ঝগড়া বা কলহ সৃষ্টির মূল কারিগর, কোথাও গায়ক অথবা ভক্তি রসের প্রবর্তক, আবার কোথাও তিনি গভীর দার্শনিক ও কূটনৈতিক বিদ্যা প্রদানকারী ঋষি হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে। যাই হোক, একাধিক ভারতীয় পুরাণ অবলম্বনে নারদ চরিত্রের বহুস্তরীয় ও বহুমাত্রিক দিকটি প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী প্রতিষ্ঠা করেছেন। অসাধারণ মেধাযুক্ত সেই উপস্থাপন আমাদের ভারতীয় পুরাণ চর্চাকে অন্য মাত্রা প্রদান করে।

তবে মহাভারতের নারদ চরিত্রের গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র অন্বেষণ ও ব্যাখ্যা পড়ে সাধারণ পাঠকের অভিভূত হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। বাঙালির মহাভারত চর্চার সম্পূর্ণ নতুন একটি ধরন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র বিশ্লেষণে বারবার মনে হয় নারদ মহাভারতের সময়ে কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সম্পর্কে তুখোড় পণ্ডিত ছিল। সমস্ত স্তরের রাষ্ট্রীয় কল্যাণের নিমিত্ত কী ভাবেনি নারদ মুনি? যুধিষ্ঠিরকে একগুচ্ছ পরামর্শ প্রদান করে নারদ তার দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে। নারদ বলেছে:

নারদ বললেন— অর্থলাভের ব্যাপারে কোনও অসুবিধে নেই তো তোমার, ধর্মে তোমার মন আছে তো? বিভিন্ন বিষয় সুখও তুমি নিশ্চয় অনুভব করছ, কিন্তু তাই বলে ‘মন’ বস্তুটা যেন বিষয়-সুখে পদে পদে থিন্ন না হয়।^{৮৯}

কিন্তু ওর মধ্যেই রাজার চাওয়া পাওয়ার একটু বিশেষত্ব আছে। নারদ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছেন— তোমার অর্থলাভ ঘটছে তো ঠিকমত? অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চতুর্বর্গের মধ্যে রাজার কাছে প্রথম বিবেচ্য হওয়া উচিত অর্থ। মনে রাখতে হবে, অর্থ বলতে এখানে টাকা-পয়সা-মাত্র বোঝায় না। অর্থ মানে এখানে ঋষি, যার মধ্যে ধনৈশ্বর্য অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা, সেটা হল— ক্রমাগত একটা তাড়না, যেটা জীবন ধারণের বৃত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।^{৯০}

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র চালানোর ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এতটা গভীরভাবে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে, তাকে নিয়ে অবশ্যই বিস্ময়ের অবকাশ থাকতে পারে। এগুলো ছাড়াও নারদ রাজার কর্তব্য ও গুণ নিয়েও ভেবেছে। রাজার ছয়টি গুণের কথা নারদ বলেছে, যথা- উত্তম বক্তা, প্রগলভতা, মেধাবী, স্মৃতিশক্তি উন্নত, কবিত্ব, নয়বিং (রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও ঐ সংক্রান্ত গুণাবলী)। আবার কৃষি ও বাণিজ্যের মতো বিষয়গুলিতে যাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা শিথিল হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে, লাল ফিতের ফাঁস খুলে বাণিজ্যে বণিকদের উৎসাহদানের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলির দায়িত্ব যথার্থ জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের হাতে রাখতে বলেছে। বর্তমান সময়ে আমাদের গণতন্ত্রে দেখতে পাই রাষ্ট্র কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিনামা প্রভাবশালী ‘পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালস্দের’ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে নিজেদের হাতে রাখে। এতে সরকারের নানাবিধ সুবিধা হয়। মহাভারতে নারদও যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়েছে যে পণ্ডিতদের পেছনে অর্থ ব্যয় যেন সে অবশ্যই করে, কারণ রাষ্ট্রের গুরুতর বিপদে তারাই রাজাকে সহায়তা করবে। আমাদের অবাক হতে হয় কত গভীর ও প্রগাঢ় কূটনীতির কথা নারদ বলেছে।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে পূর্বে উপকারী কোনও ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত অপরাধ করলেও রাজা যেন ক্ষমা করে দেয়। অপরাধের ক্ষেত্রে রাজ্যের সাধারণ প্রজা থেকে রাজকর্মচারী পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রেই রাজা যেন তদন্ত করিয়ে তবেই শাস্তির ব্যবস্থা করে। অর্থের ব্যবহারে অনেক সময় ধনী ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যায়, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য হল দরিদ্র মানুষেরাও যাতে যথার্থ বিচার বা ‘ইনসাফ’ পায়। এক্ষেত্রে রাজা প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থায় ন্যায় পরায়ণ ও জ্ঞানী এবং বিবেকবান মানুষকে স্থান দেবে। এছাড়াও মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে নারদ রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে ছোট ও মাঝারি শিল্পে আলাদা দৃষ্টি প্রদানের বিষয়টি স্মরণ করিয়েছে। আমরা জানি যে সমকালীন

ভারতেও MSME বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ রাষ্ট্রীয় উপার্জনের একটা বড়ো অংশ এখানে থেকে আসে। এছাড়াও সমাজের একটা বড়ো অংশের মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, ফলে তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিষয়টিও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ভাবতে হয়। কৃষির ক্ষেত্রেও গরীব কৃষককে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করা এবং কৃষি বীজ যথাসময়ে দেওয়ার বিষয়টিও যুধিষ্ঠিরকে মনে করানো হয়েছে।

আলোচনার বৃহৎ পরিসরে যখন নারদের এই সমস্ত পরামর্শগুলির বিষয়ে মহাভারতের গবেষক হিসেবে বা সাধারণ পাঠক হিসেবে আমরা ভেবে থাকি, তখন মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে নারদ চরিত্রটি কীভাবে গৌণ বা অপ্রধান হতে পারে? বস্তুত মহাভারতের বিশাল পরিসরে নারদ হয়তো অল্পই এসেছে, কিন্তু সেই ছোট্ট পরিসরেই নারদ নিজের জাত বা পাণ্ডিত্য আমাদের চিনিয়ে গেছে তা হতে পারে কূটনীতি, অর্থনীতি অথবা হতে পারে সামগ্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর বইটিতে মহাভারতের আরও অন্যান্য চরিত্রগুলির সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে কচ ও দেবযানীর প্রেম এবং দুশ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়। দুশ্মন্তের পুত্র ভরতের নানাবিধ যাগযজ্ঞের প্রসঙ্গ এবং বীরত্বের কথা। ভরতের সর্বদমন থেকে সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজা হয়ে ওঠার যাত্রাপথও প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী উত্থাপন করেছেন। আলোচনায় এসেছে পাণ্ডুর রাজা হওয়ার বিষয়ে অনিচ্ছার বিষয়টি, মূলত ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অসন্তোষ ঘাড়ে নিয়েই রাজ সিংহাসন গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল সে। তাই অল্পদিন রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করেই হিমালয়ের পাদদেশে সস্ত্রীক চলে যায়। সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম পিতার তীব্র সন্তান কামনা যেমন তার মধ্যে ছিল, ঠিক তেমনই আবার ব্যক্তিগত জীবনে অসম্ভব আবেগপ্রবণও ছিল সে। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে পাণ্ডুর উপস্থিতি খুব বেশি নয় মহাকাব্যে, কিন্তু মহাভারতকার ব্যাসদেব অল্প পরিসরেই তাকে অত্যন্ত আধুনিক ও ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র করে উপস্থাপন করেছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী চমৎকার বলেছেন এই বিষয়ে তাঁর বইতে:

এই মৃত্যু যতই দুঃখের হোক, মহাকাব্যিক অভিষাপের যতই সিদ্ধি ঘটুক তাঁর মৃত্যুতে, পাণ্ডু কিন্তু তৎকালীন দিনেও ভীষণ বাস্তব এক আধুনিক চরিত্র। নিজের পারিবারিক পরিস্থিতি এবং শারীরিক ত্রুটির কারণে কতগুলি সীমাবদ্ধতা চিরকাল তাঁর মনে করেছে বলেই তিনি ভয়ঙ্কর রকমের ‘সেন্টিমেন্টাল’ এবং ইমোশনাল’। প্রজনন ক্ষমতা ছিল না বলে এই ‘ফ্রাস্ট্রেশন’-ই একদিন তাঁকে মোক্ষকামী প্রব্রাজক করে তুলেছিল, কিন্তু মানুষের অন্তর্গত মানসিকবৃত্তিগুলি এমনই যে হাজারবার রুদ্ধ করলেও পথ পেলেই তা বেরিয়ে পড়ে। বারংবার পাণ্ডুর পুত্র কামনা

এবং অবশেষে তাঁর মৃত্যু-এগুলো সবই এক চিরকালীন মধ্যম ভ্রাতার রুদ্ধ-বদ্ধ মনের পথ খুঁজে পাওয়া তথা, ‘ইমোশনাল রিলিজ’।^{৯১}

মহাভারতে নকুল, সহদেব, ঋষি দুর্বাসা, ঘটোটকচ এবং অভিমন্যু’র বিষয়েও প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা রেখেছেন। মহাভারতের বিপুল পরিসরে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের খ্যাতি এবং কর্মের মাঝে দুই বিমাতা পুত্র অনেক সময় হয়তো হারিয়ে গেছে। কিন্তু মহাকাব্যের বিপুল পরিসরের মাঝেও পারিবারিক ফাই-ফরমাশ খাটা হোক, কিংবা ছোট ছোট কার্যক্ষেত্রে সফল হয়েও তারা মহাকাব্যের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে দুর্বাসা ঋষির অনেক অভিশাপই মহাভারতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, যদিও অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত ঋষি দুর্বাসারও উপস্থিতি মহাকাব্যে খুব কম। ঘটোটকচের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে পাণ্ডবদের নানা বিপদে ও সাহায্যার্থে ঘটোটকচ নানাভাবে সহায়তা করেছে, এমনকী সে কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধে নিজের প্রাণ দিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জুনের হত্যাকে রোধ করেছে। এভাবেই ভীমের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ঘটোটকচ কেবলই কার্যকালে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে অভিমন্যুর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই যে মহাকাব্যে অল্প সময়ে সমস্ত পাঠক ও দর্শকদের হৃদয় জিতে নিয়েছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র মতে- ‘মহাভারতীয় বিরাট পুরুষদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতীক। একজন চির-কিশোর নায়ক, মহাভারতের অন্যতম ‘ট্রাজিক হিরো’।^{৯২} যে নিশ্চিত মৃত্যুর বিষয়ে জেনেও পাণ্ডবদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ঐ দিন ব্যূহে প্রবেশ করে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও যুদ্ধে পারদর্শী অভিমন্যু পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিল। কিন্তু, একজন কিশোরকে যখন সাতজন মহারথীরা একসঙ্গে আক্রমণ করে বসল, পাঠকের সমস্ত হৃদয়ের ভালোবাসা তখন অভিমন্যু জিতে নিল। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এই বিষয়ে বলেছেন:

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাবীর যুদ্ধ নায়কদের মৃত্যু ঘটেছে একাধিক। কিন্তু অভিমন্যুর আকালিক পতন ‘যুদ্ধ’-নামক ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাতে এমন বীর, করুণ এবং বীভৎস রসের সামগ্রিক অনুষ্ণ সৃষ্টি করেছে, যা আর কোনও মৃত্যুতে ঘটেনি।..... বালক-কিশোর অভিমন্যু অন্য যুদ্ধ নায়কদের সঙ্গে এতটাই বিলক্ষণ যে, মহাভারতের কবি দ্রোণপর্বে অভিমন্যুর জন্যে দশ-বারো অধ্যায় ব্যয় করেও আবার এই স্ত্রীপর্বে উত্তরার সঙ্গে প্রতিপক্ষীয়া গান্ধারী জননীর বিলাপ-সংযোজন করেছেন। আর মহাভারতের শেষ মহাপ্রস্থানিকে অভিমন্যুর সন্তান-বীজ পরীক্ষিত রাজা হলেন, তখন বুঝলাম—ব্যাস কাউকে বাঁচিয়ে রাখেননি, কিন্তু অভিমন্যুকে বাঁচিয়ে রেখেছেন একভাবে।^{৯৩}

দেবতার মানবায়ন নামের বইটি আনন্দ পাবলিশার্স দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। সেই সময় থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুখপাঠ্য এই বইটি। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র যে কোনও বইয়ের মতো এটিও গবেষক, অধ্যাপক থেকে শুরু করে সাধারণ সাহিত্য পাঠকদের কাছেও

সমানভাবে সমাদৃত। তবে বইটি সরাসরি মহাভারতের ওপরে লিখিত প্রবন্ধের সমাহার নয়, ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রে এবং পুরাণ ও মহাকাব্যে দেবতাদের এক লৌকিক প্রবাদের মধ্যে নবনির্মাণ ঘটেছে। আমরা মহাভারতের গবেষক হিসেবে কেবল মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত এরকম কিছু ঘটনাবলী যা প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র সুন্দর উপস্থাপনায় উঠে এসেছে সেগুলিকে বলার চেষ্টা করব। বাঙালির মহাভারত চর্চা এবং পুরাণ চর্চা যে কত সরস ও রসের সমুদ্র হতে পারে তা নৃসিংহপ্রসাদের উপস্থাপনা থেকে সহজভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যা থেকে সাধারণ ভারতীয় সমাজে পৌরাণিক দেবতারাও বাদ যায়নি। মানুষের নানা অবস্থার কথা বোঝানোর জন্য আমরা 'গোবর-গণেশ', 'কলির কেষ্ঠ', 'ন্যাকা চৈতন্য' প্রভৃতি জাতীয় বিশেষণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এরই পাশাপাশি আমাদের শাস্ত্র ও মহাকাব্যের দেবতারা যে সকল অপরাধ ও দোষে অভিযুক্ত তা মানুষের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়। ফলে দেবতা ও মানুষের মধ্যকার বিভেদ একেবারে মুছে যায়। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন স্বর্গ মর্ত্যের মধ্যে তফাৎ নেই; বস্তুতপক্ষে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ আছে। বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দেবতা এবং স্বর্গের ঠিকানা' নামের প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-

এই ইলাবৃতবর্ষের অন্য নাম হল স্বর্গ। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতের অবস্থান। হিমালয়ের উত্তরে এবং হেমকূট পর্বতমালার দক্ষিণে হল কিম্পুরুষ বর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের সীমা নিষধ পর্বত পর্যন্ত এবং নিষধের উত্তরেই হল আমাদের ইলাবৃতবর্ষ..... পুরাণের এক জায়গায় যেমন বলা হল— ইলাবৃতবর্ষ দেবতাদের জন্মভূমি, অন্যত্র কিন্তু আবার বলা হচ্ছে যে, সেখানকার মানুষের গায়ের রঙ পদ্মের মত, আর তাদের চোখগুলো সব পদ্মের পাঁপড়ির মত, গা দিয়েও যেন পদ্মের গন্ধ বেরুচ্ছে.....। আমার মতে এই মানুষেরাই দেবতা।^{৯৪}

পণ্ডিতেরা বলেছেন— এই ইলাবৃতবর্ষ মোটামুটি মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। সম্ভবত আধুনিক পামির বা পূর্ব- তুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত।..... গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখেছেন—ইলাবৃতবাসীগণ আর্য ছিলেন। কালবশে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদল নিজেদের দেব এবং অপর দল নিজেদের অসুর বলিতেন। অসুরগণ দেবগণের জ্ঞাতি ও বন্ধু ছিলেন।^{৯৫}

ভাবনার এই সূত্র থেকেই যখন দেখি দেবতা ও মানুষের মধ্যে মিলের পরিমাণই বেশি, তখন স্বভাবতই পার্থিব পৃথিবীতে মানুষের ক্রটিগুলি দেবতার মধ্যেও থাকাই কাম্য। তাই দেবতাকে মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে একীভূত করে পড়তে ভালোই লাগে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র আলোচনায় আমরা ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যাকে ইন্দ্র দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা পেয়েছি। মহাভারতে ব্যাসদেব তাই ইন্দ্রের উপাধি দিয়েছে— ইন্দ্রস্ত রতিলম্পটঃ। আবার কুন্তীর থেকে যখন পাণ্ডু নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টিতে সম্মতি আদায় করে, তখন কুন্তীর দ্বিধা দূরীভূত করার

জন্য পাণ্ডু জানায় যে ‘উত্তরকুরু’ নামক দেশে এই রীতি এখনো চালু আছে। নৃসিংহপ্রসাদ জানিয়েছেন যে পামির মালভূমির উত্তরে ‘উত্তরকুরু’ দেশের অবস্থান। সেদিক থেকে জায়গাটিকে বর্তমানের সাইবেরিয়া বা রাশিয়ার কোনও স্থান বলে মনে হয়।

মহাভারতের মমতা ও বৃহস্পতির মিলনের কাহিনিও আমরা বলতে পারি দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেখানে দেবগুরু স্বয়ং নিজেই বলপূর্বক মমতাকে মিলনে বাধ্য করে। মমতার গর্ভের সন্তানের বাধার ফলে বৃহস্পতির বীর্য প্রবেশে অক্ষম হয়, এই ঘটনার জন্য মমতার গর্ভের সন্তানকে অন্ধ হওয়ার অভিশাপ পেতে হয়।^{৯৬} তবে মহাভারতের এই বিষয়টি থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় বলপূর্বক মিলন বা অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণ বর্তমান পৃথিবীর মতো প্রাচীন সমাজেও সমানভাবে ছিল। এর পরের ঘটনাটিও সমান্তরালভাবে সত্য। অন্ধ পুত্র দীর্ঘতমা, যে বৃহস্পতির মতোই কামপ্রবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি ক্রমাগত মিলন প্রার্থনা করলে সে ভাসুরকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। এরপর ভাসতে ভাসতে দৈত্যরাজ বলির রাজ্যে দীর্ঘতমা হাজির হয়। এরপর রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার সঙ্গে মিলনে পাঁচজন ধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়।^{৯৭} এভাবেই মহাভারতের পাঠকে সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন নৃসিংহপ্রসাদ। যেখানে লোভ, হিংসা, লোক ঠকানো, মেয়ে মানুষের রূপে মজা পাওয়া ও অন্যের স্ত্রীকে ধর্ষণ করা— এসব বর্তমানের মতো তখনকার সমাজেও সমানভাবে সত্য ছিল। কাজেই আদর্শ এবং বিচ্যুতি— এই দুইটি বিষয় মিলেই সমাজ তৈরি হয়। কাজেই দেবতা, রাক্ষস, ঋষি, মুনি ও রাজা— এরা সবাই বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। দেবতাদের বাসস্থান তো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করলাম।

আবার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কীভাবে স্বধর্ম থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে তার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত নৃসিংহপ্রসাদ দিয়েছেন। অর্থের প্রয়োজনে কীভাবে মানুষ লোভী ও স্বার্থপর হয়ে যায়— তার উদাহরণ হিসেবে মহাভারতের তক্ষক এবং কাশ্যপের মধ্যকার কথোপকথনটি উল্লেখযোগ্য।^{৯৮} যেখানে রাজা পরীক্ষিৎকে সর্প দংশনের ফলে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে কাশ্যপ বদ্ধপরিকর। কিন্তু কাশ্যপের মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার গুণাবলী দেখে তক্ষক একপ্রকার ঘুষ দিতে চাইল। কাশ্যপের অর্থের যেহেতু প্রয়োজন ছিল, তাই প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে সে বিদায় হয়। এরকম ঘটনা সমকালীন পরিস্থিতিতেও সমানভাবে সত্য। মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়ে বর্তমানেও এরকম কাজ করতে বাধ্য থাকে। এই যে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘটনা এর উপকার একটাই—দেবতা, ঋষি ও রাজা— সবাইকেই মানুষের ক্রটি-বিচ্যুতি এবং মানুষের মহত্বেই সামান্যীকরণের সুযোগ পাওয়া যায়।

আবার দেবতাকে যদি সমাজের একটি স্তরের ‘প্রিভিলেজড ব্যক্তি’ হিসাবে ভাবা যায়, তাহলে সাধারণ পৃথিবীর মানুষও দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। দৃষ্টান্তটি অবশ্যই নহুষের। নহুষ খুবই ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিল, অতুল সম্পদের অধিকারী হয়েও সাধারণের মতোই জীবনযাপনে কাল অতিবাহিত করত এবং নিজ কর্মগুণেই স্বর্গের অধিকারী হতে পেরেছিল সে। পরে ইন্দ্রপত্নী শচীকে সন্তোগের আশায় অভিশপ্ত হয়ে সর্পে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ মহাভারতে কর্মগুণেই দেখতে পেলাম মানুষ থেকে দেবতা এবং দেবতা থেকে সর্পে পরিবর্তনের কাহিনি। কৃষ্ণ, বলরাম থেকে পরশুরাম পর্যন্ত সমস্ত মহাভারতের চরিত্রগুলি মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। বলরামকে দেখতে পাই সরলের সরল, অন্যায়তে প্রবল ক্রোধী, ফূর্তিতে পানপাত্রের মুখচ্ছদ ভঙ্গকারী চরিত্র হিসেবে। পরশুরামের ক্ষেত্রেও তাই মাতৃহত্যাকারী, প্রবল ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি— যিনি আবার বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও আমাদের জনসমাজে লীলার প্রসঙ্গটি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, যে প্রেমের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের লীলা বা কৃষ্ণ লীলা অথবা রাসলীলা খুবই ব্যবহৃত শব্দ হয়ে গেছে। মহাভারতেরও দু’একটি ঘটনা ছাড়া, কৃষ্ণের মানুষ রূপই আমরা দেখেছি। শুধু তাই নয়, মানুষের হাবভাব, মানুষের হৃদয় রসবৈচিত্র্য, ভালোবাসা, শৃঙ্গার, ছেলেমানুষী ও বড়মানুষী— সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের মধ্যে চাপিয়ে আমরা এত খুশি হয়েছি যে, কৃষ্ণের ভগবতাই হারিয়ে গেছে। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর এই সামগ্রিক আলোচনায় বিষয়টিকে অত্যন্ত মেধাবী উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাণবন্ত ও রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন।

পত্রলেখা প্রকাশনী থেকে ২০১৪ সালের কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি* নামের বইটি মহাভারতের ‘নীতি’ বা ‘দণ্ডনীতি’ অথবা বৃহৎ অর্থে ‘ধর্ম’ সম্পর্কিত যে সংকটগুলি নানা সময়ে সাহিত্য সমালোচকদের বা বিদ্যায়তনিক স্তরের গবেষকদের ভাবিয়ে তোলে সেই সংক্রান্ত একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থ। ‘নীতি’ বিষয়টি ভারতীয় দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালি মহাভারত চর্চার উপরে গভীর আলোচনা করেছেন, তাঁরা অনেকেই ‘নীতি’ নিয়ে নানা সময়ে সুগভীর জ্ঞানচর্চা করেছেন। প্রাবন্ধিক সুখময় ভট্টাচার্যের *মহাভারতের সমাজ* বইটির বিষয়ে কথা বলার সময় এই ‘নীতি’ বা ‘ধর্ম’ বিষয়ে অনেক গভীর বিশ্লেষণের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এছাড়াও দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ও অমলেশ ভট্টাচার্যও তাঁদের প্রবন্ধগুলিতে ন্যায়, নীতি, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক কথা বলেছেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র বইতে আমরা মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে এই নীতির বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাই। চলমান সমাজে কখনোই সম্পূর্ণ খাঁটি ‘ভালোত্ব’ বা ‘সাদুতা’ থাকতে পারে না। পরিস্থিতির প্রয়োজনে ধর্ম কখনও অধর্মের রূপ ধারণ করে আবার এর উল্টোটাও দেখা যায়। ঘটনা পরম্পরার উপর একান্তভাবেই নির্ভর করে নীতি ও অনীতি। বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজনে পূর্বের ব্যাপারগুলিকে বিবেচনা করে নীতির কাঠিন্যের পরিহারে

ব্যক্তি জীবনে বৃহত্তরের শ্রেয় সাধন ঘটে। নীতিকে শাস্ত্রীয় শব্দপাঠের প্রমাণে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

মহাভারতের ‘ধর্ম’ সংক্রান্ত এই যে সংকট বা দ্বন্দ্ব যাকে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী নীতি ও অনীতি হিসাবে বলতে চেয়েছেন, মহাভারতের একাধিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন তিনি। ধর্ম বা নীতি আসলে কোনও একটি প্রচলিত ব্যবস্থাকে, প্রতিষ্ঠানকে বা অনুশাসনকে একটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখে। ব্যক্তি মানুষ থেকে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় উন্নতির পেছনে এই নীতির সুগভীর ভূমিকা থাকে। মহাভারতে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য কখনও কখনও প্রচলিত নীতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার ঘটনা দেখি, এদিক থেকে আসলে সার্বিকভাবে সমাজ ব্যবস্থাই উপকৃত হয়। এরকম বেশ কিছু বিষয়কে সামনে রেখে নৃসিংহপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধের বইটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। চমৎকার এই গ্রন্থটিতে আসলে নীতিকেই সামনে রেখে অনেকগুলি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যথা- প্রাচীন রাজতন্ত্র বনাম আধুনিক গণতন্ত্র, মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব, জমি অধিগ্রহণ: তৎকাল, নীতিকথায় রাজনীতি, দ্বিচারিতা ছলনা এবং মহাভারত, মহাভারতের রাজনীতি, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি এবং রামায়ণের নীতি-ধর্ম।

প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের সঙ্গে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক অত্যন্ত বিদ্যায়তনিক তুলনামূলক গবেষণাধর্মী চর্চা প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী করেছেন। আলোচনার বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য মহাভারতের পাশাপাশি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন লেখালেখির প্রসঙ্গও এসেছে। রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভাবনাগত নানা পার্থক্য রয়েছে, এদিক থেকে দুইটি একেবারে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে। কিন্তু আমরা জানি যে ভারতের মতো প্রাচীন একটি জনসমাজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো অবশ্যই ছিল। বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের লেখালেখিতেও এই বিষয়টি জানা যায়। নৃসিংহপ্রসাদ তো আমাদের সরাসরি দেখিয়েছেন রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি থেকে প্রচুর রিপাবলিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মালবেরা যেমন আছে, তেমনই শাক্যরা, মল্লদেশ, বিদেহ, লিচ্ছবি রাজ্যগুলিতেও প্রজাতন্ত্র বজায় ছিল। যেখান থেকে ‘সংঘ’ এবং ‘কোরাম’ প্রভৃতি শব্দগুলি আমরা পেয়েছি, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ আলোচনার বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের একটি রূপরেখা প্রাচীন ভারতেই ছিল।

কোনও একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমানে পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানের ওপর কেন্দ্র করে। সংবিধান প্রদত্ত নিয়মকানুনই হল রাষ্ট্রীয় চালিকাশক্তির মূলাধার। বর্তমানের সংবিধানের

সঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র অথবা দণ্ডনীতিকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। যেখানে আমরা ‘policy-making’ বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীন রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনও পার্থক্য খুঁজে পাই না। আমরা আগের আলোচনাগুলোতে দেখেছি রাজদণ্ডের বিধান থেকে শুরু করে দূত নির্বাচন, বাণিজ্য থেকে শিল্প, কৃষি ও পরিবেশ চিন্তা— সমস্ত কিছুই শাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য থাকে রাজা। বর্তমানে আইন তৈরি করে আইনসভার সদস্যরা এবং আইনের ফাঁকগুলো চিহ্নিত করে দেয় আইন বিশেষজ্ঞরা। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’ও দেখাচ্ছেন যে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় নীতিশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নারদ মুনির অবস্থান। এখানে প্রাচীনকালের নারদ-ই বর্তমানের আইন বিশেষজ্ঞ। যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যথার্থ ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী রূপে গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করছে। অনুরূপভাবে বর্তমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা নানা রকম ভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের ‘ইমেজ’ রাষ্ট্রের মধ্যে এবং বাইরে শক্তিশালী ও স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করে। নারদ রাজার আবশ্যিক ছয়টি গুণাবলী সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছে, বাণিজ্যের কর ব্যবস্থা উন্নতির বিষয়ে নানাবিধ পরামর্শ দিচ্ছে, কৃষি কার্যের উন্নতির বিষয়ে জলাশয় খননের বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে সচেতন করছে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, যে সমস্ত কাজে রাষ্ট্রীয় মুনাফা বেশি কিন্তু খরচ কম— এমন কাজকেই সবার পূর্বে প্রাধান্যের বিষয়ে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব যথার্থ ব্যক্তিকে প্রদান করা, কর্মচারীদের ভাতা ও উপযুক্ত বেতন প্রদান করা, বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে রেখে অথবা নানাবিধ সুবিধা সহযোগে রাষ্ট্রের অনুগত রাখার বিষয়েও নারদের পরামর্শ মহাভারতে রয়েছে— এই সমস্ত বিষয়গুলি মহাভারতের সঙ্গে সমকালীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একেবারে মিলে যায়।

বর্তমানের রাজনীতিতে ‘পার্টিবাজি’ ও ‘দলীয় আনুগত্যে’র মতো বিষয়গুলি যেমন অঙ্গঙ্গিভাবে জড়িত, ঠিক তেমনই মহাভারতের সময়ও এরকম ঘটনা খুবই সাধারণ ছিল। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এই বিষয়ে কৃষ্ণের রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির কথা তুলে ধরেছেন। সাম্রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং নিয়মকানুনের যথার্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে অন্ধক, ভোজ, বৃষ্টি প্রমুখদের সঙ্গে কূটনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক রাখতেই হতো। বিষয়টি হয়েছিল শাঁখের করাতের মতো, কৃষ্ণ সম্পর্ক রাখলেও বিপদ ছিল অথবা না রাখলেও সমস্যায় পড়তে হতো। এক্ষেত্রে নারদের পরামর্শ মতো জ্ঞাতীদের কৃষ্ণ যদি প্রদেয় সম্পত্তি কেড়ে নিত, তাহলেও বিবাদ নিষ্পত্তির বদলে আরও বেড়ে যেত। গণরাজ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিস নেতাদের লোভ। কৃষ্ণও যেমন লোভ থেকে সৃষ্ট জ্ঞাতীদের মধ্যে বিবাদ, ঝগড়া বা অনিষ্টসাধনের প্রয়াসকে একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। ঠিক তেমনই বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধী দল শুধুই মনে করে যে শাসক শিবির প্রশাসনের প্রকল্পগুলি থেকে কেবলই অর্থ লুটছে, সরকারি

শাসনযন্ত্রকে কীভাবে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি প্রকাশ্যে প্রচারের মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারপক্ষকে সর্বদাই চাপে রাখে। এভাবে নৃসিংহপ্রসাদ দেখিয়েছেন কৃষ্ণের ওই সমস্ত জ্ঞাতিরাই বর্তমানে দেশে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বলা বাহুল্য, মহাভারতকে এভাবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারার ক্ষমতা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র মতো কম প্রাবন্ধিকেরই আছে। অসামান্য এই বিশ্লেষণ আমাদের গভীরভাবে সমৃদ্ধ করে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, শিক্ষকদের সঙ্গে মহাভারতের রাজসভায় রাজার সাহায্যার্থে থাকা ব্রাহ্মণের তুলনা টেনেছেন নৃসিংহপ্রসাদ। আমরা এর পূর্বের আলোচনায় দেখেছিলাম রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে মিলিতভাবে প্রশাসন চালানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাজা সাম্রাজ্যের প্রধান, কিন্তু রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিটা ব্রাহ্মণের থেকে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে নারদও এ বিষয়ে একাধিকবার সাবধান করে গেছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এখানেই প্রাচীন রাজতন্ত্রকে দক্ষতার সঙ্গে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমরা দেখি যে আমাদের শাসকদলও জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মসৃণভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও সরকারি পদ বুদ্ধিজীবীদের জন্য বরাদ্দ করে। এই সমস্ত ‘পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালস্’রাই পরোক্ষভাবে সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করে। এভাবেই উভয়ের কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠে। মহাভারতের দ্রোণাচার্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রাহ্মণের প্রকৃত কাজ না করেই দ্রোণাচার্য অর্থ উপার্জনের প্রয়াস করেছিল। সেই কারণেই হস্তিনাপুর রাজসভায় গিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের শিক্ষাগুরু হিসাবে কাজে যোগদান করে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও বুদ্ধিজীবী মানুষেরা রাষ্ট্রীয় সরকারি পদ পাওয়ার পর অধিকাংশই সরকারের কুনজরে পড়ার জন্য সরকারি কাজ ও নীতির সমালোচনা করে না। দ্রোণাচার্যকেও একাধিক অপরাধ সবকিছু জেনেও সহ্য করতে হয়েছে। যথা- জতুগৃহের অগ্নি সংযোগ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবদের বনবাস ইত্যাদি।

‘মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব’- নামের অধ্যায়টি *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি* নামের বইটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূলত এই অংশের ভাবনার ওপরেই বইটির কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। নীতি বা বৃহৎ অর্থে ধর্ম নিয়ে আমরা এর আগে অনেক কথা বলেছি। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর প্রবন্ধে এই নিয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টিকে মহাভারতের পাঠক বা গবেষকের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ধর্ম বা নীতি যাই বলি না কেন আমরা, উক্ত বিষয়টির সঙ্গে ‘ভালত্বের’ গভীর যোগ আছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী বলেছেন:

মহাভারত তাই নীতিকে শাস্ত্র বলে উল্লেখ করে বলেছে— যে যে উপায় অবলম্বন করে মানুষ ভদ্রলোকের আর্থ পথ থেকে সরে যায় না, সেই সমস্ত কিছু বলা আছে আমাদের নীতিশাস্ত্রে.....। এই যে বিশাল ব্যাপ্ত এক নীতির কথা বলা হল মহাভারতে, এটা কিন্তু কোনওভাবেই পাশ্চাত্যের ‘মর্যালিটি’ কিংবা ‘এথিকস্’ নয়।

কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম শব্দটা এমনই একটা বড় ব্যাপার, যা মর্যালিটি এবং এথিকসকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে এবং আমরা দেখেছি— ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সমাজগত সমস্ত বিষয়েই যেটা শৃঙ্খলার কথা বলে, যেটা ন্যায়ের কথা বলে এবং সর্বাধিক মঙ্গলের কথা বলে সেটাই ধর্ম, আবার এমনও হতে পারে—যেটা ব্যবহারিক দিক থেকে ন্যায় বা নীতির মতো শোনাচ্ছে না, বরঞ্চ অন্যায়ের মতোই শোনাচ্ছে, কিন্তু সেটা যদি মানুষের মঙ্গলবিধান করে সেটাই ধর্ম।^{৯৯}

মহাভারতে নীতি বা ধর্ম সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের এই অবস্থানের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত। মহাভারতে নীতি সম্পর্কে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এবং অমলেশ ভট্টাচার্যেরও এরূপ বিশ্লেষণ পেয়েছি আমরা। কিন্তু প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী মহাভারত থেকে প্রচুর উদাহরণ সহযোগে আমাদের ভাবনার রসদ যুগিয়েছেন। আমরা মহাভারতের বিপুল তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করতে গিয়ে ভারতীয় সমাজের উদারতা এবং মহানুভবতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে বিস্মিত হই। কী বলেননি নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী? আমরা একটু এই বিষয়ে এইবার দেখতে শুরু করি।

অণীমাণ্ডব্য মুনির সঙ্গে ধর্মরাজের কথোপকথনে আমরা জেনেছি যে লঘুপাপে অধিক শাস্তি ভোগ করেছে মাণ্ডব্য মুনি। বাল্যকালে অপরাধ করা সত্ত্বেও পরিণত বয়সে সেই অপরাধের ফল ভোগ করতে হচ্ছে, যেটিকে নীতির দিক থেকে একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ বালক বয়সে পাপ ও পুণ্যের বোধ আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জন্মায় না। ভাবনার সেই সূত্র থেকে মুনিবর মহাভারতে উদার হস্তে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত অপরাধকেই দোষ হিসাবে না ধরতে বিধান দিয়েছে, কারণ পাপ ও পুণ্যের ধারণা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে না জন্মালে অপরাধের শাস্তি প্রদান কীরূপে সম্ভব?^{১০০} আমরা সত্যবতীর ক্ষেত্রেও দেখেছি যে বৌমাদের যৌবন যাতে বৃথা না যায় সেই জন্য সত্যবতী পুনরায় বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। নীতি বা ধর্মের গুরুত্ব তখনই আরও বৃদ্ধি পায় যখন বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে পুরনো নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিদায় জানানো হয়। আমাদের উপরের দুইটি আলোচনার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের একটি কথোপকথন উপস্থাপন করেছেন:

ভীষ্ম বলেছিলেন—দ্যাখো বাছা যুধিষ্ঠির! ধর্ম ব্যাপারটাকে তুমি মানুষের জীবন যাপনের বাইরের অন্যতম কোনও অলৌকিক উপাসনা বলে ভেব না। বরঞ্চ ভালোভাবে, সুন্দরভাবে জীবন কাটানোর জন্যই ধর্মের নিয়মগুলি করা হয়েছে— লোকযাত্রার্থম্ এবহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ।^{১০১}

রামায়ণের পাশাপাশি মহাভারতেও অহল্যার ঘটনাটিও স্থান পেয়েছে। নীতির সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সময়ের সঙ্গে তাকেও পরিবর্তিত হতে হয়েছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অহল্যার ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন কীভাবে রামায়ণ ও মহাভারত একই বিষয়কে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। রামায়ণে অহল্যা গৌতম মুনির বৈশ্যধারী ইন্দ্রকে চিনতে পারা সত্ত্বেও মিলনে সম্মতি জানিয়েছে এবং পরে ঋষি গৌতম দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে। এরপর আশ্রমেই সে হাজার বছর ধরে সমস্ত প্রাণীর অলক্ষ্যে দিন কাটায়। কিন্তু মহাভারত এখানে ন্যায় ও নীতিকে উদারভাবে গ্রহণ করেছে। সমাজের প্রয়োজনে, বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে সেই সত্য বা ধর্মকে মহাভারত পুনরায় বিবেচনা করে। মহাভারতে অপরাধের কারণে অহল্যাকে হত্যা করার জন্য পুত্র চিরকারীকে গৌতম আদেশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুত্র মাকে পিতার আদেশে হত্যা না করে নানাবিধ শাস্ত্রীয় বিধি ও নিয়ম অধ্যয়ন করে এক উদার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। চিরকারী বুঝে দেখল যে ব্যভিচার ও কামুকতায় পুরুষেরা অধিক দায়ী, ইন্দ্র ছদ্মবেশে থাকার কারণে অহল্যা তাকে স্বামী ভেবেই নিজেকে সমর্পণ করেছিল। আবার শারীরিক শক্তির দিক থেকে পুরুষেরা অধিক বলশালী হওয়ার কারণে বলাৎকার ও ধর্ষণ পুরুষের ইচ্ছাধীন। তাই পুত্র চিরকারী শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকেই তার কামনা ও পুরুষপ্রবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করে অহল্যার দিকটা ‘পুরুষপ্রবৃত্তির বলি’ হিসাবে বুঝে নিতে চাইল।^{১০২}

মহাভারতের নীতির উদারতার বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অনেক পুরুষ দ্বারা নারী স্পর্শের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেখানে রামায়ণে সীতাকে অন্য পুরুষ দ্বারা অপহরণ ও বলাৎকারের জন্য তৎকালীন সমাজ ত্যাগ করেছিলো। মহাভারত কিন্তু এক্ষেত্রে আধুনিকতার ক্ষেত্রে রামায়ণের থেকে অনেক যোজন এগিয়ে। কেবলমাত্র ‘পুরুষ স্পর্শ’ দোষের ঘটনায় দোষী হলে মহাভারতের নায়িকাদের অবস্থার শেষ থাকতো না। সত্যবতী এবং কুন্তী বিবাহের আগেই পুত্রের জন্ম দিয়েছে, বিয়ের পরেও কুন্তীর তিন পৃথক পুরুষের সঙ্গে মিলনে তিনটি সন্তান হয়েছে। দ্রৌপদীর তো পাঁচজন স্বামীর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে, ঘটনাটিকে আবার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দ্রৌপদীর পূর্ব জন্মে মহাদেবের বরদানের প্রসঙ্গ ব্যাসদেব উপস্থাপন করেছে। এছাড়াও দ্রৌপদীকে কতো পুরুষ স্পর্শ করেছে! দুঃশাসন, দুর্য়োধন এবং জয়দ্রথ তাকে নানাভাবে স্পর্শের দ্বারা অপমানিত করেছে। এগুলো ঘটলেও মহাভারত দ্রৌপদী, কুন্তী এবং অহল্যাকে সতীত্বের আসনে বসিয়েছে। আবার মহাভারত দেখিয়েছে যে কোনও অপরাধের কারণে কাউকে শাস্তি প্রদানের পূর্বে দেখতে হবে এর ফলে বৃহত্তর সমস্যা বা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে কিনা। দ্রৌপদীকে বলাৎকারের পরে যখন শাস্তি প্রদানের জন্য জয়দ্রথকে ভীম একপ্রকার হত্যা করতে চেয়েছিলো, তখন যুধিষ্ঠির গান্ধারী ও দুঃশলা’র কথা ভেবে ভীমকে হত্যায় বাধা দেয়। এভাবেই ‘ভালোত্বে’র যোগের সঙ্গে ধর্মকে সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন প্রাবন্ধিক।

মহাভারতে ব্যাসদেব রাক্ষসদের সঙ্গে মানুষের শারীরিক মিলনেও একেবারে কুণ্ঠাহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছে। রামায়ণের শূৰ্পনখা যেখানে নিজের কামনা জানানোর পরেও, মহাকাব্যে ঠাট্টা ইয়ার্কি ও পরিহাসের বিষয়টি উঠে এসেছে। রাবণের বোনকে কেউই গ্রহণ করেনি; অথচ অনার্য বলে অপমানই করা হয়েছে। অন্যদিকে মহাভারতের কবি রাক্ষসী হিড়িম্বার প্রস্তাব সহজেই মেনে নিয়েছে। কুন্তীর সামনে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে যখন হিড়িম্বা মনের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তখনই মহাভারত বিশাল ভারতবর্ষীয় সমাজের বৈকল্পিক নীতি তৈরি করে ফেলেছে। মহাভারতের এই নীতি ও ন্যায় রামায়ণের ক্ষেত্রে একেবারেই মিলবে না। রামায়ণে রামের পক্ষে শূৰ্পনখাকে বিয়ে করা বা তার প্রস্তাব শান্তভাবে দাঁড়িয়ে শোনা—দুটোই একেবারে অসম্ভব। এরকম আরও দুইটি উদাহরণ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত বরং এড়িয়ে যাওয়াটাই হল ধর্ম বা নীতি। মহাভারতে গান্ধীবের ও অর্জুনের সক্ষমতা নিয়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করার সময় অর্জুন প্রবল ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে হত্যায় এগিয়ে যায়। পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠার জন্য কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে অবশেষে অর্জুন তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের কথাটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিষয়টি হল গান্ধীবের সম্মান রক্ষার্থে যদি যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় ও নীতিই অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এখানে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার থেকেও যুধিষ্ঠিরের বেঁচে থাকাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই ন্যায়। এরই পাশাপাশি আমরা কৌশিক মুনির তপস্যার ঘটনাটিও দেখেছি, যেখানে নীতি বা ধর্মের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে। মহাভারত তাই বলে কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলাটাও ধর্মেরই অপরাধ নাম, যেখানে সত্য কথা বললে চূড়ান্ত বিপদের সম্ভাবনা আছে। এখানে কৌশিক মুনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে নিরপরাধ ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ধরা দেয়। এই সমস্ত দৃষ্টান্তগুলি অমলেশ ভট্টাচার্য থেকে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সবাই ‘নীতি’ ও ‘ধর্ম’ বোঝাতে বলেছেন।

ন্যায়, নীতি ও ধর্মের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী মহাভারতের যুধিষ্ঠির ও যক্ষের কথোপকথনের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাননি। বলা বাহুল্য, মহাভারতের বিশেষ এই অংশটি নৈতিকতা ও ধর্ম ভাবনার অনেক গুরুগম্ভীর ভাবনার জন্ম দেয়। যক্ষকে অবজ্ঞা করে জল পান করার কারণে যখন যুধিষ্ঠিরের সমস্ত ভাইরাই মারা যায়, তখন যক্ষের সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের মাধ্যমে কোনও এক কুন্তী পুত্রের জীবনের পরিবর্তে যুধিষ্ঠির বিমাতা মাদ্রীর এক পুত্রের জীবন প্রার্থনা করে। যুধিষ্ঠিরের এই প্রার্থনা মহাভারতে তাকে প্রজ্ঞা ও ধর্মবোধের নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা জানি যে মহাভারত জীবনের চারটি পুরুষার্থের কথা বলে। এগুলি হলো- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। প্রত্যেকটি ব্যক্তির এই চারটি পুরুষার্থকে সমানভাবে পালন করা আবশ্যিক কর্তব্য, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাজা অর্থকে অধিকতর গুরুত্ব দেবে। কারণ যথাযথ কর ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রপরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব। আবার রাজার মধ্যে মোক্ষ পুরুষার্থ বেশি প্রকট হলেও সেটা সমস্যাডায়ক, বরং মোক্ষ পুরুষার্থ অধিক থাকলে তা রাষ্ট্র পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায়। যাই হোক, রাজ্যের অবস্থা ভেদে কর সংগ্রহের বিষয়টি মহাভারত কীভাবে তুলে ধরেছে তা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমাদেরও মনে হয় এটাই নীতি হওয়া উচিত। সমকালীন করোনা মহামারির ক্ষেত্রেও পৃথিবীর গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে দেখেছি ‘পাবলিক হেলথ এবং MSME/ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে’ বেশি অর্থ খরচ করেছে, কারণ সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে আপাততভাবে সেটাই ন্যায্য বলে মনে হয়েছে।^{১০০} কিন্তু আবার অন্য সাধারণ পরিস্থিতিতে এমনটা না হওয়াই ধর্ম। মহাভারতের দৃষ্টান্তে আসা যাক:

এটা অবশ্যই ঠিক যে, রাজ্য যখন সুস্থিত, রাজকোষ যখন অমলিন, তখন কিন্তু কখনওই প্রজা-পীড়ন করে কোষ বৃদ্ধি করতে বলবে না মহাভারত কিংবা মনু। ওঁরা বলবেন- জেঁক যেমন বুঝতে না দিয়ে রক্ত খায়, মধুকর যেমন পুষ্প পীড়ন না করে মধু খায় অথবা বাছুর যেমন দুধ খাওয়ার সময় গাভী-জননীকে বুঝতেই দেয় না, রাজা ঠিক সেইভাবে প্রজাদের এতটুকুও পীড়ন না করে কর সংগ্রহ করবেন। কিন্তু রাজ্যের বিপদ যদি আসে, তখন কিন্তু রাজার ধর্ম অন্যরকম হয়ে যাবে, বরঞ্চ অন্যরকম না হওয়াটাই অধর্ম হবে। ভীষ্ম বলেছেন- ভালো অবস্থায় ধর্ম একরকম, খারাপ অবস্থায় আর এক রকম.....।^{১০৪}

মহাভারতের রাজনীতি নিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী স্বপ্ন পরিসরে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। তবে মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্য আগাগোড়া রাজনীতিতেই আবৃত। একটু খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারি কোনও কিছুই রাজনীতির বাইরে হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থান, চাওয়া পাওয়া থেকে শুরু করে সমাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধ কৌশল ও নীতি— সর্বত্রই রাজনীতির অবাধ বিচরণ থাকাটাই স্বাভাবিক। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাভারতের অন্যতম ঘটনাগুলিকে ঘিরে বলার চেষ্টা করেছেন কীভাবে ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে এবং এই খেলায় কূটনৈতিকভাবে কারা জয় ও পরাজয় পেয়েছে। খুবই চমৎকার এবং আশ্চর্যপূর্ণ এই মহাভারত। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ পাণ্ডু সিংহাসনে অল্পদিন থাকার পরেও বড়ো ভাইয়ের নগ্ন সাম্রাজ্য ভোগের কামনায় সে রাজ্য ছেড়ে বনবাসে চলে যায়। তার মৃত্যুর পরে পাঁচ ভাই সহ মাতা কুন্তী হস্তিনাপুরে এলেও যুধিষ্ঠিরের যুবরাজ পদে অভিষেক কণ্টকাকীর্ণ হয়ে গেল। সমস্যা ও লোভ এবং হিংসা— থাকতেই পারে। কিন্তু পাণ্ডুর প্রাপ্ত অংশটি পাণ্ডবদের যথার্থই প্রাপ্য ছিল। অন্তত এই বিষয়টিতে সহমত হবে সবাই। সেখানে দুর্যোধন ও

তার ভাইরা সর্বদাই পাণ্ডবদের অত্যাচার করত। ভীমকে বিষ খাইয়ে তো জলেই ফেলে দেওয়া হল। এরপর বারণাবতে তাদের পাঠিয়ে কুন্তী সহ অন্যান্য পাণ্ডবদের মেয়ে ফেলার পরিকল্পনা— একেবারে চতুর রাজনীতির ছবি।

পরবর্তীতে দ্রৌপদীর বিয়ে শুধুমাত্র একটি সামাজিক বন্ধনের ঘটনা হয়ে থাকেনি। দ্রৌপদীর বিয়ের মাধ্যমে পাণ্ডবেরা একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক মিত্রজোট পেল। অন্যদিকে দ্রুপদও এমন একজন জামাই পেল যে নিজে দ্রোণাচার্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে সক্ষম। দ্রৌপদীর বিয়েতে নাহলে এত কঠিন প্রতিযোগিতা রাখার অর্থ আর কি হতে পারে? এটাকে কূটনৈতিক দক্ষ চাল ছাড়া কী বলা যায়? আবার যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, যেটা মহাভারতে রাজা হিসাবে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং গুরুত্ব পরিমাপ করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যেটার মাধ্যমে আর্যাবর্তের বিরাট অংশের ওপর যুধিষ্ঠিরের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হল। এটাতো বড়ো কূটনৈতিক জয়। অপরাজেয় রাজা জরাসন্ধ, যার প্রতাপ ও ক্ষমতাবলে কৃষ্ণও একসময় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই রাজাকে কৌশলে হত্যার মাধ্যমে বন্দী রাজাদের সরাসরি সমর্থন যুধিষ্ঠিরের দিকে আসলো। এগুলো ছাড়াও পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং দুর্যোধনের মৃত্যু সম্পূর্ণ ছিল ও কৌশলের মাধ্যমে করা হয়েছে। যথার্থ সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মতো এই মহারথীদের বধ করা হয়নি, যদিও বৃহত্তর সত্য রক্ষার্থে পাণ্ডবদের এই কার্যকলাপকে আমরা মেনে নিই। তবুও বিষয়টিতে পাঠকের বা গবেষকের প্রতিক্রিয়াতে দ্বিধা ও সংকট দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য গবেষকদের বা প্রাবন্ধিকদের মতো নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও মহাভারতের এই তথাকথিত ‘ধর্মযুদ্ধ’ সম্পর্কে নিজের অবস্থান উপস্থাপন করেছেন। প্রাবন্ধিক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের মতো নৃসিংহপ্রসাদও মনে করেন:

আর যুদ্ধ যখন লাগলই তখন সেই যুদ্ধজয়ের জন্য যদি অন্যায় ছলনার প্রয়োজন হয় কৃষ্ণ তাতেই পিছপা হয় না। যুদ্ধের ব্যাপারে কৃষ্ণ তেমন কোনও মহাকাব্যিক রোমাঞ্চ অনুভব করেননি কোনওদিন, যাতে সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন তিনি। সর্বক্ষেত্রেই যখন বৃহত্তর এবং মহত্তর ধর্ম সাধিত হবে, সেখানে সাধারণ ন্যায়-ধর্ম পরিত্যাগ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। শেষ যুদ্ধের সময় দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের যুদ্ধকালীন অন্যায়াগুলি পরপর আবৃত্তি করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ একটা সাংঘাতিক যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন— আমাদের যে- সব অন্যায়ের কথা তুমি বলছ, তার সবটাই তোমার সমস্ত অন্যায় কাজগুলোর প্রতিশোধ হিসেবে করা হয়েছে।^{১০৫}

তার মানে, বৃহত্তর সর্বতোভদ্র ধর্মের মর্ম অন্য জায়গায়, সেই ধর্মের সাধন পদ্ধতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করা যায়। বারবার এই সংশয় উত্থাপিত হয়েছে যুধিষ্ঠিরের মুখে, অর্জুনের মুখেও।^{১০৬}

মহাভারতের অষ্টাদশী বইটি সমকালীন মহাভারত চর্চার ওপরে গুরুত্বপূর্ণ একটি মহাগ্রন্থ। মহাভারতের নারীদের নিয়ে অনেক গবেষকই এর পূর্বে মৌলিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন। ধীরেশ ভট্টাচার্যের মহাভারতের নারীকে আমরা এই প্রসঙ্গে উত্থাপনের চেষ্টা করব। ২০১৬ সালে দিল্লির সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃপক্ষ মহাভারতের অষ্টাদশী বইটিকে পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মান জানিয়েছে। বইটিতে কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সত্যবতী, উর্বশী, শিখণ্ডী এবং সুভদ্রার মতো মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রগুলির পাশাপাশি উত্তরা বা মাধবীকে নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখিয়েছেন যে মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে ঘৃণা ও ভালোবাসা, জুগুন্সা, ক্রোধের মতো বৃত্তিগুলি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, আধুনিক বিশ্বেও তা সমানভাবে অপরিবর্তনীয়। এই শতকে দাঁড়িয়ে তিনি মহাভারতের নতুন একটি লিখন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে নারী স্বাধীনতা ও নারী যৌনতার যে কাহিনি রয়েছে সেগুলি আজ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখাতে চেয়েছেন যে ব্যাস বা বাল্মীকি যা লিখে গিয়েছেন তা কোনও সরল বই একেবারেই ছিল না। মানবমনের অত্যন্ত জটিল অলিগলিতে ঘোরাঘুরি এই পৌরাণিক চরিত্রের। আধুনিক যুগের মানসিক জটিলতার সঙ্গে পুরাণকে মিলিয়ে দেখার জটিল কাজটিই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন নৃসিংহপ্রসাদ। প্রধান ও অপ্রধান যে আঠারোটি চরিত্র তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে সেগুলি হল- উর্বশী, শকুন্তলা, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা, সত্যবতী, অম্বা-শিখণ্ডিনী, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, হিড়িম্বা, দ্রৌপদী, উলূপি ও চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা, সুদেষ্ণা, লোপামুদ্রা, মাধবী এবং উত্তরা। প্রাচীন ভারতের নারীদের নিয়ে যারা বিদ্যায়তনিক চর্চায় নিজেদের গবেষণাকে উচ্চ স্থানে রাখতে পেরেছেন, তাদের অনেকের মধ্যেই বিশেষ করে মার্কসীয় ঘরানার প্রাবন্ধিকেরা অনেক সময়েই জোর গলায় বলে গেছেন যে ভারতীয় মহাকাব্য বা প্রাচীন ভারতের নারীদের স্বাধীনতায় পুরুষ হস্তক্ষেপের বিষয়টি। আমরাও উক্ত বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করছি না। তবে মহাকাব্যের নারীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য গভীরভাবে তৎকালীন সামাজিক কাঠামো, সমাজ জীবনের নানা স্তর, রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাসের ও আস্থার মাত্রা, সামাজিক বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রভৃতির মতো বিষয়গুলিকে ছেড়ে চলে গেলে হবে না। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ীর মহাভারতের অন্যান্য বিষয়গুলির মতো মহাভারতের নারীদের নিয়ে আলোচিত মহাভারতের অষ্টাদশী এখানেই বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে বলে আমাদের মনে হয়। কত গুরুত্বপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একটি চরিত্রকে আগাগোড়া গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক, তা এই বইটিকে দেখলেই বোঝা যায়।

মহাভারতের যে নারী চরিত্রটিকে বইতে প্রথমেই স্থান দিয়েছেন প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী, তা হল স্বর্গের অঙ্গরা উর্বশী। মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রগুলির মধ্যে উর্বশী হয়তো কাহিনিতে এসেছে অল্পই, কিন্তু তার জীবন চিত্র বর্ণনায় উর্বশীর রূপ ও মননের যে বিশাল চমৎকার দিকটি মহাভারতে এসেছে, যেখানে বৈদিক ঋকমন্ত্র থেকে মহাভারত পর্যন্ত তার সম্ভোগ বিরহের সুর চিরন্তনী এক প্রেমিকা সত্তার বিস্তারের মাধ্যমে পরিশেষে বিশ্রান্তি লাভ করে জননীত্বের পরিসরে, এখানেই মহাভারতে উর্বশী অন্যান্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। নৃসিংহপ্রসাদ পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর বিচ্ছেদের একটি বিরহ-পদাবলী এই বইতে স্থান দিয়েছেন, যেখানে সত্যিই আমরা অভিভূত হয়ে যাই। কারণ খ্রিস্ট জন্মেরও আগে এরকম অসামান্য বিরহ কবিতা আমরা আমাদের সাহিত্যে লিখেছি।

পুরুরবা বললেন- তুমি যখন আর ফিরে আসবে না, তবে পতন হোক তোমার প্রণয়ীর। সে যেন আর কোনওদিন দাঁড়ানোর শক্তি না খুঁজে পায়— সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ। পরাবতং পরমাং গন্তবা উ। সে যেন কালরাত্রির কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত নেকড়েয়া যেন খেয়ে নেয় তাকে। উর্বশী এতকালের সহবাস চেতনায় সাস্তুনা দিলেন রাজাকে। বললেন- পুরুরবা! অমন করে বোলো না তুমি। এমন করে মরণ চেয়ো না। তুমি কি জানো না— মেয়েদের হৃদয়টাই নেকড়ের হৃদয়ের মতো, মেয়েদের ভালোবাসা স্থায়ী হয় না^{১০৭}

কবিতার গভীরতায় আমাদের অবাক হতেই হয়! বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ বিপ্রলম্বগুলির সঙ্গে এর তুলনা টানা চলে। উর্বশীকে নিয়ে কতোই না গভীর গবেষণা করেছেন প্রাবন্ধিক! উর্বশী কোথায় অন্যান্য অঙ্গরাদের থেকে আলাদা?, উর্বশীর বিভিন্ন কলায় পারদর্শিতার প্রসঙ্গটি, স্বর্গে দেবতাদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি জননীত্বের ভূমিকার দিকটি, উর্বশীর জন্মের উপাখ্যান, পুরুরবার সঙ্গে প্রেমের ইতিকথা এবং উর্বশীর স্বর্গ থেকে অভিশাপের যাবতীয় ঘটনাগুলি বিস্তারিতভাবে প্রাবন্ধিকের লেখায় পেয়েছি।

উর্বশীর পর নৃসিংহপ্রসাদের আলোচনায় আমরা শকুন্তলাকে পেয়েছি। মহাভারতের রাজা দুশ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম কাহিনি তো আমরা জানি। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী কালিদাসের ও মহাভারতের দুটো উপাখ্যানের মধ্যে বিস্তারিত তুলনা টেনেছেন। মণিকার যেমন অঙ্গর কলুষিত পাথরের অংশটিকে অত্যন্ত যত্নে আলোক বিচ্ছুরণক্ষম উজ্জ্বল হীরের খণ্ডে পরিণত করেন, কালিদাসও তেমনি পুরাণ-ইতিহাসের আকর থেকে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট শকুন্তলাকে তুলে এনে বৈদগ্ধ্য ও ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করে নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এখানে কালিদাসের নাটকে আমরা পেয়েছি মধুর রসের পরিসর এবং প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরের নানা রঙের ছবি। অন্যদিকে মহাভারতের কবির আয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক প্রসারিত। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখিয়েছেন এই

ভারতযুদ্ধ, কিংবা ভরত-বংশ যে বংশের নামে আমরা আমাদের দেশ ভারতকে স্মরণ করি, একতাসূত্রে আবদ্ধ হই, সেই সর্বদমন ভরতের প্রথম জীবন এবং তার পিতা-মাতার ইতিহাস কেমন ছিল— এটাই মহামতি ব্যাসদেবের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এই কারণেই মহাভারতের দুশ্মন্ত যখন অরণ্যে বেরোচ্ছে, সেই সময়ের রাজার বিভিন্ন বাহিনী ও অস্ত্রের বর্ণনাই ব্যাসদেব অনেকটা অংশ জুড়ে করেছে। রাজার রাজকীয় মৃগয়াতে যাত্রাই এখানে প্রধান। কালিদাসের শকুন্তলা গর্ভবতী অবস্থায় দুশ্মন্ত দ্বারা অপমানিত ও তিরস্কৃত হবার পরে পাঠক ও শ্রোতার মনে শকুন্তলার প্রতি করুণা ও সমবেদনা জেগে ওঠে। কিন্তু নৃসিংহপ্রসাদ স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে ব্যাসদেবের শকুন্তলা নিজেই নিজের ভার বহিতে জানে। এক্ষেত্রে দুশ্মন্ত নিজের পূর্ব অপরাধগুলি অস্বীকার করলে মহাভারতের শকুন্তলা বলেছে যে রাজা জেগে ঘুমোচ্ছে। কালিদাসের শকুন্তলা রাজসভায় অপমানের পর লজ্জা ও দুঃখে সভাঘর যেখানে ত্যাগ করেছিল, ঠিক সেখানেই মহাভারতের শকুন্তলা নিজেই রাজাকে একগুচ্ছ কঠিন বাক্য বলে নিজেই রাজসভা ত্যাগ করে। মহামতি ব্যাসদেবের শকুন্তলা এক্ষেত্রে নির্ভীক, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী। আমরা অবাক হয়ে যাই প্রাবন্ধিকের সূক্ষ্ম ও জ্ঞানগর্ভ এই আলোচনায়।

মহাভারতের দেবযানীকে নৃসিংহপ্রসাদ তৎকালীন সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ পরিবারগুলিতে যে অতিরক্ষণশীলতা ও নারী স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ছিল, সেগুলিকে দেবযানী কালের বিপরীতে গিয়ে নিজেই কাটিয়ে উঠেছিল। মহাভারতে তিনিই অন্যতম রমণী যে ব্রাহ্মণকন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজেই নিজের পছন্দসই পুরুষ নির্বাচন করেছে। এই বিষয়টি কচ এবং যযাতির উভয়ের ক্ষেত্রেই খাটে। অন্যদিকে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর বিরোধের যে সম্পর্ক তাতে শেষ পর্যন্ত যযাতির জরা কীভাবে এবং কেন শর্মিষ্ঠার ছোট ছেলে নিল এবং যযাতির এই রাজনৈতিক চাল কীভাবে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির যাবতীয় উত্তরাধিকারী যযাতি-শর্মিষ্ঠার বংশের ছেলেদেরই হস্তগত হল— সেই রাজনৈতিক দিকটি আমাদের নৃসিংহপ্রসাদের ব্যাখ্যা বুঝতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয়ের যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মহাভারতে বারবার দেখা গেছে তারই অন্যতম একটি কাহিনি এখানে আমরা পাই। তাই প্রাথমিক অবস্থায় শুক্ৰাচার্যের মেয়ে দেবযানীকে বিবাহে যযাতি বাধ্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত পরিপূরক সঙ্গী হিসেবে শর্মিষ্ঠার মধ্যেই নিজের মুক্তি খুঁজে পেয়েছে। এভাবেই প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রাহ্মণ অসুর গুরু শুক্ৰাচার্যের কন্যা দেবযানী যেখানে আপন বংশ গৌরবে ও অহংকারে প্রায় আজীবন নিজের জেদ ও প্রভাব বজায় রেখে চলেছিল, সেই দেবযানী জীবনের শেষ পর্যায়ে পরাজিত হল তারই একদা খেলার সঙ্গী ও দাসী শর্মিষ্ঠার কাছে। এভাবেই চিরকাল অন্তরালে থাকা শর্মিষ্ঠা এবং তার পুত্ররা সম্মিলিতভাবে দেবযানীকে পরাজিত করে নিজেদের রক্তের বংশধারা বজায় রাখল। যে বংশ থেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রজানুরঞ্জক রাজারা এসেছে। এরা হলো যথা— দুশ্মন্ত, ভরত এবং কুরু প্রমুখেরা।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সত্যবতীর কথা বলতে গিয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গ চমৎকার উত্থাপন করেছেন। সত্যবতীকে আমরা সাধারণত উপরিচর বসু'র কন্যা হিসেবেই জানি। কিন্তু প্রাবন্ধিকের গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সত্যবতীর পিতা উপরিচর মহাভারতের সময়ের অনেক পূর্বের মানুষ, ভারতবর্ষের আর্যায়ণের সময়ে চৈদি দেশের প্রতিষ্ঠার সময় উপরিচর বসু'র নাম পাওয়া যায়। মহামতি ব্যাসদেব যেহেতু সত্যবতীকে 'বাসবী' নামে অভিহিত করেছে, অন্যদিকে মহাভারতের মধ্যে উপরিচরের সমস্ত পুত্রকেই একাধিকবার 'বাসব' নামে ডাকা হয়েছে। সুতরাং পরবর্তী কালের এই সমস্ত পুত্রদেরই কোনও এক বংশের কোলে সত্যবতীর জন্ম। প্রাবন্ধিকের সত্যবতী সম্পর্কে অপর দুইটি অন্বেষণ আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যেখানে সত্যবতীকে দক্ষ কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখানো হয়েছে, কারণ শান্তনুর অবর্তমানে ভীষ্ম ও রাজমাতা সত্যবতীই পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শে সাম্রাজ্য চালিয়েছে। পুত্র বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে সন্তান উৎপাদনের বিষয়ে ভাবনা সত্যবতীই ভেবেছিল। পুরো বিষয়টাই তৎকালীন সময়ের রাজধর্ম অনুসরণ করেই করা হয়। রাজার অবর্তমানে সাম্রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই যে ভাবনার পরিচয় পাই এখানেই সত্যবতীর দূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। তার রাজ প্রশাসন পরিচালনার বিষয়েও দক্ষতার পরিচয় আমরা পাই। সত্যবতী চরিত্রের অপর একটি দিক মহাভারতের পাঠক বা গবেষককে খুব আকর্ষণীয় করে। এটি হল সম্পদ ভোগের জীবন থেকে ত্যাগের ও মোক্ষের অভিমুখে যাত্রা। সত্যবতী চরিত্রের এই দিকটি প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সত্যিই তো শুধুমাত্র তার সন্তানরাই ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকার পাবে—এই নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই শান্তনুকে সে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তার সেই ভোগের জীবন বেশিদিন টেকেনি, তাই কৌরব বনাম পাণ্ডবদের দ্বৈরথ পূর্ণরূপ ধারণ করার আগেই ব্যাসদেবের পরামর্শে জীবনের পরের অংশটি অরণ্যে ঈশ্বর সাধনায় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায়। এই যে রাজমাতা বা রাজমহিষীর ভোগবিলাসী জীবন থেকে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনীর মতো জীবনে গমন—এটাই তো প্রাবন্ধিক ভাদুড়ীর মতো আমাদের কাছেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাগে। জীবনের চরম সারসত্য তো এটাই।

প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর বইটিতে গান্ধারী ও কুন্তী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের সার্বিকভাবে চরিত্র দুটির মানসিক টানাপোড়েন ও জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে। মহাভারতের একজন মুক্তমনা গবেষক হওয়ার জন্য প্রাবন্ধিক চরিত্রগুলিকে বুঝতে গিয়ে খুঁজে দেখেছেন কুন্তীর শৈশবের অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনার কথা, কিশোরীবেলার মানসিক সংকট, নিজের পুত্রদের যাবতীয় সম্পত্তির ন্যায়গত অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত বিষয়টিকে স্মরণ করানো এবং রাজধর্ম বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। অন্যদিকে গান্ধারী চরিত্রের ক্ষেত্রেও

ভাবনার দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের ক্রম পরিবর্তনশীলতার দিকটিও উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী গান্ধারীকে নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন-

এমন বলা যায় না যে, তিনি সীতা-সাবিত্রীর মতো সতী, কেননা তিনি তাঁদের চেয়েও বেশি সতী, অথচ অন্যার্থে তিনি তাঁদের মতো সতী ননও, কেননা মাঝে- মাঝেই তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে ভীষণ রকমের প্রতিবাদিনী, যা তথাকথিত সতীত্বের মুখে ঝাঁটা মারে। সার্থক এক জননী হিসেবেও তাঁর স্নেহের অন্ত নেই, অথচ এই স্নেহের ধারা এমনই বিচিত্র যে, তাঁর নিজের ছেলেরাই তাঁর স্নেহের বিষয়ে সংশয়িত, অথচ অন্যের ছেলেরা সেই স্নেহে আশ্রিত। আরও অদ্ভুত হল- তিনি নিজের ছেলেদেরও ক্ষমা করেন না, আবার অপরের ছেলের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদেরও তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না।^{১০৮}

গান্ধারীকে অনেক গবেষকই ভেতর থেকে চেনেননি। গান্ধারীর মনের উপর ধৃতরাষ্ট্রের প্রভাব বেশ জোরালোভাবেই প্রথম দিকে পড়েছে। যার ফলে যুদ্ধশেষে যে রমণী ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধের পূর্বে আশীর্বাদস্বরূপ বলে ‘ধর্মের জয় হোক’, সেই গান্ধারীই প্রথম জীবনে ধৃতরাষ্ট্রের কথায় কৌরবদের ও স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বঞ্চনার এবং অন্যায়ের বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল। এই বিষয়ে গান্ধারী তৎকালীন রাজধর্মের বিষয়ে একেবারে এড়িয়ে গেছে, অথবা সে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তৎকালীন সামাজিক বিধান কী ছিল— তা জানত না। যাবতীয় অন্যায়গুলি যা কৌরবেরা ও শকুনি প্রথম জীবনে পাণ্ডবদের ওপর করেছে, সেগুলি থেকে বিরত থাকার উপদেশ গান্ধারী দেয়নি। দ্রৌপদীর ওপর হওয়া অন্যায়ের চরমতম প্রতিবাদ করতেও আমরা তাকে দেখিনি। যদিও বস্ত্রহরণের শেষ পর্যায়ে এসে কৌরবদের চরমতম অন্যায়টি গান্ধারী ধরিয়ে দিয়েছে। আবার অনেক সময়ই গান্ধারী দুর্যোধনদের বেশি প্রশ্রয় ও অন্ধ স্নেহ দেওয়ার কারণে ধৃতরাষ্ট্রের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেও বটে। এই গান্ধারী আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধীও ছিল, যেহেতু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তার সচেতনতা পূর্ণমাত্রাতেই বহাল ছিল। মহাভারতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পাল্টে যাওয়া একটি চরিত্র, যা প্রথম জীবনের ধৃতরাষ্ট্রের প্রভাব কাটিয়ে ক্রমশ ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে যাত্রা করেছে অথচ পুত্রস্নেহ ও স্বার্থভাবনা এমনই বিষম বস্তু, যা জীবনভর লালিত ধর্মচিন্তাকেও বিদ্ধ করে ফুটে ওঠে—মহাভারতের গান্ধারী চরিত্রটির মধ্যে এই দ্বৈরথ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অন্যদিকে কুন্তী চরিত্রের ক্ষেত্রেও শৈশবকাল থেকেই বঞ্চনার বিষয়টি তার চরিত্রকে আকার দিয়েছে। কুন্তী চরিত্রের সংকটপূর্ণ এই অবস্থান নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কারণ শৈশবের এই বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস পরবর্তীকালে তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী যথার্থই বলেছেন তাঁর গ্রন্থের মধ্যে:

কুন্তী বলেছেন— বাবা এবং শ্বশুর— দুই পক্ষই আমাকে বঞ্চনা করেছে, আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী, দুঃখের চূড়ান্ত হয়েছে আমার.....।^{১০৯}

অভিমান হচ্ছে— যার পিতা সেই শৈশব অবস্থায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করে একটি শিশু কন্যাকে অন্যের কাছে দত্তক দিয়েছেন, তার আর জীবনের মূল্য কী.....। অথবা কুন্তী তাঁর পিতার ওপর অভিমানে তাঁর জীবনের ঘটনার শৃঙ্খল অন্যভাবে সাজাতে চান—অর্থাৎ যদি তাঁর পিতা কুন্তীভোজকে দত্তক না দিতেন, তাহলে স্বয়ম্বরসভায় পাণ্ডু আসতেন না, যদি পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হত, তা হলে..... ইত্যাদি ইত্যাদি।^{১১০}

প্রাথমিক ভাদুড়ী কুন্তীর সন্তান ত্যাগের বিষয়টিতে স্বাভাবিকভাবেই দোষ দেখতে পাননি। সত্যিই তো কুন্তীর এছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল না। সদ্য কিশোরী অবস্থা থেকে যৌবনে পদার্পণ কালে ঋষি দুর্বাসা স্বাভাবিক দিনযাপনে কুন্তীর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক ভাদুড়ী কুন্তী চরিত্রকে আগাগোড়া দেখতে গিয়ে এই বিষয়টি অদ্ভুতভাবে খেয়াল করেছেন:

শৈশব এবং প্রথম যৌবনের দুই ধরনের অবরুদ্ধ শোক কুন্তীর মনোজগৎ তৈরি করেছিল এমনই এক গভীরতর মিশ্রক্রিয়ায়, যাতে মহাকাব্যের কবি তাঁকে আরও বহুতর কষ্টের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কুন্তীকে যদি বুঝতেই হয়, তবে শৈশবে তাঁর পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চনা এবং নবযৌবনের আরম্ভেই তাঁর অনীক্ষিত কৌতুক-সঙ্গমে তথা সন্তান ত্যাগের নিরুদ্ধ বেদনা—এই তিনের বিচিত্র বিষমাস্বয়ের নিরিখেই তাঁকে দেখতে হবে, নচেৎ তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ ভুল হবে, তাঁর চরিত্রে আসবে অনর্থক আরোপ, যা মহাকাব্যের কবির হৃদয় না বোঝার সামিল।^{১১১}

নিজের সন্তানদের যথাযথভাবে দায়িত্ব এবং প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা কুন্তী চরিত্রের অন্যতম একটি জোরালো দিক। রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্পর্কে উত্তেজিত করে রাখার জন্য বিদুলা ও সঞ্জয়ের আখ্যান সন্তানদের বলেছে কুন্তী। নীতি ও ন্যায় সম্পর্কে কতোই না গভীর ধারণা থাকলে সন্তানের মা বাচ্চাদের এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে। নৃসিংহপ্রসাদের *মহাভারতের অষ্টাদশী* বইয়ের এই অংশটি আমাদের মহাভারতে চর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

আসলে কুন্তীও আর এই দান চান না। যিনি রাজরানি ছিলেন তাঁর ছেলেরা বনবাসের দীন প্রকোষ্ঠ থেকে পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করবেন আর দুর্যোধন সেই দান করবেন—দুর্যোধনের এই মর্যাদার ভূমিকা কুন্তী সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তী মনে করেন— ভাল কথা বলে, রাজ্যের অগ্ন্যাংশমাত্র গ্রহণের প্রস্তাব করে দুর্যোধনকে কিছুই বোঝানো যাবে না।.....। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— তুমি যে পূর্বে রাজা হয়েও ঋষিদের মতো পরম ত্যাগের মহাত্ম্যে নিজেকে বেশ রাজর্ষির কল্পনায় স্থাপন করেছ, তুমি জেনে রাখো এটা রাজর্ষির ব্যবহার নয়। তুমি যদি ভেবে থাকো যে, কোনওরকম নৃশংসতা না করে নিষ্কর্মার মতো বসে বসেই প্রজাপালনের ফল

পাওয়া যাবে, তা হতে পারে না।.....। তাঁর বক্তব্য— বাপ ঠাকুরদার মান আর ডুবিও না
যুধিষ্ঠির, তুমি রাজা ছিলে, অতএব রাজার মতো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তোমার একান্ত
ধর্ম.....। ১১২

মহাভারতে অম্বার শিখণ্ডী হয়ে ওঠার যে আখ্যান আছে, সেটি সচেতনভাবে আধুনিকতার
দৃষ্টিতে দেখতে চাওয়া হয়েছে। বিশ শতকের অনেক প্রাবন্ধিকই বলে থাকেন অম্বা থেকে শিখণ্ডী
হয়ে ওঠার পেছনে নাকী লিঙ্গ প্রতিস্থাপনের কারণ থাকতেও পারে। এখানে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র
বিশ্লেষণে একটি চমৎকার তথ্য পেলাম আমরা, যেখানে প্রাবন্ধিক বলতে চাইছেন যে পুরুষের
বিদ্যাশিক্ষা লাভের পর থেকেই তার আচরণ পুরুষ সুলভ হয়ে যায়। তাই শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব
একেবারেই লিঙ্গকেন্দ্রিক নয়, তা হল স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ-স্বভাবের মিশ্রচারিতায়। একেবারে
নতুন একটি ভাবনার পরিসর এটি।

অন্যান্য অপ্রধান নারীদের মধ্যে আরও কিছুজনের নাম না বললেই নয়। যেমন ধরা যাক,
হিড়িম্বা’র প্রসঙ্গ। মহাভারত ভীম ও হিড়িম্বা’র বিয়ের মধ্যে দিয়ে চরম উদারতা দেখিয়েছে,
মহাভারতের অন্যতম অসবর্ণ বিবাহ এটি। যেখানে আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র দৈহিক কামনায়
মুক্তমনে ভীমকে রাক্ষস রমণী কুন্তীর কাছে একপ্রকার ভিক্ষা চাইছে। এই রাক্ষস সুন্দরী
পাণ্ডবদের প্রথমা কুলবধু এবং তার মতো মহাকাব্যিক উপেক্ষিতা খুব কম জনই আছে। যুধিষ্ঠির
ও ভীমের শর্ত সে এতটাই মেনেছিল যে, সতিই পুত্র ঘটোৎকচের জন্মের পর তাকে আর দেখতে
পাওয়া যায় না। মূল মহাভারতে হিড়িম্বা যেহেতু একেবারেই উপেক্ষিতা তাই কাশীরাম দাসের
মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী
কাশীরামের মহাভারতের উক্ত জায়গাটি যেমন এক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন, ঠিক তেমনই সংস্কৃত
নাটক ভাস্কর *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকের প্রসঙ্গও সমানভাবে নিয়ে এসেছেন।

অর্জুনের অন্যতম দু’জন স্ত্রী উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে এই দুই পত্নী
হয়তো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন তাঁর ‘ভারতকথার গ্রন্থিমোচন’ নামের প্রবন্ধে
মহাভারতের ভারতযুদ্ধকে সোমযাজ্ঞী বনাম অগ্নিহোত্রী’র মধ্যে বিরোধ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।
উলূপী যেহেতু নাগজাতির প্রতিনিধিত্ব করে তাই প্রাথমিকভাবে মহাভারতে নাগ কারা? — এই
নিয়ে শুরুতে নৃসিংহপ্রসাদ কিছুটা বলেছেন। বিধবা উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়েছিল অথবা
হয়নি— এই নিয়ে উৎকৃষ্ট একটি যুক্তির কাটাছেঁড়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ
করেছেন। যেখানে স্পষ্টই দেখানো গেছে যে নাগকন্যার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহের ঘটনা যথার্থই
এবং তাদের পুত্রই ইরাবান। এক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো প্রমাণ হলো অশ্বমেধ যজ্ঞ, কারণ বিবাহিত
স্ত্রীর মর্যাদা না থাকলে এরকম প্রকট ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণের বিষয়টি উঠে না। তবে আমরা

এর পূর্বেও বলেছি মহাভারতের যুগে যৌন স্বাধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে, যেখানে চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী উভয়ই অর্জুনের প্রতি নিজেদের কামনা জানিয়েছে। তবে অর্জুনের প্রতি এই দুই পত্নীর মধ্যে উলূপীর সমর্পণ অবশ্যই চিত্রাঙ্গদার থেকে অধিক ছিল। কিন্তু অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে অধিক ভালোবেসেছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এই বিষয়ে আমাদের মনে করিয়েছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা, যেখানে ইরাবান পাণ্ডবদের জয়ের জন্য নিজে যুদ্ধ করেছে অথবা উলূপী তাকে পাঠিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। সুতরাং উলূপীর ভালোবাসা এক্ষেত্রে অনেক গভীর। অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বক্রবাহন যুদ্ধে আসেনি অথবা প্রাণ সংশয়ের কারণে চিত্রাঙ্গদা তাকে পাঠায়নি।

কৃষ্ণের অন্যতম দুইজন স্ত্রী হল রুক্মিণী ও সত্যভামা। এদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী চমৎকার এক তুলনা টেনেছেন। একদিকে রুক্মিণী কোনওরকম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ছাড়াই কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে সমর্পিত করেছে, কৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদাই চিন্তিত সে। কিন্তু কৃষ্ণ যেহেতু সাধারণ পুরুষ নয়, তাই শুধুমাত্র প্রেমিকার পূর্ণরূপে সমর্পণ ও ভালোবাসাই কৃষ্ণের মতো পুরুষের মন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যে প্রেম ও ভালোবাসা এবং চরিত্রের বহুমাত্রিক দিক কৃষ্ণ সত্যভামার কাছে পেয়েছিল। এই সত্যভামাকে যথার্থ অর্থেই কৃষ্ণ সহধর্মিণী মনে করেছে, কারণ যুদ্ধ থেকে রাজনীতি প্রত্যেকটি স্থানেই সে কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতাই তাকে অন্য কৃষ্ণ পত্নীদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এক্ষেত্রে যথার্থই বলেছেন:

বস্তুত তিনি রুক্মিণীর কাছে দাসীবৎ আচরণও আশা করেন না, প্রচুর রতিভোগও কামনা করেন না, তাঁকে অনুগত রাখার জন্য কোনও বলপ্রয়োগও করেন না। তা হলে কী অসুবিধে হল? অসুবিধেটা আসলে সেই বৈবাহিক শাস্তিকতার মধ্যেই যেখানে পথ চলতে চলতে পুরুষ রমণী দুই পক্ষেরই কিছু সাংবিধানিক স্ববিরতা আসে, যেখানে প্রতিপদেই সহজলভ্যতা জীবনের সমস্ত নূতনত্বকেও প্রাত্যহিকতায় পরিণত করে।..... রুক্মিণী শুধু লক্ষ্মী হয়েই রইলেন কৃষ্ণের কাছে, নিবেদিতপ্রাণা চিরন্তনী।^{১১৩}

হায় কৃষ্ণ! তোমার অন্তঃপুরের বৈদর্ভী রীতিতে তোমার মন ভরল না। কিন্তু যে প্রণয়, মানিনীর যে অভিমান ঠোঁট ফোলা, অরুণ অপাঙ্গ— এত যা সব তুমি দেখতে চেয়েছিলে প্রিয়তমার মধ্যে, তা তুমি রুক্মিণীর মধ্যেও পাওনি, জাম্ববতীর মধ্যেও পাওনি, কিন্তু যার কাছে পেয়েছিলে, সে তো তোমার অতি পরিচিতা দ্বারকারই মেয়ে। সত্যভামা।^{১১৪}

মহাভারতে লোপামুদ্রার চরিত্রটি একেবারেই বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী পড়েছেন। নৃসিংহপ্রসাদের প্রবন্ধের মধ্যে এরকম অনেক ব্রাহ্মণ পত্নীর উদাহরণ আমরা পাচ্ছি, যেখানে যাদের জীবনের অনেক চাওয়া পাওয়াই অধরা থেকে গেছে। লোপামুদ্রা চরিত্রটির ক্ষেত্রেও

একথা অনস্বীকার্য। ব্রাহ্মণ বাড়িতে কঠোর জীবন ও নানাবিধ ব্রতের মধ্যে অনেক নারীই জীবনভর জড়িয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য ব্রাহ্মণ রমণীদের মতো লোপামুদ্রার জীবনেও নিজের ইচ্ছা, কামনা, চাহিদা ও যৌন স্বাধীনতা অপূর্ণই থেকে গেছে। রমণীদের এই চিরন্তনী মানবিক প্রবৃত্তিগুলি মহামতি ব্যাসদেব বুঝেছিলেন বলেই মহাভারতের মধ্যে বিষয়টিকে স্থান দিয়েছে। প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধের অনেক উদাহরণ থেকে একটি না বলে পারছি না আমরা।

এও মনে হয়— সেদিন বুঝি কোনও আকালিক চৈত্রী সন্ধ্যা ছিল, হয়তো উতলা হাওয়াও কানে কানে কথা কয়েছিল কিছু, ঋষি পত্নী লোপামুদ্রা আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। সামনে বসা তপস্বী ঋষি অগত্যকে দেখে তিনি সঙ্কোভে বলে উঠলেন—আমার জীবনের কতগুলি শরৎকাল চলে গেল। প্রতিটা দিন, প্রতিটা রাত্রি আমি তোমার সেবা করতে করতে শ্রান্ত- ক্লান্ত হয়ে গেছি।.....অতএব সমস্ত নারীকুলের জন্য লোপামুদ্রার এই প্রার্থনা—পুরুষই যেন বুঝে নেয় তার স্ত্রীর ইচ্ছে, সে যেন নিজেই সব বুঝে নিয়ে রমণীর অভীষ্ট পূরণ করে এবং প্রতিটি পুরুষই যেন তার আচার-বৃত্তি, ব্রহ্মচর্য সংযম মাথায় তুলে রেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সঙ্গত হয় যৌনমিলনে।^{১১৫}

মহাভারতের মাধবী চরিত্রটিকেও নতুনভাবে আমাদের ভাবতে সাহায্য করেছেন প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী। মহাভারতে গালব ও মাধবীর যে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে, যেখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বল প্রয়োগে নাকী মাধবী নিজের যৌবন সমর্পণে বাধ্য হয়েছে— একথা বিশ শতকের অনেক মহাভারত গবেষকই বলে থাকেন। কিন্তু এর সম্পূর্ণ উল্টো একটি বিশ্লেষণ নৃসিংহপ্রসাদের লেখায় পাই। মহাভারতের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণই একে মহাভারত করে তুলেছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে, মাধবী নিজের ইচ্ছায় এতগুলি বিবাহ ও যৌন মিলন উপভোগ করেছে। কেউ তাকে মিলনে বাধ্য করেনি। অকারণে তর্কের ফল যে এরকম ভয়াবহ পর্যায়ে নেমে যেতে পারে, তার যথার্থ উদাহরণ সংশ্লিষ্ট এই আখ্যান। মাধবীকে নিয়ে নৃসিংহপ্রসাদের’র অন্য একটি পর্যবেক্ষণ আমাদের খুব ভালো লেগেছে, তা হলো মাধবীর আসক্তি থেকে নিরাসক্তিতে যাত্রা। একটা ভয়ংকর সর্বগ্রাসী আসক্তি থেকে হঠাৎই একটা নিরাসক্তিতে চলে যাওয়া, আসক্ত হয়েও অনাসক্ত থাকা— এই অসম্ভব ‘অ্যাবান্ডান্’ মহাভারতের অনেক চরিত্রের মধ্যেই দেখা গেছে। এই বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী পরাশর ও সত্যবতীর মিলনের কথা বলেছেন এবং কুন্তীর সূর্য সম্ভোগের কথা বলেছেন।

মহাভারতের অন্যান্য অপ্রধান নারী চরিত্রগুলির মধ্যে উত্তরা, সুভদ্রা, সুদেষ্ণাকে নিয়ে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর বইতে আলোচনা করেছেন। মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে এই চরিত্রগুলি হয়তো খুব কমই উঠে এসেছে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ অত্যন্ত সাড়া জাগানো এবং বহুল সমালোচিত একটি বই। মহাভারতের কৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের সমাজে ও বিদ্যায়তনিক স্তরে নানা ভাবনা আছে। তবে বেশিরভাগ সময় আমরা আমাদের প্রকল্পের মতো করে শ্রীকৃষ্ণকে সাজিয়ে নিই। ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়েই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও মুক্ত নন। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র দীর্ঘ আলোচনা পড়তে পড়তে আমরা কৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ ও চারিত্রিক গুণাবলীকে খুঁজে পাই। বইটি মূলত দুইটি বড়ো প্রবন্ধের সম্মিলিত রূপ। প্রথমটি, অবশ্যই 'কৃষ্ণ' এবং দ্বিতীয়টি, 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ'। কৃষ্ণের ভগবান রূপ ও সত্তা এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব হিসাবে যে কৃষ্ণকে আমরা দেখি— উভয়ই প্রকৃতপক্ষে কার্যত একই মানুষ। এই উভয় কৃষ্ণের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী কৃষ্ণ সম্পর্কিত ভাবনার এই পূর্ণরূপটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই বইতে তাঁর অন্য অশেষটি ছিল যে, মহাভারতের যুদ্ধ শুধুই পাণ্ডব বনাম কৌরব যুদ্ধ, নাকী ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ শক্তির উপর উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় শক্তির আধিপত্য বিস্তারের ইতিবৃত্ত? প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী কৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে তুলে এনেছেন একাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রসঙ্গ। যথা- বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ভাগবতপুরাণ', 'ব্রহ্মপুরাণ', 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ইত্যাদি। এছাড়াও এর সঙ্গে এই বইতে আছে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ও রাজবংশের বিস্তারিত পরিচয়।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তাঁর ভারতবিদ্যার চর্চার দ্বারা বিভিন্ন অনুষঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, যে বিশ্বাস বহুকাল ধরে ভারতবাসীর ধর্মচর্চা ও দর্শন চর্চাকে প্রভাবিত করে এসেছে তাকে অসত্য বা প্রক্ষিপ্ত বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। কৃষ্ণের বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং প্রেমিক সত্তা ভারতীয় জনমানসে সুদীর্ঘকাল ধরে নানা প্রভাব ফেলে এসেছে। যেখানে কৃষ্ণ পুরুষোত্তম নায়ক, আবার কপটের চূড়ামণি এবং ধুরন্ধর রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বও বটে। বইটির প্রথম অংশে মূলত এই কথা বলতে গিয়েই নৃসিংহপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন প্রাচীন ভারতের যে যে কাব্যে, নাটকে অথবা স্থাপত্য ভাস্কর্যে কৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কথা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদের এই গবেষণামূলক উপস্থাপনা। যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যীশু জন্মের পূর্বের বিভিন্ন লেখালেখি, যেখানে কৃষ্ণের বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীকে সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী ছান্দোগ্য উপনিষদের নিদর্শন দিয়েছেন, যেখানে মানুষ হিসাবে কৃষ্ণের নাম প্রথম পাওয়া যায়। নৃসিংহপ্রসাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে আর.জি.ভাণ্ডারকার এর সঙ্গে কিং সাহেবের বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গড়ে ওঠা বিখ্যাত বিতর্কটি, যেখানে ভাণ্ডারকার

গোপালক কৃষ্ণের কোনও প্রাচীনত্বকেই মানেন না। তার বক্তব্য আভীর জাতির লোকেরা এশিয়া মাইনর থেকে যীশুর জন্ম কাহিনি ও সংশ্লিষ্ট গল্পগুলিকে বয়ে এনেছিল, কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে সেই গল্পকথাগুলিই কৃষ্ণকথার সূচনা করেছে। যেখানে যীশুর নামই কোমল সুরে কৃষ্ণ নামের ধ্বনি বয়ে এনেছে। অনেক পাশ্চাত্য সাহেবই যীশুর ছাঁচে কৃষ্ণকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নৃসিংহপ্রসাদের মতো আমরাও এই বিষয়টিকে যুক্তিযুক্ত হিসাবে মেনে নিতে পারছি না। কারণ যীশুর জন্মের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে রচিত আমাদের সাহিত্যগুলিতে কৃষ্ণ তৎসময় মানুষ থেকে ‘অলরেডি’/ইতিমধ্যে দেবতাস্থানীয় হয়ে উঠেছে। তাহলে কৃষ্ণের অস্তিত্ব আর যাই হোক যীশুর থেকে অনেক প্রাচীন এইকথা বলতেই হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই পাণিনি বাসুদেব কৃষ্ণ ও অর্জুনের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করেছে। মহাভারতের কৃষ্ণের পার্থসারথি রূপ তখনকার মানুষের মনে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, রাজারা যুদ্ধে গেলে কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি সামনের সারিতে রাখত। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কার্টিয়াস এর মত অনুসারে জানা যায় যে, আলেকজান্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধকালে পুরুর সেনাবাহিনীর সামনের সারিতে কৃষ্ণের মূর্তি ছিল। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে নানা নাটকের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের দ্বারা কংসকে হত্যার ঘটনাটি উক্ত গ্রন্থের খুবই জনপ্রিয় একটি ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে মেগাস্থিনিস পতঞ্জলির আগের মানুষ, সেও কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণ পূজার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। বাসুদেব কৃষ্ণের প্রাচীনত্ব ও ঈশ্বরত্বে অন্য একটি বড়ো প্রমাণ হল পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি। এই গ্রন্থগুলির যে ব্যুৎপত্তির কথা আছে, তার প্রধান বক্তব্যই হল বাসুদেব কৃষ্ণই সমস্ত শক্তির মূল, তার থেকেই অন্যান্য দেবতাদের শক্তি বৈচিত্র্য। সাহিত্যের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় লেখা সাতবাহন রাজা হালের *গাথা/সপ্তশতী* গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনের তিনটি ঘটনা উল্লেখ আছে। হালের রচনার সময় মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ২৩৫ শতাব্দ থেকে শুরু করে ২২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়।

কুষাণ যুগের প্রথম পর্বেই মথুরার স্থাপত্যে দেখা যায় বাসুদেবের হাত থেকে কৃষ্ণ চলে গেছে নন্দগোপের হাতে। শেষ নাগের ছত্রছায়ায় বাসুদেব যমুনা পার হচ্ছে। আবার বৌদ্ধ গ্রন্থ *ঘট জাতকে* কৃষ্ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘অন্ধকবেহু’ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এখানে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে কৃষ্ণ তো অন্ধক-বৃষ্ণ বংশের বংশধর।^{১১৬} নৃসিংহপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বেশকিছু কৃষ্ণকেন্দ্রিক কাহিনির উল্লেখ করেছেন। যেখানে দেখতে পাচ্ছি, দক্ষিণ ভারতের মায়োনের সঙ্গে কৃষ্ণের একাত্মতার গল্প আছে। খ্রিস্টীয় এক-দুই শতাব্দীর মধ্যে লিখিত *শিল্পাডিকারম্* নামে তামিল গ্রন্থে মায়োন এবং তার স্ত্রী নপ্পিনাই (এরা অবশ্যই কৃষ্ণ ও রাধা) পূজিত হতো গোপ ও গোপীদের দ্বারা।^{১১৭} তামিল কবিতায় নাচের প্রসঙ্গে বলরামের নাম এসেছে,

আবার এই রাস নৃত্যের আগে ও পরে অসুর বধও ঘটে যাচ্ছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী পৌরাণিক কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে এরকম অসংখ্য সাহিত্য, কাব্য ও নাটকের উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের আলোচনার স্বল্প পরিসরে দু'একটি তুলে ধরলাম মাত্র। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার আমাদের কাছে যে, যীশুর জন্মের অনেকটা পূর্বে বা ওই সমকালীন সময়ে রচিত সাহিত্য বা শিল্পকলায় কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা বা প্রভাব বহুলাংশেই বর্তমান ছিল। ফলে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে কৃষ্ণ অনেক প্রাচীন। এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি যে, পুরাণই ইতিহাস নাকী ইতিহাস নয়— বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে এই বিতর্ক রয়েছেই। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বা মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকরা পুরাণকে ইতিহাস মানেন না। আবার নৃসিংহপ্রসাদের মতো সমসাময়িক অন্যতম ভারতবিদ্যার গবেষক পুরাণকেই ইতিহাস হিসাবে মনে করেন। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ভারতীয় পুরাণ ও শাস্ত্র থেকে যুক্তিসহকারে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বইটির পরের অংশটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে কারণ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ হিসাবে কৃষ্ণ মহাভারতে যেভাবে উঠে এসেছে, তার প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তুলে ধরেছেন। আদর্শ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ হওয়ার সমস্ত যোগ্যতাই মহাভারতে কৃষ্ণের আছে। বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে অন্যান্য মহাভারত গবেষকদের মতো নৃসিংহপ্রসাদও কিন্তু ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করা ও বন্দনা করার কথাটি স্মরণ করিয়েছেন। আমরা এর পূর্বে আলোচনায় দেখেছি ব্রাহ্মণদের সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা প্রাচীন ভারতে একপ্রকার অসম্ভবই ছিল, ব্রাহ্মণ যদি বিদ্রোহ করে তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা খুব সহজেই ভেঙে যেত। মহামতি কৃষ্ণ তার বুদ্ধি ও পুরুষকার দ্বারা বিষয়টিকে সহজেই অনুধাবন করেছিল। এরপর মহাভারতে ইন্দ্র বনাম কৃষ্ণের যুদ্ধ এবং পরিশেষে কৃষ্ণের জয়। আবার কালিয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে কৃষ্ণের জয় ঘটে। এভাবে সমাজে ইন্দ্র পূজা ও নাগ পূজার ওপরে কৃষ্ণ স্থান করে নেয়। মামা কংসকে হত্যা ও জরাসন্ধকে নিধনের মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের মূল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে কৃষ্ণ চলে আসে। একইরকমভাবে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখিয়েছেন যে মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ বিবাহগুলি কীভাবে অন্যতম কূটনৈতিক চাল হিসাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসতে কৃষ্ণকে সাহায্য করেছিল। এগুলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে সুভদ্রা, দ্রৌপদী, রুক্মিণীদের বিবাহ। কারণ এই বিয়েগুলির ফলেই কৃষ্ণ অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ফলে বিবাহকে সামনে রেখে যে কূটনীতি যা আকবরকেও রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, এখানেও কৃষ্ণ বিয়েকে কূটনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে আসীন হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে মহাভারতে বেশ কিছু রাজাকে সুকৌশলে হত্যা কৃষ্ণকে রাজনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হল- জরাসন্ধ নিধন, পৌণ্ড্রক বাসুদেব

এবং নরকাসুর ও অন্যান্য কিছু রাজা। এরকমভাবে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী মহাভারতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসার জন্য যে যাত্রা কৃষ্ণ করেছিল, সেটির একটি গবেষণামূলক উপস্থাপনা দিয়েছেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণের স্বরূপ ও নানাদিক বলার পাশাপাশি কৃষ্ণের প্রেমিক সত্তার গভীরতা সম্পর্কেও প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী ভেবেছেন। তবে মহাভারতের নারীচরিত্র নিয়ে বিস্তারিত বলার সময় আমরা কৃষ্ণের দুই পত্নী রুক্মিণী ও সত্যভামা'র প্রতি কৃষ্ণের ভালোবাসার স্বরূপ আলোচনা করেছি। এখানে সত্যভামার কাহিনি প্রসঙ্গে অবশ্যই স্যামন্তক মণির উপাখ্যানটি আলোচিত হয়েছে, যেখানে এটিকে পাওয়ার জন্য কৃষ্ণের যে লড়াই এবং এই দুঃস্বাপ্য ও দুর্লভ মণিকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের নিকট আত্মীয় ও পরিজনদের মধ্যে যে বিবাদ সুদীর্ঘ সময় ধরে চলেছে—সেটিও বিস্তারিতভাবে নৃসিংহপ্রসাদ বলেছেন। আলোচনায় এসেছে কৃষ্ণ কীভাবে নিজের আত্মীয় ও জ্ঞাতীদের মধ্যে হওয়া দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে সামাল দিয়েছিলো। মহাভারতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কৃষ্ণের সাফল্যকেই আমরা গুরুত্ব দেই, কিন্তু ভোজ ও অন্ধক এবং বৃষ্ণ গোষ্ঠীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ কৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বকেও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে তুলেছিলো। এই সমগ্র যাত্রাপথটি নৃসিংহপ্রসাদ চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বইটির দ্বিতীয় অংশে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী মহাভারতে স্থান করে নিয়েছে এমন রাজবংশগুলির বিস্তারিত বংশ পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে যদুবংশ, বিদর্ভদের কাহিনি, হৈহয় বংশ, ঋষি কান্ধীবান, দীর্ঘতমা ও সুদেষ্ণার পুত্ররা, পাঞ্চালদের বংশধরেরা এবং আরও অন্যান্য বংশের দীর্ঘ কাহিনি ও বংশ তালিকা নৃসিংহপ্রসাদের লেখায় পেয়েছি আমরা।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র মহাভারতের প্রতিনায়ক বইটিও মহাভারত চর্চার জগতে একটি বড়ো মাইলফলক। আমরা আগেও বলেছি নৃসিংহপ্রসাদ বরাবরই মহাভারতের চর্চাকে পরিপূর্ণ রূপে করতে চেয়েছেন, তাই মহাভারত সম্পর্কিত আংশিক কোনও ভাবনা বা চর্চাকে তিনি পছন্দ করেন না। কোনও একটি চরিত্রকে নিয়ে তাঁর ভাবনা সর্বদাই বহুমুখী ও আপাদমস্তক হয়ে থাকেই। তাঁর চর্চার এই ধরনটি আমাদের খুবই আকর্ষণ করে। তিনি বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন কোনও পাঠে নায়কের মতো প্রতিনায়কও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা যারা বিদ্যায়তনিক স্তরের পরিসরে আমাদের মহাকাব্যকে চর্চা করি, তারা মুক্ত চর্চাকে সর্বদা খোলা মনে স্বীকার করতে ভালোবাসি। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের মতন চরিত্র যদি মহাকাব্যে শুধু স্থান পেত তবে তা কখনোই

‘মহাভারত’ হয়ে উঠত না। কাব্যটি তখন কেবল ধার্মিক সম্প্রদায়ের পাঠ্য হিসাবেই বিবেচিত হতো। মহাভারতের ‘মহাভারত’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পেছনে প্রতিনায়কদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বইটির ভূমিকা অংশে প্রতিনায়ক বা প্রতিপক্ষ নায়কের সম্পর্কে নৃসিংহপ্রসাদ বলেছেন-

অর্থাৎ ধর্মার্থকামের ঘোষিত অঙ্গীকারই মহাভারতের বিশিষ্টতা— এটা ধরে নিয়েই যদি মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র বিচার করি, তাহলে দেখব— যুধিষ্ঠির কিংবা বিদুর অথবা ধর্মশীলা গান্ধারী মহাভারতের চরম উদ্দেশ্য সাধন করলেও তাঁরাই মহাভারতের সর্বঙ্গ তৈরি করেন না। এমনও বলতে পারি যে, এমন চরিত্র বেশি আরও বেশি থাকলে মহাভারত একটি বিশেষ ধার্মিক সম্প্রদায়ের পাঠ্যে পরিণত হত। মহাভারতের প্রথম থেকেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের যে তীব্র রাজ্যলোভ তৈরি হতে থাকে, এই ‘স্ট্রীকচার’ টা তৈরি করার জন্য প্রতিনায়ক-সংস্থায় যেমন দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং কর্ণ-শকুনির মহাকাব্যিক মিশ্রণ ঘটতে থাকে, তেমনই নায়ক-সংস্থায় ভীমের মতো একটা উপাদান এবং অবশেষে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি মহাকাব্যের পানক-রসটাকে একেবারে জারিয়ে দেয়। ঘটনা হল, দুর্যোধন, কর্ণ অথবা শকুনির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে কোনওভাবেই এঁদের খলনায়ক বলতে পারবেন না। কেননা দুর্যোধন অথবা কর্ণের দিক থেকেও কিছু নায়কোচিত প্রতियুক্তি আছে, কিন্তু সেগুলি শুভ এবং মঙ্গলের পথ ধরে চলে না বলেই শেষ পর্যন্ত মহাকাব্যের আদি-মধ্যান্তঃস্থায়ী শুভৈষণার বিপরীতে স্থাপিত হয়। অন্যদিকে লোভ, মোহ, আকাঙ্ক্ষা এবং হিংসা এখানে জীবনের ধর্ম অতিক্রম করে না বলেই, এমনকী কোথাও কোথাও সেই আকাঙ্ক্ষা এবং হিংসা ধর্মসম্মিত আকাঙ্ক্ষা এবং হিংসার অনুকৃতি বহন করে বলেই দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনদের আমরা খলনায়ক বলতে পারি না। বরঞ্চ প্রতিনায়ক বলতে পারি অথবা প্রতিপক্ষ নায়ক বলতে পারি। ১১৮

প্রতিপক্ষ নায়কের মধ্যেও কাম্য নায়ক-স্বভাবগুলি সবই পূর্ণ পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি, পরিবেশ বিপরীত হওয়ার দরুন, বিশেষত ন্যায়, ধর্ম এবং সুনীতির বিপ্রতীপ ভূমিতে থাকার ফলেই অধিগুণসম্পন্ন প্রতিনায়কও মহাকাব্যিক নিন্দার বিষয় হয়ে ওঠেন। অন্তত দুর্যোধন-কর্ণের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ১১৯

মহাভারতে প্রতিনায়ক অনেকেই আছে, সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ দশ জন ব্যক্তি যারা নায়কের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে মহাভারতের কাহিনিতে টুইস্ট এনেছে অথবা ঘটনাকে বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় করে তুলেছে, তাদেরকে নিয়েই মূলত বইটি লেখা হয়েছে। এরা হল- একলব্য, দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, শল্য, অশ্বখামা, কৃতবর্মা, বলরাম।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী প্রতিনায়ক হিসাবে একলব্যের প্রসঙ্গ প্রথমে স্মরণ করেছেন। একলব্যকে গুরু দ্রোণাচার্য শিষ্য হিসেবে কেন তার আশ্রমে ভর্তি নিলো না? এছাড়াও একলব্যের আঙুল গুরুদক্ষিণা হিসাবে নেওয়ার বিষয়টি নৃসিংহপ্রসাদ মুক্ত মনে গভীরভাবে ভেবেছেন। সমসাময়িক

সময়ের মার্কসবাদী সমালোচক গোষ্ঠীর অনেক প্রাবন্ধিকই বিষয়টিকে তলিয়ে না ভেবে শুধুমাত্র জাতিতে নিষাদ হওয়ার কারণেই নাকী একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি— এমন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। কিন্তু মহাভারতের প্রতিনায়ক বইতে নৃসিংহপ্রসাদের যুক্তিটি এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক ঠেকে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অবশ্যই জাতিবিদ্বেষের বিষয়টি একেবারে অস্বীকার করেননি, কিন্তু উক্ত বিষয়টিকেই আবার একমাত্র কারণ হিসেবে দেগে দেননি। এক্ষেত্রে নিষাদ জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে তারা একেবারেই পৃথক গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের আচার-ব্যবহার ও শুচিবোধ-সদাচার —সমস্তটাই আর্থ জনজাতির থেকে আলাদা। ফলে একলব্যের সঙ্গে একত্র শিক্ষালাভ করার বিষয়টি হস্তিনাপুরের রাজকুমারদের পক্ষে খুব একটা স্বাস্থ্যকর হবে কিনা, সেই বিষয়ে দ্রোণাচার্যের চিন্তা যথার্থই থেকে থাকতে পারে। কারণ যুদ্ধ কৌশল ও জীবন যাপনের যে শিক্ষা গুরুর গৃহে শিষ্যরা লাভ করে তা উভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।^{১২০} এক্ষেত্রে আমরা জানি সমভূমিতে যে কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধ করা যায়, পার্বত্য বা জঙ্গলের রাজত্বে সেই কৌশল সর্বদা কাজে আসে না। কারণ সেখানে জীবন সংগ্রাম অনেক বেশি কঠিন। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এক্ষেত্রে একই শ্রেণিকক্ষে সাধারণ ও বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে শ্রেণিকক্ষ পৃথক না হলে সাধারণের সুস্থ অত্যাচারেও মানসিক সংকট প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর দেখা দিতে পারে। নৃসিংহপ্রসাদের দ্বিতীয় অনুসন্ধানটির সঙ্গেও আমরা অনেকাংশে সহমত পোষণ করি। যেখানে বলা হচ্ছে যে, হস্তিনাপুর রাজপ্রশাসনের বিষয়টিতে প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে— এই বিষয়ে দ্রোণাচার্য কিছুই জানত না। কারণ গুরু হিসাবে দ্রোণাচার্যকে যেহেতু রাষ্ট্রের তরফে নিয়োগ করা হয়েছে, তাই তাদের হয়তো অনুমতির প্রয়োজন সে অনুভব করেছিল। এক্ষেত্রে জাতি ও বর্ণের বিষয়টিকে শুধুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যদি তাই হয় তাহলে দ্রোণাচার্যও নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছে। সুতরাং যে নিজেই অপেক্ষাকৃত নিচের জাতির পেশা ও কাজে লিপ্ত থাকছে, সে আর জাতের বিচার করবে কোন মুখে আর কোন মানসিকতায়!

মহাভারতে একলব্যের উপাখ্যানে আমরা সবাই গুরু দ্রোণাচার্যের কিছু পক্ষপাতমূলক আচরণ খেয়াল করেছি। এই পক্ষপাত প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অস্বীকার করেননি। তবে এক্ষেত্রে তিনি পরিশ্রমী ও মেধাবী ছাত্রের প্রতি গুরুর পক্ষপাতকে যথাযথ মনে করেছেন। কারণ ছাত্রের উক্ত গুণাবলীই শিক্ষককে তার পক্ষে টেনে আনে বা গুরু বাধ্য হয়। অর্জুনের মেধা, পরিশ্রম, আনুগত্য ও বিনয় এতটাই প্রবল ছিল যে, দ্রোণাচার্য নিজ সন্তান অশ্বথামাকেও সেই মূল্য দিতে পারেনি, যা অর্জুন পেয়েছে। এখান থেকেই দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞাকে আমাদের বুঝতে হবে। যেখানে আচার্য কথা দিয়েছিল যে, অর্জুনের সমকক্ষ আর কাউকে দ্রোণ হতে দেবে না। বিষয়টিকে সমকালের নিরিখে দেখতে গিয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর বাস্তবযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রাবন্ধিক দিয়েছেন। যেখানে আজকের

কর্পোরেট জগতে চাকরি বা দলীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে দেখা যায় নায়ক নিজের নায়কত্ব ধরে রাখার জন্য অন্যের প্রভাব ও ক্ষমতাকে দমিয়ে রাখার কৌশল অবলম্বন করে। বিষয়টিতে ‘প্রোফেশনালিজম’ আছে এবং দৈনন্দিন উচ্চাকাঙ্ক্ষার দর্শনে এটি হয়তো অস্বাভাবিকও নয়। তাইতো একলব্যের অস্ত্রচালনায় ভীত ও আশঙ্কিত হয়ে এই উজ্জ্বল প্রতিভাকে সমূলে নষ্ট করার কথাটি অর্জুন প্রথমেই ভেবেছে, সেই কারণেই একলব্যের সঙ্গে কোনওরকম যুদ্ধ ছাড়াই দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে ও তাকে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞার বিষয়ে স্মরণ করানোর মধ্যে দিয়ে একলব্যের ভবিষ্যতের নক্ষত্র হয়ে ওঠার যাবতীয় সম্ভাবনাকে চরম কৌশলে ও নির্মমতার সঙ্গে অর্জুন বিনষ্ট করে দিলো। অর্জুন এখানে বোধহয় বুঝিয়ে দিল যে, কীর্তিমান হওয়ার জন্য অন্যের কীর্তিকে কীভাবে দমন করতে হয়, যা বীরের উদারতায় নয়, বরং নিজস্ব প্রয়োজনে ও কৌশলে। নায়কের সমস্ত গুণ একলব্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য তার পরাজয় ঘটল। এর ফলেই মহাভারতের বীর একলব্য প্রতিনায়ক হয়ে গেল। এভাবেই আমরা দেখেছি মহাভারতে একলব্যের প্রতি হওয়া অবিচারটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক হলেও সত্যি।

মহাভারতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু’জন প্রতিনায়ক হল- দুর্যোধন ও কর্ণ। এই দু’জন ব্যক্তির বীরত্ব, খ্যাতি, প্রভাব, শারীরিক শক্তি, উত্তম প্রশাসক এবং যুদ্ধ কৌশলে সবাই মুগ্ধ হয়েছে। নায়ক হওয়ার মতো প্রত্যেকটি গুণাবলী উভয় চরিত্রের আছে। কিন্তু পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যটা অন্তত তাদের পাওয়ার কথা ছিল, এটা না হলেও শ্রীকৃষ্ণের দাবি মতো পাঁচটি গ্রাম পাণ্ডবরা হস্তিনাপুর থেকে পেলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতো না— যা দুর্যোধনের না দিতে চাওয়ার মাধ্যমেই এই বৃহৎ অকল্যাণকর যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। কর্ণ ও দুর্যোধনদের ক্রমাগত ঈর্ষা ও হিংসাই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ডেকে এনেছে। প্রতিনায়ক হিসাবে দুর্যোধনের মতো শক্তিশালী চরিত্র মহাভারতকে ‘মহাভারত’ হয়ে উঠতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী প্রতিনায়ক হিসেবে দুর্যোধনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন:

দুর্যোধনের উরুদেশে ভীমের প্রহার থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটল, তাতে পাণ্ডবদের বিজয় ভাবনা কেমন কলুষিত এবং তিক্ত হয়ে গেল যেন। বিশেষত অন্যায়ের কলঙ্ক রোপন করে বলরাম চলে গেলেন বলেই এমন একটা পরিবেশ তৈরি হল, যাতে প্রবল শত্রু বিনিপাতের উল্লাসটুকুও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠছে না, আবার ভীমের ওপর আরোপিত অন্যায়টুকুও ঠিক জাস্টিফাই করা যাচ্ছে না। তার মধ্যে, যে-ভীম এত লড়াই করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্যোধনের পতন ঘটালেন, তাঁকেও কেউ স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা না করায়, তাঁরও মনটা বিষণ্ণ হল। পরিস্থিতিটা এইরকম যে, কেউই খুশি নেই.....^{১২১}

বস্তুত বিজয়ী যোদ্ধা পুরুষদের মধ্যে এই যে বিষণ্ণতা, এইখানেই প্রতিনায়ক দুর্যোধনের মহিমা এবং মর্যাদা বিপ্রতীপভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই বিপরীত প্রতিষ্ঠার আবর্ত থেকে বেরিয়ে

আসার জন্য, কৃষ্ণের মতো ভগবত-প্রমাণ ব্যক্তিত্বের অভিপ্রবেশ অথবা ‘ইন্টারভেনশন’ জরুরি হয়ে পড়ে।^{১২২}

আমাদের বক্তব্য হলো- বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও সেই বিজয়ের আশ্বাদন লাভ করার জন্য এতটা যে সময় লেগে গেল এবং সেই আশ্বাদন ভোগ করার জন্য এতটা যে যৌক্তিকতার সাধন করতে হল— এই সময় এবং এই যৌক্তিকতার সন্নিবেশই এখানে প্রতিনায়ক দুর্যোধনের মহাকাব্যিক প্রতিষ্ঠা তৈরি করে দেয়।^{১২৩}

এই যে দুর্যোধনের মৃত্যুর ফলেও একেবারে যুদ্ধজয়ের হাসি কেউই হাসতে পারছে না, অথচ হস্তিনাপুরের যুবরাজকে পরাজিত করার মাধ্যমে যুদ্ধের বিজয় পাণ্ডবেরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। গদাযুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে অন্যায়ভাবে হারানোর পরেও স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি দুর্যোধনের মাথায় ঝরে পড়া বা বলরামের লাঙ্গল তুলে ভীমকে হত্যার জন্য এগিয়ে আসা বা বনবাসে যাওয়ার পূর্বে হস্তিনাপুরের প্রজাদের কাছে উত্তম প্রশাসক হিসাবে দুর্যোধনের একাধিক কাজকে গান্ধারীর স্বীকৃতি দেওয়া প্রভৃতিই প্রমাণ করে দুর্যোধনও নায়কত্বের অবশ্যই দাবিদার। পুরো মহাভারত জুড়ে দুর্যোধনের অনেক ভালো কাজের নমুনা আমরা এদিক থেকে দেখতে পারি। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের পেছনে দুর্যোধনের যে ভূমিকা এবং যে চরম অন্যায়গুলি অবলীলায় সে করে গেছে সেগুলিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই পাপ ও পুণ্য একত্রে অবস্থান করে। অর্জুন, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষদের জীবনেও পাপ কাজ রয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের অবস্থান অবশ্যই মঙ্গল ও কল্যাণের পক্ষে ছিলো। তাই তারা নিশ্চিতভাবেই নায়ক, অন্যদিকে দুর্যোধনের সার্বিক কর্মগুলি লোভ, লালসা, ঈর্ষা ও হিংসায় ভরপুর ছিলো। তাই মহাভারতে প্রতিনায়কের আসনটি তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। মহাভারতের অন্যতম পাপের কাজগুলোতে দুর্যোধনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধন ছিলোই। যেগুলির মধ্যে অন্যতম- শকুনির পরামর্শে ভীমকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার প্রয়াস, জতুগৃহে কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার প্রসঙ্গ, ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষা ও হিংসায় কীভাবে তাদের সম্পদ হস্তগত করা যায় সেই সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চক্রান্তে লিপ্ত থাকা, বিরাট রাজ্যে গোরু চুরির পরিকল্পনা, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হস্তিনাপুরে দূত হয়ে আসা কৃষ্ণকে কারারুদ্ধের পরিকল্পনা এবং সবশেষে অভিমন্যু বধের কথা বলতেই হবে আমাদের।

দুর্যোধনের মতো কর্ণের চরিত্রও বহুমাত্রিক। একাধিক মহৎ গুণের সমাবেশ দেখা গেছে কর্ণের চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু তার বেড়ে ওঠা স্বাভাবিকভাবে হয়নি, ফলে সামাজিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। যার প্রভাব ‘কর্ণ’ নামক চরিত্রটির মধ্যে বিদ্যমান। ভাবনার এই স্তরেই প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী প্রতিনায়ক হিসাবে কর্ণকে পড়তে গিয়ে কুন্তী ও

দ্রৌপদীকে নানাভাবে এনেছেন। কারণ কর্ণের প্রতিনায়ক হয়ে ওঠার জন্য উক্ত চরিত্র দু'টির বিশেষ ভূমিকা আছে। সামাজিক বিভিন্ন অন্যায়ে ও প্রত্যাখ্যানের উত্তর নিশ্চয়ই অন্যায়ে এবং ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা হতে পারে না। একইরকমভাবে জ্ঞান লাভের প্রধান উদ্দেশ্যই হল জ্ঞানের প্রকাশ যেন জগতের ও সার্বিক মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। মহাভারত স্পষ্টই দেখায় যে, শুধুমাত্র অর্জুনকে অস্ত্রশিক্ষায় পরাজিত করার জন্যই কর্ণ অস্ত্রের জ্ঞান চেয়েছিল। শুধুমাত্র সেই কারণবশতই পরশুরামের কাছে আসা এবং নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মিথ্যা পরিচয় প্রদান করা। একইরকমভাবে আমরা দেখেছি সারথির পুত্র হওয়ার জন্য দ্রৌপদী তাকে বিবাহে প্রত্যাখ্যান করলে মহাভারতের পাঠক ও শ্রোতার মনে কষ্ট হয়, প্রতিক্রিয়া দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে না। কিন্তু, এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ তোলার জন্য যখন দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণ কীভাবে পাণ্ডবদের সহ দ্রৌপদীকে সভার সমক্ষে অপমান ও নির্যাতন এবং বস্ত্রহরণ করা যায়, সেটির পরিকল্পনা করে— সেই সময় বীর যোদ্ধা কর্ণ মহাভারতের পাঠকদের কাছে প্রতিনায়ক হয়ে যায়। দুর্যোধনের প্রত্যেকটি অপরাধের সময়ে কর্ণ তার পাশে থেকেছে, অনেক চক্রান্তের পরিকল্পনাই কর্ণ ও দুর্যোধন এবং শকুনি মিলিতভাবে করেছে। বিষয়টিকে সহজ করে তোলার জন্য প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী'র বই থেকে একটি অংশ তুলে ধরতে চাই:

কর্ণ এই মুহূর্তে ন্যায়-অন্যায় বোঝেন না। পাঁচ ভাই পাশাখেলার জাঁতাকলে আটকে ছটফট করছে, কর্ণের মজা লাগছে। পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর বুকের প্রাবরণ-বাস খুলে পড়েছে দুঃশাসনের টানাটানিতে, কর্ণের ভাল লাগছে, তাঁহ গহন মনের রুদ্ধ বিকার কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করছে। অন্তত দ্রৌপদীর ঘটনাটা বিকার জেনেও কর্ণ এই বিকারকে স্বাগত জানাচ্ছেন। বিকারের কথা শুনে কর্ণের ভীষণ রাগ হল—ক্রোধমূর্ছিতঃ। রাগে বিকারের হাতে একটা ঝাঁকার দিয়ে কর্ণ বিকারকে তিরস্কার করতে থাকলেন।^{১২৪}

দুর্যোধন যে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, তার পেছনেও ছিল কর্ণেরই উৎসাহ। দ্রৌপদীর স্বাতন্ত্র্যহীনতা এবং দাসীত্ব প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ বলেছিলেন— এখন থেকে পাণ্ডবেরা কেউ তোমার প্রভু নয়, কৌরবেরাই তোমার প্রভু। তুমি বরং এঁদের মধ্যে থেকে নতুন কোনও স্বামী বেছে নাও— অন্যৎ বৃণীষ পতিমাণ্ড ভাবিনি। কর্ণ বলেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যে কামসংক্রান্ত ব্যাপার তা বাইরে কখনও আলোচনার বিষয় হতে পারে না, কিন্তু দাসীভাবে সব কথাই চলে, আর সবচেয়ে বড় কথা ওই গোটা পাঁচেক স্বামীর রতি-বন্ধনের চেয়ে, অগুপ্তি পুরুষের রতিসাহচর্য লাভ করা যায় যাতে, এমন দাসীত্বই তোমার ভাল.....। কর্ণের এত কৌরবানুকূল ওকালতির পরে দুর্যোধন আর স্থির থাকেন কী করে? বিশেষত দুঃশাসনের অপচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার নিরিখে দুর্যোধন এবার নিজেরই কাপড় তুলে ফেললেন উরু থেকে। দেখাতে থাকলেন দ্রৌপদীকে, আর বিকট কোন মর্ষকামিতায় হাসতে থাকলেন কর্ণ।^{১২৫}

ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য-প্রতিপত্তি যাই তোমার থাকুক, সেগুলি দেখে যদি পাণ্ডবদের কষ্টই না লাগল তা হলে সে সম্পদের মানে কী। তোমার ভর্তি আছে, তাদের কিছু নেই— এই অবস্থাটা, এই বাড়বাড়ন্ত তাদের দেখানো দরকার। সত্যি বলতে কি, রাজ্যপাট, ধন-সম্পত্তি— এসব থেকে কিছুই সুখ নেই, যদি না তোমার বাড়বাড়ন্ত দেখে বনবাসী এবং দুর্বিপাকগ্রস্ত পাণ্ডবদের চোখ না টাটায়।^{১২৬}

এই যে মহাভারতের অনেক জায়গাতেই শুধুমাত্র মানসিক আক্রোশ মেটানোর জন্য প্রতিশোধের আশুনে কর্ণ কেবলই জ্বলেছে, সেইটি কোনওভাবেই উত্তম বা আদর্শ প্রকাশ হতে পারে না। ঠিক একই রকম বিষয় তার বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, জ্ঞান অর্জনও নিজের ও জগতের ভালোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি শুধুমাত্র অর্জুনকে ‘কাউন্টার’ করার জন্য বা তার সমকক্ষ হয়ে ওঠার জন্য বা তাকে পরাজিত করার জন্যই কর্ণ অস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছিল। আমরা সর্বদাই কর্ণের মধ্যে একপ্রকার অর্জুনকে পরাজিত করতে চাওয়ার তাড়না দেখতে পেয়েছি। মহৎ জ্ঞান মানুষের অন্তরকে একপ্রকার শান্তি প্রদান করে। কিন্তু, কর্ণকে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো দেখি। সে অসৎ উপায়ে অবলম্বন করে সর্বোচ্চ অস্ত্র জ্ঞান লাভ করলেও সর্বদাই বিচলিত থেকেছে।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অন্যান্য প্রতিনায়কদের মধ্যে শকুনি’র প্রসঙ্গ তোলার সময় দু’একটি কথা উত্তম বলেছেন। এর মধ্যে আমাদের গান্ধার রাজ্যের সংস্কৃতি ও উপজাতিদের যুদ্ধের ধরন সম্পর্কিত নৃসিংহপ্রসাদের ভাবনাটি চমৎকার ও খুবই প্রাসঙ্গিক লেগেছে। যেখানে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন গান্ধার রাজ্যের ছোট আয়তন সম্পর্কে। পাহাড় ও নদীতে ঘেরা একটি রাজ্য, যা ভৌগোলিক দিক থেকে এরূপ রাজ্য হওয়ার কারণে ঘন অরণ্যের আড়াল থেকে চোরাগোষ্ঠা ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত। ফলে গান্ধার রাজ্যের এরূপ সংগ্রাম ও যুদ্ধের রীতিটি শকুনির মধ্যে প্রাবন্ধিক খুঁজে পেয়েছেন। যে কারণে শকুনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে এসব বিদ্যা দুর্যোধনের মধ্যে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষ খাওয়ানো বা সামনাসামনি যুদ্ধের পরিবর্তে গোপনে আশুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা বা অসতর্ক থাকাকালীন যোদ্ধাকে পিছন থেকে আঘাত করা শকুনিই কৌরবদের যথার্থভাবে শিখিয়েছিল। প্রতিনায়ক হিসাবে শকুনির অন্য একটি গুণ প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী চিহ্নিত করেছেন, যা হল তার মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার সক্ষমতা। ফলে পাণ্ডবদের মনস্তত্ত্বও সে যথাযথ ভাবেই বুঝতে পারত। শেষে তার পাশা খেলার অসম্ভব জ্ঞান ও দক্ষতার বিষয়টিও সমানভাবে স্মরণীয়, কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলী শকুনি খারাপ উদ্দেশ্যে যেহেতু কাজে লাগিয়েছে তাই অন্যান্য প্রতিনায়কদের মতো সেও প্রতিনায়ক হয়েই রয়ে গেছে।

প্রতিনায়ক হিসেবে জয়দ্রথের নামটিও ক্ষুদ্র পরিসরে নৃসিংহপ্রসাদ বলে গেছেন। তবে মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে জয়দ্রথ খুব শক্তিশালী প্রতিপক্ষ একেবারেই নয়, কিন্তু যুদ্ধের যেটুকু সময় সে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেছে সেখানে তার উপস্থিতি প্রবল ও একই সঙ্গে নির্মমও বটে। জয়দ্রথকে কী কারণে অভিমুখ্য বধে কাজে লাগানো হয়েছিল— সেই প্রসঙ্গ সাধারণভাবে সবারই জানা। জয়দ্রথকে নিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী একটি চমৎকার পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন সমাজে সর্বদাই এমন কিছু লোক থাকে যারা নিজেদের অপরাধগুলি অনেক সময় অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে দিয়ে করিয়ে নেয়, মহাভারতে এরকমই একটি ক্ষুদ্র প্রতিনায়ক চরিত্র হলো জয়দ্রথ। চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত, একেবারে বাস্তব থেকে তুলে আনা নিদর্শনের মতো। মহাভারতে বনবাসে থাকাকালীন দ্রৌপদীকে অপহরণ ও সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও তাকে জোরপূর্বক সম্ভোগের চেষ্টা করা এবং অভিমুখ্য বধের মূল অপরাধী হিসাবে জয়দ্রথ প্রতিনায়ক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। অন্যদিকে বলরামকে দেখা যায় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে সে কোনও পক্ষেই যোগদান না করে ভ্রমণে বেরিয়ে যায়। আমরা আশা করি যুদ্ধের প্রতিটি খবর তার কাছে অবশ্যই আসছিল। কিন্তু ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় ধৈর্য রাখতে না পেরে সমস্তপক্ষকে বলরাম হাজির হয়। গদা যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে ভীম দুর্যোধনকে আঘাত করেনি, ফলে এদিক থেকে নিয়মের চরম লঙ্ঘন অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু, নৈতিকতা ও ধর্ম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আমরা যেহেতু আগেই উল্লেখ করেছি, তাই আমাদের ভীমের অন্যায়ভাবে গদাযুদ্ধকে কোথাও সমর্থন দিতেই হচ্ছে। দুর্যোধনের পরাজয়ে বলরাম দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও ভীমের প্রতিজ্ঞা একদম ভুলে গিয়ে ভীমের অন্যায়কেই প্রধান হিসেবে দেখছে। যদিও কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। তবুও যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করার কারণেই তাকে প্রতিপক্ষ নায়ক হিসাবে নৃসিংহপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন। দুর্যোধনের বাল্যকাল থেকে অন্যায়গুলি বলরাম জানা সত্ত্বেও তাকে অপরাধগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি, তার নৈতিক অবস্থান সর্বদাই দুর্যোধনের পক্ষে ছিল। তাই এক্ষেত্রে সেও প্রতিনায়ক হয়েই রয়ে গেছে।

নৃসিংহপ্রসাদের উপস্থাপিত প্রতিনায়কদের মধ্যে অশ্বখামা অবশ্যই অন্যতম। মহাভারতের যুদ্ধে অন্যান্য কুশলী যোদ্ধাদের মধ্যে অবশ্যই তার নাম বলতে হয়। যোদ্ধার দক্ষতা, যুদ্ধ কৌশল, বীরত্ব ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার বেশ কিছু পদক্ষেপ অত্যন্ত গোলমেলে প্রকৃতির, যা তাকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে প্রতিনায়ক করে তুলেছে। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দ্রোণাচার্যের দুর্বলতাগুলি যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেছেন, যেগুলি তার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। ভগবান প্রদত্ত জীবনে দ্রোণ ও তার পুত্র অশ্বখামা সুখ খুঁজে পাচ্ছিলো না। ফলে দ্রোণাচার্য যেমন ব্রাহ্মণের জীবিকা ছেড়ে ক্ষত্রিয়কে বেছে নিয়েছে, হস্তিনাপুরের আশ্রয়ে থেকে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়েছে। এছাড়াও সন্তানের প্রতি দুর্বলতা তার জীবনের সবথেকে বড়ো

বাধা ছিল। অশ্বখামার নিজের জীবনের প্রতিও অদ্ভুত মোহ ও মায়া ছিলো। আমরা জানি যে এই সকল বিষয়গুলি অশ্বখামার প্রতিনায়ক হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহাভারতের এই অন্তর্নিহিত সত্য নৃসিংহপ্রসাদ বুঝেছেন, তাই স্বল্প পরিসরে তিনি বলেছেন:

পুত্র-কন্যার ওপরে পিতা মাতার যে পরম বাৎসল্য, তাকেই আমরা ‘স্নেহ’ বলে থাকি। কিন্তু সংস্কৃতির ধাতুগত মৌলিক অর্থে ‘স্নেহ’ মানে অনুরাগ, আসক্তি। মহাভারত বলেছে— স্নেহ থেকেই মানুষের যত দুঃখ, যত ভয়, শোক, হর্ষ, চেষ্টা, ক্রোশ— সব তৈরি হয় এই স্নেহ থেকেই.....। মানুষের অন্তরশায়ী এই অনুরাগ- বৃত্তি থেকেই বিষয়-রসের উপভোগ-সংকল্প তৈরি হয়, তারপর সেই বিষয়ে প্রীতি তৈরি হয়। মহাভারতের কবি যতখানি কবি ঠিক ততখানি দার্শনিক বলেই এখনকার দিনের মতো ‘ইঁদুর দৌড়’ শব্দটা ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন— তৃষ্ণা, পিপাসা। বলেছেন— এটার মতো উদ্বিগ্ন তৈরি করা জিনিস আর দ্বিতীয় নেই— অনাদি, অনন্ত এই তৃষ্ণা মানুষের অন্তর্দেহের মধ্যে এমন আগুন জ্বালিয়ে তোলে যে, সে আগুন মানুষকে পুড়িয়ে শেষ করে ছাড়ে।^{১২৭}

আমরা জানি যে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, তৃষ্ণা অনাদি এবং অনন্ত। মানুষের দৈহিক সুখের কারণে উপরোক্ত বিষয়গুলির কোনও সীমানা নেই, তাই প্রতিটি মানুষই এগুলি যতোই পায় ততোই মানসিক সন্তুষ্টি অধরাই তার থেকে যায়। যেখান থেকে মানসিক ‘ডিপ্রেসন’ জন্ম নেয় এবং ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। অশ্বখামা চরিত্রকে ভাবনার এই জায়গা থেকে খুঁজতে হবে। মহাভারতের অনেক ঘটনাতেই আমরা অশ্বখামাকে প্রতিবাদ করতে দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিবাদ ব্যক্তিগত মতামতের স্তরেই থেকে গেছে। কৌরবদের প্রধান অন্যায়গুলি একেবারে জোরালো রূপে অশ্বখামা করেনি। কারণ হস্তিনাপুরের রাজসভায় বহাল থাকাকালীন যে শারীরিক সুখ ও অর্থ এবং খ্যাতি সে লাভ করেছিল, সেসব ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের বিরাগভাজনের পাত্র হয়ে সে হারাতে চায়নি। এই মানসিক দ্বিচারিতা ও একপ্রকার জটিলতাও যা বটে সেইটি অশ্বখামার মধ্যে ভালোভাবেই ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত সে দুর্যোধনের সঙ্গে থেকে অভিমন্যু সহ অন্যান্য পাণ্ডব পুত্রদের পৈশাচিকভাবে হত্যা করে পাঠক ও শ্রোতাদের মনে প্রতিনায়ক হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র উপস্থাপিত অন্য অপ্রধান প্রতিনায়কদের মধ্যে দুঃশাসন, কৃতবর্মা এবং শল্য রয়েছে। দুঃশাসন সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর একটি উপস্থাপন রেখেছেন প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, ইউনিয়ন বা কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময় এমন মানুষ দেখা যায়, যে কেবল একাকী নিজের ক্ষমতাবলে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তার অবস্থানের গুরুত্ব তখনই বোঝা যায়, যখন একটি অটুট সংঘবদ্ধ শক্তি তার পেছনে থাকে। এদিক থেকে দেখতে গেলে দুঃশাসন প্রতিনায়ক হিসাবে ‘দুঃশাসনে’ পৌঁছতে পেরেছে কেবলমাত্র কর্ণ ও দুর্যোধনের সহায়তায়। দ্রৌপদীকে শারীরিকভাবে ভোগ করতে চাওয়ার ইচ্ছে কর্ণ ও দুর্যোধনের মাধ্যমে

প্রকাশিত হলেও, তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে দুঃশাসনের মাধ্যমে। মহাভারতের প্রত্যেকটি অপরাধেই কৌরবদের সঙ্গে দুঃশাসন সঙ্গ দিয়ে গেছে। কর্ণ ও দুর্যোধনের মতো বীরত্ব, ক্ষমতা ও যুদ্ধকৌশল দুঃশাসনের না থাকলেও মহাভারতের কবি অদ্ভুত নিপুণতায় এই প্রতিনায়কের আত্মলাভ ঘটিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার পূর্বে ভীমের কথার উত্তরে দুঃশাসন যেসব কথা জানিয়েছে, সেগুলিই মহাকাব্যে তাকে প্রতিনায়কের আসনে বসিয়েছে।

হ্যাঁ, এই সেই হাত, হস্তিগুপ্তের মতো এই মসৃণ হাতেই আমি শত-সহস্র ব্রাহ্মণকে গোদান করেছি, এই হাতেই আমি শত্রু ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেছি, আর এই হাতেই আমি প্রিয়তমা রমণীদের পীন-স্তন মর্দন করেছি। অর্থাৎ কিনা, ধর্ম, অর্থ, কামের সম্যক সাধন করেছি আমি। ব্রাহ্মণদের দান-ধ্যান করে অলৌকিক পুণ্যের মাধ্যমে ‘ধর্মে’র উপাসনা করেছি। শত্রু ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করে রাজ্য-সমৃদ্ধির ‘অর্থ’ ভোগ করেছি এবং একাধিক সুন্দরী যুবতীর শরীর উপভোগ করে ‘কামে’রও পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছি। একজন সফল মানুষ যে জীবনকে উপভোগ করতে চায়, তার কাছে এই দুঃশাসনী পরিতৃপ্তিই তো সবচেয়ে কাম্য। মরে যাবার কালে চিরন্তন শত্রুকে এই পরিতৃপ্তির কথা জানানোর মধ্যে এক অপরিমিত সুখ আছে, দুঃশাসন সেই সুখ পাচ্ছেন মরণান্তিক আশ্ফালন করে— এবং এই আশ্ফালন-সুখও তাঁর অগ্রজ দুর্যোধনেরও মনের কথা। মরণের সময় তিনিও যুধিষ্ঠিরকে নিজের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসুখের কথা সোচ্চারে বলেছেন।

১২৮

মহাভারতে কৃতবর্মা সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনায়ক নয়। যুদ্ধে অশ্বখামার সহযোগী হিসাবে পাণ্ডবদের সন্তানদের ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্যায় ভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যার কারণে সে কুখ্যাত হয়ে আছে। মহাভারতে শুধুমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যক্তিগত রেষারেষির জন্যই কৌরবক্ষে কৃতবর্মা যোগদান করেছিল। এই অত্যন্ত জঘন্য কাপুরুষের ন্যায় হত্যার জন্যই এবং অভিমন্যুকে অন্যায়ভাবে নিধনকারী যোদ্ধাদের মধ্যে কৃতবর্মা অন্যতম হওয়ার কারণে মহাভারতে সে প্রতিনায়ক হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু কৃতবর্মা’কে কী কারণে আমরা প্রতিনায়ক বলব? এই প্রশ্নের থেকেও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে যে, কৃষ্ণের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও কেন সে কৌরব পক্ষে যোগদান করল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখার চেষ্টা করেছেন মানুষের ভেতর ও বাইরের দুইটি রূপের প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে নৃসিংহপ্রসাদের দুইটি মতের সঙ্গে আমরা সহমত। কারণ প্রথমটির সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত, যা আমাদের চারপাশেও প্রতিদিন ঘটে। আমাদের ব্যক্তিগত পরিসরে বা গণতন্ত্রেও একজন বুদ্ধিমান পুরুষ যখন নিজের ক্ষমতাবলে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তখন মাঝারি মাপের ব্যক্তির তর প্রতি হিংসা ও ঈর্ষা স্বাভাবিকভাবেই করে থাকে। বিদ্যায়তনিক স্তরের এরকম ভাবনা থেকেই কৃতবর্মাকে দেখতে চাওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণের মতো মর্যাদা পুরুষোত্তম পুরুষ থাকার ফলে অন্যান্য মধ্যম মানের ব্যক্তির নিজেদের সম্মান ও প্রতিপত্তি

না পাওয়ার কারণেই কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণটিও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে নৃসিংহপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন স্যমন্তক মণি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের প্রয়াস। অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু হওয়ার কারণে স্যমন্তক মণি সবাই নিজের কাছে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু মণির আসল মালিক ছিল সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ। ঘুমন্ত অবস্থায় এই সত্রাজিৎকে হত্যা করে কৃতবর্মা'র ভাই শতধন্বা। পরে অবশ্য কৃতবর্মার এই ভাইকে কৃষ্ণ হত্যা করে এবং মণি পুনরুদ্ধার করে সত্যভামার কাছে ফিরে আসে। এই পুরনো শত্রুতার আক্রোশ মেটানোর জন্যই কৃতবর্মা কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছে, যেখানে কৃষ্ণের সরাসরি ক্ষতি না হলেও কৃষ্ণের প্রিয়জনদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের প্রভূত ক্ষতি সম্ভব হয়েছে।

মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ ছয় জন প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে *মহাভারতের ছয় প্রবীণ* নামক বইটি প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী লিখেছেন। আমরা এর পূর্বে একাধিকবার বলার চেষ্টা করেছি যে, মহাভারত শুধুমাত্র পাণ্ডব বনাম কৌরবদের যুদ্ধ একেবারেই নয়। মহাভারত বস্তুতপক্ষে তার থেকেও অনেক বড়ো বিষয়। মহাভারতের অন্যতম ছয় জন স্থপতিকে জায়গা করে দিয়েছে এই বই, যারা মহাভারতকে গভীরতায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে। এরা হল- মহামতি ব্যাস, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর। উক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে একপ্রকার বিশালতা আছেই, তাই চরিত্রগুলিকে বুঝতে গেলে সমসাময়িক একাধিক বিষয়কে আমাদের মাথায় রাখতে হয়। এই চরিত্রগুলির সম্পর্কে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী বলেছেন:

কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, মহাভারতের তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলি দিয়ে মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলির বিচার করলে চলবে না। আসলে মহাভারতের চরিত্রগুলির সঙ্গে তৎকালীন সমাজের ধর্ম, দর্শন, মানবিকতা, ক্ষত্রিয়ধর্ম, রাজধর্ম এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেখানে একটি কি দু'টিমাত্র ঘটনার নিরিখে চরিত্রগুলির সাময়িক বিচার করাটাও নিতান্ত বাতুলতা।^{১২৯}

আসলে মহাভারতের চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে প্রথমেই বোঝা দরকার যে, এখানে বেশিরভাগ প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে এক ধরনের মহাকাব্যিক শক্তি কাজ করে। এ-শক্তি খুব সাধারণ শক্তি নয়; এ-শক্তি ভারতীয় সমাজের ধর্ম, দর্শন এবং নীতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে এক একটি চরিত্রকে এক পরম ব্যাপ্ত প্রতীকে পরিণত করেছে। অন্যদিকে অত্যন্ত বিপ্রতীপভাবে যেখানে ধর্ম নেই, নীতি নেই, সেই অন্যায-অনীতিও এক-একটি চরিত্রের মধ্যে এমন মহাকাব্যিক বিশালতায় উদাহৃত যে, তার গতি এবং শক্তিও কিছু কম নয়। ঠিক এইখানেই মহাভারতের সার্বিক ভাবনার প্রশ্ন আসে।^{১৩০}

মহাভারতের মধ্যে মানুষের জীবনের চারটি পুরুষার্থের কথা গভীরভাবে বলা আছে। এর পূর্বে এই নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। মহাভারতের এই পুরুষার্থগুলি পিতামহ

ভীষ্ম, মহামতি ব্যাস, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের মতো ব্যক্তিত্বের গুণাবলী ও জীবন দর্শন এবং কর্মের মাধ্যমেই অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সকল পুরুষার্থগুলির সঠিক ও যথার্থ প্রয়োগ এবং ব্যবহারের মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবন সার্থকতা লাভ করে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে মহাভারতের এই প্রবীণ মানুষগুলিকে ভালোভাবে জানা ও পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী এই কাজটাই মহাভারতের ছয় প্রবীণ বইটির মধ্যে করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে আমাদের মহামতি ব্যাস, পিতামহ ভীষ্ম এবং বিদুরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনে হয়।

মহাভারতের মধ্যে মহামতি ব্যাসদেব অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একজন চরিত্র এবং স্বয়ং যে মহাভারতের রচয়িতাও বটে। ব্যাসদেব সম্পর্কে প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে ('আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত') দেখানোর চেষ্টা করেছেন ব্যাসদেবের চরিত্রের দ্বৈত টানাপোড়েনের বা সংকটের দিকটি। যেখানে ব্যাস নিজে ঋষি হয়েও সম্পূর্ণরূপে সংসারের মায়া ত্যাগ করতে না পেরে বারবার সংসারে ফিরে এসেছে বা তার সন্তানদের খবর নিয়েছে। আবার স্বাভাবিকভাবেই একজন ঋষির দৃষ্টিপাত নিরপেক্ষ ও নির্মোহ হওয়াটাই কাম্য, কিন্তু সত্যবতীর এই ঋষিপুত্র অধিকাংশ সময় পাণ্ডবদের পক্ষেই নিজের অবস্থান প্রকাশ করেছে। এখানেও সে অন্যান্য অনেক ঋষিদের থেকেই আলাদা। সুকুমারী ভট্টাচার্যের ব্যাসকে নিয়ে এই ভাবনা অনেকাংশেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান। কিন্তু নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর প্রবন্ধে মহাভারতে ব্যাসের এই সংকট বা দ্বিচারিতার মূলে কী কারণ আছে— তার সন্ধান পাই। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ীর এই অন্বেষণটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাগে।

প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর ব্যাসদেব সম্পর্কে যে ভাবনা ও গবেষণা তা ব্যাপকভাবে ব্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের আলোচনায় আমরা প্রথমে ব্যাসের সংকটগুলিকে খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু নৃসিংহপ্রসাদে'র গবেষণায় যেন তার অন্তর্নিহিত সত্যটি আবিষ্কার করলাম। সার্বিকভাবে ব্যাস অত্যন্ত উদার মনের মানুষ, যেখানে সমাজের ন্যায়নীতির উপরেও 'মানুষের ভালোত্ব' তার কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যাস মহাভারতের মধ্যে এমন এক জীবনচিত্র এঁকেছে— যেটির মধ্যে বৈরাগ্য অথবা সন্ন্যাসী হওয়ার অভিসন্ধি নেই। এই বৈরাগ্য বা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাস এক নিয়ম সংযত ক্রমিকতার কথা বলে। ইন্দ্রিয়ের আমাদের যে খাদ্য প্রয়োজন, ব্যাস তা যুগিয়ে দেওয়ার পক্ষে, কিন্তু তার মধ্যে যেন অতিরিক্ত না থাকে, তার মধ্যে যেন ন্যায় বা ধর্ম থাকে। এখানেই ব্যাস বলবার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মসঙ্গত আসক্তির পথ ধরে ব্যাসের দেখানো অনাসক্তির পথে যেতে হবে। পণ্ডিতেরা বলে থাকে মহাভারতের মূল রস শান্তরস— যা ব্যক্তি মানুষকে মোক্ষ/নির্বাণ লাভের কথা বলে। যেখানে ব্যাসদেব মানুষকে

একেবারে মোক্ষতে পৌঁছাতে উপদেশ দেয় না। মহাভারতের রচয়িতা বলে মানুষের জীবনের কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য— প্রত্যেকটিকেই বুঝে নিয়েই মোক্ষে পৌঁছানো দরকার। অর্থাৎ ব্যাসদেব ধর্মকেই প্রধান হিসাবে দেখতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই যেহেতু সাধু সন্ন্যাসীর মতো নির্মোহ জীবন যাপন খুবই কঠিন, তাই মহামতি ব্যাসদেব বারবার বলতে চেয়েছে সংসারের মধ্যে থেকেই মোক্ষ লাভের কথা। মহাভারতে ব্যাসের এই জীবনদর্শন বা শিক্ষার কারণেই তা আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তাঁর বইতে বলেছেন:

ধর্মের কথা বলে ব্যাস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইছেন। তিনি জানেন— মোক্ষধর্ম সবার জন্য নয়। ইহলোকে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না, পরলোকেও স্বর্গাদিবাসনা থাকবে না, অহং-মম থাকবে না,— এমন মানুষ, অথবা শম-দমের সাধনে যাঁরা দৃঢ় এবং যাঁরা মুক্তিলাভ করতে চান— তাঁরা যে সংখ্যায় গুটিকয়েক মাত্র, ব্যাস তা জানেন। মহাভারতে এই মোক্ষধর্মের কথা অবশ্যই আছে— কিন্তু সেটা এখানে প্রধান নয়। মোক্ষের কথাটা এখানে আছে চতুর্বর্গসাধনের অন্য তিন উপায় ধর্ম, অর্থ, কামের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মহাভারতের প্রধান অঙ্গুলি-সংকেত তা হলে কোন দিকে? আমি যতটুকু বুঝেছি, তাতে বার বার মনে হয়েছে— মহাভারতের সমস্ত ঝোঁকটাই ধর্মের দিকে।..... এই ধর্মকে কামের জন্য, ভয়ের জন্য, লোভের জন্য এমনকী জীবনের জন্যও ত্যাগ করা যায় না। অপর দিকে এই ধর্মের জন্য কাম, লোভ, ভয়— সব ত্যাগ করা যায়। ব্যাস সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে এই ব্যবস্থা দিয়েছেন।^{১৩১}

উপরের এই বক্তব্যগুলি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। যেহেতু আমাদের অধিকাংশ জনের মধ্যেই কামনা, বাসনা ও ভোগের ইচ্ছা পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান থাকে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী ভাবনার এই জায়গা থেকেই ব্যাসকে দেখেছেন। সে কারণে সত্যবতীর কথায় পুত্র ব্যাস অশ্বিকা ও অশ্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদনে সম্মত হয়েছে। রাজা না থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়— একথা ব্যাস অবশ্যই বুঝেছে। তাই তৎকালীন সময়ের ধর্ম মেনেই সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের কাজ করতে চেয়েছে ব্যাস। এছাড়াও শুধুমাত্র জন্ম দিয়েই ব্যাস তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে যায়নি, মহাভারতে বারবার দেখেছি আমরা ব্যাস তার পুত্র ও নাতিদের সঙ্গে বারবার দেখা করেছে, আশীর্বাদ করেছে এবং পরামর্শ দিয়েছে। বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জীবন দর্শন বুঝিয়েছে, গান্ধারীর মনের কষ্ট লাঘবের জন্য একাধিকবার হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছে এবং ধৃতরাষ্ট্রকেও ব্যাস যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে কম বোঝায়নি। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী ব্যাসপুত্র শুককেও নিয়ে কতো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, দেখিয়েছেন কীভাবে মোক্ষ প্রাপ্তির পর বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর শুক উর্ধ্বমার্গে চলে যাওয়ার সময় ব্যাসের মানসিক অবস্থা কেমন

হয়েছিল। শোক ও বেদনা তাকে যথেষ্টই আচ্ছন্ন করেছিল। ভাবনার এই জায়গা থেকে ব্যাসদেবকে দেখলে তার সংকট ও দ্বন্দ্বকে বুঝতে পারা সম্ভব।

বইতে নৃসিংহপ্রসাদ পিতামহ ভীষ্মকে নিয়ে অনেকগুলি কথা বলতে চেয়েছেন। আমাদের আলোচনার অন্যত্র এই বিষয়ে দু'একটি কথা বলা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থে প্রাবন্ধিক যেহেতু মহাভারতে ধর্মকে পুরুষার্থগুলির মধ্যে প্রধান হিসাবে দেখতে চেয়েছেন, তাই ভাবনার এই জায়গা থেকে ব্যাসের পাশাপাশি ভীষ্মও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নৃসিংহপ্রসাদ তাই বলেছেন ব্যাস সন্ন্যাসী হতে গিয়েও গৃহস্থের কাজ করে গেছে, অন্যদিকে ভীষ্ম সেখানে গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাসীর মানসিকতায় স্বার্থহীনভাবে রাজবংশের সেবা করে গেল। অবশ্য তার অবিবাহিত থাকাটা মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে সহজ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় না, পাঠকের থেকে বহুমুখী জটিল প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। কিন্তু প্রশাসক হিসাবে ভীষ্মের যে প্রজ্ঞার পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেখানে তার যথার্থই সম্মান প্রাপ্য। ধৃতরাষ্ট্র বা পাণ্ডু নামেই রাজা ছিল। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব যথার্থ অর্থেই সত্যবতী, বিচিত্রবীর্য়, ধৃতরাষ্ট্র বা পাণ্ডু'কে সিংহাসনের সামনে রেখে ভীষ্ম পেছন থেকে নিজে পরিচালনা করেছে। এই দিক থেকে তার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সমরকৌশল খুবই ধারালো হওয়াই স্বাভাবিক। তার এই প্রজ্ঞার কারণেই কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় সর্বোত্তম সম্মান প্রদান করতে তার বাধেনি। কারণ ভীষ্ম দেখতে পেয়েছিল যে পুরনো দিনের প্রচলিত যুদ্ধ পদ্ধতি ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষ্ণ একটিও যুদ্ধ হারেনি, তার পেছনে কৃষ্ণের চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। শুধুমাত্র কূটনৈতিক চাতুর্যের জোরেই যে একটি মানুষ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে, সেই বোধ অন্য কারও না থাকলেও ভীষ্মের ছিল বলেই কৃষ্ণকে রাজসূয় যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ উপহারটি প্রদানের প্রস্তাব রাখতে পেরেছিল। ফলে আগামী দিনে যুধিষ্ঠিরদের পক্ষে যদি এরকম একজন 'সমর বিশারদ' ব্যক্তি থাকে, তাহলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাণ্ডুপুত্ররা শক্তিশালী হয়ে উঠবে— এমন ভাবনা ভীষ্মের ছিলই। যেখানে পরবর্তীকালে শুধুমাত্র কৃষ্ণের কূটনীতি ও রাজনৈতিক কৌশলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠিররা বিজয়ী হবে এবং সমাজে সর্বস্তরে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, এই ইঙ্গিত অনেক আগেই পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণকে দেখে বুঝেছিল।

এছাড়াও পিতামহ ভীষ্মকে নিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী মহাভারতের ছয় প্রবীণ বইতে অন্য একটি চমৎকার প্রসঙ্গ এনেছেন। শরশয্যায় যন্ত্রণাতে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা এক বৃদ্ধের মুখ থেকেই কেন যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, রাজধর্ম ও সমাজনীতির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কথাগুলি শোনানো হল? সত্যিই তো, মহাভারতে এ বিষয়ে কম জ্ঞানী পুরুষের অভাব ছিল না। যুদ্ধ শেষের পর রাজা যুধিষ্ঠির যাবতীয় সংশয় নিয়ে পিতামহের কাছে এসেছে ধর্ম ও ন্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত

জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার জন্য, কারণ যুধিষ্ঠিরের মনে হয়েছিল এতো বৃহৎ রাজ্য যথার্থভাবে শাসনের জন্য তার পর্যাপ্ত প্রজ্ঞা নেই। যুধিষ্ঠির যখন এই জ্ঞান লাভের জন্য ভীষ্মের কাছে হাজির হয়েছে, তখন ব্যাসদেব ও নারদ সামনেই ছিল। যে নারদ লৌকিক জ্ঞান এবং রাজনীতিশাস্ত্রের এতো বড়ো তাত্ত্বিক প্রণেতা, তার মুখ থেকে কেন রাজধর্ম ও সমাজনীতি এবং কূটনীতির জ্ঞানগুলি ব্যাসদেব উপস্থাপন করলো না? নারদ ছাড়াও ব্যাস নিজেও এই বিষয়গুলিতে যথেষ্টই জ্ঞানী। কিন্তু ভীষ্ম এক্ষেত্রে উভয়ের থেকেই আলাদা। এখানেই তার গুরুত্ব। নারদ ও ব্যাস যেখানে ব্রাহ্মণ এবং তাদের এক্ষেত্রে যে জ্ঞান আছে, তা অবশ্যই শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান। কিন্তু রাজনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে চলে না। এদিক থেকে গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় জ্ঞানেরই অধিকারী। যেখানে ভীষ্ম বৃহস্পতি সম্প্রদায়ের গুরুদের থেকে বৃহস্পতি-কথিত বাহ্যস্পত্য শিখেছে, অন্যদিকে সে অসুরগুরু শুক্রাচার্যের সম্প্রদায়ের গুণী আচার্যদের থেকে অসুরদের রাজনীতির স্বরূপটিও সমানভাবে জেনেছে। ভীষ্ম অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছে স্বয়ং পরশুরামের কাছ থেকে, আবার এত কিছু তাত্ত্বিক ও ফলিত জ্ঞান লাভের পর ভীষ্ম নিজের মতো করে রাষ্ট্রসম্বন্ধী বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অবস্থান জানিয়েছে। এখানেই ভীষ্ম কিন্তু অন্যদের থেকে আলাদা। এই জ্ঞানগুলি মহাভারত হতে পাওয়া এক অমূল্য সম্পদ। যা মহাভারতের পাঠক বা গবেষকদের নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। ভীষ্ম চরিত্রের এই জায়গাটি প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী খুব সুন্দর ধরেছেন।

মহাভারতে ব্যাস এবং ভীষ্মের পরই আমাদের কাছে বিদুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মহাভারতের বৃহৎ পটভূমিতে বিদুর হয়তো তার জ্ঞান ও যোগ্যতার তুলনায় কম সম্মান পেয়েছে, কিন্তু যে মহাভারত দাঁড়িয়ে আছে শান্ত রসের ওপরে তা বিদুরের অনুপস্থিতিতে অসম্পূর্ণই থেকে যেত। তাকে নিয়ে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ বলেছেন:

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা আর একটু অন্যরকম হলেই ইতিহাস বদলে যেত। পারিবারিক ইতিহাস তো বটেই, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসও বদলে যেত। এমন মানুষ এই সংসারেই দেখেছি, যাঁর জ্যেষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল, তিনি কনিষ্ঠ হয়ে জন্মেছেন।..... বিদুরের কথা বলতে গেলে কপালের গুণের কথাও আছে, কপালের দোষের কথাও আছে, আবার রাজনৈতিক কারণও আছে— যাতে যা যা তিনি হতে পারতেন, তা তিনি হননি। তিনি ঋষি হতে পারতেন, বিশালবুদ্ধি ব্যাসের তিনি পুত্র, একজন পূর্ণপ্রজ্ঞ ঋষি হওয়ার অধ্যাত্মবীজ তাঁর মধ্যে ছিল।..... অথচ তিনি উত্তম রাজা হতে পারতেন, কেননা রাজনৈতিক জ্ঞান এবং নিরপেক্ষতা— এ দুটি তাঁর অন্য ভাইদের চেয়ে বেশি ছিল। রাজ্য চালাতে গেলে এবং পররাষ্ট্রীয় রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সে বুদ্ধিও তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি ছিল।^{১৩২}

সত্যিই তো, অনেক গুণের বিবিধ সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও বিদুর থেকে গেছে হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে। মহাভারতের অনেক সমস্যাই বিদুর হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিল। এর কারণ হিসাবে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী দেখিয়েছেন বিদুরের রক্ত একাধারে ব্যাসদেবের সংস্কারের ঐতিহ্য বহন করেছে, অন্যদিকে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধি শূদ্র মায়ের গর্ভে বেড়ে ওঠার কারণে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি ও প্রতিবাদগুলি মন থেকে অনুভব করেছে। বিদুরের জন্ম রহস্য এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতিগতভাবে অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ ধর্ম ও নীতি এবং শৃঙ্খলার অযান্ত্রিক সত্তা হিসাবে পুরো মহাভারতের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ধর্ম ও নীতি যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়, যা ক’য়েক হাজার বছর ধরে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সমগ্র মহাভারত জুড়ে এরকম অসংখ্য ধর্ম ও নীতির শিক্ষা বিদুরের হাত থেকে আমরা পেয়েছি, নৃসিংহপ্রসাদের অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে থেকে কিছু আমরা বলার চেষ্টা করছি। এই বিষয়ে প্রথমেই আমাদের মনে হয় জতুগৃহের ঘটনা, যেখানে মূলত বিদুরের শেখানো বিদ্যার উপর ভর করে যুধিষ্ঠিররা প্রাণে বেঁচে ছিল। বিদুর এক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছিল যে পাণ্ডবদের যা কিছু উপকার করতে হবে সবটাই বর্তমান রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে এবং তা করতে হবে সম্পূর্ণ অন্তরালে ও চুপিচুপি। যে কারণে কুন্তীকে সন্তানদের সুরক্ষায় মন দেওয়ার কথা বলার পাশাপাশি নিজেও তার ঘরে অধিক সময় থাকেনি। কারণ সেক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ছোট ছোট কিশোর কুন্তী পুত্রদের প্রতি বিদুরের মন্ত্র থেকেছে প্রতিরোধের পথে না গিয়ে সহ্য করার নীতি। যুধিষ্ঠিরেরা যেহেতু নিজেদের রাগ ও দুঃখ বুঝতে না দিয়ে প্রতিপক্ষের অপচেষ্টাগুলি রুদ্ধ করে দিচ্ছিল, এই সম্বন্ধে নির্বাক ও নির্বিকার যে অবস্থান তারা নিয়েছিল একপ্রকার, তাতে দুর্যোধনের পক্ষে সূক্ষ্ম বিদুরের নীতি বোঝাটা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। ইন্দ্রপ্রস্থে আলাদা রাজ্য পাওয়ার পরেও যে রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছিল, সেখানে অর্থের খরচের হিসাব রাখার জন্য বিদুর দায়িত্ব পেয়েছিল। যে কোনও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ, অর্থ কোন কোন খাতে খরচ হবে এবং কর কোন কোন ক্ষেত্র থেকে তুলে আনা হবে— এ বিষয়ে মহাভারতের বিদুর অবশ্যই অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

নৃসিংহপ্রসাদ প্রতিভা বসু’র মতো বিদুরের সঙ্গে কুন্তীর কোনও সম্পর্ক ছিলো বলে বিশ্বাস করেন না। সেদিক থেকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিদুরের সরাসরি রক্তের সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। উভয়ের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রজ্ঞা, ন্যায় ও নীতি এবং উপযোগী শৃঙ্খলে সহবস্থানের সূত্রেই। বলাই বাহুল্য, প্রতিভা বসু’র বিদুর সম্পর্কে ভাবনাটি আমরাও সমর্থন করি না।

হস্তিনাপুরের মঙ্গলের জন্য সদাই যথোপযুক্ত পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে গেছে বিদুর। দুর্যোধনের জন্মের পরেই পরবর্তী যুবরাজ ও রাজার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা খেয়াল করে দুর্যোধনকে ত্যাগ করার বিষয়টি বিদুরেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। অন্ধ পুত্র স্নেহে নিমজ্জিত পিতার দুর্বলতার দিকটি বিদুর জন্ম লগ্নেই খেয়াল করেছিল। আবার সে ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে অনেক কথাই নানা সময়ে পাণ্ডবদের বুঝিয়ে এসেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিদুর কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যদের মতো কম প্রয়াস করেনি। বিদুর মহাভারত জুড়ে শুধু পরামর্শ দিয়েই থেমে থাকেনি, মানুষের জীবনে যা করা উচিত এবং যা অনুচিত, কাকে ধরা উচিত, কাকে ফেলা উচিত, কোন গুণ থাকলে রাজা হওয়া যায় ও কোন বিদ্যা আয়ত্ত করলে সমৃদ্ধি আসে— এরকম প্রচুর নীতিকথা বিদুর বলে গেছে। বিদুরের এই নীতিকথাগুলি পরবর্তীকালে ‘বিদুর নীতি’ নামে খ্যাতি লাভ করেছে, এমনকী আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের অনেক নীতিকথাই বিদুর নীতি দ্বারা প্রভাবিত। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র দেওয়ার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি শেষ করতে চাই।

বিদুর বললেন— চার রকম মানুষের রাতে ঘুম আসে না, মহারাজ। রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে প্রবলতর ব্যক্তির চাপ যদি অসহায় দুর্বল মানুষকে সহ্য করতে হয়, তবে সেই বেচারার ঘুম আসে না, মহারাজ। আর ঘুম আসে না সেই ব্যক্তির, যার ধন হরণ করা হয়েছে, যে জৈবিক কামনায় উত্তাল, আর হল চোর। বিদুর বোধ হয় বলতে চাইলেন যে— আজকে আপনার ঘুম আসছে না বটে, কিন্তু এতগুলি বছর পাণ্ডবরাও ঘুমোননি। কারণ, না-ঘুমোনো চার প্রকারের মধ্যে প্রথম দুটি কল্প পাণ্ডবদের ক্ষেত্রেই খাটে, আর শেষ দুটি কল্প দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। বিদুর বললেন— এই চারটির মধ্যে কোনওটা আপনার ক্ষেত্রে খাটে না তো? অথবা অন্যর বিত্ত হরণ করে এখন আপনি পরিতাপ করছেন না তো?^{১৩৩}

দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনিদের ওপর বিশ্বাস করে নিজের সমৃদ্ধি চাইলেন। এটা কি পণ্ডিতের লক্ষণ মহারাজ? পণ্ডিত হলেন তিনিই মহারাজ, যাঁর নিজের পরিমিতি বোধ আছে, যিনি সময়ে কাজ আরম্ভ করতে পারেন, যাঁর সহিষ্ণুতা আছে এবং যিনি নীতিচ্যুত হন না।^{১৩৪}

কৃপাচার্য মহাভারতে হস্তিনাপুর রাজপরিবারের শিক্ষাগুরু হিসাবে দিন কাটিয়ে এসেছে। তবে দ্রোণাচার্য নিযুক্তির পর আদিগুরু হিসাবেই কৃপাচার্য থেকে যায়। কোনও রাজনৈতিক সংকটে সেভাবে কখনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে তাকে আমরা দেখি না। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তার বইতে মূলত দেখতে চেয়েছেন গুরু কৃপাচার্য, যে চিরকাল ন্যায় ও ধর্ম মেনে যুধিষ্ঠিরদের পাশে থেকে এসেছে, সেই কৃপ কেন অশ্বখামার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাণ্ডবদের পুত্র সহ অন্যান্যদের রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো? যথোপযুক্ত সেই অন্বেষণ আমাদের মুগ্ধ করে। ধৃতরাষ্ট্রকে গভীরভাবে চিনতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী, তার মনের অভ্যন্তরে যে সংকট ও দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত চলেছে এবং যার ফলস্বরূপ অন্যায় ও অবিচারে ধৃতরাষ্ট্র সর্বদাই শেষ পর্যন্ত

প্রিয় পুত্রের দাবিগুলি মেনে নিয়েছে। এরকম একটি চরিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নৃসিংহপ্রসাদ বলেছেন:

মহাকাব্যের একেকটি চরিত্রে যে নায়কোচিত উদাত্ত গুণ থাকে, তাও এই ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে নেই, এমনকী খলতা, ধূর্ততা, শঠতা— ইত্যাদি মন্দ গুণের কলুষ দিয়ে যদি বা কখনও ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর খণ্ডিত করা যায়, তবু সেগুলি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রচনা করে না। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের আত্মা রচিত হয়েছে পুত্রস্নেহ দিয়ে। অথগু, বাঁধভাঙা, অবুঝ স্নেহ, যেটাকে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যে ‘রিপু’ই বলতে হবে।^{১৩৫}

বাঙালির মহাভারত চর্চার ওপর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্যই *কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়*, প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী’র এই বইটির কথা না উল্লেখ করলেই নয়। মহাভারতের ছয় জন প্রধান ব্যক্তি চরিত্রদেরকে এই বই স্থান দিয়েছে। এরা হলো- কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী এবং কর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই কুন্তীকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ তার জটিলতা ও মনস্তত্ত্ব না বোঝা গেলে কর্ণের প্রতি হওয়া বঞ্চনার বিষয়টিকে ধরা যাবে না। *মহাভারতের অষ্টাদশী* বইতে কুন্তী নামক চরিত্রটিকে নৃসিংহপ্রসাদ যেভাবে মেলে ধরেছিলেন, এখানেও তাঁর বক্তব্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুটি একই। পিতা মাতা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তাকে পালক পিতার অধীনে হস্তান্তর করার মাধ্যমে শৈশবে যে জটিলতাগুলি তাকে মর্মাহত করেছিল, তার প্রভাব কর্ণের উপরে স্বাভাবিকভাবেই পড়েছিল। অন্যদিকে দুর্বাসার মতো ক্রোধী ঋষির অত্যাচার ও আবদার কিশোরী অবস্থাতেই পালক পিতার অনুরোধে কুন্তীকে মেটাতে হয়েছে। সেখান থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া এবং কিশোরীর নিতান্ত কৌতুহলবশত হয়ে মন্ত্রের প্রভাব বুঝতে চাওয়ার মধ্যে সেরকম বড়ো কোনও ভুল ছিল না। তা সত্ত্বেও সূর্য দেবকে কুন্তীর তরফে বারবার ফিরে যেতে বলা এবং নিজে কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও সূর্য কুন্তীর মতো সুন্দরী রমণীকে পূর্ণ সম্ভোগ না করে ফিরে যেতে চায়নি। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পালিত পিতার সম্মান রক্ষার্থে মিলনে একপ্রকার বাধ্যই হয়েছিল সে। ফলস্বরূপ কর্ণকে গৃহের দাসী মারফত জলে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কৈশোরের এই বেদনা ও বঞ্চনার পাশাপাশি বিবাহিত জীবনেও তার নেমে এসেছিল একরাশ অপ্রাপ্তি ও যন্ত্রণা। যেখানে নেমে এসেছে স্বামী সুখ হতে বঞ্চনা এবং তার মৃত্যুর পর পাঁচ পুত্রকে নিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ লড়াই। ফলে পাণ্ডবদের বনবাসকালে কুন্তী বিদুরের ঘরে থাকাকালীন ন্যায় ও রাজধর্মের বিষয়ে একাধিক ভাবনা ভেবেছে। যে কারণে আজীবন বঞ্চনার শিকার যে রমণী নিজেকে ও সন্তানদের রক্ষায় এতকাল অতিবাহিত করে এসেছে, সেই রাজমাতা কুন্তী এখন কৃষ্ণের মারফত যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য উদ্ধারের জন্য বিদুলার আখ্যান শুনিচ্ছে। যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সম্পর্কে। দ্রৌপদীর ওপরে হওয়া অন্যায়কে যুদ্ধের

মাধ্যমে মোকাবিলার কথা শুনিয়ে দিয়েছে। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যখন পাণ্ডবরা বিজয়ী হয়েছে, হস্তিনাপুরে ধর্মরাজ্য স্থাপন হয়েছে, তখন কুন্তীর মধ্যে অদ্ভুত রকম বৈরাগ্য আমরা লক্ষ করেছি। কুন্তীর জীবনের এই তিনটি দিক বা প্রবণতা প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। যেখানে আছে কৈশোর ও শৈশবের বঞ্চনার ইতিহাস, বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামীর সম্ভোগসুখ না পাওয়া এবং স্বামীর মৃত্যুর পর কীভাবে সন্তানদের দুর্যোধন ও শকুনির অত্যাচার হতে বাঁচানো যায়- সেই চিন্তায় সর্বদাই চিন্তিত থাকা এক নারী এবং অজ্ঞাতবাসের পর নিজ অধিকার, রাজ্যপাট ও সম্পত্তি কীভাবে ফিরিয়ে নেওয়া যায় সেই পরামর্শ দেওয়া, এরপর সম্পূর্ণভাবে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পর কুন্তীর মনে বৈরাগ্যের আগমন এবং পূর্বের অস্থির চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবার মধ্যে দিয়ে কালযাপন—এই সম্পূর্ণ যাত্রাপথটি দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন প্রাবন্ধিক।

প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে বলতে গিয়ে অনেকাংশেই বুদ্ধদেব বসু'র *মহাভারতের কথা*-র সঙ্গে সহমত হয়েছেন। আসলে মহাভারতের প্রধান কেন্দ্রীয় রস অবশ্যই শান্তরস, আলংকারিক ও নন্দনতত্ত্বের খ্যাতনামা মানুষেরা তাই মনে করেন। সেদিক থেকে যুধিষ্ঠিরকে নায়ক হিসাবে বেছে নেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত। তাই সেদিক থেকে যুধিষ্ঠির নাকী ব্যাসদেবের কাছে একটা ‘এক্সপেরিমেণ্ট’ এর বিষয় বলে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী মনে করেন। একটা নীতিশুদ্ধ মানুষ, যার মন সর্বদাই ধর্ম ও জগতের মঙ্গল কামনায় পরিশীলিত, সেই যুধিষ্ঠির। নীতি ও ধর্মের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে একজন মানুষ, অথচ সব ক্ষেত্রে পারছে না— এটাও যুধিষ্ঠিরের একটা দিক। সাধারণত যুদ্ধে যোদ্ধাকে প্রচলিত যে যুদ্ধের ধরন ও কৌশল তাতে বিপক্ষকে পরাজিত করে জিততে হয়। যুদ্ধের এটি একটি সাধারণ দিক, যা অর্জুন ও ভীম করে এসেছে। কিন্তু ধর্মের প্রতীক যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে সর্বদাই নিজের মনের সঙ্গে, যার ফলে যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে তার মনের গভীর পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি। এই মনের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব লড়াই করতে থাকা যে যুধিষ্ঠিরকে আমরা সহজে দেখতে পাই না, সেই ‘নায়ক’ যুধিষ্ঠিরকেই নৃসিংহপ্রসাদ তাঁর লেখায় দেখতে চেয়েছেন। যুধিষ্ঠির সম্পর্কিত এই ভাবনাটি আমাদেরও মুগ্ধ করে রাখে। চুপ করে বসে থেকে শুধুই আমরা মনে করতে থাকি যে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কতো ধর্ম সম্পর্কিত গুণের প্রকাশই না ঘটিয়েছে ! মহাভারত শান্তরসের মহাকাব্য হওয়ার পেছনে তাই যুধিষ্ঠিরের কম ভূমিকা নেই। আমরা মূল যে কথা বলছিলাম, যুধিষ্ঠিরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী বলেছেন:

আশ্চর্য লাগে আমাদের—জন্ম লগ্নেই যে মানুষটির ওপর নরোত্তম ধার্মিকের এক মার্কা মেরে দেওয়া হল, সদা-সত্য কথনের বিশাল মর্যাদায় যে শিশুটিকে চিহ্নিত করা হল, সারা জীবন

ধরে সেই ধর্ম আর সেই সত্যবাদিতা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে এক পরম তত্ত্বের মতো, আদর্শের মতো। সারাক্ষণ তাঁকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে— আমি ঠিক কাজটিই করছি তো? ধর্ম থেকে, সত্য থেকে আমি বিচ্যুত হচ্ছি না তো? অন্য কেউ পাশা খেললে দোষ নেই, যুধিষ্ঠির পাশা খেললেই তিনি ধর্মচ্যুত। স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে না পারলে অন্যের ক্ষেত্রে তা পৌরুষের অপমান, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে তা ধর্ম-চ্যুতি।^{১৩৬}

আরও আশ্চর্য- কী বিপ্রতীপ মহাত্ম্যই না তাঁর কাছে আশা করা হয়েছে! একদিকে তিনি ধার্মিক শ্রেষ্ঠ নরোত্তম হবেন, সত্যবাদী হবেন, আর একদিকে তিনি রাজাও হবেন— বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্যাং ভবিষ্যতি। ধর্ম, সত্য এবং রাজত্ব— একই ব্যক্তির মধ্যে চরম বিপ্রতীপ এই তিনটি গুণের সমাহার যেখানে সমস্ত মানুষের আশার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সেই ব্যক্তিকে মনের সঙ্গে কীরকম সংগ্রাম করতে হয়, তা একমাত্র যুধিষ্ঠিরই জানেন।^{১৩৭}

এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যুধিষ্ঠিরের নিজের মনের মধ্যে হওয়া একপ্রকার মানসিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ। যে লড়াই তাকে লড়তে হয়েছে আজীবন, এখানেই সে অন্য মহাভারতের চরিত্র অপেক্ষা আলাদা। ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের ছিল প্রজারঞ্জনের বৃত্তি, যা তাকে শৌর্য ও বীর্যে বলবান যে কোনও রাজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে। আমাদের ভাবনার এইরকম দিকগুলি থেকে যদি যুধিষ্ঠিরকে পড়তে চাই, তাহলে সম্পূর্ণ অন্য একরকম নায়কের ছবি সামনে ভেসে উঠবে। যেখানে তার অন্য দুই ভাই ভীম ও অর্জুনের ছবি অনেকাংশে ম্লান হয়ে ওঠে। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত থেকে দু'তিনটি না বললেই নয়। গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাত থেকে দুর্যোধন সহ অন্যান্য কৌরবদের মুক্তির জন্য অর্জুনকে যুধিষ্ঠির কর্তৃক আদেশ দেওয়া, বোন দুঃশলার কথা ভেবে জয়দ্রথকে ভীমের হাত থেকে বাঁচানো অথবা যক্ষের কাছে বিমাতা মাদ্রীর পুত্র নকুলের জীবন প্রার্থনা প্রভৃতি ঘটনাগুলি যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম ও ন্যায়ের চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে যায়। এরপর আসে অবশ্যই যক্ষের প্রশ্নগুলির উত্তর দানের প্রসঙ্গটি। সবথেকে আনন্দে থাকা ব্যক্তিটির বিষয়ে যুধিষ্ঠির যক্ষকে জানায়, যেই মানুষ নিজের দেশে থাকতে পারে, সেই মানুষ ধার না করে দিনের শেষে শাক-ভাত যদি খেতে পায়, তাহলে সেই মানুষই সব থেকে বেশি আনন্দে দিনযাপন করে। আবার পথ কাকে বলে? যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির জানিয়েছে, যে পথে বহু মানুষ গেছে তাই আদর্শ পথ। যুধিষ্ঠির বেদ, উপনিষদ ও বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন হৃদয়ে আত্মস্থ করেও খুব সহজভাবে প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে। যক্ষের এরকম যে প্রশ্নগুলি মহাভারতের স্থান পেয়েছে এবং যুধিষ্ঠির যেভাবে প্রশ্নগুলির গভীর অর্থবহ উত্তর দিয়েছে তাতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ধর্মবোধে যুধিষ্ঠিরের উচ্চতা সহজেই বোধগম্য। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু এবং নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা সহমত। যে যুক্তি ও বিদ্যায়তনিক ভাবনার পরিসর থেকে তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে দেখার চেষ্টা করেছেন, তা যথার্থ অর্থেই চমকপ্রদ।

মহাভারতে দ্রৌপদীকে নিয়ে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী বলেছেন। আমরাও এর পূর্বে দ্রৌপদীকে নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছি। দ্রৌপদীর বিবাহের সঙ্গে জড়িত মহাদেবের বর, দ্রৌপদীর জন্ম, কেন দ্রৌপদী কৃত্য, পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক ও রসায়ন, যুধিষ্ঠিরকে ন্যায় ও ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান-প্রদান এবং একধরনের আপসহীন মনোভাব দ্রৌপদী চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যুদ্ধে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থেকে এবং প্রচুর নির্দোষ মানুষের প্রাণ যাওয়ার কথা ভেবে যখন যুধিষ্ঠির তার ন্যায় ও ধর্মের কথা ভেবে যুদ্ধ বিমুখ হওয়ার কথা ভাবছে, তখন দ্রৌপদী ছিল সেই মানের ক্ষত্রিয়রমণী যে কোনও কিছুর মূল্যেই মান খোয়াতে রাজি থাকেনি। বাস্তব জীবনে প্রেমিকা বা কুলবধূ হওয়ার পাশাপাশি সে ক্ষাত্র তেজে তেজস্বিনীও বটে। তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তার স্বামীদের ন্যায় সমান্তরাল। অজ্ঞাতবাসের শেষে যেখানে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে কথা উঠেছে, যেখানে সহদেব ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডবেরা সবাই সন্ধিতেই রাজি ছিল, সেখানে দ্রৌপদী বারবার প্রতিশোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর এই দিকটি তার চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী বলেছেন:

দ্রৌপদী আজকে আবার রাজনীতির পাকা আলোচনায় সামিল। অনেক কথার মধ্যে দ্রৌপদী বললেন— যুধিষ্ঠির মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে সন্ধি চাচ্ছেন, তাও যেন লজ্জার সঙ্গে.....। মনে রেখ কৃষ্ণ! দুর্যোধন যদি ঈঙ্গিত রাজ্য না দেন, তাহলে যেন খবরদার সন্ধি করতে যেয়ো না, দুর্যোধন করতে চাইলেও না.....। তাদের ওপরে তোমার দয়া দেখানোর দরকার নেই। যেখানে মিষ্টি কথায় কাজ হয় না, সেখানে দণ্ড দিতে হয় এবং এই পাপিষ্ঠদের দরকার মহাদণ্ড— তস্মাত্তেষু মহাদণ্ডঃ ক্ষেপ্তব্যঃ ক্ষিপ্ৰমত্যত।^{১৩৮}

এছাড়াও দ্রৌপদীর বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা এবং অগাধ জ্ঞানের বিষয়টি অন্যান্য মহাভারত গবেষকদের মতো নৃসিংহপ্রসাদও গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ধর্ম ও নীতির বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের ভাবনা ও অবস্থান সাধারণভাবে অনেক মহৎ ও উচ্চমার্গের। যেখানে ক্ষমাই তার কাছে বড়ো ধর্ম। যেখানে যুদ্ধ বিষয়টাতেই যুধিষ্ঠিরের অনেক আপত্তি আমরা দেখেছি, সেখানে তার বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদীর বক্তব্যে যে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনের কথা উঠে এসেছে, তা যথার্থ রাজার ধর্ম স্মরণ করায়। যুধিষ্ঠিরের নীতি ও ধর্মের অবস্থান অনেক উপরে। কারণ হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য যুধিষ্ঠিরের এই মহৎ অবস্থানের কথাই আমাদের জানান দিয়েছে। প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী তাই যথার্থই বলেছেন যে যুধিষ্ঠির জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয় হলেও তার ভাবনা ও অবস্থান ব্রাহ্মণের মতো। আর এই অবস্থানে রাজ্য শাসন একেবারেই অসম্ভব। তাই মহাভারতকার মহামতি ব্যাস দ্রৌপদীর মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত কথাগুলিও একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেনি। মহাভারতে বনপর্বে তাই যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীর বলা এই কথাগুলি এই কারণেই এত

গুরুত্বপূর্ণ। এই উক্তিগুলির মধ্যে যেমন দ্রৌপদীর জ্ঞানের পরিধি বোঝা যায়, ঠিক তেমনই রাজার রাজধর্মকেও তা স্মরণ করায়। বস্তুত এই পরামর্শগুলিই পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠিরকে প্রভাবিত করে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে যথার্থ অধিকার ও প্রাপ্য বুঝে নিতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এগিয়ে যায়।

দ্রৌপদীর জবানীতে তার বক্তব্য হয়ে উঠেছে বক্রোক্তির সংকেতে অলংকৃত। মহাভারতকার অলংকারের ধার ধারেন না, সহজ কথা তিনি এত সহজেই বলেন যে দ্রৌপদীর বক্তব্য যেন আরও স্কুরধার হয়ে ওঠে। মহাভারতের দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কাছে রাগে ফেটে পড়েন— তোমার শরীরে কি রাগ বলে কোনও জিনিস নেই মহারাজ! তোমার জোয়ান জোয়ান ভাইয়েরা সব ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদের খাওয়ার জন্য পাচকেরা শতক ব্যঞ্জে রান্না করে দিত, তাদের এখন বন্য খাবার ছাড়া গতি নেই। এই ভীমকে দেখে তোমার রাগ হয় না মহারাজ! যার পথ চলার সুখের জন্য দুয়ারে গোটা কতক রথ, হাতি, ঘোড়া প্রস্তুত থাকত, যে একাই সমস্ত কৌরবদের ধ্বংস সাধনে সমর্থ, তাকে দুঃখিত অন্তরে বনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে দেখে তোমার রাগ হয় না মহারাজ! যে অর্জুনের তুলনা শুধুই অর্জুনই, অস্ত্রসন্ধানে যে যমের মতো সমস্ত রাজার মস্তক নত করে ছেড়েছিল, সেই বাঘের মতো মানুষটাকে দেখে তোমার রাগ যে কেন বেড়ে যায় না— তাই ভেবে আমার মুছো যেতে ইচ্ছে করে.....। তারপর আছে নকুল, অমন সুন্দর চেহারা, অমন বীরত্ব— দর্শনীয়শ্রু শূরশ্রু, আছে সহদেব, কোনওদিন কোনও দুঃখ সহিতে হয়নি বেচারাকে— আহা তাদের দেখেও কি তোমার রাগ বেড়ে যায় না মহারাজ!^{১৩৯}

যুধিষ্ঠিরের কিছুই হয়নি, কোনও বিক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়াও নয়। দ্রৌপদী সর্বসহ প্রহ্লাদের উক্তি পর্যন্ত উদ্ধার করে যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মতেও মাঝে মাঝে ক্রোধের প্রয়োজন আছে, অন্তত রাজনীতিতে, শত্রু-ব্যবহারে। কিন্তু যুধিষ্ঠির তবু সেই মিন-মিন করে সেই অক্রোধ, ক্ষমা, আর শান্তির বাণী পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। এবার রাগের বদলে দ্রৌপদীর ঘেন্না ধরে গেল যেন। যে ধর্ম মানুষকে এমন করে ডোবায়, সেই ধর্মের প্রবক্তার ওপরেই তাঁর ঘেন্না ধরে গেল যেন।^{১৪০}

প্রেমিকা এবং স্ত্রী হিসেবে দ্রৌপদীর ভূমিকা কীরকম ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অনেক মহাভারতের গবেষকই খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদও এই বিষয়ে অন্যথা করেননি, তবে মহাভারতের কথা বইতে এই বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু'র সঙ্গে তিনি সহমত হননি। বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ কবি ও প্রাবন্ধিক, তাই তার ভাষার কারুকার্য ও অলংকারে এবং শব্দ বিন্যাসে যুধিষ্ঠিরের প্রতিই দ্রৌপদীর পূর্ণ সমর্পণ বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা সহমত নই প্রাবন্ধিক বসু'র সঙ্গে। আসলে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতি ও ধর্মে এতো বেশি বড়ো ও মহান হওয়ার কারণে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা প্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর হওয়া অনেক কঠিন। বলা বাহুল্য, বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর রাগ ও অভিমান লুকানো ছিল না। এক্ষেত্রে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বয়সের পার্থক্য বেশি না হওয়া সত্ত্বেও তার আজন্মালিত

ধর্মীয় ন্যায়নীতির সংস্কারেই স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহারটি ছিল বয়স্ক স্বামীর মতো। অন্যদিকে ভীম ও অর্জুনকেই দ্রৌপদী সবথেকে বেশি ভালোবাসত। কৌরবদের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার কথাই হোক বা কীচক হত্যাই হোক অথবা সরোবর থেকে পদ্ম তুলে আনার কথাই হোক— সব ক্ষেত্রেই এই দুই ভাই দ্রৌপদীর প্রেমের অম্ল-মধুর রসের পাত্র হয়েছে। আবার অন্যদিকে নকুল ও সহদেবের প্রতি দ্রৌপদীর বাৎসল্য রসের প্রকাশটি অধিক লক্ষ করা গেছে।

অর্জুনের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী যুধিষ্ঠিরের বিপরীতে অর্জুনকে দাঁড় করিয়ে অর্জুনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। ধর্ম ও মোক্ষতত্ত্বের নিরিখে যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের সিংহাসনে বসানোটা খুবই সহজ। কারণ যেখানে শাস্ত্রকার ও আলংকারিকেরা মহাভারতকে শান্তরস প্রধান মহাকাব্য হিসাবে উপস্থাপন করেছে, সেখানে শম-প্রধান যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বানাতে যুক্তির অভাব হয় না। এরপরেই অর্জুনের পক্ষে দাঁড়িয়ে নৃসিংহপ্রসাদ অসাধারণ একটি কথা বলেছেন। বিষয়টি হল যে অর্জুনের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও বলদর্পিতা এবং অসাধারণ প্রেমিক সত্তা যদি মহাভারতে গৌণ রস হয়, তাহলে শুধুমাত্র নীতি ও ধর্মের রসহীন তাত্ত্বিক কথায় মহাভারত কি আদৌ সমাজের সকল মানুষ সমান আগ্রহে পড়ত? অবশ্যই অনেকেই পড়ত না। সেক্ষেত্রে মহাভারত শুধুমাত্র দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হিসাবেই বিবেচিত হয়ে থাকত। অর্জুনকে রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কৃষ্ণ গীতা তাকেই শোনার জন্য আদর্শ হিসেবে ভেবেছে। আমরা আগেই বলেছি যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, সহ্য এবং ত্যাগ অসম্ভব রকমের উচ্চ স্তরের। কিন্তু অর্জুন এক্ষেত্রে অন্য পাঁচজন মানুষের মতো, তাই প্রতিটি ঘটনায় ও বিপদে অর্জুনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। এই প্রতিক্রিয়াগুলি কতটা ঠিক নাকী ভুল— সেটা অন্য প্রশ্ন। তবে মহাভারতের সাধারণ পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে অর্জুনের এই প্রতিক্রিয়াগুলি অবশ্যই মানুষোচিত, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার এই দ্রুত প্রতিক্রিয়াগুলি মেলার কারণে সেও মহাভারতের অন্যতম নায়ক চরিত্র বটে।

৪.১১।।

শামিম আহমেদ (১৯৭৩-বর্তমান)

একুশ শতকে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালি মহাভারতকে নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি ও চর্চা করে চলেছেন, তাদের মধ্যে প্রাবন্ধিক শামিম আহমেদ একজন। প্রাবন্ধিকের *মহাভারতে দ্রৌপদী*, *মহাভারতে যৌনতা*, *মহাভারতে বিবাহ*, *মহাভারতে গুপ্তহত্যা* এবং *মহাভারতে নাস্তিকতা* বইগুলি মহাভারতের বর্তমান পাঠক ও এই সময়ের সাহিত্য সমালোচকদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়া বাংলা দৈনন্দিন সংবাদপত্রে মহাভারতের নানান বিষয় নিয়ে শামিম প্রায়ই লিখে

থাকেন। এদিক থেকে শামিম একজন মুক্তমনা মহাভারত গবেষক। প্রাবন্ধিকের বস্তুবাদী চোখ দিয়ে মহাভারত চর্চার কারণে বাঙালির প্রিয় মহাকাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একেবারেই গো-বলয়ের কউর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের মতো হয়ে ওঠেনি। একজন স্বাধীন মনের পাঠক ও দর্শকের মতো করেই শামিম তাঁর মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও চরিত্রকে ভেবেছেন। প্রাবন্ধিক শামিম আহমেদের বিভিন্ন প্রবন্ধের বইগুলি এক্ষেত্রে আমাদের লড়াইয়ের অন্যতম একটি অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। সমকালীন পরিস্থিতিতে যেখানে ধর্মীয় উগ্রতা এবং আগ্রাসনের মাত্রা প্রতিনিয়তই ক্রমবর্ধমান, সেখানে প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধগুলি আমাদের নিয়ে যায় প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় সম্প্রীতির কাছে। আমরা আমাদের এই মিলেমিশে থাকার ছবি সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও পেয়েছি। হিংসা ও হানাহানি এবং কূটনীতির খেলা যেমন অতীত ভারতে ছিল, ঠিক তেমনই আবার এই মহাভারতেই পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে যে মানুষের স্থান সবার উপরে। মহাভারতেই দেখেছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্রে বসবাসের ছবি। যেখানে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র বিদ্যায়তনিক স্তরে এই বিরোধ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, কখনও এক পক্ষ অন্যকে ভিন্ন মতাদর্শের কারণে তাদের উপর অত্যাচার করত না। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক গোষ্ঠীদের একত্র বসবাসের ছবি মহাভারতেই আছে। শিবের উপাসক, বিষ্ণুর উপাসক, শাক্ত উপাসক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুসারীরা একসঙ্গেই থেকেছে। মহাভারত থেকে আমাদের এই শিক্ষা সমকালীন পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মহাভারতে নাস্তিকতা-র মতো বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাই প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের। মহাভারতে আস্তিক বনাম নাস্তিকের লড়াইতে শেষ পর্যন্ত হয়তো নাস্তিকই পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তাদের যুক্তির ধরন ও মতামত এবং চিন্তন প্রণালী মহাভারতকারকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সেই কারণেই মহাভারতের অনেক জায়গাতেই এই সকল নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক প্রস্থানগুলির স্বতন্ত্র উপস্থিতি লক্ষণীয়। মহাভারতের নানা পরিস্থিতিতে কীভাবে ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানগুলি আলোচিত হয়েছে, এবং কীভাবে নাস্তিক দর্শনকে পূর্বপক্ষ ধরে আস্তিক দর্শন নিজে সিদ্ধান্তী হিসেবে নাস্তিকতার যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছে, প্রাবন্ধিক মহাভারতের নিবিষ্ট পাঠের মধ্যে দিয়ে তা দেখিয়েছেন। শামিম এই প্রক্ষেপণকে বিশেষভাবে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট পর্বগুলি, যেমন শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়ে ভীষ্মের আধ্যাত্মিক জবানিতেই শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, নানা ধরনের বচনে-বাচনে, আখ্যানের মোড়ে, সম্বোধনে সে খুঁজে বার করেছে নাস্তিক মত ও মতাবলম্বীদের উপস্থিতি, এবং বলেছে মহাভারতের বহুস্বরতার স্তরে স্তরে কীভাবে নাস্তিক দর্শন প্রস্থানের খণ্ডনের মধ্যে দিয়ে প্রাধান্য লাভ করে আস্তিক্যবাদী। নাস্তিকদের সরাসরি নিপীড়নের ছবিও শামিম খুঁজে বার করেছেন। এই সব নাস্তিক্যবাদীদের থেকে সমকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষণীয় বেশ কিছু বিষয় আছে বলে মনে হয়। যার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ

করতে হয় যে, যুক্তিহীনভাবে ও তর্ক ছাড়া হিন্দুত্ববাদীদের কল্পিত প্রাচীন ভারতের সমস্ত কিছুকেই মানা যায় না- সেটি আমরা শামিমের লেখা থেকে শিখেছি। প্রাবন্ধিকের লেখাগুলির মধ্যে সমানভাবে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানসমূহ, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিদ্যার মতো একাধিক বিদ্যায়তনিক জ্ঞানচর্চার শাখা।

প্রাবন্ধিক মহাভারতে নাস্তিকতা গ্রন্থের মধ্যে মূলত মহাভারতের সাতটা নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক প্রস্থান আলোচনা করেছেন। এগুলি হলো- আত্মীক্ষিকী, চার্বাক দর্শন, সৌগত দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, জৈন দর্শন, তৈরিক ও উড়ুলোম দর্শন। আস্তিকতা ও নাস্তিকতা দু'টি একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। নাস্তিকরা পৃথিবীকে জড় দিয়ে ব্যাখ্যা করে, তাদের মতে চৈতন্য এই জড় থেকেই আসে। অন্যদিকে আস্তিকেরা পৃথিবীকে চৈতন্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী, আস্তিকের কাছে চৈতন্যই প্রধান। কিন্তু নাস্তিকেরা ভাবে জড় হল মুখ্য। ভাবনার এই জায়গা থেকে শামিম আহমেদ মহাভারতে পাণ্ডব ও কৌরবের দ্বন্দ্বকে ক্ষেত্রজ বনাম স্বাভাবিক ঔরসজাত সন্তানদের লড়াই হিসাবে উপস্থাপন করেন। নাস্তিকতা বনাম আস্তিকতা আসলে এই দিক থেকে চন্দ্রবংশ বনাম সূর্যবংশ উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের ঘটনাও বটে। জড় থেকে যে চৈতন্য উৎপত্তি, সেটাকে যদি আলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যায় সূর্যের আলোর মতো ঔরসজাত সন্তান পিতার বীর্য দ্বারা এসেছে। অন্যদিকে, চাঁদের ধার করা আলোর মতো ক্ষেত্রজ সন্তানরা অন্য পুরুষের ঔরসজাত। মহাভারতের মতো মহাকাব্যের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ এভাবেই প্রাবন্ধিক বহুমুখী ও বহুমাত্রিক করে তুলেছেন।

নাস্তিকতা নিয়ে কথা বলার আগে একটু জেনে নেওয়া যাক নাস্তিকের পরিচয় কী? সুকুমারী ভট্টাচার্য বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য-তে নাস্তিকের পরিচয় নিয়ে চমৎকার একটি কথা বলেছেন:

নাস্তিকের সংজ্ঞা হল 'ঈশ্বরপ্রামাণ্যবাদী' অর্থাৎ যে ঈশ্বরকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না, এবং 'বেদপ্রামাণ্যবাদী' অর্থাৎ বেদকে প্রামাণ্য বলে মানে না। এ ছাড়া উপনিষদে দেখি, যে পরলোকে বিশ্বাস করে না সে-ও নাস্তিক। পরলোক মানে শুধু স্বর্গনরক নয়, পরলোক থাকতে গেলেই মরণোত্তর আত্মা থাকতে হবে। তাই যে পরলোক নয়, শুধু ইহলোককেই স্বীকার করে সে-ও নাস্তিক। পরলোককে স্বীকার করলেও ঈশ্বরকে স্বীকার নাও করা যেতে পারে, এবং এ দুটি স্বীকারকরেও বেদের প্রামাণ্যতা যে মানে না সেও নাস্তিক। হেমচন্দ্রের অভিধান বলে, নাস্তিকের প্রতিশব্দ হল, বারহস্পত্য, চার্বাক ও লোকায়তিক। যে 'নাস্তি' শব্দ থেকে নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি, তার তিনটি অর্থ হতে পারে: যে ঈশ্বর মানে না, যে পরলোক মানে না এবং যে বেদের প্রামাণ্য মানে না। দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর, পরলোক ও বেদে বিশ্বাস পরস্পর-নিরপেক্ষ; তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, এ তিনটিই ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তিনটি মূল স্তম্ভ।^{১৪১}

অর্থাৎ নাস্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে না, বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করবে না এবং তার পরকালে অবিশ্বাস থাকবে- মূলত এই বিষয়গুলি নাস্তিক সম্প্রদায় হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবে কাজ করে। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই নিয়ে আস্তিক বনাম নাস্তিকের বিভিন্ন যুক্তিবিন্যাস এবং তর্কগুলি আমাদের নজরে পড়ে। এই সমস্ত যুক্তি ও তর্কের ধরনগুলি দেখলে সেই সময়ের মুক্ত চিন্তক বা নাস্তিকদের প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। এই সমস্ত দার্শনিক প্রশ্নগুলির মতামতের সামনে আস্তিক গোষ্ঠীভুক্ত তথাকথিত পণ্ডিতদের প্রায়শই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। ফলস্বরূপ এই সমস্ত নাস্তিকদের ধর্মীয় পথে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা আস্তিকেরা করেছে। কিন্তু নাস্তিকদের বক্তব্যগুলি বরাবরই মানবসমাজে পৃথক স্থান রেখে গেছে। হয়তো সমস্ত ক্ষেত্রে নাস্তিকদের যুক্তির ধরন নিয়মানুসারে হয়নি, আস্তিককে পরাজিত করার জন্য নাস্তিকের বক্তব্যগুলি অনেক সময়ই বড়ো একঘেয়ে লাগে। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সমানভাবে প্রযোজ্য যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবও মহাভারতের অনেক জায়গাতেই নাস্তিকদের যুক্তি এবং বক্তব্যগুলি দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। তার প্রমাণও মহাভারতেই পাওয়া যায়। আস্তিকতার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার পরিমণ্ডলে নাস্তিকতারও যে প্রভূত ঐতিহ্য ছিল, সেই বিষয়টিই প্রাবন্ধিকের লেখার মধ্যে স্পষ্টতই পাওয়া যায়। ঠিক এই জায়গাতেই নাস্তিক্যবাদীরা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ বেদ ও ঈশ্বর এবং পরকাল নিয়ে আমাদের প্রাচীন নাস্তিক্যবাদীরা যে সংশয় ও মানসিক টানাপোড়েনের ঐতিহ্য রেখে গেছে, সেটি বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যায়তনিক পরিসরে অথবা আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে।

প্রাবন্ধিকের আলোচনায় প্রথমে আত্মীক্ষিকীর প্রসঙ্গ এসেছে। যার প্রধান কথাই হলো জ্ঞানের চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু হয় না। কোনও প্রাক-ধারণা বা ধর্মীয় উক্তি আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিভূমি নয়। জ্ঞান তার সত্যকে খুঁজে নেবে যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার যথার্থ মেলবন্ধনের ফলে। ভারতীয় যুক্তি শাস্ত্রের ইতিহাস আসলে আমাদের মুক্তচিন্তার দীর্ঘ ইতিহাসের কথাই বলে। এই যুক্তিশাস্ত্র বা বিজ্ঞানের পারিভাষিক নামই হল আত্মীক্ষিকী। যদিও অনেকেই মনে করে আত্ম সম্পর্কিত বিজ্ঞানই হল আত্মীক্ষিকী বা অনুসন্ধানবিদ্যা। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের *ভারতীয় যুক্তিশাস্ত্রের ইতিহাস* বইতে এটির বিস্তারিত আলোচনা আছে। অন্যদিকে কৌটিল্য এবং *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*-র টীকাকার বিশ্বরূপের মতে এর অর্থ হেতুবিদ্যা। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও আত্মীক্ষিকীকে তর্ক বা যুক্তি হিসাবেই ধরেছে। নৃসিংহপ্রসাদ এটিকে ‘দর্শন’ বলার পক্ষপাতী নয়। যদিও অনেক আধুনিক পণ্ডিত এটিকে দর্শন হিসাবে ভাবতে চায়, এইচ. জেকোবি হল এদের মধ্যে অন্যতম। আবার কামসূত্রের রচনাকার বাৎসর্যয়ন এটিকে অনুসন্ধানমূলক এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক শাস্ত্র হিসেবে ভাবতে চায়। তবে প্রাবন্ধিকের লেখা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আত্মীক্ষিকীর অর্থ আর

যাই হোক, মহাভারতের শান্তিপর্বে একে হেতুবিদ্যা বা যুক্তিবিজ্ঞানই বলা হয়েছে। শামিম এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন:

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে (১০৪/১০৮, ১২/১-৫) যা বলা হয়েছে, তার মর্মকথা হল- তর্কের দ্বারা বিচার না করলে ধর্ম সিদ্ধ হয় না। আর ধর্ম সিদ্ধ না হলে অর্থ, কাম ও মোক্ষ- কোনওটাই সিদ্ধ হতে পারে না। তাই তর্ক বা আত্মক্ষিকীর গুরুত্ব অপরিসীম।^{১৪২}

মহাভারতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আত্মক্ষিকীর দৃষ্টান্ত সুন্দরভাবে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। সমাজে আস্তিক্যবাদী বনাম নাস্তিক্যবাদীদের মধ্যে বিরোধ তো ছিলই, এইরকম একটি কাহিনি শান্তিপর্বে ব্যাসদেব বলেছে। যেখানে নাস্তিকতার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে একজন ব্রাহ্মণের শৃগালরূপে পরজন্মে জন্মগ্রহণের কথা উঠে এসেছে। শামিম ও সুকুমারী ভট্টাচার্য উভয়েই কাহিনিটিকে তাদের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

এক ধনী বণিক রথে চড়ে যাচ্ছিলেন, পথে এক ব্রাহ্মণ চাপা পড়েন; ব্রাহ্মণটি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে এক শৃগাল তাঁকে নিবৃত্ত করে বলে যে, ‘আত্মহত্যা নাস্তিকোচিত কাজ, এটা করা ঠিক নয়। গতজন্মে সে নিজে নিরর্থক আত্মক্ষিকী ও তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত ছিল, হৈতুক অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে সব কিছুর হেতু নির্ণয় করতে চেষ্টা করত, বেদনিন্দক ও নাস্তিক ছিল, তাই এজন্মে শৃগাল হয়েছে।’^{১৪৩}

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পুরোহিততন্ত্রের ও শাস্ত্রকারদের উদ্ভার প্রধান কারণই হল যুক্তিবাদ। মোটামুটিভাবে গল্পের মোড়কে বলে দেওয়া হলো নাস্তিক্যবাদীদের শেষ পরিণাম ও গন্তব্য। বলা বাহুল্য, মহাভারতের সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক বিষয়কেই এই প্রসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের কাছ থেকে একপ্রকার প্রশ্নহীন আনুগত্য চায়। সমসাময়িক অনেক রাষ্ট্রীয় প্রকল্পই, সরকারি পরিকল্পনা ও উদ্যোগকে যদি আমরা মুক্তচিন্তার সাহায্যে বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে প্রকল্পগুলির অন্তঃসারশূন্যতা। আমরা জানি যে বিদ্যায়তনিক পাঠের চর্চাই হোক অথবা একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশকাল সম্পর্কে ব্যক্তিগত বোঝাপড়াই হোক; পরিণত সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হওয়া কেবল তখনই সম্ভব যদি যুক্তিতর্কের সাহায্যে সামগ্রিক বিষয়টিকে তলিয়ে দেখা হয়। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমাদের নজরে আসছে কলা ও সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলিতে পড়াশোনা এবং গবেষণায় রাষ্ট্রের অনধিক অর্থ বরাদ্দের দিকটি।^{১৪৪} দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের যথাযথ জ্ঞানের চর্চা মানব মনের গভীরে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাই মহাভারতের মতো সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও আত্মক্ষিকী ও যুক্তিতর্কের সহযোগে কোনও

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চর্চা করতে চাইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা নানাভাবে বাধাবিঘ্ন ঘটায়। রাষ্ট্র আরোপিত ভাবনায় এভাবেই কুঠারাঘাত এনেছিল সক্রেটিস, গ্যালিলিও এবং মার্টিন লুথারেরা।

মহাভারতে গণেশ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে আত্মক্ষিকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক গণেশ চরিত্রটিকে একটি বাদী-প্রতিবাদী আত্মক্ষিকার উদাহরণ হিসাবে বলতে চেয়েছেন। আমরা জানি ভারতীয় লোকায়ত দর্শনে গণেশের চিত্রকল্প বা ইমেজ বিঘ্নরাজ, বিঘ্নেশ, বিঘ্নেশ্বর ও বিঘ্নকৃত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এই বিঘ্নরাজ থেকে সিদ্ধিদাতা রূপে গণেশের প্রকাশ পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে, বিষয়টি আমরা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *লোকায়ত দর্শন* নামক বিখ্যাত বই থেকে জানতে পারি। দার্শনিক দেবীপ্রসাদ তাঁর বইতে বলেছেন:

প্রাচীনকালের আইনের বইতে গণেশের প্রতি এই যে-মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তার কথা মনে না রাখলে গণেশের কয়েকটি পুরোনো নামের তাৎপর্য বুঝতে পারাই সম্ভব নয়। নানা রকম পুঁথিপত্রে এই নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। নমুনা: বিঘ্নেশ, বিঘ্নকৃৎ, বিঘ্নেশ্বর, বিঘ্নরাজ, ইত্যাদি। চলতি কথায়, ‘যতো নষ্টের গোড়া’-ট্রাবল মেকার। দুর্বৃত্তদের পান্ডাও বলতে পারেন। অবশ্যই, পরের যুগের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় গণেশ সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা দেখা দিলো। এবং, এই পরবর্তী ধারণার বশবর্তী হয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা ওই প্রাচীন নামগুলির ভুল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বলতে চাইলেন, বিঘ্ন দূর করবার ক্ষমতা গণেশের, বাধাবিঘ্নের শক্তি গণেশের কাছে নতজানু-তাই তিনি বিঘ্নের অধিপতি, বিঘ্নেশ। বৌদ্ধাচার্য-ধর্মসূত্রে গণেশের কয়েকটি চিত্রকর্ষক নামের মধ্যে একটি হলো বিঘ্ন এবং শুধু বিঘ্ন। এবং, আমরা একটু আগেই দেখেছি, যাজ্ঞবল্ক্য সরাসরি বলেছেন যে, বিঘ্নসাধন করবার জন্যেই বিনায়কেরা নিযুক্ত আছেন। তাই মানতেই হবে যে, এককালে গণেশকে শুধু দুর্বৃত্ত বলেই দেখবার চেষ্টা করা হয়েছিলো, দুর্বৃত্ত-দলনের কথাটা অর্বাচীন।^{১৪৫}

বলা বাহুল্য, প্রাবন্ধিক আহমেদ দেখিয়েছেন যে গণেশ যেকোনো তাকায় সেটারই ঘোরতর অমঙ্গল হয়। যেমন- পিতামাতা সন্তানকে হারায়, বিবাহযোগ্যদের বিয়ে হয় না, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি। এছাড়াও আমরা দেখেছি একবার নারী ও শূদ্ররা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে মহাদেবের কাছে যাচ্ছিল, এই মিছিল আটকানোর জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পার্বতীর শরণাপন্ন হলে পার্বতী গণেশকে সৃষ্টি করে। আচার্য মনু’র মতে গণেশ শূদ্রদের দেবতা। কিন্তু শূদ্রদের দেবতা হওয়া সত্ত্বেও কেন গণেশ নারী ও শূদ্রদের মিছিল আটকে দিল? এখানেই একটি স্ববিरोধ বা কূটাভাস লক্ষণীয়। প্রাবন্ধিক আহমেদ দেখিয়েছেন এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই গণেশের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়, তাই শাস্ত্রে গণেশ ‘দ্বিদেহক’ নামে পরিচিত। আসলে গণেশ এখানে বিদ্রোহ বা অবরোধ অথবা প্রতিবাদ কোনওটাই নারী বা শূদ্রদের বিরুদ্ধে করে না, সেইটি মূলত

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এইদিক থেকেই পরশুরামের সঙ্গে গণেশের বিরোধকে পড়া যায়। আবার মহাভারতে ব্যাসদেবের রচনায় আট হাজার আটশো শ্লোকের অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না, এই কূটশ্লোকের অর্থ মহাভারতকার নিজে এবং শুক জানে। ফলে এগুলিও আত্মক্ষিকার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রাবন্ধিক আহমেদ দেখিয়েছেন।

মহাভারতে আত্মক্ষিকার দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে প্রাবন্ধিক আলোচনায় এনেছেন নারদ, সুলভা এবং অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিদের নামও। আমরা জানি মহাভারতে দেবর্ষি নারদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যুধিষ্ঠিরের রাজদরবারে এসে রাজাকে নানা পরামর্শ দিল। বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে রাজাকে একপ্রকার জ্ঞানে সমৃদ্ধ করল। আবার আমরা মহাভারতে ঋষি অষ্টাবক্রকে পাই, যে আক্রমণাত্মক তর্কিক হিসাবে যথেষ্টই খ্যাত ছিল। রাজশেখর বসুর মহাভারত-এ দেখতে পাই যে অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে জনক রাজার যজ্ঞসভায় বিতর্ক শুনতে যায়। বিতর্কসভায় যথার্থ যুক্তিতর্ক ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে ঋষি অষ্টাবক্র আচার্য বন্দীকে পরাজিত করে।

মহাভারতে আত্মক্ষিকার বিষয়ে রাজা জনকেরও পর্যাপ্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলভা নামের একজন সন্ন্যাসিনীকে জনক জানায় যে, যদি একজন রাজার ডান হাতে চন্দন মাখিয়ে দেয় এবং অন্যজন বাম হাত ছেদ করে, তবে রাজা উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখবে। এই ক্ষেত্রে রাজার আত্মক্ষিকার হবে বিশুদ্ধ ও স্বার্থরহিত, রাজা এখানে বাদী-প্রতিবাদী উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখবে। প্রাবন্ধিকের আলোচনায় উঠে এসেছে কৃষ্ণের নামও, মহাভারতে অর্জুনের সঙ্গে তার দীর্ঘ কথোপকথনের সূত্রে উঠে এসেছে কৃষ্ণের জ্ঞানগর্ভ আত্মক্ষিকার পরিচয়।

মহাভারতের আত্মক্ষিকার দ্বারাও সমাজ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক আহমেদ একটি গল্প উল্লেখ করেছেন। আত্মক্ষিকার গুরুত্ব এই প্রসঙ্গে এতটাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে যে, বর্ণভেদের মতো কুপ্রথাকেও সরাসরি প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

ভৃগু ভরদ্বাজকে বলেন, বর্ণাশ্রম গঠিত মানুষের শারীরিক গুণাবলির ওপর নির্ভর করে, গাত্রবর্ণের বিভিন্নতা অনুযায়ী। ভরদ্বাজ তার একটি যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। গাত্রবর্ণ যদি বর্ণাশ্রমের ভিত্তি হয়, তা হলে দেখা যাবে একটি বর্ণাশ্রমে অনেক গাত্রবর্ণ আছে। যদি এই ধরনের গায়ের রং অনুযায়ী জাতি ঠিক হয়, তা হলে সব জাতিই মিশ্র জাতি। আমরা সকলেই কামনা, রাগ, ভয়, দুঃখ, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও শ্রম অনুভব করি-তা হলে জাতিভেদ কেন থাকবে? ভবিষ্যপুরাণ-এও একই কথা দেখা যায়, যদি চতুর্বর্ণের সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হয়, তা হলে সকলেরই এক জাতিভুক্ত হওয়া উচিত।^{১৪৬}

মহাভারতে নাস্তিক্যবাদী যে সাতটি সম্প্রদায়ের বিষয়ে প্রাবন্ধিক আহমেদ আলোচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে চার্বাক সম্প্রদায় নাস্তিকতার চর্চাকারীদের মধ্যে অন্যতম। ‘চার্বাকসূত্র: পুনর্গঠনের দিকে’-নামের প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চার্বাক দর্শনের পাঁচটি লক্ষণের বিষয়ে কথা বলেছেন।^{১৪৭} এই প্রসঙ্গে প্রথমেই চার্বাকরা ভূতবাদে বিশ্বাসী। পৃথিবীতে সবকিছুই তাদের মতে মাটি, জল, আগুন ও বাতাস এই উপাদানগুলি সহযোগে সৃষ্ট। সমস্ত জীব ও জড় পদার্থের দেহ এগুলির সাহায্যেই তৈরি হয়েছে। এই উপাদানগুলির একটি বিশেষ সমবায়েই চৈতন্য বা চেতনার উপস্থিতি লক্ষণীয়। চার্বাকরা দেহ ছাড়া চেতনার উপস্থিতি অস্বীকার করে। চার্বাক দর্শনের দ্বিতীয় লক্ষণকে স্বভাববাদ হিসাবে বলা হয়েছে, যার বক্তব্য হল জগতের বৈচিত্র্য আসে বস্তুর নিজের স্বভাবের কারণে। এর জন্য ঈশ্বর, নিয়তি ও কালের ভূমিকা নেই। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আরও জানিয়েছে যে প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ, পুনর্জন্ম ও পরলোক বিলোপবাদ এবং বেদপ্রামাণ্য-নিষেধবাদ এগুলিও চার্বাক দর্শনের প্রধান লক্ষণসমূহের মধ্যে পড়ে। পৃথিবী সৃষ্টির কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে চার্বাকরা অমান্য করে। চার্বাক চর্চাকারীরা সংশয়বাদকে আমাদের কাছে তুলে ধরে, দার্শনিক আলোচনার বিশ্বে যার মূল্য অপরিসীম। পরবর্তীকালে ভারতীয় আন্তিক দার্শনিকরা চার্বাককে পূর্বপক্ষ হিসাবে মর্যাদা দিয়ে এসেছে।

প্রাবন্ধিক আহমেদ আমাদের কাছে মহাভারতে চার্বাক দর্শনের প্রভাবটি বেশ কিছু দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপন করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেককালে দুর্যোধনের বন্ধু চার্বাক ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয় এবং যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার জানিয়ে বলে যে, যাবতীয় হত্যাযজ্ঞের মূল কারণই সে। চার্বাকের কথায় যুধিষ্ঠির ব্যথিত হয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণেরা এরপর যুধিষ্ঠিরকে বলে এই ব্যক্তি স্বয়ং দুর্যোধনের বন্ধু চার্বাক রাক্ষস, তারপর ব্রাহ্মণদের তীব্র রোষানলে চার্বাক দগ্ধ হয়ে ভূপতিত হয়ে গেল। তবে সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতের সমাজ বইতে মনে করেছেন চার্বাকের এই পরিণতির মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা চার্বাকমতের পরাজয়ের বিষয়টি থাকলেও থাকতে পারে। আমরাও এইখানে সুখময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যটিকেই স্বীকার করি।

মহাভারতের বনপর্বে দেখতে পাই বনবাসের সময় যাবতীয় দুঃখ ও কষ্টের দ্বারা শোকাহত হয়ে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ঘটনার জন্য দোষারোপ করতে থাকে। রাজার সুখ ও শান্তি, ভাইদের সেবা এবং উন্নত বস্ত্র, বিছানা এবং আহার- সমস্ত কিছুই যুধিষ্ঠিরের ছিল। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণে আজ সে বনবাস করছে। দ্রৌপদী এরপর আরও কঠোরভাবে জানায় যে, তার অন্য ভাইদের দুর্দশার কারণও যুধিষ্ঠিরই, ‘ক্রোধহীন ক্ষত্রিয় নেই’- এই প্রবাদবাক্যকে যুধিষ্ঠির মিথ্যায় পরিণত করেছে। দ্রৌপদীর মুখে এরূপ কথা শুনে তাকে ‘নাস্তিক’

বলে যুধিষ্ঠির আখ্যায়িত করেছে। বলা বাহুল্য, দ্রৌপদীর এই কথার মধ্যে চার্বাক তত্ত্ব মিশে আছে। আমরা জানি মোক্ষ বাদে তিন পুরুষার্থের মধ্যে যুধিষ্ঠির ধর্মকে প্রধান ভাবত, কিন্তু ভীম নিজে কামকেই মুখ্য হিসাবে ভেবেছে এবং অর্জুন অর্থকে সর্বাত্মে প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দিলে অন্য পাণ্ডবদের নৈতিক অবস্থানও যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রাবন্ধিক শামিম আহমেদ মহাভারতের শান্তিপর্ব-র বসুমনা ও বৃহস্পতির মধ্যে হওয়া একটি কথোপকথন তুলে এনেছেন। যেখানে আমরা চার্বাক দর্শনের রূপটি ভালোভাবে লক্ষ্য করতে পারছি।

এখানে বসুমনা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করছেন, কীসে মানুষের ঐহিক সমৃদ্ধি ও সুখ আসে? উত্তরে আচার্য বৃহস্পতি বলছেন যে রাজা না থাকলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, মানুষের সমস্ত ধর্ম ও শৃঙ্খলার মূলেই আছেন রাজা। ভাল শাসনে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে।^{১৪৮}

চার্বাক সম্প্রদায় অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ হিসাবে মান্য করে, এই বিষয়টি আমরা সবাই জানি। মহাভারতে অর্জুনের একটি উক্তি এই বিষয়টিকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

মানুষের জীবনে অর্থের প্রাধান্য দেখাতে গিয়ে অর্জুন বলছেন, যার অর্থ বা টাকা আছে, তারই বন্ধু আছে; বন্ধু না থাকলেও জোটে। অর্থবান লোকই জগতে বিখ্যাত হন। তিনি মূর্থ হলেও লোকে তাঁকে পণ্ডিত বলে জানে। বৃহস্পতি অর্জুনের এই উক্তিটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবেই প্রতিপাদন করেছেন। তিনি বলেছেন, অর্থ থাকলেই বন্ধু, বিদ্যা, গুণ, বুদ্ধি থাকে। নির্ধন ব্যক্তির পক্ষে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নয়। যার অর্থ নেই, সে মৃত চণ্ডাল।^{১৪৯}

এছাড়াও প্রাবন্ধিক আহমেদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারতের নয়টি শ্লোক উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মধ্যে চার্বাক দর্শনের প্রভাবকে খুঁজে পাই। যেখানে আত্মার অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে বলা হয়েছে দেহই আত্মা, দেহ ভিন্ন আত্মা নেই। দেহ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আত্মারও শেষ ঘটে। চার্বাক সম্প্রদায় একথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু থেকে দেহে চৈতন্য আসে। গাছের বীজের মধ্যে যেভাবে পরবর্তী গাছের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনই মানব শুক্রের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও অহংকার নিহিত থাকে। অর্থাৎ দেহ থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। মহাভারতের মতো মহাকাব্যের মধ্যে এরকম চরম বস্তুবাদী ধারণা থেকে আমরা সমৃদ্ধ হই।

মহাভারতের সঙ্গে বৌদ্ধ বা সৌগত দর্শনেরও এক গভীর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। মহাভারতের অনেক কাহিনি জাতকের আখ্যানসমূহের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। বৌদ্ধরা নাস্তিক এবং কশ্যপ ও ত্রুকুচ্ছন্দ হলো এই মতের আদি প্রচারক। বৌদ্ধ দর্শনকে প্রয়োগবাদী দর্শন হিসাবে মান্য করা হয়, এরা ঈশ্বর বা স্থায়ী আত্মার তত্ত্বে অবিশ্বাসী। প্রাবন্ধিক বৌদ্ধ দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত হিসাবে ছয়টি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন। যথা-আর্যসত্যচতুষ্টয়, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব, শ্রুতিকে অস্বীকার, ক্ষণিকত্ববাদ এবং নৈরাশ্রবাদ।

মহাভারতের আদিপর্বে সৌগত দর্শনের প্রভাব একটি কাহিনিতে আমরা লক্ষ করেছি। যেখানে উত্ক যোগ্যার সময় পথে এক নগ্ন ক্ষপণক দেখতে পেলেন, যে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। উত্ক জলে যখন স্নান করতে যায় তখন ক্ষপণক উত্কের কুণ্ডল নিয়ে পালিয়ে যায়। স্নানের পর উত্ক ক্ষপণককে ধরে ফেলে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ‘ক্ষপণক’ বলা হয়ে থাকে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মত অনুসারে ক্ষপণক শব্দের অর্থ পাষণ্ড ভিক্ষু। পাষণ্ডদের আবার বেদ-নিন্দুক নাস্তিকও বলা হয়। ক্ষপণক তার চেহারা বদলে এরপর পাতালে চলে গেলে উত্কও ইন্দ্রের সাহায্যে নাগলোকে যায় এবং তার কুণ্ডল ফিরে পায়। এখানে প্রাবন্ধিক আহমেদ বলেছেন যে উত্ক এবং ইন্দ্রের জোটকে এখানে আস্তিক পক্ষ হিসাবে মনে করা যায়। ক্ষপণক আসলে তক্ষক, যার কামড়ে পরীক্ষিত মারা যায়। শেষ পর্যন্ত জনমেজয়ের যজ্ঞে তক্ষকের মৃত্যু হয় না। এই গল্পটিতে সৌগত বা নাস্তিকদের সঙ্গে আস্তিকদের এক দার্শনিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের অনেক জায়গাতেই অহিংসার কথা বলা হয়েছে, পশু হত্যার দ্বারা হওয়া যাগযজ্ঞের সমালোচনা করা হয়েছে। এই জায়গা থেকেই মহাভারতে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষণীয়। মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে জাতকের অনেক গল্পেরই মিল প্রাবন্ধিক আহমেদ দেখিয়েছেন। জাতকের কাহিনির জন্য ঈশানচন্দ্র ঘোষের *জাতক গ্রন্থসমূহ*কে পাশে রেখে প্রাবন্ধিক উভয়ের মিলগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। *দেবধর্ম্ম জাতক* (৬নম্বর জাতক)-এর দ্বিতীয় পর্বে বোধিসত্ত্ব ও সূর্যকুমার এবং চন্দ্রকুমারের অরণ্যবাসের কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৫০} সরোবর থেকে তৃষ্ণার জল যথাযথ বিধি না মেনে আনার কারণে সূর্যকুমার ও চন্দ্রকুমার উভয়ই রাক্ষস দ্বারা সরোবরে আটকে পড়ে। বোধিসত্ত্ব বৈমাত্রের ভাই হওয়ার কারণে চন্দ্রকুমারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাক্ষসকে অনুরোধ করে। অনুরূপভাবে মহাভারতের বনপর্বেও যুধিষ্ঠির যক্ষের কাছে নকুলের জীবন প্রার্থনা করে। মহাভারত ব্যক্তির আদর্শ জীবন চর্যা ও আচারকে ধর্ম নামে অভিহিত করেছে। কাষ্ঠহারি জাতকের সঙ্গে মহাভারতের দুম্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনির মিলকেও প্রাবন্ধিক আহমেদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। উভয় জায়গাতেই লোকনিন্দার ভয়ে রাজা পুত্রকে স্বীকার

করতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহাভারত এবং জাতকে ধর্ম ও নৈতিকতার যে পরস্পর বিরোধী রূপ দেখা যায়, সেখানে ধর্মই জয়ী হয়েছে। প্রাবন্ধিক আহমেদ জাতক ও মহাভারতের আরও দুইটি এরকম গল্প উল্লেখ করেছেন, যেখানে সৌগত দর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কৃতজ্ঞ শূকের কাহিনি বলেছে। যেখানে একটি বৃক্ষ শুকিয়ে যাওয়ার পরেও তার মধ্যে ক্ষীণ দেহে শূক থেকে যায়, মহাভারতে দেবরাজ ইন্দ্র ও জাতকে হংস যখন শূককে বৃক্ষটি না ত্যাগের কারণ জিজ্ঞেস করে, তখন শূক কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রীর কথা তাদের বলে।^{১৫১} মহাভারত ও জাতকে এখানে লোভহীনতার নীতি উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও সৌগত দর্শনের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জাতকে* মাণ্ডব্য মুনির কথা এবং মহাভারতের আদিপর্বে মাণ্ডব্য মুনির বিষয়টিও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বলেছেন।

প্রাবন্ধিক আহমেদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গীতা ও ধর্মপদ, দুইটি বইতেই আদর্শ জীবন বলতে অন্তর থেকে সত্য সাধনাকে বুঝিয়েছে। উভয় গ্রন্থই বলে যে কৃত্রিম বা প্রাণহীন আচার পালন নীতি ও ধর্ম নয়। গৌতম বুদ্ধের মতে করণীয় সবকিছুই কায়মনোবাক্যে করা উচিত, ব্রাহ্মণের সংযম আবশ্যিক। অন্যদিকে গীতাও একই কথা বলে। আত্মশুদ্ধির তপস্যা মন ও বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের সহযোগে করা উচিত। মানসিক শুদ্ধি এবং পবিত্র আদর্শের পথের কথা বুদ্ধ ও গীতা উভয়ই বলে থাকে। গীতা-য় মুক্তির কথা বলতে গিয়ে কর্মফলের শৃঙ্খলকে অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং নির্বাণ প্রভৃতির মাধ্যমে নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এরকমভাবে বিষয়গুলিকে মিলিয়ে দেখলে মহাভারত ও সৌগত দর্শনের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়।

বৈশেষিক দর্শনও হল অন্যতম একটি নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক প্রস্থান। মহাভারতের মতো মহাকাব্য নানান ভাবে প্রভাবিত ছিল বৈশেষিক দর্শন চর্চাকারীদের দ্বারা। এই দর্শনকে কণাদ দর্শন, কাশ্যপীয় দর্শন এবং ঔলূক্য দর্শন নামেও বলা হয়ে থাকে। মহাভারতে আমরা উলূকের দেখা পাই, যে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে কৌরব পক্ষের দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। যুধিষ্ঠিরকে উলূক পরামর্শ দেয় যে যুধিষ্ঠির সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাকে অথচ সে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস করতে চায় কেন? উলূক যুধিষ্ঠিরকে আরও মনে করিয়ে দেয় প্রকাশ্যে ধর্মের ধ্বংসা উঁচু রাখা এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপ কাজ করার নাম হলো বৈড়াল ব্রত, পাণ্ডবদের ইন্দ্রজাল ও মায়াকে যথার্থ বীরেরা ভয় পায় না। সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করা উলূক তথা কৌরব পক্ষের অন্যতম তত্ত্ব এবং মায়ার জালে তারা তত্ত্বকে আবদ্ধ

রাখতে চায় না। বৈশেষিক মতে যা থেকে মুক্তি বা চরম উদ্দেশ্যলাভ হয় তাই ধর্ম। ধর্ম শব্দটি এখানে পারিভাষিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির হেতুই ধর্ম।

বৈশেষিক দর্শন আলোচনাকালে পরমাণুবাদ নামক অবৈদিক মতের জন্য বৈশেষিকদের নাস্তিক বলা হয়। তাদের পদার্থ সম্পর্কিত আলোচনাও মহাভারতের সিদ্ধান্তের পছন্দ নয়। বৈশেষিক দর্শন আত্মা সম্পর্কে তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে পদার্থ ও দ্রব্যের বিষয়ে আলোকপাত করেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ আকাশ, মরুৎ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন- এই দ্রব্যগুলি বৈশেষিকরা মানে। জ্ঞানের আশ্রয় জীবাত্মা। জীবাত্মার চোদ্দোটি গুণের কথা বৈশেষিকরা বলেছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে পূর্বপক্ষ হিসাবে আত্মার মধ্যে এই সমস্ত বিবিধ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপর্বে পূর্বপক্ষ হিসাবে আত্মার নিত্যতা মেনে নিয়ে তারমধ্যে বিবিধ গুণের অবস্থানকে স্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে আস্তিক মনে করে নিত্য আত্মায় বিবিধ গুণ থাকতে পারে না। মহাভারতের মতো কালকেও বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কর্ম, গুণ এবং সামান্যকেও মহাভারতে এবং বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

প্রাবন্ধিক আহমেদ তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে বৈশেষিক দার্শনিকরা চব্বিশ প্রকার গুণের কথা বলেছে, অন্যদিকে মহাভারতের মধ্যেও একাধিক এরকম গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে শামিম বলেছেন যে মহাভারতও বৈশেষিক দর্শন দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৈশেষিক দর্শনের সমর্থক হিসাবে লঙ্কেশ্বর রাবণ এবং দুর্যোধনের নাম পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শনে বৈশেষিক মত প্রসঙ্গে শংকরাচার্য এই মত খণ্ডন করেছে। আমরা দেখি যে রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যের প্রতিনায়কেরাই নাস্তিক তথা বৈশেষিক দর্শনের সমর্থক। মহাদেব বা শিবের উল্লেখ বেদে পাই না। অন্যদিকে উত্তরাখণ্ডের একটি মন্দিরে দুর্যোধন শিবের অবতার রূপে পূজিত হয়, এখান থেকে বোঝা যায় দুর্যোধনের সঙ্গে শৈব দর্শনের নিবিড় যোগাযোগের বিষয়টি। এছাড়াও শোনা যায় যে মহর্ষি কণাদ শিবের প্রসন্নতা পেয়ে বৈশেষিক দর্শন প্রণয়ন করেছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের নিত্যত্ব মান্যকারীরা বেদ সিদ্ধান্তের বিরোধী। তবে কেউ কেউ নাস্তিক মতের সঙ্গে মহাভারতের আস্তিক মতের এক সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছে, কারণ মহাভারতের মধ্যে অনেক অনেক যুগের দর্শন, ইতিহাস ও স্মৃতি মিশে রয়েছে।

সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক মহাভারত রচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক মহাভারতগুলির মধ্যে কাহিনিগত ভিন্নতা দেখা যায়। জৈনদের প্রাচীন সাহিত্য *অধর্মমাগধীসূত্র*-তে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের কাহিনিগুলি পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক আহমেদের আলোচনায় আমরা জানতে

পারি যে জৈন মহাভারতে পাণ্ডবরা এবং বলরাম স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং কৃষ্ণ ও জরাসন্ধ নরকগামী হয়। সৌগত দর্শনের মতো জৈন দর্শনেরও অন্যতম কথা অহিংসা, জৈনদের প্রধান লক্ষ্যই হল মোক্ষ। এই মোক্ষ লাভের জন্য তারা নৈতিকতাকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে ভেবেছে। তবে নৈতিকতার প্রশ্নে মহাভারতের সঙ্গে জৈন দর্শনের পার্থক্যকে প্রাবন্ধিক আহমেদ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

মহাভারতে অহিংসা ও মৈত্রীকে শাস্ত্রত ধর্ম বলে গণ্য করা হয়েছে। যশ, সত্য, দম, শৌচ, অচাপল্য, দান, তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্য এই কয়েকটি হল ধর্মের শরীর; সেই ধর্মকে লাভ করার উপায় হল অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা প্রভৃতি। মহাভারতে অহিংসা হল ধর্মলাভের উপায়, লক্ষ্য হল লোকস্থিতি। কিন্তু জৈন দর্শনে সব তত্ত্বেরই মূল লক্ষ্য হল অহিংসা।^{১৫২}

মহাভারতের নৈতিক ব্যবহার প্রণালী সমাজকেন্দ্রিক। লোকস্থিত সমাজের কথাই সেখানে প্রধান লক্ষ্য। জৈনদের নৈতিকতা ঠিক তেমনটি নয়। মহাভারতে নিজের প্রতি, অন্য ব্যক্তির প্রতি এবং বৃহৎ সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করার জন্যে নৈতিক উপদেশ প্রযুক্ত হয়েছে। অতি প্রাচীনকালে জগতের হিতের নিমিত্ত ভার্গব মুনি নীতিশাস্ত্র প্রচার করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাভারত নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবস্থান বদল করেছে। এই প্রায়োগিক নীতিবাক্য মহাভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেখানে জৈন নীতিবিদ্যা অনেকটাই অনড়, তাঁদের কাছে জীবের মোক্ষ লাভই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।^{১৫৩}

জৈন দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সংশয়বাদ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই সংশয়বাদীদের ‘স্যাদবাদী’ আখ্যা দিয়েছেন। ব্যাসদেবের মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বে জৈন দর্শন সম্পর্কে কথা বলা আছে। প্রথমত, স্যাদবাদ জৈনদের একটি মতবাদ। কারণ, জৈন দর্শন ছাড়া অন্যত্র কোথাও এই তত্ত্বের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, জৈনগণ সন্তোষিত নয় প্রচার করে। তৃতীয়ত, স্যাদবাদী ও সন্তোষিত নয়বাদী জৈনরা হল সংশয়বাদী।

জৈন দর্শন বস্তুর স্থায়ীত্ব স্বীকার করে। তারা সৌগত দর্শনের ক্ষণিকতাবাদকে অবাস্তব ও অযৌক্তিক মনে করে। নাস্তিকতার এই জায়গায় মহাভারতের সঙ্গে জৈন দর্শন অনেকটাই মিলে যায়। ভারতীয় ভাবনা-চিন্তার ধারায় জৈন যুক্তিবিদ্যা মনে করে যেকোনও বচন এবং তার বিপরীত বচন, এমনকী সদর্থক ও নঞর্থক বচনের যুগ্মতারও এক সত্যতা আছে। কোনও বচন দৃষ্টিভঙ্গির উপর থেকে সত্য অথবা অসত্যে পরিণত হয়। অন্যান্য নাস্তিক মতের মতো জৈন মতকেও মহাভারতে খণ্ডন করা হয়েছে, তবে জৈনদের যুক্তি ও মতামতকে সঙ্গে নিয়ে মহাভারতের মধ্যে তাদের একীভূত করে নিয়েছে মহাভারতকার। অহিংসা ও সমস্ত জীবের প্রতি দয়া দেখানোর দিকটি ভারতীয় দর্শন বৌদ্ধ ও জৈনদের থেকে পেয়েছে। এদিক থেকে সারা পৃথিবীবাসী

একান্তভাবেই তাদের কাছে ঋণী। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদ একসময় এতটাই কঠোর হয়ে পড়েছিল যে সাধারণ মানুষ মুক্তির আশায় ও সহজ ধর্ম সাধনার জন্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে বেছে নেয়। মহাভারতেও উক্ত দুইটি ধর্মের বহুল প্রভাব দেখা যায়। জৈন দর্শনের ধৈর্য ও তিতিক্ষা এবং পরমত সহিষ্ণুতা আমাদের জীবন চর্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়াও সংশয়বাদ তো সারা বিশ্বের দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছেই। এই সংশয় থেকেই ব্যক্তি আমির অস্তিত্ব, জগৎ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত গভীর তত্ত্বকথায় দার্শনিকেরা পৌঁছতে পারে।

মহাভারতে নাস্তিকতা গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক আহমেদ তৈরিক ও উডুলোম মত নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য দার্শনিক প্রস্থানের মতো এরাও মূল মতের থেকে আলাদা অবস্থানে ছিল। কপিল মুনি থেকে কণাদ- মহাবীর-বুদ্ধ হল এই দর্শন চর্চার প্রতিনিধি স্থানীয় আলোচক। মহাভারতে নাস্তিকতার দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক যথার্থভাবে দেখিয়েছেন পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ আসলে একপ্রকার দার্শনিক লড়াইও। তবে মহাভারতের গুরুত্ব তখনই আমাদের কাছে অপরিসীম হয়ে ওঠে যখন পাঠক বা দর্শক বুঝতে পারে মহাকাব্যটির মধ্যে নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের সিদ্ধান্তী যুক্তি দ্বারা পরাজিত করলেও তাদের ভাবনাচিন্তা ও তর্কের ধরনকে মহাভারতকারও একেবারে ফেলে দিতে পারেনি। এক দীর্ঘ সময় ধরে মহাভারত রচিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন কালের ও যুগের ছবি এবং ভাবনাচিন্তা এই মহাকাব্যে মিশে আছে, তাই সার্বিকভাবে পুরো বিষয়টা যখন পাঠকের বোঝাপড়ার আয়ত্তে আসে তখনই সে জ্ঞানী ও সমৃদ্ধ হয়। মহাভারতের সার্থকতা আসলে এই জায়গাতেই।

মহাভারতে দ্রৌপদী নামের বইটি গাঙচিল দ্বারা ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, প্রাবন্ধিকের এই বইটিতে দ্রৌপদী চরিত্রের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উঠে এসেছে। আমরা জানি যে দ্রৌপদীর জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়, মহাভারতের দ্রৌপদী যথার্থভাবেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ও বৌদ্ধিক গুণাবলীর জন্য অন্যান্য পৌরাণিক নারী অপেক্ষা আধুনিক। প্রাবন্ধিকের দীর্ঘ আলোচনায় ভীল মহাভারত সহ অন্যান্য আঞ্চলিক মহাভারতের একাধিক পাঠান্তর উঠে এসেছে, যেখানে দ্রৌপদী চরিত্রটিকে নানাভাবে ভাবার ও পড়ার সুযোগ গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, মহাভারতে দ্রৌপদীর চরিত্রটি বহুস্তরীয় এবং বহুমাত্রিক।

বাঙালির মহাভারত চর্যায় বাঙালিরা দ্রুপদ কন্যা যাজ্ঞসেনীকে পাণ্ডবদের স্ত্রী হিসাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর দুর্বলতার প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তুলে এনেছে ভীল মহাভারতের আখ্যানকে, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা বলতে গিয়ে উঠে এসেছে মহাদেবের বরের কথা, দ্রুপদ-কন্যার মানব অবতার আলোচনার প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে ইন্দ্র পত্নী শচী ও লক্ষ্মীর

প্রসঙ্গ। আবার দ্রৌপদী চরিত্রের সঙ্গে পার্বতী এবং কালীকেও মিলিয়েছেন শামিম। দ্রৌপদীর বিবাহ পরবর্তী জীবন-যন্ত্রণা, স্বামীদের মঙ্গলার্থে প্রাত্যহিক কাজকর্ম ও যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা সম্পর্কিত সংকটগুলিও প্রাবন্ধিকের নজর এড়িয়ে যায়নি। দ্রৌপদীর কেশকে নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য প্রাবন্ধিক আহমেদ দেখাতে চেয়েছেন। দ্রৌপদীকে অনেকেই ‘তত্ত্ব’ হিসাবে মনে করে, সেটির সংকেতও যেন প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন। ‘কেশ’ শব্দের একটি অর্থ হল পরব্রহ্মশক্তি। যার অন্য একটি প্রতিশব্দ ‘কচ’- যা মাথায় শোভা পায়। এই কেশ বা পরব্রহ্মশক্তি বহনকারী হল কৃষ্ণ। ঝগড়া বা চুলোচুলি আসলে সম্পদের লড়াই বলে মনে করতে পারি। তাই দ্রৌপদীর উন্মুক্ত কেশকে অনেকে সম্পদের লড়াই হিসাবে দেখতে চায়, যেখানে সম্পদের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দের ও ধন্দের আভাস লক্ষণীয়। সমগ্র মহাভারত জুড়ে দ্রৌপদীর চরিত্রের এরকম একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন।

অন্যান্য অনেক মহাভারত চর্চাকারীদের মতো প্রাবন্ধিক আহমেদও দ্রৌপদীর জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে ভোলেননি। মহাভারতের একাধিক জায়গায় যুধিষ্ঠির সহ অন্যান্যদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম, কর্তব্য, সমাজনীতি, কূটনীতি ও ঔচিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে দ্রৌপদী সচেতন করেছে। মহাভারতে দ্রৌপদীর পুত্ররা বয়সে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যু’র বিবাহের মাধ্যমে ক্ষমতার আসল জায়গা বা কেন্দ্রবিন্দু সুভদ্রার কাছে চলে যাবে--- বিষয়টি দ্রৌপদীর প্রখর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা বোধগম্য হয়েছিল। কেবলমাত্র রাক্ষস হওয়ার কারণে ঘটোৎকচ যথাযথ সম্মান পায়নি, শুধুই ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বাপরের কৃত্যার এই বিষয়টিও বুঝতে বাকি থাকেনি। বনপর্বে আমরা দেখেছি দ্রৌপদীর মুখ থেকে যুক্তিপূর্ণ তিরস্কার শুনে যুধিষ্ঠির তাকে নাস্তিক হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদী হলো সেই নারী যে রামায়ণের সীতার মতো অন্যায়গুলি মাথা নিচু করে মেনে নেয়নি, বরং প্রতিবাদ করেছে এবং স্বয়ং নিজের তেজে ভাস্বর একজন নারী। যে নিজের স্বামীদের পাশাপাশি কুরুবংশের বৃদ্ধদেরও সমানভাবে নিন্দা করেছে প্রকাশ্যে। এছাড়াও শামিম দেখিয়েছেন যে ভারতীয় পুরাণ ও মহাভারতে পুরুষের বহুগামিতা সমাজ স্বীকৃত, কিন্তু নারীর একই সময়ে একাধিক স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া সমাজে এক প্রকার নিষিদ্ধ। সেখানে মহাভারতকার দ্রৌপদী চরিত্রের মাধ্যমে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারকে তুড়ি মেরে উড়িয়েছে। এইসব বিষয়গুলিকে ভর করেই আমাদের মহাকাব্যে দ্রৌপদীর চরিত্র আলাদা মাত্রা পায়।^{১৫৪} ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনমানসের মাঝে দ্রৌপদীকে নিয়ে একাধিক মিথ ভাবনা রয়েছে। তেলেগু ও তামিলরা শ্রীলঙ্কার মতো দ্রৌপদীকে দেবী হিসাবে মেনে থাকে, তাই অন্ধ্রপ্রদেশ ও ব্যাঙ্গালুরুতে দ্রৌপদীর মন্দির দেখা যায়। আবার ভারতের একটা অংশের মানুষ দ্রৌপদীকে ধ্বংসের ও মহাপ্রলয়ের সূচক হিসাবেও ভেবে থাকে।

মহাভারতে গুপ্তহত্যা এবং মহাভারতে যৌনতা প্রাবন্ধিক আহমেদে'র মহাভারত চর্চার অন্যতম দুইটি বই। গাঙচিল দ্বারা প্রকাশিত উভয় গ্রন্থদ্বয়ের প্রথমটি অক্টোবর ২০১৪ এবং দ্বিতীয়টি জুলাই ২০১৩ তে প্রকাশ পায়। আমাদের মহাভারত চর্চা অনেক সময় পাণ্ডবদের চোখ দিয়ে দেখার কারণে ভালো মন্দের একটা বিভাজন পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। ফলে এক পক্ষের দোষ ও ত্রুটিগুলি আমরা প্রায় ভুলেই যাই। মহাভারতে গুপ্তহত্যা বইটিতে এরকম আঠারোটির বেশি গুপ্তহত্যার সন্ধান প্রাবন্ধিক করেছেন। কোথাও হত্যা আচমকা আক্রমণের ফলে হয়েছে, কোথাও ষড়যন্ত্র করে খুন অথবা সারপ্রাইজ অ্যাটাক। পুরো মহাভারত জুড়েই পাণ্ডব ও কৌরবেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এমনটা করে গেছে। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, মহাভারতে ক্ষত্রিয়কে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, দুর্গত রোগীর মতো মৃত্যুবরণ করলে ক্ষত্রিয় ধর্ম থাকে না। তাই মহাভারতকার বলেছে ক্ষত্রিয়ের জন্ম ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনের জন্যই। ভীতু ও কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোকে ক্ষত্রিয়ের অধর্ম হিসেবে বলা হয়েছে। তবে যুদ্ধের একটা মান্য নিয়মাবলী বা শিষ্টাচার অবশ্যই ছিল। সেগুলি অমান্য করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করাকে অধর্ম বা অন্যায় যুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষের আদর্শ ও কৃতকর্মে যে মিলের অভাব দেখা যায়, সেটি আজকের মতো মহাভারতের যুগেও সমানভাবে সত্য ছিল।

প্রাবন্ধিক আহমেদে'র আলোচনায় উঠে এসেছে নিষাদী ও তার পঞ্চ পুত্রের গুপ্তহত্যা, পরীক্ষিতের গুপ্তহত্যা, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কাহিনি, কিমিন্দম হত্যার ঘটনা, কন্দ্ৰাষপাদের শত্রুবধ, সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনি, খাণ্ডববনের ঘটনা, মগধরাজ জরাসন্ধের ভীম দ্বারা হত্যা, সোমক রাজার পুত্রবধ, গঙ্গার পুত্রবধ, কুন্তীর প্রথম সন্তানকে হত্যার চেষ্টা, বিরাট রাজার সেনাপতি ও জামাতা কীচকের গুপ্তহত্যা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে অশ্বখামা দ্বারা পাণ্ডব শিবিরের লোকজনদের হত্যা, ঘটোৎকচের কৌশলে হত্যার কাহিনি, যুধিষ্ঠিরের অর্ধসত্য উচ্চারণের মাধ্যমে দ্রোণাচার্যের হত্যার ঘটনা, জয়দ্রথের পিতার গুপ্তহত্যা, বিষকন্যা পাঠিয়ে গুপ্তহত্যা, পিতামহ ভীষ্মের কাহিনি, কৃতবর্মা হত্যা, যাদবদের মধ্যে গুপ্তহত্যা এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাধ দ্বারা প্রাণ ত্যাগ।

অন্যদিকে মহাভারতে যৌনতা বইতে হাল আমলে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা নির্মিত প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত মিথকে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের ভারতের মতোই প্রাচীন মহাভারতের সময়েও ধর্ষণ, কামাচার, ব্যভিচার, রূপান্তরকামিতা ও সমকাম এবং যৌনতার রকমভেদের উপস্থিতি ছিল। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নারী ও শিশুদের নানাভাবে যৌননিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে। আমাদের মহাভারতেও নিগ্রহ ও বিকৃতকামের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে। প্রাবন্ধিক আহমেদ তাঁর এই বইটি জুড়ে দেখাতে পেরেছেন মহাভারতের সঙ্গে সেই

সময়ের যৌনতা, অজাচার, গণিকাবৃত্তি, শবমিলন, লিঙ্গ পুরাণ এবং কামসূত্রের সঙ্গে সংযোগের বিষয়টি। আমরা জানি ‘যৌনতা’ ও ‘কাম’ দুইটির অর্থ পৃথক। ‘যৌন’ হলো যোনিসম্বন্ধী, বৈবাহিক ও কন্যাদানাদি। অন্যদিকে কাম এর অর্থ হল ইচ্ছা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যৌনতা কামের অন্তর্গত, কিন্তু তাকে আরও কিছু শর্ত পালন করতে হয়। প্রাবন্ধিক শামিম এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক মহাকাব্যের চরিত্রদের সাধারণ মানুষ হিসাবেই দেখেছেন, তাদের দেবত্বে উত্তীর্ণ করেননি। মহাভারতের অনেক প্রধান চরিত্রেরই অপকর্ম ব্যাসদেব খোলাখুলি বলেছে, এমনকী নিজে ব্যাসদেব কানীন পুত্র হয়েও কানীন সন্তানদের ‘পাপ’ আখ্যা দিয়েছে। এখানেই মহাভারত হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সন্দর্ভ।

মহাভারতের যৌনতা বইটির সূচিপত্রের দিকে একবার তাকালেই প্রাবন্ধিকের আলোচনার পরিধি ও গভীরতা সম্পর্কে রীতিমতো সমীহ জাগে। প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছে- যৌনতা ও স্নৈরাচার, বহুপত্নী ও বহুপতি, আঠারো রকমের যৌনমিলন, ইতরকাম, শবদেহের সঙ্গে যৌনাচার, অজাচার, সঙ্গমে কার বেশি আনন্দ, স্ত্রী না পুরুষের? এছাড়াও উপস্থাপিত হয়েছে গণিকাবৃত্তি, লিঙ্গপুরাণ ও মহাভারত, কামদেব ও রতিদেবী, কামসূত্র ও মহাভারত, তন্ত্র কামাচার ও মহাভারত, মহাভারতে ধর্ষণ, বিপরীত লিঙ্গের বস্ত্র কাম, মিলনে অনু ও প্রতি, কামগীতা, মিলনে উপেক্ষিতা নারী এবং নারী-সমকামী, পুরুষ-সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী।

আমরা জানি মহাভারতে চারটি পুরুষার্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাম পুরুষার্থ তার মধ্যে অন্যতম। বইটি লেখার জন্য প্রাবন্ধিক বাগর্থতত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। ফলে আচার্য যাস্কে’র দেখানো পথে প্রাচীন সাহিত্যের অর্থ নির্ধারণে ধাতুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। জটিল একাধিক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের যাস্কে’র নিরুজ্জ্বল অনুসরণের বিষয়টি প্রশংসার যোগ্য। মহাভারতে শামিম যৌনতা ও স্নৈরাচারের কথা বলতে গিয়ে উত্থাপন করেছেন একাধিক প্রসঙ্গ। যথা- মমতা ও বৃহস্পতির কাহিনি, দীর্ঘতমার বিধান, মহাভারতে ৮ প্রকার বিবাহের প্রকারভেদ, পরাশর ঋষি ও সত্যবতীর মিলন কাহিনি, কৃষ্ণ ও ইরাবানের একটি রাতের মিলনের প্রসঙ্গ, মহাভারতে বর্ণিত ১২ প্রকার পুত্রের প্রসঙ্গ, বিশ্বামিত্র ঋষি ও অঙ্গরা মেনকার গল্প, দুশ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনি এবং স্বয়ং ব্যাসদেব ও অম্বিকা অম্বালিকার মিলনের কথা। মহাভারতে বহুপতি ও বহুপত্নীর দৃষ্টান্তও একেবারেই কম নয়। প্রাবন্ধিক এখানে আলোচনার সূত্রে তুলে এনেছেন ব্যাসদেব, রাজা শান্তনু ও বিচিত্রবীর্যদের মতো মানুষদের। এছাড়াও পাণ্ডবদের একাধিক পত্নীদের প্রসঙ্গ, কৃষ্ণের বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত, জটিল ও বাক্কীর একাধিক পুরুষ সম্বোধনের কথা এসেছে, ওঘবতী এবং মাধবীর বিষয়টিও উল্লেখ করতে শামিম ভুলে

যাননি। প্রাবন্ধিক ১৮ রকমের যৌনমিলন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এখানে মানুষের সঙ্গে সাপ ও মাছ এবং দেবতার নানারকম মিলনের কাহিনি এসেছে।

প্রাবন্ধিক গণিকাবৃত্তির বিষয়েও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। সমাজে এদেরও যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুসারে বিভেদ ছিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর আসতো এই সমস্ত বারাদ্দাদের উপার্জনের একটি অংশ হতে। বিভিন্ন কলায় পারদর্শিতার নমুনা এদের ছিল। যথা-নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকা, সুগন্ধির প্রস্তুতি এবং অবশ্যই যথাযথ মৈথুনের প্রশিক্ষণ। সমাজে শীর্ষস্থানীয়া গণিকার যথেষ্ট বেতন ও রাষ্ট্রীয় সম্মান ছিল। মহাভারতে পিঙ্গলার ও শারদণ্ডায়ণীর উপাখ্যানও আছে।^{১৫৫} তন্ত্র ও কামাচার নিয়েও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শামিম করেছেন। গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক নকুলকে স্তম্ভন শিখিয়েছিল, যার মাধ্যমে নিদ্রা ও যৌনতাকে জয় করা যায়। অর্জুন ও সুভদ্রার তন্ত্র শিক্ষার প্রসঙ্গও প্রাবন্ধিক বলেছেন। মহাভারতে সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীদের নিয়েও প্রাবন্ধিকের নজর এড়িয়ে যায়নি, সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের দুইটি বিধবা স্ত্রীর সম্পর্ক সমকামিতার। রাজা ভগ্নাস্বন ও শিখণ্ডী আবার রূপান্তরকামী ছিল। শামিম ‘মিলনে উপেক্ষিতা নারী’ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যবতী, অম্বিকা, মাদ্রী, শকুন্তলা, অম্বা, দেবযানী, অম্বালিকা, হিড়িম্বা, ভীমের স্ত্রী বলঙ্করা ও কালী, যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী দেবিকা, নকুলের স্ত্রী করেণুমতী, সহদেব পত্নী বিজয়া ও জরাসন্ধসূতাদের কথা বলেছেন। এছাড়াও উত্তরা ও কৌরব পাণ্ডবদের অন্যান্য অকাল বিধবাদের কষ্টকর দিনযাপনের দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

শামিমের মহাভারতে যৌনতা বইটি পড়তে গিয়ে মহাভারতের সময়কালের সমাজকে বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেকাংশে আধুনিক বলে মনে হয়েছে। আমরা অবাক হই মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে মানুষের যৌনজীবনের স্বাধীনতার বিষয়টিকে দেখতে পেয়ে। কারণ, যেখানে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রায় সর্বত্রই তার নানা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত ‘চয়েস/পছন্দ-অপছন্দকে’ বেঁধে দেয়, যৌনজীবনের স্বাধীনতা তো মহাভারত অপেক্ষা যেখানে খুবই কম, সেখানে মহাভারত যথার্থ অর্থেই খুবই উদার। ভাবনার এই জায়গা থেকেই বইটি এইখানে গুরুত্ব রাখে। বর্তমান সমকালীন বাংলা ভাষায় মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক আহমেদ ইতিমধ্যেই বহু চর্চিত ও আলোচিত। তাঁর এরকমই বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও লেখালেখির মধ্যে দিয়ে আমাদের মহাভারত চর্চা আরও ভরপুর হয়ে উঠবে।

অন্যান্য অপ্রধান গ্রন্থ-

অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে আমরা বিশ শতকের বাঙালির মহাভারত চর্চার একটি সামগ্রিক যাত্রাপথ মনে করার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ বিশ এবং একুশ শতকের প্রথম দু'ই দশকে যাঁরা প্রাবন্ধিক হিসাবে মহাভারত চর্চায় খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হয়তো পূর্বসূরীদের মৌলিক রচনায় বা গবেষণায় নানাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই পনেরো শতক থেকে অনুবাদের মাধ্যমে যে মহাভারত চর্চা বাঙালির শুরু হয়েছিল, আজও সেই ধারা একইভাবে বহমান। এই ধারায় আমরা পেয়েছি কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী এবং কাশীরাম দাসের মতো বিখ্যাত কবি ও অনুবাদকদের। তবে মধ্যযুগে মহাভারত চর্চায় মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করার বিষয়টিই প্রধান ছিল। যেখানে উনিশ শতকে আমরা দেখেছি আমাদের মহাভারত চর্চায় অনুবাদের পাশাপাশি লেখকের কলমে মহাভারতীয় অনুষ্ঙ্গও এসেছে বারবার। এক্ষেত্রে প্রথম তিন সারথী হচ্ছে- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন। উনিশ শতক যথার্থ অর্থেই 'ইন্ডিজুয়ালিটির' বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। যে যুগ জন্ম দিয়েছে একাধিক কৃতিবিদ্য খ্যাতিমান মহাপুরুষ ও সমাজ সংস্কারকদের। বাঙালি জাতি এ সময় পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ছিলো। একদিকে পরাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যেমন দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছে, ঠিক তেমনই যুক্তির চর্চা ও পৌরাণিক ঐতিহ্যগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও দেখা গেছে।

উনিশ শতকে এই যাত্রায় প্রথম পথিক অবশ্যই মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-তে তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে কবির যে সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় পাই, তার সাহিত্যমূল্য অপরিমিত। এরপর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-তে মহাভারতীয় অনুষ্ঙ্গ আমরা পাই। প্রথম সর্গে বীরপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের যে হাহাকার ফুটে উঠেছে তা অবশ্যই অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মৃত্যুর বেদনার সঙ্গে তুলনীয়। আমরা 'বীরঙ্গনা কাব্য'-তেও বেশ কয়েকটি পত্রতে মহাভারতের নারীদের পেয়েছি। মাইকেলের পর হেমচন্দ্রের 'বৃহৎসংহার কাব্য'-তে মহাভারতের অনুষ্ঙ্গ রয়েছে। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ মুনি অগস্ত্যের কীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে দধীচি ও বৃহৎকে বধের গল্প বিবৃত করেছে। এই আখ্যান হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যে যথার্থভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙালির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। এরপর নবীনচন্দ্র সেনের রচিত ত্রয়ী মহাকাব্য- 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'। পরবর্তী সময়ে তারাচরণ শিকদার, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারেরা মহাভারত থেকে তাঁদের কাহিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেহেতু এই অধ্যায়ে আমরা শুধুমাত্র প্রবন্ধকে নিয়ে আমাদের আলোচনা এগিয়েছি তাই অন্যান্য সংরূপের কথা অন্যত্র বলা যাবে। এবার আমরা বিশ শতক থেকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বেশ

কিছু প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের নাম উল্লেখ করবো, যেগুলি মহাভারত চর্চার জগতে একেবারে প্রতিনিধি স্থানীয় না হলেও আমাদের মহাভারত চর্চার ইতিহাসে তাদের জায়গা থাকাটা কাম্য। এই তালিকা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়, বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্যসূত্র থেকে অথবা সরকারি বা বেসরকারি গ্রন্থাগার থেকে এই তালিকা আমরা প্রস্তুত করেছি। পরবর্তীকালের গবেষকদের সুবিধার্থে এখানে আমরা বিশ শতকের মহাভারত চর্চার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বইগুলির পাশাপাশি উনিশ শতকেরও প্রবন্ধগ্রন্থগুলির নাম রাখার চেষ্টা করছি। তবে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে ও মহাভারত সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্যসূত্র থেকে মহাভারত বিষয়ক বাংলা সমালোচনা গ্রন্থের যে তালিকা করার চেষ্টা করেছি, তার অনেক গ্রন্থই বর্তমানে অপ্রাপ্যতার জন্য ‘ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন’ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তাই গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ থেকে বা গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি থেকে অবিকৃত ভাবে অনেক সময়ই সরাসরি গ্রন্থের নাম আমরা তুলে নিয়েছি।

উনিশ শতকে গদ্য বা প্রবন্ধে মহাভারতের উল্লেখ বা প্রসঙ্গ প্রথম আমরা পাই রাজা রামমোহন রায়ে’র বেশ কিছু নিবন্ধে। যেগুলির মধ্যে আছে— ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’, ‘কবিতাকারের সহিত বিচার’, ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’, ‘উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার’। এগুলির মধ্যে মাঝেমাঝেই বেদব্যাস, গীতা ও ভাগবতের প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। এর পরবর্তী সময়ে ভারতবিদ্যার অনুরাগী জেমস লং সাহেবের গ্রন্থ তালিকায় এই ধরনের কিছু গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া গেছে। যেমন—জৈনেক কে. ব্যানার্জী *ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গ্রন্থ*-তে মহাভারত কথার আলোচনা করেছেন। অন্য একটি গ্রন্থ *বিবিধপাঠে* পাণ্ডববৃন্দ, গান্ধারীর বিলাপ, সগর এবং পাণ্ডবপতন বিষয়ের আলোচনা আছে। তাঁর *জীবন বৃত্তান্ত* গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই বইগুলি ১৮৪৬-৪৮ সালের মধ্যে রচিত বলে মনে করা হয়, যাদের প্রকাশক রজ্ অ্যান্ড কোং। এরই সময়কালে জৈনেক ইংরেজ এটস রচিত *গদ্য রচনাবলী*-তে নলের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এরপর নীলমণি বসাকের *নবনারী* ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়, এখানে তিনি দ্রৌপদী ও শকুন্তলা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। মহেন্দ্র রায় দ্বারা রচিত *কুসুমাবলী* গ্রন্থে মহাভারতের ব্যাস মুনি ও অন্যান্যদের কথা আলোচিত হয়েছে। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন মারাবলী এবং গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের হাত থেকে আমরা পেয়েছি যথাক্রমে *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* এবং *নীতিরত্ন*।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগরের ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে’ পাওয়া যায় শিশুপাল বধ, নৈষধ চরিত্র, কিরাতার্জুনীয়মের আলোচনা। গোপীনাথ কবিরাজের আলোচনায় *শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব* এর মতো গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। এরপর পেয়েছি প্যারীচাঁদ মিত্রের *যুধিষ্ঠিরের চরিত্র*। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত *বিদ্যাকল্পদ্রুম*-তে মহাভারতের অনেক

বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর পরের বইগুলিতে যে প্রবন্ধগুলি আমরা বলব সেগুলি সম্পর্কে কমবেশি সবাই পরিচিত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের লেখা *বিচিত্রবীৰ্য* এবং চন্দ্রনাথ বসু'র লেখা *শকুন্তলাতত্ত্ব*। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র* এবং *শ্রীমৎভগবতগীতা* মহাভারত সম্পর্কে উনিশ শতকে বাঙালির লেখা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বই। বঙ্কিমের মতামতের সঙ্গে আমরা অনেকাংশেই সহমত নই, কিন্তু মতামতের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এই দুইটি বই প্রত্যেক ভারতীয় তথা বাঙালির পড়া দরকার বলে মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদী, শকুন্তলা, শকুন্তলা-মিরন্দা-দেসদিমনা বিশ্লেষণে মহাভারতীয় প্রসঙ্গ ও প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি এবং চিত্তশুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন *দময়ন্তী* এবং রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন *ভীষ্মচরিত*। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *কাশীরাম দাস* এবং ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুরুক্ষেত্র' বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন— উর্বশী বিদায়, দুর্বাসার কথা, শকুন্তলার মা, দুশ্মন্তের ভাঁড়, শকুন্তলার হিন্দুয়ানী, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি। উমেশচন্দ্র বটব্যালের রচিত *হুসেনশাহী মহাভারত*। শ্রীম কথিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত* কথোপকথন প্রসঙ্গে মহাভারতীয় নানা আখ্যান ও উপাখ্যান সরসভাবে আলোচনা করেছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেব ঠাকুর। রমেশচন্দ্র দত্তের আলোচনায় পাওয়া যায়— দ্রৌপদী চরিত্র, হিন্দু আর্ষদের প্রাচীন ইতিহাসে মহাভারতীয় যুগ এবং মহাভারত। বীরেশ্বর পাণ্ডের প্রবন্ধ 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'-তে নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ীকাব্যের সমালোচনা করেন। এছাড়াও হরলাল ভট্টাচার্যের *মহাভারতে ভীষ্ম চরিত্রের মাহাত্ম্য* নামে বিখ্যাত রচনা আমরা পাই। হরলালের অন্য দুইটি বইয়ের মধ্যে অন্যতম হল *মহাভারত* (গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত), অন্যটি হল *কাশীদাসী মহাভারত* (দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত)।

বিংশ শতক এবং একুশ শতকের প্রথম দু'ই দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি—

সখারাম গণেশ দেউস্কর — যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত)

—জয়দ্রথ বধ (প্রতিভা পত্রিকায় প্রকাশিত)

বেনীমাধব শীল — প্রভাস খণ্ড (উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত)

দেবেন্দ্রনাথ বসু— *শকুন্তলায় নাট্যকলা* এবং *শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনা*

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার— প্রভাস খণ্ড

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়— পঞ্চকন্যার অংশবিশেষে দ্রৌপদী ও কুন্তী বিষয়ক আলোচনা

বুদ্ধদেব বসু— *মহাভারতের কথা* (সিগনেট প্রেস)

প্রতিভা বসু— *মহাভারতের মহারণে* (বিকল্প প্রকাশনী)

পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য— মহাভারতের কৃষ্ণ
 সুকুমার সেন— ভারতকথার গ্রাফিমোচন (আনন্দ পাবলিশার্স)
 স্বামী জুনেশ্বরানন্দ— ভারত কথামৃত
 বীরেন্দ্র মিত্র— মহাভারতের স্বর্গদেবতা
 হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়— প্রসঙ্গ মহাভারত
 নরেশচন্দ্র জানা— শকুন্তলা ও সীতার বনবাস
 সত্যজীবন দাস— চন্দ্রভাগা দ্রৌপদী
 গৌরবচন্দ্র সাহা— শ্রীকৃষ্ণ (১-৪ খণ্ড)
 রবীন্দ্রনাথ দাস— শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গত শ্রীমদমহামানব্রত ব্রহ্মচারী (শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ বিষয়ক তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ)
 আশা দাস— রামায়ণ-মহাভারত ও জাতক
 চিত্তরঞ্জন ঘোষাল— ভারতসংবাদ
 বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী— মহাভারত গাইড, মহাভারত (আনন্দ পাবলিশার্স)
 অতুল সুর— মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা
 রাজেশ্বর মিত্র— মহাভারত চিন্তা
 দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়— মহাভারতের কুমারীমাতা
 ধীরেন্দ্রলাল ধর— মহাভারতের উপাখ্যান বিষয়ক আলোচনা
 কালীপদ সরকার— কৃষ্ণকথা চিরন্তনী
 দিলীপ কুমার রায়— কৃষ্ণকথা কাহিনী
 ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়— নরনারায়ণ
 বীরেন্দ্র সিংহ— যদুবংশ
 বিষ্ণুপদ দত্ত— শিশুপাল বধ কাব্য সমীক্ষা
 স্বপন বসু— সতী বিষয়ক নিবন্ধ
 অমলেশ ভট্টাচার্য— মহাভারতের কথা (প্রতিভাস)
 প্রভাতরঞ্জন সরকার— মহাভারতের কথা
 জনার্দন চক্রবর্তী— মহাভারতের বিদুর সম্পর্কিত মননশীল বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
 সুকুমারী ভট্টাচার্য— রামায়ণ ও মহাভারত : আনুপাতিক জনপ্রিয়তা (একটি বিশেষ তুলনাত্মক বিশ্লেষণ) (গাঙচিল প্রকাশনী)
 কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়— ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ (সাহিত্যলোক)
 বীরেন্দ্র মিত্র— কুরুক্ষেত্রে দেব শিবির
 নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী — অর্জুন-দ্রৌপদী

- কৃষ্ণা- কুন্তী এবং কৌন্তেয় (আনন্দ পাবলিশার্স)
- মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ (আনন্দ পাবলিশার্স)
- মহাভারতের অষ্টাদশী (আনন্দ পাবলিশার্স)
- মহাভারতের প্রতিনায়ক (আনন্দ পাবলিশার্স)
- মহাভারতের ছয় প্রবীণ (আনন্দ পাবলিশার্স)
- দেবতার মানবায়ন (আনন্দ পাবলিশার্স)
- মহাভারতের লঘু-গুরু (পত্রলেখা)
- মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি (পত্রলেখা)
- দণ্ডনীতি (সাহিত্য সংসদ)
- কথা অমৃতসমান (দে'জ)

ভূপেন চৌধুরী— কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী

বারিদবরণ ঘোষ— কুরুক্ষেত্রের শেষ দশ মহাবীর (নাথ পাবলিশার্স)

বারিদবরণ ঘোষ — মহাভারতের অন্তরমহল (নাথ পাবলিশার্স)

বারিদবরণ ঘোষ - মহাভারতের নারীচরিত্র

বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত)— স্বামীজীর মহাভারত (পারুল প্রকাশনী)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত— উনিশ শতকের মহাভারত

বীরেন্দ্র দত্ত— সংস্কৃত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কবি কাশীরাম দাসের কাব্য বিচার

নিরঞ্জন সাহা— রামায়ণ মহাভারতের দেব গন্ধর্বেরা কি ভিন্ন গ্রহবাসী

শঙ্কু মহারাজ— দ্বারকা ও প্রভাস বিষয়ক আলোচনা

শিপ্রা দত্ত— চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত (ডি এম লাইব্রেরি)

শিপ্রা দত্ত — মহাভারতের কৃষ্ণ (ফার্মা কে এল এম পাবলিশার্স)

স্বামী বেদানন্দ— গুরুমুখী মহাভারত

স্বামী তথাগতানন্দ— মহাভারত কথা

দিলীপ কুমার ভারতী— সহিংস যুধিষ্ঠির

মনোনীত সেন— রামায়ণ ও মহাভারত: নব সমীক্ষা

বলরাম চক্রবর্তী— মহাভারত ও পুরাণ থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সনাক্তকারী গ্রন্থ

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়— কৃষ্ণ চরিত

সুখরঞ্জন রায়— মহাকাব্যের চলচিত্র ও চলচিত্রে মহাকাব্য

অর্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য— গীতায় শ্রীকৃষ্ণ

— কুরুক্ষেত্রের অধর্ম-যুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ

— দ্রৌপদীর সেকাল ও একাল

—মহাভারতের নারী

অশ্বকুমার সিকদার— নবীন যদুর বংশ

বীরেন্দ্র কুমার রায়— মহাভারতের চরিত্র

সুখময় ভট্টাচার্য— মহাভারতের চরিতাবলী

— মহাভারতের সমাজ

— মহাভারতের চতুর্বর্গ

শিশির কুমার সেন— মহাভারতের মূলকাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ

নরেশ গুহ— একালের জন্য মহাভারত পাঠের ভূমিকা

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— কৃষ্ণ কাহিনী মহাভারত (১৬ অংশে বিভক্ত) (বিংশ শতাব্দী প্রকাশনা)

— অন্য চোখে মহাভারত (বিংশ শতাব্দী প্রকাশনা)

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত— ভারত জিজ্ঞাসা

অরুণ রায়চৌধুরী— মহাভারতের উৎস সন্ধানে

পল্লব সেনগুপ্ত— ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা উৎস সন্ধানে (ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাভারতকে দেখেছেন)

কল্পনা ভৌমিক— কবীন্দ্র মহাভারত (লিপিতাত্ত্বিক- ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা)

সুধাময় দাস— কালের ইতিহাসে মহাভারত

শিপ্রা দত্ত— চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত (১-৭ম খণ্ড)

বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়— তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত

আশুতোষ ভট্টাচার্য— দেবব্রত ভীষ্ম

নীহাররঞ্জন মিত্র— দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ও বহুপত্ন্যত্বক বিবাহ

তারাপদ পাল— পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা

বিমলাচরণ লাহা— প্রাচীন ভারতে কুরুবংশ

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়— ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ

নিবারণচন্দ্র পাল— মহাভারত সার

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ— মহাভারতের কথা

মধু চট্টোপাধ্যায়— মহাভারতের জন্মকথা

রাজশেখর বসু— মহাভারতের মানব চরিত্র

জীবনকৃষ্ণ মন্ডল— মহাভারতের যান ও বাহন কথা

রাজলক্ষ্মী দেবী— রত্নকথা (মহাভারতের কথা ও উপদেশ)

বসন্তকুমার বসু মল্লিক— শ্রীকৃষ্ণ বা সার্বভৌমিক ধর্ম

বীরেন্দ্র মিত্র— দানিকেন তত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা
 অনন্ত ভট্ট— ভারত চম্পু
 স্বামী অমলানন্দ— মহাভারত কাহিনী
 অসীম চট্টোপাধ্যায়— করুণা তোমায় কুন্তী
 অসীম চট্টোপাধ্যায়— জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণ
 প্রদ্যোত কুমার চট্টোপাধ্যায়— যুগান্তকারী দুই যোদ্ধা
 বরুণ সেন— জতুগৃহের জ্বালা
 বাসুদেব পোদ্দার— রামায়ণ মহাভারত কাল
 শৈলেন্দ্র বিশ্বাস— মহাভারতের মণিমুক্তা
 শ্যামল দত্ত চৌধুরী— মহাভারতের পরে
 শ্যামল দত্ত চৌধুরী— সর্বনাশেয় দুরামেয় দুর্যোধন
 মৃণালকান্তি পট্টনায়ক— মহাভারতের ভাস্বর মুহূর্তগুলি
 মল্লিকা ঘোষ— সার্থ চারিসহস্র বাক্য প্রতিবাক্যে মহাভারত
 অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্তী— ইতিহাসের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচরিত্র
 মিহির সেনগুপ্ত— যুগান্তে
 হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত)— কাশীদাসী মহাভারত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত)
 শ্যামলবরণ দত্ত— মহাভারতের আলোকে রাজনৈতিক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
 হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— অন্যচোখে মহাভারত
 সত্যদুলাল মণ্ডল— মহাভারত ভাবনা
 হীরেন সান্যাল— মহাভারতের দর্পণে
 হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়— প্রসঙ্গ মহাভারত
 প্রদীপ দাশগুপ্ত— ভীষ্ম
 দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)— কাশীদাসী মহাভারত (সাহিত্য সংসদ)
 বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র(সম্পাদিত)— কাশীদাসী মহাভারত (মণ্ডল এন্ড সন্স)
 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়— কাশীদাসী মহাভারত (প্রবাসী কার্যালয়)
 ঈশ্বর ত্রিপাঠী— মহাভারত চর্চা (অব্যয় লিটারারি সোসাইটি)
 কালিদাস মৈত্র— মহাভারতের শিখণ্ডী (গ্রন্থরশ্মি)
 কালিসাধন মুখোপাধ্যায়— দ্রৌপদী (তুলিকলম)
 দীপঙ্কর লাহিড়ী— শাস্ত্রত মহাভারতের পুনঃপাঠ (মনফকিরা)
 দেবেন্দ্রনাথ বসু— শ্রীকৃষ্ণ (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)
 অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়— মহাভারতের সৃষ্টি ও স্রষ্টা (আনন্দ প্রকাশন)

অনিল চন্দ্র বসু— মহাভারতম্ (উদ্যোগ ও অনুশাসন পর্ব) (সংস্কৃত বুক ডিপো)
 অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী— মহাভারতম্: বন পর্ব
 উপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী— বিচিন্তা মহাভারতের কথা ও অন্যান্য (বিশ্ববিদ্যা)
 উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— মহাভারতের সূচী (হিন্দু মিশন)
 উত্তম ঘোষ— মহাভারত প্রেমকথা (মৌসুমী প্রকাশনী)
 কালিপদ দাস— ডার্কসাইড মহাভারত (মৌসুমী প্রকাশন)
 পূর্ণচন্দ্র দে— সঠিক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ অষ্টাদশ পর্ব, কাশীরাম দাসের মহাভারত
 কালিদাস মৈত্র— মহাভারতে শিখণ্ডী (গ্রন্থরশ্মি)
 কালিসাধন মুখোপাধ্যায়— দ্রৌপদী (তুলিকলম)
 গোবিন্দনাথ গুহ— মহাভারত
 চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব কাশীদাসী মহাভারত
 জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ— মহাভারত- শ্রীমহাভারতের বৃহৎসূচী
 তারকনাথ তত্ত্বরত্ন— মহাভারত (আদি, সভা, বন, বিরাট পর্ব)
 তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা— সংক্ষেপে মহাভারত বা মহাভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
 (জয়নারায়ণ প্রেস)
 তাপসী মুখার্জী— মহাভারত: পুরাণে সাংখ্য দর্শনের উত্তরাধিকার (সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার)
 দীপককুমার নাগ— মহাভারত ও রামায়ণে শাসন রাজনীতি (পুস্তক বিপণি)
 দীপক রায়— মহাভারতের কথা: জীবনে, জিজ্ঞাসায় (ওরিয়েন প্রেস)
 নিমাই চন্দ্র শিরোমণি— মহাভারত
 প্রমথনাথ মল্লিক— মহাভারত (শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং)
 প্রিয়দর্শন হালদার— ভারত চিত্র
 বীরেন্দ্র কুমার রায়— মহাভারতের কৃষ্ণ
 বীরেন্দ্রনাথ দত্ত— সংস্কৃত মহাভারতের প্রেক্ষিতে কবি কাশীরাম দাসের কাব্য বিচার (বর্ধমান
 বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা)
 যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য— পুণ্য ভারতকথা
 রাজেন্দ্রনাথ কাজিলাল— মহাভারতের নীতিকথা
 রামচন্দ্র শাস্ত্রী— মহাভারত: আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম পর্ব
 রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত— মহাভারত (সত্যপ্রকাশ প্রেস)
 — মহাভারত: শান্তি পর্ব (সত্যপ্রকাশ প্রেস)
 রামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ— মহাভারত
 রামদয়াল মজুমদার— ভারতসমর বা গীতা পূর্বাধ্যায়

শঙ্কর শীল— মহাভারতের নারী (নবপত্র)

—মহাভারতের নরনারী (নবপত্র)

— মহাভারতের নায়ক (নবপত্র)

দিব্যেন্দুশেখর মিশ্র— মহাভারত: নানা প্রসঙ্গ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল (অমর ভারতী)

শ্যামলবরণ দত্ত— মহাভারতের আলোকে রাজনৈতিক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (দে'জ)

শেখর সেনগুপ্ত— হেলেন সীতা দ্রৌপদী (মডার্ন কলাম)

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস— মহাভারত (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েড পাবলিশিং কোং)

শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ— পাণ্ডব নির্বাসন

সদগুরু দাস— মহাকাব্য দর্শন

সরোজিনী ভূইঞা—মহাভারত (আদি পর্ব)

সতীশচন্দ্র শীল— মহাভারত (বিরাত পর্ব)

যদুনাথ ব্যানার্জি—মহাভারত: আদিপর্ব-সত্যব্রত সামসরমী

সারদাপ্রসাদ— মহাভারত (সত্য প্রকাশ প্রেস)

সঞ্জীব ন্যায়তীর্থ— মহাভারত: আদি পর্ব (সনাতন শাস্ত্র)

সত্যকিঙ্কর সাহানা— মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব (জিঞ্জাসা)

সন্ন্যাসী চরণ চন্দ্র— মহাভারতের উপদেশাবলী

সুধা সেন— ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ

সোমনাথ ভট্টাচার্য— মহাভারতম্: বন পর্ব (সংস্কৃত বুক ডিপো)

সত্যদুলাল মণ্ডল— মহাভারত ভাবনা (একুশ শতক)

হীরেন সান্যাল— মহাভারতের দর্পণে (দে'জ পাবলিশিং)

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়— প্রসঙ্গ মহাভারত (শশধর প্রকাশনী)

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ— মহাভারতের ইতিহাস

— মহাভারতের সময়

হৃদয়রঞ্জন পাঁজা— কৃষ্ণ-বলরামচরিত (ইসকো প্রকাশনী)

শাঁওলী মিত্র- মহাভারত ও আমার কথকতা (নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন)

—ইতিহাস পুরাণ ও আখ্যান (কারিগর)

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল— নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ (আনন্দ পাবলিশার্স)

ধীরেশ ভট্টাচার্য— মহাভারতের নারী (আনন্দ পাবলিশার্স)

— মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত (আনন্দ পাবলিশার্স)

— নায়ক যুধিষ্ঠির (আনন্দ পাবলিশার্স)

দেবীদাস আচার্য— মহাভারতের জনবিদ্রোহের উপাদান (সিগনেট প্রেস)

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ— মহাভারত (অভিযান পাবলিশার্স)
 নিবেদিতা বিশ্বাস— মহাভারত: প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর (দে পাবলিকেশন)
 নিতাই মল্লিক—রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত (গিরিজা লাইব্রেরী)
 শামিম আহমেদ— মহাভারতে দ্রৌপদী (গাঙচিল)
 —মহাভারতে গুপ্তহত্যা (গাঙচিল)
 —মহাভারতে যৌনতা (গাঙচিল)
 — মহাভারতে নাস্তিকতা (সিগনেট প্রেস)
 —মহাভারতের বিবাহ (গাঙচিল)
 সব্যসাচী রায়চৌধুরী— প্রেক্ষিত মহাভারত (আশাদীপ প্রকাশনী, ২০২০)
 সুহৃদকুমার ভৌমিক— মহাভারতে বর্ণিত জনজাতি (টেরাকোট, ২০২০)
 সুব্রতকুমার দাস— রবীন্দ্রনাথ ও মহাভারত (মূর্খণ্য, ২০১২)

Bimal krishna Matilal— Ethics and Epics: Philosophy, Culture and Religion,
 (Motilal Banarsidass)

Sibaji Bandyopadhyay and Sankha Banerjee—Vyasa: The Beginning,Penguin
 Random House India (14 August 2017)

Sibaji Bandyopadhyay—THREE ESSAYS ON THE MAHABHARATA,Orient
 Blackswan Private Limited - New Delhi (1 January 2015)

Sibaji Bandyopadhyay and Arindam Chakrabarti—Mahabharata Now:
 Narration, Aesthetics, Ethics. Routledge (India) (1 January 2018)

গীতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিক ব্যক্তি আলোচনা
 করেছেন, আমরা তাদের থেকে কয়েকজনকে আলোচনায় রাখলাম—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা —দেবেন্দ্র বিজয় বসু
 — জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত)
 — সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (গান্ধী ভাষ্য)
 — অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়
 — উত্তমানন্দ স্বামী

বাংলা সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা—

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) — কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত (মডার্ন বুক এজেন্সি)

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) — মহাভারতে বন পর্ব: যক্ষ যুধিষ্ঠির সংবাদ (মডার্ন বুক এজেন্সি)

গোপাল হালদার (সম্পাদিত) — মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত মহাভারত (স্বাক্ষরতা প্রকাশন)

— কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত (স্বাক্ষরতা প্রকাশন)

গিরিধর বিদ্যারত্ন— মহাভারত: বেদব্যাস প্রণীত (স্বাক্ষরতা প্রকাশন)

চিত্রা দেব (সম্পাদিত) — মহাভারত-শংকর কবিচন্দ্র প্রণীত (সাহিত্যলোক)

চৈতালি দত্ত (সম্পাদিত) — ভীষ্ম- প্রদীপ দাশগুপ্ত (নবপত্র)

— কর্ণ—প্রদীপ দাশগুপ্ত (নবপত্র)

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পাদিত) — মহাভারত (প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম)

নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) — মহাভারত- বিজয় পণ্ডিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

পঞ্চগনন তর্করত্ন (সম্পাদিত)— মহাভারত (বঙ্গবাসী কার্যালয়)

প্রত্যাশকুমার রীত (সম্পাদিত) — ঠাকুরবাড়ির পত্রিকার রামায়ণ মহাভারত চর্চা: প্রসঙ্গ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (মনফকিরা)

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) — ছুটিখানের মহাভারত: অশ্বমেধ পর্ব (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

মণীন্দ্র কুমার বসু (সম্পাদিত)— সঞ্জয়ের মহাভারত (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) — কাশীদাসী মহাভারত (প্রবাসী কার্যালয় প্রকাশনা)

শোভন সোম (সম্পাদিত) — কাশীদাসী মহাভারত (রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়)

সুবোধ মজুমদার (সম্পাদিত) — কাশীদাসী মহাভারত (দেব সাহিত্য কুটীর)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) — কাশীদাসী মহাভারত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

বিশ শতকের শুরু থেকে একুশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় আমাদের মহাভারত চর্চার ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমরা এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র প্রবন্ধের ওপরেই আলোচনা করলাম। প্রতিনিধি স্থানীয় যে সকল প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধ গ্রন্থ বাঙালির মহাভারত চর্চার প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে, তাদের মহাভারত সম্পর্কিত বিদ্যায়তনিক স্তরের ভাবনাকে আমরা এই অধ্যায়ে খুঁজতে চেয়েছি। অনেক সময়ই মহাভারতের বিভিন্ন বিষয়কে তুলনামূলকভাবে ভাবতে

গিয়ে একাধিক প্রাবন্ধিকের ভাবনাকে আমাদের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি। তাঁদের অনেক অভিমতের সঙ্গেই আমরা সহমত হয়েছি এবং অনেক জায়গাতেই আবার মতানৈক্য হয়েছে। আমাদের আলোচিত প্রাবন্ধিকেরা সবাই মহাভারত চর্চার ধারায় বিশেষ আসন অধিকার করে আছেন। তবে প্রতিনিধি স্থানীয় এই সকল প্রাবন্ধিকদের বাইরেও রয়ে গেছেন আরও অনেক বিখ্যাত প্রাবন্ধিক, যাঁরা হয়তো নিজেদের মতো করে মহাভারত চর্চা করে গেছেন এবং যাচ্ছেন। আমরা চেষ্টা করেছি সেই সকল প্রাবন্ধিকদের চর্চার বিষয়ে কিছু বলতে এবং তাদের রচিত মহাভারত সম্পর্কিত সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ বা গ্রন্থগুলিকে আমাদের গবেষণার মধ্যে রেখে দিতে। এই তালিকা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের চেষ্টা থাকল এই তালিকা যতটা সম্ভব দীর্ঘ করা যায়। আমরা তাই আমাদের আলোচনায় বিশ শতক জুড়ে মহাভারত সম্পর্কিত যে সব প্রবন্ধের বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা অধ্যায়ে জুড়ে দিয়েছি।

বিশ শতকের শেষের দিকে বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত* নামের বইটি মহাভারতের গবেষকদের মনে ভালো সাড়া ফেলেছিল। কত গভীরভাবে উভয় মহাকাব্যে গবেষকের সার্বিক দখল না থাকলে এরকম বই করা যায় না। বইটিতে আলোচিত হয়েছে— মহাকাব্য দু'টিতে শ্লোকের সাম্য, মহাকাব্য দু'টিতে উপাখ্যানের মিল ও অমিল, রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত সমাজজীবন, ভারতীয় জনমানসে মহাকাব্য দু'টির প্রভাব, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে মহাকাব্য দু'টি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, ভারতবাসীর জীবনে উভয় মহাকাব্যের চরিত্রগুলির প্রভাব ইত্যাদি।^{১৫৬} ভারতবিদ্যার অন্য এক গবেষক শিপ্রা দত্ত রচনা করেন *চরিত্রে রামায়ণ ও মহাভারত*। অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত বইটি বিস্তারিতভাবে উভয় মহাকাব্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় যথার্থই ভরপুর। আমাদের মহাভারত চর্চার ধারায় এরকম বই সত্যিই দুর্লভ। বইটিতে কুন্তী ও কৌশল্যা, কুম্ভকর্ণ ও ভীম, রাম ও যুধিষ্ঠির, কৈকেয়ী শকুনি ও দুঃশাসন, লক্ষ্মণ ও অর্জুনদের মতো চরিত্ররা গভীরভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে।^{১৫৭}

প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র মিত্র মহাভারতের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। যার মধ্যে *কুরুক্ষেত্রে দেব শিবির* অন্যতম। এরকম সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বই খুব কম দেখেছি আমরা। মহাভারতের দেবতারা আসলে কারা এবং কোথা থেকে এসেছে? দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীরা কি পূর্বে অন্য কোনও জায়গা থেকে এসেছিল? ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৌম সমাজের অবস্থান কিরূপ ছিল? প্রভৃতির মতো আলোচনা তাঁর লেখালেখি থেকে আমরা পেয়েছি। এছাড়াও বইটিতে আলোচিত হয়েছে— প্রাচীন ভারতের জনপদ, কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজ্য,

যুদ্ধের আকৃতি, দেবাসুর শিবির, বিদুরের ধর্ম, পাণ্ডব সহায় ব্যাসদেব, দেবতার ক্ষুধা, পাথুরে স্বর্গের পথে পথে, অর্জুনরথে রোবট? দেবতাদের সন্ধিপ্ৰস্তাব প্রভৃতি।^{১৫৮}

ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের পণ্ডিত গবেষক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ে'র *ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ* নামের বইটি সরাসরি মহাভারতের ওপর না হলেও গবেষকদের মনে ভালো জায়গা পেয়েছে। কারণ বইটিতে মহাভারতের অনেক অনুষ্ণ সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনেক পুরনো। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের পড়তে হয়। কৃষ্ণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও ভক্তের মনে একদিনে জায়গা করে নেয়নি। কৃষ্ণের প্রভাব আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পে অনেকদিনের, তা যীশুর পৃথিবীতে আসার অনেক আগেই। কারণ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অনেক সাহিত্যেই কৃষ্ণ মানুষ থেকে ভগবানে রূপান্তরিত হয়েছে, তার প্রমাণ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলি। এই বিষয়ে পূর্বে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র *মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ* নামক বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে বিশদে আমরা উপস্থাপন করেছি। এই বইটিতেও প্রাবন্ধিক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন— কৃষ্ণচেতনার পূর্বাভাষ, দেবতা ও অসুর প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মণ্য সমাজে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণ— মহাভারতে ও পুরাণে এবং ভগবান বিষ্ণু ও যজ্ঞ ইত্যাদি।^{১৫৯}

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শিশির কুমার সেন *মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ* নামে একটি বই লিখেছিলেন। তবে শিশিরবাবু নিজে বিচারক ও আইনের ছাত্র হওয়ার কারণে মহাভারতের বেশ কিছু বিষয়ে গোয়েন্দার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেছেন। তাঁর আলোচনায় মূলত মহাভারতের কাহিনীতে অসঙ্গতি ও প্রক্ষিপ্ত অংশ নিয়ে নানা কথা উঠে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টি বিতর্কমূলক হলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মহাভারতের সংকলন যেহেতু দীর্ঘ সময়কাল ধরে হয়েছে তাই বিভিন্ন যুগের ও কালের পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব ও কথাবার্তা এই মহাগ্রন্থে থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের কাছে প্রক্ষিপ্ত অথবা প্রক্ষিপ্ত নয়— এই তর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ লাগে না। এছাড়াও তিনি আলোচনা করেছেন ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংশোধিত মহাভারতের বিষয়ে কিছু কথা ও মহাভারতে মূল ভারত সংহিতা ও যোজনা অংশ।^{১৬০}

২০১৯ সালে নভেম্বর মাসে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত দেবীদাস আচার্য রচিত *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। বইটিতে স্থান পেয়েছে প্রাবন্ধিকের বিভিন্ন সময়ে লেখা দশটি প্রবন্ধ। যেগুলি হচ্ছে— ঈশ্বরের রাজনীতি: পটভূমি মহাভারত, খাণ্ডব ও জতুগৃহ: দুটি পরিকল্পিত গণহত্যা, দ্রৌপদীর না-হওয়া স্বয়ংবর ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, দুর্যোধন কিন্তু সুশাসক ছিলেন, পাশায় হারিয়ে দুর্যোধনের রাজ্য কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, মহাভারতে

জনবিদ্রোহের উপাদান, মহাভারতে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ, মহাভারতের বিদ্রোহিণী, দাস দাসত্ব ও মহাভারত এবং অস্বা থেকে শিখণ্ডী: অপূর্ণ প্রতিশোধের গল্প। পেশায় সাংবাদিক দেবীদাস আচার্য প্রাবন্ধিক হিসাবে আগাগোড়া মার্কসবাদী মতবাদের অনুসারী। মহাকাব্যের প্রাচীন শরীরের নিবিড় ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে ধারালো আধুনিক অস্ত্রে। এখানে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে আলোচিত হয়েছে আমাদের সমাজের অসম বন্টন, দ্বন্দ্ব- বিদ্বেষ, ন্যায়-অন্যায়, লিঙ্গ বৈষম্য ও প্রতিবাদ ইত্যাদি। মহাভারত পাঠ আমরা সাধারণত পাণ্ডবদের চোখ দিয়েই পড়ে থাকি, কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে এই বিচার ও দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পর্যাপ্ত নয় একেবারেই। তাই চিরাচরিত সংস্কারের বিপরীতে গিয়ে আলোচিত বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব নৈব্যক্তিকভাবে ও উচ্চবর্ণীয় ব্যাখ্যানের সমান্তরালে দেখবার চেষ্টা হয়েছে— প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের মাধ্যমে। কিন্তু মহাভারত পাঠ ও চর্চা কোনও একটি নির্দিষ্ট মতবাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হলে সম্পূর্ণতা পায় না। এক্ষেত্রে দেবীদাসের বক্তব্য অত্যন্ত ধারালো হলেও মহাভারতকে শেষ পর্যন্ত বুঝতে হয় হৃদয় দিয়ে, মহাভারতকে দেখতে হবে তৎকালীন সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে। আমাদের মহাভারত চর্চা অবশ্যই বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় হওয়াই কাম্য। তবে আবার এই কথাও বলতে হবে বিগত দশকগুলিতে রণজিৎ গৃহ, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়'দের নিম্নবর্ণের ইতিহাস চর্চা জনমানসে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেদিক থেকে প্রাবন্ধিক আচার্যের মহাভারত চর্চার বইটি অবশ্যই অন্য মাত্রা যোগ করে।

একুশ শতকে বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ এক জনপ্রিয় নাম। তবে তাঁর মহাভারত পড়তে গিয়ে অনেক সময়ই অবাক হতে হয়। মহাভারতের সর্বজনগ্রাহ্য যে রূপটি পুণের ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রাপ্ত পাঠগুলিকে মিলিয়ে মহাভারতের 'ক্রিটিকাল এডিশান' তৈরি করেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে মহাভারতের বিশুদ্ধ রূপ বলে কিছুই নেই। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে মহাভারতের আকার বেড়েছে। বিভিন্ন সময় তাই বিভিন্ন প্রাবন্ধিক বা রচনাকার নিজেদের মতো করে মহাভারত পড়েছেন। নিজের ভাবনা মতো বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে কাশীরাম দাস, রাজশেখর বসু, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সবাই মহাভারত চর্চায় নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছেন। এগুলি বলার কারণ শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষও এর বাইরে নয়। তিনি তাঁর বইতে প্রথমেই দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের ছায়াসঙ্গী রূপে চতুর বর্মাকে হাজির করলে পাঠকের আগ্রহ জেগে ওঠে কেন? চতুর বর্মা নামে কেউ মূল মহাভারতে ছিল কিনা সেই প্রশ্নে নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে প্রথম পর্বে নগরের বিকাশ ও ক্ষত্রিয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে করা মন্তব্যগুলি মহাভারতের পাঠক এড়িয়ে না গেলেই হয়। মহাভারতের একাধিক দিক যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদ, সমাজে উচ্চবর্ণের অবস্থান বনাম নিম্নবর্ণ জাতিসংকরের ভূমিকা নিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচনা

করেছেন। তবে মহাভারত মূলত চারটি পুরুষার্থের কথা বললেও, অর্থ ও কামের কথা ধর্ম এবং মোক্ষের মতো আলোচিত হতে দেখা যায় না— এই বিষয়টি প্রাবন্ধিক ঘোষ যথার্থই বলেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন তৎকালীন সময়ের বিরাট এই ভূ-ভাগের অর্থনীতি কেমন ছিল। অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে সুধন্য নামের এক বণিক হাজির হয়েছে প্রাবন্ধিক শুদ্ধের মহাভারতে, যেখানে সুধন্যের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক ধরিয়ে দিচ্ছেন হস্তিনাপুরকে কেন্দ্র করে সমগ্র আর্যাবর্তের রাজনীতি ও অর্থনীতি। সেই সময়ের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হলেও কৃষিজাত পণ্য কীভাবে রূপান্তরিত হতো বাণিজ্যিক পণ্যে; সেই পণ্য-নির্ভর অর্থনীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করত রাজনীতির গুটিগুলি এবং কীভাবেই বা ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয়নীতি কাজে লাগাত ক্রমশ সমাজে বসতে থাকা বৈশ্য সমাজকে?— এগুলিও উঠে এসেছে তার লেখায়। মনস্তত্ত্বের পাঠও গভীরভাবে করেছেন তিনি, মননশীল পাঠক নিশ্চয়ই চমকিত হবে কৃষ্ণ এবং দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের সম্বন্ধের রসায়ন বিশ্লেষণে বা এমনই নানা চরিত্রের চিত্রণে। মহাভারতে বহুগামিতার প্রভাব নায়ক নায়িকাদের উপর কেমন ছিল? প্রাবন্ধিকের মহাভারত চর্চা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে কুন্তী ও দ্রৌপদীর সম্পর্কে, ভাবতে বাধ্য করে দ্রৌপদী ও সুভদ্রার আন্তঃসম্পর্কেও। আমরা আগেই বলেছি শুদ্ধসত্ত্ব আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সঙ্গে পুরাণ, নাট্যকাব্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং পালি সাহিত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন। শুধু পড়াই নয়, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ছিন্নসূত্রগুলিকে মেলানোর প্রয়াসও করেছেন তিনি।^{১৬১}

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী'র মহাভারত নামে একটি প্রবন্ধের বই খুবই উল্লেখযোগ্য। তবে এটিকে আমরা প্রবন্ধের বই না বলে 'তথ্যপঞ্জি' বললেই বোধহয় বেশি ভালো হয়। মহাভারত সম্পর্কিত অসংখ্য খুঁটিনাটি তথ্যে ভরপুর এই বই। মহাভারত সম্পর্কে অতি অল্প সময়ে গড়ে তোলার উপযোগী একাধিক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এখানে আছে। এছাড়াও ওই সময়ের বিভিন্ন স্থান, নদী, পাহাড়, বন প্রভৃতির বর্তমান নাম ও অবস্থান সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে। প্রাবন্ধিক চক্রবর্তী'র বইতে আছে সপ্তর্ষি, অষ্টাবসু, দ্বাদশ আদিত্য এমন নানান সমষ্টিবাচক শব্দের ব্যাখ্যা। সর্বোপরি রয়েছে মহাভারতের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য চরিত্র ও স্থানের বর্ণানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা। ভাবনার সেই জায়গা থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যা অল্প হলেও বইটি আমাদের মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এই সকল তথ্যপঞ্জি কোন সূত্র থেকে তিনি নিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। যার ফলে এটিকে নির্ভরযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসাবে মেনে নিতে অসুবিধা হয়।^{১৬২}

বিখ্যাত মহাভারতের গবেষক এবং অনুবাদক হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পৌত্র ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম অবশ্যই আমাদের উল্লেখ করতে হবে। ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্য, মহাকাব্য, পুরাণ এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও চর্চা তাঁর আগ্রহের প্রধান বিষয়। মহাভারত

নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। তাঁর তিনটি গ্রন্থ মহাভারতের ওপর খুবই বিখ্যাত। এগুলি হচ্ছে- মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত, মহাভারতের নারী এবং নায়ক যুধিষ্ঠির। মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত গ্রন্থে সেগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলিতে জীবনের একেকটি পরিণতি, আংশিক অথবা পূর্ণ পরিণতি, বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। মূল মহাভারত যে সকল ব্যক্তির পাঠে অনাগ্রহী কিংবা সময়ের অভাব যাদের মহাভারত জানতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাদের জন্য আয়তনের ছোট পরিসরে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বিষয়গুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। একশোটি ঘটনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো- ধৃতরাষ্ট্রের হাহাকার, অভিশপ্ত অগ্নিদেব- ভৃগুর শাপমোচন, দুশ্শন্তের ভরতকে গ্রহণ- ভরত বংশের প্রতিষ্ঠা, ব্যাসদেবের জন্ম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারীর শতপুত্রের জন্ম, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, নারদ কর্তৃক পাণ্ডবদের দাম্পত্য জীবনের নিয়ম বন্ধন, খাণ্ডব দাহন, জরাসন্ধ বধ, কীচক বধ, বৃহন্নলারূপী অর্জুনের আত্মপ্রকাশ, কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর্ণ সংবাদ, কুন্তী কর্ণ সংবাদ, ভীষ্ম কর্তৃক কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ভীষ্মের পতন, জয়দ্রথ বধ এবং ঘটোটকচ বধ, কর্ণ বধ, গান্ধারীর রণক্ষেত্র দর্শন, কৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ, যদুবংশ ধ্বংস, পরীক্ষিতের রাজ্যে আরোহণ এবং যুধিষ্ঠিরের সংসার ত্যাগ প্রভৃতি।^{১৬৩}

মহাভারতের নারী সম্পর্কে অনেক প্রাবন্ধিকের মতো ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য'ও আলোচনা করেছেন। তবে সমকালীন মহাভারত চর্চায় মহাভারতের অষ্টাদশী হলো মহাভারতের নারী চরিত্রের উপর সবথেকে আলোচিত ও চর্চিত একটি বই, যা পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। প্রাবন্ধিক ধীরেশ ব্যাসদেবের মূল মহাভারত অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক বইটির কথাযুখে বলেছেন— ‘সেই নারী, যাঁরা কন্যা জায়া জননী— নানা রূপে এই মহান ভারতকথাকে সমৃদ্ধ করেছেন, কখনও-বা হয়ে উঠেছেন নিয়ন্তা। যাঁদের প্রভাব কেবলমাত্র মহাভারতের কাহিনিতে নয়, ভাবীকালের উপরেও পড়েছে। অদिति, উর্বশী, সত্যবতী, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, হিড়িম্বা, উলূপী, তপতী, সুভদ্রা, সত্যভামা, সুদেষ্ণাদের জীবনালোচনার আলোকে ‘মহাভারতের নারী’ গ্রন্থটি বিশেষ উজ্জ্বল।’^{১৬৪} গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থে যাদের সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তারা হলো- ব্যাসদেব প্রদত্ত কুরু-পাণ্ডব বংশের কুলপঞ্জিকা, অদिति, উর্বশী, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী, শকুন্তলা, গঙ্গা, সত্যবতী, অম্বিকা-অম্বালিকা-অনামিকা মাতা, গান্ধারী, রাক্ষসী জরা, নিঃসঙ্গ মনস্বিনী কুন্তী, মাদ্রী, পতিব্রতা হিড়িম্বা, দ্রৌপদী, তিলোত্তমা সম্ভব, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, তপতী, প্রতিবাদিনী অম্বা, সত্যভামা, সুদেষ্ণা এবং অভিমন্যু-পত্নী উত্তরা।

প্রাবন্ধিক ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নায়ক যুধিষ্ঠির নামে বইটি মহাভারতের নায়ক হিসাবে যুধিষ্ঠিরের অবস্থানকে উন্নত রূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। এক্ষেত্রে অনেকাংশেই তাঁর মতামতের সঙ্গে

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র মিল পাই। আলংকারিক খ্যাতনামা ব্যক্তির যাহেতু মহাভারতকে শান্ত রসের আধার হিসাবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন, তাই ভাবনার সেই পরিসর থেকে নায়ক হিসাবে যুধিষ্ঠিরকে উপস্থাপন করা অত্যন্তই সঙ্গত। যুধিষ্ঠিরের জীবন এক শান্ত সমাহিত ধর্মপরায়ণ ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজার জীবন পরিক্রমা। বহুব্যাগ্ জীবনের শেষে, মহাভারতের অন্য নায়কোচিত চরিত্ররা যেখানে শোচনীয় নিঃসঙ্গ মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখানে যুধিষ্ঠির পৃথিবীর ধূলিময় দেহে সশরীরে স্বর্গে যেতে পেরেছে। মহাভারতের অন্য প্রধান চরিত্ররা যেখানে তৃপ্ত হয়ে যায়, সেখানেই যুধিষ্ঠিরকে আমরা নতুনভাবে বিচলিত হতে দেখি।^{১৬৫} এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক নৃসিংহপ্রসাদ যেন যথার্থই বলেছেন যে যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ নিজের সঙ্গেই, অন্যরা যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবিকই যুদ্ধ করেছে, সেখানে প্রতি মুহূর্তেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধে রত থেকেছে যুধিষ্ঠির। বন পর্ব, শান্তি পর্ব এবং অনুশাসন পর্ব জুড়ে যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন ও বাণী মহাভারত জুড়ে উঠে এসেছে, সেগুলির অনেকটাই যুধিষ্ঠিরের মুখে উচ্চারিত। ফলে ভাবনার এই পরিসর থেকেই যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রাবন্ধিকদের মতো ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও মহাভারতের নায়ক হিসাবেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন।

প্রাবন্ধিক রাজ্যেশ্বর মিত্র বাঙালির মহাভারত চর্চার উপরে *মহাভারত চিন্তা* নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মূলত সংগীতের সমালোচক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু সংগীত ছাড়াও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পুরাণ চর্চা তাঁর আগ্রহের অন্যতম বিষয় ছিল। উক্ত বইতে মহাকাব্য হিসেবে মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা ও নতুন ভাবনার দিকগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। আমরা অনেক মহাভারত সমালোচকের লেখাতেই স্বর্গ বলতে পৃথিবীর মধ্যেই এক স্থানকে পেয়েছি, যেটা প্রধানত হিমালয়ের উত্তরে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র *দেবতার মানবায়ন* প্রবন্ধের বইতে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জেনেছি। এখানেও প্রাবন্ধিক রাজ্যেশ্বর মিত্র বইয়ের শুরুতেই এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ভাবনার এই সূত্র থেকেই গঙ্গাকে তিনি স্বর্গের নারী বা মহাদেবের স্ত্রী রূপে দেখতে চাননি, গঙ্গা নামের অপর একটি অর্থ প্রাবন্ধিক আবিষ্কার করেছেন। তা হলো সুখকর জায়গা, যা তিব্বতি ভাষায় গঙ্গা নামের অর্থ। এছাড়াও তিনি মনে করেন গঙ্গা হতে পারে নদী তীরবর্তী কোনও এক উপজাতীয় কন্যা বা 'ট্রাইবাল নারী'। এই নারীর সঙ্গেই পরবর্তীকালে শান্তনুর বিবাহ হয়েছিল। পিতার দাম্পত্য জীবন মধুর করার জন্য ভীষ্মের অবিবাহিত থাকার বিষয়টিকে আমরা এর পূর্বে মহাভারতে পাঠক বা শ্রোতার মানসিক দ্বন্দ্ব বা সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি, প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য এই দিকটি বড়ো করে দেখিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যেশ্বর মিত্র এখানে চমৎকার একটি ভাবনার নিদর্শন আমাদের দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভীষ্মের এই সিদ্ধান্তই যেমন মহাভারতকে 'মহাভারত' হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, ঠিক তেমনই ভীষ্মের এই যুক্তিহীন অনুগত্য মহাভারতের মহাযুদ্ধের

জন্য দায়ী। ভীষ্ম যদি কঠোরভাবে দাস রাজাকে নিজের ক্ষমতাবলে কন্যাদানে অর্থাৎ সত্যবতীকে সমর্পণে বাধ্য করতো তাহলে কূটনৈতিকভাবে হস্তিনাপুরের জয় যেমন হতো, ঠিক তেমনই রাজা শান্তনুর আত্মতৃপ্তির পাশাপাশি ভীষ্মের পরবর্তী জীবনও কন্টকহীন হতো। এখানেই আমাদের অবাক লাগে যে ভীষ্ম রাজনীতি, সমাজনীতি ও কূটনৈতিক বিষয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান মহাভারতে দিয়ে গেছে, সেই একই ব্যক্তি জীবনের শুরুতে নিজেই নিজের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজ বপন করে গেছে। প্রাবন্ধিক মিত্রের এই ভাবনাটি আমাদের চমৎকার লেগেছে।

যুধিষ্ঠির কি যথার্থই দুর্যোধনের থেকে বয়সে বড়ো ছিলো? এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিভা বসু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার ছোঁয়া রেখেছেন। প্রাবন্ধিক মিত্রও প্রতিভা বসু'র মতামতের সঙ্গে এক্ষেত্রে সহমত পোষণ করেছেন। গান্ধারীর শত পুত্রকে তিনি পুরাণ প্রণেতাদের কল্পনা হিসেবেই ভাবতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের হিসেবে গান্ধারীর একাধিক সন্তান প্রসবকেই প্রামাণ্য হিসাবে তিনি ধরেছেন। কিন্তু তা একেবারেই শত পুত্র নয়। মহাভারতে গান্ধারীর গর্ভধারণ কুন্তীর দুই বছর পূর্বে হওয়ার কথা বলা আছে, তাহলে কীভাবে যুধিষ্ঠির বয়সে দুর্যোধন অপেক্ষা বড়ো হয়? দুর্যোধনকে এড়িয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করার কোনও পরিকল্পনার অন্তর্গত এটি নয়তো? এই প্রশ্ন পাঠকদের কাছে প্রাবন্ধিক মিত্র রেখেছেন। তবে প্রাবন্ধিক মিত্রের এরকম অশ্বেষণ আমাদের যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি, কারণ আমরা দেখেছি মহাভারতকার ব্যাসদেব নিজের সম্পর্কে ও অন্যান্য অনেক বিষয়েরই নগ্ন সত্য কুণ্ঠাহীন ভাবে মহাভারতে প্রকাশ করেছে। যেগুলি ব্যাসদেব সযত্নে এড়িয়ে যেতে পারতো। এছাড়াও কৈশোরে দুর্যোধন দ্বারা ভীমকে হত্যার প্রয়াসটিকে শুধুই দুর্যোধনের পরিকল্পনা হিসাবে প্রাবন্ধিক মিত্র দেখতে চাননি। কারণ কিশোর বয়সে এতো বড়ো একটি পরিকল্পনা করা দুর্যোধনের পক্ষে অসম্ভব বলেই তিনি ভেবেছেন। তবে তাঁর এই বক্তব্যটি খুব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত মনে না হলেও নাগলোক সম্পর্কে প্রাবন্ধিক মিত্রের ভাবনাটি প্রশংসার যোগ্য। দুর্যোধন দ্বারা ভীমকে বিষ খাওয়ানোর ফলে ভীমের চেতনাহীন হয়ে যাওয়া এবং নাগলোকে পৌঁছানোর যে আখ্যান মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, সেটা বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি প্রাবন্ধিক। এক্ষেত্রে নাগেদের বাসস্থান বলতে প্রাবন্ধিক মিত্র নাগ সম্প্রদায়ের বসবাসের জায়গাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তা কোনওভাবেই যে সর্প নয় তাও প্রাবন্ধিক বলে দিয়েছেন। মহাভারতে জরাসন্ধ বধ এবং খাণ্ডব অরণ্য ধ্বংসকে নিন্দা করেছেন প্রাবন্ধিক মিত্র। তবে কৃষ্ণকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছেন প্রাবন্ধিক মিত্র। তাঁর মতে মহাভারতে কৃষ্ণের মহিমা ও ক্ষমতা দেখানোর জন্য অনেক উপাখ্যানই মহাভারতকারের নিজের সৃষ্টি। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন যে দুর্যোধনের তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার মধ্যে দিয়ে যে করুণ চিত্র উঠে আসে, তা অনেক প্রাচীন সাহিত্যেই দুষ্প্রাপ্য। তবে মহাভারতের

শেষ অংশ বা পর্ব যে বাস্তবিকই পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে ওঠে, তার প্রমাণ প্রাবন্ধিক মিত্র তাঁর বইয়ের শেষ অংশ দিয়েছেন। এটি উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

এই মহাগ্রন্থের পরিসমাপ্তি অতুলনীয়। একটা বিরাট সংগঠনের ধ্বংসটা খুব অল্পকালের মধ্যে হলেও পুরাণকার ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি এই ধ্বংসকাহিনীর বিবরণ দিয়ে গেছেন ধীরগতিতে ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। এত সুন্দর, স্বাভাবিক এবং সমযোচিত পরিসমাপ্তি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে, মহাভারতের শেষভাগই সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। এই পর্যায়ে পাঠকের আগ্রহ সর্বদাই জাগ্রত থাকে এবং এক এক সময় পরবর্তী ঘটনা তাকে দুর্বীরভাবে অন্তিমাত্মশূন্য জ্ঞানবার জন্য আকর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাসংঘাতের যখন অবসান ঘটল তখনও পরিসমাপ্তি আমাদের ধীর, স্থির এবং শান্ত গতিতে পৌঁছে দেয় একেবারে অন্তিম রঙ্গক্ষেত্রে, যেখানে হিমাচলের উত্তর প্রদেশে তুষারের আবরণে অবশিষ্ট পাঁচটি ক্লান্ত, নিস্পৃহ, অপরিভূক্ত জীবনের অতি নিভৃত, অজানিত অবসান ঘটে। এইখানে যে পরিসমাপ্তি ঘটল তা সত্যিই সমগ্র ভারতের একটি মহাযুগের পরিসমাপ্তি। তাই, ‘মহাভারত’ নামটি যথার্থ সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।^{১৬৬}

অতুল সুর মূলত নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার উৎস নির্ণয়ে যে সকল মানুষদের ভূমিকা সবথেকে বেশি ছিল তাদের মধ্যে অবশ্যই তিনি অন্যতম। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য গবেষণা ছিলো অতুল সুরের। তিনি লিখেছেন- *হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষা, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভারতের বিবাহের ইতিহাস, বাঙলা ও বাঙালি, বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ফোক এলিমেন্ট ইন বেঙ্গলি লাইফ, দেবলোকের যৌনজীবন* ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই। মহাভারতের ওপর গুরুত্বপূর্ণ একটি বই তিনি লিখেছিলেন *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা* নামে। আয়তনে তা খুব একটা বড়ো না হলেও আমাদের মহাভারত চর্চায় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। বইটির মোট পাঁচটি প্রবন্ধ মহাভারত সম্পর্কিত। যেগুলি হলো- ‘মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা’, ‘মহাভারত ‘জাতীয় ইতিহাস’, ‘মহাভারতের বিবরণ কতটা সত্য?’ ও ‘কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বাঙালির পাণ্ডবগণ’ এবং ‘যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণ কি সত্য?’

প্রাবন্ধিক অতুল সুর দু’একটি বিষয় সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মূলত বলার চেষ্টা করেছেন মহাভারতের সভ্যতা বা সময়কাল অবশ্যই সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন বা তারও আগে। এখানে মহাভারত বলতে অবশ্যই অতুল সুর আদি মহাভারতকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এতকাল ধরে আমাদের যে স্থির বিশ্বাস থেকেছে বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে, প্রাবন্ধিক সুরের এই প্রবন্ধ আমাদের সেই বিশ্বাসে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। প্রাবন্ধিক সুর

দেখিয়েছেন মহাভারতীয় কাল অবশ্যই প্রাক্ বৈদিকও বটে। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে প্রমাণ দিয়েছেন নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় যে কথাটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ লাগে তা হলো মহাভারত কি যথার্থই ইতিহাস? এই প্রশ্নটিও বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সহযোগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিক। ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সুর জোর দিয়েছেন জনশ্রুতির উপরে, জনশ্রুতিকে অবশ্যই অনেক সময় যুক্তির দ্বারা নস্যাৎ করা যায়। কিন্তু স্থানীয় লোককথা ও জনশ্রুতির গভীরে অবশ্যই কিছু সত্য থাকে। এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথাকে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও মনু থেকে অভিমন্যু পর্যন্ত ৫৪ জন পুরুষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা ১৮ টি পুরাণ অবলম্বনে মেলাতে চেয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের নানা সাহায্য নিয়েছেন তিনি। তাঁর সমস্ত বক্তব্য বা অন্বেষণগুলি অনেকেই নাও মানতে পারেন। কিন্তু বাঙালির মহাভারত চর্চায় তাঁর অন্বেষণ অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে পরবর্তীকালে স্মরণ করা হবে।

প্রাবন্ধিক সুর প্রথমেই বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার বিভেদগুলি বা পার্থক্যকে যুক্তিসহকারে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন খ্যাতিমান ও পণ্ডিতদের বক্তব্যগুলি মিলিয়ে অতুল সুর দেখিয়েছেন আর্যরা ভারতে এসেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ, যেখানে ঋক্বেদ রচিত হয় ৯০০/১০০০/১২০০ সাল নাগাদ। এ বিষয়ে সুকুমার সেন ও সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রমুখদের মতো প্রাবন্ধিকদের মতামতের সাহায্য নিয়েছেন অতুল সুর। অন্যদিকে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার বয়স রেডিও কার্বন ডেটিং পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৯০০ বছর পর্যন্ত। এদিক থেকে জানা যায় বৈদিক সভ্যতার থেকেও পুরনো সভ্যতা প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। প্রাবন্ধিক সুরের দেওয়া বেশ কিছু পার্থক্য এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য। যেমন বৈদিক আর্যরা গ্রামে বসবাস করত, অন্যদিকে সিন্ধু সভ্যতার বাহকেরা ছিলো নগরের অধিবাসী। নগরের ওপরে আর্যদের ভীষণ রাগ ও বিদ্বেষ ছিল, সেই কারণে তাদের দেবতার নাম রেখেছিলো ‘পুন্দর’। এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, যেখানে বৈদিক আর্যরা কৃষিকাজ জানত না। বৈদিক আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিলো। যেহেতু ঘোড়াই প্রধান জন্তু ছিল, তাই তার জীবাশ্ম কঙ্কাল সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রে পাওয়ার কথাই স্বাভাবিক। কিন্তু, সিন্ধু সভ্যতার খনন কার্যে এরূপ কিছু পাওয়া যায়নি। তাদের কাছে ঘোড়ার বদলে বৃষই ছিল প্রধান। তাই সিন্ধু সভ্যতার একাধিক সীলমোহরের ওপর বৃষের মূর্তি লক্ষ করা যায়। বৈদিক আর্যরা পুরুষ দেবতার উপাসনা করত। সেখানে সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা মাতৃ পূজা ও শিশু উপাসক ছিল। আর্যরা যেখানে মৃতদেহকে দাহ করত, ঠিক সেখানে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করত। এই সমাধির সঙ্গে কুকুরকেও কবর দেওয়ার রীতি ছিল, ভাবনার এই জায়গা থেকেই প্রাবন্ধিক সুর

মহাভারতের মহাপ্রস্থানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুরের স্বর্গযাত্রাকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রে যে মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তার রং কালো ও লাল, অন্যদিকে বৈদিক আর্য সভ্যতার ব্যবহৃত মাটির পাত্র ধূসর বর্ণের। এরকম আরও উদাহরণ সহযোগে প্রাবন্ধিক সুর দেখিয়েছেন যে বৈদিক আর্য ও সিন্ধু সভ্যতার বাহকেরা এক নয় এবং সেটি নৃতাত্ত্বিক তথ্য দ্বারাও প্রমাণিত নয়। ১৬৭

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কথাটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ লাগে। প্রাবন্ধিক সুর এরপর খুঁজে দেখতে চেয়েছেন বৈদিক আর্য সভ্যতা যদি সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী হয়, তাহলে ঋক্বেদে আমরা কুরু-পাণ্ডব কাহিনি পাই না কেন? আমাদের ঋক্বেদে যদিও কুরু-পাণ্ডব নামের সঙ্গে বেশ কিছু শব্দের মিল পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও সামগ্রিকভাবে মহাভারতের কথা ঋক্বেদে অনুপস্থিত। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আর্য কারা এবং কীভাবে কোন পথে ও কখন তারা ভারতে এল— এর মূল খুঁজে দেখতে চেয়েছেন। খুবই চমৎকার সেই অন্বেষণ। ভারতীয় সভ্যতার মূল উৎস সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁর এই অনুসন্ধান গবেষক হিসাবে আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। আর্য কারা? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সুর আমাদের মনে করিয়ে দেন যে আর্য শব্দটা জাতিবাচক নয়, তা ভাষাবাচক শব্দ মাত্র। যেসব ভাষা গোষ্ঠী আর্য ভাষায় কথা বলত, তাদেরকেই ঐতিহাসিকেরা ‘আর্য’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ভারতে আর্য ভাষার লোকেরা দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রথমটি হল আলপীয় এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নর্ডিক। ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে জানা যায় যে উরাল পর্বতের পাদদেশে উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই বসবাস করত, কিন্তু নবোপলীয় যুগের বিকাশকালে আলপীয়রা কৃষিপরায়ণ হয় এবং নর্ডিকরা পশুপালনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মূলত এর কারণেই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে উপাস্য দেবদেবীও আলাদা হয়ে যায়। নর্ডিকরা কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের উপাসক ছিল এবং উপাস্য দেবতাদের তারা ‘দেব’ নামে অভিহিত করত। অন্যদিকে আলপীয়রা কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তি রূপে দেবতাদের পূজা করত। তারা তাদের ‘অসুর’ নামে অভিহিত করত। এভাবেই কালক্রমে অসুর গোষ্ঠীর আর্যরা পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর উপকূল ধরে ওড়িশা ও বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকে। অন্যদিকে পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবেশদ্বার দিয়ে নর্ডিক আর্যরা এসে পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে তাদের বসবাস শুরু করে। পূর্ব ভারতে বসবাসকারী অসুর আর্যদের মধ্যে অনু, পুরু প্রভৃতিদের নাম পাওয়া যায়। আর্যদের মধ্যে যদু এবং তুর্বশরা যে সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিল, তার উল্লেখ ঋক্বেদে পাওয়া যায়। অসুর পুরু বংশেই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মায়। অসুর রাজা বৃষপর্বীর কন্যা শর্মিষ্ঠার সন্তানেরাও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ শাসন করেছে। অতুল সুর দেখিয়েছেন আলপীয়রা

পূর্ব ভারত থেকে বারাণসী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং নর্ডিক আর্যরা পঞ্চগনদ থেকে উত্তর ভারত বিশেষ করে কাশী পর্যন্ত এগিয়েছিল, তারপর আর পূর্ব ভারতে এগোতে পারেনি।^{১৬৮}

এভাবে পুরো বিষয়টিকে বলার পর প্রাবন্ধিক সুর দেখিয়েছেন আর্যরা ভারতে আসার সময় ভারত একেবারে জনশূন্য ছিল না, ভারতে সেই সময় দাস, দস্যু, নিষাদ প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করত। নর্ডিক আর্যরা এদের অসুর হিসাবে অভিহিত করে এবং আলপীয় আর্যরা তো পূর্বেই অসুর হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিল। অসুর রাজা বলির পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পৌণ্ড্রদের নাম অনুসারেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অসুররা স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো, ফলে ঘরবাড়ি সহজেই তারা নির্মাণে দক্ষ ছিল। মহাভারতে ময়দানবের কথা আমরা সবাই জানি, সুন্দর ভবন নির্মাণের প্রতিশ্রুতির জন্য তাকে অর্জুন ও কৃষ্ণ ছেড়ে দেয়। অতুল সুর প্রাচ্য দেশের আর্য ভাষাভাষী এই জনগোষ্ঠীকেই ‘ভরতবংশীয়’ বলে মেনেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে পাণিনি এবং পতঞ্জলির গ্রন্থের সমর্থন নিয়েছেন। এদিক থেকে তিনি দেখিয়েছেন প্রাচ্য দেশের আর্য ভাষাভাষী অসুরদের সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্ব থেকে পশ্চিমে হয়েছিল। যেহেতু কুরু ও পাঞ্চাল অনুপ্রবেশের পূর্বে বৈদিক আর্যরা ভরতবংশীয়দের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তাই ঋক্বেদে আমরা ভরতদের উদ্ভব বা আগমন সম্পর্কে কিছুই লিপিবদ্ধ দেখতে পাই না, মহাভারতীয় ঘটনাও তাই ঋক্বেদে পাই না। বিদ্যায়তনিক চর্চার এই স্তরে এসে প্রাবন্ধিক সুর খুব সুন্দরভাবে ও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে প্রাচ্য দেশের অসুররা বা ভরতবংশীয় রাজারা অনেক পূর্বেই ভারতবর্ষে রাজ্য শাসন করে থাকলেও কী কারণে এবং কেন তাদের নাম ও মহাভারতীয় প্রসঙ্গ ঋক্বেদে আমরা পাই না। পরবর্তী সময়ে বৈদিক আর্য সমাজের সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন হয়, দেশীয় নারীরা আর্যদের বিবাহ করে, দেশীয় বিভিন্ন কৌশল আর্যদের মুগ্ধ করে— এগুলির ফলে উভয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়। সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলেই মহাভারতীয় বিভিন্ন উপাখ্যান সম্পর্কে বৈদিক আর্যরা পরিচিত হয় এবং আর্যদেরও নানা ঘটনা ও কাহিনি মহাভারতে এসে মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করে। আদি মহাভারতে তাই বৈদিক যজ্ঞের প্রভাব ছিল না, পরবর্তীকালে মহাভারতের মধ্যে এগুলি এসেছে। মহাভারতে পাণ্ডবদের প্রধান দেবতা মহাদেব। মহাভারতে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে প্রধান হলো বারণাবতে শৈব উৎসবের অজুহাতেই যুধিষ্ঠিরদের পাঠানো হয়। অন্যদিকে সিন্ধু সভ্যতায় আমরা আদি মহাদেবকে খুঁজে পেয়েছি, তার বিভিন্ন প্রতিমূর্তি আবিষ্কার করা গেছে। এভাবে মিলগুলি মিলিয়ে দেখাই যায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে অতুল সুর মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এটি। মার্কসবাদী সমালোচকেরা ইতিহাসকে একভাবে দেখার

চেষ্টা করেন এবং পুরাণবিদ, নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অন্যভাবে ইতিহাসকে চর্চা করেন। ব্যক্তিগতভাবে সবাইকেই যে ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান একরকম ভাবে করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। একপক্ষ অপরের অনুসন্ধানের ধরন সম্পর্কে সহমত নাই হতে পারেন। কিন্তু বিদ্যায়তনিক স্তরে চর্চার এরকম একাধিক দিক থাকাটা খুবই দরকার। অনেক সময় অপরের যুক্তি ও চর্চার ধরন অন্যকে নতুন ভাবে ভাবতেও সাহায্য করে। যাই হোক, মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। প্রবন্ধটি অতুল সুর শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিকে দিয়ে, যেখানে ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ‘আর্যসমাজে যতকিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। মাত্র জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস তর্কবিতর্ক ও চরিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত! ইহা কোনো ব্যক্তিশেষের ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।’^{৬৬} প্রাবন্ধিক অতুল সুর রবীন্দ্রনাথের কথার সূত্র ধরেই মহাভারত ও পুরাণ থেকে ইতিহাসের অনুসন্धानে রত ছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন আচার্য মনুর পুত্র ইক্ষাকু থেকে সূর্যবংশ এবং মনুর কন্যা ইলা থেকে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে এই বংশের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারতের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাবন্ধিক সুর স্মরণ করেছেন। আদি মহাভারতের কাহিনিকাল সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন বা তারও পূর্বে এবং মহাভারতের রচনাকাল বা সংকলনকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। ভারত ভূমির পূর্বের ইতিহাস মূলত রাজাদের কীর্তি ও ঘটনাকেন্দ্রিক ছিল। এগুলি থেকেই গাথা ও প্রশস্তি এবং নাটকীয় বৃত্তান্ত রচিত হতো। সমাজের একশ্রেণির মানুষেরা এগুলিকে লোক মুখে প্রচারের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করত, তারা সুত বা মাগধ হিসাবে পরিচিত ছিল। কালের নিয়মে শত শত বছর ধরে লোকমুখে এই কাহিনিগুলি প্রচার পেতে পেতে একসময় এদের কলেবর বৃদ্ধি হয়, এইভাবে সময়ের দাবি মেনে অন্যান্য উপাখ্যান এবং নীতি ধর্ম যুক্ত হয়ে গ্রন্থের আকার অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। মহাভারতের সংকলন যেহেতু দীর্ঘ হাজার বছর ধরে হয়েছে তাই এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মহাভারতের আদি কাহিনির সময় অতুল সুর ধরেছেন আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের গবেষণা অনুসারে। *বৃহৎসংহিতা* গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ সাল ধরা হয়েছে যেটি বরাহমিহির খুঁজে পেয়েছেন। আর্যভট্টেরও মতামত একই। অন্যদিকে রেডিও কার্বন ডেটিং অনুসারে সিন্ধু সভ্যতার চরম বিকাশ জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ থেকে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত। ফলে আদি মহাভারতের প্রাচীনত্ব সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন এবং তার থেকেও পুরনো। এর পূর্বে আমরা জেনেছি যে বৈদিক সভ্যতা বা ঋক্বেদ রচনা এর অনেক পরের ঘটনা। যদিও মহাভারত

লিখিত আকারে যখন স্থান পায় তখন আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। ফলে উভয় সংস্কৃতির অনেকগুলো বিষয়ই মহাভারতে পরে স্থান পেয়েছে।

আদি মহাভারতের কাহিনি যে সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন বা তারও পূর্বের এই বিষয়টি মহাভারতের মধ্যে থাকা বেশ কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাবন্ধিক সুর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা শেষের পর রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষায় ছিলো শরসন্ধান, মল্লযুদ্ধ এবং গদাযুদ্ধ। ধাতু নির্মিত অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধের বর্ণনা ছিল না, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় আমরা ধাতুর খোঁজ পেয়েছি। তাই রাজপুত্রদের এই যুদ্ধ সিন্ধু সভ্যতারও পূর্বের সময়ে আমাদের নিয়ে যায়। দ্বিতীয় যুক্তিটি অতুল সুরের ছিল বারণাবতের লাক্ষা মিশ্রিত ও তৈল সামগ্রী দ্বারা নির্মিত যে গৃহ দুর্যোধন ঘনিষ্ঠ পুরোচন নির্মাণ করেছিল, তা বস্তুতই সিন্ধু সভ্যতার পূর্বে নবপলীয় যুগের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। কারণ ওই যুগে মানুষ মাটিতে গর্ত করে বা মাটির ঘরে বসবাস করত, তার একাধিক প্রমাণ প্রাবন্ধিক সুর কাশ্মীরে দিয়েছেন। ওই যুগের মাটিতে গর্ত করে থাকার মতো ঘর ও উপকরণ ভারতের অন্যত্রও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গেছে। জতুগৃহে আগুন লাগার পর যুধিষ্ঠিরদের মাটিতে গর্ত করে থাকার যে কথা উঠে এসেছে, তা সিন্ধু সভ্যতার পূর্বের ইতিহাস আমাদের স্মরণ করায়। কারণ সিন্ধু সভ্যতার যুগেও মানুষ ইটের কোঠাবাড়ি ও তামার ব্যবহার করত। তাই মাটিতে গর্ত করে থাকার বিষয়টি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কথা হিসাবে নবপলীয় যুগের কথাকে স্মরণ করায়। নবপলীয় যুগের শেষেই কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সূচনা হয়। তাই এদিক থেকে মহাভারতের প্রাচীনত্ব সহজেই প্রমাণিত।

মহাভারতের একচক্রা নগর আসলে বীরভূমের একচক্রা স্থানকেই নির্দেশ করে— এমন মত প্রাবন্ধিক সুরের। জতুগৃহ এর ঘটনার পর পাণ্ডবরা কুন্তী সহ সবাই বিদুরের পাঠানো নৌকায় করে নদীর অপর তীরে এসে অন্যত্র চলে যায়। যত ঘন্টা অতিক্রম করে যুধিষ্ঠিররা একচক্রা নগরে পৌঁছেছিল, সেটি অতুল সুর বিচার করে আমাদের বীরভূমের একচক্রা স্থানকেই চিহ্নিত করেছেন মহাভারতের একচক্রা নগর হিসাবে। বীরভূমের একাধিক জায়গা মহাভারতের বিভিন্ন নামে রয়েছে। এ কথা ঠিক ভারতের সমস্ত প্রদেশেই মহাভারতের নামের সঙ্গে অনেক জায়গারই মিল পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাবন্ধিক সুর দেখিয়েছেন বঙ্গদেশেই শিব মন্দিরের আধিক্য অন্যান্য প্রদেশের থেকে অনেক বেশি। বীরভূমে পাণ্ডবেশ্বর, একচক্রা, ভীমগড়, পাণ্ডুরাজার টিবি প্রভৃতি স্থানগুলি রয়েছে। যুধিষ্ঠিরেরা যে বীরভূমেই আত্মগোপন করেছিলো তার জনশ্রুতি বীরভূমে খুবই প্রবল। এক্ষেত্রে জনশ্রুতির সবটা যে মিথ্যে নয়, জনশ্রুতির গোড়ায় যে অনেকটাই সত্য লুকিয়ে থাকে— তা অতুল সুর মনে করেন। পাণ্ডবরা একচক্রা নগর থেকে বেশ কিছু ঘন্টা হেঁটেই পাঞ্চগলে দ্রৌপদীর বিবাহ সভায় যোগদান করেছিল, তাই পাঞ্চগল এক্ষেত্রে বীরভূমের কোনও

কাছাকাছি স্থানকেই চিহ্নিত করে, এক্ষেত্রে অনেক পণ্ডিত পাঞ্চগল নামক জায়গাটিকে উত্তরপ্রদেশের কোনও জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করে ভুল করে বলে অতুল সুর মনে করেন। জনশ্রুতি কীভাবে ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক হতে পারে তা অতুল সুরের এই অনুসন্ধান থেকে আমরা জানতে পারি।

মহাভারতের সময়কাল যে সিদ্ধু সভ্যতার সমকালীন বা তারও পুরনো তা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানে কুকুরকে নিয়ে যাত্রা অনেকাংশে প্রমাণ করে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। কারণ এর আগেও আমরা উল্লেখ করলাম সিদ্ধু সভ্যতায় কুকুরকে অগ্রগামী করে সমাধিস্থ করার বিষয়টি প্রচলিত ছিল। ভাবনার এই সূত্র থেকেই যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানে কুকুর নিয়ে যাত্রা বিষয়টিকে মিলিয়ে পড়া যায়। বৈদিক সমাজে বহুপতিকবিবাহ চালু ছিল না, এমনকী বিষয়টি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ব্যবস্থা চালু ছিল। দ্রৌপদীর বিবাহ তাই পঞ্চস্বামীর সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু মহাভারত যখন সংকলন হয় তখন সমাজপতিদের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিধা ও সংকট যেহেতু কাজ করেছে, তাই দ্রৌপদীর বিবাহকে যথার্থ হিসাবে স্থান দেওয়ার জন্য কুন্তীর মাতৃ আঞ্জা ও ব্যাসদেবের দ্রৌপদীর পূর্ব জন্মের কাহিনিকে মহাভারতের মধ্যে স্থান দিতে হয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদীর একাধিক বিবাহের বিষয়টিই একে বৈদিক সভ্যতার পূর্বের ঘটনা বলে প্রমাণ করে। প্রাবন্ধিকের এরকম অন্বেষণ আমাদের প্রতি মুহূর্তেই চমকিত করে। বর্তমানে আমাদের সমাজে বিবাহের রীতিতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, সপ্তপদী গমন প্রভৃতির খুবই গুরুত্ব আছে। কিন্তু মহাভারতের বিয়েতে তা হতো না, প্রাক বৈদিক সমাজে বিবাহতে এগুলির প্রয়োজন ছিল না। কারণ মহাভারতে অসংখ্য বিবাহ বৈদিক মত অনুসারে হয় নি এবং সমাজে তা স্বীকৃতও ছিল। এরকম প্রচুর বিয়ের উদাহরণ প্রাবন্ধিক সুর আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু মহাভারত সংকলনের সময় যেহেতু সমাজে আর্য-প্রাগার্য সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছে, তাই তখন সমাজপতি ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে বিবাহকেই প্রধান হিসেবে মান্যতা দিয়েছে এবং অন্যান্য বিবাহ পদ্ধতিকে অসম্পূর্ণ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাক্ষস বিবাহ ও অসুর বিবাহও মহাভারতে ভরপুর রয়েছে।

‘মহাভারতের বিবরণ কতটা সত্য?’ —প্রাবন্ধিক অতুল সুর এই প্রবন্ধে মহাভারতের কাহিনি থেকে বেশ কিছু সত্য ঘটনা তুলে এনেছেন। দীর্ঘ হাজার বছর ধরে মহাভারত সংকলনের ফলে অনেক প্রক্ষেপই মূল মহাভারতে ঢুকেছে। একথা সত্য, তাই সেই প্রক্ষেপ থেকে বেশ কিছু সত্য ঘটনা প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেগুলির মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে মহাভারত চন্দ্রবংশের রাজাদের ইতিহাস, রাজা শান্তনু থেকে জনমেজয় পর্যন্ত সাত পুরুষের তালিকা মহাভারত আমাদের জানান দেয় যা ভারতীয় পুরাণ দ্বারাও সমর্থিত। তৎকালীন সময়ে

পাঞ্জাবে নাগ-কিরীট জাতি ছিল, যাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরীক্ষিত প্রাণ হারায়, সিদ্ধু সভ্যতার প্রতিকৃতিতে এই ধরনের লোক পাওয়া গেছে। পরীক্ষিত যে তক্ষকের কামড়ে মারা যায়, তা আসলে নাগজাতির সঙ্গে রাজার যুদ্ধের ফল হিসাবে ধরাই যায়। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন পাশা খেলা মহাভারতে সত্য ঘটনা, কারণ সিদ্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে পাশার বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে মহাদেবের পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারণ ভগবান শিব পাণ্ডবদের প্রধান দেবতা হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণের ভগবান রূপ মহাভারতে আরোপিত, মহাভারতের দু'একটি ঘটনা ছাড়া মানুষ হিসাবেই কৃষ্ণ উপস্থাপিত হয়েছে। আবার মহাভারতের মতো সিদ্ধু সভ্যতার জায়গাতেও ভগবান শিবের একাধিক মূর্তি ও প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়াও প্রাবন্ধিক সুর দেখিয়েছেন আদি মহাভারতীয় যুগে বিবাহ পূর্ব যৌনতা সিদ্ধ ছিল, অবৈধ সন্তানদের রাজা ও মুনরা নিজের সন্তান রূপেই প্রতিপালন করত।

বিশ শতকে অতুল সুরের মহাভারত চর্চায় বাঙালি নতুন ভাবনার স্বাদ পেয়েছিল। সিদ্ধু সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে যে মহাভারতের চর্চা করা সম্ভব, তা তাঁর চর্চার সূত্র ধরেই আমরা জানতে পারি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার যে পন্থা প্রাবন্ধিক সুর দেখিয়েছিলেন তা হয়তো সর্বজনগ্রাহ্য নয়, বিদ্যায়তনিক স্তরের চর্চার ধরনও একমুখী হবে তাও কাম্য নয়। মহাভারতের মতো মহাকাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট হবে তাই আমরা কামনা করি। ভাবনার এই জায়গা থেকেই অতুল সুরের এই চর্চাটি আমাদের মুগ্ধ করে।

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

- ১। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'ভূমিকা: ভারতবর্ষে সমন্বয়ের ধর্মধারা', *হিন্দু সম্প্রদায়িকতা*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, সংশোধিত সংস্করণ, বইমেলা ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩
- ২। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'ভূমিকা: ভারতবর্ষে সমন্বয়ের ধর্মধারা', *হিন্দু সম্প্রদায়িকতা*, পৃষ্ঠা ১৪
- ৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৯৬
- ৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২

- ৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুন ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬১৩-৬১৪
- ৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ঊনবিংশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা ১৩৭
- ৭। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ১৮৫
- ৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৪
- ৯। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ১৮৮
- ১০। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ১৮৬
- ১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা ১২২
- ১২। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ১৮৯
- ১৩। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ১৮৯
- ১৪। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ১৯০
- ১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৫৯
- ১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০
- ১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ভাদ্র ১৪১৬ব, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৬
- ১৮। সেন, সুকুমার, 'ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন', *প্রবন্ধ সংকলন* (৪), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৪২
- ১৯। সেন, সুকুমার, 'ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন', পৃষ্ঠা ৫৪৮
- ২০। বসু, বুদ্ধদেব, 'আগুন-জলের গল্প', *মহাভারতের কথা*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ৫৭
- ২১। সেন, সুকুমার, 'ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন', পৃষ্ঠা ৫৭০
- ২২। সেন, সুকুমার, 'ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন', পৃষ্ঠা ৫৭০
- ২৩। সেন, সুকুমার, 'ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন', পৃষ্ঠা ৫৬২
- ২৪। আচার্য, দেবীদাস, 'মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান', *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮
- ২৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'মূল কাহিনী', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ২০

- ২৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'এক বিশ্ববিদ্যালয়', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ৩০-৩২
- ২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মূল কাহিনী', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ২১
- ২৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'আগুন-জলের গল্প', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ৬২
- ২৯। বসু, বুদ্ধদেব, *সংক্রান্তি*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা ৩৭
- ৩০। বসু, বুদ্ধদেব, *কালসন্ধ্যা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা ৯৩
- ৩১। বসু, বুদ্ধদেব, 'ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য: দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ১৯১
- ৩২। ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মহাভারতের কথা: যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা', কোরক, কলকাতা, শারদীয় ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৯৪
- ৩৩। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'ক্ৰীতদাসী', *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৫৫
- ৩৪। ভট্টাচার্য, সুখময়, 'বিবাহ', *মহাভারতের সমাজ*, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৯ব, পৃষ্ঠা ৭
- ৩৫। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব', *প্রবন্ধসংগ্রহ ১*, কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা ১৬২
- ৩৬। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব', পৃষ্ঠা ১৬২
- ৩৭। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব', পৃষ্ঠা ১৬৩
- ৩৮। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব', পৃষ্ঠা ১৬৭
- ৩৯। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব', পৃষ্ঠা ১৬৭
- ৪০। ভট্টাচার্য, সুখময়, 'নারী', *মহাভারতের সমাজ*, পৃষ্ঠা ৬৬
- ৪১। সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'মাতৃত্ব ও সামাজিকীকরণ', *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯
- ৪২। চক্রবর্তী রণবীর ও চক্রবর্তী কুণাল এবং অন্যান্য (সম্পাদিত), 'প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য', *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৮
- ৪৩। 'প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য', *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*, পৃষ্ঠা ১৩২
- ৪৪। ভট্টাচার্য, সুখময়, 'দেবতা', *মহাভারতের সমাজ*, পৃষ্ঠা ২৯৯
- ৪৫। ভট্টাচার্য, সুখময়, 'দায়বিভাগ', *মহাভারতের সমাজ*, পৃষ্ঠা ৩৬৪

- ৪৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘অমাত্য’, *দণ্ডনীতি*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০১০, পৃষ্ঠা ১৩০
- ৪৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘নারদ’, *মহাভারতের লঘু-গুরু*, কলকাতা: পত্রলেখা, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৭৯
- ৪৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘নারদ’, *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ২৮১
- ৪৯। আচার্য, দেবীদাস, ‘মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান’, *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, পৃষ্ঠা ১৩৮
- ৫০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘নারদ’, *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ২৭৫
- ৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৬
- ৫২। বসু, প্রতিভা, ‘প্রাক্কথন’, *মহাভারতের মহারণ্যে*, কলকাতা: বিকল্প প্রকাশনী, নবম সংস্করণ, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৫
- ৫৩। বসু, প্রতিভা, ‘প্রাক্কথন’, *মহাভারতের মহারণ্যে*, পৃষ্ঠা ১৪
- ৫৪। বসু, প্রতিভা, ‘প্রাক্কথন’, *মহাভারতের মহারণ্যে*, পৃষ্ঠা ১৬
- ৫৫। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘জীবনদর্শনের পার্থক্য’ *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ২৮৮
- ৫৬। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়’ *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ২৯২
- ৫৭। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়’ *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ২৯২
- ৫৮। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়’ *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ২৯৩
- ৫৯। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়’ *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ২৯৩
- ৬০। আচার্য, দেবীদাস, ‘খাণ্ডব ও জতুগৃহ: দু’টি পরিকল্পিত গণহত্যা’, *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, পৃষ্ঠা ৩৮

৬১। সামাজিক বিভেদীকরণ ও জাতপাতের এক গভীর সমস্যা আমাদের দেশে আছে। এই সমস্যা শুধু একুশ শতকের নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের সময়পর্ব থেকেই চলে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও জাতপাতের নানা সমস্যার কথা বা আত্মহত্যা সম্পর্কিত ঘটনা নানা সময় সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে। এখান থেকেই বর্তমান সময়ে ঘটে চলা এরকম দু’একটি ঘটনার তথ্য নিয়েছি।

<https://thewire.in/books/how-does-caste-operate-in-indian-higher-education> তারিখ ও সময়- ২২/৩/২০২০, ৯ pm

https://www.youtube.com/watch?v=-iKDEd_IHNY

তারিখ ও সময়- ২২/৩/২০২০, ৯.১৭ pm

<https://www.anandabazar.com/india/university-was-responsible-rohit-vemula-sucide-claims-2-1.294789> তারিখ ও সময়- ২৮/০৪/২০২০, ১১ am

https://zeenews.india.com/bengali/nation/dalit-student-at-iit-bombay-who-died-allegedly-by-suicide-had-spoken-to-his-sister-and-aunt-about-being-ostracised-by-his-friends-because-of-his-caste_458969.html

তারিখ ও সময়- ০১/০৫/২০২০, ৭ am

https://zeenews.india.com/bengali/nation/inquiry-commission-report-says-rohith-vemula-was-a-troubled-individual_172013.html

তারিখ ও সময়- ০১/০৫/২০২০, ৯.৩৮ am

৬২। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, মহাভারত স্রষ্টার অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রবন্ধসংগ্রহ ২, পৃষ্ঠা ৩১০

৬৩। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ‘মুখবন্ধ’ নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৬, পৃষ্ঠা ১১

৬৪। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ‘ধর্মযুদ্ধ’, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ১৭

৬৫। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ‘ধর্মযুদ্ধ’, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ১৮

৬৬। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ‘ন্যায় অন্যায়ের নানা দিক’, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ৪৭

৬৭। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ‘প্রিয়ের দেবতা’, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ১০৮

৬৮। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ‘প্রিয়ের দেবতা’, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ১০৯

৬৯। ভট্টাচার্য, অমলেশ, ‘মহাভারতের মহাফল’, মহাভারতের কথা, কলকাতা: প্রতিভাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৭৩

৭০। ভট্টাচার্য, অমলেশ, ‘অগ্নিঢালা সুধা’, মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা ৩৬

৭১। বসু, বুদ্ধদেব, ‘এক বিশ্ববিদ্যালয়’, মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা ৩১

৭২। ভট্টাচার্য, অমলেশ, ‘বসুধে কৰ্ণ: দৈব না পুরুষকার’, মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা ১১৪

৭৩। আচার্য, দেবীদাস, ‘মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান’, মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান, পৃষ্ঠা ১১৯

৭৪। ভট্টাচার্য, অমলেশ, ‘কোন পথে ধর্ম?’ মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭

৭৫। ভট্টাচার্য, অমলেশ, ‘কোন পথে ধর্ম?’ মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা ১৩৮

৭৬। ভট্টাচার্য, অমলেশ, ‘ধর্ম-অধর্ম’, মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা ১৪৫

৭৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব’, মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, কলকাতা: পত্রলেখা, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা ১০০

৭৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব’, মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পৃষ্ঠা ১০৩

- ৭৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব', *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি*, পৃষ্ঠা ১২৩
- ৮০। ভট্টাচার্য, অমলেশ, 'মহাভারতের মহাফল', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ২৮৪
- ৮১। ভট্টাচার্য, অমলেশ, 'মহাভারতের মহাফল', *মহাভারতের কথা*, পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫
- ৮২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'উবাচ', *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ৭-৮
- ৮৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'সঞ্জয় এবং মহাভারতের ঘটমান বর্তমান', *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩
- ৮৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'সঞ্জয় এবং মহাভারতের ঘটমান বর্তমান', *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ৫৫
- ৮৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'মৎস্যরাজ বিরাট', *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ১৮২
- ৮৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'মৎস্যরাজ বিরাট', *মহাভারতের লঘু-গুরু*, পৃষ্ঠা ১৮৪
- ৮৭। বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতিতে একটি বড়ো সংকট ডেকে এনেছে তালিবান। দুর্বল রাষ্ট্রীয় কাঠামো একটি রাষ্ট্রকে বস্তুতপক্ষে অনেকটাই পিছিয়ে দেয়। ২১ শতকের দ্বিতীয় দশকে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের (যদিও বিশ্বের অনেক দেশই এখনও তালিবানকে সরকার হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্মগুলিকে এক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি। যেখানে দুর্বল রাষ্ট্র সেই দেশের আইনশৃঙ্খলা, মানব অধিকার, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ ও সুরক্ষা প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে একেবারেই ব্যর্থ হয়। এই বিষয়টি আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জেনেছি ও নিয়েছি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে।

<https://eisamay.com/editorial/post-editorial/how-dark-is-afghanistan-under-taliban-rule/articleshow/85926932.cms>

তারিখ ও সময়- ০১/০৯/২০২৩, ৭ am

<https://www.anandabazar.com/world/womens-rights-not-priority-says-taliban-spokesperson-after-education-ban-in-afghanistan-dgtl/cid/1399743>

তারিখ ও সময়- ২২/০৯/২০২৩, ১১.৩০ am

<https://www.anandabazar.com/world/un-says-afghanistan-is-most-repressive-country-for-women-in-the-world-dgtl/cid/1412771>

তারিখ ও সময়- ২২/০৯/২০২৩, ১০.৪০ am

<https://bangla.aahtak.in/desh/story/since-taliban-took-power-they-issued-36-edicts-eliminating-womens-rights-said-fawzia-koofi-in-india-today-conclave-2023-hijab-hate-state-sum-528284-2023-03-17>

তারিখ ও সময়- ২৪/০৯/২০২৩, ৭.৫০ am

৮৮। সমকালীন পরিস্থিতিতে দুর্বল রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণে শ্রীলঙ্কার অবস্থা আমরা সবাই জানি। দেশটির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার খোঁজ প্রতিনিয়তই আমরা পাচ্ছি। প্রয়োজনীয় তথ্য জেনেছি নিম্নলিখিত সংবাদ মাধ্যমের পোর্টাল থেকে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/sri-lankan-ex-president-gotabaya-rajapakse-s-family-leaves-for-us-says-report-31672056082085.html>

তারিখ ও সময়- ১৫/০৯/২০২৩, ৭ pm

<https://bengali.abplive.com/news/year-ender-2022-sri-lanka-observes-economic-and-political-crisis-huge-protest-in-2022-945439>

তারিখ ও সময়- ১৫/০৯/২০২৩, ৭.২০ pm

৮৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'নারদ', মহাভারতের লঘু-গুরু, পৃষ্ঠা ২৬৭

৯০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'নারদ', মহাভারতের লঘু-গুরু, পৃষ্ঠা ২৬৭

৯১। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'পাণ্ডু', মহাভারতের লঘু-গুরু, পৃষ্ঠা ১১২

৯২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'অভিমন্যু', মহাভারতের লঘু-গুরু, পৃষ্ঠা ১৫৩

৯৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'অভিমন্যু', মহাভারতের লঘু-গুরু, পৃষ্ঠা ১৭০

৯৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দেবতা এবং স্বর্গের ঠিকানা', দেবতার মানবায়ন, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১৮, পৃষ্ঠা ৩৯

৯৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দেবতা এবং স্বর্গের ঠিকানা', দেবতার মানবায়ন, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

৯৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'পুরাণের সচল সমাজে দেবতাদের লোকব্যবহার', দেবতার মানবায়ন, পৃষ্ঠা ৫৫

৯৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'পুরাণের সচল সমাজে দেবতাদের লোকব্যবহার', দেবতার মানবায়ন, পৃষ্ঠা ৫৭

৯৮। আহমেদ, শামিম, 'জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ', মহাভারতে গুপ্তহত্যা, কলকাতা: গান্ধিচিহ্ন, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪২

৯৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'মহাভারতের নীতির দ্বন্দ্ব', মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পৃষ্ঠা ১৫০

১০০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'মহাভারতের নীতির দ্বন্দ্ব', মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পৃষ্ঠা ১০০

১০১। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'মহাভারতের নীতির দ্বন্দ্ব', মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পৃষ্ঠা ১০৮

১০২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘মহাভারতের নীতির দ্বন্দ্ব’, *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি*, পৃষ্ঠা ১১৯

১০৩। করোনা মহামারি চলাকালীন রাষ্ট্রের ‘ছোট ও মাঝারি মাপের শিল্প’ এবং ‘জনস্বাস্থ্য’ পরিকাঠামোতে প্রত্যেকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সরকারই অধিকতর খরচ করেছিল। রাষ্ট্রের সমস্যায় এই দু’টি ক্ষেত্রকে টিকিয়ে রাখার আশু প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধানেরা ও নীতি নির্ধারকেরা মনে করেছিলেন। মহাভারতের উক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে এই সময়ের এই দু’টি বিষয়ের মিল খুঁজে পেয়েছি। মহাভারত যেখানে একাধিকবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ‘নীতি’ ও ‘ধর্ম’ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং সময়ের চাহিদা মেনেই পরিবর্তিত হওয়া উচিত। ভাবনার সেই জায়গা থেকেই মহামারির সময়ে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প’ এবং ‘জনস্বাস্থ্য’ ক্ষেত্রে সময়ের দাবি মেনে রাষ্ট্র অতিরিক্ত ব্যয় করেছে।

<https://www.youtube.com/watch?v=i6oNiE65PiI>

তারিখ ও সময়- ১৫/১১/২০২৩, ৭ pm

<https://www.youtube.com/watch?v=VcPL8KTXrfg>

তারিখ ও সময়- ১৫/১১/২০২৩, ৭ pm

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654179>

তারিখ ও সময়- ১৫/১১/২০২৩, ৭ pm

১০৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘মহাভারতের নীতির দ্বন্দ্ব’, *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি*, পৃষ্ঠা ১৬৮

১০৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘মহাভারতের রাজনীতি’, *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি*, পৃষ্ঠা ৩১১

১০৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘মহাভারতের রাজনীতি’, *মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি*, পৃষ্ঠা ৩১১

১০৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘উর্বশী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৯

১০৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘গান্ধারী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ১৬৪

১০৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘কুন্তী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ২৫৪

১১০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘কুন্তী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ২৫৫

১১১। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘কুন্তী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ২৭৪

১১২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘কুন্তী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ৩১২

১১৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘রুক্মিণী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ৬৫৪

১১৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘রুক্মিণী’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ৬৫৪

১১৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ‘লোপামুদ্রা’, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, পৃষ্ঠা ৭৩৪

১১৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কৃষ্ণ', মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৫, পৃষ্ঠা ৪৩

১১৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কৃষ্ণ', মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ৪৬

১১৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কথামুখ', মহাভারতের প্রতিনায়ক, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা ১০

১১৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কথামুখ', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১২

১২০। মহাভারতের গবেষকদের কাছে একলব্য চরিত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয়। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকেরা চরিত্রটিকে নিয়ে একভাবে ভেবেছেন এবং মহাভারতের প্রতিনায়ক বইতে প্রাবন্ধিক ভাদুড়ী অন্যভাবে ভেবেছেন। আমরা এখানে যে দু'জন প্রাবন্ধিকের বক্তব্য থেকে প্রভাবিত হয়েছি, তাঁদের তথ্যসূত্র দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছি।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'একলব্য', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ৯

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'মহাভারতের মহত্তম দ্বিধা', প্রবন্ধসংগ্রহ ২, পৃষ্ঠা ২৬০

১২১। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দুর্যোধন', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১২৬

১২২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দুর্যোধন', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১২৬

১২৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দুর্যোধন', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১২৬

১২৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কর্ণ', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১৫৫

১২৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কর্ণ', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১৫৮

১২৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কর্ণ', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ১৬৩

১২৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'অশ্বখামা', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ৩৮৪

১২৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দুঃশাসন', মহাভারতের প্রতিনায়ক, পৃষ্ঠা ২৬৯

১২৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কথামুখ', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ, জুন ২০১৮, পৃষ্ঠা ২

১৩০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'কথামুখ', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃষ্ঠা ২

১৩১। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'বাস দ্বৈপায়ন', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃষ্ঠা ৫৬

১৩২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'বিদুর', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩২

১৩৩। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'বিদুর', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃষ্ঠা ৩৮৯

১৩৪। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'বিদুর', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃষ্ঠা ৩৮৯

১৩৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'ধৃতরাষ্ট্র', মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃষ্ঠা ৩২৮

১৩৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'যুধিষ্ঠির', কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা ৮৭

১৩৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'যুধিষ্ঠির', কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়, পৃষ্ঠা ৮৭

- ১৩৮। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দ্রৌপদী', *কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়*, পৃষ্ঠা ৩৬০
১৩৯। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দ্রৌপদী', *কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়*, পৃষ্ঠা ৩৩৩
১৪০। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, 'দ্রৌপদী', *কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়*, পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৩৪
১৪১। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'ভূমিকা-বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য', *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ১০৯
১৪২। আহমেদ, শামিম, 'আত্মক্ষিকী', *মহাভারতে নাস্তিকতা*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ১৪

১৪৩। প্রাবন্ধিক শামিম আহমেদ ও সুকুমারী ভট্টাচার্য উভয়েই মহাভারত থেকে চমৎকার এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। যুক্তি বা আত্মক্ষিকীর চর্চা আমাদের দেশে অনেক পুরনো। তাই আন্তিক বিভিন্ন দার্শনিকেরা বা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা এই উপাখ্যানের মাধ্যমে আত্মক্ষিকীর চর্চাকারীদের পরবর্তী বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছেন। শেষে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি যে যুক্তিবিজ্ঞান বা আত্মক্ষিকীর অধিক চর্চার ফলে এক ব্রাহ্মণের শেয়াল জন্ম হয়েছে। আন্তিক দার্শনিকেরা এর মাধ্যমে সমাজকে সচেতনভাবে একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন, যেটি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলেও এটির অর্থ অত্যন্ত সহজ।

আহমেদ, শামিম, 'আত্মক্ষিকী', *মহাভারতে নাস্তিকতা*, পৃষ্ঠা ১৫

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'ভূমিকা- বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য', *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*, পৃষ্ঠা ১২১

১৪৪। বর্তমান ভারতে সমাজবিজ্ঞান ও মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণায় অর্থ সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি, যতোটা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানে সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। ফলে মৌলিক গবেষণায় বিশেষ করে কলা ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে খুব একটা হিতকর নয় একেবারেই। প্রতিনিয়তই সংবাদমাধ্যমে এই বিষয়ে প্রতিবেদন কিছু না কিছু থাকেই। সেই অজস্র প্রতিবেদন ও সমালোচনা থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত আমি দিলাম।

<https://www.telegraphindia.com/india/ugc-stops-research-projects-due-to-lack-of-funds-from-centre/cid/1846232>

তারিখ ও সময়- ১৫/১২/২০২২, ৭ pm

<https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/discontinuation-of-manf-is-regressive-and-undermines-indias-research-ecosystem/articleshow/97734610.cms?from=mdr>

তারিখ ও সময়- ১৭/১২/২০২২, ৭ pm

১৪৫। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, 'গণপতি- বস্তুবাদের উৎস সন্ধান', *লোকায়ত দর্শন*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ১৯৫

১৪৬। আহমেদ, শামিম, 'আত্মক্ষিকী', *মহাভারতে নাস্তিকতা*, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

১৪৭। ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, 'চার্বাকসূত্র: পুনর্গঠনের দিকে', চার্বাকচর্চা, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৪

১৪৮। আহমেদ, শামিম, 'চার্বাক দর্শন', মহাভারতে নাস্তিকতা, পৃষ্ঠা ৪৪

১৪৯। আহমেদ, শামিম, 'চার্বাক দর্শন', মহাভারতে নাস্তিকতা, পৃষ্ঠা ৪৪

১৫০। আহমেদ, শামিম, 'সৌগত দর্শন', মহাভারতে নাস্তিকতা, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪

১৫১। জাতকের গল্পগুলির সঙ্গে মহাভারতের অনেক জায়গাতেই চমৎকার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য, বৌদ্ধ ও জৈন উভয় দর্শন দ্বারাই মহাভারত অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলো। এ বিষয়টির ক্ষেত্রে আমরা ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক বইটির সাহায্য পেয়েছি, যা ১৩৮৭ সালে করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত।

১৫২। আহমেদ, শামিম, 'জৈন দর্শন', মহাভারতে নাস্তিকতা, পৃষ্ঠা ১৪৬

১৫৩। আহমেদ, শামিম, 'সৌগত দর্শন', মহাভারতে নাস্তিকতা, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭

১৫৪। আহমেদ, শামিম, মহাভারতে দ্রৌপদী, কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০২

১৫৫। আহমেদ, শামিম, 'গণিকাবৃত্তি', মহাভারতে যৌনতা, কলকাতা: গাঙচিল, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৬-১২৫

প্রাবন্ধিক আহমেদের মহাভারতে যৌনতা বিষয়ক বইটির পাশাপাশি গণিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন ভারতে গণিকা' নামক প্রবন্ধ থেকে।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'প্রাচীন ভারতে গণিকা', প্রবন্ধসংগ্রহ ১, কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা ২৭১-২৮০

১৫৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০। এই বইটির ভূমিকা ও কথামুখ অংশটি আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে নিয়েছি।

১৫৭। দত্ত, শিপ্রা, চরিত্রে রামায়ণ ও মহাভারত, কলকাতা: কালিকা প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১ লা বৈশাখ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। রামায়ণ ও মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রগুলি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন শিপ্রা দত্ত। একাধিক খণ্ডে বিভক্ত সেই বই, আমরা প্রথম সাতটি খণ্ড দেখেছি।

১৫৮। মিত্র, বীরেন্দ্র, কুরুক্ষেত্রে দেব শিবির, কলকাতা: নাথ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৬০। প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র মিত্রের বইটির 'কথারস্তু' অংশটি এই বিষয়ে আমরা দেখেছি।

১৫৯। গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার, ভারতসংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ, কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৯। গ্রন্থকারের নিবেদন অংশটি উক্ত বিষয়টিকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছে।

- ১৬০। সেন, শিশিরকুমার, *মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮৭-৯৪
- ১৬১। সমকালীন মহাভারত চর্চায় তরুণ মহাভারত গবেষক শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়। একাধিক খণ্ডে তিনি নতুন ভারতের চাহিদা অনুসারে মহাভারত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। দীর্ঘ ও সুবিপুল গবেষণার মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থে উঠে এসেছে কাহিনিচ্ছলে এক দীর্ঘকালের ইতিহাস। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লিখিত এই মহাভারত যথার্থ অর্থেই সমকালীন ভারতের দর্পণ। অভিযান পাবলিশার্স দ্বারা প্রকাশিত শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষের মহাভারতের পাঁচটি খণ্ড দেখার আমাদের সুযোগ হয়েছে।
- ১৬২। চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ, *মহাভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
- ১৬৩। ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, *মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০১৭। বইটির ভূমিকা ও সূচিপত্র অংশটি আমাদের আলোচনায় কাজে লেগেছে।
- ১৬৪। ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, ‘ভূমিকা’, *মহাভারতের নারী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৮
- ১৬৫। ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, *নায়ক যুধিষ্ঠির*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৯। আসলে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পৌত্র ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বাল্যকাল থেকেই পারিবারিক মহাভারতীয় পরিবেশের জন্যই মহাভারতের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ফলে যুধিষ্ঠির চরিত্রটিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানাভাবে ভেবেছেন প্রাবন্ধিক ধীরেশ। তবে এ বিষয়ে তিনি কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী’র যুধিষ্ঠির সম্পর্কিত মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। যুধিষ্ঠিরই কেন নায়ক?– তা সমগ্র মহাভারত জুড়ে দৃষ্টান্ত সহকারে বলেছেন ধীরেশচন্দ্র।
- ১৬৬। মিত্র, রাজ্যেশ্বর, *মহাভারত চিন্তা*, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১ লা বৈশাখ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬
- ১৬৭। সুর, অতুল, ‘মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা’, *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা*, বাংলাদেশ: আকাশ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০২৩, পৃষ্ঠা ১৯-২০
- ১৬৮। সুর, অতুল, ‘মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা’, *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা*, পৃষ্ঠা ২১-২২
- ১৬৯। সুর, অতুল, ‘মহাভারত ‘জাতীয় ইতিহাস’’, *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা*, পৃষ্ঠা ৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা শিশু এবং কিশোর সাহিত্যে মহাভারত কথার
পুনর্নির্মাণ

মহাভারত এক মহাগ্রন্থ। আমরা যেহেতু জানি মহাভারত সংকলন হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে চলেছে, তাই এর মধ্যে অনেক যুগের অনেক কালের দর্শন, রাজনীতি, কূটনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাজার কর্তব্য, রাজ ধর্ম প্রভৃতি জটিল জটিল তত্ত্বকথা মিশে রয়েছে। এগুলির সঙ্গে রয়েছে অটেল সীমাহীন হিংসা, যৌনতার বিভিন্ন ধরন, নানান অনাচার ও ব্যভিচার প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয় দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজের মধ্যেই রয়েছে। এগুলি ছাড়া একটি সমাজের ও রাষ্ট্রের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, সমস্যা হচ্ছে যখন ছোটদের জন্য মহাভারতের নির্মাণ ও সংকলন সাহিত্যিকদের করতে হয়। আমাদের উপরের উল্লিখিত এরকম অনেক বিষয়গুলি ছাড়া মহাভারত কার্যত অসম্পূর্ণ। কিন্তু, শিশুদের মহাভারতে সরাসরি এই বিষয়গুলি দেওয়া হলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। বেশিরভাগ সময়ে বিষয়গুলি ছোটদেরও জ্ঞান ও বোধেরও বাইরে। ভাবনার এই সূত্র থেকেই উনিশ শতক থেকে ছোটদের মহাভারত নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন রকম বই লিখেছেন, তাঁরা সকলেই এই বিষয়টিকে কমবেশি খেয়াল করেছেন। ফলে অনেক সময় লেখক তাঁদের মনে হওয়া মহাভারতের হিংসা, যৌনতা, ব্যভিচার এবং নানান রকম তত্ত্বকথা হয়তো এড়িয়ে গেছেন কিংবা বিষয়টিকে দু'এক লাইনে বলে কাজ সেরেছেন। গীতার কথা তো অনেকেই একেবারে এড়িয়ে গেছেন। কেউ কেউ তিন-চার লাইনেই মোটামুটি বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এরপর ছোটদের মহাভারত রচনায় অপর এক বড়ো সমস্যা হল মহাভারতের বাস্তবিক বৃহৎ আকার। ছোটদের জন্য মহাভারত রচনায় সর্বদাই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যার দিকে নজর রাখতে হয়। যেমনটা রবীন্দ্রনাথও *কুরুপাণ্ডব* নামে তাঁর ছোটদের মহাভারত রচনায় করতে চেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলিত মহাভারতের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৯৫, যা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই উপযুক্ত মনে করেন নি। তাই তাঁর *কুরুপাণ্ডব* বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয়েছিল ১৫২। কারণ শিশুদের দীর্ঘ পৃষ্ঠা সংখ্যার পাঠে ক্লান্তি আসাটাই স্বাভাবিক। ভাবনার এই জায়গা থেকে উনিশ শতক থেকে মূলত বিশ শতক পর্যন্ত যে সমস্ত লেখকেরা ছোটদের মহাভারত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই লিখেছেন, তাঁরা সবাই বইয়ের আকার ছোটই রেখেছেন। এরই সঙ্গে তাঁরা জোর দিয়েছেন ভাষা ও শব্দ চয়নে। শিশুদের জন্য জটিল ও যৌগিক ভাষা পরিহার করে সরল ভাষা ব্যবহারে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ছোটদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক লাগবে এমন বিষয় এড়িয়ে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক মূল গল্পকেই বলা হয়েছে। এরই সঙ্গে ছবিতে ও 'কার্টুনে' মহাভারত কথা লিখেছেন অনেকেই, যাঁদের কথাও আমরা আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে। ছোটদের মহাভারত চর্চার ধারাতে এগুলির ভূমিকা অপরিসীম বলেই মনে করি আমরা। এগুলির পাশে মহাভারত কেন্দ্রিক বেশ কিছু আখ্যানকে কেন্দ্র করে ছোটদের মতো করে গল্প লিখেছেন অনেক সাহিত্যিকই। যেগুলির শেষে নীতিকথাধর্মী একটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যা বস্তুতপক্ষে শিশুদের চরিত্র নির্মাণে অনেকাংশে

সাহায্য করে। এরকম বেশ কিছু মহাভারত কেন্দ্রিক গল্পকে নিয়ে আমরা বিস্তারিত এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। যাদের মধ্যে লীলা মজুমদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র মতো সাহিত্যিকেরাও আছেন।

৫.২।।

ছোটদের মহাভারত নিয়ে অনেক সাহিত্যিকই লেখালেখি করেছেন এবং আজও করে আসছেন। এছাড়াও অনেক পূর্বে প্রকাশিত হতো বর্তমানে বাজারে আর সহজলভ্য নয়- এমনও বইয়ের সংখ্যাও অনেক। বাঙালির মহাভারত চর্চা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অনেক শিশু ও কিশোরদের পাঠ্য গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। আবার এমনও অনেক বই আছে যা আমাদের সন্ধান হয়তো অধরাই থেকে গেছে। কিন্তু, এরই মধ্যে থেকে আমরা শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত মহাভারত কেন্দ্রিক রচনার একটি তালিকা নির্মাণের চেষ্টা বরাবর করে এসেছি। আমাদের গবেষণা পত্রে সেটিরই একটি তালিকা জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের গবেষণা বিশ শতক নিয়ে হলেও পরবর্তীকালের কোনও গবেষকের সুবিধার জন্য উনিশ শতকেরও কিছু মহাভারতকেন্দ্রিক শিশু পাঠ্য রচনা তালিকায় জুড়ে দিলাম।

উনিশ ও বিশ শতকের সময়কালে রচিত হওয়া মহাভারতকেন্দ্রিক ছোটদের রচনার তালিকা:

- ১। লঙ্ সাহেবের পুথি তালিকায় পাওয়া যায় মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত *অভিলাষ ও রসসিন্ধু*
- ২। আর.সি.বসু- *দ্বীপ-বিলাস*
- ৩। দ্বারকানাথ কুণ্ডু- *পরশুরামের দর্পচূর্ণ*
- ৪। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল সম্পাদিত- *পাণ্ডবগণের জন্ম ও পরশুরাম, অশ্বমেধপর্ব, বনপর্ব, ভীমপর্ব, গদাপর্ব, নলদময়ন্তী, ভদ্রার্জুন*
- ৫। নীলাদ্রি লোহারি- *দ্রৌপদী-কুন্তী-গান্ধারী এবং কর্ণের মৃত্যু* রচনাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়
- ৬। মধুসূদন নাপিত- *নলদময়ন্তী কাহিনী*
- ৭। জনৈক লিঙলে মারে- দাতা কর্ণ, গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদ চরিত্র সম্পর্কিত আখ্যান
- ৮। হরিশচন্দ্র মিত্র শিশুদের উপযোগী বেশ কিছু আখ্যান লিখেছিলেন (নামগুলি নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় না)

- ৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- বাসুদেব চরিত, শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, বেণীসংহার এবং ঋজুপাঠের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মহাভারতের কিছু উপাখ্যান
- ১০। হরিনাথ মজুমদার- একলব্যের অধ্যবসায় নামে একটি আখ্যান রচনা করেন
- ১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- কুরুপাণ্ডব (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ)
- ১২। দীনেশচন্দ্র সেন- সতী, জড়ভরত, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ এবং পৌরাণিকী সংকলন
- ১৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর- শকুন্তলা
- ১৪। যোগীন্দ্রনাথ সরকার- মহাভারত
- ১৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত- ছোটদের ব্যাসরচিত মহাভারত (শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৩)
- ১৬। পার্থসারথি দাশগুপ্ত- মহাভারতের ভীমসেন
- ১৭। স্বামী রাঘবেশানন্দ- মহাভারতের গল্প শোনো, সচিত্র মহাভারত (১-৫ম খণ্ড) যা প্রকাশিত হয়েছে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে
- ১৮। শঙ্করীপ্রসাদ বসু- কৃষ্ণ (আনন্দ পাবলিশার্স)
- ১৯। রমেন ভট্টাচার্য- শকুন্তলা
- ২০। বিষ্ণুপদ রায়- শ্রীচৈতন্য ও কুরুক্ষেত্র
- ২১। অনন্তকুমার দত্ত- পুরাণের গল্প
- ২২। রূপক সাহা- পঞ্চপাণ্ডব ও একাদশ সূর্যোদয়
- ২৩। খগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত)- ছোটদের মহাভারত (রঞ্জন পাবলিশার্স)
- ২৪। যোগীন্দ্রনাথ সরকার (সম্পাদিত) - ছোটদের মহাভারত (শিশু সাহিত্য সংসদ)
- ২৫। ফুলবালা রায় (সম্পাদিত) - ছোটদের মহাভারত (বি চাঁদ অ্যান্ড সন্স)
- ২৬। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (অঙ্কন এবং লেখা) - ছবিতে মহাভারত (শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০)
- ২৭। সুবোধচন্দ্র মজুমদার- ছোটদের মহাভারত (দেব সাহিত্য কুটির)
- ২৮। অলোকনাথ চক্রবর্তী- ছোটদের মহাভারত (ভারতী)
- ২৯। সুবোধ কুমার চক্রবর্তী- ছোটদের মহাভারত (দেব সাহিত্য কুটির)
- ৩০। অমিতাভ চৌধুরী- ছোটদের মহাভারত (নিউ বেঙ্গল পাবলিশার্স)
- ৩১। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী- ছেলেদের মহাভারত (প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। যেমন- প্রাত্রজ, অন্নপূর্ণা, সাহিত্যম্, কেম্বিজ বুক থেকে)।
- ৩২। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী- মহাভারত (প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যামন্দির থেকে)
- ৩৩। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী- মহাভারতের নানা গল্প (গ্রন্থনিলয় প্রকাশনা)
- ৩৪। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী- মহাভারতের গল্প (অন্নপূর্ণা সাহিত্য মন্দির)
- ৩৫। লীলা মজুমদার- মহাভারতের গল্প (শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪), এছাড়াও ছোটদের নাটক বক-বধ পালা লেখেন (১৯৫৯)

- ৩৬। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়- মহাভারতের গল্প (এ. কে. সরকার প্রকাশনী)
- ৩৭। সন্ধ্যা বারিক- মহাভারতের গল্প
- ৩৮। গজেন্দ্রকুমার মিত্র- শিশু মহাভারত (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স)
- ৩৯। গজেন্দ্রকুমার মিত্র- মহাভারতের নীতিগল্প (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স)
- ৪০। নীলিমা ঘোষ - মহাভারতের গল্প (প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী)
- ৪১। স্বামী বেদানন্দ- শিশুদের মহাভারত (ভারত সেবাশ্রম প্রকাশনা)
- ৪২। পূর্ণেন্দু পত্নী — দুষ্টির মহাভারত
- ৪৩। বারিদবরণ ঘোষ- পাণ্ডবদের ছেলেবেলা (নবপত্র প্রকাশনী)
- ৪৪। দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- ভারত গল্পকথা (পত্রভারতী)
- ৪৫। উৎপল সেনগুপ্ত- মহাকাব্যের ঝুলি
- ৪৬। ননীগোপাল চক্রবর্তী- ছোটদের মহাভারত
- ৪৭। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী- ছোটদের মহাভারত (ওরিয়েন্ট লঙ্ঘ্যান)
- ৪৮। স্বামী অমলানন্দ- মহাভারত কাহিনী (রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম)
- ৪৯। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ- মহাভারতের গল্প (উদ্বোধন কার্যালয়)
- ৫০। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী- মহাভারত (শিশু সাহিত্য সংসদ)
- ৫১। উত্থানপদ বিজলী (পুনর্লিখন)- ছোটদের রঙিন মহাভারত (হোলি চাইল্ড পাবলিকেশন)
- ৫২। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ- নীতিরত্ন (নীতিকথা মূলক সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ)
- ৫৩। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়- শিশু মহাভারত (সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী)
- ৫৪। গগনচন্দ্র হোম- মহাভারতের গল্প (শ্রীবৎস উপাখ্যান ও যযাতি উপাখ্যান নিয়ে লেখা হয়েছিল)
- ৫৫। তারাকুমার কবিরত্ন- মহাভারতের গল্প
- ৫৬। ভুবনমোহন রায়- মহাভারতের কথা
- ৫৭। লাবণ্যপ্রভা বসু- ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং কচ ও দেবযানী, একলব্যের তপস্যা, রুরু ও প্রমদ্বরা, ভীষ্ম ও অম্বা, ভীষ্ম ও শিখণ্ডী, নল ও দময়ন্তী (মুকুল পত্রিকায় এগুলি নিয়ে নিয়মিত পৌরাণিক কাহিনি লেখা হয়ে এসেছে)
- ৫৮। প্রিয়ম্বদা দেবী- বিনতার শাপমোচন, উত্কলের গুরুদক্ষিণা
- ৫৯। কালীপ্রসন্ন সরকার- শিশু অথবা সংক্ষিপ্ত মহাভারত (ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত)
- ৬০। গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য- মহাভারতের কথা (সিটি লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯১৫)
- ৬১। পরেশনাথ মহলানবিশ- মহাভারতের কথা (সন্তোষ লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯২৬)
- ৬২। নিশিকান্ত চক্রবর্তী- সরল মহাভারত (ঢাকা, ১৯২৫)

৬৩। যোগীন্দ্রনাথ সরকার- ছোটদের মহাভারত-এর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই বইটি ছাড়া যোগীন্দ্রনাথ সরকার অনেক মহাভারতকেন্দ্রিক শিশুদের উপযোগী বই লিখেছিলেন, যেগুলি আজ খুবই দুস্প্রাপ্য, এমনকী অনেকগুলির প্রথম সংস্করণের তারিখ পর্যন্ত আর পাওয়া যায় না। কিন্তু শিশু ও কিশোরদের জন্য মহাভারতকেন্দ্রিক বইয়ের তালিকা করতে গেলে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অন্যান্য বইগুলিকে এড়িয়ে গেলে অন্যায্য হবে। কুরুক্ষেত্র বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, উশীনর, সুভদ্রা, প্রহ্লাদ, অভিমন্যু, একলব্য, গান্ধারী, দ্রৌপদী, নল-দময়ন্তী, ভীষ্ম, শকুন্তলা, শ্রীবৎস এবং সাবিত্রী-সত্যবান।

৬৪। সত্যচরণ চক্রবর্তী- সাবিত্রী, অগস্ত্য, অষ্টাবক্র, চ্যবন, দুর্বাসা, পরশুরাম, শুক্রাচার্য, দাতাকর্ণ

৬৫। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত- প্রহ্লাদ, অর্জুন, ধ্রুব এবং ভীমসেন

৬৬। শিশু পত্রিকার সম্পাদক বরদাকান্ত মজুমদার লিখেছেন- পার্বতী, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বালক শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা এবং শর্মিষ্ঠা। এগুলি ছাড়াও ১৯১৫ সালে লেখেন শিশু রঞ্জন মহাভারত।

৬৭। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়- শিশু মহাভারত (১৯১২)

৬৮। রাজকুমার চক্রবর্তী- মহাভারত (১৯১৪)

৬৯। উপেন্দ্রনাথ রায়- মহাভারতের গল্প (১৯১৫)

৭০। কবিশেখর কালিদাস রায়- ছেলেদের মহাভারত (১৯৩০)

৭১। প্রিয়দর্শন হালদার- সচিত্র শিশুরঞ্জন মহাভারত (১৯১৪)

৭২। বিজয়রতন মজুমদার- ধনুর্ভঙ্গ

৭৩। কেশবচন্দ্র সেন- কর্ণার্জুন (১৯৩৩)

৭৪। গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ- মহারণ (১৯৪১)

৭৫। রামধনু পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য- মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১৯৩০-৩১)

৭৬। সুবোধচন্দ্র মজুমদার- শকুন্তলা (১৯২২), প্রহ্লাদ (১৯২২), দময়ন্তী (১৯২২), অর্জুন (১৯২৫), সুভদ্রা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণার্জুন, দ্রৌপদী

৭৭। কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত- মহাভারতিনী (১৯৪১)

৭৮। এছাড়াও মহাভারতের নানান কাহিনি নিয়ে বিভিন্ন সময় ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন আখ্যান রচনা করেছেন একাধিক ব্যক্তির। এরা হলেন- রবীন্দ্রনাথ সেন, রেবতীমোহন সেনগুপ্ত, রাজকুমার চক্রবর্তী, শিশিরকুমার মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মৃত্যুঞ্জয় বরাট, বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রসন্নকুমার কাব্যতীর্থ প্রমুখ।

৭৯। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- আমাদের মহাভারত (আনন্দ পাবলিশার্স)

৮০। সুনির্মল বসু- ছোটদের মহাভারত

৮১। প্রেমেন্দ্র মিত্র- মহাভারতে নেই (দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)

- ৮২। মকবুলা মনজুর- কিশোর মহাভারত (সেবা প্রকাশনী, ঢাকা)
৮৩। প্রণব চক্রবর্তী- ছবিতে ছোটদের মহাভারত (শিশুগ্রন্থ কুটির, বাংলাদেশ)
৮৪। ননীগোপাল দে- গল্পে সচিত্র মহাভারত (সাহিত্যমালা, বাংলাদেশ)
৮৫। আশিস ভট্টাচার্য- মহাভারতের গল্প (ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস)
৮৬। বিপ্লব মজুমদার- ছোটদের মহাভারত (গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা)

৫.৩।।

ছোটদের মতো করে মহাভারতের কাহিনি রচনা করা বা ছোটদের জন্য মহাভারত সংকলনের কাজ খুবই জটিল এবং সময় সাপেক্ষ একটি বিষয়। আমরা আগেও যেহেতু বলেছি মহাভারতের অনেক অংশই ছোটদের অনুপযোগী, মূল আখ্যানটিও অনেকটাই বৃহৎ। মূলত এই কারণেই ছোটদের জন্য যে সমস্ত রামায়ণের সংকলন গ্রন্থ আমরা দেখতে পাই, সেগুলি মহাভারত অপেক্ষা বয়সে অনেকটা প্রাচীন। ছোটদের মহাভারত সংকলন করতে গিয়ে এই সকল বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হওয়ার জন্যই ছোটদের উপযোগী মহাভারত বাজারে আসতে অধিক সময় লেগেছে। বিশ শতকের ছোটদের মহাভারত নিয়ে কিছু কথা বলার আগে উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংকলনের বিষয়ে না বললে বোধহয় অন্যায় হবে। ছোটদের জন্য মহাভারত সংকলনে বা বলা ভালো কাহিনি পরিবেশনে সম্ভবত প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর রচিত *ঋজুপাঠ* (তৃতীয় ভাগ, ১৮৫১ সাল) বইতে বিষ্ণুপুরাণ, হিতোপদেশ এবং মহাভারতের অংশবিশেষ অনূদিত আকারে আমরা পাই। তবে বইটির ভাষা প্রায় অনেকটাই সংস্কৃত-ঘেঁষা। বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের একাধিক জনপ্রিয় গল্পকে অনুবাদ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, ধ্রুব, একলব্য, শকুন্তলার গল্প বা কাহিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি অনুবাদে বাংলার পাঠক সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই উদ্যোগ উনিশ শতকের সময়কালের সাপেক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে উনিশ শতকের শেষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শকুন্তলা* অত্যন্ত সরস ভাষায় বেশ সুখপাঠ্য একটি গ্রন্থ। অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে আমাদের শিশুরা শকুন্তলার আখ্যান জানতে পেরেছিল। তাঁর উপস্থাপনার ধরন এবং রচনা শৈলী ছোটদের তো বটেই, এমনকী বড়োদেরও সমানভাবে মুগ্ধ করে রাখে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষার ব্যবহার এতটাই মধুর যে আজ এত বছর পরেও সমস্ত পাঠকের হৃদয়ে প্রথম সারিতেই তা অবস্থান করে। শিশুদের পাঠের জন্য যা আজও খুবই উপযোগী। শকুন্তলার বেড়ে ওঠা নিয়ে তিনি লিখেছেন:

সকলি ছিল, ছিল না কেবল-আঁধার ঘরের মাণিক-ছোটো মেয়ে-শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অঙ্গুরী মেনকা তার রূপের ডালি-দুধের বাছা-শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, ঠিক সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল! সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্ঠের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে পিঠে মানুষ হতে লাগল।^১

এর থেকে ভালো উপস্থাপনা আর কী হতে পারে? এই বর্ণনা তো শিশুদের অন্তরে দীর্ঘকাল রয়েই যাবে। যাই হোক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায় একই সময়ে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ *নীতিরত্ন* (১৮৫৪) নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। যেখানে ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের একাধিক শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। তবে বলাই বাহুল্য যে, মহাভারতের আখ্যান পরিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য লেখকের ছিল না। ছোটদের চরিত্র গঠনের জন্য নীতিকথা পরিবেশনই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উনিশ শতকে ছোটদের মহাভারতের কাহিনি রচয়িতা হিসাবে অল্প আর যে কিছুজনের নাম আমরা পেয়ে থাকি, তাঁদের প্রায় সকলেরই নাম গ্রন্থসহ পূর্বের তালিকায় আমরা যুক্ত করেছি। তাই আলোচনার এই পরিসরে সেগুলিকে পুনরায় সংযোগের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আমাদের আলোচনার পরিসর মূলত বিশ শতকের ছোটদের মহাভারতকে কেন্দ্র করে। তাই এবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে চাইছি।

৫.৩।। ক। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর- *মহাভারত* এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- *কুরু পাণ্ডব*

বিশ শতকে ছোটদের মহাভারত নিয়ে যে সমস্ত রচনাকারেরা ভেবেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই একজন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের উপর মহাভারতের প্রভাব কতটা গভীর ছিল। এর পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি মহাভারতের প্রতিগ্রহণ কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য ও নাটকে করেছেন। তবে তাঁর বিভিন্ন লেখালেখিতে মহাভারত চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে থাকলেও তা বাস্তবিকই পরিণত বয়সের মানুষের পাঠ ও চর্চার বিষয়। কিন্তু, তিনি মহাভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি মহাকাব্যকে শিশুদের মতো করে উপযোগী করার কথাও ভেবেছিলেন। বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কৃতি, আমাদের মূল্যবোধ, ধর্ম ও নীতির ধারণা শিশুদের মনের মধ্যে প্রবেশের জন্য তিনি মহাভারতকেই হাতিয়ার করেছিলেন। মহাভারতের অসংখ্য জটিল তত্ত্বকথা এড়িয়ে তিনি শিশুদের উপযোগী কৌরব এবং পাণ্ডবদের মূল বৈরিতা ও যুদ্ধ কাহিনিকেই প্রধান হিসাবে তাঁর *কুরু পাণ্ডব* বইতে স্থান দিয়েছেন। মাত্র একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠার কিছু অধিক পৃষ্ঠা সংখ্যার মধ্যেই তাঁর বইটি স্থান করে নিয়েছিল। যাই হোক, তবে ছোটদের জন্য মহাভারত রচনা রবীন্দ্রনাথ অল্প দিনের মধ্যেই করে উঠতে পারেন নি। এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস।

মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার বা ছোটদের মহাভারত সম্পর্কিত একটি বই যা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরেই ভেবে আসছিলেন। বস্তুতপক্ষে মহাভারত অজানা থাকলে আমাদের দেশে কারোরই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না বলে প্রচলিত একটি ধারণা রয়েছে। তাই ভাবনার এই পরিসর থেকেই রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছোটদের পাঠের উপযোগী একটি বই রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেখানে বইয়ের আকার ছোট ও ভাষা সহজ সরল হলে তা বিদ্যালয়েও পাঠের উপযোগী হতে পারে এমন একটি চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল। বিশ শতকে মহাভারত চর্চায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই একজন একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজের ভাইপো অথবা শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের যেমন ভারতকথার সংকলন ও আলোচনায় টেনে এনেছেন, ঠিক তেমনই যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ এর মতো পণ্ডিতদেরও মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করেছেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যখন ১৯২৯ সালে নীলকণ্ঠ ও নিজের করা টীকা ও অনুবাদ সমেত ১৫৯ খণ্ডে মহাভারত প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, তখন তার প্রথম ১৭ টি খণ্ড পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। এগুলি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

আমার অল্প বয়স হইতেই মহাভারত আমাকে বিস্মিত করিয়াছে।... একাধারে এমন বিপুল বিচিত্র সাহিত্য আর কোনো ভাষায় নাই।.... ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, মহাভারত না পড়িলে আমাদের দেশের কাহারো শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।^২

পরিপূর্ণ শিক্ষালাভে মহাভারত পাঠের প্রয়োজনীয়তা কবিগুরু নিজের জীবন ও প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন বলেই ছোটদের উপযোগী বিদ্যালয় পাঠ্য মহাভারত সংকলনে তাঁর প্রয়াস প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি। বোলপুরে শান্তিনিকেতনের সূচনা পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যথার্থ মহৎ নাগরিক গঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অবসর সময়ে তিনি কম বয়সি ছাত্রদের গল্প বলতেন মহাভারত থেকে। কখনও আবার পাঠ করে শোনাতেন কাব্যটি। মহাভারতের গল্প বলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে ছোট ছাত্রদের মনোরঞ্জন করতেন তার চমৎকার একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ২০ শে আষাঢ় ছোট্ট নাতনি নন্দিনী /পুপেকে লেখা একটি চিঠিতে মহাভারতের গল্প কথক রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

পুপমণি,

বেশি দেরী কোরো না। এইবার চলে এসো। কেননা পাণ্ডুদের এবার খুব মুন্সিল। বন থেকে ফিরে এল, তের মাস কেটে গেল। কিন্তু দুষ্ট দুর্যোধন বল্চে কোনোমতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। লড়াই করতে হবে। তাই বলচি তাড়াতাড়ি এসো নইলে লড়াই বন্ধ হয়ে থাকবে। ভীম তা হলে ছটফট করে মরবে- তার গদা দেওয়ালের কোণে ঠেসান দিয়ে রেখেছে। সে থেকে থেকে লাফ দিয়ে বলে উঠছে দুঃশাসনকে একবার পেলে হয়। অর্জুনের ইচ্ছে, আর একটু দেরি না করে কর্ণের বুকে পিঠে তীর মেরে মেরে তিনশোটা ছেঁদা করে দেয়। তুমি এলেই তখনি লড়াই

শুরু হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্রে হাজার হাজার তাঁবু পড়ে গেছে—কত হাতি কত ঘোড়া কত রথ তার ঠিক নেই।....^৭

শিশুদের কাছে ভারতকথার কোনও একটি পর্বের গল্প বলা আর অল্প বয়সি ছাত্রদের জন্য মহাভারতের গল্পগুলির শিক্ষণীয় বিষয়কে সংকলন করে দেওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত *সরল কৃত্তিবাস* গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতকেও বলেছেন ছোটদের ‘মনের অন্ন, পানের অক্ষয় ভাণ্ডার’। সুদীর্ঘ কাল ধরে মহাভারত মানব মনের যথার্থ বিকাশ এবং মনুষ্যত্বকে রক্ষা করে আসছে। সে সময়ের সকল শিক্ষিত মানুষ মহাভারত না পাঠের কারণে রবীন্দ্রনাথ আফসোস করেছিলেন। যদিও বর্তমান সময়েও সমস্ত শিক্ষিত মানুষ মহাভারত পাঠ সম্পূর্ণ করে না। মহাভারতের মতো একটি মহাগ্রন্থ ছোট ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। যদিও এই সম্পর্কে দু’একটি অসুবিধার কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। যেমন— মহাভারতের অনেক কথাই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পাঠের অনুপযোগী, এত বিশাল একটি গ্রন্থ যথার্থভাবেই বিদ্যালয়ে পড়িয়ে শেষ করা অসম্ভব। মূলত এই বিষয়গুলির মতো বিষয়কে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন উদ্যোগী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই যোগীন্দ্রনাথ বসুকেও উৎসাহিত করেছিলেন বিদ্যালয়ে পাঠের উপযোগী মহাভারত রচনায়। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই পরবর্তী সময়ে যোগীন্দ্রনাথ বসু কাশীদাসী মহাভারতের সংক্ষিপ্ত রূপ *সরল কাশীরাম দাস* ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন।

বলা বাহুল্য, ১৮৯৮ সালে সপরিবার শিলাইদহে থাকার সময় ছোটদের স্কুল পাঠ্য মহাভারত প্রকাশের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রয়াস করেছিলেন। নিজের সন্তানদের শিক্ষার জন্য সেখানে একটি গৃহ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানেই মূলত মহাভারতের মূল গল্প অবিকৃত এবং অটুট রেখে ছোটদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থ অবলম্বনে অবান্তর ঘটনাবলী বাদ রেখে সহজ ভাষায় মহাভারত সংকলনের ভার দেওয়া হয়েছিলো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং প্রিয় পাত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরুর নির্দেশ এবং পরিকল্পনা অনুসারে কাজে হাত লাগিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, কিছুটা কাজ এগিয়ে গেলে তিনি শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথকে লেখাগুলি দেখিয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলেছেন:

সুরেন দাদা প্রায়ই শিলাইদহে আমাদের কাছে আসতেন। তাঁর আসার জন্য দিদি আর আমি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতুম। জানতুম, তিনি মহাভারত সংকলনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে আসবেন, যতটা লেখা হয়েছে আমাদের পড়ে শোনাবেন।^৮

গ্রন্থটি সংকলনের জন্য জটিল কাজটি করতে সুরেন্দ্রনাথের সময় লেগেছিল বেশ কিছু বছর। শান্তিনিকেতনে পরবর্তীকালে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সুরেন্দ্রনাথের সেই সংকলন গ্রন্থ ছাত্রদের পাঠ করে শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে মহাভারত পাঠ শ্রবণের দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে:

১৯০৩ সালের শীতকালে আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মার্চ মাসে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, বাবা সেই সময় লাইব্রেরির বারান্দায় বসে সুরেন দাদার সংকলিত মহাভারত ছেলেদের পড়ে শোনাতে লাগলেন। পড়াশোনা ফেলে আমরা দুজনেও মহাভারতের গল্প শুনতে বসে গেলাম। মাস্টারমশায়রা বাবার কাছে নালিশ জানালেন।^৫

সকলেই পড়তে পারে এমনভাবে মূল গল্পটি অবিকৃত রেখেই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাভারত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই মলাটের মধ্যে একত্রে প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। বইটি ছোট ছোট ছাত্রদের পড়ার উপযোগী হলেও বস্তুতপক্ষে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুইটি খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯৫। যাকে কিন্তু কোনওমতেই আমরা বিদ্যালয়ের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে অভিহিত করতে পারি না। ফলস্বরূপ এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের ছোটদের বা শিশুদের মহাভারত সংকলনের পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা সম্পূর্ণ মাত্রায় সফলতা পায় নি। তবে সুরেন্দ্রনাথের বইটি বর্তমানে একপ্রকার দুস্তাপ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা একটি কপি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে যদিও আছে। কিন্তু, সাধারণের পড়ার জন্য বাজারে এখন তা আর পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্রনাথের বইটিতে দুই পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা এবং দশ পৃষ্ঠার একটি বিস্তৃত সূচিপত্র রয়েছে। বইটির প্রথম খণ্ডের ১৩ টি অধ্যায়ের নাম হল- বংশাবলী, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের জন্মবৃত্তান্ত, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণের বাল্যজীবন, পাণ্ডবদের প্রতি ধার্তরাষ্ট্রদের উৎপীড়ন, পাণ্ডবগণের বিবাহ ও রাজ্যপ্রাপ্তি, পাণ্ডবদের সাম্রাজ্যপ্রাপ্তি, পাণ্ডবদের রাজ্যহরণ, পাণ্ডবদের বনবাস, ধার্তরাষ্ট্রগণের রাজ্যচালনা, বনবাসান্তে অজ্ঞাতবাসের উদ্যোগ, অজ্ঞাতবাস, পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস সমাপন, পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ ও মন্ত্রণা। একইভাবে বইটির দ্বিতীয় খণ্ডেও ১২ টি অধ্যায় আছে। এগুলি হল- শান্তির চেষ্টা, যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধপ্রবাহ, যুদ্ধাবসান, যুদ্ধশেষ, যুদ্ধান্তে, পাণ্ডবদের একাধিপত্য, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পরিণাম, যদুবংশধ্বংস এবং মহাপ্রস্থান। এভাবে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরই হলেন প্রথম সেই ব্যক্তি, যিনি মহাভারতের কাহিনিমালাকে ২৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। মহাভারতের পর্ব বিভাগকে তিনি মান্যতা দেন নি।

বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের এই বইটি প্রকাশিত না হলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা ছোটদের মহাভারত সম্পর্কিত কুরু পাণ্ডব বইটি হয়তো দেখতে পেতাম না। বইটির ‘ভূমিকা’ অংশে সুরেন্দ্রনাথ মহাভারত সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠকদের জানিয়েছেন:

মহাভারতের অক্ষয়ভাণ্ডার অব্যাহতদ্বার।... আমি যাহা পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার ভার আর কেহ লইয়াছেন বলিয়া আমি অবগত নহি।... আমার লক্ষ্য সমষ্টির প্রতি;.... এক কথায়, আখ্যানাংশের সাহিত্য রসের প্রতি।... অমৃতসমান-কথা-সাগর-মস্থন-সম্বন্ধে কাহাকেও যদি উৎসাহিত করিতে পারি তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।^৬

মূলত সুরেন্দ্রনাথের মহাভারতের এই সংকলন গ্রন্থটিকে সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুরূপ একটি শিশুদের উপযোগী মহাভারতের বই লেখার কথা ভেবেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা যেহেতু হয়েছিল ৫৯৫, তাই রবীন্দ্রনাথ মনে মনে চেয়েছিলেন এর থেকে অনেকটাই আকারে ছোট এমন মহাভারতমূলক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা যায় কিনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এবং পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আর এরূপ কাজে সময় হয়ে উঠছিল না। ইতিমধ্যে কাজের পরিসর বেড়েছে, বেড়েছে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য প্রদানের অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথ থেকে হয়ে উঠেছেন তিনি ‘বিশ্বকবি’। পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের মহাভারতের বৃহৎ অংশকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা কাট-ছাঁট করে তাঁর মনের মতো করে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এমন পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ যায় নি। মাত্র অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই অসাধ্য কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করলেন তিনি। এই বিষয়ে ঐ বছরের মার্চের দ্বিতীয় তারিখে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন:

গাড়িতে আমার দুটি কাজ ছিল। একটি বাইরের একটি ভিতরের। সুরেনের মহাভারতখানা নিয়ে তার খাঁটি গল্পাংশটুকু চিহ্নিত করছিলুম। আমার পেন্সিলের দাগের মধ্যে বি.এন.আর এবং জি.আই.পি আর রেল বাহিনীর হৃৎস্পন্দন দুই দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই কাজটা খুব ভালো লাগছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মহাভারতের অতি বিপুলতা থেকে আমি তার যে সারভাগ উদ্ধার করেছি সেটা অতি উত্তম হয়েছে। আশা করি ওটা ছাপানো হবে।^৭

এই মহাভারতের বিষয়ে পুত্র রবীন্দ্রনাথকেও চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কিছু কথা জানিয়েছিলেন। যেখানে পৃষ্ঠার কথা এবং সুরেন্দ্রনাথের সংকলনের বিষয়ে কিছু কথা বলা ছিল:

মহাভারতের নিছক গল্প অংশটুকু চিহ্নিত করে দিয়েছি। ওর প্রথম অংশটা বাদ পড়বে। যেখান থেকে পাণ্ডব কৌরবদের বাল্যলীলা শুরু হয়েছে সেখান থেকে বই আরম্ভ হবে। পেন্সিল দিয়ে

ঘেরা অংশগুলো ত্যাগ করতে হবে। শেষের অনেকখানি বাদ। সবশুদ্ধ বোধহয় ১৫০/২০০ পাতার বেশি হবে না। খুব আঁট করে দিয়েছি— পড়তে বেশ লাগবে। এটা স্কুলপাঠ্য হবার বাধা নেই। বইটি যদি নিজের খরচে ছাপাই তাহলে সংসদওয়ালাদের আয়ের ভাগ দিতে হবে না। আমার সেই ইচ্ছে।^৮

তবে মুদ্রণের প্রাথমিক কিছু সমস্যা থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথের সংকলিত এবং সম্পাদিত মহাভারত প্রকাশিত হতে কিছু বছর অধিক সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথের সংকলিত মহাভারত প্রকাশ পায়, তখন তাঁর মহাভারতের নতুন নাম হল *কুরুপাণ্ডব*, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধের কারণ হিসাবে অল্প কথায় পূর্বের কিছু কথা জানিয়েই প্রবেশ করেছেন মহাভারতের কাহিনির প্রধান অংশে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের *কুরুপাণ্ডব* শুরু হয়েছে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের আগমনের মধ্যে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের যুদ্ধ ও আচার্য দ্রোণাচার্যের অধীনে থেকে পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা শেখার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মহাভারত তথা *কুরুপাণ্ডব* শেষ হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এবং যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভে। অত্যন্ত পারদর্শী এবং দক্ষ সংকলকের মতো রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গেছেন মহাভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদি পর্ব এবং যুদ্ধ শেষের পর শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্বের মতো জটিল এবং নীতিকথায় পরিপূর্ণ পর্বগুলি। বিশেষ করে শান্তি এবং অনুশাসন পর্ব শিশুদের বোঝার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। ধর্ম ও নীতির জটিল তত্ত্বকথা ছোটদের রসহীন লাগাই স্বাভাবিক। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস একেবারেই সফল হয়েছিল, কারণ পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের বাইরেও *কুরুপাণ্ডব* পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। আমরা একটু দেখে নিচ্ছি রবীন্দ্রনাথের সংকলিত *কুরুপাণ্ডব* গ্রন্থের সূচিপত্র যেমনটি ছিল, এখান থেকে পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্য মহাভারত রচনায় তাঁর ভাবনা কত গভীর ছিল। সূচিপত্রটি এরকম ছিল:

- ১। রাজকুমারদিগের বাল্যক্রীড়া— ভীমের প্রতি দুর্যোধনের বিদ্বেষ— দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা— অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা— কর্ণের আগমন
- ২। পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন— জতুগৃহদাহ— পাণ্ডবদের পলায়ন— হিড়িম্বার বিবাহ
- ৩। পাণ্ডবদের পাঞ্চাল দেশে গমন— দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ও বিবাহ— খাণ্ডবগ্রন্থে রাজ্য স্থাপন
- ৪। ময়দানবের সভানির্মাণ— দুর্যোধনের বিদ্বেষ— দ্যুতক্রীড়া— যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও বনগমন
- ৫। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দ্বৈতবনে বাস— বিরাটরাজের গৃহে অজ্ঞাতবাস
- ৬। কৌরবদিগের সহিত বিরাটরাজের যুদ্ধ— অর্জুনের জয়লাভ
- ৭। পাণ্ডবদিগের আত্মপ্রকাশ— উত্তরার বিবাহ— ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দূতপ্রেরণ

- ৮। উভয়পক্ষের দূতপ্রেরণ- কৌরবগণের রাজ্যদানে অস্বীকার- কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথন
- ৯। যুদ্ধের উদ্যোগ- যুদ্ধার্থ যাত্রা
- ১০। ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ আরম্ভ- ভীষ্মের শরশয্যা
- ১১। দ্রোণ অভিমন্যু জয়দ্রথ কর্ণ শল্য দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণের যুদ্ধ ও মৃত্যু
- ১২। সকলের হস্তিনাপুরে গমন- যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ

রবীন্দ্রনাথের *কুরু পাণ্ডব* পাঠের দিক থেকেও খুবই সুখপাঠ্য। পাশাপাশি বইতে ছোটদের জন্য উপযুক্ত শব্দ চয়ন এবং বাক্য বিন্যাস একেবারে যথাযথ হয়েছে। ভীষ্মের সঙ্গে দুর্যোধনদের বাল্যকালে যে লড়াই চলেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছল ভাষায় লিখেছেন:

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার সহিত বালককালে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের সর্বদা ক্রীড়া কৌতুক চলিত। কিন্তু ভীষ্মের বল এত অধিক ছিল যে তাঁহার পক্ষে যাহা ক্রীড়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষে তাহা পীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা গাছে চড়িলে গাছে পদাঘাত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাখাচ্যুত করিয়া দিতেন, জলক্রীড়াকালে তাহাদিগকে বলপূর্বক জলমগ্ন করিতেন, কেশাকর্ষণ করিয়া মাটিতে ফেলিতেন, দুইজনকে পরস্পরের সহিত নিষ্পেষণ করিতেন, এইরূপে নানাপ্রকার উৎপীড়নে তিনি ধার্তরাষ্ট্রদের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।^৯

আবার দ্রোণাচার্যের কাছে শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর রাজকুমারদের রাজা ও প্রজাদের সামনে নিজেদের অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় প্রদান করতে হতো। দেখাতে হয়েছে অস্ত্রবিদ্যার মাধ্যমে নানা রকম যুদ্ধের ক্ষমতাও। প্রকাশ্যে লড়াই করতে হয়েছে দুর্যোধন ও ভীমকে। অর্জুনের সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে লড়তে হয়েছে কর্ণকেও। ভীম ও দুর্যোধনের লড়াই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের কাছে অমর হয়ে আছে। বাঙালি শিশুরা এটিকে অত্যন্ত উপভোগের সঙ্গে পাঠ করে থাকে।

অনন্তর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভীম ও দুর্যোধনকে পরস্পরকে বামে রাখিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গেল। দুই তুল্যবীর ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরের সহিত স্পর্ধাপূর্বক গদাযুদ্ধ আরম্ভ করায় তাঁহাদের প্রতি দর্শকবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেহ ‘হা দুর্যোধন’, কেহ বা ‘হা ভীম’, বলিয়া স্ব স্ব পক্ষকে উৎসাহ দান করিয়া মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। পাছে ইহাতে উত্তেজনাবশে যোদ্ধাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই নিমিত্ত ধীমান্ দ্রোণ দুই বীরকে নিবারণ করিবার জন্য অশ্বখামাকে যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিলেন। অশ্বখামার চেষ্টায় ভীম ও দুর্যোধন নিরস্ত হইলেন।^{১০}

৫.৩।। খ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাংলা শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বরাবরই অতি পরিচিত একটি নাম। উপেন্দ্রকিশোরের হাত ধরেই আমরা চিনেছি ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র ও গল্পগুলিকে। তাঁর *ছেলেদের মহাভারত* প্রথমে মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরবর্তী সময়ে পরিমার্জিত রূপে *ছেলেদের মহাভারত* বই আকারে সিটি বুক সোসাইটি থেকে ১৯০৮ সালে বেরিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশের কিছু সময় পরেই পাঠক সমাজের মধ্যে এই গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। সিটি বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশের কিছু বছর বাদে গ্রন্থটি লেখকের নিজের সংস্থা ইউ রায় এন্ড সন্স থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। তবে এই কথা স্বীকার করতেই হবে মুকুল পত্রিকায় প্রকাশের সময় ছেলেদের মহাভারতের আকার ছিল ৮০ পৃষ্ঠার মতো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে গ্রন্থ আকারে যখন বেরোয় তখন এর কলেবর অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের ফলে গ্রন্থের আকার ৩৫০ পৃষ্ঠার মতো দাঁড়িয়ে যায়। আমরা আগেই বলেছি যে ছোটদের মহাভারত সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের সুপ্ত ইচ্ছা ছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থটির কলেবর অনেকাংশে ছাঁটাই করেছেন। এটিকে তিনি বাস্তবিক অর্থেই শিশু পাঠ্য গ্রন্থে পরিণত করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের রচনার সময়ও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন, এই কথা ভূমিকা অংশে রচনাকার নিজেই বলে গেছেন।

তবে উপেন্দ্রকিশোর শুধুমাত্র বইটিই লেখেননি, বইতে যতগুলো ছবি আছে তার সবকটি অঙ্কনও করেছেন রচনাকারে নিজে। কারণ তিনি হৃদয় থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, শিশুদের জন্য সহজ ও সরল রচনার পাশাপাশি ছবিরও অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ছবি শিশুদের পাঠের আগ্রহ বাড়ায় এবং তা বহুলাংশে মনোযোগ বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বলা বাহুল্য, বিশ শতকের শুরুতেই এই গ্রন্থটি লেখার সময় উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের চাহিদা ও শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। তাঁর হাফটোনে ছবির ব্লক নির্মাণের অন্যতম দৃষ্টান্ত এই বইটি। প্রকাশের প্রথমে দিকে বইটির মুখবন্ধে ছিল কালারফুল বা উজ্জ্বল হাফটোনের খাণ্ডবদাহন ছবি, আর ভেতরে ছিল আটটি একরঙের পাতাজোড়া ছবি। ফলে বলতেই হয় তাঁর *ছোটদের মহাভারত* জনপ্রিয়তা পাওয়ার পেছনে এই ছবিগুলির ভূমিকা অপরিসীম। জনপ্রিয়তার কথা বলতে গেলে এটাও বলা দরকার যে বইটির কতগুলি মুদ্রণ হয়েছিল। লেখকের নিজের ইউ রায় এন্ড সন্স হাতবদলের পরেও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এখান থেকে বইটির ২৮ টি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল। ছবির ব্লকগুলির মান খারাপ হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে ছাপা ছবির গুণগত মানও অনেকটা পড়েছে। পরবর্তীকালে কপিরাইট উঠে গেলেও অন্তত আরও দশটির বেশি প্রকাশক

উপেন্দ্রকিশোরের *ছেলেদের মহাভারত* ছাপিয়েছে। কিন্তু নতুন বইগুলিতে আর পাওয়া যায় না সেই ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থচিত্রণগুলি। কিছু বছর আগে দে'জ পাবলিশিংও বইটি বের করেছে এবং বইটির ইতিমধ্যে একাধিক মুদ্রণও হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই পাঠক হতাশ হয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের সেই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী ভূমিকাটি না দেখতে পেয়ে। পাঠক দেখতেও পায়নি সেই সব উজ্জ্বল হাফটোনের ছবিগুলিও। যা প্রকৃত অর্থেই হতাশ করেছে পাঠক সমাজকে। তবে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় উপেন্দ্রকিশোরের *ছেলেদের মহাভারত*-এর উপস্থাপনের বিশেষত্ব এবং ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে, যা প্রকৃত অর্থেই শিশুদের আকর্ষণ করে তো বটেই, এমনকী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরাও এই তালিকা থেকে বাদ যায় না। তাই এই নিয়ে দু'একটি কথা বলতেই হচ্ছে।

উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের মানসিক গঠন, ভাবনার জগত এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যেহেতু সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন, তাই মহাভারতের গল্প বলতে গিয়ে কাহিনি শুরু করেছেন একেবারে পাণ্ডব ও কৌরবদের বাল্যকাল থেকেই। এড়িয়ে গেছেন তার পূর্বের প্রচুর আখ্যান। বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত আখ্যানগুলি মহাভারতকে এতটা জটিল ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু, শিশু মনের গভীরে এই সমস্ত আখ্যানগুলি (যথা— মহাভারতের বংশাবলী ও প্রক্ষিপ্ত নানা কাহিনিসমূহ) অযথা জটিলতার সৃষ্টি করবে এবং এগুলি হয়তো শিশুদের মহাভারতের প্রধান গল্পটিকে আত্মস্থ করতেও বাধা প্রদান করতে পারে— এরকম কিছু ভাবনা থেকেই উপেন্দ্রকিশোর এগুলি বাদ রেখেছেন হয়তো। তিনি শুরু করেছেন আমাদের শৈশবের মা, ঠাকুমাদের মতো করে গল্প বলার ভঙ্গিতেই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শিশুই এরকম ভাষা ব্যবহার ও ছবিতে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না।

এখন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে, অনেকদিন আগে, হস্তিনা বলিয়া একটা নগর ছিল। এই হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে বড় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। অন্ধ যে, সে রাজ্য পায় না। কাজেই, বয়সে বড় হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না; রাজা হইলেন ছোট ভাই পাণ্ডু।^{১১}

আমরা যদি *ছেলেদের মহাভারত* শুরু হওয়ার কয়েকটি লাইন খেয়াল করি, তাহলে দেখতে পাব উপেন্দ্রকিশোরের রচনা উপস্থাপনের বিশেষত্বটি। ছোটরা প্রাচীন ইতিহাস এবং মহাকাব্যে বর্ণিত স্থানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত না হওয়াই স্বাভাবিক। সেই বিষয়টি আগাম অনুধাবন করেই রচনাকার হস্তিনাপুর স্থানটি বোঝানোর জন্য বর্তমানের দিল্লির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিষয়টা এমন যে অনেকেই তো পর্যটনের উদ্দেশ্যে দিল্লি গেছে অথবা অনেকে মানচিত্রে দিল্লির অবস্থান জেনেছে, ফলে মহাভারতের যুগের হস্তিনাপুরকে বুঝতে আর ছোটদের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আবার উপেন্দ্রকিশোরের রচনার অন্য একটি প্রসঙ্গে আসি, অন্যান্য পাণ্ডব ভাইদের তুলনায় ভীম ছিল বেশি শক্তিমান। ফলে প্রায়শই দুর্যোধনের অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে ভীমের অসম যুদ্ধ হয়ে থাকত। ফলস্বরূপ অন্যরা পরাজিত হয়ে ভীমের ওপর প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে থাকত। রাজকুমারদের বাল্যকালের এরকম প্রচুর যুদ্ধের ঘটনা মহাভারতেই আছে। কিন্তু রচনাকার মহাভারতের গল্পকে ছোটদের জন্য উপস্থাপন করেছেন একেবারে অন্য ঢঙে। উপস্থাপনের ভঙ্গি ও ভাষার ব্যবহার শিশুদের মনে একেবারে টানটান উত্তেজনা তৈরি করে রাখে। একটু দেখা যাক, উপেন্দ্রকিশোরের বর্ণনা:

খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভালো করিয়া খেলিতেই পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দেন। উহারা একশো ভাই, ভীম একেলা। তবুও উহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে আছড়াইয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেন যে, বেচারারা তাহাতে চ্যাঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়া খেলা করিতে গেলে, তিনি তাহাদের দশজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর তাহারা আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয়তো ফল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নড়িয়া উঠে যে, ফলের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর তাঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না।^{১২}

ভীমকে যতই দেখে, দুর্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্ট বুদ্ধি বাড়িয়া উঠে। সে কেবলই ভাবে, ‘এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই তো আমাদের সর্বনাশ! সুতরাং, এইবেলা এটাকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।’^{১৩}

দুষ্ট বসিয়া বসিয়া খালি এইরূপ ভাবে। তারপর একদিন সে সকলকে বলিল, ‘চল আজ গঙ্গাস্নানে যাই!’ এই সহজ কথাটার ভিতর কি ভয়ানক ফন্দি রহিয়াছে, তাহা তো পাণ্ডবেরা জানেন না, তাঁহারা কেবল জানেন যে গঙ্গায় বুটোপাটি করিয়া স্নান করিতে যারপরনাই আরাম। সুতরাং, গঙ্গা-স্নানের কথা শুনিয়াই সকলে যাইব! যাইব!’ বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।^{১৪}

সুতরাং, উপেন্দ্রকিশোরের এই ভাষা ব্যবহার ও উপস্থাপনের ভঙ্গি তাঁর রচনাকে অমরত্ব প্রদান করেছে। আজও তাই *ছেলেদের মহাভারত* -এর মতো তাঁর প্রত্যেকটি লেখাই শিশু কিশোরেরা মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকে। *ছেলেদের মহাভারত* বইটি জুড়ে এর অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। কতগুলিকেই বা আমরা তুলে ধরতে পারি! যেমন ভীমের সঙ্গে হিড়িম্ব রাক্ষসের যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে উপেন্দ্রকিশোর একেবারে গল্প বলার ভঙ্গিতে বলেছেন:

সেই বনের কাছে, এক প্রকাণ্ড শাল গাছের উপরে, হিড়িম্ব নামে একটা বিকট রাক্ষস থাকিত। তাহার তালগাছের মতো বিশাল দেহে ভয়ানক জোর, আগুনের মতো চোখ, জালার মতো মুখ, মূলার মতো দাঁত, গাধার মতো কান, ঝাঁকড়া তামাটে চুল-দাড়ি; বেলুনের মতো প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। অনেকদিন মানুষের মাংস খায় নাই, তাই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাহার মুখে জল আর ধরে না। সে খালি মাথা চুলকায়, আর হাই তোলে, আর বারবার তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে তাহার বোন হিড়িম্বাকে বলিল, “বাঃ! কি এ মিঠঠারে গন্ধো! ও বোহিন্, ঝাট্ কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্ছবো!”^{১৫}

অসাধারণ এই রাক্ষসের চেহারার বর্ণনা। এইরূপ বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর এর মতো শিশু সাহিত্যিকদের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। হিড়িম্বা রাক্ষসের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপরের যে যে উপমাগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন তা বাস্তবিক অর্থেই শিশুদের আকর্ষণ করতে বাধ্য। ঠিক একই রকম বক রাক্ষসের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে উপেন্দ্রকিশোর বলেছেন:

ডাক শুনিয়া রাক্ষস দাঁত কড়মড় করিতে করিতে হাজির! কি বিকট চেহারা! এক কান হইতে আর এক কান পর্যন্ত তাহার খালি দাঁত!..... একেই তো রাগিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আসিয়া দেখে ভীম তাহার ভাত প্রায় শেষ করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতেই পার। সে গর্জন করিয়া বলিল, “মোর ভাতটি খাইছিস? তোকে যোম ঘর পেঠঠাইব নি?”^{১৬}

এরকম অনেক হাস্যরসের ধারা রচনাকার শিশুদের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়তে মজা পায় এবং আগ্রহ ভরে পুরো বইটা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। বকের মৃত্যুর পর তার সহযোগীরা ভীমের স্বরূপ এবং সামনে বক রাক্ষসের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাস্তবিক অর্থেই অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল। ফলস্বরূপ মহাভারতে নিশ্চয়ই পুনরায় এরূপ হত্যালীলা রাক্ষসদের তরফ থেকে না হওয়ার বচনই দেওয়া হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর সেই কথাটিকে একেবারে শিশুদের কাছে গল্প বলার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। ছেলেরা রূপকথার গল্প এবং ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো হাস্যরস ও আনন্দ এখানেও পায়।

তাহারা বলিল, ‘ওরে ঝাপ্পো! মোরা আর কখখনু মানুস্ খাবো নি!’ তখন হইতে উহারা ভদ্রলোক হইয়া গেল, আর মানুষ খায় না।^{১৭}

তবে এই সকল হাস্যরসগুলির সৃষ্টির পাশাপাশি *ছেলেদের মহাভারত* গ্রন্থে মহাভারতের অনেক জটিল বিষয়কেই অল্প কথায় উপেন্দ্রকিশোর বলার চেষ্টা করেছেন। তবে এই সমস্ত প্রয়াস ভালোভাবেই তাঁর সফল হয়েছে। যেমন ধরা যাক, যুধিষ্ঠির ও বক্রপী যক্ষের কথোপকথন।

মহাভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অংশ। যুধিষ্ঠির ও যক্ষের মধ্যে হওয়া একাধিক কথোপকথন ভারতীয় দর্শন চর্চার দীর্ঘদিনের ফসল। কিন্তু এই তাত্ত্বিক আলোচনা শিশুদের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তা অনেকাংশে ক্লাস্তিকর লাগতেও পারে। তাই দু'একটি কথায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর এই বিষয়টিকে শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, কথাগুলির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য শিশুদের এই বয়সে বোঝার পক্ষে অনুপযোগী বলে তিনি বলেও দিয়েছেন যে, এতো কথা বলার জায়গা ওই বইতে নেই।

যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করিল, যুধিষ্ঠির তাহার সকলগুলিরই উত্তর দিলেন। সকল প্রশ্নের কথা লিখিবার স্থান এ পুস্তকে নাই। দু-একটির কথা মাত্র বলিতেছি।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, ‘পৃথিবীর চেয়ে ভারি কে? স্বর্গের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়েও কাহার সংখ্যা বেশি?’.....

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, ‘সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? সংবাদ কি?’^{১৮}

এরপর উপেন্দ্রকিশোর অল্প কথায় যুধিষ্ঠিরের উত্তরগুলিও লিখেছেন। তবে একেবারে সাধারণ সরল ভাষায় যাতে ছোটদের বুঝতে সমস্যা না হয়। তবে বলা বাহুল্য, যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের যে সমস্ত কথাগুলি ছোটদের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত তা উপেন্দ্রকিশোর বাদ রেখেছেন। পাশাপাশি বনপর্ব, শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্ব মহাভারতের সব থেকে আয়তনে বড়ো পর্বগুলির অন্যতম। এই পর্বগুলি মানুষের অনেক গভীর আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে। পাশাপাশি বুঝতে শিখিয়েছে জীবনের অনেক জটিল সত্যকে। কখনও তা উপদেশের আকারে সরাসরি বলা হয়েছে, অথবা কখনও সত্যটিকে বুঝে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে বোঝানোর প্রয়াস করা হয়েছে। আমাদের গবেষণার অন্যত্র এই নিয়ে আলোচনা করাও হয়েছে। কিন্তু ছোটদের কাছে নিরস লাগবে ভেবে রচনাকার এগুলি এড়িয়ে গেছেন। বনপর্বের মধ্যে রচনাকার স্থান দিয়েছেন অর্জুন ও মহাদেবের যুদ্ধের কাহিনিকে, ভীম এবং হনুমানের সাক্ষাৎ, ভীমের সঙ্গে অভিশপ্ত সর্পরূপী নহুষের লড়াই, গন্ধর্ব বনাম পাণ্ডবদের যুদ্ধ, দুর্বাসা ঋষির দশ হাজার শিষ্য সহকারে পাণ্ডবদের কুটিরে আগমন, জয়দ্রথ দ্বারা দ্রৌপদীর সম্মানহানির চেষ্টা ও ইন্দ্রের দ্বারা কর্ণের কবচ এবং কুণ্ডল নিয়ে নেওয়া। এরপর একেবারে শেষে যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ রচনাকারের কলমে উঠে এসেছে। এই বিষয়গুলিকে দেখলে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে একেবারেই বুঝতে পারা যায়।

শান্তিপর্ব উপেন্দ্রকিশোর শেষ করেছেন মাত্র তিন পৃষ্ঠার মধ্যেই। যাবতীয় জটিলতা এবং পিতামহ ভীষ্মের উপদেশগুলি একেবারেই শিশুদের মহাভারতে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এড়িয়ে গেছেন এই বলে যে, ‘তোমরা বড় হইয়া তাহার কথা পড়িবে।’ তবে প্রতিনিধি

স্থানীয় সাহিত্যিকেরা ছোটদের মহাভারত সম্পর্কিত যে সমস্ত বই লিখেছেন, তাঁরা সবাই শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্বে-র এই ভীষ্ম দ্বারা উপদেশের জায়গাগুলি এড়িয়ে গেছেন। কেউ কেউ আবার চার পাঁচ লাইনেই কাজ সেরেছেন। উপেন্দ্রকিশোর বলেছেন তাঁর বইতে:

তারপর বহুদিন পর্যন্ত, যুধিষ্ঠির প্রত্যহ সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া, যে সকল অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তোমরা বড় হইয়া তাহার কথা পড়িবে। এমন উপদেশ যে-সে দিতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির উপদেশ লইতে আসিলে নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘এই মহাত্মা ধর্মের সকল সংবাদ জানেন, ইনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা শুনিয়া লও।’^{১৯}

মহাভারতের মূল গল্পটি ছাড়া এমন অনেক উপকাহিনি আছে যেগুলি *ছেলেদের মহাভারত*-এর মধ্যে স্থান পায়নি। সেগুলির প্রয়োজনীয়তা উপেন্দ্রকিশোর অনুভব করেছিলেন। তাই সম্ভবত ১৯০৯ সালে সিটি বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর *মহাভারতের গল্প*। মোট ৬৪ টি কাহিনি স্থান পেয়েছিল এই গ্রন্থে। এই বইতে একটি রঙিন মুখপত্র ছাড়া ছিল আটটি পাতাজোড়া এক রঙের ছবি। ‘গ্রন্থকারের নিবেদন’ অংশে রচনাকার লিখেছিলেন:

মহাভারতের অবান্তর গল্পগুলি লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। এ সকল গল্পের প্রত্যেকটির আগাগোড়া অবিকল রাখিয়া বালক-বালিকাদিগের নিকট বলা একেবারেই অসম্ভব, আর তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ মহাভারতের ভিতরেই এক গল্পের নানা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই পুস্তকের নানা স্থানে মূলের সহিত যে অনৈক্য আছে, তাজন্য সহৃদয় পাঠক আমাকে মার্জনা করিবেন, এই আমার কথা।^{২০}

ছোটদের বা শিশুদের মহাভারত চর্চাতে বা অনুধাবনে উপেন্দ্রকিশোরের এই ৬৪ টি গল্পের যে কত বড়ো ভূমিকা রয়েছে তা এক কথায় বলা অসম্ভব। ছোটদের কাছে অল্প পরিসরেই মোটামুটিভাবে ভারতীয় পুরাণ, মহাভারতীয় বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়া গেছে এই বইতে। কী বলেন নি উপেন্দ্রকিশোর! তিনি যা যা বলেছেন- সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা, মনু ও আশ্চর্য মাছের কথা, মহাভারতের কথা, দেবতা আর অসুরের কথা (সুন্দ ও উপসুন্দের কথা, তিলোত্তমা, কচের কথা, সমুদ্র মন্তন, রাহুর কথা, দধীচির কথা, দেবসেনার কথা, ঋন্দের কথা), কদ্রু ও বিনতার কথা, সর্পযজ্ঞের কথা, সাগরে জল আনিবার কথা, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা, দুশ্মন্ত ও শকুন্তলার কথা, রুরু ও প্রমদ্বরার কথা, নল ও দময়ন্তীর কথা, সত্যবান ও সাবিত্রীর কথা, পরীক্ষিত ও সুশোভনার কথা, বামদেব ও বামীর কথা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা। এছাড়াও বলা হয়েছে পরাশর, অষ্টাবক্র, পরশুরাম, নচিকেতা প্রমুখ ঋষিদের কথা। কিন্তু এগুলির পাশাপাশিও বেশ কিছু মহাভারতীয় নৈতিকতার আখ্যান রচনাকার এই বইটিতে লিখেছেন।

এগুলির সঙ্গে অবশ্যই শিশুদের মতো করে ভাষা ব্যবহার এবং উপস্থাপনও করা হয়েছে। মহাভারতের এই গল্পগুলির ভূমিকা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। কারণ আজ যে শিশু, সামনের দিনে সে পরিণত মানুষ। পরবর্তী সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রেও এই নাগরিকই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই সার্বিক বড়ো মনের মানুষ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহাভারতের এই আখ্যানগুলি যা রচনাকার উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বইতে উপস্থাপন করেছেন, তা এই কারণেই অমূল্য সম্পদ বলে আমাদের মনে হয়। আখ্যানগুলি হল- উশীনরের পরীক্ষা, কুশিকের সহিষ্ণুতা, গৌতমীর ক্ষমা, ধূর্ত শেয়াল, বাঘ আর শিয়ালের কথা, মহর্ষি ও কুকুরের কথা, তিন মাছের কথা, ব্যাধ ও কপোতের কথা, ডাকাত ব্রাহ্মণ ও ধার্মিক বক, কৃতজ্ঞ শুকপাখি, জুতা আর ছাতার জন্ম। এগুলি ছাড়াও তিনি সন্দেশ পত্রিকায় যে সব পৌরাণিক গল্প লিখেছিলেন, তার মধ্যে ‘পৃথিবীর পিতা’, ‘ত্রিপুর’, ‘অগস্ত্য’, ‘গঙ্গা আনিবার কথা’ (১৩২০, বঙ্গাব্দ), ‘সাগরের রাজা’, ‘সূর্যের গৃহিণী’, ‘রৈবতীর বিবাহ’, ‘সাপ রাজপুত্র’ প্রভৃতি মহাভারত থেকে সংকলিত।

৫.৩।।গ। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং সুবোধ চন্দ্র মজুমদার এবং অন্যান্যরা

রবীন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী’র পর শিশুদের মহাভারত রচনাকারদের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার। এদের বইগুলির নাম হল যথাক্রমে- ছোটদের মহাভারত, ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত, মহাভারত কাহিনী, মহাভারতের গল্প এবং ছোটদের মহাভারত।

ছোটদের জন্য কোনও কিছু লেখা সর্বদাই একটু চ্যালেঞ্জেরই বটে। কারণ সমাজনীতি থেকে রাজনীতি বড়োরা সবকিছুই কমবেশি বোঝে। কিন্তু ছোটদের বিষয়গুলি একটু অন্যভাবে পরিবেশন করতে হয়, নাহলে একেবারে এড়িয়ে যেতে হয়। আবার ছোটরা বা শিশুরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিক। দেশের ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই পরবর্তীতে এগিয়ে যাবে। ভালো বা খারাপ কোনও একটি বিষয় শিশুকে বোঝানো গুরুজনদেরই কর্তব্য। তাই ছোটদের বা শিশুদের সমস্ত প্রকার বিকাশকেই অভিভাবকদের কঠোর নজর রাখতে হয়। ছোটদের জন্য লেখা সকল গ্রন্থেরই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকেই। কারণ ছোটদের জন্য লেখা এই বইগুলিতেই নৈতিকতা, ঔচিত্য, সততা, করুণা, সর্ব জীবে দয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি শেখানো হয়। কখনও তা উপদেশ আকারে, অথবা কখনও সেটি পরোক্ষভাবে কোনও গল্পের মাধ্যমে। তাই ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যে নির্ভেজাল আনন্দ দানের পাশাপাশি সব সময়ই তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে শিক্ষাদানের কিছু

কৌশল। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে রামায়ণ ও মহাভারত এবং ভারতীয় পুরাণ শিশু মনে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় বোধ তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভাবনার এই স্তর থেকেই উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বর্তমানের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেকেই ছোটদের জন্য একটি মহাভারত রচনা করেছেন। মহাভারতের একাধিক জটিল বিষয়কেই নিজেদের মতো করে তা ছোটদের উপযোগী করে রচনাকারেরা পরিবেশন করেছেন।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ময়দানে অর্জুনের পরিণতি খুবই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ হয়েছিল। বেচারি অর্জুন কি ভয়ানক মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সংকটেই না পড়েছিল! শেষ পর্যন্ত এই ধর্মযুদ্ধই তো ত্যাগ করতে বসেছিল সে। ঠিক তখনই কৃষ্ণ তার যুদ্ধ বিমুখ অবস্থা থেকে চেতিয়ে তোলবার জন্য আস্ত ভগবদ্গীতা আওড়ে দেন। বস্তুতপক্ষে গীতা প্রক্ষিপ্ত নাকী মহাভারতেরই অংশ- তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। যদিও এই বিতর্ক অতিক্রম করেও এই কথা বলতেই পারি যে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অনেক যুগের ও অনেক কালের চর্চার ফসল এই গীতা। আমাদের ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় অনুশাসন পর্ব, শান্তি পর্বের মতো গীতাও ব্যক্তি মানুষের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক গভীর সমস্যার সমাধান দেয়। আমাদের বিদ্যায়তনিক স্তরের চর্চায় গীতার অনেক বিষয়কেই বিতর্কের ওপরেও রাখা হয়নি। অনেকেই মনে করেন শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিতে অর্জুন সম্পূর্ণ মাত্রায় তৃপ্ত হতে পারেনি, তাই তার বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, এই বিতর্ক এই স্থানে অমূলক। যদিও শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় গীতার কর্ম যোগ, জ্ঞান যোগ, আত্ম-সংযম যোগ, কর্ম-সন্ন্যাস যোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, অক্ষর-পরব্রহ্ম যোগ, ভক্তিযোগ এবং মোক্ষ-সন্ন্যাস যোগ ইত্যাদি অধ্যায়গুলির গুরুত্ব কোনওমতেই লঘু হয় না। কিন্তু, সমস্যা হচ্ছে শিশুদের কীভাবে এগুলি বলা যাবে? শিশুরা কি এগুলো বুঝবে? নাকী তাদের বোঝানো আদৌ সম্ভব? তাই এখানে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বইতে লিখেছিলেন:

তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিয়া, তাঁহা দ্বারা যুদ্ধ করাইতে, কৃষ্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ দেন, তাহাতে ‘ভগবদ্গীতা’ নামক অমূল্য পুস্তকই হইয়া গিয়াছে; বড় হইয়া তোমরা তাহা পড়িবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মন শান্ত হওয়াতে, আবার তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ আসিল।^{২১}

তবে স্বামী অমলানন্দ তাঁর ১৯৬৯ সালে লিখিত *মহাভারত কাহিনী* নামক বইতে গীতা বিষয়টি দু’একটি কথার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের মতো বলেননি যে ছোটরা বড়ো হয়ে বইটি পড়বে। কিন্তু, তিনিও গীতার সমগ্র অংশের সারসংক্ষেপ বলে যেতে পারেন নি। হয়তো ছোটদের ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলেই। শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ অমলানন্দ এই প্রসঙ্গে

বলেছেন তবু সামান্য দুই একটি কথা। এই অল্প কথার মধ্যেই তিনি বুঝিয়েছেন ছোটদের গীতার মর্মার্থ:

শ্রীকৃষ্ণ ভরসা দিয়ে বললেন, ‘ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। তুমি কাপুরুষ হয়ো না। হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ কর। ওঠ, যুদ্ধ কর।’ কিন্তু অর্জুন উত্তরে বললেন, ‘ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহানুভব গুরুজনদের আমি বধ করব কি করে? স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও আমি তা পারব না।’ কৃষ্ণ বোঝাতে লাগলেন অর্জুনকে ‘দেহ তুচ্ছ বস্তু। কারণ দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেহের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তাই হলো জীবের প্রকৃত সত্তা। আত্মার মৃত্যু নেই। শরীর নষ্ট হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। কাপড় জীর্ণ হয়ে গেলে যেমন তা ফেলে দিয়ে মানুষ আর একখানি নতুন কাপড় পরে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেলে আত্মা তেমনি একটি নতুন দেহ গ্রহণ করে।’^{২২}

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন, ‘অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই তোমার ধর্ম। সেই ধর্ম লঙ্ঘন করো না। তোমার ফলাফলের দিকে তাকিয়ো না। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলাফলে নয়। ফলাফল ভগবানের হাতে অর্পণ কর।’...অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য শ্রীভগবান্ যুদ্ধক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়েছিলেন- তাই পরে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।^{২৩}

আবার অপর এক জনপ্রিয় ছোটদের মহাভারত গ্রন্থের লেখক খগেন্দ্রকুমার মিত্র গীতার বিষয়টি একেবারেই বলার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। মাত্র দুই লাইনে কাজ সেরেছেন। তিনি বললেন- ‘শ্রীকৃষ্ণ যখন নানা উপদেশ দিয়ে তাঁর মনে বল সঞ্চার করতে লাগলেন। এই উপদেশ গীতা। উপদেশ শুনেই অর্জুন যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন।’^{২৪} যোগীন্দ্রনাথ সরকারও তাঁর ছোটদের মহাভারত বইতে গীতার স্বরূপ বলতে গিয়ে বলেছেন- ‘যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশক্রমে অর্জুনের মন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গাণ্ডীব লইয়া প্রস্তুত হইলেন। সেই সকল অমূল্য উপদেশ তোমরা বড় হইয়া ‘শ্রীমদ্ভগদগীতা’য় দেখিতে পাইবে।’^{২৫} আবার শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বইতে গীতা সম্পর্কে বাকিদের থেকে অল্প বেশিই বলেছেন। একেবারে গীতাকে সম্পূর্ণ মাত্রায় এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাঁর বইয়ের ১৫/২০ লাইনের মধ্যে গীতাকে ছোটদের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ধর্ম, অধর্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সম্পর্কে সহজ ভাষায় কিছু কথা বলেছেন।^{২৬} আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমাদের মহাভারত বইতে দেখতে পাই গীতা সম্পর্কে সুনীল বলছেন যে, যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে কৃষ্ণ অর্জুনকে যেগুলি বলেছিলো তাকে গীতা বলে। তবে এটা পৃথক বই আকারেও পাওয়া যায়। অনেক হিন্দুর মতে এটা তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। যদিও অনেকেই সেটি না পড়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে।’^{২৭} আমাদের রীতিমতো অবাক হতে হয় যে সুনীল গীতার কোনও কথাই সেভাবে বললেন না। ছোটদের অসুবিধার বিষয়টি সম্পর্কে জানার ফলে এভাবে তিনি বলতে পেরেছেন। এই একই বিষয়ে মহাভারতের

শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব সম্পর্কেও সত্যি। গীতাকে নিয়ে বলতে গিয়ে যেমন ছোটদের মহাভারত রচনাকারদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে, ঠিক তেমনি মহাভারতের অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব সম্পর্কে ছোটদের কেমনভাবে উপস্থাপন করা হবে তা নিয়েও যথেষ্টই চিন্তিত ছিলেন ছোটদের মহাভারত রচনাকারেরা। যেমন ধরা যাক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বামী অমলানন্দ মহারাজের কথা। ওই দু'টি পর্বের উপদেশসমূহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন- ‘তারপর কয়েকদিন ধরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিলেন। রাজধর্ম কি? সত্যাসত্য কি, পাপ-পুণ্যই বা কি? মানুষের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়- এক একটি প্রশ্ন করেন যুধিষ্ঠির আর জ্ঞানগর্ভ ও সুললিত ভাষায় তার উত্তর দেন পিতামহ ভীষ্ম। রাজধর্ম, আপদ্রম ও মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে ভীষ্মের উপদেশগুলি মহাভারতের অমূল্য রত্ন’।^{২৮} শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বইতেও মহামূল্যবান এই পরামর্শগুলি খুব একটা বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তিনিও মাত্র দুই পৃষ্ঠাতেই মূল গল্পটিকে বলে দিয়েছেন। কারণ এছাড়া সত্যিই খুব একটা কিছু করার নেই। তিনি বলেছেন- ‘রাজার ধর্ম কী, সত্য কী অসত্য কী, পাপ কী পুণ্য কী- মানুষের কর্তব্য কী অকর্তব্য কী। যুধিষ্ঠির একটি একটি করে প্রশ্ন করেন, ভীষ্ম ক্ষীণকণ্ঠে একটি একটি করে উত্তর দেন। সব উপদেশের শেষে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সব মানুষই ধর্মের কথা বলে এবং জানতে চায়; পিতামহ, মানুষের এই ধর্ম কী?’^{২৯} যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর মহাভারতের বইতেও এই বিষয়টি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। স্বামী অমলানন্দ বা শশিভূষণ দাশগুপ্ত যদিও বিষয়গুলি একটু ছুঁয়েছেন, সেখানে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় বললেন- ‘ইহার পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন। সে-সকল অমৃতমাখা কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বুক জুড়াইয়া গেল’।^{৩০}

আবার আমরা হিংসা বা হত্যার মতো ঘটনাগুলি শিশুদের থেকে এড়িয়ে যাই। কারণ এগুলির নেতিবাচক প্রভাব ছোটদের অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে। তাই মহাভারতে যুদ্ধের হিংস্রতা বা খুবই হিংস্র উপায় কাউকে হত্যা করার বিষয়টিকে কমবেশি সমস্ত লেখকরাই সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। অথবা মাত্র দু’এক লাইনেই কাজ সেরেছেন। যেহেতু মহাভারতে হিংসার বহুল ছড়াছড়ি আছেই, তাই সমস্ত হিংসার আখ্যানকে কারোর পক্ষেই বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং চেষ্টা করা হয়েছে যতটা কম উপায়ে এবং ওপর ওপর পাশবিক হিংস্র আখ্যান উপস্থাপন করা যায়। বিস্তারিত বিবরণ দেওয়াই হয়নি। কারণ একুশ শতকে মনোবিজ্ঞানের প্রভূত বিকাশ ঘটেছে, শিশুর মনের ওপর কোন কোন বিষয় কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া ফেলে তা সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা প্রতিনিয়তই এগিয়ে চলেছে। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি টিভির ভার্চুয়াল কার্টুনের চরিত্রগুলির মধ্যে হিংস্রতা দেখতে দেখতে বাস্তবে ঘটতে থাকা হিংস্রতার মধ্যেও শিশু অদ্ভুত আনন্দের উপাদান খুঁজে পায়। ভার্চুয়াল জগতের পাশবিক হত্যা ও আগ্রাসন শিশু এভাবেই উপভোগ করতে শেখে। এর ফল হয় অত্যন্ত ভয়ানক, ভার্চুয়াল মাধ্যমে শেখা এই সকল

অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলি বাস্তবের মাটিতে শিশু অনেক সময়তেই প্রয়োগ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। হারিয়ে ফেলে ন্যায়-অন্যায় এবং ঔচিত্যের যাবতীয় বোধ। তাই শিশুদের হিংসার বিষয়ে কোনও আখ্যান দেখানো বা শোনানো সর্বদাই খারাপ। কিন্তু মহাভারতের ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে হিংসা রয়েছে, তাই ছেলেদের মহাভারতের নানান আখ্যান যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই উক্ত বিষয়টি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। যেমন কথা প্রসঙ্গে যদি উপেন্দ্রকিশোরের *ছোটদের মহাভারত* -এর ভীষ্মপর্বের কথাই ধরি, তাহলে দেখতে পাই:

এই বলিয়া ভীষ্ম ক্রোধ ভরে এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে কাহার সাধ্য তাঁহার সামনে দাঁড়াই! চারিদিকে কেবল ‘হায় হায়!’ ‘রক্ষা কর!’ ‘বাবা গো!’ এইরূপ শব্দ। পাণ্ডবপক্ষের এক-এক যোদ্ধার নাম করিয়া তিনি বলেন, ‘এই তোমাকে কাটিলাম!’ আর অমনি তাহার মাথা কাটিয়া পড়ে! সেই বুড়া মানুষ তখন এমনি বেগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, তাঁহার বাণই কেবল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।^{৩১}

আবার যদি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *আমাদের মহাভারত* বইটি দেখি, তাহলে সেখানে দেখতে পাই অসংখ্য হিংসা ও হত্যাকে সুনীল সংক্ষেপেই প্রকাশ করেছেন। যা পড়ে শিশুরা হত্যা ও হিংসার ভয়াবহ কদর্য রূপ খুব একটা অনুভব করতে পারে না। হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন সুনীল। মহাভারতে এরকম অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে অভিমন্যুর মৃত্যুটিকে যদি আমরা তুলে ধরি, তাহলে দেখতে পাই সুনীল সেটি লিখেছেন একেবারেই হিংস্রতার আখ্যানকে দূরে সরিয়ে রেখে। অর্থাৎ সমস্ত মহারথীরা হিংস্র উপায়ে যা যা অবলম্বন করে অভিমন্যুকে হত্যা করেছিল, সেগুলি সুনীলের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই স্থান পায় নি। সুনীল লিখেছেন:

অনেকেরই ধারণা সাত জন মহারথী মিলে একসঙ্গে হত্যা করেছেন অভিমন্যুকে। তা অবশ্য ঠিকই।

তাকে ঘিরে ধরেছেন ছ’জন। তাঁদের কারওরই মৃত্যুবাণ অভিমন্যুর বুকে বেঁধেনি। অভিমন্যুর সঙ্গে শেষ লড়াইটা হয়েছিল দুঃশাসনের ছেলের। রক্তাক্ত শরীরে অনেক ক্লান্তি নিয়েও অভিমন্যু গদাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একসময় দুঃশাসনের ছেলে তাঁর মাথায় প্রবলভাবে একটা আঘাত করতেই তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। সেটাই তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সময়।^{৩২}

এরকম অনেক দৃষ্টান্তই আমরা দিতে পারি। যদি শশিভূষণ দাশগুপ্তের বইতে ঘটোৎকচের যুদ্ধের বিবরণ দেখি, তাহলে দেখতে পাই ঘটোৎকচের বীভৎস ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কমই কথা বলা হয়েছে। শশিভূষণ লিখেছেন— ‘কিন্তু ঘটোৎকচও এমনভাবে কুরুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগল এবং কর্ণকেও বিব্রত করতে লাগল যে কর্ণ ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠলেন।’^{৩৩} এক্ষেত্রে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার একেবারেই শিশু ও কিশোরদের মনের ভাষাকে কেড়ে নিয়ে লিখেছেন— ‘দলে দলে কত কৌরব-বীর যে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তাহা গনিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু অর্জুনের বাণে তাহাদের মাথা ধূলার ন্যায় উড়িতে লাগিল।’^{৩৪} আবার দ্রোণপর্বে ভীমের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথ যেন শিশুমনে বাস্তবিক অর্থেই এক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলেন। যুদ্ধের হিংসা ও হত্যালীলা এখানে একেবারেই প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয়নি। যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ‘কৌরবেরা আজ জয়দ্রথের মাথা রক্ষা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু ভীমের বিশাল গদার আঘাতে তাহাদের হাজার হাজার মাথা চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। এক এক করিয়া দুর্যোধনের একত্রিশটি ভাইকে তিনি যমালয়ে পাঠাইলেন। কাহারও সাধ্য হইল না যে, তাঁহাকে বাধা দেয়।’^{৩৫} আবার যোগীন্দ্রনাথ জয়দ্রথের হত্যার পরবর্তী সময়ে ভীমের পরাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন— ‘ভীমের কথা আর কি বলিব! তাহার হাঁটুর গুঁতো খাইয়াই কত লোক মাটিতে পুঁতিয়া গেল। লাথির চোটেই কত লোকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল। দুর্যোধনের আর নয়টি ভাইকে তিনি এমন করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন যে, তাহাদিগকে চিনিতে পারাই ভার!’^{৩৬}

এরপরে শিশুদের বা ছোটদের মহাভারত সম্পর্কিত যে বিষয়টি আমাদের উল্লেখযোগ্য লেগেছে সেইটি হল রচনাকারদের কখনভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য। যেটা বড়োদের রচনাগুলির থেকে শিশুদের মহাভারতকে পৃথক স্থান দেয়। উপেন্দ্রকিশোরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সরকার *ছোটদের মহাভারত* রচনা করেন উপেন্দ্রকিশোরের লেখার এক দশক পর। সময়টা ছিলো ১৯১৯ সাল। *ছোটদের মহাভারত* এই বইটিও পাঠক সমাজের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এর ভাষা ও উপস্থাপন পদ্ধতির জন্য। তিনি বইটিকে ব্যাসদেবের মহাভারতের মতো পর্ব বিভাজন করে সাজিয়েছেন। যেখানে আদি পর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত সমস্ত পর্বগুলি একেবারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমদিকে বইটির ৩৫ টি সংস্করণ শুধুমাত্র সিটি বুক সোসাইটি থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য প্রকাশকরা বইটি ছেপেছেন। আমাদের হাতে শেষ সংস্করণ যেটি এসেছে, সেটি হল শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত। তবে যোগীন্দ্রনাথ *ছোটদের মহাভারত* বইটি ছাড়া মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি বই লিখেছিলেন, যা এই অধ্যায়ে তালিকা নির্মাণের সময় আমরা সংযোগ করেছি। এক্ষেত্রে তাই বইগুলির নাম পুনরায় সংযোগের প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। যোগীন্দ্রনাথের মহাভারতে রাজকুমারদের রণকৌশল প্রদর্শনের যে দৃশ্য রচনাকার ফুটিয়ে তুলেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। সহজ সরল ভাষা ব্যবহার, শিশু মন মেলাতে পারে এমন উপমার ব্যবহার ও যথার্থ শব্দ চয়ন এবং ছোট ছোট বাক্যের নির্মাণ শিশু মনে অভূতপূর্ব ছাপ ফেলে। রণকৌশল প্রদর্শনের এই জায়গাটি যোগীন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে:

শেষে আসিলেন অর্জুন। যেমন বীরের ন্যায় চেহারা, তেমনি তাঁহার হাতের কায়দা। তিনি অগ্নিবাণে চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া, বরুণবাণে তখনই আবার তাহা নিভাইয়া ফেলিলেন; এক বাণে আকাশে বায়ু ও মেঘের সৃষ্টি করিলেন, এক বাণে বিশাল পর্বত গড়িলেন, এক বাণে নিজেই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া পর-মহুর্তেই আবার বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাণে কখনও রৌদ্র, কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি,— যেন বাজিকরের ভেলকি! লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল। শেষে অর্জুন এক বাণে আপনাকে এমন করিয়া লুকাইলেন যে, কেহ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। আশ্চর্য শিক্ষা! অর্জুনের জয়ধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া উঠিল।^{৩৭}

ঠিক একইরকম উপস্থাপনার ভঙ্গি ভীম দ্বারা কীচক হত্যা় আমরা দেখতে পাই। ছোটদের মনে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে এমন অশালীন কথাবার্তা যা কীচক দ্রৌপদীকে বলেছিলো— তা মোটের উপর এড়িয়ে গেছেন রচনাকার যোগীন্দ্রনাথ। অশ্লীল যৌন কথাবার্তা ও কুৎসিত ইঙ্গিত যা কীচক করেছিল সেইটি ছোটদের মহাভারত রচনার সময় রচনাকার যোগীন্দ্রনাথ আনেন নি। যথার্থ উচিত কাজই করেছেন তিনি। কিন্তু বিরাটনগরে কীচক বধ ঘটনাটিকে এমনভাবে রচনাকার উপস্থাপন করেছেন যেটা পড়তে পড়তে বর্তমান সময়ের শিশুদের জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘ছোট ভীম’- এর কথা মনে পড়তে বাধ্য। মনে হতে পারে ‘বাঁটুল দি গ্রেট’, ‘লিটল কৃষ্ণ’ বা ‘ভীম ও কৃষ্ণ’ নামক জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজগুলি। যেগুলি দেখে শিশুরা খুবই মানসিকভাবে আনন্দিত হয়, যখন দেখে ভীম অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে জিতছে এবং দুষ্ট লোকেদের শাস্তিস্বরূপ হয় যুদ্ধে পরাজিত করছে, নয়তো হত্যা করছে। শিশুরা রাষ্ট্রের ন্যায় ও নীতির জটিল সমীকরণ বোঝে না। বোঝে না তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দম্ভ। তারা শুধুমাত্র সাদা ও কালোর মতো ভালো লোক এবং মন্দ লোক— এই সমীকরণেই বিষয়টিকে দেখতে চায়। তাই যখন দুষ্ট কীচক ভীমের হাতে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তখন শিশুদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। যোগীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

তাঁহাদের কৌশলে ভুলিয়া শেষে রাত্রে কীচক সুন্দর বেশভূষা করিয়া নাট্যশালায় উপস্থিত হইল। ভীম অগ্রেই সেখানে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দ্রৌপদী ভাবিয়া কীচক যেমন দুই- পা অগ্রসর হইয়াছে, অমনি ভীম তাহাকে আক্রমণ করিলেন। কীচকও বড় সহজ বীর ছিল না, কিন্তু ভীমের কাছে পারিবে কেন? যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, কীচকের হাত, পা ও মাথা তাহার পেটের মধ্যে না ঢুকাইয়া ছাড়িলেন না। সে অবস্থায় দেখলে তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনে কাহার সাধ্য! ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড মাংসের পিণ্ড।^{৩৮}

ঠিক এরকমভাবেই ভাষার মিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে সুনির্মল বসু’র ছোটদের মহাভারত গ্রন্থে। গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ত ছন্দোবদ্ধ মহাভারতের অনুবাদ। তিনি লিখেছেন:

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-শেষে হাহাকার ওঠে,/ হস্তিনায় বেশী কেউ বেঁচে নাই মোটে।/ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র
গান্ধারী সে রানী/ পুত্রশোকে কেঁদে সারা শিরে কর হানি।/ তাঁদের একশো ছেলে সব মরে
রণে,/ স্বামী-হারা বধূগণ আকুলা ক্রন্দনে।^{৩৯}

আমাদের সমাজ জীবনে শৈশব বা কৈশোরকে নবরূপে নির্মাণ করেছে ঔপনিবেশিক যুগ। কারণ তার পূর্বে প্রত্যেক ছেলেমেয়েদেরই বিবাহ সম্পন্ন হতো প্রত্যেকের ছেলেবেলাতেই। সমাজ জীবনে গ্রামের চণ্ডীতলায় প্রত্যেক মানুষই একসঙ্গে শুনতে পারত মঙ্গলকাব্যের যাবতীয় কাহিনি, শিবের বীর্যপাতে পদ্মার জন্ম-কথা প্রভৃতি। ফলে যৌনতার কাহিনি বা যৌন সম্পর্কিত গল্প থেকে ছোটরা বাদ যেত এমনটা নয় একেবারেই। কিন্তু, ঔপনিবেশিক যুগ আমাদের শৈশবকে আলাদা বর্গে বিভাজন করে দিতেই হাজির হল একগুচ্ছ সমস্যা। ফলে শৈশব বা কৈশোরের নির্মাণের কথা মাথায় রেখে বাজারে এলো একাধিক যৌনতার আখ্যান মুক্ত গ্রন্থ। যাই হোক, সেই সব বইয়ের প্রসঙ্গে এখন আমরা যেতে চাই না। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দেখা দেয় আমাদের মহাকাব্যগুলি। বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কথা বলতেই হয়। মহাভারতে অসংখ্য নানাবিধ যৌনতার আখ্যান রয়েছে। কিন্তু, এই প্রসঙ্গ মহাভারতে এতই ছড়িয়ে আছে যে তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা মুশকিল। তাই ছোটদের মতো করে আবরণে আবড়ালে নবরূপে আখ্যানগুলিকে পরিবেশন করা হল। মহাভারতের অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

মহাভারতের বন পর্ব-তে যদি দৃষ্টি রাখি, তাহলে সহজেই দেখতে পাব এই পর্বের একটি বড়ো অংশ জুড়ে যুধিষ্ঠির বিভিন্ন মুনি ঋষিদের থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান শ্রবণ করেছে। যেগুলি পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ময়দানে ও রাজা হিসেবে সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকাংশে তাকে সহায়তা করেছেও বটে। এছাড়াও বনপর্বে-র এই আখ্যানগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের গভীর সত্য, যা যুধিষ্ঠির দীর্ঘ বারো বছর ধরে বাধ্য ছাত্রের মতো শুধুই শিখেছে। ছোটদের মহাভারত সংকলনের সময়ে অধিকাংশ রচনাকারেরাই এই সমস্ত অমূল্য গল্পগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। যাই হোক, আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। এই বন পর্বেই লোমশ মুনির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে ভরদ্বাজ আর রৈভ্য নামে দুই ঋষির গল্প। এই ভরদ্বাজ মুনির পুত্র যবক্রীত এবং রৈভ্যের ছেলে ছিল পরাবসু। মহাভারতের মূল গল্পে ছিল একদিন বৈশাখ মাসে যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে কিন্নরীর মতো রূপবতী পরাবসুর স্ত্রীকে দেখতে পায়। যবক্রীত কামের বশে নির্লজ্জের মতো বন্ধু পত্নীকে বলে তাকে ভজনা যেন করা হয়। এরপর পরাবসুর পত্নী ভয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। কিন্তু, মহাভারতের এই গল্পটিকে যখন উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য তাঁর *মহাভারতের কথা* নামক বইতে 'যবক্রীতের তপস্যা' নামে লিখলেন, তখন যৌনতাকে ঢেকে শিশুদের উপযোগী করে রূপ দিলেন। তিনি লিখলেন: 'শেষে

একদিন যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমে গিয়া পশুর ন্যায় এমন জঘন্য অত্যাচার করিলেন যে, তেমন অত্যাচার কেউই সহিয়া থাকিতে পারে না।^{৪০} এখানে সহজেই দেখতে পাচ্ছি উপেন্দ্রকিশোর বিষয়টিকে ‘পশুর মতো জঘন্য কাজ’ বলে উতরে যেতে চাইলেন। এর মাধ্যমে শিশুদের কাছে যৌনতার বিষয়টি ঢেকে আখ্যানের বাকি অংশটিকে বলা গেল। আবার যদি আমরা লীলা মজুমদারের ‘মহাভারতের গল্প’ নামক বইটির কথা বলি, তাহলে দেখতে পাব এখানেও অনেকগুলি গল্পের পাশাপাশি ‘রৈভ্য ও ভরদ্বাজের গল্প’-ও আছে। এখানে লীলা মজুমদার উপেন্দ্রকিশোর এর মতোও বিশেষণে উপস্থাপন করতে চাইলেন না। সরাসরি লিখলেন- ‘দুঃখের বিষয়, ভরদ্বাজ যা ভয় করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই হল। রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে অত্যন্ত অসৎ আচরণের ফলে, রৈভ্যেরই প্রভাবে এক মায়া রাক্ষসের হাতে যবক্রীত প্রাণ দিলেন।’^{৪১} ফলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি শিশুদের মহাভারতে মূল যৌন প্রসঙ্গটিকে উত্থাপনের নানাবিধ সমস্যার কথাটি রচনাকারেরা একপ্রকার মেনেই নিয়েছেন। কারণ, যৌনতার বিষয়টিকে নানাবিধ অ-যৌন শব্দবন্ধে শেষ পর্যন্ত আটকে রেখেছেন রচনাকারেরা। বিষয়টি আমরা লীলা মজুমদার ও উপেন্দ্রকিশোরের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ দেখি না। অন্যান্য রচনাকারদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। এবার আমরা সেই প্রসঙ্গ উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

‘দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ’ মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূলত কৌরবদের লোভ ও লালসা সীমাহীন এই স্তরে না পৌঁছলে হয়তো মহাভারতের মহাযুদ্ধ হতো না। পাশা খেলায় যেমন ধর্মরাজ নিজের কর্তব্য ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছিল, ঠিক একইরকম ভাবে দুর্যোধন ও দুঃশাসন এবং কর্ণেরা শালীনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিল। প্রকাশ্য রাজসভায় সকল পুরুষ মানুষের সামনে যে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা ও আচরণ দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধনরা করেছিল, সেইটি মহাভারতের অন্যতম একটি কালো দিক। যাই হোক, এই অংশের সমস্ত কথাবার্তা ও ঘটনা মহাভারতের সকল গবেষক ও পাঠকেরা জানেন। তাই সে প্রসঙ্গে কথা বলার আবশ্যিকতা নেই। কিন্তু, সমস্যা হল মহাভারতের এই ঘটনা ছোটদের মহাভারতে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়? কারণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এমনিতেই মহাভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান বা বলা ভালো মহাভারতের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এর ওপরই কেন্দ্র করে এগিয়েছে। তাই শিশুদের কাছে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু, এই সমস্যার একটি দৈবী সমাধান মূল মহাভারতেই যেহেতু আছে, দ্রৌপদীকে শেষ পর্যন্ত বিবস্ত্র হতে হয়নি, তাই প্রায় সমস্ত ছোটদের মহাভারতের রচনাকারেরা শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণে ঘটা এই ঘটনাটিকে বলে দিয়েছেন। কিন্তু বাদ গেছে কর্ণ দ্বারা দ্রৌপদীকে অভিহিত করা ‘বেশ্যা’ বিশেষণটি এবং এরকম আরও অনেকগুলি ঘটনার বিবরণ। বস্ত্রহরণের ঘটনাটি সমস্ত শিশু সাহিত্যিকেরা তাঁদের অস্বস্তি ঢাকবার জন্য অথবা উপস্থাপনের ধরন কেমন হওয়া উচিত সেটি সম্পর্কে স্পষ্টতই তাঁরা কিছু ঠিক করে উঠতে পারেননি। তাঁরা

নিজেরাও এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব বেশ ভুগেছেন। যদি শিশুদের জন্য লেখা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী'র মহাভারত বইটির দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব এই ঘটনাটি অল্প কথায় সেরে তিনি মুক্ত হয়েছেন। বিস্তারিত লেখার দিকে তিনি যাননি। তিনি লিখেছেন:

কিন্তু দুঃশাসন তাঁর চুলের মুঠি ধরে কুরু-সভার মাঝখানে এনে হাজির করলেন। তাঁকে অকথ্য সব অপমান করা হল। কর্ণের কথায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরনের কাপড় ধরে টানাটানি করলেন। আর দুর্যোধন বললেন— দ্রৌপদী! পাণ্ডবরা সব ভীষণ গরিব। ওদের ছেড়ে তুমি আমাদের কাউকে বিয়ে করো।^{৪২}

তবে সব থেকে বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কারণ মূল মহাভারতে আমরা দেখেছি দুর্যোধন কর্ণের দিকে চেয়ে হাস্যসহকারে নিজের কদলীকাণ্ডের মতো বাম উরু দ্রৌপদীকে দেখিয়েছিল। তাই ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল দুর্যোধনের উরুভঙ্গের। যেহেতু পুরুষের শরীরের বাম উরু তার স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত। তাই ভেবে নেওয়াই যায় যে দ্রুপদ কন্যাকে দুর্যোধন তার এই অঙ্গ দেখানোর মাধ্যমে শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাই ফলস্বরূপ শরীরের নিচের অংশ গদা যুদ্ধে আঘাত করা শাস্ত্রসম্মত না হলেও ভীম উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা না করে পারেনি। বলা বাহুল্য, দুর্যোধনের এই প্রকাশ্য রাজসভায় উরু প্রদর্শনের বিষয়টিতে প্রচ্ছন্ন যৌন ইঙ্গিতের আভাস আছে। তাই ছেলেদের মহাভারত যাঁরা রচনা করেছেন, তাদের সবার মধ্যেই বিষয়টি উপস্থাপনের মধ্যে এক প্রকার অস্বস্তি ছিলই। রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতকাহিনি থেকে কুরুপাণ্ডব নামে যে মহাভারতের সংকলনটি শিশুদের জন্য রচনা করেন, সেখানেও দুর্যোধনের উরু প্রদর্শন এবং ভীমের দ্বারা উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা কোনও কিছুই উপস্থিতি নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

এ দিকে যখন দুঃশাসন সভামধ্যে একবজ্রা দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিল, তখন দ্রৌপদী একান্ত বিপন্ন হইয়া আতর্নাদ করিতে লাগিলেন। সেই বিপদে স্বয়ং ধর্ম অন্তরিত হইয়া দ্রৌপদীকে নানাবিধ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিলেন।^{৪৩}

তদর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভৎসনা করিয়া নিবারণ করিলেন। ভীমসেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ওষ্ঠাধর ক্রোধভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি করে করে নিষ্পেষণ করিয়া শপথপূর্বক কহিলেন, “হে ক্ষত্রিয়গণ, শ্রবণ করো, যদি আমি যুদ্ধে এই ভারতধম কুলাঙ্গার দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তবে আমি যেন পূর্বপুরুষের গতিপ্রাপ্ত না হই।”^{৪৪}

অর্থাৎ স্পষ্টই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যেও এই অস্বস্তি ছিলই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় দুঃশাসন কর্তৃক জোরপূর্বক দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে আনিয়েই ধর্ম দ্বারা দ্রুপদ কন্যার

লজ্জা নিবারণ করেছেন। তারপরেই ভীমের মুখ থেকে দুঃশাসনের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা প্রকাশিত হয়েছে। মূল মহাভারতে যা ছিল অর্থাৎ দুর্যোধনকে দেওয়া ভীমের হুমকি, সেইটি এখানে যুক্ত হয়ে গেছে দুঃশাসনের প্রতি ভীমের উত্তির সঙ্গে। এসব করেও বিষয়টিতে সম্পাদনার কাজ খুব একটা মসৃণ হয়নি রবীন্দ্রনাথের, একটা অস্বস্তি কোথাও যেন রয়েই গেছে।

এই একই সমস্যার বিষয়টি শশিভূষণ দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে স্বামী অমলানন্দ ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনাতেও সমানভাবে পাচ্ছি। স্বামী অমলানন্দ স্বাভাবিক কারণেই সন্ন্যাসী মানুষ। তিনিও দুর্যোধনের উরু দেখানোর বিষয়টি তাঁর রচনায় তুলে ধরেন নি। সোজাসুজি দুঃশাসনের রক্তপান এবং গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কথা বলা আছে। মহাভারতের শিশু পাঠকেরা বুঝতে পারে না দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের কারণ কি? অমলানন্দ লিখেছেন: ‘...ভীম কী আর করেন? সভায় দাঁড়িয়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন— “আমি এই দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করব এবং গদাঘাতে উরুভঙ্গ করব দুর্যোধনের। তা যদি আমি না পারি তবে আমার স্থান যেন পিতৃপুরুষদের সঙ্গে না হয়।”^{৪৫} সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *আমাদের মহাভারত* এর মধ্যেও দেখতে পাই দুর্যোধনের কোনও এক ‘অসভ্য ব্যাপার’ দেখেই ভীম এরকম প্রতিজ্ঞা করেছিল।^{৪৬} কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না দুর্যোধনের অসভ্য আচরণের জন্য ভীম দুর্যোধনের শরীরের যে কোনও অঙ্গ ভাঙতে পারত, কেন উরুকেই উদ্দেশ্য করে এমন প্রতিজ্ঞা ভীম করল তা ছোটদের কাছে অজানাই থেকে যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচিত *ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত* এও অনুরূপ ঘটনা দেখতে পেয়েছি। এখানে তিনি লিখেছেন- ‘ভীম তখন সভায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দুই বাহুর আশ্ফালন করে প্রতিজ্ঞা করলেন, “আমি এই দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করব, আর গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করব।”^{৪৭} বেচারী শশিভূষণের দুর্যোধন, একবারের জন্যও নিজের পোশাক সরিয়ে নগ্ন উরু দ্রৌপদীকে দেখায়নি, তবুও তাকে শুনতে হলো উরু ভঙ্গের হুমকি।

তবে এক্ষেত্রে মহাভারতের মূল বিষয়টিকে রক্ষা করেও শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেছেন যেই সমস্ত ব্যক্তির, তাঁদের মধ্যে সুবোধচন্দ্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার রয়েছেন। এঁরা কিন্তু দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কারণটি এড়িয়ে যাননি। হ্যাঁ, এঁরা এঁদের লেখায় উল্লেখ করেন নি দুর্যোধন তার কদলীকাণ্ডের ন্যায় উরুকে পোশাক সরিয়ে দ্রৌপদীকে দেখিয়েছেন বলে। কিন্তু, সুবোধচন্দ্র মজুমদার তাঁর *ছোটদের মহাভারত* বইতে লিখলেন- ‘তিনি হাসতে হাসতে দ্রৌপদীকে পা দেখালেন। ভীম তখন স্থির থাকতে পারলেন না।’^{৪৮} আমরা সহজেই বুঝতে পারছি পোশাক সরিয়ে নগ্ন উরু প্রদর্শনটিকে সুবোধচন্দ্র অশ্লীল মনে করেছিলেন। তাই তার পরিবর্তে উল্লেখ করেছেন ‘দ্রৌপদীকে পা দেখালেন’ বলে। এরকম

কাজ করেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকারও। তিনিও লিখেছেন- ‘ইতরের ন্যায় পা উঠাইয়া দ্রৌপদীকে অপমান করিতেও তিনি কুষ্ঠিত হইলেন না’।^{৪৯} অন্যদিকে উপেন্দ্রকিশোরও লিখেছেন- ‘যখন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়াও দুর্যোধনের মন উঠিল না, তখন হাসিতে হাসিতে আবার দ্রৌপদীকে পা দেখাইলেন- আবার তাহা দেখিয়া কর্ণ হাসিতে লাগিলেন- তখন ভীম আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না’।^{৫০}

শুধুমাত্র রাজা ও যুবরাজদের কাহিনি নিয়েই মহাভারত রচিত নয়। সেখানে স্থান পেয়েছে অনেক প্রান্তিক চরিত্র ও বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতাধর মানুষেরাও। মূল মহাভারতে তাদের যেভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে, ঠিক একইরকম ভাবে যদি আমাদের শিশু সাহিত্যিকেরাও তাঁদের লেখায় ওই সকল চরিত্রদের স্থান দিতেন, তবে আমাদের সামনে অনেকগুলি সমস্যা হাজির হতো। সম্ভবত সেই বিষয়গুলি ভেবেই মূল মহাভারতের থেকে অনেকটা আলাদা শিশুদের মহাভারত। একটু বিস্তারিতভাবে বলা যাক। প্রথমেই আসা যাক একলব্যের কথায়। সাধারণভাবে শিশুমনে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগিয়ে তোলার জন্যই আমাদের শিশু সাহিত্যিকেরা রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনানোর বিষয়ে জোর দিয়েছেন। কিন্তু, সমস্যা দেখা দেয় বেশ কিছু আখ্যানে। যেমন- একলব্যের গল্প। বালক একলব্য যে সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রচেষ্টায় বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, ওইটুকু বয়সেই শব্দভেদী বাণ যে নিক্ষেপ করতে পেরেছিল, তাকে শুধুমাত্র গুরুদক্ষিণার অজুহাতে নিজের সমস্ত প্রতিভার বিসর্জন দিতে হয়েছিল। ফলে এখানে কোন ন্যায় অন্যায়ের বোধ শিশু মনে পৌঁছবে? শিশুর কাছে আগাগোড়া পুরোটাই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকটের সূচনা করে। ফলে একলব্যের আখ্যান উপস্থাপন করতে গিয়ে আমাদের শিশু-সাহিত্যিকদের বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়েছে।

প্রথমে আমরা সন্ন্যাসী মানুষ স্বামী অমলানন্দে’র *মহাভারত কাহিনী* বইয়ের কথাই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাই *আদি পর্বে*’র মধ্যে ‘একলব্যের গুরুভক্তি’ নামে একটি আখ্যান স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, স্বামী অমলানন্দ তাকেই আদর্শ রূপ হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রের যে আনুগত্য ও সেবা সেটাকেই বড়ো করে দেখতে চাওয়া হয়েছে। স্বামী অমলানন্দ এই সম্পর্কে লিখেছেন:

গুরুদেবের এই নিদারুণ আদেশে একলব্য বিস্মিত হল- কিন্তু স্থির চিত্তে বুড়ো আঙুলটি কেটে দ্রোণাচার্যের পদতলে অর্পণ করল।

একলব্য পূর্বের মত আর অদ্বিতীয় ধনুর্ধর রইল না। কিন্তু পুরুষকার, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে একলব্য চরিত্র চিরকালের জন্য অদ্বিতীয় ও অবিনশ্বর হয়ে রইল।^{৫১}

স্বামী অমলানন্দের ভাবনার সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের। তাঁর রচিত *মহাভারতের নীতিগল্প* নামে বইটির মধ্যে ‘একলব্যের পুরস্কার’ নামে একটি গল্প আছে। একেবারে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মানসিকতার সঙ্গেই সরাসরি মিল পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। সমাজের প্রান্তিক বর্গের মানুষ হওয়ার জন্য একলব্যের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার হল— সেই সম্পর্কে বুক ফাটা অভিযোগ ও নালিশ তাঁর কলমে একটুও পেলাম না আমরা। তাঁর লেখা বই থেকে তাঁরই বক্তব্য একটু না উপস্থাপন করে পারলাম না। তিনি লিখেছেন:

এই ব্যাপারে দ্রোণকে যেন খুব স্বার্থপর ও নীচ বলে মনে হয়, না? কিন্তু তা নয়, একটু যদি ভেবে দেখো ত বুঝবে যে, তিনি নিজেকে ছোট ক’রেও একলব্যকে অমর করে রেখে গেছেন। এই এতকাল, শত শত বৎসর ধরে একলব্যের কাহিনী লোকে শুনে ও বলে আসছে; আর প্রত্যেকবারই একলব্যের গুণগান করা হচ্ছে। এইটাই হ’ল একলব্যের পুরস্কার। দ্রোণ জানতেন যে, একলব্য যত বড় বীরই হোক—যে-হেতু সে চণ্ডালপুত্র, অনার্য— সে কোন সুবিধাই পাবে না বীর বলে পরিচিত হবার। তার চেয়ে এ ঢের ভাল হ’ল। আজ আমাদের চোখে একলব্য কি কোন অংশে অর্জুনের চেয়ে ছোট বা কম বীর?^{৫২}

একলব্যের আখ্যান উপস্থাপনের এরূপ কিছু সমস্যা থাকার কারণেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত বই *কুরুপাণ্ডব* থেকে এই আখ্যান অন্তর্হিত হয়েছে। জায়গা পায়নি তা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা *ছোটদের মহাভারত* বইতেও। সুবোধচন্দ্র মজুমদার তাঁর *ছোটদের মহাভারত* বইতেও একলব্য আখ্যান রাখেন নি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর *ছেলেদের মহাভারত* বইতে একলব্যকে স্থান দেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি *মহাভারতের কথা* বইতে একলব্যের গুরুদক্ষিণা নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেখানে একলব্যকে নিয়ে সেরকম মতামত বা অভিব্যক্তি লেখকের প্রকাশ পায়নি। শুধুমাত্র একলব্যের পরিণতির জন্যই এক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখলেন— ‘অঙ্গুষ্ঠ গেল, সুতরাং একলব্যের আর তেমন আশ্চর্য রূপ তীর ছুঁড়িবার ক্ষমতা রহিল না, ইহাতে দ্রোণাচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন একলব্যও এই-সকল কথা ভাবিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।’^{৫৩} তবে এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরবর্তী সময়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *আমাদের মহাভারত* বইতে। ছেলেদের সোজাসুজিই সুনীল বলেছেন দ্রোণাচার্যের মহত্বের খাটো দিক সম্পর্কে। তবে শুধু তাই বলেই থেমে থাকেননি সুনীল, মিলিয়েছেন একলব্যের প্রতিভা ধ্বংসের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের করুণ মৃত্যুর যোগ সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য, অন্যান্য শিশুদের মহাভারত রচয়িতাদের থেকে সুনীল এক্ষেত্রে অনেকটাই আধুনিক, বিশ শতকের সময়োপযোগী ভাবনাই উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর কলমে। তিনি লিখেছেন:

যারা জঙ্গলে থাকে, শিকার করাই যাদের পেশা, তাদের বলে নিষাদ। আদিবাসীও বলা হয়। এই একজন নিষাদের ছেলে রাজকুমারদের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে, তা দ্রোণ চাননি বলেই একলব্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে যদি অনেক কিছু শিখতে পারে সেজন্য তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবু তার উপর এমন অবিচার করলেন দ্রোণ। বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেললে মানুষ আর যুদ্ধ করতে তো পারেই না, কোনও কিছুই শক্ত করে ধরতে পারে না। দ্রোণ অসাধারণ অস্ত্রগুরু ছিলেন বটে, কিন্তু মানুষটা তেমন মহৎ ছিলেন না। সেজন্য তাঁকে প্রতিফলও পেতে হয়েছিল।^{৫৪}

সমাজের প্রান্তিক মানুষদের প্রতি এরকম অনেক বঞ্চনা ও অবিচারের নানান নমুনা আমাদের মহাভারতে অনেকই আছে। তবে এটা শুধু মহাভারতেই নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর এবং জাতপাতের প্রভাবের নানান কুফলের দৃষ্টান্ত রামায়ণ সহ অন্যান্য কাব্যেও আছে। শিশুদের উপযোগী করে এগুলি উপস্থাপন করা খুবই সমস্যাডায়ক বিষয়। তাই অনেক সময় রচনাকারেরা এগুলি এড়িয়ে গেছেন অথবা নিজেদের স্বার্থের উপযোগী করে পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিবর্তনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই মূল মহাভারতের সঙ্গে সুবিশাল পার্থক্য রয়ে গেছে।

উপনিবেশের প্রভাব আমাদের ভাবনা চিন্তার জগতে বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর যেমন ভালো প্রভাব আমরা দেখতে পেয়েছি, ঠিক তেমনই এটির একাধিক সমস্যার দিকও আছে। আমাদের অনেক বড়ো দেশকে শাসন করার জন্য ইংরেজরা একাধিক নীতি গ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে অন্যতম ‘ডিভাইড এন্ড রুল’। ইংরেজ শাসনের পূর্বে আমাদের সমাজ জীবনের মধ্যে সেরকম বিভেদ ছিল না। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও রুচি আমাদের গ্রাম শহরের পার্থক্য দেখিয়ে দিল। সেখানে সাহেবদের দেখানো নীতিতে ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’ তত্ত্বে ভারতীয়রা নিজেদের দেখতে শুরু করল। ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও সাহেবদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকা তথা কলকাতা কেন্দ্রিক মানুষেরা নিজেদেরকে সামাজিকভাবে উচ্চ শ্রেণির ভাবতে লাগল এবং গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়-পর্বতে থাকা মানুষেরা ঠিক যেন শহরের বাবুদের মতো নয়। তাই তারা নিম্ন শ্রেণির মানুষ। বিষয়টা শুনতে খারাপ লাগলেও, বস্তুতপক্ষে এটি সত্য হয়ে দেখা যায়। তাই সমাজ জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যেও এর বহু প্রতিফলন ঘটতে আমরা দেখেছি। শিশুদের মহাভারতের অনুবাদগুলির মধ্যেও এগুলির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির থেকেই দু’একটি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সাধারণভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতাকে ‘সভ্য’ বা প্রগতিশীল হিসাবে অনেকেই ভেবে থাকেন। আবার শহর কলকাতার দূরবর্তী জেলাগুলিতে থাকা মানুষেরা ঠিক বাবুদের চোখে

‘সভ্য’ নয়, অসভ্য। তাই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষদের মুখের ভাষাকে আমরা রাক্ষসের মুখের ভাষা হিসেবে বসিয়েছি। কোনও একজন শিশুর উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারত পড়তে পড়তে তার এমনটা মনে হতেই পারে। উপনিবেশের শিক্ষা এভাবেই আমাদের প্রভাবিত করেছে। বর্তমানের মানুষও এই ভাবনায় অনেকাংশে বিশ্বাসী। ঠিক একইরকম ভাবে ছোটদের মহাভারত সম্পর্কিত যে সমস্ত বই শিশু সাহিত্যিকেরা লিখেছেন, তাঁরাও এই ভাবনায় বিশ্বাসী থাকার প্রমাণ পেয়েছি উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতেই। এখানে হিড়িম্ব মানুষের গন্ধ পেয়ে বলে- ‘বাঃ! কি এ মিঠঠারে গন্ধো! ও বোহিন্, ঝাট কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিড়ায়কে নাচ্চবো!’^{৫৫} আবার বক রাক্ষস ভীমকে তার বরাদ্দ খাবার খেতে দেখে বলে- ‘মোর ভাতটি খাইছিস্? তোকে যোম ঘর পেঠঠাইব নি?’^{৫৬} আবার উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতেই অলম্বস নামক রাক্ষস দুর্যোধনকে বলেছে- ‘হেই মোহার্রাজ্জ! মোকে বোল্‌না, মুহি পাণ্ডোধের্‌কে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পুকে মারিলেক্!’^{৫৭} সুবোধচন্দ্র মজুমদারের রচিত ছোটদের মহাভারত বইতে হিড়িম্ব রাক্ষসের ছবিটা একেবারে আফ্রিকার বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের মতো।^{৫৮} অন্যান্য ছোটদের মহাভারতের আখ্যানগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরাও কমবেশি একই পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে সচেতনভাবেই শহর কলকাতার বৃত্তের বাইরে থাকা মানুষদের আমরা নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই রাক্ষস বানিয়ে তুলেছি। বর্তমান সময়ের বাংলা উপভাষার ধরন দেখলে বোঝা যাবে উপেন্দ্রকিশোরের রাক্ষসেরা কথা বলছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বাংলা ভাষায়। এভাবেই অত্যাচারিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের আমরা আমাদের বৃত্তের বাইরে ঠেলে রাক্ষস হিসাবে দেখতে চেয়েছি। যেটা আমাদের বাস্তব জীবনের পাশাপাশি ছোটদের মহাভারতেও সমানভাবে দেখা গেছে।

তবে প্রচলিত ধারার বিপরীতেও পথ আছে। কিন্তু, সেইটির দৃষ্টান্ত খুবই কম। এই ব্যতিক্রমী ধারার বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ‘মহাভারতে নেই’ নামে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি আখ্যানের কথা। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে দেব সাহিত্য কুটীর থেকে আখ্যানটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র স্পষ্টই তাঁর শিশু পাঠকদের জানিয়ে দেয় ভীম ও হিড়িম্বের যুদ্ধ আসলে বাস্তবিকই গল্প। এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাভারতের আখ্যানকে সম্পূর্ণ উল্টো করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। গল্পে শক্তিশালী হিড়িম্ব ভীমকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল লড়াই করতে চাইলে ফাঁকা জায়গায় তাকে যেতে। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হিড়িম্ব এখানে অধিক শক্তিশালীর পাশাপাশি অধিক বুদ্ধিমানও বটে। উপনিবেশিকতা ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র উভয়কেই একহাত নিয়েছেন তিনি। পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসার পর যখন হিড়িম্ব ভীমকে ছেড়ে দেয়, তখন ভীম মিথ্যা আর্ঘ্য গর্বে গর্বিত হয়ে পাল্টা তাকে জানায় যে সে কোন যুক্তিতে ভীমকে ‘তুই’ বলে সম্বোধন করছে।^{৫৯} যেন ‘তুই-তোকোরি’ করার অধিকার শুধুমাত্র ভীমদের মতো মানুষদের জন্মগত অধিকার।

প্রেমেন্দ্র মিত্রে'র লেখায় তার ব্যতিক্রম হতেই আখ্যানের ভীম প্রতিবাদ করে উঠেছে। আমাদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মানসিকতায় যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে বয়সে ছোট মালিককেও বাড়ির গৃহ সহায়িকা 'আপনি' বলতে বাধ্য হয়, সেই ব্যবস্থাকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র একেবারে বিধ্বস্ত করে ছেড়ে দেন। এখানে ভীম হিড়িম্বকে ধমকে জানান দেয় উভয়ের মধ্যে মর্যাদাগত ও সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য অনেকটাই। ভীম নিজেকে রাজাদের বংশধর হিসাবে আখ্যা দেয় এবং হিড়িম্বাকে জংলী ও বনবাসী হিসাবে উপস্থাপিত করে। এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে ভীম মনু মহারাজের বর্ণাশ্রমের বেঁধে দেওয়া কাঠামোর মধ্যে থেকেই কথা বলতে চেয়েছে। তবে ভীমের মুখ থেকে 'চাকর' সম্বোধন শুনে হিড়িম্বাও এখানে হাসতে হাসতে জানিয়ে দেয় যে তারাও ভীমদের চাকর হিসেবে রাখবে না। যা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মুখে একপ্রকার ঝাঁটা মারার সমান। বস্তুতপক্ষে অরণ্যবাসীদের ও প্রান্তিক মানুষদের জোর করে বেঁধে চাকর বানিয়ে রাখার অভ্যাস ভীমের মতো সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে থাকা মানুষদেরই; হিড়িম্বারা কিন্তু নিজেরা ভীমদের উপর আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করেনি কখনোই। এভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্রে'র আখ্যানে 'তুই-তোকারি' থেকে 'জংলীপনা', প্রতিটি ক্ষেত্রেই উচ্চবর্গের গড়ে তোলা সামাজিক নির্মাণ তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। এভাবেই শিশুদের মহাভারতের অন্যরকম একটু উপস্থাপনা প্রেমেন্দ্র মিত্রে'র হাত ধরে আমরা পাই।

কৃষ্ণকে বা তার জীবনকে নিয়ে শিশুদের মতো করে একটি জনপ্রিয় বই লিখেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। তাঁর বইয়ের নাম কৃষ্ণ। মূলত কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, পুতনা বধ, কালীয় দমন, মাতুল কংসকে বধ প্রভৃতি চিরনতুন কাহিনিকে এই বইতে শিশুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। বলাই বাহুল্য, কৃষ্ণের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠার ঘটনাটি মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহাভারতের অনেক স্থানেই কৃষ্ণের বাল্যকালের যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাগুলির উল্লেখ রয়েছে। তাই মহাভারতে যে পুরুষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শন ও কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান আমরা পেয়েছি, তার শৈশব ও কৈশোর জীবনের ঘটনাসমূহ শিশুদের কাছে কম আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি বালক কৃষ্ণের জীবনের ওই সকল ঘটনাগুলির আকর্ষণ আরও বেড়ে যায় যখন লেখক সহজ ও সরল কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি একগুচ্ছ রঙিন ছবি বইয়ের মধ্যে ব্যবহার করেন। যে ছবিগুলিতে ফুটে উঠেছে বালক কৃষ্ণের মাখন চুরি, কালীয় দমন, কংসের মৃত্যুর দৈব বাণী, রাখাল বালকের বাঁশি বাজানো, বসুদেব ও দেবকীর শৃঙ্খল মুক্তি এবং কংসের সভায় কংস সহ অন্যান্য মল্লযুদ্ধে বীরদের পরাজিত করার ছবি। বলা বাহুল্য, ছোটদের জন্য কৃষ্ণ কাহিনি লেখার এর থেকে ভালো নিদর্শন হয়তো খুব কমই আছে। বইটির বিষয়ে কিছু কথা বলতে গিয়ে লেখক ভূমিকা অংশে বলেছেন:

আমাদের সময়ের অনেকের মতোই আমিও বাল্যে কৈশোরে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ডুবে ছিলাম। কৃত্তিবাস, কাশীরাম তো ছিলেনই, নিবেদিতাও ছিলেন রসপাত্র নিয়ে উপস্থিত। নিবেদিতার ‘ক্ল্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম্’ স্কুলে পাঠ্য ছিল, পড়িয়েছিলেন হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের অসাধারণ শিক্ষক সুধাংশুশেখর আচার্য। নিবেদিতার রচনাগুণে এবং শিক্ষক মহাশয়ের পড়ানোর গুণে ওই বইয়ের পৌরাণিক চরিত্রগুলি কল্পজগতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষত কৃষ্ণকাহিনিতে একেবারে মোহিত। পরে সুযোগমতো নিবেদিতার বইটির অনুবাদ আরম্ভ করেছিলাম। সেটি ছাপাবার সময়ে সচেতন হয়ে দেখি— সময় বদলেছে, আমাদের স্বপ্ন এখনকার ছেলেমেয়েদের চোখে নেই। এরা তথ্য চায়, জীবনের গতিশীল নাটক চায়। আশঙ্কা হল, নিবেদিতার অপরূপ রচনাকে সরাসরি অনুবাদে উপস্থিত করলে হয়তো টান থাকবে না। অথচ কৃষ্ণ কাহিনি লেখার একটা আগ্রহ ছিলই। লেখাটা তাই নতুনভাবে আরম্ভ করলাম, কাব্যপুরাণ থেকে কৃষ্ণের বাল্য-কৈশোর কথা আরও জেনে নিলাম, তাতে কল্পনা মেশালাম, দু’-একটা নতুন চরিত্রও এল, পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে কিছু মনোবিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার কিছু স্নিগ্ধ সখ্য ও বাৎসল্যরস। নিবেদিতার ভাবস্বপ্নের ভুবনপ্রস্থান তো রইলই।^{৬০}

আমরা মহাভারতের পাঠক বা গবেষক হিসাবে মহাভারতের বৃহৎ এই যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতির পাশাপাশি নৈতিকতার এক অমূল্য শিক্ষা পাই। বলা বাহুল্য, মহাভারতের মধ্যেই বিশেষ করে বনপর্ব এর কথা বলতেই হয়, এখানে সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে যুধিষ্ঠির ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও ঋষিদের আশ্রমে ঘুরে ঘুরে যে জীবন গড়ার শিক্ষা লাভ করেছিল, সেইগুলি আজও আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এগুলির গুরুত্ব এতটাই বেশি যে ভবিষ্যতেও তা চিরনতুন হয়েই থাকবে। নীতি, ধর্ম ও ঔচিত্য প্রভৃতি কথাগুলির ভার অনেক বেশি, অল্প কথায় বোঝা তো সম্ভবই নয়। কিন্তু শিশুদের কাছে মহাভারতের রসহীন তত্ত্বকথার গুরুত্ব একেবারেই নেই। শিশুরা জটিল তত্ত্ব বোঝে না। পিতামহ ভীষ্মের কাছে বসে যুধিষ্ঠির যে ধর্মের জ্ঞান লাভ করেছিল তা শিশুদের সহজ কথায় বলা খুবই সমস্যার। তাহলে কী শিশুরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে? এই প্রশ্নটি ভেবেই শিশুদের মহাভারত রচয়িতারা নিয়ে এলেন মহাভারতের মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলি, যেগুলি থেকে শিশুরা নীতি ও ধর্মের বোধ তাদের নিজেদের মতো করে বুঝে নিতে সক্ষম হবে। এই গল্পগুলির বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমৎকার। যেমন এগুলির মধ্যে আছে— যেমন কর্ম তেমন ফল, অহঙ্কারের ফল, শিক্ষায় একাগ্রতা, কর্তব্যে অবিচলিত— উশীনর ও শিবী, গৃহবিবাদের কু-ফল, পাণ্ডবদের মহত্ব, দুর্যোধনের অহমিকা, লোভের ফল, ভালো আর মন্দ, একলব্যের পুরস্কার, হঠকারিতার ফল, তিন মৎস্য, মৃষিক-মার্জার কথা, নকুলের উপাখ্যান, সাবিদ্রী ও সত্যবান, কুন্তী-বিদুলা, ভীম ও অজগর ইত্যাদি। মহাভারতের এরকম অনেক আখ্যানকে কেন্দ্র করে ছোটদের মতো করে গল্পগুলি লিখেছেন অনেকেই। আমরা তাঁদের থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু জনকে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি। এঁদের মধ্যে আছেন— গজেন্দ্রকুমার মিত্র (মহাভারতের নীতিগল্প), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (মহাভারতের

গল্প) এবং লীলা মজুমদার (মহাভারতের গল্প)। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের বইয়ের নিবেদন অংশে এই গল্পগুলির সম্পর্কে স্বামী সন্তোষানন্দ অসাধারণ কথা বলেছেন:

মनुষ্য-জীবনে যত রকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে এই গ্রন্থে তাহাদের সকলেরই বিশ্লেষণ ও অপূর্ব সমাধান দেওয়া আছে। মহাভারতের শিক্ষা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে কল্যাণকামীর পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য ছিল এখনও তদ্রূপই আছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি এমন কি মোক্ষমার্গ সন্ন্যাস ধর্ম পর্যন্ত এই মহাগ্রন্থে অতি নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা অবলম্বন করিয়াই সুন্দর সুন্দর গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। এই গল্পগুলির সাহায্যে অতি দুরূহ বিষয়ও সুনিপুণভাবে সাধারণের বোধগম্য করা হইয়াছে। মহাভারতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, ইহাতে উক্ত গল্পগুলি এত সুন্দরভাবে রচিত যে গল্পের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়টি আপনা আপনি অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আরও এক বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি গল্পেই একটি উচ্চ আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।^{৬১}

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ নিজেও তাঁর বইয়ের উপক্রমণিকা অংশে এই গল্পগুলির সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

আমাদের মূল শাস্ত্র বেদান্তে প্রধানতঃ জীবন ও বিশ্বের চরম সত্য, চরম জ্ঞান ও আনন্দের কথা এবং তা লাভ করার উপায়ের কথা বিবৃত হয়েছে। মন অনেকখানি তৈরি না হলে তার সব কথা ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই সর্বসাধারণের বোধ্যার মতো সহজ সরল করে সেই সব কথাই ইতিহাস, গল্প, উপকথা প্রভৃতির মাধ্যমে পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত এই জাতীয় একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। মহাভারত যুগ যুগ ধরে ভারতের সর্বসাধারণের হৃদয়ে উচ্চভাব সঞ্চার করে আসছে। উচ্চ নীচ সর্ব-স্তরের লোকই জীবন পথের যেখানে যে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে আর একটু উঁচুতে ওঠার অনুপ্রেরণা পেয়েছে এর মাধ্যমে। মহাভারত যুগে যুগে অমৃত বিতরণ করে আসছে গৃহস্থের কুটিরে কুটিরে, রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে, আবার সর্বত্যাগীদের তপোবনেও।..... ধনার্জন, বিষয়রক্ষা, লোকব্যবহার, রাজ্যপালন প্রভৃতি কিভাবে করতে হয়, মহাভারতে তাও বলা হয়েছে; আবার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীদের চিরকাম্য জ্ঞানের আকর বেদান্তদর্শনের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ গীতাও রয়েছে এই মহাভারতে।^{৬২}

.....সাজানো হয়েছে প্রথমে সাধারণ নীতি বিষয়ক কয়েকটি গল্প দিয়ে; পরে দেওয়া হয়েছে উচ্চতর জীবন গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল তথ্যের উদঘাটক কয়েকটি গল্প, এবং ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের মূর্ত প্রতীক মহীয়সীদের জীবন-কথা। শেষে দেওয়া হয়েছে জীবন ও বিশ্বের চরম সত্য সম্বন্ধে সামান্য আভাস। সব শেষে রয়েছে সমগ্র মহাভারতের মূল বক্তব্য, ভারতের প্রাণবাণী ‘ভারত সাবিত্রী’র ছন্দোবদ্ধ ভাবানুবাদ।^{৬৩}

কিছু গল্পের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বলা যাক। গজেন্দ্রকুমার মিত্র শিশুদের জন্য মহাভারতীয় যে দুইটি বই লিখেছেন, সেটার মধ্যে *শিশুদের মহাভারত* (১৯৪০) বইটির কথা বলতেই হবে। পরে এই বইটিকেই আরও ছোট করে লিখলেন *শিশু মহাভারত*। *শিশু মহাভারত* এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো এবং বইটি সচিত্র। শিশুদের সুবিধার্থে তিনি বইটিতে যুক্তাক্ষর প্রায় ব্যবহার করেন নি, তবে চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁকে যুক্তাক্ষর ব্যবহার করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বইটিকে তাই যুক্তাক্ষর-বিরল বই হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। *মহাভারতের নীতিগল্প* বইটির রচয়িতা গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাভারতে জ্ঞাতি বিরোধের কুফল সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য দুর্যোধনকে বিদুর একটি গল্প বলেছিল। সেই আখ্যানটি শিশুদের মতো করে সহজ সরল ভাষায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র ‘গৃহবিবাদের কুফল’ নামে তাঁর বইতে স্থান দিয়েছেন। গল্পটি হচ্ছে একদা দুইটি বড়ো পাখি ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ার পর দুইজন মিলেই সেই ফাঁদের জালটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু সময় পরে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া ও মতবিরোধ হওয়ার ফলে নিজেরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফলস্বরূপ ব্যাধ জাল ও পাখি দুটি উভয়ই পেয়ে গেল। এই গল্পের মধ্যে শিশুরা সহজেই বুঝতে পারে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংকটে সর্বদাই তৃতীয় পক্ষ লাভবান হয়। নিজেদের একতা ভেঙে গেলে বাইরের শক্তি সহজেই আমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। আবার নিজেদের মধ্যে একতা থাকলে ও ভুল বোঝাবুঝি যদি না থাকে তাহলে সর্বদাই জয়ী হওয়া সম্ভব। তাই বাইরের শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় গৃহবিবাদ না করাই বাঞ্ছনীয়। জয় তাহলে সহজেই ধরা দেবে। এ বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য গজেন্দ্রকুমার মিত্র ‘পাণ্ডবদের মহত্ব’ নামে আর একটি গল্প লিখেছেন, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বনবাসে কুটীরে থাকাকালীন পাণ্ডবদেরকে নিজেদের ঐশ্বর্য দেখানোর জন্য ঘোড়া, হাতি ও বিভিন্ন ধরনের অলংকার সহযোগে কৌরবরা অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করে। শেষ পর্যন্ত গন্ধর্বদের সঙ্গে মতের বিরোধ হওয়ার জন্য যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্যোধনেরা গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। তাই গন্ধর্বদের থেকে দুর্যোধনদের মুক্ত করার জন্য যুধিষ্ঠির তার ভাইদের আদেশ দেয়, ফলস্বরূপ গন্ধর্ব চিত্রসেনরা সহজেই ভীম ও অর্জুনদের হাতে পরাজিত হয়। পরাজিত কৌরবদের মুক্তি ঘটে এর ফলে। বিপদের দিনে এভাবেই সমস্ত প্রতিকূলতা ও পূর্বের মনোমালিন্য ভুলে যদি এক হওয়া যায়, তাহলে শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব। এভাবেই সহজ নীতিকথাটি গজেন্দ্রকুমার তাঁর গল্পের মাধ্যমে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করেন। গজেন্দ্রকুমার তাঁর গল্পে লিখেছেন:

কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমের এই উল্লাসে খুব বিরক্ত হলেন। বললেন, ‘ভাই ভীম, তোমার এই আনন্দ প্রকাশ করাটা বড়ই অশোভন হচ্ছে। আমাদের ভেতরে যত ঝগড়াই থাক, তারা আমাদেরই জ্ঞাতি ত! একই রক্ত আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বইছে। বাইরের লোক এসে আমাদের ভাইকে অপমান করে যাবে আর আমরা সহ্য করব! এ ত আমাদেরই অপমান!’^{৬৪}

আবার সঙ্গ দোষে স্বভাব নষ্ট হওয়ার উত্তম একটি নিদর্শন ‘ভালো আর মন্দ’ নামক গল্পটি। মহাভারত এখানেই মহান এবং সর্বোৎকৃষ্ট কারণ নৈতিকতার নিদর্শন এমন ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রে’র মতো সাহিত্যিকেরা আবার সেই গল্প থেকে জটিল অংশগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সরল অংশগুলি নিয়ে শিশুদের জন্য এরকম গল্প উপস্থাপন করেছেন। যাই হোক, গল্পে আমরা দেখতে পাই একজন ব্রাহ্মণ চণ্ডালদের মধ্যে থাকার ফলে ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণ সে হারিয়ে ফেলে, পরিবর্তে পশু-শিকার এবং মাংস আহার করার মতো বিষয়গুলিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে রাজধর্মা নামে এক বকের থেকে অনেক সাহায্য পাওয়ার পর তাকেই ব্রাহ্মণটি হত্যা করে নিজের খাবার বানিয়ে নেয়।^{৬৫} অন্যদিকে ‘হঠকারিতার ফল’ নামে গল্পটিতে দেখতে পাই কোনও কিছু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে নেই, একটু ভেবেচিন্তে ধীরে সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত। নাহলে অনেক বড়ো ভুল হয়ে যেতে পারে। গল্পে দেখতে পাই বাঘ তার মন্ত্রীদেব প্ররোচনায় পা দিয়ে কৃতজ্ঞ বন্ধু গোমায়ুকে বধ করে খেতে চাইল।^{৬৬} সর্বদা ধর্ম ও ন্যায়ের পথে থাকাটাই যে কাম্য তা বোঝানোর জন্য গজেন্দ্রকুমার মিত্র উপস্থাপন করেছেন উশীনর ও শিবির গল্পটি। শিশুদের মধ্যে আদর্শ ও সৎ চরিত্র গড়ে তোলার জন্য এই গল্পটি খুবই উত্তম। সর্বদাই কেউ জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় প্রদান করা একান্তই ধর্ম। উশীনর সেটাই করেছে, বাজপাখির হাত থেকে পায়রাকে রক্ষা করার জন্য সে নিজের শরীরের মাংস কেটে দাঁড়িপাল্লায় রেখেছে। উশীনরের পুত্র শিবিরও ব্রাহ্মণের কথা রাখতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নির্ধিধায় নিজের পুত্রকে হত্যা করে তার নরমাংস রান্না করিয়েছিল। যদিও তার ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে খুশি হয়ে ব্রাহ্মণরূপী বিধাতা শেষ পর্যন্ত তার পুত্রকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছিল।^{৬৭} ‘পরান্নপুষ্ট কাক ও হাঁসের গল্প’ নামে একটি আখ্যান গজেন্দ্রকুমার উপস্থাপন করেছেন যাতে শিশুরা বুঝতে পারে ক্ষমতা ও যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যদি নিজেকে অন্য কোনও ক্ষমতালীনের সমগোত্রীয় ভাবা হয়, তবে তার পরিণাম শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনকই হয়ে থাকে। আখ্যানে যেমন দেখতে পাই কাক নিজেকে হাঁসের সমগোত্রীয় ভাবার ফল কী করণই না হয়েছিল!^{৬৮}

ছোটদের মধ্যে নৈতিকতার গুণাবলী কীভাবে ঢোকানো যায় তা নিয়ে লীলা মজুমদারও সমানভাবে ভেবেছেন। এক্ষেত্রে তিনিও মহাভারতকেই অবলম্বন করেছেন। তাঁর বইতে আমরা বারোটি গল্প পেয়েছি। যেগুলি হলো- মহাভারতের রচনা, বৈবস্বত মনু আর মাছের গল্প, আয়োদধৌম্যর কথা, অষ্টাবক্রর কথা, রৈভ্য ও ভরদ্বাজের গল্প, উশীনরের গল্প, তপস্বী কৌশিক, যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন, নারদের বিচার, সমুদ্রমন্ত্ৰন, কিরাত এবং অর্জুনের কথা, ইন্ডল আর বাতাপির গল্প। এদের থেকে দু’একটির বিষয়ে কথা বলা যাক। যদি আমরা ‘আয়োদধৌম্যর কথা’ নামক গল্পটির কথাই বলি, তাহলে দেখব কীভাবে লীলা মজুমদার মহাভারতের একটি আখ্যানকে

সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের কাছে সংযম ও ধৈর্যের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছেন। যেখানে দেখতে পেয়েছি এক ঋষির তিনজন শিষ্য ছিল। যারা গুরুর দেওয়া কাজ যথার্থ নিষ্ঠা ও ভক্তি সহযোগে শেষ করেছে। আরুণি মাঠের আলে জলপ্রবাহ বন্ধ করার জন্য নিজেই আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়েছিল। উপমন্যু গুরুর আদেশ মতো কম খাবার খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত ঘাস ও পাতা খেয়ে থাকত। একদিন আকন্দ পাতার রস চোখে লেগে অন্ধ হয়ে গেলে সে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। তার অসীম ধৈর্য ও সংযম দেখে গুরু অত্যন্ত প্রসন্ন হয় এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের বর প্রদান করে।^{৬৯} 'রৈভ্য ও ভরদ্বাজের গল্প'-র মাধ্যমে শিশুদের সহজেই বোঝানো সম্ভব যে সাফল্যের জন্য ছোটখাটো কোনও রাস্তা হয় না, কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং ত্যাগই পারে উপযুক্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া যদি সংক্ষিপ্ত উপায়ে কেউ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করতে চায়, তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।^{৭০} লীলা মজুমদারের 'তপস্বী কৌশিক' গল্পটির মাধ্যমে ছোটরা সহজেই বুঝতে পারে ধর্মের স্বরূপ। মহাভারতের অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়কে গল্পের মাধ্যমে লীলা মজুমদার উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমাজ নির্দিষ্ট যে কর্ম রয়েছে, সেইটি মনোযোগ সহকারে করার নামই এখানে ধর্ম। লীলা মজুমদার ছোট ছোট বাক্যে, সহজ সরল ভাষায় ছোটদের ধর্মের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছে। তাঁর গল্পে ধর্মব্যাধ কৌশিক মুনিকে জানিয়েছে:

ধর্মব্যাধ বললেন, 'আমি ব্যাধের ঘরে জন্মেছি। আমার যা কর্তব্য, তাই করি। বুড়ো মা বাপের সেবা করি। সত্য কথা বলি। হিংসা করি না। যতটা পারি দান করি। দেবতা, অতিথি আর কাজের লোকদের খাইয়ে, যা বাকি থাকে, তাই খাই। আমি পশু মারি না। অন্যরা যা মারে, আমি তার মাংস বেচি। আমি মাংস খাই না। ওই মাংসে দেবতাদের, পূর্বপুরুষদের, গরিবদের, অতিথিদের, কাজের মানুষদের, বাড়ির পশুপাখিদের সকলেরই প্রতিপালন হয়।'^{৭১}

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ তাঁর *মহাভারতের গল্প* নামক বইতেও যে গল্পগুলি ছোটদের মতো করে উপস্থাপন করেছেন, সেখানেও মহাভারতের এই গল্পগুলির মাধ্যমে আদর্শ চরিত্র গঠন, ত্যাগ, নারীত্বের আদর্শ রূপ, জীবনের চরম লক্ষ্য, সঙ্গ প্রভাব এবং বিপদে কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সম্পর্কিত বিষয়গুলিই তুলে ধরেছেন। যেমন তাঁর 'মূষিক-মার্জার কথা' গল্পের মাধ্যমে শিশুরা বুঝতে পারে বিপদের সময় ধৈর্য না হারিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে স্থির বুদ্ধিতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করা যায়। এমনকী চরম বিপদের হাত থেকেও মুক্ত হওয়া সম্ভব।^{৭২} 'তিন মৎস্য' নামক গল্পেও শিশুরা বুঝতে পারে বিপদ হতে দুই ধরনের প্রাণী মুক্তি পায়। একজন যে পূর্বের ঘটনা প্রবাহ দেখে আগাম সচেতনতা অবলম্বন করে এবং অন্যজন যে বিপদের সময়ে উপযুক্ত কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু, যে বিপদ দেখেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে না; সে মুক্তি পায় না।^{৭৩} তিন মাছকে নিয়ে এই গল্পটি শিশুদের কাছে খুবই শিক্ষণীয়। যথার্থ পরিশ্রম, তপস্যা ও সংযম

বৃদ্ধিতে একজন মানুষ ক্ষমতাশালী ও মহান হয়ে ওঠে। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহাভারত থেকে অর্জুনের চরিত্র তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন কীভাবে ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রমের প্রভাবে একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়ে উঠতে পারে। দেখিয়েছেন তার লব্ধ জ্ঞান কীভাবে সমাজের মঙ্গলসাধন করতে পারে। আবার অশ্বখামার চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন অমঙ্গল ও লোভ এবং প্রতিশোধস্পৃহা কীভাবে একজন মানুষকে পৃথিবীতেই নরক যন্ত্রণা প্রদান করে। এভাবে এই গল্পগুলি ছোট শিশুদের উত্তম মানসিক গঠন ও উৎকৃষ্ট স্বভাব গঠনে সাহায্য করে। আবার ‘নকুলের উপাখ্যান’ গল্পটি সহজেই শিশুদের বুঝতে সাহায্য করে যজ্ঞ কতটা আড়ম্বরপূর্ণ হল, কতটা অর্থ ও গাভী ব্রাহ্মণদের দান করা হল তার উপর ভিত্তি করে যজ্ঞকে মহৎ বলা ঠিক নয়। যজ্ঞের উৎকর্ষের মাপকাঠিও তা হতে পারে না। যজ্ঞকর্তার আন্তরিকতা এবং ত্যাগের গভীরতাই যজ্ঞের উৎকর্ষের মাপকাঠি হওয়া উচিত।^{৭৪} স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ গল্পটির শেষ অংশে শিশুদের বোঝাতে চেয়েছেন যে সর্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীলতা, তপস্যা, সরল ব্যবহার, সত্য এবং ইন্দ্রিয়দমন- এগুলির মধ্যে কোনওটিই কিন্তু যজ্ঞের থেকে কম নয়।

শিশুদের মহাভারতের ওপর রচিত সচিত্র ও কার্টুনধর্মী বেশ কিছু বই ইতিমধ্যে বাজারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল- পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী’র *ছবিতে মহাভারত*, উত্থানপদ বিজলী’র রচিত *ছোটদের রঙিন মহাভারত* এবং স্বামী রাঘবেশানন্দ’র *সচিত্র মহাভারত* অন্যতম। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর ছত্রিশ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বইতে মহাভারতের আঠারো পর্বকেই ছবিসহ একেবারে ছোট শিশুদের জন্য উপযোগী করে লিখেছেন। বইটিতে স্থান পাওয়া প্রত্যেকটি ছবিই এককথায় যথার্থ। পাশাপাশি খেয়াল রাখা হয়েছে ছবিগুলির গুণগতমানের দিকেও, প্রত্যেকটি ছবি একেবারে সুস্পষ্ট এবং শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্টও বটে। সেইটা রাজকুমারদের দ্রোণাচার্যের অধীনে থেকে শিক্ষা গ্রহণই হোক অথবা ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের যুদ্ধই হোক। অর্জুনকে সামনে রেখে গীতাকে উপস্থাপন করাই হোক অথবা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য থেকে কর্ণ পর্যন্ত মহারথীদের হত্যাই হোক- মহাভারতের একেবারে মূল ঘটনার উপর ভিত্তি করে কাহিনিটি পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছেন।^{৭৫} শিশু সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বইটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল জুলাই ১৯৫৬ সালে, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য বার বইটির মুদ্রণ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বইটির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি। একইরকম ভাবে উত্থানপদ বিজলী’র রচিত *ছোটদের রঙিন মহাভারত* বইটির কথাও বলতে হয়। মাত্র ছাপান্ন পৃষ্ঠার বইটিতে লেখক বড়ো বড়ো চিত্র সহকারে সহজ ভাষায় মহাভারতের মূল ঘটনা ছোটদের বলতে চেয়েছেন। এই বইটির মূল আকর্ষণ বইটির মধ্যে থাকা বড়ো রঙিন ছবিগুলি, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি বয়সের শিশুদের সমানভাবে আকর্ষণ করে। দ্রৌপদীর বিবাহ সভায় অর্জুনের তীর

নিষ্ক্ষেপ, বকরূপী ধর্মের কথা না মানার জন্য যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডবের হতচেতন হয়ে যাওয়ার ঘটনাই হোক অথবা ভীষ্মের দিকে সুদর্শন চক্র সহকারে কৃষ্ণের এগিয়ে যাওয়াই হোক— প্রত্যেকটি ছবি শিশুদের আকর্ষণ করে।^{৭৬} বোঝার সুবিধার্থে আমরা ছবিগুলি এই অধ্যায়ে সংযোগ করে দিয়েছি।

তবে শেষ পর্যন্ত বলতেই হবে স্বামী রাঘবেশানন্দ রচিত *সচিত্র মহাভারত* নামে বইটির কথা। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বইটি প্রথম মুদ্রণ থেকেই শিশুদের কাছে মহাভারতের জনপ্রিয় একটি বই। মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত বইটি, এগুলির মধ্যেই মহাভারতের সবকটি পর্বই ধরানো গেছে। বইটিতে প্রচুর রঙিন ছবি লেখক ব্যবহার করেছেন। ভাষা একেবারে সহজ সরল এবং উপস্থাপন পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয় ধরনের। সচিত্র শিশুদের মহাভারত নিয়ে যে সমস্ত রচনাকার বই লিখেছেন তাঁদের থেকে রাঘবেশানন্দ-এর বই আয়তনে অনেকটাই বড়ো। তবে পাঁচটি খণ্ডে বই লিখলেও ইনিও মহাভারতের মধ্যে থাকা অন্যান্য গল্প ও আখ্যানকে উপস্থাপন করেন নি, মূলত বলে গেছেন মূল গল্পটিকেই। তাঁর মহাভারতের মধ্যে স্থান পেয়েছে অনেক ছোট ছোট মহাভারতীয় আখ্যান, শিশুদের জন্য যেগুলি খুবই আকর্ষণীয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম বেশ কিছু হলো— শান্তনু ও গঙ্গার বিবাহ, ভীষ্ম-মহাভারতের স্তম্ভ, রাজপরিবারে সংকট, দুর্যোধনের ঈর্ষা, একলব্যের গুরুভক্তি, অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব, ঘটোৎকচের জন্ম, জতুগৃহদাহ, নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বললেন, যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণের উপদেশ, জরাসন্ধ বধ, কৃষ্ণের শিশুপালবধ, যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেললেন, মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, ভীম-হনুমান সাক্ষাৎকার, জয়দ্রথের সাজা, কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান, যক্ষের প্রশ্ন, মৎস্যরাজ্যে পাণ্ডবদের প্রবেশ, দ্রৌপদীর উপর কীচকের লোভী-দৃষ্টি, কীচক বধ, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ, অপরাজেয় ভীষ্ম, দুর্যোধনের ক্ষোভ, প্রবল পরাক্রমী ভীষ্ম, অভিমন্যুর বধ, ঘটোৎকচের আত্মদান, কর্ণের মৃত্যু, কৃষ্ণ অশ্বখামাকে অভিশাপ দিলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন, ধৃতরাষ্ট্র বনে চলে গেলেন, কৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করলেন বৈকুণ্ঠে, পাণ্ডবগণ স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং স্বর্গে যুধিষ্ঠির। তবে এই বইতে ভীষ্মের মুখ থেকে যে সমস্ত উপদেশ যুধিষ্ঠিরকে বলা হয়েছে, সেগুলির থেকে বেশ কিছু উপদেশকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় শিশুদের জন্য উপস্থাপন করেছেন রচনাকার। মহাভারতের এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যুধিষ্ঠির বললেন, “প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বললেন, সব দায়িত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো রাজকীয় দায়িত্ব। দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়?”

উত্তরে ভীষ্ম বললেন, “তাহলে কর্তব্যের কথা আলোচনা করা যাক। রাজার সর্বোচ্চ কর্তব্য হলো সত্যবাদিতা। যে-রাজা সত্যবদ্ধ, তাঁর আর কিছুই দরকার লাগে না। রাজার সর্বক্ষণের চিন্তা হওয়া উচিত প্রজামঙ্গল। রাজাকে হতে হবে পরিশ্রমী। কাজ ছাড়া একজন বুদ্ধিমান রাজার কী-ই বা মূল্য? তাঁকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। স্কুলিঙ্গ থেকে যেমন দাবানল হতে পারে, এক বিন্দু বিষ যেমন একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে, তেমনই দুর্বলতম শত্রুও পারে আক্রমণ করে গোটা একটা রাজ্য দখল করে নিতে— যদি রাজা সতর্ক না থাকেন।”.....^{৭৭}

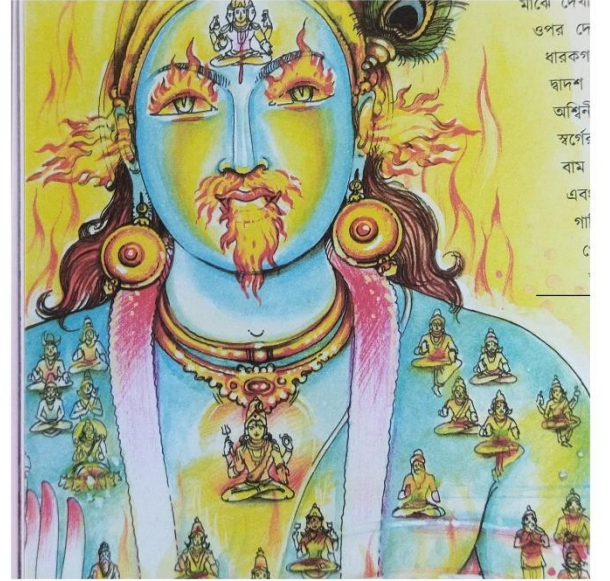
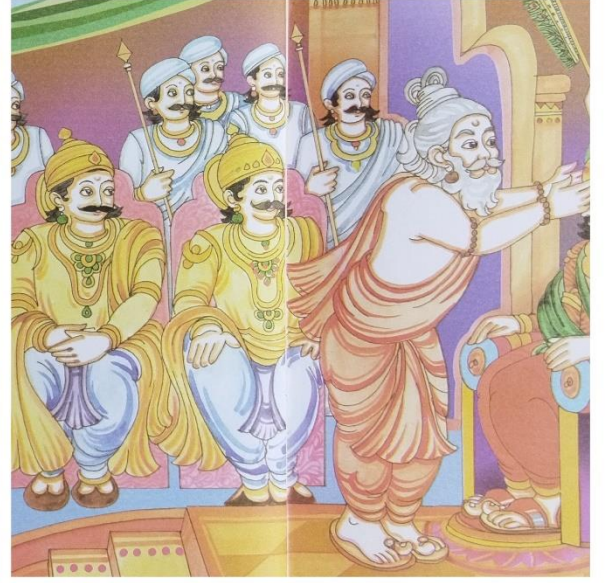
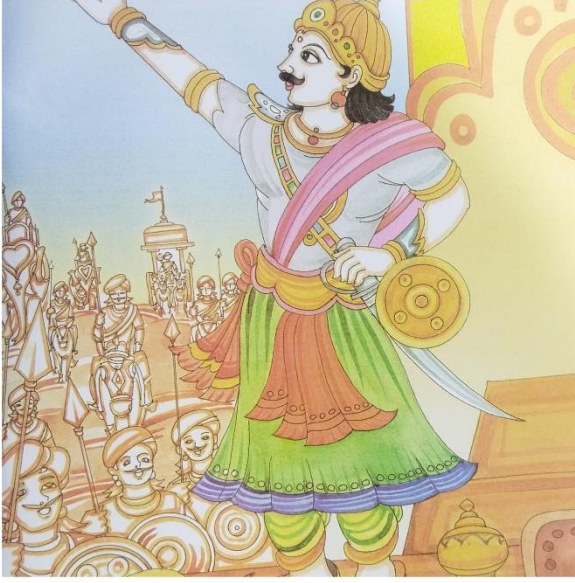
“অন্যায় কর্ম কী? এর মূল্যই বা কোথায়?”

“বাসনাই হলো অন্যায় কাজের মূল। বাসনা থেকে জন্মায় লোভ, আর লোভ থেকে আসে অসৎ কর্ম। সব শঠতা ও প্রবঞ্চনার মূলে রয়েছে লোভ। তাই বাসনা ও লোভ পরিত্যাগ করতে হবে।”^{৭৮}

অজগররূপী নহুষ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একগুচ্ছ বাক্য বিনিময় করেছিল। যে কথাগুলির মধ্যেও মিশেছিল অসংখ্য জ্ঞানের কথা। রাঘবেশানন্দ মহারাজ এখানেও সহজ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন:

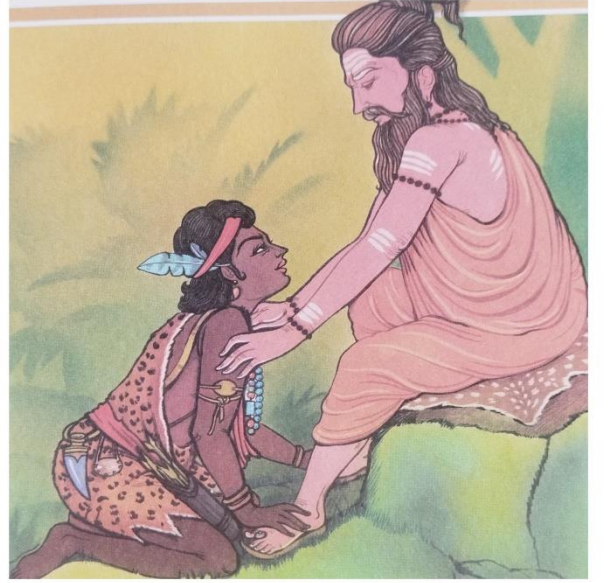
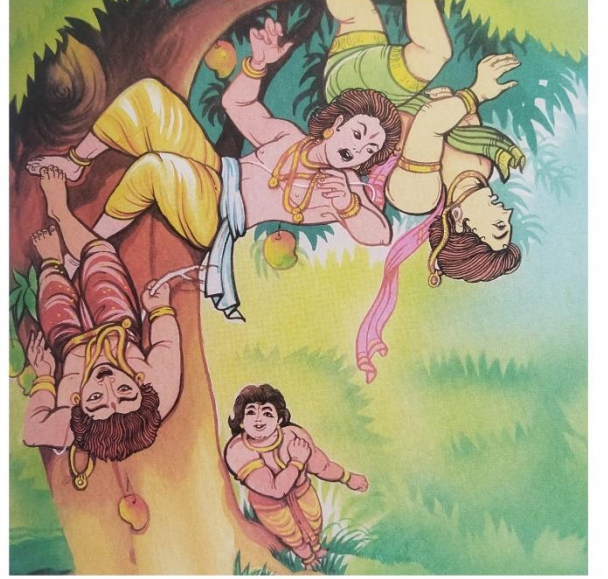
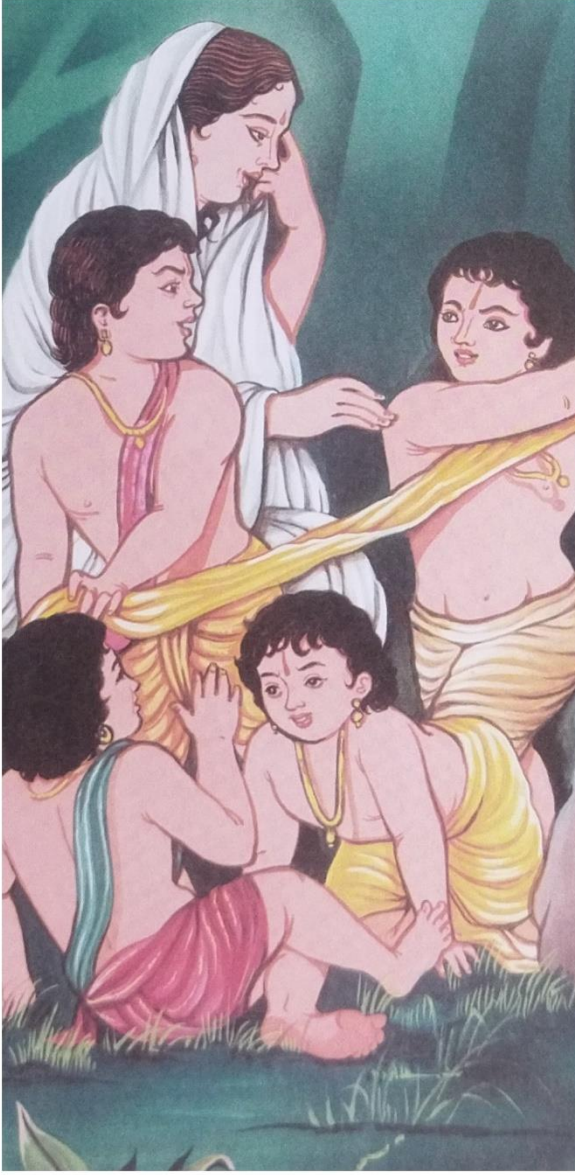
যুধিষ্ঠির বললেন, “আপনি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করব।” অজগর বলল, আমার প্রথম প্রশ্ন— ব্রাহ্মণ কে?” যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, “সত্য, দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। যে-শূদ্রে এসব গুণ থাকে তিনি শূদ্র নন, ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণে ওসব লক্ষণ থাকে না তাঁকে ব্রাহ্মণ না বলে শূদ্র বলাই উচিত।” অজগর বলল, “আমার পরের প্রশ্ন— এ-জগতে কার স্বরূপ জানা কর্তব্য?” উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, “সুখ-দুঃখহীন পরব্রহ্ম, যাঁকে লাভ করলে শোক থাকে না, তাঁর স্বরূপ জানাই কর্তব্য।”^{৭৯}

ছোটদের বা শিশুদের মহাভারত সম্পর্কিত যে কোনও গ্রন্থ রচনা করার কাজ অত্যন্ত কঠিন। শুধু তাই নয়, সচেতনভাবে সমগ্র কাজটি করার প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচিত শিশু সাহিত্যিকেরা প্রত্যেকেই শিশুদের মহাভারত রচনার কাজটি গুরুত্বের সঙ্গে করেছেন। এর পাশে ছবি ও কার্টুন সহযোগে যে সকল শিল্পীরা মহাভারতের গল্পগুলিকে শিশুদের কাছে রঙিন ও বর্ণময় করে তুলেছেন, তাদেরও এই বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা আছে এ কথা আমাদের বলতেই হবে।



স্বামী রাঘবেশানন্দ মহারাজের বইতে স্থান পাওয়া মহাভারতের নানান ছবি।

- ১। সেনাপতি হিসাবে কর্ণ যুদ্ধে যাচ্ছে।
- ২। যুদ্ধের পর সকল মুনি ও প্রজ্ঞাশীল মানুষের পরামর্শ নিয়ে রাজসিংহাসনে যুধিষ্ঠির বসল।
- ৩। ভীমের কীচক হত্যা।
- ৪। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ যা অর্জুনকে দেখানো হয়েছিল।

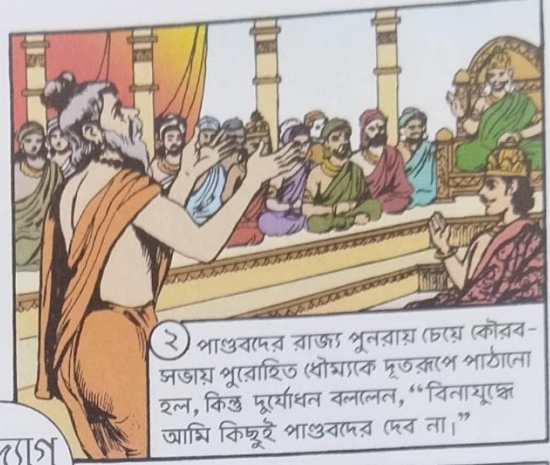


স্বামী রাঘবেশানন্দ মহারাজের বইতে স্থান পাওয়া মহাভারতের নানান ছবি।

- ১। কুন্তীর কাছে মানুষ হওয়া পাণ্ডবরা। বাল্যকালের ছবি।
- ২। ভীমের দ্বারা কৌরবদের প্রতি হওয়া কৌতুক ও অত্যাচারের চিত্র।
- ৩। একলব্য এর গুরু ভক্তি।



১) অতিমন্য ও উত্তরার বিয়ের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাজা দ্রুপদ প্রভৃতি পাণ্ডবহিতৈষীগণ কী উপায়ে পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য পুনরায় ফিরে পাবেন, তাঁরা মন্ত্রণা করতে বসলেন।

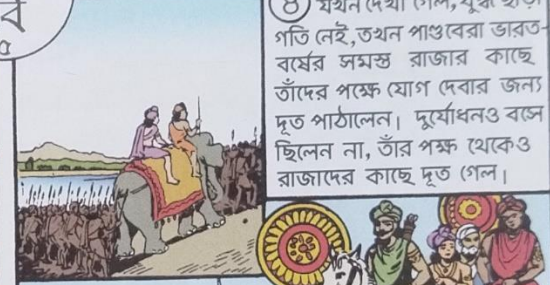


২) পাণ্ডবদের রাজ্য পুনরায় চেয়ে কৌরব-সভায় পুরোহিত ধৌম্যকে দূতরূপে পাঠানো হল, কিন্তু দুর্যোধন বললেন, “বিনাযুদ্ধে আমি কিছুই পাণ্ডবদের দেব না।”

উদ্যোগ
পর্ব
৫



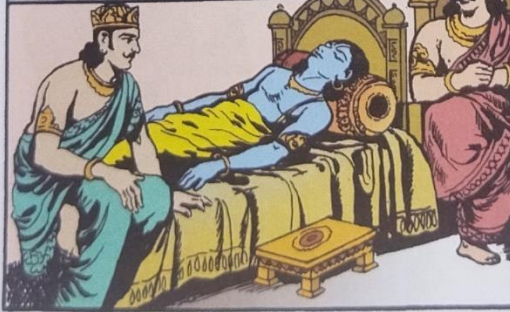
৩) মহামতি বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলেই দুর্যোধনকে অনেক রকমে যুদ্ধের কুফল বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্যোধনের এক কথা-যুদ্ধ-যুদ্ধ-আর যুদ্ধ!



৪) যখন দেখা গেল, যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই, তখন পাণ্ডবেরা ভারত-বর্ষের সমস্ত রাজার কাছে তাঁদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য দূত পাঠালেন। দুর্যোধনও বসে ছিলেন না, তাঁর পক্ষ থেকেও রাজাদের কাছে দূত গেল।



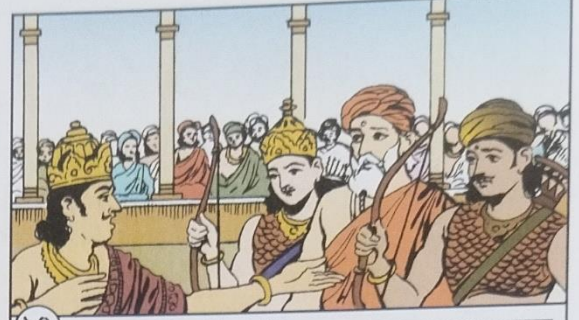
৫) শ্রীকৃষ্ণকে নিজ দলে পাবার জন্য দুর্যোধন ও অর্জুন দুজনেই দ্বারকায় গেলেন। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর মাথার কাছে একখানি সিংহাসনে দুর্যোধন বসলেন, আর অর্জুন বসলেন তাঁর পায়ের কাছে।



৬) ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথমেই অর্জুনকে দেখালেন, তাই তিনি যোগ দিলেন পাণ্ডব-পক্ষে। দুর্যোধনকেও তিনি নিরাশ করলেন না, তাঁকে দিলেন তাঁর দূর্ধর্ষ নারায়ণী সেনাবাহিনী।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী'র বইতে স্থান পাওয়া মহাভারতের নানান ছবি।

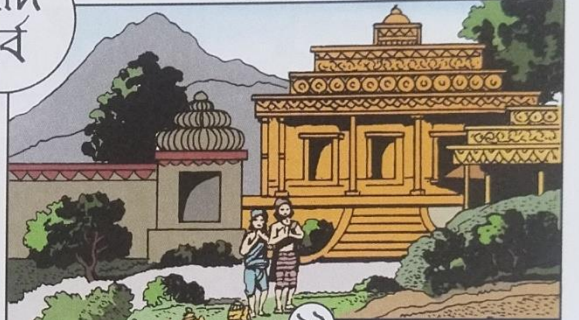
১৯ এমন সময় জেখানে অধিরথ মারথির ছেলে কর্ণ এসে দস্ত করে বললে, “আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই।”



২০ তখনকার দিনে নিয়ম ছিল রাজপুত্র ছাড়া রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত না। সেজন্য দ্রোণপুত্র কর্ণের কথা শুনলেন না। এমন সময় দুর্যোধন বললেন—“আমি একে অস্ত্র-রাজ্য দান করলাম আজ থেকে রাজা কর্ণ আমার বন্ধু।”

আদি
পর্ব

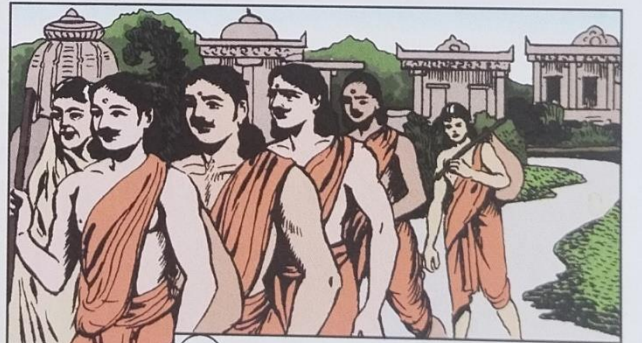
২১ দুর্যোধনের মামা শকুনি ছিলেন পাশাখেলায় ও দুষ্কবুদ্ধিতে পাকা। কৌরবেরা তাঁর সঙ্গে যুক্তি করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্য বারণাবত গ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।



২২ দুর্যোধনের নির্দেশে বারণাবতে চর্বি, গালা ও ধূনো দিয়ে একটি বাড়ি প্রস্তুত হল ও তাঁরই চক্রান্তে কুন্তীসহ পাণ্ডবেরা সেখানে গেলেন।



২৩ পাণ্ডবেরা চক্রান্ত টের পেয়ে একরাতে নিজেরাই ঘরে আগুন দিয়ে বনে পালিয়ে গেলেন।

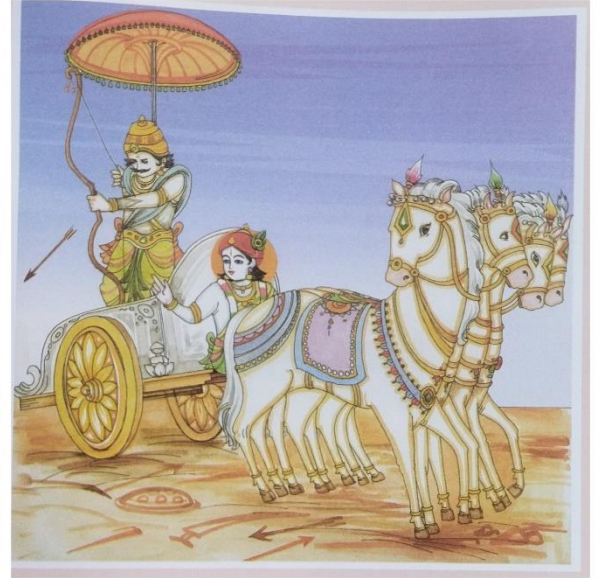
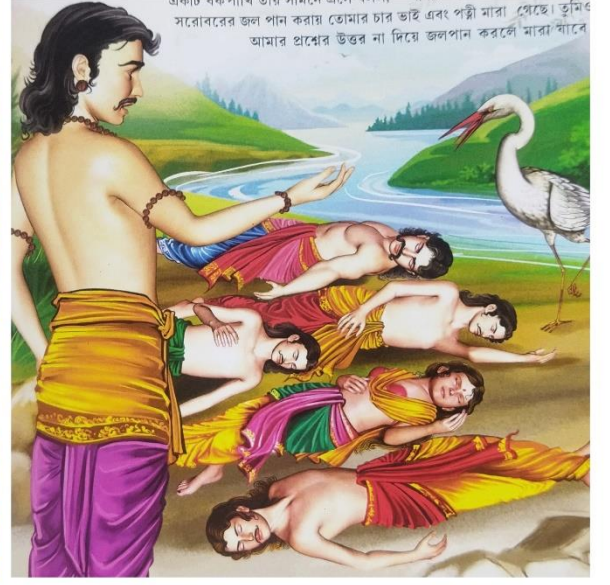


২৪ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা করে তাঁরা দিন চালাতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা একদিন পাঞ্চাল দেশে এসে উপস্থিত হলেন।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী'র বইতে স্থান পাওয়া মহাভারতের নানান ছবি।

উত্থানপদ বিজলী'র বইতে স্থান পাওয়া মহাভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চিত্র।

- ১। পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা। শিখণ্ডিকে সামনে রেখে অর্জুনের যুদ্ধ জয়।
- ২। ধর্মদেবতা অথবা বকরূপী যক্ষের কথা অমান্য করার ফল এবং যুধিষ্ঠিরের দ্বারা যক্ষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান।
- ৩। অর্জুন এবং কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মের জরাসন্ধ বধ।
- ৪। কর্ণকে বধ করার সময় অর্জুনের অস্ত্র ধারণ।



উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

- ১। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ২২৬
- ২। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১২
- ৩। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১২
- ৪। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১৩
- ৫। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১৪
- ৬। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১৫
- ৭। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১৫-৩১৬
- ৮। এবং জলঘড়ি, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩১৬
- ৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কুরুপাণ্ডব*, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৬ব, পৃষ্ঠা ৮
- ১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কুরুপাণ্ডব*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২
- ১১। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১২২
- ১২। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩
- ১৩। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩
- ১৪। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৪
- ১৫। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮
- ১৬। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩
- ১৭। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৪
- ১৮। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৪-২১৫
- ১৯। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩১
- ২০। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ৯১
- ২১। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৬
- ২২। অমলানন্দ, স্বামী, *মহাভারত কাহিনী*, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, ১৪২৫ব, পৃষ্ঠা ৭০
- ২৩। অমলানন্দ, স্বামী, *মহাভারত কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০-৭১
- ২৪। মিত্র, খগেন্দ্রকুমার, *ছোটদের মহাভারত*, কলকাতা: রঞ্জন প্রকাশন, ১৩৯২ব, পৃষ্ঠা ৩৬

- ২৫। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৯৭
- ২৬। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ১১১
- ২৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *আমাদের মহাভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২২৯
- ২৮। অমলানন্দ, স্বামী, *মহাভারত কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮
- ২৯। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৫
- ৩০। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৮
- ৩১। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫২
- ৩২। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *আমাদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৭
- ৩৩। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫
- ৩৪। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৪
- ৩৫। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫
- ৩৬। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮
- ৩৭। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১
- ৩৮। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯
- ৩৯। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ২৪৪
- ৪০। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪৬
- ৪১। মজুমদার, লীলা, *মহাভারতের গল্প*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০২২, পৃষ্ঠা ২০
- ৪২। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *মহাভারত*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৯-২০
- ৪৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কুরুপাণ্ডব*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০
- ৪৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কুরুপাণ্ডব*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১
- ৪৫। অমলানন্দ, স্বামী, *মহাভারত কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯
- ৪৬। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ২৪৮
- ৪৭। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
- ৪৮। মজুমদার, সুবোধ চন্দ্র, *ছোটদের মহাভারত*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ৫৭

- ৪৯। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫
- ৫০। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৩
- ৫১। অমলানন্দ, স্বামী, মহাভারত কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
- ৫২। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, মহাভারতের নীতিগল্প, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২২ব, পৃষ্ঠা ৫০
- ৫৩। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৩
- ৫৪। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ২৪৯
- ৫৫। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮
- ৫৬। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩
- ৫৭। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ২৫০
- ৫৮। মজুমদার, সুবোধ চন্দ্র, ছোটদের মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩
- ৫৯। কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২১ব, পৃষ্ঠা ২৫১
- ৬০। শঙ্করীপ্রসাদ বসু'র কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত একটি শিশু পাঠ্য গ্রন্থ আছে। বইটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। আমরা বইটির ডিসেম্বর ২০১৮ এর তৃতীয় মুদ্রণ হাতে নিয়ে দেখেছি। বইটির ভূমিকা অংশটি আমাদের এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেখান থেকেই আমাদের আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে।
- ৬১। মহাভারতের গল্প নামে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ চমৎকার একটি ছোটদের জন্য বই লিখেছিলেন। কলকাতার উদ্বোধন কার্যালয় থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বইটির ষষ্ঠ সংস্করণ দেখেছি। যেইটি প্রকাশিত হয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে। বইটির নিবেদন অংশ থেকে উপরের অংশটি আমরা নিয়েছি।
- ৬২। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের মহাভারতের গল্প বইটির উপক্রমণিকার কিছু অংশ আমরা নিয়েছি। উপক্রমণিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯ থেকে আমাদের উপরের অংশটি নেওয়া হয়েছে।
- ৬৩। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের মহাভারতের গল্প বইটির উপক্রমণিকার ১৩ পৃষ্ঠা থেকে আমাদের অংশটি নেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মহাভারতের গভীর সার ও সত্যটি এখানে জায়গা পাওয়া কিছু গল্প থেকে আমরা পাই।
- ৬৪। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, মহাভারতের নীতিগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২
- ৬৫। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, মহাভারতের নীতিগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২-৪৫
- ৬৬। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, মহাভারতের নীতিগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২-৫৫
- ৬৭। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, মহাভারতের নীতিগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮-১১
- ৬৮। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, মহাভারতের নীতিগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৭

- ৬৯। মজুমদার, লীলা, *মহাভারতের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২-১৫
- ৭০। মজুমদার, লীলা, *মহাভারতের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯-২১
- ৭১। মজুমদার, লীলা, *মহাভারতের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
- ৭২। বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী, *মহাভারতের গল্প*, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৫-১৯
- ৭৩। বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী, *মহাভারতের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০-২২
- ৭৪। বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী, *মহাভারতের গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৭
- ৭৫। চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র, *ছবিতে মহাভারত*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃষ্ঠা ৬,১০,২১-২৬
- ৭৬। বিজলী, উত্থানপদ, *ছোটোদের রঙিন মহাভারত*, কলকাতা: হোলি চাইল্ড পাবলিকেশন, তারিখ উল্লেখ নেই, পৃষ্ঠা ৯,১৪,৩০
- ৭৭। রাঘবেশানন্দ, স্বামী, *সচিত্র মহাভারত*, পঞ্চম খণ্ড, অনুবাদ- অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৯
- ৭৮। রাঘবেশানন্দ, স্বামী, *সচিত্র মহাভারত*, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০
- ৭৯। রাঘবেশানন্দ, স্বামী, *সচিত্র মহাভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০

উপসংহার

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা (১৯০০-২০২০) শীর্ষক বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যে সকল বিষয়গুলি গবেষণার শুরুতে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছিলাম, সেগুলি আমরা পেয়েছি। মহাভারত বাস্তবিক অর্থেই বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয়। কাজেই নির্দিষ্ট একটি ছকে ফেলে মহাভারতের পাঠ সম্ভব নয়। তাই বর্তমান কালে যে সমস্ত উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠন মহাভারতকে নিয়ে নিজেদের মতো করে উপস্থাপনের প্রয়াস চালাচ্ছে, তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলতা পাবে না। কারণ হিংসা, যুদ্ধ, মারামারি থাকলেও মহাভারতের মতো মহাকাব্যই আবার বলেছে যে মানুষের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধ সমাপ্তির আশায় বলেছে- সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে কেউ নেই। তার অর্থাৎ ভীষ্মের ইচ্ছা ছিল যে, তার মৃত্যুর মাধ্যমেই এই বিনাশকারী যুদ্ধের সমাপ্তি হোক। মহাভারতের এই মহাবাক্য তাকে অন্যান্য গ্রন্থের থেকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে। সমস্ত হিংসা ও হত্যার ওপরে ক্ষমা ও মানবতার কথা মহাভারত বলেছে। বর্তমান মূল মহাভারত থেকে তো বটেই, এমনকী বাংলা সাহিত্যের যে যে পাঠগুলি আমরা নির্বাচন করে আমাদের গবেষণার কাজে এগিয়েছি, সেগুলির দিকেও যদি তাকানো যায় তাহলেও আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের জীবনের থেকে বড়ো আর কিছু হয় না। সমকালীন বৈশ্বিক রাজনীতিতে যেখানে যুদ্ধ ও ব্যক্তির স্বার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের প্রধানদের সহনশীলতা ও ধৈর্য এবং পরমত সহিষ্ণুতার অভাব বড়োই প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে। তার ফলে বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধ ও হানাহানি লেগেই আছে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিষয়টি আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও মহাভারত আমাদের জানিয়েছে। কিন্তু এই মহাভারতেই যুদ্ধকে অতিক্রম করে যাওয়ার একাধিক প্রচেষ্টা পাণ্ডবরা করেছিল। মাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে যুদ্ধ থেকে কৌরবদের মুক্তির বিষয়েও সম্মতি প্রদান করেছিল যুধিষ্ঠির। এছাড়াও ধর্ম বকের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে মহাভারত জানিয়েছে যে, দিনের শেষে যে মানুষ শাক পাতা সহযোগে কিছু ভাত খেতে পারে সেই সুখী। যে গ্রন্থে এত বড়ো ও মহৎ মাপের কথা বলা আছে, সেই গ্রন্থের এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বর্তমান সময়ে আমাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। বলা বাহুল্য, বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য মারামারি ও হিংসা লেগেই আছে। বিগত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে লড়াই আরও বেড়েছে, ভারতের বেশকিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত লড়াই লেগে থেকেছে- মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি এক্ষেত্রে আমাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

ছাড়াও আমাদের দীর্ঘ গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা অত্যন্ত চমকপ্রদ আমাদের কাছে। প্রথমত, মহাভারত শুধুমাত্র রূপকের আচ্ছাদনে আবৃত নয়। অলৌকিক ঘটনা ও অতিপ্রাকৃত বিষয় মহাভারতে থাকলেও তাতে আছে ইতিহাস পূর্বযুগের ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত। আদি মহাভারতের সময়কাল সিন্ধু সভ্যতার থেকেও প্রাচীন। মহাভারত ইতিহাস না হলেও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান মহাভারতের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কালে কালান্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিতে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের কাল সীমায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণের ধারা। তৃতীয়ত, মহাভারত চর্চায় নবজাগ্রত বাঙালির অন্বেষণ ও সৃষ্টিধারা। চতুর্থত, বিশ শতক ও একুশ শতকে মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকট বোঝাতে গিয়ে মহাভারতীয় অনুষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পঞ্চমত, ভারতীয় মহাভারত চর্চার ধারায় বাঙালির অবদান এবং ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালির মহাভারত চর্চার জায়গা।

গ্রন্থপঞ্জি: বাংলা

- অমলানন্দ, স্বামী, *মহাভারত কাহিনী*, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, ২৪ তম সংস্করণ, ১৪২৫ব
- আইয়ুব, আবু সয়ীদ, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মার্চ ১৯৭৩
- আচার্য, দেবীদাস, *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, কলকাতা: সিগনেট, ২০১৯
- আহমেদ, শামিম, *মহাভারতে গুপ্তহত্যা*, কলকাতা: গাঙচিল, অক্টোবর ২০১৪
- *মহাভারতে দ্রৌপদী*, কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৭
 - *মহাভারতে নাস্তিকতা*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি ২০২০
 - *মহাভারতে যৌনতা*, কলকাতা: গাঙচিল, জুন ২০১৮
- কর, বিমল, *অসময়*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩৭৯ব
- *উড়েখই* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮
 - *এই বেদনায়, বিষাদে*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯
 - *একত্র*, কলকাতা: বিকাশগ্রন্থ ভবন, বইমেলা ১৯৯১
 - *শমীক*, কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৩ব
- কর, বিলল, *বাছাই গল্প*, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, একাদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৩ব
- কার্ভে, ইরাবতী, *যুগান্ত*, অনুবাদ- অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৪
- কালকূট, *কালকূট রচনা সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯৩ব
- *কালকূট রচনা সমগ্র* (নবম খণ্ড), কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৬ব
 - *পৃথা*, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৩ব
 - *শাস্ত্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৫ব
- গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার, *ভারতসংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, আগস্ট ১৯৮৯
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৬ব
- *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৮ব
- গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮
- গিরি, সত্যবতী, *কৃষ্ণ কথার ক্রমবিকাশ*, কলকাতা: রত্নাবলী প্রকাশনী, ১৩৯৪ব

- ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০০
- ঘোষ, অজিতকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০২
- *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০
- ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, *জাতক*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৩৭ব
- ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব, *মহাভারত* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৭
- *মহাভারত* (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৮
- *মহাভারত* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, জুন ২০১৮
- *মহাভারত* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৭
- *মহাভারত* (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৯
- ঘোষ, সুবোধ, *ভারত প্রেমকথা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৫ব
- চক্রবর্তী, ননীগোপাল, *মহাভারত: প্রসঙ্গ চরিত্র*, কলকাতা: কবিতীর্থ, জানুয়ারি ২০১১
- চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র, *ছবিতে মহাভারত*, কলকাতা, সংশোধিত বহুবর্ণ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯
- চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ, *মহাভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২৩ব
- চক্রবর্তী, রণবীর ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস* (অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ), কলকাতা: আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০১৯
- চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা), *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১১
- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, কলকাতা: রত্নাবলী, মে ২০১১
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৬ব
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, *শেষ গ্রন্থ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮
- *শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯
- *শ্রীমতী রাধার শেষ সংবাদ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০২৩
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সাংস্কৃতিকী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় অখণ্ড সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯
- চন্দ্র, দীপক, *কৃষ্ণস্তু ভগবান*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৭
- *পৌরাণিক প্রেমকথা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১৩
- *যোজন গন্ধা সত্যবতী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১১
- *অগ্নিগর্ভ খাণ্ডব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩
- *উর্বশী জননী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০২
- *কুন্তীর তর্জনী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০০

- পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৬
- বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১
- জানা, নরেশচন্দ্র, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস: বিদ্যাসাগর, কলকাতা: সাহিত্যলোক, জুলাই ২০১৫
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ভাদ্র ১৪১৬ব
- সঞ্চয়িতা, কলকাতা: ইউনাইটেড পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০২
- রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চদশ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ২০১৬
- রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জুন ২০১৭
- রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ডিসেম্বর ২০১৬
- রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ২০১৬
- রবীন্দ্র রচনাবলী (ঊনবিংশ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ডিসেম্বর ২০২০
- রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ডিসেম্বর ২০১৫
- রবীন্দ্র-রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ২০১৫
- দত্ত, অজিত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৩
- দত্ত, শিপ্রা, চরিত্রে রামায়ণ ও মহাভারত, কলকাতা: কালিকা প্রেস, বৈশাখ ১৩৬১ব
- দত্ত, হর্ষ, বিকর্ণ, কলকাতা: আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৫
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, ছোটদের ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৩
- দাস, কাশীরাম, মহাভারত, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, মুদ্রণ ২০১৩
- দেবসেন, নবনীতা, গল্প সমগ্র (২), কলকাতা: সুপ্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫
- সীতা থেকে শুরু, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৫
- দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৪
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত. কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৪ব.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, জানুয়ারি ২০০০
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৪ তম মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাছাই গল্প, কলকাতা: নাভানা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা বইমেলা ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৩৭২ব
বসু, গিরিন্দ্রশেখর, *পুরাণপ্রবেশ*, কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৯ব
বসু, প্রতিভা, *মহাভারতের মহারণ্যে*, কলকাতা: বিকল্প প্রকাশনী, ২০১৯
বসু, বাণী, *অষ্টম গর্ভ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮

— *অষ্টম গর্ভ* (২), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৪

— *কালিন্দী*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৯

— *কৃষ্ণ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬

— *কৃষ্ণ বাসুদেব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০২১

— *ক্ষত্ৰ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৭

— *ক্ষত্রবধূ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৭

— *পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮

— *সুযোজন-দুর্যোজন*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮

বসু, বুদ্ধদেব, *অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৭

— *কালসন্ধ্যা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২

— *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২ব

— *মহাভারতের কথা*, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৯

— *সংক্রান্তি: প্রায়শ্চিত্ত: ইক্কাকু সেম্নিন*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২

— *সাহিত্য চর্চা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন ১৩৯৯ব

বসু, রাজশেখর, *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত*, কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৪ব

— *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০
বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, *কৃষ্ণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৮

বিজলী, উত্থানপদ, *ছোটোদের রঙিন মহাভারত*, কলকাতা: হোলি চাইল্ড পাবলিকেশন, মার্চ ২০১৯
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, *ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী, *মহাভারতের গল্প*, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ষষ্ঠ সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৩

- বিশ্বাস, নিবেদিতা, *মহাভারত: প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর*, কলকাতা: দে পাবলিকেশন্স, জানুয়ারি ২০১৫
- ভট্টাচার্য, অমলেশ, *মহাভারতের কথা*, কলকাতা: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৫
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯
- ভট্টাচার্য, তপোধীর, *ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা বইমেলা ২০০৮
- *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, মেদিনীপুর: অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২
- ভট্টাচার্য, দেবীপদ, *রবীন্দ্র-চর্যা*, কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রাবণ ১৪০৬ব
- ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, *নায়ক যুধিষ্ঠির*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯
- *মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত*, কলকাতা: আনন্দ, জুন ২০১৭
- *মহাভারতের নারী*, কলকাতা: আনন্দ, জুন ২০১৮
- ভট্টাচার্য, বীতশোক, *পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ*, বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
- ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, কলকাতা: এন বি এ, আগস্ট ২০১৭
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, বইমেলা ২০০০
- *প্রবন্ধসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: গাঙচিল, সেপ্টেম্বর ২০১২
- *প্রবন্ধসংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: গাঙচিল, অক্টোবর ২০১২
- ভট্টাচার্য, সুখময়, *মহাভারতের সমাজ*, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, ১৩৮৯ব
- *সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৯
- *মহাভারতের চরিতাবলী*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯
- ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: পুষ্প, অজ্ঞাত
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌত্তেয়*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৬
- *দণ্ডনীতি*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১০
- *দেবতার মানবায়ন*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১৮
- *বাণ্মীকির রাম ও রামায়ণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৮
- *মহাভারত*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ১৯৯৩
- *মহাভারতের অষ্টাদশী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৮
- *মহাভারতের ছয় প্রবীণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১৮
- *মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪২৫ব
- *কথা অমৃতসমান* (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৬

- কথা অমৃতসমান (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৭
- কথা অমৃতসমান (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৯
- কথা অমৃতসমান (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৭
- কথা অমৃতসমান (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬
- মহাভারত: নীতি অনীতি দুর্নীতি, কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৬
- মহাভারতের প্রতিনায়ক, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জুলাই ২০১৮
- মহাভারতের লঘু-গুরু, কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৬
- মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, রাতের তারা দিনের রবি, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৪১৮ব
- মজুমদার, তিলোত্তমা, অর্জুন ও চারকন্যা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
- মজুমদার, পম্পা, রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ব
- মজুমদার, লীলা, মহাভারতের গল্প, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০২২
- মজুমদার, সুবোধ চন্দ্র, ছোটদের মহাভারত, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২৬ব
- মণ্ডল, সত্যদুলাল, মহাভারত ভাবনা, কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারি ২০১২
- মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম, কলকাতা: আনন্দ, ১৪২৬
- মল্লিক, নিতাই, রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত, কলকাতা: গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা বইমেলা ২০১৮
- মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, পাঞ্চজন্য, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৪২৫ব
- মহাভারতের নীতিগল্প, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২২ব
- শিশু মহাভারত, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪
- মিত্র, দীপঙ্কর, অনাদৃত নায়ক ইন্দ্রজ অর্জুন, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৮
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র ২, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মে ২০১১
- মিত্র, বীরেন্দ্র, কুরুক্ষেত্রে দেব শিবির, কলকাতা: নাথ পাবলিশিং হাউস, জুলাই ১৯৬০
- মিত্র, মনোজ, রামায়ণী মহাভারতী, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৯
- মিত্র, রাজ্যেশ্বর, মহাভারত চিন্তা, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, বৈশাখ ১৩৭২ব
- মিত্র, শাঁওলী, নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৬ব

- মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, *গোল গল্প চৌকো গল্প*, কলকাতা: দ্যা ক্যাফে টেবিল, তৃতীয় প্রকাশ, ২০২২
- *যুগ-সম্ভাবিনী*, কলকাতা: অন্তরীপ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০২৩
- *দৈবাদিষ্ট*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ব
- *প্রথম প্রবাহ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭
- রাঘবেশানন্দ, স্বামী, *সচিত্র মহাভারত*, অনুবাদ- অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য (পঞ্চম ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
- *সচিত্র মহাভারত* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯
- *সচিত্র মহাভারত*, অনুবাদ- তারকনাথ দে (তৃতীয় ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, আগস্ট ২০১৯
- *সচিত্র মহাভারত*, অনুবাদ- অরুণ গুপ্ত (প্রথম ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
- *সচিত্র মহাভারত*, অনুবাদ- কমল নন্দী (চতুর্থ ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, জুন ২০১৯
- রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২
- *ভীষ্ম*, কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, বৈশাখ ১৩৫৪
- রায়, মন্থন, *কারাগার*, কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, নভেম্বর ২০১১
- রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র* (১), কলকাতা: রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সপ্তম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২
- রায়চৌধুরী, রুমা, *কথাসাহিত্যে সমরেশ: সামগ্রিক মূল্যায়ন* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পূর্বাশা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩ব
- লাহিড়ী, দীপঙ্কর, *শাস্ত্রত: মহাভারতের পুনর্পাঠ*, কলকাতা: মনফকিরা, মে ২০১২
- শীল, শঙ্কর, *মহাভারতের নরনারী*, কলকাতা: প্রতিভাস, আগস্ট ২০১১
- সরকার, পবিত্র, *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম অখণ্ড দে'জ সংস্করণ, মার্চ ২০০৮
- সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের মহাভারত*, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৬
- সরকার, সুধীরচন্দ্র(সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৪১২ব
- সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস, *মহাভারতম্* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৩৮৩ব
- সুর, অতুল, *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা*, ঢাকা বাংলাদেশ: আকাশ, বইমেলা ২০২৩
- সুর, সুমনা দাস, *বিমল করের কথাসাহিত্য*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪১৫ব

সেন, নবেন্দু (সম্পাদনা), *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, কলকাতা: রত্নাবলী, অক্টোবর ২০১২
সেন, শিশিরকুমার, *মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩৯০ব
সেন, সুকুমার, *প্রবন্ধ সংকলন* (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৮
সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, *মিথ-পুরাণের ভাঙা গড়া*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০০১
সেনগুপ্ত, মল্লিকা, *স্ট্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০১২
সেনগুপ্ত, মিহির, *বিদুর*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ, ২০১২
হোসেন, সেলিনা, *ঘরগেরস্তির রাজনীতি*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৯
— *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৪

গ্রন্থপঞ্জি: ইংরেজি

Abrams, M.H, *A Glossary of Literary Terms*, Delhi: Cengage Learning India Private Limited, 2018
Bandyopadhyay, Sibaji, *THREE ESSAYS ON THE MAHABHARATA*, Delhi: Orient Blackswan Private Limited, january 2015
Chakrabarti, Arindam and Bandyopadhyay, Sibaji (editors), *Mahabharata Now: Narration, Aesthetics, Ethics*, Delhi: Routledge India, january, 2022
Dasgupta, Chakraborty Subha, *A Bibliography of Reception World Literature in Bengali Periodicals (1890-1900)*, calcutta: Jadavpur University press, August 1992
Freund, Elizabeth, *The Return of the Reader: Reader Response Criticism*, New York: Methuen & Co. Ltd., 1st Pub. 1987
Ghosh, N N, *Early History of India*, Allahabad: The Indian press Ltd., First ed. 1939
Holub, Robert C, *Reception Theory: A Critical Introduction*, London and New York: Methuen & co. Ltd., 1st Pub. 1984
Kosambi, D D, *Myth and Reality*, Bombay: popular prokashan, 1962.
Majumdar, R C, *Historian of India, Pakistan and Ceylon*. London: OUP, 1961

Matilal, Bimal Krishna, *Ethics and Epics: The Collected Essays of Bimal Krishna Matilal* (volume 2) (Philosophy, Culture and Religion), Delhi: OUP, June 2015

Selden, Raman, *A Reader Guide to Contemporary Literary Theory*, London: The Harvester Press Ltd., 1st Pub. 1985

পত্রপত্রিকা—পঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদিত), *বোধ*, মহাভারত সংখ্যা, অক্টোবর ২০০১
চৌধুরী, রীনা (সম্পাদিত), *এবং জলঘাড়ি*, ক্রোড়পত্র প্রসঙ্গ: মহাভারত, ডিসেম্বর ২০১৮- মার্চ ২০১৯
দাস, সোমনাথ (সম্পাদিত), *সময় তোমাকে*, বিশেষ সংখ্যা- আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মিথ, পঞ্চম বর্ষ ২০১১
ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত), *দিবারাত্রির কাব্য*, সুকুমারী ভট্টাচার্য সংখ্যা, ২০১৬
ভট্টাচার্য, মল্লয়া (সম্পাদিত), *এবং আমরা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৫
ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, মহাভারত বিশেষ সংখ্যা, শারদীয় ২০১৪
মণ্ডল, সন্তোষকুমার (সম্পাদিত), *উদ্ধালক*, সপ্তদশ বর্ষ, জানুয়ারি-জুন ২০২৩
মিত্র, দীপক ও সেন, সিদ্ধার্থ (সম্পাদিত), *অন্যকথা*, একাদশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২২ব
রায়, তাপস (সম্পাদিত), *চন্দ্রগ্রহণ*, শারদ সংখ্যা, ১৪২১
শূর, চিরঞ্জীব (সম্পাদিত), *আলোচনা চক্র*, ২১ তম সংকলন, ২০০৩

গবেষণা পদ্ধতি গ্রন্থ

ইসলাম, শেখ মকবুল, গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য- সমাজ- সংস্কৃতি, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০১২
গোস্বামী, জয়ন্ত, সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুন ২০১৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি, গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি, কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১১
মুখোপাধ্যায়, জগমোহন, গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১২

ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য আর্কাইভ্যাল এবং বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি

<https://thewire.in/books/how-does-caste-operate-in-indian-higher-education> তারিখ ও সময়- ২২/৩/২০২০, ৯ pm

https://www.youtube.com/watch?v=-iKDEd_IHNY

তারিখ ও সময়- ২২/৩/২০২০, ৯.১৭ pm

<https://www.anandabazar.com/india/university-was-responsible-rohit-vemula-sucide-claims-2-1.294789> তারিখ ও সময়- ২৮/০৪/২০২০, ১১ am

https://zeenews.india.com/bengali/nation/dalit-student-at-iit-bombay-who-died-allegedly-by-suicide-had-spoken-to-his-sister-and-aunt-about-being-ostracised-by-his-friends-because-of-his-caste_458969.html

তারিখ ও সময়- ০১/০৫/২০২০, ৭ am

https://zeenews.india.com/bengali/nation/inquiry-commission-report-says-rohith-vemula-was-a-troubled-individual_172013.html

তারিখ ও সময়- ০১/০৫/২০২০, ৯.৩৮ am

<https://eisamay.com/editorial/post-editorial/how-dark-is-afghanistan-under-taliban-rule/articleshow/85926932.cms>

তারিখ ও সময়- ০১/০৯/২০২৩, ৭ am

<https://www.anandabazar.com/world/womens-rights-not-priority-says-taliban-spokesperson-after-education-ban-in-afghanistan-dgtl/cid/1399743>

তারিখ ও সময়- ২২/০৯/২০২৩, ১১.৩০ am

<https://www.anandabazar.com/world/un-says-afghanistan-is-most-repressive-country-for-women-in-the-world-dgtl/cid/1412771>

তারিখ ও সময়- ২২/০৯/২০২৩, ১০.৪০ am

<https://bangla.aajtak.in/desh/story/since-taliban-took-power-they-issued-36-edicts-eliminating-womens-rights-said-fawzia-koofi-in-india-today-conclave-2023-hijab-hate-state-sum-528284-2023-03-17>

তারিখ ও সময়- ২৪/০৯/২০২৩, ৭.৫০ am

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/sri-lankan-ex-president-gotabaya-rajapakse-s-family-leaves-for-us-says-report-31672056082085.html>

তারিখ ও সময়- ১৫/০৯/২০২৩, ৭ pm

<https://bengali.abplive.com/news/year-ender-2022-sri-lanka-observes-economic-and-political-crisis-huge-protest-in-2022-945439>

<https://www.youtube.com/watch?v=i6oNiE65PiI>

তারিখ ও সময়- ১৫/১১/২০২৩, ৭ pm

<https://www.youtube.com/watch?v=VcPL8KTXrfg>

তারিখ ও সময়- ১৫/১১/২০২৩, ৭ pm

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654179>

তারিখ ও সময়- ১৫/১১/২০২৩, ৭ pm

<https://www.telegraphindia.com/india/ugc-stops-research-projects-due-to-lack-of-funds-from-centre/cid/1846232>

তারিখ ও সময়- ১৫/১২/২০২২, ৭ pm

<https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/discontinuation-of-manf-is-regressive-and-undermines-indias-research-ecosystem/articleshow/97734610.cms?from=mdr>

তারিখ ও সময়- ১৭/১২/২০২২, ৭ pm

সহায়ক গবেষণা গ্রন্থ

মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটক: ১৮৫২-১৯১২

গবেষক- গৌতম চন্দ্র বাউড়ী

তত্ত্বাবধায়ক- অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১০১৯

পরশুরামের ছোটোগল্প: নির্মাণের শিল্প

গবেষক- সঞ্জিতা বোস

তত্ত্বাবধায়ক- অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

মহাভারত চর্চার দিশা ও বাঙালি মনীষা

গবেষক- সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়ক- ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭